জেরাল্ড এম. মেয়ার
বরার্ট ই. বল্ডউইন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি

তত্ত্ব ইতিহাস কার্যধারা

অধ্যাপিকা আতিকা হোসেন
অনূদিঃ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয়-মুদ্রণ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুদ্রক
এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড
ঢাকা—৩

মুখবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র দেশে উন্নয়ন গতি বেগবান করা এবং ধনী দেশে উন্নয়ন স্পৃহা বজায় রাখার সমস্যা পর্যালোচনা করে দেখা। তত্ত্ব, ইতিহাস ও কার্যধারার আলোতে দীর্ঘসূত্রী উন্নয়ন-প্রবাহ নিশ্চিত করার শক্তিনিচয় উদ্ভাষণে তা নিবেদিত।

উন্নয়ন-অগ্রগতির বাস্তবমুখী সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে বহু ধন-বিজ্ঞানী আজ অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ইতিহাস পূর্ণ মূল্যায়নে মগ্ন। অগ্রগতি সম্পর্কীয় এইসব পুনর্বিবেচনা অবশ্য বহুমুখী খাতে প্রবাহিত। ফলে, ভিন্নমুখী বহু যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে। কাজেই, প্রথম দৃষ্টিতে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্লেষণাদিতে ঐকমত্য খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল বটে বরং খণ্ডিত ও বিসদৃশ চিত্র পাওয়াই স্বাভাবিক। বক্ষ্যমান পুস্তক এই ধারণার অবসান ঘটাবে। কারণ, বিপরীতধর্মী প্রধান প্রধান অবদানগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করে সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরী করে নেয়াই আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। তাতে করে প্রগতি-প্রক্রিয়ার 'সুসংহত রূপ'টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি।

সুসংবদ্ধ এই রূপকাঠামো প্রণয়নে প্রথমে আমাদের উদ্দেশ্য হবে অভীষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে নেয়া, প্রণালীসম্মত বিধি-বিধান তৈরী করে নেয়া। তদনুসারে আলোচনায় বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করা হবে বিশ্লেষণী ছক্ বিন্যাসে যার পরিবৃত্তে প্রগতি প্রক্রিয়ার মূল উপাদানাবলীর আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে।

অগ্রগতি-তত্ত্ব বহুকাল ধরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। ক্লাসি-ক্যাল, মার্ক্সিয়ান, নয়া ক্লাসিক্যাল ও কেইনশীয় সব ধন-বিজ্ঞানী এই সমস্যা উন্মোচনে পথ-নির্দেশ করেছেন। প্রথম পর্বে এই সকল তত্ত্বাবলীর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আলোচিত হয়েছে। বিশেষ জোর আরোপ করা হয়েছে আদম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, কার্লমার্ক্স, আলফ্রেড মার্শাল, জোসেফ সুম্পিটার ও কেইনশীয়োত্তর ধন-বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে। অর্থনৈতিক প্রগতি-প্রক্রিয়ার এইসব তত্ত্ব-ধারণা উদ্ভাসিত করে অতঃপর আমরা এগিয়ে যাব তাদের তুলনামূলক বিচারে এবং সমন্বিত করার প্রয়াসে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রূঢ় বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাই দ্বিতীয় পর্বে উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-অর্থনীতির 'কেন্দ্রভূমি' রূপে বৃটেনের উদ্ভব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে তুলে ধরা হবে। বিশ্ব-পরিমণ্ডলে বিস্তৃত এই প্রেক্ষাপটে অগ্রগতি-প্রবাহ গত শতাব্দীতে যে রূপ-নক্সা পরিগ্রহ করে তার মূল বৈশিষ্ট্যাবলী চিহ্নিত করায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হবে। ইতিহাস-চিহ্নিত ঘটনাপ্রবাহ-পরম্পরা ক্রমানু-সন্নিবেশের ফলে একদিকে অগ্রগতি-প্রক্রিয়ার সংখ্যাবাচক দিক-নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং অন্যদিকে উন্নয়নের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক একত্রীভূত করে নেয়া চলবে।

ইতিহাস-চিহ্নিত পথে পরিভ্রমণ শেষে আমরা চলতি দুনিয়ার ঘটনা-বর্তে এসে উপস্থিত হব। অতীতে অগ্রগতির বিভিন্ন হার আজ দেশে দেশে অসম উন্নয়ন পর্যায় জন্ম দিয়েছে। তার এক প্রান্তে অবস্থিত আজকের গরীব দেশ আর অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ধনী দেশ। গরীব দেশের জন্য প্রধান সমস্যা: উন্নয়ন অগ্রগতি বেগবান করা; প্রকৃত জাতীয় আয়ের বর্ধন-হার চড়া করে তোলা আর ধনী দেশের জন্য মাথাব্যথা: উন্নয়ন-হার যথাবিহিত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা—যাতে বিধ্বংসী মুদ্রাসঙ্কোচন কি মুদ্রা-স্ফীতি এড়িয়ে দ্বিরায়তনিক পরিসরে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি অর্জন সম্ভব হয়। এই দুই সমস্যা যথাক্রমে তৃতীয় চতুর্থ পর্বে আলোচিত হবে এবং তৎ-উৎসারিত উপসিদ্ধান্তমালা তুলে ধরা হবে।

সুতরাং, বর্তমান পুস্তকে নিম্নে বর্ণিত মুখ্য প্রশ্নাবলী পর্যালোচনা করা হবে:

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রধান প্রধান নিয়ামক কি কি? (প্রথম পর্ব)

(২) এইসব নিয়ামক অতীতে কিভাবে ক্রিয়া করেছে? (দ্বিতীয় পর্ব)

(৩) আজকের দরিদ্রদেশে উন্নয়ন-গতি বেগবান করায় কোন্ সব অন্তরায় বিরাজমান? (তৃতীয় পর্ব)

(৪) ধনীদেশ তার যথাবিহিত অগ্রগতি হার বজায় রাখায় কি কি সমস্যার সম্মুখীন (চতুর্থ পর্ব)।

আমাদের আলোচনা অর্থনৈতিক উপাত্ত বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিক কারণে এই পরিবৃত্তের বাইরে অধিক দৃষ্টি দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমরা স্বীকার করি যে, প্রগতি-প্রক্রিয়ার সঠিক রূপ-নির্ণায়নে এটাই

যথেষ্ট নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও সাহায্য নেয়া কাম্য। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমরা অন্যত্রও কিছুটা বিচরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। বিশেষ করে অতীতের ঘটনা তথা 'কেন'কে তুলে ধরার জন্য ইতিহাস ঘেটেছি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মূল্যবোধ, প্রেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গী যাচাইয়ের নিমিত্তে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান জগতে চু মেরেছি। সম্ভব-অসম্ভব তথা সাধ্য-অসাধ্যের বৈপরীত্ব প্রদর্শনে, শক্তিবর্গের চেহারা-চরিত্র উদ্ভাষণে এবং নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীর বিধান তৈরী করার নিমিত্তে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান জগতে ক্ষণিক বিচরণ করেছি। তাছাড়া, যুক্তিজাল ধারামাফিক পথে বিন্যস্ত করায় প্রয়াস পেয়েছি যাতে প্রয়োজনানুসারে অতিরিক্ত মাল-মশলা সংযুক্ত করে নেয়া যায়। তদুদ্দেশ্যে সমাজ-সংস্কৃতিক বিষয়, বাস্তব উন্নয়ন কার্যক্রম ও দেশওয়ারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কিত পুস্তকের তালিকা-সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট পেছনে সংযোজন করে দেয়া হয়েছে।

সামগ্রিক আকারে বইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তন) পঠনরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ আঁধার। পুস্তকটি মূলতঃ উপাধিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত। স্নাতক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও তার থেকে উপকার পেতে পারে। বইটির কিছু কিছু অংশ হয়ত আন্তর্জাতিক ধন-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যা-লোচনা হিসাবেও উপকারী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

গ্রন্থটি মিলে-মিশে লেখা হয়েছে। উভয় গ্রন্থকার পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বইটি সম্পন্ন করেছেন। তবে অধ্যাপক মেয়ার লিখেছেন 'অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা', পঞ্চম পরিচ্ছেদ এবং সপ্তম থেকে একবিংশ পরিচ্ছেদ আর অধ্যাপক বলডউইন লিখেছেন প্রথম থেকে চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদসমূহ।

আমাদের ছাত্ররা ছিল আমাদের পরীক্ষাগার। তারাই ছিল আমাদের ধ্যান-ধারণার প্রথম পাঠক। তাদের সাথে আলোচনায় আমরা বহুল উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক **Henry Broude, Every Domar, James Duessen-berry, Gottfried Haberler, Burton Hallowell, David McClelland, William Parker, Arthur Smithies** ও **Kossuth Williamson** তাঁদের জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য দিয়ে আমাদেরকে ধন্যবাদার্হ করেছেন। অধ্যাপক **A. H. Imlah** বৃটেনের বাণিজ্য-শর্তের উপর তাঁর সংশোধিত হিসাব প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইটিতে সন্নিবেশিত চিন্তাস্রোতের প্রাথমিক সূতিকাগার হিসাবে কাজ করেছে Merril Center for Economics. অধ্যাপক মেয়ার ১৯৫৫ সালে এই Center-এ কিছুকাল সময় কাটান—তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর সেখানকার সহকর্মীদের কথা স্মরণ করছেন। মহাকরণ কার্যাবলী নিষ্পন্ন হয়েছে Wesleyam Research Committee-এর সহায়তায়। সেখানের মিসেস Evelya Place ও মিসেস E. B. Carling অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বহু প্রকাশকের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণের অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে বাধিত করেন। সময়ে সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধাদির পুনর্প্রকাশনে অনুমতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট পত্র-পত্রিকা আমাদের বিশেষ বাধিত করেন।

সর্বোপরি, আমাদের সহধর্মীণীদ্বয়—তাঁদের স্বভাবসুলভ সহনশীলতার পরশ দিয়ে আমাদেরকে যেভাবে নিমগ্ন রেখেছেন এবং সহায়তা প্রদর্শন করেছেন তা অপূর্ব বলেই ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁদের ভূমিকা অনেকাংশে সহ-গ্রন্থকার, হয়ত বা তার চেয়েও অধিক ছিল।

জি. এম. এম.

আর. ই. বি.

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

প্রারম্ভিক

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ পর্ব

অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকা

নক্সাসূচী

সারণীসূচী

প্রথম পর্ব

"ভাণ্ডার পূর্ণ আর গোমস্তা (Steward) উদার। সুতরাং রাজনৈতিক ধন-বিজ্ঞান (Political economy) নির্বস্তুক নীতিমালার অর্থহীন বিচ্ছিন্ন কচ্‌কচানী নয়। বরং তা আগা-গোড়া মানুষেরই কাহিনী।....... সম্পদ রীতি-নীতি যেন সুসংবদ্ধ নাটকের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সমাবেশে উদ্ভাসিত।"

—ফ্রান্সিস ডাব্লউ. হার্ষট

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : তত্ত্বাবলী

প্রারম্ভিক

আলোচনা শুরু করা যাক। তবে প্রবহমান ধারা দিয়ে নয়। মানুষ তার কালের সৃষ্টি ও বহমান ঘটনার আবর্তে নিয়ন্ত্রিত। অনিত্য ঘটনাবলী তার মধ্যে বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। ফলে তার দৃষ্টি সাম্প্রতিক ঘটনাবর্তে জড়িয়ে যেতে পারে এবং তাহলে স্বচ্ছ উপলব্ধি নাও ঘটতে পারে। কাজেই, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের নিমিত্তে কালের সীমা ছাড়িয়ে অতীত দিগন্তে বিচরণ করা শ্রেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেই সুদূর অতীতকালের প্রবহমান একটি প্রক্রিয়া। অতীতের বহু মনীষী এ নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই সকল অবদান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কালের কষ্টিপাথরে বহু অবক্ষয় ঘটেছে বটে। ইতিহাস বহু মতবাদ মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে দিয়েছে। আবার বহু প্রতিপাদ্য সময়সীমা পেরিয়ে সত্য হিসাবে আজও দেদীপ্যমান। আমাদের আলোচনায় সেই সব বিষয়াবলী যথোপযুক্ত স্থান পাবে।

তাতে করে পুরোপুরি লাভ আমাদের। আমাদের কালের কবলমুক্ত হয়ে আমরা স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে নিজেদেরকে ব্যাপৃত করে নিতে সক্ষম হব। আমাদের হাতিয়ার হবে অধিকতর সূক্ষ্ম ও ধারালো। সাম্প্রতিক ঘটনার উদ্ভাবনে আমরা হব অধিকতর সক্ষম। উন্নয়ন-কার্য-করণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অতীত মনীষীদের মতামত যাচাই করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে আমরা আমাদের সুষ্ঠু নীতিমালা গড়ে তুলতে সক্ষম ও সফল হব। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিভিন্ন চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে বর্তমানকালের সমস্যাবলী সমাধানে তাঁদের মন্তব্যাবলীর সত্যাসত্য বাছাই করে নিতে পারব। অন্যদিকে নিজেদের নীতিমালা প্রণয়নে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাব। বিভিন্ন কালের মতবাদে বিদ্যমান তারতম্যগুলো ও দেখে নিতে সক্ষম হব।

বর্তমান পর্বে পাঁচ শ্রেণীর তত্ত্ববাদীর মতবাদ তুলে ধরা হবে। মতবাদগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে এবং মূল্যায়ন করা হবে। এই

শ্রেণীগুলো হচ্ছে: (১) ধ্রুপদী ধন-বিজ্ঞানী, (২) মার্ক্সবাদী, (৩) নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ববাদী, (৪) সুম্পিটার ও (৫) কেয়নশীয়োত্তর মতাবলী। প্রতিটি গ্রুপে অসংখ্য ধনবিজ্ঞানী রয়েছে। তাঁদের সবাকার আলোচনা করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি প্রয়োজনও নেই। প্রতিটি গ্রুপ থেকে প্রতিভূ স্থানীয় দু'এক জনের মতাবলী নিবিড়ভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে। যে সকল লেখকের লেখা আলোচনা করা হবে তাঁরা হচ্ছেন: স্মিথ ও রিকার্ডো (ধ্রুপদী স্কুল); মার্ক্স (মার্ক্সবাদী); মার্শাল, উইকসেল্ ও ক্যাশেল (নব্য-ধ্রুপদী স্কুল); সুম্পিটার এবং হেরড-ডোমার (কেয়নশীয়োত্তর)। এই সকল লেখকের মতাবলী বিশ্লেষণ করে প্রতিটি গ্রুপের আসল বক্তব্য পেয়ে যাব এবং এটুকুই আমাদের প্রয়োজন।

তাঁদের বক্তব্যাবলী থেকে যে জ্ঞান আমরা পাব তা দিয়ে উন্নয়ন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাব। অতঃপর তাঁদের আলোচনার সারবস্তু নিংড়িয়ে একটা সংশ্লেষ (synthesize) সৃষ্টি করে নেয়া যাবে। সুতরাং, বলতে পারি বর্তমান পর্বের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন-অগ্রগতির আকৃতি-প্রকৃতি ও নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে অতীত মনীষীদের ধ্যান-ধারণা রীতিসিদ্ধ ও সুসংহতভাবে একত্রিত করা ও ক্রমানুসন্নিবেশ ঘটানো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্রুপদী বিশ্লেষণ
(Classical Analysis)

দৃপ্ত অথচ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধ্রুপদী ধন-বিজ্ঞানী অর্থনীতির পর্যালোচনা করেছেন। জাতীয় আয় তাঁদের লক্ষ্যস্থল। তার দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণ নিয়ে তাঁরা অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থেকেছেন। সম্প্রসারণের কারণসমূহ নির্ণয়ে মাথা ঘামিয়েছেন অধিক। তেমনি বর্ধন-প্রক্রিয়া নির্ণয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। কিন্তু সম্পদ বরাদ্দকরণ কি ভোক্তা ও উৎপাদকের সিদ্ধান্তাবলী তাঁর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে সমাদর পায়নি। এইসব তাঁর কাছে গৌণ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অথচ নব্য-ধ্রুপদী এই সবে মাথা ঘামিয়েছেন। আলোচনা প্রদান করেছেন বিস্তৃত। ক্লাসিক্যাল মতবাদীর জন্য প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল : অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গে একটা আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তার গুরুত্ব সমধিক। ক্লাসিক্যাল মতে এই কারণিক সম্পর্কের মাত্রানুযায়ী অসমষ্টিকরণ পরিমাণ নির্ণীত হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক। ধ্রুপদীবাদীরা বলেন, জাতীয় আয় তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—মজুরী, খাজনা ও মুনাফা। তাঁদের এই বিভক্তিকরণে যুক্তি হচ্ছে এই যে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে গতিধারাকে বেশ প্রভাবান্বিত করে। তাদের সূক্ষ্ম চুলচেরা বিভেদ প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুধাবনে তা অত্যাবশ্যক নয়। এই একই যুক্তিতে তাঁরা জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্যকে কৃষি-দ্রব্য ও শিল্পদ্রব্যে ভাগ করেন। তাঁদের বক্তব্যের অপর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁরা কেবল উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হন না, বরং এই সকল নীতিমালার গুণাগুণ বিচার করেও দেখেন। কোন্‌গুলো উন্নয়নের সহায়কারী আবার কোন্‌গুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী তাও নির্দেশ দেন।

আদম স্মিথ ও রিকার্ডোর বক্তব্য পর্যালোচনা করা যাক। তাঁদের বক্তব্য থেকেই ধ্রুপদী মতবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

রিকার্ডোর ছাঁচ (model) অনন্যসাধারণ। কি শৃঙ্খলায়, কি বক্তব্যে অথবা কি আদর্শ হিসাবে বা যুক্তিতর্কের মাপকাঠিতে তা ছিল সর্বৈব সৌকর্যময়। রিকার্ডোর চিহ্নিত পথে ইংরেজ চিন্তাধারা অনেককাল প্রবাহিত হয়েছিল। তবে স্মিথও কম নন। তিনি অবশ্যই ক্লাসিক্যাল মতবাদীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

১. আদম স্মিথ

আদম স্মিথের **An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations** (১৭৭৬)[১] ধন-বিজ্ঞানের উপর লিখিত এক যুগান্তকারী পুস্তক। আদম স্মিথকে বলা হয় 'অবাধ-নীতির' **(Laissez-faire)** আদি-পিতা। ধন-বিজ্ঞান তত্ত্বে স্মিথের প্রভাব অপরিসীম। এমন কি রিকার্ডোর যে উন্নয়ন-তত্ত্ব তা স্মিথের চিন্তাধারার সুসংবদ্ধ প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়। স্মিথ তাঁর চিন্তাধারার সমঝোতা সাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন (হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে)। রিকার্ডো সেই মালমসলা দিয়ে সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, স্মিথের লেখা তেমন সুষ্ঠু গাঁথুনীর নয়। চিন্তা-স্রোত তেমন সংযত নয়, যুক্তিতর্ক তেমন জোরালো নয়। বিশ্লেষণ তেমন মাধুর্যময় নয়। কাজেই, স্মিথকে নিয়ে বেশী কিছু একটা আলোচনা করা হবে না, সেই তুলনায় রিকার্ডোকে বেশ করে খতিয়ে দেখা হবে। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য ঐসব তত্ত্বগুলো অধিক করে আলোচনা করা যেগুলো উন্নয়ন বিশ্লেষণে অধিক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তাই বলে যেন মনে করবেন না স্মিথকে হেয় চোখে দেখা হল। নিশ্চয়ই নয়। তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া অনুধাবনে তাঁর অনেকগুলো আলোচনা যথেষ্ট সহায়ক।[২] তাঁর মুখ্য মতবাদগুলো নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল।

তার গাঁথুনী তেমন বলিষ্ঠ নয় বটে। আটুনী তেমন বজ্র নয়। গেরো ফস্‌কা। বিশ্লেষণ অস্পষ্ট ও ঘোরপ্যাচালো-ভিত্তিক। কিন্তু, এই

---

১. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. Eward Cannan, The Modern Library, Random House, New York, 1937.

২. বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণটুক দেখুন, প্রাগুক্ত পুস্তক, বই III।

সব দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট ও বেশ জোরালো একটা প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে অবাধ-নীতি তথা অর্থনীতিতে প্রবহমান স্বয়ংক্রিয় পূর্ণ প্রতিযোগিতা ব্যাহতকারী সরকারী সক্রিয়তা এমনকি, বেসরকারী ক্রিয়াকলাপের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা প্রকাশ। স্মিথ এই বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সক্রিয় প্রাকৃতিক-আইন নীতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সহজ ভাষায় নীতিটি হচ্ছে "স্বাধিকার বা ন্যায়-নীতির একটা স্বাভাবিক বিধি-নিয়ম বিরাজমান রয়েছে, হয়ত বা নৈতিকতা বোধেরও। মানুষ তা স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। কতকক্ষেত্রে হয়ত বা যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হতে পারে এই বিধি-নিয়মের অনুশাসন সবার উর্ধ্বে। এমনকি রাজা-মহারাজার আদেশ-নিষেধ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সনাতন বৈধ বা নৈতিক বাধা-নিষেধ অপেক্ষা তা অধিক ক্ষমতাবান। কাজেই রাজা-মহারাজা কি সমাজের রক্তচক্ষু এই প্রাকৃতিক বিধি-নিয়মের ব্যত্যায় ঘটাতে পারে না।"[৩] স্মিথ এই নীতিকে ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে 'প্রকৃতি' সব সাজিয়ে দেয়। সুবিন্যাস ঘটিয়ে দেয়। তাঁর বিন্যাস অপেক্ষা সুষ্ঠু কিছু হতে পারে না। উন্নয়ন-অগ্রগতির বেলায়ও একথা সমভাবে সত্য। ন্যায়নীতি-ভিত্তিক বৈধ ব্যবস্থা মানুষের মৌল অধিকার নিশ্চিত করে। তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তার কর্মাবলীতে বাধা অপসারণ করে। তাকে ইচ্ছামত পেশা বেছে নিতে সক্ষম করে তুলে। অথচ তা অন্যের অধিকার খর্ব করে নয় বা অন্যের সর্বস্ব গ্রাস করে নয়, বরং অন্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে। শ্রদ্ধা জানিয়ে। তা নিশ্চিত করার আশ্বাস প্রদান করে। আর এই বৈধ-ব্যবস্থা হচ্ছে প্রকৃতিসঞ্জাত। এই স্বাভাবিক স্রোতধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে যাওয়া বোকামির নামান্তর। ধন-বিজ্ঞান জগতে বাধা-নিষেধের বেড়া গড়ে তোলা আর এই সাবলীল গতিধারায় কুঠারাঘাত করা একই কথা। ফলে, জাতীয় উন্নয়ন প্রতিহত হয়। তার চেয়ে সবাইকে যার যার পেশা অবলম্বন করে বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হউক। প্রাকৃতিক 'বাধার' বাইরে কোন কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। তাতে সুসংহত ও

---

৩. দেখুন O. H. Taylor-এর Economics and Liberalism, Collected Papers, Harvard University Press, Cambridge, 1955, পৃ: ৭৩।

সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম নেবে এবং তা হবে সমাজের সবাকার জন্য মঙ্গলজনক। স্মিথের ভাষায় 'অদৃশ্যহস্ত' অর্থাৎ কিনা পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বাজার-ব্যবস্থা তা নিশ্চিত করবে।

কিন্তু কিভাবে তা ঘটতে পারে? সবার স্বার্থ বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে কি? স্মিথ বলেন, কেন হবে না? 'শ্রম-বিভাজন' নীতি মেনে চলুন। শ্রম-বিভাজন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। শ্রম-বিভাগ ও নৈপুণ্য (specialization) (১) শ্রমেব দক্ষতা বাড়িয়ে দেয়, (২) দ্রব্য উৎপাদনে সময়ের হ্রাস ঘটায় এবং (৩) যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আবিষ্কারে সহায়তা করে। বিদ্যমান সাজসরঞ্জামে একই শ্রমিক নিরন্তর কাজ করে। অন্যদিকে গবেষক ও অনুসন্ধানী নিত্যনতুন আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকে। এই উভযবিধ ক্রিয়াকর্মের ফলে দক্ষতা আরও বেড়ে যায়।

শ্রম-বিভাজন কেন ঘটবে? স্মিথ বলেন, মানুষের স্বাভাবিক স্পৃহা "অদল-বদল করা, এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস বিনিময় করা," তা সাধিত করে দেবে। স্ব-স্বার্থ বিনিময়ে প্ররোচিত করবে এবং পরিণামে শ্রম-বিভাজন ঘটবে। যুক্তিটা ঘোরপ্যাচালো এবং তেমন সুষ্ঠু নয়। সে যাই হউক, শ্রম-বিভাজনের জন্য মূলধন প্রয়োজন। মূলধন-গঠন যথেষ্ট হতে হবে। তাই স্মিথ বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। "মূলধনে হ্রাস-বৃদ্ধি শিল্পোৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়, শ্রমের সংখ্যা বাড়ায়-কমায়। পরিণামে দেশের ভূমি ও শ্রমের বার্ষিক উৎপন্নের বিনিময় মূল্যে; দেশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদে।" এদিকে, "মূলধন বৃদ্ধি পায় মিতব্যয়িতায় আর হ্রাস ঘটে অপব্যয় ও নষ্টামির ফলে।"[৪]

স্মিথের মতে শ্রম-বিভাজন সীমিত করার অপর শক্তি 'বাজার পরিধি' এই সম্পর্কে তিনি বলেন, "বাজার পরিধি সঙ্কীর্ণ হলে বেশী উৎপন্ন করার স্পৃহা থাকে না, কেউ এক কাজে নিজকে ব্যাপৃত রাখার উৎসাহ পায় না। উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রি করার জো যে নেই। নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস যে বিনিময় করা যায় না। অন্যদিকে। বাকী সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার জো নেই।"[৫] বেশ বলিষ্ঠ যুক্তি, কথাটা সাদামাঠা

৪. স্মিথ-এর প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা—৩২১।
৫. ঐ পৃঃ ১৭।

হলেও বেশ মূল্যবান। চাহিদাবিহীন জিনিস উৎপন্নে লাভ কোথায়? আর বাজার ছাড়া চাহিদা আসবে কোথেকে? কাজেই, প্রয়োজন বহির্বাণিজ্য। বহির্বাণিজ্যের উপকারিতা এখানে নিহিত। তাই তিনি আমেরিকা আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন, "ইউরোপীয় পণ্যের জন্য তা নতুন সীমাহীন নির্গম পথ খুলে দিয়েছিল। ফলে শ্রম-বিভাজন সুগম হয়েছিল। উৎপাদনপদ্ধতি ও আঙ্গিক উন্নত হওয়ার সুবিধা হয়েছিল। ইউরোপের সংকীর্ণ বাজার পরিধিতে তা সম্ভব ছিল না। উৎপাদন তেমন হারে সম্প্রসারিত হতে পারত না। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে গিয়েছিল ব্যাপকহারে। উৎপন্ন দ্রব্য বেড়ে গিয়েছিল অনেক গুণ। ফলে দেশবাসীর প্রাচুর্য এসেছিল প্রচুর পরিমাণে।"[৬] এই বক্তব্যটি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বৃটেনের উন্নতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে তা আলোচিত হবে।

আদম স্মিথের মতে উন্নয়ন ক্রিয়া-কর্ম পুনরাবৃত্তধর্মী। একবার শুরু হয়ে গেলে তা স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠার ক্ষমতা লাভ করে। বাজার পরিধি মনে করুন যথেষ্ট। মূলধন সংগঠন হওয়ার সুযোগ-সুবিধা প্রচুর। স্মিথ বলেন তাহলে শ্রম বিভাজন ঘটবে ও উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যাবে। ফল হিসাবে জাতীয় আয়ে বর্ধন ঘটবে। এদিকে লোক-সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কাজেই বাজার-সীমা বিস্তৃত হবে। সঞ্চয়-পরিমাণও বেড়ে যেতে বাধ্য। তাতে জাতীয় আয় বাড়ার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ক্রমে ক্রমে শ্রম অধিক দক্ষ ও নিজ নিজ পেশায় নিপুণ হয়ে উঠবে। ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে। উৎসাহ-উদ্দীপনা উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। নব নব উৎপাদন-আঙ্গিক গ্রহণে আগ্রহ বাড়বে। উৎপাদন-প্রথা উন্নততর হবে। নৈপুণ্য আরও বেড়ে যেতে থাকবে। সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তিও।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এই বর্ণনা দিয়ে স্মিথ আমাদেরকে পরবর্তীকালের ব্যয়সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ (external economics) সম্পর্কে অবহিত করে তুলেছেন।[৭] নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা এই নীতির ভূয়শী প্রশংসা

৬. প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা, ৪১৬

৭. এই সম্পর্কে জানতে হলে আলোচনা করুন তার "Effects of the Progress of Improvement upon the Real Price of Manufactures," পূর্বোক্ত বই, পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৭।

করেছেন।[৮] ব্যয়সঙ্কোচে বাহ্যিক কারণ কথাটার অর্থ হচ্ছে পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক ব্যয় নিম্নগতি-সম্পন্ন হয়ে উঠে।[৯] অর্থাৎ একটা শিল্পের চারপাশে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প ও শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক শর্তাবলী পূরণে সক্ষম (যেমন যানবাহন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি) ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে তার ব্যয়-নির্দেশক রেখা (cost curve) নিম্নগামী হয়ে উঠে। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। বিশেষ একটা শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটল। তার ফলে অধিকতর দক্ষ শ্রমিক তথায় জড়ো হতে থাকবে। ফলে, শিল্পভুক্ত ফার্মসমূহ অধিক ফায়দা পাবে। যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত কোথায়ও, যানবাহনে অধিকতর প্রয়োজনীয় এমন সব শিল্প সেই জায়গায় গড়ে উঠতে থাকবে। কেননা তাতে তাদের খরচা পরিমাণ কম হবে। বহির্ব্যয় সঙ্কোচ প্রত্যয়টা শিল্পে শিল্পে নির্ভরশীলতা ও সম্পূরকতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এক অংশ বাড়ছে, অন্য অংশকে তা প্রভাবিত ও প্ররোচিত করছে। অন্য অংশের খরচ কমাতে সহায়তা করছে। ফলে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও জন্মে। ফলে সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ও বর্ধন ঘটতে থাকে।

স্মিথ উন্নয়নক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তির কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাখ্যাটুকু অনুধাবন করতে তাঁর আয়-বন্টন তত্ত্ব খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমে ধরুন তাঁর মজুরী নির্ধারণ তত্ত্ব। দুঃখের বিষয় তাঁর বইয়ে এর কোন সঠিক ও স্বচ্ছ জওয়াব নেই। প্রথমে তিনি বলেছেন যে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরী স্থিরীকৃত হয়। তাদের আপেক্ষিক বাদানুবাদ ক্ষমতা তা নির্ণয় করে। তাঁর মতে নিযোগকর্তার ক্ষমতা অধিক। তাই শ্রমিক জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম যে মজুরী প্রয়োজন তাই পেয়ে থাকে। মূলধন-সংগঠন যখন দ্রুত হারে হতে থাকে তখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের সুবিধা বেড়ে যায়। তার চাহিদা বাড়ে, পুঁজিপতি একটু বেকায়দায় পড়ে। ফলে মজুরী বেড়ে যেতে থাকে ; কিন্তু বেশীক্ষণ বাড়ার জো নেই।

---

৮. দেখুন, যথা তৃতীয় পরিচ্ছেদ, তৃতীয় ভাগ।

৯. অবশ্য উল্টোটাও ঘটতে পারে। 'বাহ্যিক' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে এইজন্য যে এই ব্যয়-সঙ্কোচ কোন বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

একটা স্বাভাবিক ভাটা পড়ে। "শ্রম-চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকলে বিয়ে-সাদীর সংখ্যা বেড়ে যায়। জনসংখ্যা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। ফলে মজুরীর বাড়তি অংশটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়। শ্রমসংখ্যা কোন সময়ে কম হলে মজুরী বেড়ে যায়। আবার মজুরী কম হলে অপর্যাপ্ত শ্রম-সরবরাহ তা বাড়িয়ে দেয়। ভিন্নদিকে, মজুরী জীবনধারণের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হলে জনসংখ্যা বেড়ে যেয়ে অচিরে তা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসে। অর্থাৎ মজুরীর হার জীবন ধারণের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে প্রাকৃতিক কারণে।" সোজা কথায় তাঁর মত হচ্ছে, "অর্থনীতির স্থবির পর্যায়ে (stationery state) শ্রমিক জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম যে মজুরীর প্রয়োজন সেই পরিমাণ মজুরী পেয়ে থাকে। আর যখন মূলধন-গঠন দ্রুত হারে হতে থাকে তখন তা ঊর্ধ্বগতি নেয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়। কতটুকু বাড়বে তা নির্ভর করে একদিকে মূলধন-সংগঠনের উপর ও অন্যদিকে জনসংখ্যা বর্ধনের উপর।

মুনাফায় কি ঘটে? দেখা যাক। তিনি বলেন (রিকার্ডোর মত; অবশ্য কারণ ভিন্ন) "সংভার (stock) বর্ধন মজুরী বাড়িতে দেয়। ফলে মুনাফায় হ্রাস ঘটে।"[১০] তাঁর যুক্তি বলিষ্ঠ নয়। "পয়সাওয়ালা বহু বণিকের সংভার যখন একই ব্যবসায় নিয়োজিত হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে মুনাফা হ্রাস পায়।' সব ব্যবসায় একই অবস্থা সৃষ্টি হলে পরিণাম একই হতে বাধ্য।" কিন্তু, তাঁর প্রথম উক্তির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দ্বিতীয় উক্তি সত্য নাও হতে পারে। রিকার্ডোও এই মত পোষণ করেন।[১১]

এবারে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যাক। নব-অধ্যুষিত একটা এলাকা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম সবে শুরু হয়েছে। মজুরী হার ও মুনাফা পরিমাণ কেমন হবে? স্মিথের বক্তব্যানুযায়ী তা নিম্নরূপ:

মূলধন পরিমাণ অপর্যাপ্ত। কিন্তু, সম্পদ পরিমাণ পর্যাপ্ত। ফলে লাভের হার অধিক হবে। মূলধন সংগঠন হার বেশ ঊর্ধ্বে।

১০. পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৮৭।

১১. দেখুন P. Sraffa সম্পাদিত "The works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge University Press, Cambridge, 1951, I পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮৯-২৯০।

কাজেই, মুনাফার হারও যথেষ্ট হবে। মূলধন-গঠন দ্রুত বেড়ে চলেছে। কাজেই মুনাফার হার কমতে শুরু করবে। মজুরীর হার উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধন গঠন প্রবল থাকে। এদিকে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মূলধনী সম্পদও। অর্থনীতি "প্রাচুর্য সীমার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তার সম্পদ পরিমাণের মাত্রানুযারী পরিপূর্ণতা-পর্ব এগিয়ে আসে। আশপাশের অন্যান্য দশটা দেশের সাথে তাল রেখে তা এগুতে সক্ষম হয়।"[১২] এই পর্যায়ে এসে মূলধন সংগঠন শিথিল হয়ে উঠে। পরিণামে মজুরী পড়ে যায়। অর্থনীতি একটা স্থবির পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। মূলধন গঠন বন্ধ হয়ে যায়। উন্নয়ন কার্যক্রম শিথিল হয়ে উঠে।

স্মিথ বলেন, স্থবির পর্যায়ে খাজনার পরিমাণ অধিক হয় পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায়। কিন্তু খাজনা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা একেবারে অস্পষ্ট। তার বক্তব্য দেখে মনে হয় যেন ভূমিতে একচ্ছত্র পরিস্থিতি বিরাজ হেতু খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু কেন খাজনা বেড়ে যায়? সমাজ এগিয়ে গেলে কেন তা এমন হয়? এর উত্তর স্মিথে নেই। তিনি যেন ধরে নিয়েছেন তা এমন হবেই। দেশ সম্পদশালী হলে ভূম্যাধিকারীও লাভ-বান হবে স্বাভাবিক কারণে—তাঁর বক্তব্য।

অর্থনীতি স্থবির পর্যায়ের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়। স্মিথ বলেন, তখন শিল্পের হিসাবে উন্নয়ন-পরিবেশ দাঁড়ায়--প্রথমে কৃষি, অতঃপর শিল্প ও সর্বশেষে বাণিজ্য। তাঁর মতে তা 'স্বাভাবিক পরিণতি' (**according to natural course of things**)।[১৩]

সুতরাং, বলা যায় আদম স্মিথের আলোচনা সুষ্ঠু নয়। উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর মতামত তেমন বিজ্ঞান-ভিত্তিক বা যুক্তিতর্কমাফিক নয়। তাঁর বুনট্ তেমন শক্ত নয়। স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতার স্বাক্ষর বিরাজ-মান। কিন্তু সে যাই হউক, উন্নয়ন-প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্যাবলী তা পরবর্তী লেখকদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। মূলধন-সংগঠন নিয়ে তাঁর আলোচনা পরবর্তীকালের উন্নয়ন-তত্ত্বের বিশ্লেষণে ও উদঘাটনে যুগান্তকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর স্থবির-পর্বের বিশ্লেষণ সমগ্র ধ্রুপদী বিশ্লেষণে অনুরণিত হতে দেখা গিয়াছে। স্থবির-পর্বে মুনাফা কমে যায়। মজুরী জীবন ধারণের ন্যূনতম

১২. স্মিথের উপরোক্ত বই. পৃ: ৯৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬০

পর্যায়ে নেমে আসে এবং খাজনা অধিক হয় তাঁর এই যে অভিমত তা পরবর্তীকালের চিন্তাধারায় অনুপ্রবিষ্ট হতে দেখা যায়। তেমনি তাঁর মন্তব্য উন্নয়ন অগ্রগতি কালে তৈরী দ্রব্যের প্রকৃত দাম পড়ে যায় অথচ কতকগুলো কৃষিপণ্যের প্রকৃত দাম বেড়ে যায়—পরবর্তী ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা বহুকাল নাগাদ প্রভাবিত করেছে। অবাধ-নীতির পক্ষে তাঁর যে বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক তা বহুকাল পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর খ্যাতির বাক্সে আরও যোগ করতে হয় উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ চিন্তাধারা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা ক্রমানুয়িক ও স্বয়ংক্রিয় (সীমাহীন নয় কিন্তু) প্রক্রিয়া—তাঁর এই যে অভিমত তা পরবর্তীকালের ক্লাসিক্যাল ও নব্য-ক্লাসিক্যাল বহু ধন-বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন।

২. রিকার্ডীয় রূপরেখা (Ricardo's framework)

এককালীন দালাল, সখের কৃষক ও গণপরিষদ সদস্য ডেভিড রিকার্ডো একটি বিখ্যাত নাম। ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে উঁচু স্তরের নমস্য ব্যক্তি তিনি। ধ্রুপদী তত্ত্ববাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারক সুস্পষ্ট প্রবক্তা। তাঁর বিশ্লেষণে ধ্রুপদী তত্ত্ব একদিকে যেমন সুস্পষ্ট আকার পায় তেমনি যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠতায় বলীয়ান হয়ে উঠে। অথচ তিনি অধিকাংশ মালমশলা পেয়েছিলেন আদমস্মিথ থেকে। আদমস্মিথের নড়বড়ে আলোচনার সূত্র ধরে, তাঁর অসংলগ্ন ও অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা সম্বল করে রিকার্ডো গড়ে তোলেন সেকালের সবচেয়ে সুষ্ঠু, স্পষ্ট, উদ্ভাসিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্লেষণী রূপরেখা। নিম্নে তা আলোচিত হল। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আলোচনার বুনট্ রিকার্ডোতেও তেমন শক্ত নয়। তাঁর বিশ্লেষণেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। যত্রতত্র ছড়িয়েছিটিয়ে, এলোমেলো ও অগোছালোভাবে মূল বক্তব্যাবলী তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "The Principles of Political Economy and Taxation" (১৮১৭)-এ বেশ কিছু ভাবধারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে অন্যান্য অর্থশাস্ত্রবিদকে লেখা পত্র-পত্রিকায়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে তাঁর মূল ভাবগুলো সংযতভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা গিয়েছে। বিস্তৃত বক্তব্যে ঢুকার আগে রিকার্ডীয় কতকগুলো ধ্যান-ধারণা এবং তাঁর রূপরেখার মূল আন্তঃসম্পর্কগুলো পরীক্ষা করে নেয়া যাক।

রিকার্ডোর মতে কৃষি সর্বেসর্বা। অর্থনীতিতে তার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে ভাত তোলে দেওয়া বড্ড কঠিন কাজ। তাই কৃষিকে নিয়ে রিকার্ডোর এত মাথাব্যথা। 'কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব'—কথাটা রিকার্ডোর কাছে তেমন পাত্তা পায়নি। পরবর্তী ক্লাসিক্যাল-ধনবিজ্ঞানীতেও এই ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল। আধুনিকীকরণে কৃষি-ফলন বাড়তে পারে—এটা যেন তাঁরা তেমন মানতে পারেন নি। কাজেই, ভাত-কাপড়ের সমস্যাটিকে সহজ করে দেখার মত মনোবৃত্তি তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

রিকার্ডোর চিন্তায় অর্থনৈতিক জগত এইরূপ: অর্থনৈতিক জগতরূপ মঞ্চে তিন জাতীয় মঞ্চাভিনেতা বিরাজমান। তাঁরা হল পুঁজিপতি, শ্রমিক ও জমিদার। তন্মধ্যে পুঁজিপতি হল মহাজন ব্যক্তি। কলকাঠি তার হাতে। উৎপাদন ঘটে তার নির্দেশে। ক্রিয়াকর্ম চলে তার অঙ্গুলী হেলনে। জমিদার জমি বর্গা দেয়, শ্রমিককে লাঙ্গল-জোয়াল, যন্ত্রপাতি (বদ্ধমূলধন) প্রদান করে। ভাত-কাপড় (চলতি-মূলধন) যোগায়, উৎপাদন কালে। দুইটি জরুরী কর্তব্য সম্পন্ন করে সে। প্রথমতঃ, পুঁজি নিয়ে অধিক উৎপাদনধর্মী ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বেড়ায়। মূলধন খাটায় সেইসব ক্ষেত্রে। ফলে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাভেদে অর্থ-নীতির সর্বক্ষেত্রে মুনাফায় একটা সামঞ্জস্য সাধনে সহায়তা করে। তাতে সম্পদ বরাদ্দকরণ সুষম হওয়ার সুযোগ হয়। তার দ্বিতীয় কর্তব্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন-অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটায় সে। অর্জিত মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ করে। ফলে মূলধন-সংগঠন অধিক বলশালী হয়। আর মূলধনই হচ্ছে উন্নয়ন-অগ্রগতির চাবিকাঠি। অর্থনীতির সর্বত্র দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। ফলে জাতীয় আয়ে বর্ধনপ্রাপ্তি ঘটে।

শ্রমিক সংখ্যায় গরিষ্ঠ। পুঁজিপতির উপর সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উৎপাদন-উপকরণ তার কিছু নেই। তার ভরণপোষণের জন্য পুঁজিপতি তাকে যা দেয় তাই তার বার্ষিক মজুরী। অর্থ্যাৎ মজুরী তহবিলকে (**wage fund**) শ্রমিকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই শ্রমিকের বার্ষিক মজুরীর হার। (এই হিসাবে মজুরী বৎসরে একবার দেয় এবং শ্রম-দক্ষতা একটা নির্দিষ্ট মানে বলে ধরে নেওয়া হয়।)

শ্রমিক-সংখ্যা উঠা-নামা করে, তার মজুরীর ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী। অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে প্রাপ্য মজুরীর যে

ক্ষমতা সেই মাত্রাভেদে শ্রমিক-সংখ্যা বাড়ে-কমে। অবশ্য প্রকৃত মজুরীর একটা মান বিদ্যমান রয়েছে। সনাতনী আচার-প্রথায় তা নির্ধারিত হয়। সেই মাত্রায় শ্রমিকদল কায়ক্লেশে টিকে থাকে। মজুরী তার অধিক হলে অচিরে বাড়তি অংশটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়। শ্রমিক-সংখ্যা তড়িৎ গতিতে বেড়ে যায়। ফলে, বাড়তি মজুরী পাওয়া যায় না। বিপরীতদিকে, মজুরী পরিমাণ কমে গেলে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তা পূর্ব পর্যায়ে নিয়ে আসে। অর্থ্যাৎ রিকার্ডোর মতে মজুরীর হার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে এবং এই 'স্বাভাবিক' মজুরীর হার দেশে দেশে, কালে কালে ভিন্নতর হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার তাঁর আলোচনায় এই বৈসাদৃশ্যের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে অনুধাবন করা যায় যে তৎকালীন বৃটেনে বিবাজমান 'স্বাভাবিক' মজুরীহার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা মিটাতে সক্ষম ছিল। মোটামুটি 'আরাম-আযেশে'[১৪] দিন কাটাবাব মত ছিল। শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির এই মনোভাবের জন্য তিনি ম্যালথাসের কাছে ঋণী। ম্যালথাস তাঁর "Essay on the Principle of Population" (১৭৯৮) প্রবন্ধে এই যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন।

রিকার্ডো বলেন, উর্বরা জমি ক্রমে ক্রমে কমে আসে। সমাজ এগিয়ে চলেছে। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মূলধন-সংগঠন হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে ভাল জমির পরিমাণ কমতে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতে চাষাবাদ হবে। কাজেই সমপরিমাণ পুঁজি ও শ্রম খাটিয়ে পূর্ব-পরিমাণ ফলন পাওয়া যাবে না। কারণ ভূমির উপর ক্রমহ্রাসমান বিধি (Law of Diminishing Returns) ক্রিয়া করতে শুরু করবে। এদিক জনসংখ্যা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

পুঁজিপতিদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ও প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। সবার চাইতে উৎকৃষ্ট ভূমি। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভূম্যাধিকারীকে ফলনের একভাগ দিতে হবে। আর তাই হচ্ছে 'খাজনা' অর্থাৎ কিনা "মাটির আদিম ও অক্ষয় ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন শস্যের যে অংশটুকু ভূস্বামীকে প্রদান করা হয় তাই হচ্ছে খাজনা"[১৫] সব জমির উৎপাদিকা-শক্তি সমান নয়। কোন জমির উৎপাদিকা-শক্তি বেশী, আবার

১৪. Sraffa সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই, ১,পৃ: ৯৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭।

কোনটির কম। উর্বরতার এই ভেদাভেদের জন্য খাজনা দিতে হয়। ফলে বিষম উৎপাদিকা-শক্তিসম্পন্ন ভূমির ফলন মোটামোটি একইরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি রিকার্ডোর এই মত। ক্লাসি-ক্যাল আরও বহু ধন-বিজ্ঞানীর মতও মোটামুটি এইরূপ। তাঁরা জাতীয় আয়কে তিনভাগে ভাগ করেন। যথা মজুরী, খাজনা ও মুনাফা। অতঃপর এই তিনভাগের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পুঁজিপতি, শ্রমিক ও ভূমি-মালিকের যে পাওনা তাব আপেক্ষিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। একক (absolute) পরিস্থিতি নয়। রিকার্ডো এই মতের সারবত্তা প্রমাণে ম্যালথাস্‌কে এক পত্রে লিখেন "পরিমাণ বেধে দেওযার জো নেই। মোটামুটি একটা আনুপাতিক হিসাব প্রদান করা যেতে পারে। এ নিয়ে যত ভাবছি ততই আমি স্থিরনিশ্চিত হচ্ছি যে পূর্ববর্তী পন্থা সঠিক নয়, তা ভ্রমাত্মক। পববর্তী পন্থা সঠিক ও লক্ষ্যে পোঁছার অব্যর্থ উপায়।"[১৬] অর্থাৎ রিকার্ডো বলছেন, আপেক্ষিক আয় পরিমাণ পর্যালোচনা করে জাতীয় আয বা উৎপাদনের বর্ধন হার নির্ণীত করা যেতে পারে। অন্যভাবে নয়।

সুতরাং, রিকার্ডোর আলোচনা সমষ্টিগত আলোচনা নয়। তিনি আনুপাতিক হার নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন এবং তাও শব্দত্রয়ের নির্দিষ্ট অথের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যাপক আলোচনা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি সাকুল্য মজুরী, মুনাফা কি খাজনার ব্যবহারবিধি প্রণযন করেননি। অথবা জাতীয় আয় বা উৎপন্নের সাথে মিলিয়ে দেখেননি। তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন শ্রম ও পুঁজি উৎসারিত খাজনা, মজুরী ও মুনাফার ব্যবহার পন্থা উদ্‌ঘাটনে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় রিকার্ডোর ধ্যান-ধারণা উপলব্ধির অপর একটা উপায় হিসাবে তার আলোচিত মোট ও নীট আয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আলোচনাটি বেশ লাভজনক হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। রিকার্ডোর মতে 'মোট আয়' (gross revenue)। মানে নির্দিষ্ট সময়সীমায় তৈবীকৃত পণ্যাদির বাজার-মূল্য (market-value)। এই বাজার-মূল্য ও উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম-শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যে (হয়ত বা স্থায়ী মূলধনী

১৬. প্রাগুক্ত, viii, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

সাজসরঞ্জাম বজায় রাখার প্রয়োজনীয় খরচ সহ) যে বিভেদ তাই হচ্ছে সমাজের "নীট আয়" (net revenue)। কথাটা সাদামাঠা বটে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। এই দুয়ের পার্থক্য থেকে যা পাওয়া যায় তাই হল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (economic surplus) আর এই উদ্বৃত্তের ক্রিয়াকর্ম দিয়েই কেবল উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এই উদ্বৃত্ত বৈ উন্নতি সম্ভব নয়। ক্লাসিক্যাল মতবাদী বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য সম্পদ সহযোগে শ্রমিক এই উদ্বৃত্তের জন্য দেয় বলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। মুনাফা, খাজনা ও মজুরী বাদ দিয়ে যা থাকে তাই সমাজ বা অর্থনীতির জন্য উদ্বৃত্ত। আব এই উদ্বৃত্ত থেকেই মূলধন সঞ্চিত হয়। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং এই কারণে পুঁজিপতির এত গুরুত্ব। কেননা, সে ছাড়া অন্য কেউ সঞ্চয় করে না, শ্রমিক ও ভূম্যাধিকারী সঞ্চয় করে না বা করতে পারে না। সঞ্চয় দিয়ে, মজুবী তহবিল বাড়িয়ে পুঁজিপতি গড়ানো বলকে (rolling ball) আরও গড়িয়ে দেয়। করে তোলে বেগবান। যাব অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জাতীয় উৎপাদনে বর্ধন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, বিকার্ডো যুক্তি দেন, প্রকৃতিব কার্পণ্যহেতু অর্থনীতিতে এমন ওলট-পালট ঘটতে থাকে যে বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ে তারতম্য ঘটে নীট আয় গ্রাস করে নেয়। ফলে মুনাফা, যাব থেকে কিনা সঞ্চয় উৎসারিত হয়, নিঃশেষিত হয়ে যায়। পরিণামে, বর্ধন রহিত হয়।

এবারে রিকার্ডীয় ধ্যানধারণার গোড়ার কথায় দৃষ্টি দেয়া যাক। তাঁর আয বন্টন নীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। তাঁর মতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই আয় বন্টন নীতিমালা। এই সুদীর্ঘ আলোচনায ব্যাপৃত হওয়ার আগে অবশ্য তাঁর আরও কিছু উপকল্প ও বিশ্লেষণ-উপকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

৩. রিকার্ডীয় উপকল্প ও বিশ্লেষণ উপকরণ (Ricardian Assumptions and Analytical Tools)

গোড়াতে রিকার্ডো এক বেকায়দায় পড়েন। তাই তিনি জেমস্ মিলকে লেখেন "ভাই, বুঝতে পারছি শীঘ্রই আমাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। দর (price) কথাটা নিয়ে। তখন তোমার দ্বারে উপস্থিত হওয়া

ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উপদেশ ও সাহায্যের জন্য।"[১৭] তিনি অনুভব করতে সক্ষম হন যে বিভিন্ন পণ্যে একটা বিনিময় সম্পর্ক ছাড়া পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি স্মিথের শ্রমমূল্য তত্ত্ব (Labour theory of value) গ্রহণ করেন।[১৮] সাদামাঠা কথায় তত্ত্বটির মানে হচ্ছে: দ্রব্য উৎপাদন প্রয়োজনীয় শ্রমের তুলনাত্মক সংখ্যা অনুযায়ী পণ্য বিনিময় হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য বিনিময় অনুপাত শ্রমসংখ্যার পরিমাণে নির্ণীত হয়। বিশেষ করে, সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান বাজারে। আবশ্য এই তত্ত্ব নিয়ে রিকার্ডো তেমন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তত্ত্বটি যে সুষ্ঠু নয়। নানারূপ ভুল-ত্রুটিতে পূর্ণ। প্রথমত: শ্রমে শ্রমে তুলনা করা অসুবিধাজনক। দক্ষতা, নৈপুণ্য ও শিক্ষাদীক্ষায় বিভেদ বিদ্যমান বলে। দ্বিতীয়ত: একেক রকম উৎপাদনে একেক রকম ধরন-ধারণ বিরাজমান। কোথায়ও স্থায়ী মূলধন বেশী ব্যবহৃত হয়, কোথায়ও আবার চলতি মূলধন বেশী প্রয়োজন। এক ক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধন অনেক দিনে টেকে। অন্যত্র তেমন নয়। এদিকে আবার ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন প্রয়োজন হয়। তাদের অনুপাতে সমঝোতা সাধন সহজ নয়। ফলে তুলনা ভ্রমাত্মক হতে পারে। রিকার্ডো এইসব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাইত তিনি বলেন "তত্ত্বটি তেমন সুষ্ঠু নয়।"[১৯] কিন্তু তবু সব কিছু মিলেয়ে বিদ্যমান তত্ত্বাবলীর মধ্যে এটাকেই অধিক সঠিক বলে মনে হয়। আপোষিক মূল্য যাচাইর জন্য। তাইত আমি বলি তা পূর্ণাঙ্গভাবে সুষ্ঠু না হলেও কাজ চলার মত।" তাঁর এই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি তাঁর আলোচনায় এই তত্ত্বটিকে কাজে খাটিয়েছেন এবং কেবল একমাত্র প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে

---

১৭. প্রাগুক্ত, vi, পৃ: ৩৪৮।

১৮. একটু উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে হয়ত রিকার্ডোর মূল্য নির্ধারণ তত্ত্বকে উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব (Cost of production theory) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। দেখুন George J.Stigler-এর "The Ricardian theeory of value and Distribution". Journal of Political Economy, Lx, no 3, 201 (June, 1952), Sraffa সম্পাদিত প্রাগুক্ত বই I, xxx. VII-XI.

১৯. Sraffa সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই, viii, পৃঃ-২৭৯।

ভুগেছেন। অন্য সর্বত্র নির্দ্বিধায় মূল্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তা ব্যবহার করে গিয়েছেন। মনে হয় যেন উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে তা সর্বতো-ভাবে সন্তোষজনক।

সে যাই হউক, দোষত্রুটি মেনে নিয়ে রিকার্ডো তাঁর যুক্তিতর্কে অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময় সম্পর্ক গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হন। তিনি অবশ্য স্বর্ণকে সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে মেনে নেন। কিন্তু, দীর্ঘ সূত্রী দরমাত্রা বিশ্লেষণে দ্রব্যাদির উৎপাদন পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের উপর জোর আরোপ করেন। মনে করুন, সময়ের ব্যবধানে মুদ্রা-পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্তু উৎপাদন পরিমাণ পূর্ববৎ থাকে। তাতে টাকার হিসাবে দ্রব্যের দাম বেড়ে যেতে বাধ্য।[২০] কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন পরিস্থিতি পূর্ববৎ থাকে। অর্থাৎ শ্রম সংখ্যা আগের মতই থাকে। পণ্যের দাম টাকার হিসাবে দিতে হবে অথচ তজ্জনিত দর-পরিবর্তন এড়িয়ে যেতে হবে—এই সমস্যার মোকাবিলায় রিকার্ডো মত প্রদান করেন যে, অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে, প্রতি ইউনিট উৎপাদনে সমপরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হচ্ছে; সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, টাকার হিসাবে পণ্য-মূল্য ধ্রুব (constant) থাকছে। অন্যদিকে শ্রম পরিমাণ অধিক বা কম প্রয়োজন হলে মনে করতে হবে যে, প্রতি ইউনিট পণ্যের মুদ্রা-মূল্য সম-অনুপাতে বেড়ে-কমে চলেছে। মুদ্রা সরবরাহ দ্রব্যপ্রবাহের সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে বলে মেনে নিতে হবে। তাহলে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ হবে।

রিকার্ডিয়ান তত্ত্বে অপর উপকল্প হচ্ছে এই যে উপাদান প্রতিস্থাপন (factor substitution) করা যাবে না, প্রত্যেকটি উৎপাদনে স্থিরীকৃত উৎপাদান ব্যবহৃত হবে। দেয় উৎপাদন আঙ্গিকে স্থায়ী মূলধনে শ্রমের একটি মাত্র অনুপাত বিরাজমান বলে মেনে নিতে হবে। মজুরী হার বেড়ে গেল বলে পুঁজিপতি শ্রম-সংখ্যা কমিয়ে অধিক পুঁজি খাটাতে পারবে না। একটিমাত্র উৎপাদন-বিচিত্রা (production function) বিদ্যমান বলে ধরে নিতে হবে। শ্রম ও পুঁজির সঠিক অনুপাত নির্ধারিত হয়ে গেলে মেনে নিতে হবে যে, এই অনুপাত যেই পরিমাণে বাড়ানো হবে উৎপাদনও সেই পরিমাণে সম্প্রসারিত হবে। অর্থ্যাৎ কোন দ্রব্য উৎপাদনে উপকরণ দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ করা হলে তার উৎপাদন ও দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ বেড়ে যেতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আকার নিয়ে

২০. অবশ্য ধরে নিতে হবে যে অতিরিক্ত টাকা বাক্সবন্দী করে রাখা হবে না।

রিকার্ডো কোন উচ্চবাচ্য করেননি অথবা কোন নিয়ামকও প্রদান করেননি। সুতরাং, ফার্মের আকার-প্রকৃতি দেয় বলে মেনে নিতে হবে অথবা অ-অর্থনৈতিক (non-economic) বিষয়াবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ভেবে নিতে হবে।

কৃষির বেলায়ও একই কথা। প্রতিটি কৃষি-পণ্য উৎপাদনে শ্রম ও পুঁজির কেবলমাত্র একটা অনুপাত ব্যবহার করা যাবে। শিল্পক্ষেত্রে ধ্রুব ফলন (constant return)-এর কথা বলা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্নরূপ। এক্ষেত্রে ফলন ধ্রুব নয়। বরং তা ক্রমহ্রাসমানবিধির আয়ত্তে। কেননা, ভূমি সীমিত, অথচ কৃষির প্রধান উপকরণ ভূমি। শিল্পের বেলায় তেমন নয়। কাজেই, রিকার্ডোর মতে শ্রম ও পুঁজির পরিমাণ দ্বিগুণ করা যেতে পারে। কিন্তু জমির পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়াবার সুযোগ নেই। সম উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন ভূমিত নয়ই। হয়ত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ভূমির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। অথবা ইতিমধ্যে ব্যবহৃত ভূমির নিবিড় (intensive) চাষ করা যেতে পারে। এতে করে হয়ত ফলন কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু আনুপাতিক হারে বাড়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, ক্রমহ্রাসমান বিধি কৃষিক্ষেত্রে ক্রিয়া করতে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় যেমন কৃষি-খামারের প্রশ্নেও রিকার্ডো নীরব। কাজেই, তার আকার-আঙ্গিক ধরে নিতে হবে।

সর্বশেষ কথা। রিকার্ডিয়ান রূপরেখায় জিনিসপত্তরের ছড়াছড়ি বলে কিছু নেই।[২১] দ্রব্যাদির সাধারণ পর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাপ্য আয় জিনিসপত্তর কেনাকাটায় ব্যয় হয়ে যায়। রিকার্ডোর মতে শ্রমিক ও ভূ-স্বামী তাদের আযের সবটা ভোগদ্রব্যে খরচ করে ফেলে। কেবলমাত্র পুঁজিপতি কিছুটা সঞ্চয় করে। সে আবার সেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করে ফেলে। সাম্প্রতিক পরিভাষায় যাকে বলা চলে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগে নিয়োজিত হয়। কাজেই, কার্যকরী চাহিদায় কোন কালেই অপ্রাচুর্যতা দেখা যায় না।

৪. ভূ-স্বামীর পাওনা ও কৃষিপণ্যের দাম

রিকার্ডো দাম সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন। এবারে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন খাজনা, মজুরী ও মুনাফার প্রতি। উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম চলাকালে

২১. ম্যালথাস রিকার্ডোর এই বক্তব্যের সাথে একমত হননি। Sraffa-এর বই দেখুন IX, পৃষ্ঠা ৯-১১। রিকার্ডো ম্যালথাসের পত্রাবলীও আলোচনা করতে পারেন।

এদের চাল-চরিত্র কেমন হয় তা উদঘাটনে প্রয়াসী হলেন। ভূ-স্বামীকে খাজনা দেয়ার ফলে পুঁজিপতিদের পাওনা মুনাফা হারে সমতা আসে। জমির উদপাদিকা-শক্তিতে তারতম্য বিরাজহেতু ভূ-স্বামী খাজনা পায়। সমপরিমাণ শ্রম ও পুঁজি ভিন্নতর জমিতে খাটাতে হয় বলে পুঁজিপতি খাজনা দেয়। উদাহরণ দেয়া যাক: প্রথম শ্রেণীর জমিতে প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি ১০০ মণ ধান উৎপন্ন করে একই শ্রম দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ৯০ মণ ধান জন্মাতে পারে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর জমিতে চাষের ব্যয় এক হয়। ফসলের বাজার দরও এক। সুতরাং উৎকৃষ্ট জমিতে ১০ মণ ধান বা তার মূল্যের সমান অধিক পাওয়া যায়। কাজেই, উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারী পুঁজিপতিকে ১০ মণ ধান খাজনা হিসাবে দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বিরাজমান বলে তা দিতে হয়। কেননা, এই পরিমাণ খাজনা দেওয়া না হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ব্যবহারকারীরা প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীকে হারিয়ে দিয়ে অধিক উর্বরা জমি দখল করে নেবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করে খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা মেটানো যায় বলে এই জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয় না। কারণ, এই শ্রেণীর জমি অপর্যাপ্ত আর অপর্যাপ্ত জিনিসের জন্য কেউ দাম দেয়না। সুতরাং এই জমি উন্মুক্ত। প্রথম শ্রেণীর ভূস্বামী ১০ মণ অপেক্ষা অধিক দাবী করলে পুঁজিপতি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করতে চলে যাবে। সুতরাং, উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার পরিমাণ ১০ মণ ধান। নিকৃষ্ট জমিতে কোন খাজনা নেই। ফলে উভয়বিধ জমি থেকে গড়ে ৯০ মণ ধান পাওয়া যায়।

লোকসংখ্যা বাড়ছে। পুঁজি-গঠন চলেছে। খাওয়ার মুখ বেড়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিচাষ করে আর কুলোনো যাচ্ছে না। খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে। কাজেই তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষাবাদে আনতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা কম ধান হয়। কিন্তু চাষের ব্যয় এক। সুতরাং, তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষাবাদের সাথে সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনা দেখা দেবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা আরও বেড়ে যাবে। ধরা যাক তৃতীয় শ্রেণীতে ফলন হয় ৮০ মণ ধান। কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর খাজনা হবে ১০ মণ ধান এবং প্রথম শ্রেণীর খাজনা বেড়ে যেয়ে দাঁড়াবে ২০ মণ ধানে।

এদিকে নিবিড় চাষাবাদ হতে শুরু করে। লোকসংখ্যা আরও বেড়ে যায়। পুঁজিতেও সম্প্রসারণ ঘটে। পুঁজিপতি অধিক হারে শ্রম ও পুঁজি খাটাতে শুরু করে। উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক চাষাবাদের ফলে সেই জমির উৎপাদন-ক্ষমতা কমে যায়। ক্রমহ্রাসমানবিধি সচল হয়ে উঠে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় ইউনিট শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে ৯০ মণ ধান পাওয়া যায় আর তৃতীয় ইউনিট কাজে লাগিয়ে মাত্র ৮০ মণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে দ্বিতীর শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় ইউনিট খাটিয়ে ফসল পাওয়া যায় ৮০ মণ। তাহলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনা হবে (১০০-৮০)+(৯০-৮০) অর্থাৎ ৩০ মণ ধান আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে হবে (৯০-৮০) অর্থাৎ কিনা ১০ মণ ধান। নিকৃষ্টতর জমিতে খাজনা নেই। কেননা, তা হচ্ছে প্রান্তিক-ভূমি যার সরবরাহ চাহিদা অপেক্ষা অধিক।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বর্ধন হেতু খাজনায় নিরঙ্কুশ বর্ধন ঘটায়। খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। অনুপাতও বেড়ে যায়। অবশ্য শ্রম ও পুঁজি ব্যবহারের হিসাব অনুসারে। সাকুল্য উৎপাদনের তুলনায় পণ্য-খাজনা (Commodity rent) বাড়তেও পারে আবার হ্রাসও পেতে পারে। তা নির্ভর করে ক্রমহ্রাস বিধির কার্যকলাপের উপর।[২২]

---

২২. প্রাগুক্ত, II, পৃ: ১৯৩। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক। প্রথম শ্রেণীর জমিতে প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজির ফলন ১০০ মণ ধান ধলে ধরা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ব্যাহত হলে খাজনা দাঁড়ায় প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজিতে ১০ মণ ধান, অর্থাৎ মোট ফসলেব ১০ শতাংশ। তৃতীয় শ্রেণীসহ ব্যবহৃত হলে খাজনা হয় ২০ মণ অর্থাৎ কিনা মোট ফলনের শতকরা ২০ ভাগ। কাজেই, খাজনার হার প্রথম ইউনিট শ্রম ও পুঁজির অনুপাতে বেড়ে যায়। এবারে হিসাবে নেয়া যাক উভয় শ্রেণীব জমিতে ব্যবহৃত শ্রম ও পুঁজির ইউনিটগুলো (মোট দুই ইউনিট) এবং তাদের সর্বমোট ফলন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ব্যবহারকালে মোট খাজনা হয় ১০ মণ ধান আর মোট উৎপাদন দাঁড়ায় (১০০+৯০) ১৯০ মণ ধান। সুতরাং খাজনা হয় মোট ফলনের ১০/১৯০ অর্থাৎ ৫.৩ শতাংশ। তৃতীয় শ্রেণীর জমিসহ ব্যবহৃত হলে মোট তিন ইউনিট (এক ইউনিট করে) শ্রম ও পুঁজি কাজে খাটানো হয়। খাজনা দাঁড়ায় (২০+১০) ৩০ মণ ধান আর মোট ফসল হয় (১০০+৯০+৮০) ২৭০ মণ ধান। অর্থাৎ খাজনা হয় ৩০/২৭০ অথবা মোট ফলনের ১১.১ শতাংশ। হিসাব একটু ঘুরিয়ে নিলে হয়ত দেখা যাবে যে মোট ফলনের তুলনায় খাজনার হার-হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে মনে করুন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে যথাক্রমে ১০০ মণ ও ৯০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। কিন্তু, তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে ফসল পাওয়া যায় ৮৯ মণ ধান। অর্থাৎ সমপরিমাণ উপাদান ইউনিট খাটিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে এবারে ফসল একটু বেশী (উপরোক্ত উদাহরণে ৮০ মণ ছিল ; বর্তমান উদাহরণে তা ৮৯ মণ) পাওয়া যায়। এক্ষণে খাজনা হবে ১১+১ অর্থাৎ ১২ মণ। মোট ফসল হয় (১০০+৯০+৮৯) অর্থাৎ ২৭৯ মণ। তার মানে মোট খাজনা দাঁড়ায় মোট ফলনের ৪.৩ শতাংশ মাত্র। অবশ্য প্রথম ইউনিট শ্রম ও পুঁজিতে এবারেও খাজনার হার বেড়ে যায়। ১০ শতাংশ থেকে তা ১১ শতাংশ হয়।

রিকার্ডোর মতে শিল্পকাজে কোন খাজনা নেই। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, প্রতি ইউনিট উপাদান বাড়িয়ে শিল্পক্ষেত্রে সমপরিমাণ ফলন পাওয়া যায়। কাজেই, বিভেদক উদ্বৃত্ত (differential surplus) কিছু নেই। সুতরাং, খাজনার অস্তিত্বও নেই। সমাজ এগিয়ে যায়। দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। রিকার্ডো যুক্তি দেন যে তৈরীকৃত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিপণ্যে দাম বেড়ে যায়। কারণ, কৃষি-পণ্য উৎপাদনে তখন অধিক ব্যয় পড়ে। অর্থ্যাৎ ক্রমহ্রাসমান বিধি সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু, শিল্পজাত দ্রব্যের বেলায় নয়। অধিক উৎপাদনে সমপরিমাণ ব্যয়ই পড়ে, অধিক লাগে না।

উদাহরণ দিয়ে বলা যাক, মনে করুন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট (উৎপাদন বিবেচনায়) শ্রম-পুঁজি ইউনিট প্রতি একর জমিতে ৫০ মণ ধান ফলাতে সক্ষম। দীর্ঘকালীন বিবেচনায় এই ফলনের দাম শ্রমের মজুরী ও পুঁজির মুনাফা মিটাতে সক্ষম হতে হবে। তা না হলে এরা অন্যত্র সরে যাবে। মনে করুন, প্রতি মণ ধানের দাম ২ টাকা। সুতরাং মোট ফলন ৫০ মণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০ টাকা। এবারে চিন্তা করুন সেই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে ১০ জোড়া জুতা তৈরী করা যেতে পারে। প্রতি জোড়া জুতার দাম ১০ টাকা করে। সুতরাং, ১০ জোড়া জুতার দামও ১০০ টাকা। ফলে ধান ও জুতার বিনিময় হবে ৫০/১০ অর্থাৎ ৫ মণ ধানের বদলে এক জোড়া জুতার হারে।

লোকসংখ্যা বাড়ছে। পুঁজি-গঠনও হচ্ছে। কাজেই, অধিক ধান উৎপন্ন করা প্রয়োজন। জুতাও বেশী দরকার। এক্ষণে প্রতি ইউনিট শ্রম-পুঁজি ৪০ মণ উৎপন্ন করতে পারে। জুতা কিন্তু তৈরী করতে পারে ১০ জোড়াই। ফলে বিনিময় হার দাঁড়াবে ৪০/১০ অর্থাৎ কিনা প্রতি ৪ মণের বদলে এক জোড়া জুতা। রিকার্ডো এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে জুতার দাম ধ্রুব থাকবে, কিন্তু ধানের দাম বেড়ে যাবে। এক্ষণে জুতা বিকোবে পূর্ব দামে অর্থাৎ প্রতি জোড়া ১০ টাকা করে। কিন্তু ধানের মণ বিকোবে ২·৫০ পয়সা করে। কারণ ধান উৎপাদনে এক্ষণে অধিক শ্রম-পুঁজি (১¼ ইউনিট বর্তমান দৃষ্টান্তে) প্রয়োজন পড়ে।

কৃষিকাজে প্রথম ইউনিট শ্রম-পুঁজিতে খাজনা নেই। একথা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছে। কিন্তু, লোকসংখ্যা বেড়ে

যেয়ে পুঁজি অধিক হয়ে অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, ১০ মণ ধান অথবা তার মূল্য (১০×২.৫০) ২৫ টাকা খাজনা হিসাবে দিতে হয়। নিকৃষ্টতম শ্রম-পুঁজি ইউনিট থেকে প্রথমে ৫০ মণ ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তার দ্বিতীয় ইউনিট খাটিয়ে পাওয়া গেল ৪০ মণ। সুতরাং ১০ মণ ধানের যে পার্থক্য তা খাজনা হিসাবে আদায় করতে হবে। সুতরাং দাম বেড়ে যেয়ে ১০০ টাকার জায়গায় ১২৫ টাকা (৫০×২.৫০) হয়ে গেলেও সেই প্রান্তিক শ্রম-পুঁজি ইউনিট খাটিয়ে বেশীটুকু ভোগ করার জো নেই। এই বাড়তিটুকু খাজনা শেষে নেবে। অর্থাৎ খাজনার হার বেড়ে যেয়ে তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

রিকার্ডো মন্তব্য করেছেন-উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়ে খাজনার হার বাড়া রুখতে পারা যায়। তবে বেশী দিনের জন্য নয়। কিছুকাল হয়ত ধরে রাখা যেতে পারে। তিনি উর্বরতা বৃদ্ধির দুই জাতীয় কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমতঃ জমি-ব্যবহাব কমিয়ে অর্থাৎ চাষপ্রথার উন্নতি ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পজমি থেকে অধিক ফসল ফলিয়ে। এই উন্নতিটুকু পাওয়া যাবে কোনরকম উদ্ভাবন আবিষ্কারের আগে। দ্বিতীয় কারণটি চিহ্নিত করতে যেযে বলেছেন—কিছু কিছু উদ্ভাবন-আবিষ্কার শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়ে দেয় বটে,[২৩] কিন্তু জমির ব্যবহারে হ্রাস ঘটাতে পারে না। অর্থাৎ সমপবিমাণ ফসলের জন্য সমপরিমাণ জমি চাষ করতে হয়। প্রথম শ্রেণীর উন্নতি-অগ্রগতির ফলে মুদ্রা-

২৩. উদ্ভাবন আবিষ্কার (Inventions) বহু রকম হতে পারে। শ্রীমতি রবিনশনের মতে মোট পণ্য উৎপাদনে উপাদান কম-বেশী লাগলে উদ্ভাবন আবিষ্কার মনে করা যেতে পারে। তিনি শ্রম, পুঁজি এবং ভূমি-ব্যয়সঙ্কোচ বা ব্যবহারের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তার থেকে উপরোক্ত মন্তব্য উৎসাবিত হয়। দেখুন, Joan Rabinsion-এর The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan and Co, London, 1952, পৃঃ ৪২, ৫০। তাঁর ধারণা অনুযায়ী নিবপেক্ষ উদ্ভাবন মানে প্রতি ইউনিট উৎপাদনে শ্রম, পুঁজি ও ভূমি ব্যবহারের সমানুপাতিক হ্রাস ঘটানো। Harrod বলেন, নিরপেক্ষ উদ্ভাবন হচ্ছে তা যা মূলধন মূল্যের অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় না। একটা ধ্রুব সুদের হার বজায় থাকাকালে এবং নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে। উদ্ভাবন-আবিষ্কার হেতু মূলধন ব্যবহার তার সৃষ্ট আয় অপেক্ষা অধিক হারে সম্প্রসারিত হলে (অর্থাৎ কিনা মূলধন-সহগ বেড়ে গেলে) বুঝতে হবে যে তা শ্রম-রক্ষাকারী (labor-saving) উদ্ভাবনা আর যদি তদপেক্ষা ন্যূনহারে সম্প্রসারিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তা পুঁজি বাচানেওয়ালা (Capital-saving) আবিষ্কার। আলোচনা করুন R. F. Harrod-এর Towards a Dynamic Economics, Macmillan & Co., London, 1948, পৃঃ ২৬—২৭।

খাজনা (money rent) যেমন হ্রাস পায় তেমনি ফসল দিয়ে হিসাবকৃত খাজনা (comodity rent)ও হ্রাস পায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উন্নতিতে মুদ্রা-খাজনা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু, পণ্য-খাজনা হ্রাস নাও পেতে পারে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার রিকার্ডো এখানেই আলোচনা ক্ষান্ত করেছেন, কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি, জমি-ব্যয় সংক্ষেপ (Land-saving) নিয়ে তাঁর আলোচনা বিশেষ উপ-কল্পের উপর নির্ভরশীল।[২৪] অন্যদিকে, দ্বিতীয় কারণটি সুষ্ঠুভিত্তিক নয়। তাত্ত্বিক বিবেচনায় সম্ভব হলেও যে গাণিতিক দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেনি।[২৫] অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, উন্নয়ন-প্রক্রিয়া উদঘাটনে তাঁর বিশ্লেষণ যথেষ্ট অর্থবহ। উদ্ভাবন আবিষ্কারের যে অবশ্যম্ভাবী ফলাফল সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং পথিকৃত হিসাবে সম্মান পেয়েছেন। জে. এস. মিল তাঁর চিহ্নিত উভয়বিধ উন্নতির কারণ মেনে নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীকে ভূমি-ব্যয়-সঙ্কোচ প্রবণতাগুলো উন্নয়ন-অগ্রগতির যথেষ্ট সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করেছিল।[২৬]

রিকার্ডো বলেছেন, অবশ্য সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে কৃষির এই উন্নতি-অগ্রগতি বিপরীত গতিকে রুখতে সক্ষম নয়। জনসংখ্যা বর্ধন ও পুঁজি-গঠন হেতু এই বিপরীত শক্তি সৃষ্টি হয়। সুতরাং তিনি বলেন, দীর্ঘকালীন পরিবেশে খাজনা ও কৃষি পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যেতে বাধ্য।

৫. খাজনা, মজুরী ও মুনাফার প্রকৃতি: স্থবির পর্যায়

রিকার্ডোর আলোচনা আপেক্ষিকধর্মী। তিনি এককভাবে কোন কিছুর বিশ্লেষণ দেননি। তুলনামূলকভাবে জাতীয় আয়ের বিভিন্ন অঙ্গের

---

২৪ দেখুন, যথা—E. C. K. Gonner-এর আলোচনা তার সম্পাদিত Ricardo's Principles-এ দেখুন। বইটি George Bell and Sons, London কর্তৃক ১৯০০ সালে প্রকাশিত। পরিশিষ্ট খ। Alfred Marshall প্রণীত Principles of Economics, eighth edition, New York, 1948, Macmillan & Co., 1930, Appendix L.

২৫ E. Cannon-এর A History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848 third edition. P. S. King and Sons Ltd, London, 1924, পৃঃ ৩২৯।

২৬ J. S. Mill প্রণীত Principles of Political Economy, edited by W. J. Ashley, Long-mans, Green and Co., London, 1940 পৃঃ ১৮৩ দেখুন।

পর্যালোচনা করেছেন। চাতুর্যময় ও নিপুণ খাজনা-তত্ত্ব উদ্ভাসিত করে তিনি জাতীয় আয়ের অপর দুইটি বিষয় মজুরী ও মুনাফায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি যে ফলন দেয় তার আপেক্ষিক ভাগ-বন্টন দেখিয়েছেন। সুতরাং, তাঁর আলোচনায় মজুরী বেড়ে যাওয়া মানে মুনাফার তুলনায় মজুরী বেড়ে যাওয়া এবং মজুরীর তুলনায় মুনাফায় হ্রাস পাওয়া। তা এককভাবে নয়। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আয়ের যে বন্টন তা নির্ধারিত হয় মজুরীর ক্রিয়াকর্মের ফলে। লাভ "পুরোপুরিভাবে উচ্চ বা নিম্ন মজুরীর উপর নির্ভরশীল। অন্য কিছুর উপর নয়।"[২৭] মজুরী কিভাবে স্থিরিকৃত হয়? পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রমের যে 'স্বাভাবিক' দাম তা তার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার অধিক নয়। এই মজুরী দিয়ে সে কোন রকমে কায়ক্লেশে বেঁচে-বর্তে থাকে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে মজুরীও বেড়ে যেতে বাধ্য। এই মজুরী টাকা-পয়সার হিসাবে হবে। শ্রমিক স্বাভাবিকভাবে কৃষিপণ্য অধিক ভক্ষণ করে থাকে। কাজেই, লোকসংখ্যা যত ও পুঁজিগঠন বেড়ে যাওযার সাথে সাথে মুনাফাহারে হ্রাস ঘটার প্রবণতা দেখা দেয়।

নিম্নভাগে তা ঘটে থাকে। মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বিরাজমান। পুঁজিপতি তাঁব আয়ের সবটা খেয়ে বসে না। কিছুটা সঞ্চয় করে। শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির আসল কলকাঠি পুঁজি-সংগঠন। মূলধন সঞ্চিত হয়ে গেলে সর্বত্র নড়াচড়া শুরু হয়। কর্মক্রিয়া সচল হয়। সবায় জেগে উঠে। মনে করুন, গোড়াতে মজুরী হার 'স্বাভাবিক' অর্থাৎ কিনা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পর্যায়ে ছিল। এক্ষণে সঞ্চয় কর্মক্ষেত্রে নেমে মজুরী তহবিল বাড়িয়ে দেয়। ফলে মজুরী হার 'স্বাভাবিক' পর্যায় ছাড়িয়ে উর্ধ্বগতি নেয়। শ্রমিকশ্রেণী তার আয় কিছুটা কৃষিপণ্যে আর বাকীটা শিল্পজাত দ্রব্যে ব্যয় করে। বাড়তি আয় সবটাই সে ব্যয় করে ফেলে। তার এই বাড়তি ব্যয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য জাতীয় আয়ে গঠনভেদে অনেক সামগ্রী উৎপাদন যেমন বেড়ে যেতে পারে তেমনি বহু সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাসও পেতে পারে।

---

২৭. Srafta সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই II, পৃঃ ২৫২।

এদিকে কিন্তু লোকসংখ্যা বসে নেই। যথারীতি বেড়ে চলেছে। অধিক মজুরী পেয়ে শ্রমিক বেশ ঝাঁকিয়ে বিয়েসাদী করতে শুরু করে আর অগণিত সন্তান জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। ফলে, দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। খাওয়ার মুখ বাড়ে। ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হয়। উৎপাদন আঙ্গিক পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে।

যদি ধরা যায় যে মূলধন বেড়ে মজুরী তহবিল তেমন স্ফীতকায় করে না তাহলে এই অতি-বর্ধিত জনসংখ্যার প্রভাবহেতু মজুরী হার হ্রাস পেতে থাকে। [২৮]

জনসংখ্যা বেড়ে যেয়ে অবশ্য টাকার হিসাবে মজুরী হার পূর্ব পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে না। অধিক খাদ্যদ্রব্য ফলাতে অধিক ব্যয় পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম উর্ধ্বগতি নেয়। ফলে শ্রমিককে অধিক খরচ করতে হয় খাওয়ার খাতে। চিরাচরিত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য। পরিণামে তার বাড়তি আয়টুকু নিঃশেষিত হয়ে যায়।

লাভ ও মজুরীতে কি সম্পর্ক? কি ভাবে তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়? মজুরী বর্ধনহেতু তাদের সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়? প্রকৃত মজুরী নির্দিষ্ট স্বাভাবিক গণ্ডীতে ফিরে আসে। কিন্তু টাকার হিসাবে তা উর্ধ্বে থাকে। কেননা কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে যায়। আর মজুরদের প্রধান ভক্ষণীয় বস্তু কৃষিপণ্য। তার অর্থ, মুনাফা হার নিম্ন হয়। কিন্তু, কেন? কারণ স্মরণ করুন, রিকার্ডোর মতে মুদ্রা-মূল্যে পরিবর্তন মানে উৎপাদন পরিস্থিতির পরিবর্তন। পণ্যের দাম বেড়ে গেলে

২৮. রিকার্ডীয়ান আঙ্গিকে এই অধিক কর্মীর কর্ম-সংস্থান কঠিন কিছু নয়। লাভ সম্ভাবনা বিরাজমান হলে পুঁজিপতি অধিক উৎপাদনে পরাঙ্মুখ নয়। সে অধিক কর্মী নিয়োগ কবতে থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী নেমে আসে। ফলে সবায় কাজ পেয়ে যায়। অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। যদি মজুরী অনমনীয় হয়। মনে করুন মজুরী হার নিম্নতম পর্যায়ে আছে। এর কম দিয়ে শ্রমিক পাওয়ার জো নেই। কাজেই, বাড়তি শ্রমিক কেবল বেকারত্বের পরিমাণ বাড়াবে। রিকার্ডো আলোচনায় এই জাতীয় পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায় বৈকি। নব নব উন্মোষণী-উদ্ভাবনীর সংযোজনের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। রিকার্ডো তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। যদি নব উদ্ভাবনা অধিক পুঁজিভিত্তিক হয় তাহলে শ্রমিকের পাওনা যেমন হ্রাস পাবে তেমনি সময়ের দীর্ঘ পরিসরে বেকারী তীব্রতর হবে। অবশ্য সে শুধু সম্ভব কেবল মজুরী 'অনমনীয়' হলে। কিন্তু, তাঁর রূপরেখায় ধ্রুবধর্মী মজুরী বিদ্যমান সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য।

তা উৎপাদনে অধিক শ্রম প্রয়োজন হয়। কিন্তু সব পণ্যের দাম বেড়ে যাবে এমন মনে করার কারণ নেই। মুদ্রা সরবরাহ সম্প্রসারণ তাঁর আলোচনার বহির্ভূত। কেননা যদি তাই হয় তাহলে দ্রব্যাদির বিনিময় হারে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

কাজেই, শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে সম্প্রসারণ ঘটলেও এদের দামে নড়চড় ঘটেনা। কেননা উৎপাদন ব্যয় যে একই রূপ। অধিক উপাদান ইউনিট খাটিয়ে দ্রব্যাদির আনুপাতিক বর্ধন যে পাওয়া যায়। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রে টাকার মজুরী অধিক হয়। কারণ প্রতিযোগিতার ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গে মজুরী হার সমান হয়ে যায়। সুতরাং প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে, কি সমগ্র পুঁজি সরঞ্জাম থেকে প্রাপ্ত মুনাফাহারে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। এদিকে মজার ব্যাপার এই যে, মজুরী হার ও কৃষিপণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী হয় অথচ কৃষিকাজে মুনাফা পড়ে যায়। কিন্তু কেন এমন হয় ? কারণ রিকার্ডো বলেন, কৃষিজাত দ্রব্যের দামে খাজনা নেই। প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উৎপণ্য কৃষিদ্রব্যের দাম প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হয়। খাজনার উদ্ভব ঘটে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে। সেই জন্য প্রান্তিক ভূমিতে খাজনা নেই। সুতরাং, খাজনাকে প্রান্তিক উৎপাদন খরচে যেমন নেওয়া হয় না. তেমনি দামের মধ্যেও ধরা হয় না। উৎপন্ন শস্যের দাম যত বেশী, প্রান্তিক উৎপাদন খরচ যত কম, খাজনার পরিমাণ তত বেশী। একই জমি যদি ভালভাবে চাষ করা হয়, তবে প্রান্তিক খরচ বেশী হবে এবং প্রান্তিক খরচ ও গড়পড়তা খরচের উদ্ভবে ঘটবে খাজনার উৎপত্তি। অর্থাৎ কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে খাজনার পরিমাণও বেড়ে যায়। সুতরাং, প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে পুঁজিপতি যে বাড়তি আয় পায় তা বাড়তি খাজনা শুষে নেয়। ফলে পুঁজিপতির অবস্থা থাকে পূর্ববৎই। অথচ মজুরী হার বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিককে অধিক মাইনে দিতে হয়। ফলে, লাভের অংশ হ্রাস পায়।

সমস্যাটি পূর্বোক্ত গাণিতিক উদাহরণের সংখ্যাগুলোর সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। নিকৃষ্টতম পুঁজি ও শ্রম ইউনিট প্রথমে ৫০ মণ ধান জন্মাতে পারে। প্রতি মণের দাম ২ টাকা হিসাবে মোট আয় আসে ১০০ টাকা। পরে সেই একই পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি ৪০ মণ ধান জন্মায়। দাম দাঁড়ায় যেয়ে মণ প্রতি ২·৫০ টাকা। প্রথমোক্ত পুঁজিপতি

এই হিসাবে ১২৫ টাকা পায়। প্রথমে তাকে খাজনা দিতে হয়নি। এক্ষণে খাজনা দিতে হয় ২৫ টাকা, অর্থাৎ ১০ মণ (৫০-৪০) ধানের দাম। ফলে তার নীট প্রাপ্য ১০০ টাকাই হয়। এই টাকা মজুরী ও মুনাফা খাতে প্রাপ্য।

ধরা যাক, শ্রমের ন্যূনতম মজুরী ১০ মণ ধানের সমান। অর্থাৎ পুঁজিপতি মজুরী হিসাবে ২০ টাকা (১০×২) দেয়। আর লাভ পায় ৮০ টাকা বা ৪০ মণ ধান।[২৯] অতঃপর অবস্থা এগিয়ে চলে। পুঁজি সংগঠন হয়। খাজনা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ টাকায় অর্থাৎ ১০ মণ ধানের সমান। মজুরীও প্রদান করতে হয় ২৫ টাকা (১০×২.৫০), সুতরাং, প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে সে লাভ পায় ৭৫ টাকা অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা কম।

শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থা অভিন্ন থাকে। অর্থ্যাৎ প্রথমে ওপরে প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজি ১০ জোড়া জুতাই তৈরী করে যার দাম দাঁড়ায় ১০ টাকা হারে মোট ১০০ টাকা। কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। কাজেই শিল্পপতি বেশী লাভ পেতে পারে না। সুতরাং, তার দেয় মজুরীও জাতীয় আয় বর্ধনের সাথে সাথে বেড়ে যেয়ে ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা দাঁড়ায়। কাজেই, এই পুঁজিপতির পাওনা মুনাফাও ৮০ টাকা থেকে নেমে ৭৫ টাকা চলে আসে। তাকে অবশ্য খাজনা দিতে হয় না।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণভাবে সবায় দাম চড়াতে পারে না বটে। কিন্তু, কেউ একজন হয়ত বাড়িয়ে বসতে পারে। তাতে অন্য দশজনের ক্ষতি হবে। অর্থনীতিতেও বিষম অবস্থার সৃষ্টি হবে। তবে তা ক্ষণকালের জন্য। অচিরেই প্রতিযোগিতা তাকে ঘর-মুখো করে তুলবে এবং তার আয় যথারীতি পর্যায়ে নিয়ে আসবে।

মূলধন-সংগঠন হলে এবং লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে মোট মজুরী বেড়ে যায়। মোট মুনাফা বাড়তেও পারে নাও বাড়তে পারে। চলতি মূলধন ও স্থায়ী মূলধনের বর্ধন ঘটে। মুনাফা হারে হ্রাস ঘটে। মূলধন বাড়ার সাথে কি তালে মুনাফা হার হ্রাস পায়, তার উপর নির্ভর করে মোট মুনাফা **(aggregate profit)** কমবে কিনা। অবশ্য মোট মুনাফার অনুপাতে মোট মজুরী অবশ্যই বেড়ে যায়। কেননা, ইউনিট প্রতি শ্রম ও পুঁজিতে মজুরী হার মুনাফা অপেক্ষা অধিক বেগে বেড়ে যায়।

২৯. আলোচনা সহজতর করার খাতিরে কাঁচামাল ইত্যাদির খরচ হিসাবে নেওয়া হয়নি।

মূলধন সংগঠনের প্রভাদ ভিন্নরূপও হতে পারে। তার ফলাফল উপরোক্ত রূপ না হয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। পুঁজি-গঠন একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া। লাভ হলে সঞ্চয় কিছুটা ঘটবে—এত স্বাভাবিক কথা। অবশ্য লভ্যাংশ একটা নিম্নতম পর্যায়ের নীচে চলে গেলে ভিন্নরূপ হতে পারে। লোকসংখ্যা বাধাহীন অবস্থায় স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে চলে। মজুরী জীবন ধারণের ন্যূনতম পর্যায় অপেক্ষা অধিক হলে জনসংখ্যা বেড়ে চলে। রিকার্ডো মনে করেন যে, পুঁজি-গঠন জনসংখ্যা বর্ধন অপেক্ষা অধিক হারে হতে পারে এবং অনেককাল ধরে। এমতাবস্থার মজুরীহার তার 'স্বাভাবিক' হার অপেক্ষা উর্ধ্বে হয়। এই পরিস্থিতি নব অধ্যুষিত অঞ্চলে ঘটতে পারে। কেননা সেথায় উর্বরা জমি এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। খাজনা তেমন চড়া নয়। অথচ শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে প্রচুর লাভ পাওয়া যায়।

রিকার্ডো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রযুক্তিক অগ্রগতির ফলে মুনাফা হারে হ্রাস রোধ হতে পারে। মুনাফাহারে নিম্নমুখী প্রবণতাগুলো কাটিয়ে দিতে পারে। কৃষিকাজে শ্রম পরিমাণ কমিয়ে খরচা কমাতে পারে এবং ফলে কৃষিপণ্যের দাম তেমন চড়তে নাও পারে। তাতে করে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলেও হয়ত টাকার হিসাবে মজুরী তেমন নাও বাড়তে পারে। অন্যথায় যেমনটা ঘটতে পারত। তাহলে লোকসংখ্যা বাড়াসত্ত্বেও মুনাফাহার তেমনটা নেমে আসবে না। উদ্ভাবনী-আবিষ্কার হেতু শিল্পজাত দ্রব্যের দামও কম হয়। শ্রমিকরা এই সব দ্রব্যও কিছুটা ভক্ষণ করে। এই কারণেও টাকা মজুরী তেমনটা বাড়বে না। অন্যথায় যেমনটা বাড়তে পারত।

এই জাতীয় ব্যতিক্রমের কথা রিকার্ডো উল্লেখ করেছেন বটে। তবে তাঁর মতে এরা তেমন শক্তিশালী নয়। কাজেই তিনি যে বন্টন নীতিমালা দিয়েছেন তা মোটামুটিভাবে বেশ স্পষ্ট। তিনি বলেছেন যে, উন্নত অর্থনীতিতে (mature economy) প্রকৃত মজুরী সনাতন জীবনধারণ প্রথার ন্যূনতম পর্যায়ে বিরাজমান থাকে। পুঁজি-সংগঠন প্রকৃত ও টাকা-মজুরী বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃত মজুরী বেশীদিন উঁচু পর্যায়ে থাকতে পারে না। লোকসংখ্যা বেড়ে যেয়ে বাড়তিটুকু অচিরে গ্রাস করে নেয়। ফলে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু, টাকা-মজুরী নিরন্তর বেড়ে চলে। অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তা পাওয়া যেতে পারে কেবল অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষাবাদ করে। ফলে

খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলে। শ্রমিক তার আয়ের প্রায় সবটা ব্যয় করে খাদ্যদ্রব্যে। কাজেই, তার ন্যূনতম আয়ে এই অস্বাভাবিক চাপের ফলে টাকা-মজুরী হার (money wage rate) বেড়ে চলে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায় কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে মুনাফায় সঙ্কোচন। পরিণতি হিসাবে পুঁজি-সংগঠন শিথিল হয়ে উঠে। কেননা পুঁজি-গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে মুনাফা হারের উপর। তারই পরিণাম হয়ে দাঁড়ায় অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকর্মে জড়তা। ফলে জাতীয় আয়ে বর্ধন ব্যাহত হয়। মুনাফা হার কমে যখন সর্বশেষ পর্যায়ে ঝুঁকি ও ঝামেলা পূরণে ব্যর্থ হয়ে উঠে তখন মূলধন-সংগঠন বন্ধ হয়ে যায়। অর্থনীতি স্থবির পযায়ে (stationery state) এসে দাঁড়ায়। মূলধন বা জনসংখ্যা কোথায়ও সম্প্র-সারণ ঘটেনা। খাজনা সর্বোচচ হয়ে উঠে। প্রকৃত মজুরী সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। মুনাফার হার শূন্যের ধারে-কাছে ঘুরাফেরা করে। বন্ধ্যাত্ব পরিবেশ জাঁকিয়ে বসে।

এই হল রিকার্ডো প্রদত্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রকৃত বিশ্লেষণ। সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে। অধিকাংশ ধ্রুপদী ধন-বিজ্ঞানী তাঁর মতামতে সায় দিয়েছেন। দোষ-ত্রুটি তাঁর আলোচনায় যথেষ্ট রয়েছে। নিম্নে তা দেখানো হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, রিকার্ডোর বিশ্লেষণ ধন-বিজ্ঞান পর্যালোচনায় এক নবদিগন্ত উন্মুক্ত করেছিল। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা দিগ্‌দিশারী হিসাবে সর্বকালে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে।

তাঁর আলোচনায় আমরা প্রথমে পাই কি করে অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদানে আয় বন্টিত হয়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া চলাকালে মজুর, খাজনা ও মুনাফা কি আকৃতি-প্রকৃতি ধারণ করে; কিভাবে তারা আবর্তিত হয়, তাদের আপেক্ষিক ভাগাভাগি কেমন হয়, ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর আলোচনা অর্থনীতির চলিষ্ণু কাঠামো (dynamic) প্রদান করে। কোথায়ও তা স্থবির হয়ে বিরাজমান নয়। অনন্তর তা এগিয়ে চলেছে। সময়কাল পেরিয়ে সে ধাবমান। সর্বশেষ পর্যায়ে এসে অবশ্য স্থবির পর্যায়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়তঃ, তাঁর বিশ্লেষণ অর্থনীতির বিশিষ্ট উপ-করণগুলোতে যথারীতি জোর আরোপ করে। উন্নয়ন অগ্রগতির নিয়ামক-সমূহ উপযুক্ত সন্ধান পায়।

সংক্ষেপে তাঁর রূপরেখা সম্পর্কে বলা যায় যে তা মূলধন, জনসংখ্যা ও উৎপাদনে কতকগুলো আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলে এবং এই সব আন্তঃ-সম্পর্কের ভিত্তিতে খাজনা, মজুরী ও মুনাফার গতিধারা নির্ণয় করে পরিশেষে এই পূর্বাভাস দিয়ে ইতি টানে যে কালে অর্থনীতি স্থবির পর্যায়ের খপ্পরে নিপতিত হয়।

৬। উপ-সিদ্ধান্তমালা (Policy Implications)

সুতরাং, পাওয়া যায় রিকার্ডীয় পর্যালোচনা থেকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ। রিকার্ডো এই কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ বাতলিয়েছেন কি ? রিকার্ডো তাঁর বিশ্লেষণে না হলেও উপসিদ্ধান্তমালা প্রণয়নে তৎকালীন উপযোগিতাবাদীদের (Utilitarians) ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি উপযোগবাদের অভীষ্ট লক্ষ্য "সর্বাধিক সংখ্যার জন্য সর্বাধিক কল্যাণ" মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তাঁর মতে সরকারী ক্রিয়াকর্ম সংযত হতে হবে। সরকার যত্রতত্র হস্ত প্রসারিত করতে পারবে না। তাহলে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি কতকগুলো সরকারী নীতির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এমন একটি ক্ষেত্র হল শুল্ক। আন্তর্জাতিকভাবে উপাদান সঞ্চালন সম্ভব নয়--এই প্রতিপাদ্য মেনে নিয়ে তিনি যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন যে বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা সবাই লাভবান হতে পারে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করে দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য গড়ে তোলা হলে প্রতিটি দেশ বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারে। পরবর্তীকালে জে. এস. মিল তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে গিয়ে প্রদর্শন করেন কিভাবে প্রতিটি দেশ বাণিজ্য দ্বারা লাভবান হবে। বাণিজ্য-শর্তের (terms of trade) ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলতে সক্ষম হন কিভাবে একদেশে ও আরেক দেশে বিনিময় হার ভারসাম্য লাভ করতে পারে।[৩০] রিকার্ডো ও ক্লাশিক্যাল মতবাদী অন্যান্যের ধারণা অনুযায়ী অবাধ বাণিজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রম-বিভাজন ও বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট তুলনামূলক উৎপাদন ব্যয়বিধি অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তি।

৩০. ক্লাশিক্যাল মতবাদীরা উপাদানের ইউনিট হিসাব করে দেশে দেশে বাণিজ্যের বিনিময় হার গড়ে তুলেন। Viner বাণিজ্য অনুপাতের এই হিসাবকে আখ্যা দিয়েছেন Double factorial trading terms বলে। দেখুন J. Viner-এর Studies in the theory of International trade, Harper and Brothers, New York, 1937. 56.

এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে সব কয়টি দেশ আন্তর্জাতিক নৈপুণ্যের সুবিধাদি ভোগ করতে পারে। বিশ্ব-আয় বেড়ে যেতে পারে। সম্পদ বিতরণ সুষম হতে পারে। আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে অশেষ সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। তাতে আভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন সবল হয় ও উদ্ভাবন আবিষ্কার অনুপ্রাণিত হয়। রিকার্ডো যুক্তি দেন তৈরীকৃত দ্রব্যের বিনিময়ে বৃটেন খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে বিশেষভাবে লাভবান হতে পারে। তাতে তার কৃষিপণ্যে চাপ হ্রাস পায়। ফলে, কৃষিপণ্যের দাম তেমন চড়তে পারে না। তেমনি মজুরীও অধিক হওয়ার প্রবণতা প্রাপ্ত হয় না। পরিণামে মুনাফায় যে নিম্নগতি প্রবণতা বিরাজমান তা কিছুটা শিথিল হয়। ক্লাসিক্যাল লেখক অবাধ বাণিজ্যের একটা ব্যতিক্রম অবশ্য চিহ্নিত করেছেন। সেটি হচ্ছে 'শিশু শিল্প' যুক্তি। যুক্তিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানব শিশুকে যেমন সংরক্ষণ ও লালন-পালন করা প্রয়োজন, তেমনি দেশের শিশু শিল্পকে কঁচি অবস্থায় বিদেশীর প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানো উচিত। তাই জে. এস. মিল লিখেন "নীতিগতভাবে কেবলমাত্র একক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করা যেতে পারে। (অপেক্ষাকৃত নতুন অথচ উন্নতকর্মী) এমন দেশ হয়ত সাময়িকভাবে অবস্থার সাথে মিলিয়ে সংরক্ষণধর্মী শুল্কনীতি গড়ে তুলতে পারে। অনেক শিল্পেরই ভবিষ্যৎ হয়ত উজ্জ্বল, কিন্তু, শিশু অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় এরা হয়ত দাঁড়াতে, কি বাড়তে পারে না। হয়ত জন্মগত কোন দুর্বলতা বহু শিল্পে নেই। কেবল দেরীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দীর্ঘকাল আগে প্রতিষ্ঠিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্প-সংস্থার সাথে কিয়ৎকাল প্রতি-যোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম নয়। কিন্তু, অচিরেই তা সাবালক হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। কাজেই, সেই শিল্পকে একটু ছায়া দেয়া যেতে পারে বৈকি। কিছুকালের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। তাতে করে আজকের এই অসহায় শিল্প দেশকে অধিকহারে লভ্যাংশ দিতে পারে। কাজেই, বর্তমানের অসুবিধা পুষিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, এই যুক্তির সারবত্তা অনস্বীকার্য। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন যোগ্য শিল্প সমর্থন পায়। যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাময় শিল্প সংরক্ষণ সহযোগিতা পায়। যেন তা নির্দিষ্টকাল পেরিয়ে গেলে নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। অপর লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত, সংরক্ষণ নীতি যেন কিয়ৎকালের জন্য হয়। সংরক্ষণের

স্বাদ পেয়ে যেন দেশী শিল্পপতি চিরকালের জন্য তা দাবী করে না বসে। নির্দিষ্ট কাল পরে তা উঠিয়ে দেয়ার নীতি সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করে নিতি হবে"।[৩১]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মতবাদীর অপর একটি বৈশিষ্ট্য খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, শ্রম ও পুঁজি আন্তর্জাতিক-ভাবে সচল নয়। এই কথা দিয়ে অবশ্য এটুকু বোঝান না যে একবারে চলাচল নেই। চলাচল কিছুটা আছে বটে। তবে তা তেমন ধর্তব্য নয়। আভ্যন্তরীণ চলাচলের তুলনায় তা নেহায়েতই নগণ্য। রিকার্ডোর মত হচ্ছে "অভিজ্ঞতা বলে যে পুঁজি নিয়ে অমূলক বা সঠিক যাই হউক, একটা নিরাপত্তা বোধের অভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।....তার সাথে যোগ হয় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার স্বাভাবিক দুর্বলতা। ফলে মূলধন-নির্গম তেমন সবল হতে পারে না। এই সকল প্রভাবহেতু......পুঁজি-পতিরা স্বদেশে দুই পয়সা রোজগার করেই শান্ত থাকে। বিদেশে যেয়ে কাড়ি কাড়ি রোজগারে অনুপ্রাণিত হয় না।"[৩২] জে. এস. মিল-এর চিন্তাও মোটামুটি একই ধরনের। তবে তিনি কিছুটা শিথিল মনোভাব গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর মতে দেশে দেশে শ্রম পুঁজির সঞ্চালন আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। কেননা, মানুষ দূরের মানুষকে চিনে চলেছে। তাদের মধ্যে নিরন্তর ভাব বিনিময় ঘটে চলেছে। দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছে।

ঔপনিবেশিক অঞ্চল সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল ধন-বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা ভিন্নরূপ। জে. এস. মিল তাই বলেন, "এগুলোকে দেশ বলে গণ্য করার মানে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে আলাদাভাবে লিপ্ত. হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। বরং, এই সকল অঞ্চলকে বৃহত্তর সমাজের সমপ্রসারিত অংশ হিসাবে বিবেচনা করা শ্রেয়। সেথায় অবস্থিত কৃষি কি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মালিকানায় বলে ধবে নেয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ হিসাবে আমাদেব পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জের কথা ধরুন। এগুলোকে দেশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাদের স্বীয় মূলধন আছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই।......সমস্ত মূলধন ইংরেজদের। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সেবার জন্য নিয়োজিত।.... কাজেই এই দীপ-পুঞ্জের সাথে বহির্বাণিজ্য নয়। তা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের নামান্তর। যেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা। কাজেই, ব্যবসা অন্তর্দেশীয়

---

৩১. J. S. Mill-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৯২২।

৩২. Sraffa সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই, পৃষ্ঠা ১৩৬—১৩৭।

বাণিজ্যের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৩৩] নব অধ্যুষিত অঞ্চলে মূলধন ও শ্রম প্রবাহের ফলে মূলধন নির্গমনী দেশ লাভবান হয়। মুনাফা অধিক পায়। সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়। নামমাত্র মূল্যে কাঁচামাল পাওয়া যায়। যে শ্রম দেশ ছেড়ে নতুন অঞ্চলে যায় তারাও লাভবান হয়। কেননা তারা "এমন জায়গা ছেড়ে যায় যেখানে তাদের কদর তেমন নেই। আর যেখানে যায় সেখানে তাদেরকে লুফে নেয়।"[৩৪] মিল্ অবশ্য মনে করেন যে ঔপনিবেশগুলোতে মূলধন ও শ্রম নির্গম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তাতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা সম্ভব হয়। জনকল্যাণ সর্বাধিক হয়। মাতৃভূমি অধিক লাভ পায়।[৩৫]

ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানী মূলধন নির্গমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেন-দেনে যে প্রভাব পড়ে তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূলধন চলাচলের ফলে উদ্ভূত সমস্যার আঙ্গিকে বাণিজ্য লেন-দেন পরিস্থিতিতে সাঙ্গীকরণের একটা উপায় বাতলিয়েছেন জে. এস. মিল্।[৩৬] তা এইরূপঃ স্বর্ণমান বিরাজমান বলে ধরে নেয়া যাক। মূলধন রপ্তানিকারক দেশে বৈদেশিক মুদ্রার দাম স্বর্ণ-রপ্তানি বিন্দু (gold export point) অবধি বেড়ে যায়। ফলে উত্তমর্ণ দেশ থেকে স্বর্ণ অধমর্ণ দেশে প্রবাহিত হয়। তার ফলে দাতা দেশে বৈদেশিক মুদ্রার দাম পড়ে যায়। আর গ্রহিতা দেশে বেড়ে যায়। মূল্যমানে পরিবর্তনের ফলে মূলধন রপ্তানিকারক দেশের রপ্তানি বেড়ে যায় আর আমদানী হ্রাস পায়। তার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত ঘটে। এই উদ্বৃত্ত মূলধন নির্গমনের সমান। ফলে বৈদেশিক বিনিময় হার সমবিন্দুতে (at Par) ফিরে আসে ও মূলধন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। স্বর্ণ-রপ্তানিকারক দেশে স্বর্ণ পরিমাণ কমে যায়, মূলধন বিদেশে পাঠাবার ফলে। তার চেয়েও বড় কথা, সেই দেশের পণ্য বাণিজ্য-অনুপাত (Commodity terms of trade) বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্থ হয়। সে যাই হউক, ক্লাসিক্যাল লেখকদের মতে স্বর্ণমান বিরাজিত হলে স্বয়ংক্রিয় সমঝোতা এসে যায়। কাজেই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেন-দেনে অসমতা তেমন একটা বড় সমস্যা নয়।

---

৩৩. J.S. Mill-এর প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা ৬৮৫—৬৮৬।

৩৪. J.S. Mill-এর বই, পৃষ্ঠা ৯৭০।

৩৫. ... ঐ, পৃঃ ৯৭০।

৩৬. ... ঐ, পৃঃ ৬২৭—৬২৮।

রিকার্ডো Poor Laws উঠিয়ে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর সময়ে এই আইন বলবৎ ছিল। এই আইন মাধ্যমে দুঃস্থ ও বেকারীদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করেন "খাওয়ার যুগিয়ে অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করা হয় বটে। তবে এতে করে মানব চাহিদা অসীম করে তোলার পথও উন্মুক্ত করা হয়।"[৩৭] "লোকসংখ্যা বর্ধন দমন করতে হলে কিছুটা নিপীড়ন প্রয়োজন বৈকি। তা না হলে বর্ধন যে সীমা ছাড়িয়ে যাবে। দরিদ্র জনসাধারণ ও তাদের নিয়োগকর্তার মধ্যে দর কষাকষি উন্মুক্ত রাখুন। তাতে শ্রমপরিমাণ কিছুটা সীমিত হবে। তা কার্যকরী চাহিদার সমানুপাতিক হয়ে উঠতে বাধ্য হবে।"[৩৮] এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত রিকার্ডোর ধারণার কথা মনে করা যাক। ইংল্যাণ্ডে পাওয়া তখনকার মজুরীর হার তেমন একটা নিম্ন পর্যায়ে ছিল বলে তিনি মনে করতেন না। এই হারে বৈপ্লবিক সংস্কার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন নি। বরং তিনি সময়ে সময়ে লোকসংখ্যার অধিক বর্ধন প্রবণতায় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য যে সকল দেশে মজুরী 'স্বাভাবিক' সীমার অনেক নিম্নে ছিল সেই সব দেশের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা সমর্থন করেছেন।

রিকার্ডো করনীতি নিযে অনেক সময় কাটিয়েছেন। এ করের আসল ভার (ultimate incidence) কার ঘাড়ে পড়ে তা নির্ধারণে ব্যাপৃত থেকেছেন। সরকারী ব্যয় নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেন নি। কারণ অন্যান্য ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীর ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে সরকারী ব্যয় 'উৎপাদনশীল নয়' (unproductive)। অনেককে তিনি অন-উৎপাদনশীল শ্রম বলে অভিহিত করেছেন। সৈন্য ও নৌবাহিনীর লোকদেরকে তিনি অন-উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ তারা দেশ পাহারা দেয়। সম্পদ ফলায় না। তেমনি ভোগকেও 'উৎপাদনশীল' ও 'অন-উৎপাদনশীল' দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেসকল ভোগ সম্পদ উৎপাদনে সরাসরি কি পরোক্ষভাবে সহায়শীল তারা অন-উৎপাদনশীল বলে খেতাব পেয়েছিল।

রিকার্ডোর মতে সর্বশেষ পর্যালোচনায় করের বোঝা বইতে হয় জাতীয় আয়কে অথবা মূলধনকে। অন্যভাবে কথাটার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, উৎপাদন অধিক হারে সম্প্রসারিত করতে হবে। তেমন অন-উৎপাদনশীল

৩৭. Sraffa সম্পাদিত বই, VII পৃঃ ১২৫।
৩৮. ঐ ঐ ।

ভোগ কমাতে হবে। নাহলে মূলধনী সংভার হ্রাস পাবে। অর্থাৎ কর প্রথা মূলধন-সংগঠন ব্যাহত করে। রিকার্ডো উদাহরণ দেন এই বলে যে মনে করুন, নির্দিষ্ট কোন একটা কর চাপানো হল কৃষিপণ্যের উপর। তারফলে কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে যায়। কর বোঝার সমান হয়। ফলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়। পরিণতি হিসাবে মুনাফাহার কমে যায়। মূলধন সংগঠন শিথিল হয়ে পড়ে। অন্যান্য ট্যাক্স ও মুনাফাকে আঘাত হানে। তাতে উন্নয়ন ক্রিয়াকর্মে চোট লাগে। অবশ্য খাজনায় কি বাবু-গিরি দ্রব্যসামগ্রীতে কর আরোপ করায় আপত্তি নেই। খাজনায় কর চাপালে তা পুরোপুরি ভূম্যাধিকারীর ঘাড়ে পড়ে। সে এমন ব্যক্তি যে রিকা-র্ডোর মতে এক পয়সাও সঞ্চয় করে না। পরোক্ষভাবে হয়ত এই করও পুঁজিকে ধাক্কা দিতে পারে। সৌখীন দ্রব্যাদিতে কর বসালে তা মজুরীকে দৌড়ায় না। তেমনি মুনাফাকে দাবায় না। কারণ, বাবুগিরি শ্রমিকের খাতায় নেই।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাসিক্যাল ধন-বিজ্ঞানীরা সরকারী সক্রিয়তাকে তেমন সুনজরে দেখেন নি। সরকার নাচতে নেমে লেজে-গোবরে অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে—এই তাদের বিশ্বাস। শুল্ক বসিয়ে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে তুলে। দরিদ্রকে ভরণ-পোষণ যুগিয়ে ঝিয়ে-পুতে বেড়ে উঠার সুযোগ দেয়। দেশের ফলন কিছুটা নিজের আয়ত্তে নিয়ে আহুদা কাজে ব্যয় করে। তাতে সম্পদ সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই যে ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানী কেবল দুঃখ-দুর্দশার চিত্রই এঁকেছেন; উদ্ধারের পথ নির্দেশ দেননি। তাঁদের কালে সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তাধর্মী মনোভাবই উদার বলে মনে করা হত। এমনকি কেউ কেউ তা বাড়াবাড়ি বলেও মনে করতেন। সে যাই হউক, এই মতবাদের হোতা অর্থশাস্ত্রবিদরা সরকারী নিষ্ক্রিয়তাকে সুখময় বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির অনুকূলে বলে মত প্রকাশ করেছেন। দুঃখ-দুর্দশা মোচনে সহায়ক বলে যুক্তিতর্ক দিয়েছেন।

৭. ধ্রুপদী বিশ্লেষণের মূল্যায়ন

ক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণ ধনবিজ্ঞান জগতে চলিষ্ণু ও সমষ্টিগত (aggre-gative) আলোচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁদের আলোচনায় নিবদ্ধ

রয়েছে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ। এক কথায় এই বিশ্লেষণ উদ্বৃত্তকে কাজে খাটিয়ে মূলধন সংগঠন প্রক্রিয়াকে উদ্ভাসিত করেছে। ক্লাসিক্যাল ধন-বিজ্ঞানীর কাছে অগ্রগতির একমাত্র চাবিকাঠি মূলধন গঠনে। তাঁদের আলোচনা অবশ্য তেমন শক্ত গাঁথুনীর নয়। বুনটও তেমন কিছু একটা টেকসই নয়। তবে আসল জিনিস কিন্তু তাঁরা ঠিকই খতিয়ে বের করে দেখিয়েছেন।

রিকার্ডো ও তাঁর পরবর্তী কিছুসংখ্যক ধনবিজ্ঞানীতে মূলধন-গঠন ও মাথাপিছু আয় বর্ধন নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে তা মূলতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ, ইতিহাসখ্যাত ক্রমহ্রাসমান নীতির ক্রিয়া কর্মের সক্রিয়তা সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং দ্বিতীয়তঃ ম্যালথুশীয় জন-সংখ্যা তত্ত্বের ভয়ভীতি নিয়ে অতীব চঞ্চলতা। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানী প্রযুক্তিক অগ্রগতিকে তেমন আমল দেননি। কিন্তু, সময় প্রমাণ করেছে যে যান্ত্রিক অগ্রগতি ক্রমহ্রাসমান বিধিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তেমনি প্রযুক্তিক বিদ্যায় বৈপ্লবিক সম্প্রসারণ মুনাফা হারে ব্যাপক হ্রাস রোধতে পারে ও খাজনার মাতলামী রোখতে পারে। ম্যালথাসও সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারেননি। পশ্চিমা জগতের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তা-ধারাকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে। এই তত্ত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করলে ন্যূনতম মজুরীর প্রশ্ন দেখা দিতে পারে না। কাজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা যে দুইটি উপকল্পের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা বলেছেন সেগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়। বরং দোষ-ত্রুটিতে ভরপুর।

সামগ্রিক চাহিদা নিয়ে তেমন সুষ্ঠু আলোচনা ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানী দিতে পারেননি। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার জন্য দায়ী অতিরিক্ত ফটকাবাজারী কারবার ও বাণিজ্য স্রোতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। এ-নিয়ে রিকার্ডো ও ম্যালথাসে কথা কাটাকাটি হতে দেখা যায়। কিন্তু রিকার্ডোর যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মান মর্যাদা পায়। ক্লাসি-ক্যাল আঙ্গিকে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান তেমন কোন সমস্যা নয়। কিন্তু আসলে ব্যাপার যথেষ্ট জটিল। সবাই আজ একথা বিশ্বাস করেন ফলে বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের আলোচনাও দোষত্রুটির উর্ধ্বে নয়।

ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানী অনেকগুলো উপকল্প মেনে নেন। তাঁর কাছে অর্থনৈতিক পরিবেশ বেশ সাজানো-গোছানো। আস্তে-ধীরে সেথায়

উন্নয়ন-অগ্রগতি ঘটে চলে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। প্রতিষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা, আচার-প্রথা, হিসাব-নিকাশ, উন্নয়নের অনুকূলে প্রবহমান। কিন্তু, উপকল্পগুলো কি সত্য? মোটেই নয়। সুতরাং, তাঁদের আলোচনা সেই পরিমাণে ভেজালে ভরা। দোষ-ত্রুটিতে ভরপুর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মার্ক্সীয় মতাদর্শ

কার্ল মার্ক্স ইতিহাস ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সর্বব্যাপী, তাঁর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তন ইতিহাসের গতিধারায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মূলতঃ তিনি এমন এক মতবাদেব সোচচার প্রবক্তা যা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে পুঁজিবাদতন্ত্র অবশ্যই ভেঙ্গে পড়বে এবং তার স্থলে সমাজতন্ত্রবাদ জন্ম নেবে। তাঁর অনুসারীরা বড় শক্ত মানুষ। শির দেবে কিন্তু সীমানা ছাড়বে না। তাঁর মতবাদে আস্থাবান ব্যক্তিবা বিশ্বাস করেন, "বিরুদ্ধবাদী কেবল ভুলের জগতে বিচরণকারী নয় বরং সে মারাত্মক পাপী।"[১]

বক্ষমান প্রবন্ধে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মার্ক্সীয় বক্তব্য উপস্থাপন করা হল। আমাদের আলোচনা এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ। মনে রাখা প্রয়োজন, মার্ক্স কেবল ধনবিজ্ঞানীই ছিলেন না, যদিও তাঁব আলোচনায় ধনবিজ্ঞানের পরিসরই অধিক পরিস্ফুট। তিনি একাধারে ধনবিজ্ঞানী, সমাজবাদী, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের সারবস্তু নিংড়িয়ে তিনি তাঁর অমর সৃষ্টি মানবতাকে প্রদান করে যান।[২]

১. ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা

মার্ক্সীয় মতবাদের ভিত্তি—ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর উদ্ভাসনে নিহিত রয়েছে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের সাধারণ রূপরেখা; আর এরই মাধ্যমে মার্ক্স তুলে ধরেছেন সামাজিক জীবন স্রোতের ভিত্তি ও তার প্রবহমানতা। তিনি মেনে নেননি ঐতিহাসিক

---

১. দেখুন Joseph Schumpeter-এর Capitalism, Socialism and Democracy, Second Edition, Harper and Brothers, New York, 1947.

২. দেখুন, যথা—ঐ, অধ্যায় I-IV, Isaiah Berlin, Karl Marx, Oxford University Press, Oxford, 1948, E.O. Golob, The "Isms": A History and Evaluation, Harper & Brothers, New York, 1954 ; Sidney Hook. Towards the Understanding of Karl Marx, The John Day Co, New York, 1933 ; H. B. Mayo, Democracy & Marxism, D.U.P, N. Y. 1955.

অধিবিদ্যাকে (metaphysics) এবং উপেক্ষা করেছেন মানব প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে। অধিবিদ্যাকে তিনি বলেছেন—অর্থহীন অতীন্দ্রিয়বাদ আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, "মানবমনের সজ্ঞানতা তার অস্তিত্বের নিয়ামক নয়, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার সচেতনতার নিয়ামক।"[৩] মার্ক্স-এর দৃষ্টিতে ইতিহাস কেবল কতকগুলো আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জী নয়। তার নিজস্ব গতি ও ধারা রয়েছে। এগুলো চিহ্নিত করা যায়। আর এই ধারাপর্ব সতত বহমান নব নব সামাজিক আঙ্গিক জন্ম দেয়।

মার্ক্স-এর চোখে মানব-আচরণ 'উৎপাদন-ভূষক'-এর (Made of production) সামিল। 'উৎপাদন-ভূষক' বলতে বুঝানো হচ্ছে উৎপাদনের একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে এবং তা এমন সমাজে যার গঠন প্রণালীতে রয়েছে :

"(১) শ্রমিক-সংগঠন বিভাজন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে, শ্রমিক নৈপুণ্য ও তার মান-মর্যাদা সমাজে বিরাজমান স্বাধীনতা বা দাসত্বের ভিত্তিতে;

(২) ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ধনসম্পদ ব্যবহারের প্রযুক্তিক জ্ঞান এবং

(৩) প্রযুক্তিক প্রথা ও প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য জ্ঞানের সাধারণ পরিবেশ।"[৪]

মার্ক্সীয় আলোচনায় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ভূষক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনধারার সাধারণ রূপরেখা নির্ণীত করে। অন্য কথায় উৎপাদন-ভূষক অনুযায়ী বিধিবদ্ধ 'উৎপাদন সম্বন্ধ' পাওয়া যায়। এই 'উৎপাদন সম্বন্ধ' মানে সমাজগত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী-নক্সা (class structure) নির্ণীত হয়। শ্রেণী বলতে বোঝা যায় একদল লোক যারা, কি সম্পত্তির মালিকানায়, কি সামাজিক মান-মর্যাদায় এক সমাজভুক্ত। শ্রেণী কাঠামোর ধরন-ধারণ এমন-যে তাতে একদল

---

৩. দেখুন Karl Marx-এর A Contribution to the Critique of Political Economy, translated by N.1. Stone, the International Library Publishing Co, New York 1904, Preface 11-12.

৪ M.M. Bober-এর Karl Marx's Interpretation of History, Harvard University Press, Cambridge, 1950, P. 24.

লোক সবার মাথার উপরে বসে মাতবরী করে বেড়ায় আর বাকী সবাই দুর্ভোগ পোহায় ও শোষিত হয়। কেবলমাত্র সমাজ বিবর্তনের সর্বশেষ মাথায় শ্রেণীবিহীন সমাজে এই বিভাগ বিদ্যমান নয়। বাকী সর্বত্র একই ইতিহাস।

উৎপাদন-ভূষক ও সম্বন্ধ ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও প্রতিষ্ঠানগত একটা সার্বিক কাঠামো প্রদান করে। এগুলো যেন স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরিত হয়ে যায়। তাছাড়া, হয়ত কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যধর্মী চিন্তাধারা স্থান পেতে পারে। তবে এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনে তাদের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

সমাজে বিবর্তন আসে। কারণ, উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক প্রবাহে অর্থাৎ কিনা উৎপাদন-ভূষকের উপাদানাবলীতে পরিবর্তন ঘটে। উপাদানা-বলীর এই পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে। তার জন্য জোরজবর-দস্তির প্রয়োজন পড়ে না, মার্ক্স তাই বলেন। হয়ত সমাজ ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ অর্থনৈতিক উপাদানাবলীর এই অগ্রগমন কোথায়ও বা ত্বরান্বিত করতে পারে। আবার কোথায়ও হয়ত শ্লথগতিসম্পন্ন করে তুলতে পারে। কিন্তু পরিবর্তন ঘটে চলবেই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাই হউক না কেন! সমাজ বিবর্তনের গোড়ার দিকে উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক গতিধারা, উৎপাদন সম্বন্ধ এবং ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিকের সমানুসারী হয়। এই সময়ে উৎপাদন সম্বন্ধ ধাবা মানে "উৎপাদন শক্তি-নিচয়ের উন্নয়ন-অগ্রগতি আকার-ভেদ।"[৫] উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক শক্তিনিচয় এগিয়ে চলে। সাংস্কৃতিক কাঠামোও এগিয়ে যায়। কিন্তু, তা শক্তিনিচয়ের তুলনায় পেছনে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে এসে উৎপাদনী শক্তিনিচয় ও উৎপাদন-সম্পর্কে বাদ-বিসম্বাদ বেধে যায়। বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কে চিড় ধরে। তা "উৎপাদন শক্তিনিচয়ের নিগড়ে আটকে পড়ে।" "শুরু হয় সামাজিক বিপ্লব"।

এই পরিবর্তন শ্রেণী-দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয়। উৎপাদন শক্তিনিচয় অগ্রগামী হয়। উৎপাদন-সম্পর্ক দৃঢ়সংবদ্ধ হয়। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। শাসক ও শোষকের বিভেদ দানা বেঁধে উঠে। শোষিত শ্রেণী আঘাত

৫. মার্ক্স-এর প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা ১২।

হানে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে প্রবৃত্ত হয়। উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে এই শ্রেণীতে শক্তি ও সাহস আসে। সর্বাধিক শক্তিধারী উৎপাদনী শক্তিনিচয় তাদের আয়ত্তে। ফলে তাদের জয় অবধারিত। পরিণামে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠে। অর্থনৈতিক ক্ষমতাবলী আস্তে আস্তে তাদের হাতে আসতে থাকে। নতুন উৎপাদনী স্রোত বইতে শুরু করে। ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। সাংস্কৃতিক পরিবেশে রূপান্তর ঘটে। প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিক রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক অমোঘধারা এগিয়ে চলে। ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। শ্রেণীবৈষম্য তীব্রতর হয়। ইতিহাস পট বদলায়। আপন পরিক্রমায় প্রবাহিত হয়। ইতিহাসের সব স্তরে শ্রেণীবৈষম্য বিরাজমান। মার্ক্স ও এঙ্গেল্স্ ইতিহাসেব কপোলতলে চার শ্রেণীর সামাজিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। শ্রেণীগুলো হল: (১) আদিকালীন (Primitive) সাম্যবাদ, (২) পুরাকালীন দাসপ্রথা, (৩) সামন্ত প্রথা ও (৪) পুঁজিবাদ।

মার্ক্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ইতিহাসের নবদিগন্ত উন্মোচনকাবী একথা অনেক পশ্চিমা পর্যবেক্ষক স্বীকার করলেও অনেকেই মত পোষণ করেন যে, এই ব্যাখ্যা সমাজ বিবর্তনের ধারাপর্ব উন্মোচনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তাঁদের মতে মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ সাদামাটা এবং তত্ত্ব হিসাবে তা আটপৌরে (rigid)। প্রথমতঃ,[৬] মার্ক্স ইতিহাসকে যে ভাবে ভাগ করেছেন তা অতি-সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। তিনি ইতিহাসকে ভাগ করেছেন কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যায়ে এবং প্রতিটি পর্যায়কে এক একটি বিষম ও অসদৃশ সামাজিক ব্যবস্থা-সম্বলিত করে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তাত সত্য নয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশ হঠাৎ করে গজায় না, তা নিরন্তর প্রবহমান। আজকের সংস্কৃতি গতকালের প্রভাববর্জিত নয়। অথচ মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাতে উত্তরসূরীদের উপব পূর্বসূরীদের প্রভাব সম্যক আলোচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্স প্রদত্ত প্রতিটি অর্থনৈতিক স্তরের বিশ্লেষণ মোটেই শক্ত গাঁথুনীতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়ম মেনে অর্থনৈতিক প্রতিটি স্তর নির্দিষ্ট পরিক্রমায় প্রবাহিত হয়। তাব জন্ম ঘটে। তাতে প্রগতিশীল

৬. নিম্নে বর্ণিত তিনটি সমালোচনা O. H. Taylor-এর Economics and liberalism, Collected papers, Harvard University Press, Cambridge, 1955 পুস্তক থেকে নেয়া। পৃঃ সংখ্যা ২৭০—২৭১।

বিবর্তন দেখা দেয়। অধঃপতন নেমে আসে। অতঃপর স্বাভাবিক নিয়মে মুছে যায়। 'স্তরধর্মী' অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি তত্ত্বের ন্যায় তাঁর বিশ্লেষণও কতকগুলো ঐতিহাসিক বিষয়াবলীর সমর্থন পায় বটে; কিন্তু সবগুলোর নয়।[৭] তৃতীয়তঃ, সমাজকে দুই শ্রেণীতে 'জলরোধক বিভক্তিকরণ' মোটেই সুখপ্রদ নয়। তেমনি তাঁর উপকল্প যে কেবলমাত্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলেই অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটে এবং পরিণামে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্ম দেয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজ ও তার সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে পরিবর্তন ইত্যাদি বেশ জটপাকানো ব্যাপার। মুখের দু'টি কথাতে এর সহজ ব্যাখ্যা করা চলে না।

মার্ক্স প্রতি স্তরে অর্থনৈতিক অগ্রগতি-প্রক্রিয়ার রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশেও তা করেছেন। কিন্তু সীমারেখায় তেমন একটা আটঘাট বাঁধা আলোচনা করেননি। মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছেন। সে যাই হোক, আলোচনা তবু অনেকটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে ধরা যায়; তবে, অর্থনৈতিক গতিধারার বিশ্লেষণ ও তার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং ইতিহাস এর মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা একাত্ম হয় নাই। এমন কি কেবলমাত্র তথাকথিত অর্থনৈতিক শক্তিনিচয় পর্যালোচনা করে কথিত যুগটার পরিস্থিতিও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের পূর্ববর্তী আলোচনার রীতি-নীতি এক্ষেত্রেও অঙ্গীভূত করতে যেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যায়। বিশ্বটা বড্ড জটিল জায়গা। হাজার হাজার ঘটনা তাতে ক্রিয়া করে। তাদের আন্তসম্পর্ক ও আন্তক্রিয়া উদঘাটন সহজ নয়। এককেন্দ্রিক আলোচনায় তা সম্ভব নয়। অথচ মার্ক্স তাই করেছেন। কেবলমাত্র ইতিহাসের একদেশদর্শী ব্যাখ্যা দিয়েই মার্ক্স সবকিছু উদ্ভাসিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাতে তাঁর বিশ্লেষণ অতি সহজ হয়ে পড়েছে। তেমনি সাধারণ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। এই কারণেই হয়ত তাঁর ভবিষ্য-দ্বাণী সত্য হতে পারেনি। অথবা তাঁর প্রদত্ত তত্ত্ব ইতিহাসের আসল গতিধারা চিহ্নিত করতে পারেনি। পরবর্তীকালীন ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে।

২. উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব

মার্ক্স অতীতকে ঘেঁটেছেন। তবে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য বর্তমানকে নিয়ে। তিনি বিপ্লবী। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেয়া তাঁর লক্ষ্য।

৭. দেখুন, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম ভাগ।

অতীত তাঁর জন্য পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছে। তিনি চান বর্তমানকে ঘেটে দেখতে। তার আকৃতি-প্রকৃতি ও মুখোশ মেলে ধরতে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিনাশের কারণসমূহ খুঁজে বের করতে।

মার্ক্স উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব দিয়ে এই কাঠামো তৈরী করেন। এই ছকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ বিশ্লেষণ করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ, তাঁর মতে দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে রয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী। উৎপাদনের সব কল-কব্জা তাঁদের আয়ত্তে; অন্যদিকে শ্রমিক-দল। তাদের আছে মাত্র শ্রম-শক্তি। এই শক্তি বেচে তারা অর্জন করে। বিদ্যমান শ্রম শক্তি ও উৎপাদন-উপকরণ (যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল ইত্যাদি) এই দুয়ে মিলে উৎপাদন ঘটায়। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ অধিক। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং যন্ত্রপাতি–সংভার বজায় রাখতে যা প্রযোজন, তদপেক্ষা ফলন বেশী। তার মানে অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত ঘটে। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে তার ন্যূনতম চাহিদা যুগিয়ে এবং উৎপাদনী-উপকরণের মূল্য পুষিয়ে বেশ কিছুটা বাঁচে। এই বাড়তিটুকুকে মার্ক্স বলেছেন 'উদ্বৃত্ত মূল্য'। এই উদ্বৃত্তের ভাগীদার পুঁজিপতি। নীট মুনাফা, সুদ ও খাজনা হিসেবে সে তা পায়। মার্ক্স কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্যের এই বিশ্লেষণ অনেকটা ক্লাসিক্যাল লেখকদের উদ্বৃত্ত ধারণার অনুরূপ। তিনি মোটামুটি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগিয়েছেন।[৮]

এই উদ্বৃত্তটুকু কিভাবে ঘটে? আর কেনই বা পুঁজিপতি তা পান? খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মার্ক্স বলেন, পুঁজিপতি শ্রমিককে খাটায়। শ্রমিক পুঁজিপতির অন্য উপকরণের সাথে মিলে উৎপাদন ঘটায়। কিন্তু, শ্রমিকের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য সে তার মূল্য অপেক্ষা অধিক ফলায়। এই যে বাড়তিটুকু সে ফলায় তাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত। আর এই উদ্বৃত্তের মজা লুটে পুঁজিপতি। শ্রম-শক্তির মূল্য "নির্ধারিত হয় অন্য জিনিসের মত করেই। তা নির্ধারিত হয উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে। পরিণামে শ্রমিকের জন্যও নিয়ন্ত্রিত হয় এইভাবে। .... অন্য কথায়, শ্রম-শক্তির মূল্য মানে শ্রমিকের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়

---

৮. মার্ক্স নিজেও উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস খুঁজে বেড়িয়েছেন ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের লেখায়। দেখুন **G. A. Bonner** ও **Emile Burns** অনূদিত **Marx**-এর **Theories of Surplus Value, Lawrence and Wishart, London, 1951.**

দ্রব্যাদির মূল্য।[৯] আসল মজুরী শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান হয় কি করে? মার্ক্স এই সমস্যার সমাধানে "শিল্পকাজে পশ্চাৎভাগে অবস্থানরত শ্রমিক" (Industrial reserve army) প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে সাকুল্য কর্ম-সংস্থান নিয়ন্ত্রিত হয় মূলধনী-সংভার ও প্রযুক্তিক-বিদ্যা অনুসারে। প্রযুক্তিক বিদ্যার বিদ্যমান আঙ্গিকে মূলধনী সামগ্রী শ্রমিকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এদিকে, সব সময়েই কর্ম অপেক্ষা কর্মী বেশী হয়। অর্থ্যাৎ পুঁজিসামগ্রী খাটিয়ে যে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয় তা পুরো শ্রমশক্তিকে অন্তরিত করে নিতে পারে না। ফলে কিছুটা শ্রমিক বেকার থেকে যায়। এই অতিরিক্ত শ্রম মানে শিল্পকাজে নিরত পশ্চাৎভাগে বেকার অবস্থানরত শ্রমিক। তারা নিয়োজিত শ্রমিকের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে মজুরী ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসে।[১০]

কাঁচামাল ও মূলধনী সরঞ্জাম থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় কি? উৎপাদনে এরাও যে সহযোগী। মার্ক্স বলেন, না, পাওয়া যায় না। কাঁচামাল ও যান্ত্রিক সরঞ্জামে উদ্বৃত্ত ঘটতে পারে না। প্রকৃতি একাকী কিছু ফলাতে পারে না। মানব হাতের পরশ পেয়ে তবেই তা 'স্বর্ণফসল' ফলাতে পারে। অন্যথায় নয়। এই যেমন, ভূমি, জল কি বাতাস। এমনিতে এরা ফলন দিতে পারে না। কিন্তু, যেই মানুষ হাতে তুলে নিল অমনি ফসল ফলতে থাকে। কাঁচামাল পূর্ব-শ্রমপ্রসূত। মূলধনেরও অবদান বটে। শ্রমিক এই কাঁচামাল কাজে লাগায়। কিন্তু তারা তাদের মূল্যের অধিক অবদান দিতে পারে না অর্থাৎ সর্বশেষ ফলনে তাদের দান তাদের মূল্যের আনুপাতিক হয়। অধিক হতে পারে না। কিন্তু, তাদের মালিক উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়। সে পুঁজিপতি। বিক্রি করে অন্য পুঁজিপতির কাছে যে এগুলো কাজে খাটিয়ে উৎপাদন ঘটায় এবং ক্রেতা যেহেতু উৎপাদনে লাগায় সেহেতু সে দেয় মূল্যের অধিক

৯. Frederick Engels সম্পাদিত Karl Marx, Capital, Charles H. Kerr & Co., Chicago, 1926, 1, 189-190. এখন থেকে উল্লেখ করা হবে Marx, Capital বলে।

রিকার্ডোর মত মার্ক্স ও শ্রম-মূল্য তত্ত্ব গ্রহণ করেন। এ নিয়ে বিশদ জানতে হলে আলোচনা করতে পারেন Joan Robinson-এর An Essay on Marxian Economics, Macmillan & Co. Ltd, London, 1949.

১০. অতিরিক্ত শ্রম দেখা দেয়ার যে সমস্ত কারণ মার্ক্স দেখিয়েছেন এগুলো পরবর্তী ভাগে আলোচনা করা হবে।

পায়না। মার্ক্স স্বীকার করেছেন বটে যে উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি হয়ত কিছুটা উদ্বৃত্তি দিতে পারে। তবে যে শ্রমিক এই যন্ত্রপাতি চালায় উদ্বৃত্ত-মূল্য তার থেকে উৎসারিত, যন্ত্রপাতি থেকে নয়।

অর্থনীতিতে উৎপাদিত মোট উৎপন্ন তিনটি বিষয়ের সমাহার। নির্দিষ্ট সময়কালে। বিষয়গুলো হচ্ছে ধ্রুব মূলধন (ধ) অর্থাৎ উৎপাদনে ব্যয়িত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির মূল্য,; চলতি মূলধন (চ) মানে নির্দিষ্ট সময় পরিক্রমায় ব্যবহৃত শ্রম-শক্তির মূল্য এবং উদ্বৃত্তমূল্য (উ)। মোট মূল্যের অঙ্গিভূত এই তিনটি বিষয় দিয়ে মার্ক্স তিনটি অনুপাত গড়ে তোলেন। উ/চ, হচ্ছে শোষণ-হার। তাঁর মতে শ্রমিক নিজ প্রয়োজন মিটাবার জন্য কতক্ষণ খাটে। বাকী সময় খাটে উদ্বৃত্ত মূল্য জন্ম দেওয়ার জন্য। এই অনুপাত দিয়ে ভাগটুকু বোঝানো হচ্ছে। মনে করুন উ/চ এক ইউনিট বা ১০০ ভাগের সমান। সুতরাং শ্রমিক এর অর্ধেক সময় খাটে নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাবার জন্য। বাকী অর্ধেকটুকু খাটে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করায়। ধরা যাক ধ্রুব ও চলতি মূলধন নির্দিষ্ট সময় পরিক্রমায় একবার আবর্তিত হয়। তাহলে উ/(ধ+চ) অনুপাত মোট নিয়োজিত মূলধনের 'মুনাফাহার'। ধ্রুব ও চলতি মূলধনের সম্বন্ধ অর্থাৎ ধ/চ অনুপাত মার্ক্স-এর ভাষায় 'পুঁজির আঙ্গিক গঠন' (Organic Composition of capital)। কোন কোন লেখক এটাকে ধ/(ধ+চ) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

পুঁজিপতির উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা। শোষণ হার বাড়িয়ে তা সাধন করতে হয়। তিনভাবে তা হতে পারে। প্রথমতঃ, কার্যকাল (দিনের হিসাবে) বর্ধিত করে। মনে করুন শ্রমিক তার প্রয়োজন মিটাতে ৪ ঘণ্টা খাটলেই যথেষ্ট। এই চার ঘণ্টার অধিক যতটুকু খাটানো যায় ততটুকুই পুঁজিপতির লাভ। তার পাওনা উদ্বৃত্ত মূল্য সেই হারে বেড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিককে তার ন্যূনতম প্রয়োজনের কম প্রদান করে তা সাধিত হতে পারে। কিন্তু, বেশীদিন ধরে তা করার জো নেই। কিছুকাল হয়ত করা যেতে পারে। কেননা, শ্রমিক তার ন্যূনতম মজুরী না পেলে বাঁচতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়ে তা হতে পারে। তজ্জন্য অবশ্য প্রযুক্তিক-জ্ঞানে উন্নতি ঘটিয়ে নিতে হবে। উন্নত উৎপাদন-প্রণালী মোট উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ফলে মোট উৎপাদন ও শ্রমিকের পাওনায় বিভেদ বেড়ে যায়। বাড়তিটুকু পুঁজিপতি পায়।

উৎপাদন-আঙ্গিকের আলোচনায় মার্ক্স ও রিকার্ডোর মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রিকার্ডো প্রযুক্তিক-জ্ঞান সম্প্রসারণকে তেমন আমল দেননি। স্থবির পর্যায়কে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। হয়ত ক্ষণকাল আটকে রাখতে পারে। মার্ক্স-এর চোখে কিন্তু উৎপাদন-প্রণালীর গুরুত্ব সমধিক। তাঁর মতে প্রযুক্তিক-বিদ্যা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন প্রযুক্তিক-জ্ঞানের এই দ্রুত বর্ধনের ফলেই পুঁজিবাদী সমাজ অবশেষে ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয়।

মার্ক্স মনে করেন প্রযুক্তিক-জ্ঞান দ্রুতহারে বেড়ে যায় বলে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে অধিক সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে শ্রমিক-পিছু যন্ত্রপাতির পরিমাণ বেশী হয়। অর্থাৎ উৎপাদন অধিক মূলধনভিত্তিক হয়ে উঠে। যন্ত্রপাতিতে এই সম্প্রসারণের অধিক পুঁজি-দ্রব্যাদি প্রয়োজন। তাই চাই পুঁজিপতির জন্য অধিক হারে মূলধন। মূলধন আসবে কোত্থেকে? সঞ্চয় থেকে। কাজেই, ধনকুবের উদ্বৃত্ত-মূল্য সবটা খেয়ে বসতে পারে না।

মার্ক্স—এর মতে, পুঁজিপতি শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াতে সদা-সচেষ্ট থাকে। কেননা, কেবল এই পথেই সে অধিক উদ্বৃত্ত পেতে পারে। অন্য যে দুটো উপায় রয়েছে এগুলো নিয়ে বেশী টানাহেচড়া করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, নতুন যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে সে অন্য পুঁজিপতিদের উপর অনেকটা সুবিধা পায়। চট্ করে তার উৎপাদন-ব্যয় নেমে আসে। অথচ দাম তত সহজে পড়ে না। অন্যান্য পুঁজিপতি তার পদাঙ্ক অনুসরণে এগুলে তবেই কেবল ধীরে ধীরে দর নেমে আসে। কাজেই, যে পুঁজিপতি নব উৎপাদন-প্রণালী সর্বাগ্রে প্রবর্তিত করতে পারে। সে বেশ একটু অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নিতে পারে। কাজেই, পুঁজিপতিদল সদা-সর্বদা সজাগ থাকে কি করে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে কাবু করা যায়।

পুঁজিপতি অবশ্য এমনিতেও বসে থাকে না। বিদ্যমান উৎপাদন আঙ্গিকেও অধিক মুনাফা অর্জনের পথ খুঁজে বেড়ায়। উৎপাদন পরিমাণ বাড়িয়ে তা সাধন হতে পারে। তাই সে সদানিয়ত চেষ্টায় থাকে উৎপাদন বাড়াতে। তা করতে হলে শ্রমিক ব্যয় বেড়ে যায়। কাঁচামাল অধিক কিনতে হয়। যন্ত্রপাতি বেশী কাজে লাগাতে হয়। অর্থাৎ অধিক মূলধন খাটাতে হয়। তার মানে অর্জিত আয় বিনিয়োজিত করতে হয়। ধনতান্ত্রিক কর্ম-পন্থার এই হল আসল রূপ। তাই মার্ক্স বলেন, "সঞ্চয় আর সঞ্চয়। এই তার ভগবান এই তার ধ্যান"।[১১]

১১. Marx, Capital, 1, পৃঃ ৬৫২।

৩. ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি

উপরোক্ত পটভূমিকায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন-অগ্রগতির মার্ক্সীয় মতবাদ একত্রীভূত করা যাক। ধনতান্ত্রিক সমাজ ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ। পুঁজিপতিরা ভূম্যাধিকারীদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পুঁজিপতিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ধনতন্ত্রের মূলকথা। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ সম্পর্কে বলতে যেয়ে মার্ক্স বেশ জোরের সাথে ঘোষণা করেন "এক্ষণে অবলোকন করার বিষয় শ্রমিক তার নিজের জন্য খাটছে তা নয়। বরং পুঁজিপতি অসংখ্য শ্রমিককে শোষণ করছে তা। শ্রমিক শোষিত হচ্ছে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফল হিসাবে। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। লোপ পায় হাজার হাজার ক্ষুদ্রকায় শিল্পসংস্থা। এক পুঁজিপতি অসংখ্য পুঁজিপতিকে গ্রাস করে নেয়। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। অন্যদিকে, শ্রমিক দল সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়া অধিক বিজ্ঞানভিত্তিক হয়। প্রযুক্তিক বিদ্যা এগিয়ে যায়। চাষাবাদ প্রণালী উন্নততর ও রীতিসিদ্ধ হয়। শ্রমিকের কার্যকলাপে রূপান্তর ঘটে। শ্রমিক কেবলমাত্র উৎপাদনী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন উপকরণে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। সমস্ত বিশ্ব জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিশ্ববাজার উন্মুক্ত হয়। বিশ্ববাসী সবায় প্রবাহমান ধারায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এই হল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। তার আন্তর্জাতিক রূপও এতে বিধৃত। ধনকুবেরেব সংখ্যা আরও কমে আসে। পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা তাদের আয়ত্তে চলে আসে। অন্যদিকে, দুঃখ-দুর্দশার পরিমাণ বেড়ে চলে। অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তীব্রতর হয়। অপ্রতিহত গতিতে শোষণ চলে। নির্যাতন-নিগ্রহ গাঢ়তর হয়। শ্রমিক শ্রেণীও বসে নেই। অবস্থার পীড়নে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠে। অসহনীয় মনোভাব জন্ম নেয়। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালী দানা বাধে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে চলে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে পতিত হয়ে শ্রমিক একতাবদ্ধ হয়। নিয়মতান্ত্রিক হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠে। এই সবই ঘটে ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশের অবধারিত পরিণতি হিসাবে। অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে উৎপাদন-ভূষকে নবতর আঙ্গিকে জন্ম দেয়। তার ছত্রচ্ছায়ায় তার উৎপত্তি। সম্প্রসারণও বটে। অথচ অবশেষে ইহাই হয়ে দাঁড়ায়

তার গলার ফাঁস। উৎপাদান উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়ে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। শ্রমিক দল একতাবদ্ধ হয়ে হয়ে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, উভয়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। প্রবাহিত ধারা অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠে। ধনতান্ত্রিক পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠে। তার বহিরাবরণ খসে পড়তে শুরু করে। অবশেষে তার বিনাশ প্রথা আরম্ভ হয়ে যায়। খোলস ভেঙ্গে পড়ে। ব্যক্তিগত মালিকানা উবে যায়। শোষকশ্রেণী নিঃশেষিত হয়ে যায়।"[১২]

এমতাবস্থায় বাণিজ্যিক পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠে। ঘনঘন সঙ্কট দেখা দেয়। আস্তে আস্তে তীব্রতর হয়। সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরে। এই সবই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা হেতু। বস্তুতঃ তার বিকাশের মধ্যেই তার বিনাশের বীজ নিহিত। সে যাই হউক, পারস্পরিক সঙ্কট ঘটাকালে কোন একটা পর্বে সর্বশেষ আঘাত আসে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যায়।

আলোচনার সুবিধার্থে মার্ক্স-এর বিশ্লেষণকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া যাক। মার্ক্স বলেন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-আঙ্গিকে দুই জাতীয় শক্তি ক্রিয়া করে। একদিকে স্বল্পকালীন তথা চক্রাকার শক্তিনিচয়। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন 'প্রভাবাবলী' (laws)। এই দুই ভাগকে আলাদা করে দেখা হবে। তার দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণকে তিনটি নীতি বা তত্ত্বে চিহ্নিত করা যায়, যথা (১) শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি, (২) অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং (৩) মুনাফাহারে ক্রম হ্রাস। অবশ্য এরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। তাই এদেরকে একত্রে আলোচনা করা হবে।

মার্ক্সীয় তত্ত্বের মধ্যমনি পুঁজিপতি শ্রেণী। তারা পুঁজিবাদের জন্মদাতা। শ্রমিককে চুষে এটি সাধন করে। উৎপাদন-উপকরণ পুরোপুরি তাদের আয়ত্তে চলে আসে। শ্রমিকের হাতে থাকে কেবল তার কর্মশক্তি। পুঁজিপতি সচেষ্ট হয় উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াতে। কারণ এটা যে তার প্রাপ্য। শুধু তাই নয়—এই উদ্বৃত্ত দিয়ে জীবনযাত্রার মান যেমন অচিন্তনীয়ভাবে বাড়াতে পারে, তেমনি সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। পুঁজি বাড়িয়ে, শ্রমসংখ্যা সমপ্রসারিত করে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়। আর এই উদ্বৃত্ত আয় থেকে পুঁজি গঠন আরও তীব্রতর হয়। অতিরিক্ত শ্রম পাওয়া যায় জনসংখ্যা বর্ধনের ফলে।

১২. **Marx, Capital,** পৃ: ৮৩৬—৮৩৭।

আর জনসংখ্যা বর্ধন ঘটে যেহেতু "স্বাভাবিক মজুরী (শ্রমিক-শ্রেণীর) ভরণ-পোষণে যথেষ্ট হয়ে তার বর্ধনেও সহায়তা করে।"[১৩]

মজার কথা, মার্ক্স বলেন, ধনসম্পদ ঘনীভূত হওয়ায় জনসংখ্যা বর্ধন স্পৃহা হালে বাতাস পায়। অবশ্য ধারণভিত্তিক প্রযুক্তিক আঙ্গিকে (given state of technology)। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, লগ্নী-ক্রিয়া পুরোদমে চলাকালে শ্রমিকের চাহিদা জনসংখ্যার স্বাভাবিক বর্ধন অপেক্ষা অধিক হতে পারে। ফলে, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যেতে পারে। অবশ্য মজুরী একাধারে বেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। ঐ বাড়া থেকেই প্রতিরোধক শক্তি জন্ম নেবে। কারণ, মজুরী দ্রুত হারে বেড়ে যাওয়া মানে পুঁজি-গঠন ব্যাহত হওয়া এবং তাহলে শ্রম-চাহিদা হ্রাস পাবে।[১৪] এদিকে বাড়তি মজুরী বিয়ে-সাদীর ধুমধাম লাগিয়ে দেয়। ফলে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলে। মার্ক্স-এর এই বর্ণনা দেখে মনে হয় যেন ম্যালথুশীয় জনসংখ্যাতত্ত্বে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা ম্যালথাসের ধারণার অনেকটা কাছাকাছি।

শ্রমিক নিয়ে তাঁর আলোচনা এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও এগিয়ে গিয়েছেন। ম্যালথুশীয় ধ্যান-ধারণাকেও তেমন বেশী পাত্তা দেননি। মজুরী-নীতিতে 'লৌহ-নিগড়ে বাধা আইন' নেই বটে। তবে মজুরী হার সাধারণতঃ ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার উর্ধ্বে থাকবে। শুধু তাই নয়, মার্ক্স আরও বলেন, "ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আকার-কাঠামো আপন রূপ পরিগ্রহ করে উঠলে, কেন্দ্রীভূত হওয়ার এক পর্যায়ে শ্রমিক-উৎপাদিকা শক্তি সবচেয়ে ক্ষমতাশীল সংগঠন হিসাবে প্রতিপন্ন হবে।"[১৫] অন্যকথায় মার্ক্স বলতে চান যে প্রযুক্তিক উন্নয়ন-অগ্রগতি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসানের ভিত্তি হিসাবে ক্রিয়া করবে।

---

১৩. Marx, Capital, পৃঃ ৬৩৬। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মজুরী একেবারে নিম্নতর পর্যায়ে নেমে আসে না। অর্থাৎ প্রকৃত মজুরী এমন পর্যায়ে নেমে আসে না যে বিদ্যমান শ্রম-শক্তিকে খাইয়ে-পরিয়ে কিছুই বাঁচে না। কিছুটা বাচে বটে এবং শ্রমশক্তি এ দিয়ে সম্প্রসারিত হতে পারে।

১৪. ঐ, পৃঃ ৬৭৯।

১৫. ঐ, পৃঃ ৬৮১।

প্রযুক্তিক-অগ্রগতি সাধন করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়িয়ে নেয়। শ্রম কম লাগে এমন উদ্ভাবনী আবিষ্কার দিয়ে শ্রমিক থেকে অধিক ফায়দা আদায় করে নেয়। অর্থাৎ কম শ্রমিক নিয়োগ করে অথচ নিয়োজিত শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময় খাটিয়ে অধিক উৎপন্ন করে নেয়।

সবায় মিলে সেই উদ্ভাবনী আবিষ্কার গ্রহণ করে নিলে তৈরীকৃত দ্রব্যের দাম নেমে আসে। এর থেকে বোঝা যায় কতটুকু শ্রমিক কাট্-ছাট করা হয়েছে। কিন্তু, যদি কোন একজন পুঁজিপতি ব্যয় হ্রাসকারী উদ্ভাবন প্রণালী পেয়ে যায়, তাহলে দাম না কমিয়ে শ্রমিক উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারে। তেমনি অধিক লাভের ভাগীও হতে পারে। কারণ, বাজারে তার অবস্থান এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। শত শত উৎপাদকের সে একজন মাত্র। কিন্তু, বেশীদিন মজা লুটার জো নেই। অচিরেই অন্য সবায় তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে আসবে। প্রথমতঃ, অতিরিক্ত লাভের আশায় এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টায়। তা না হলে যে অধিক উদ্যোগীদের ঠেলায় সে পাড় পাবে না। বস্তুতঃ অনেকের ভাগ্যে তাই ঘটে থাকে। শত চেষ্টায়ও টিকে থাকতে পাবে না। ফলে, অচিরে দেউলিয়া হয়ে বসে। স্থান পায় সর্বহারাদের দলে। তাদের সম্পদ চলে যায় ভাগ্যবানদের করতলে। ফলে ধনকুবেরের সংখ্যা আরও সীমিত হয়ে উঠে।

এই টানাটানির অপর পরিণতি শ্রমিক শ্রেণীতে উদ্বৃত্ত দেখা দেওয়া। নিরন্তর সম্পদ হস্তান্তরিত হতে থাকায় শ্রম-প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। অথচ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

"শ্রমিকদল যন্ত্রের ন্যায় হয়ে উঠে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রপাতিব আকারে পুঁজিতে স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঘটে। আব এদিকে শ্রমিকের ভাত মারে। পুঁজিতে সম্প্রসারণ আর শ্রমিক সংখ্যার বিতাড়ন সমানুপাতিক হয়। ...... যন্ত্রপাতির ঠেলায় শ্রমিকের এই অংশটুকু বাহুল্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ উৎপাদন-খাতে আর স্থান পায় না। স্রোতেব শেওলা হয়ে ভেসে বেড়ায়, না হয় চারু-কারুশিল্পে স্থান করে নিতে চায়। নতুবা শ্রম-বাজারে ছেয়ে পড়ে। পরিণামে শ্রম-শক্তির দাম তার মূল্যের নিম্নে দাবিয়ে দেয়।"[১৬]

সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা স্থিতিহীন ও বিস্ফোরণধর্মী। নিজেকেই সে নিজে গ্রাস করে বসে। ছাইভস্মের ন্যায় শ্রমিককে উড়িয়ে দেয়। অথচ

১৬. প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৪৭০।

খাতির করে না এতটুকু। শ্রমিক-ছ্ঁাটাই-উপযোগী উদ্ভাবনী আবিষ্কার ঘটিয়ে চলে একাধারে। ফলে শিল্পকাজে পশ্চাৎভাগে অবস্থানরত শ্রমিকশ্রেণীর (অর্থাৎ বেকার শ্রমিক) বেলুন ফাঁপিয়ে দেয়। তার সাথে জনসংখ্যা বেড়ে অবস্থা অসহনীয় করে তোলে। বড় বড় ধনকুবের হাজার হাজার শৌল-গজার গ্রাস করে নেয়। দক্ষ শ্রমিক তাড়িয়ে দেয় নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি। আর যারা বা টিকে থাকে তাদের ভাগ্যে মেলে নুন-ভাত। সইতে হয় জ্বালা-যাতনা। ভোগতে হয় একগেয়ে জীবনের নিরানন্দময় তাল-লয়-মাত্রা। এ অবস্থা আরও অসহনীয়। এদিক বেকারী শ্রমিক কাজের ধান্ধায় চক্ষে সর্ষেফুল দেখে। চাকুরীরত শ্রমিকের সাথে নিরন্তর প্রতিযোগিতায় রত থাকে। পুঁজিপতি মওকা পেয়ে যায়। মজুরী কমিয়ে কমিয়ে উপোষ-পর্ব পর্যায়ে নিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, কর্ম-সময় বাড়িয়ে দেয়। শোষণের সর্বপ্রণালী গ্রহণ করে। আপন পেট ফোলাবার চিন্তিত-অচিন্তিত হাজারো কায়দা বের করে। অন্য পুঁজিপতিকে প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দেয়ার নিমিত্তে নারী-শিশু নির্বিচারে নিয়োগ করে চলে। নর অপেক্ষা তাদের মাইনে যে কম দিতে হয় তাই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নর-নারী পথের ভিখারী (**Proletariat**) হয়ে দাঁড়ায়।

পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে যেতে থাকে। তাদের পরস্পর ধাক্কাধাক্কি তীব্রতর হয়। মুনাফাহারে হ্রাস পেয়ে তা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়। এদিকে উদ্বৃত্তে কিন্তু কমতি নেই। তা বরং বেড়ে যায়। কারণ মোট উৎপাদনে যে সম্প্রসারণ ঘটে। মার্ক্স বলেন, নব নব উৎপাদন-আঙ্গিক সংযোজনেব ফলে পুঁজির আঙ্গিক-গঠন অর্থাৎ ধ/(ধ- + চ) সম্প্রসারিত হয়। মার্ক্স মন্তব্য করেন, তার থেকে বোঝা যায় যে মুনাফা-হার হ্রাস পায়।

মার্ক্স এই রূপরেখার কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন, কতকগুলো বিষয় বিপরীত-শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। তবে এরা তেমন শক্তিশালী নয়, প্রযুক্তিক অগ্রগতির প্রকৃতি তন্মধ্যে একটা। L প্রকৃতিগত কারণে "ধ্রুব মূলধন খরচা হ্রাস পেতে পারে।" অর্থাৎ প্রতি ইউনিট উৎপাদনে স্থায়ী খরচা কম হয় এবং তা উদ্ভাবন-আবিষ্কার উৎসারিত। অন্যদিকে শ্রমিককেও হয়ত অধিক দক্ষ করে তুলতে পারে। কেননা, যন্ত্রপাতি চালনা করা হয়ত তখন সুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। লাভের হার কমে যায়। ফলে পুঁজিপতি বে-পরোয়া হয়ে উঠে। হার বাড়াবার জন্য

উঠে-পড়ে লাগে। কার্যকাল বাড়িয়ে দেয়। দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ায়। মজুরী হার কমাতে সচেষ্ট হয়। এই সবের সোজা অর্থ দাঁড়ায় শোষণ-হার অধিক হয়। অন্যদিকে, চুনোপুটি পুঁজিপতি-দেরকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য রাঘববোয়ালরা চেষ্টা চালাতে থাকে এবং অনেকাংশে স্বার্থক হয়। ফলে একত্রীকরণ আরও অধিক হয়। পুঁজিপতি সংখ্যা আরও হ্রাস পায়। পুঁজির আকার-প্রকারে রূপান্তর ঘটে। ফলে মুনাফা হার আরও হ্রাস পায়। পুঁজি আকার-প্রকারে রূপান্তর ঘটে। ফলে মুনাফা-হারে আরও পতন ঘটে। মুনাফা হারের এই ক্রম-অধঃপতন সঞ্চয় হারে অধঃপাত ঘটায়। ফলে পুঁজি-সংগঠন হারে কমতি দেখা দেয়। অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থবির পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যায়, পরিণামে পুঁজিবাদ ব্যবস্থার ভিত্ ধ্বসে পড়ার অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

মার্ক্স-এর দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা ও চক্রাকার বা স্বল্পমেয়াদী আলোচনা আলাদা করে দেখা হল। তাতে চক্রাকার হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপা-রটা হয়ত আমাদের আলোচনায় তেমন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেনি। অথচ তার গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কম নয়। মার্ক্স বলেন, চক্রাকার উঠানামা ধনতন্ত্রের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। তা তার অঙ্গীভূত অংশ। অবশ্য তাঁর এই আলোচনা তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাহলেও তাঁর বিশ্লেষণ থেকে সঙ্কটের তিনটা কারণ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণগুলো হচ্ছে : ক্রমহ্রাসমান মুনাফাহার, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় অসমান অগ্রগতি এবং উন-ভক্ষণ (under consumption)।

মার্ক্স-এর বিশ্লেষণ থেকে মুনাফা হারে দীর্ঘকালীন অবনতি ও স্বল্পকালীন হ্রাস পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। অর্থাৎ এই দীর্ঘমেয়াদি পতন ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যকার সম্পর্ক তেমন স্পষ্ট নয়। পুঁজির আঙ্গিক-গঠনের গড়মেয়াদী সম্প্রসারণের ফলে মুনাফাহারে দীর্ঘকালীন হ্রাস ঘটে। কিন্তু, মুনাফাহারের এই ক্রম-পতন কোন বিশেষ সংকটের সাথে তেমন সম্পৃক্ত নয়।

মজুরীহারে বর্ধনহেতু লাভের হারে ভাঁটা পড়ে। মার্ক্স বলেন, এই ঘটনা অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বল্প-কালীন বিবেচনায় পুঁজি গঠন হয়ত বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে কিছুটা শক্ত থাকতে পারে। কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়ে গেলে তা আর সম্ভব নয়। পূর্ণ কর্মসংস্থার পর্যায় অবধি শ্রমিককে ন্যূনতম মজুরী

প্রদান করে সন্তুষ্ট রাখা যায়। কিন্তু, তারপর আর সম্ভব হয় না। কারণ পুঁজি সংগঠনের প্রবল প্রভাব মজুরী হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে, মুনাফা হারে হ্রাস ঘটে। এই হ্রাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পুঁজি-সংগঠন শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে সংকট মাথা উঁচিয়ে উঠে।

অন্য একটা ঘটনাও সংকট পথে অবদান রেখে যায়। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম একটু ঝিমিয়ে পড়ে। ফলে পুঁজিপতি দল হন্যে হয়ে ছুটে। বেপরোয়া কাজকর্ম চালাতে থাকে। ফটকাবাজারী শুরু করে। দূর-কল্পী প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হয়। কাল্পনিক পথে অগ্রসর হয়। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কাজ করে বসে। অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলে না। পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে এগোয় না। তাতে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠে। ফলাফল বিপরীত হয়। মারাত্মক ভুল-প্রমাদ দেখা দেয়। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের জন্ম ঘটে। এই পরিস্থিতির বর্ণনায় মার্ক্স বলেন, "শোষণমাত্রা নিম্নতম পর্যায়ের নিম্নে চলে গেলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-কাঠামোতে বিষম অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান প্রবাহে ভাঙ্গন ধরে। এলোপাতাড়ি হাওয়া বইতে থাকে। বন্ধ্যাত্ব পরিবেশ জন্ম নেয়। সংকটকাল দেখা দেয়। মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।"[১৭]

যে কোন কারণেই হউক, একবার সংকট দেখা দিলে আর কথা নেই। সবায় উতলা হয়ে উঠে। কারো আর তর সয় না। ঝাপিয়ে পড়ে নগদ টাকার (liquidity) জন্য। "....সর্বত্র আগুন ধরে যায়। নগদ টাকাই তখন কেবল মূল্যবান।"[১৮] লেগে যায় টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি, তাতে মুদ্রার বারটা বাজার যোগাড় হয়। তার ক্রিয়াকর্ম বাত্যাহত হয়। বিশেষ করে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। "পরিশোধ-পন্থা ভেঙ্গে পড়ে। ধারপ্রথা অস্বাভাবিক ঘনত্ব লাভ করে। ঋণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সংকট আরও গভীরতর হয়।"[১৯] ব্যাপকহারে কর্মী ছাঁটাই চলে। মজুরী কমিয়ে কমিয়ে উপোষ-পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ছোট ছোট পুঁজিপতি চক্ষে সর্ষেফুল দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শেষ রক্ষা করতে পারে না, ধ্বংস হয়ে যায়, তাদের পুঁজি হয় বিনষ্ট হয়ে যায়, না হয় বড়দের গহ্বরে ঢুকে পড়ে। এদিকে বিপরীত-শক্তিনিচয় তর পায়। অর্থাৎ মুনাফাহার

১৭. Marx, Capital, iii, পৃ: ৩০০।
১৮. ঐ i, পৃ: ১৫৫।
১৯. ঐ iii, ১৯৮।

বাড়তে শুরু করে। মজুরী যে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বহু মূলধন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ফটকাবাজারীও কমতে শুরু করে। তাতে বিনিয়োগ পরিবেশ কিছুটা সবল হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে ক্ষমতা লাভ করে। ফলে দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমুখী মোড় শুরু হয়।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বৈষম্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির অসমানতা। অর্থনীতির সকলক্ষেত্র সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে না। কতকগুলো দ্রুতহারে এগিয়ে যায়। কতকগুলো স্বল্প হারে। আবার অনেকগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই বৈষম্যের কারণ পুঁজিপতির বোকামি। তারা হিসাব-নিকাশে গোলমাল করে ফেলে। বাজার পরিস্থিতি ঠিকমত যাচাই করে নিতে পারে না। উল্টা-পাল্টা কাজ করে বসে। লেজে-গোবরে অবস্থার জন্য দেয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসংগতির জন্যই অবশ্য তা ঘটে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী বড্ড জটিল ও ঘোরপ্যাঁচালো। একক পুঁজিপতির পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। বাজার পরিস্থিতি তার তেমন জানা নেই। ফলে অতি সহজে অতি উৎপাদন ঘটে বসে। লাভ দিয়ে তা বিক্রি করা সহজ হয় না। ফলে অর্থনীতিতে হতাশাজনক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পরিণামে সঙ্কটের সূত্রপাত ঘটে।

এবারে মার্ক্স-এর উন বা ন্যূন ভক্ষণ তত্ত্ব খতিয়ে দেখা যাক। সবচেয়ে বিখ্যাত তাঁর এই তত্ত্ব। সঙ্কটকাল পর্যালোচনায়। 'সরবরাহ আপন চাহিদার জন্য দেয়' ক্লাসিক্যালদের এই মত তিনি নাকচ করে দেন। তাঁর মতে তা বোকামির নামান্তর। একটু বুদ্ধিমান লোক তা মেনে নিতে পারে না। "তা বালখিল্য গোঁড়ামি বৈ কিছু নয়। বিক্রি মানে কেনা, আর কেনা মানে বিক্রি; সুতরাং মুদ্দত বিক্রি আর মুদ্দত কেনা সমান—এই কথা মেনে নেয়া বালসুলভ বাতুলতা বৈ কিছু নয়। সর্বশেষ দ্রব্য তৈরী আর তার উপাদানাবলী তৈরীতে ব্যবধান অনেক। বেচাকেনা ব্যাপারটা তড়ি-ঘড়ি হয় না। এ দুই সম্পন্ন হতে প্রচুর সময় লাগে। ক্ষেত্র বিশেষে ফাঁক অনেক বেশী হয়। কাজেই এই সবের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ভেবে নিয়ে তাদের মধ্যে অদ্বিতীয়ত্ব বিরাজমান বলে মেনে নিয়ে ক্রিয়াকর্মে অগ্রসর হলে নিপতিত হয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের হা করা গহ্বরে।"[২০]

২০. Marx, Capital, i, পৃ: ১২৭—১২৮।

সুতরাং ঊনভক্ষণ থেকে সঙ্কট জন্ম নেয়। মার্ক্স তার বর্ণনা দিয়েছেন। ধনিক শ্রেণীর ভক্ষণ অভ্যাস সীমিত। আয়ের সাথে তাল মিলিয়ে সে ভোগ করে না। তার লক্ষ্য সঞ্চয়ে। মূলধন সম্প্রসারণে। অধিক হারে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতি-নীতি তা। আর এই রীতি-নীতির জন্মদাতা পুঁজিবাদ তন্ত্রের উৎপাদন প্রণালীর নিরন্তর রূপান্তর; মূলধনী সরঞ্জামের অবধারিত অবক্ষয়, পরস্পরধ্বংসী তুমুল প্রতিযোগিতা, উৎপন্ন দ্রব্যগুণের দিক থেকে উৎকৃষ্ট করার অদম্য স্পৃহা ও উৎপাদনের মাত্রাহীন সম্প্রসারণ। এই সবই প্রয়োজন পড়ে নিজকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং ভুল-ত্রুটির মাশুল যোগাবার নিমিত্তে।"[২১] আর এই যে উঠে-পড়ে দৌড়, মরি কি পড়ি অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে প্রতিযোগিতা, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সর্বহারাদের (Proletariat) সংখ্যা বেড়ে যায়। তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যা সম্প্রসারিত হয়। মজুরী নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে। এই সর্বনাশী বণ্টন প্রথার ফল হিসাবে একটা বিপরীতধর্মী মনোভাব জন্ম নেয়। এদিকে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে চলে। অথচ ভোগ স্পৃহা হ্রাস পায়। "ফলে এই দুয়ে বিভেদ দেখা দেয়। সঙ্কীর্ণ ভোগমাত্রায় সম্মুখীন হয়ে উঠে সম্প্রসারিত উৎপাদন পরিমাণ।"[২২] শ্রমিক বেশী খাইতে পায় না বা পারে না। কারণ তার আয় যে সীমিত। আর ধনিক সঞ্চয়ের প্রতি মুখ বাড়িয়ে আছে। জমাবার প্রতি তার অতি লোভ। ফলে আয়ের তুলনায় তার ভোগবিলাস তত নয়। পরিণামে ভোগমাত্রা যথোপযুক্ত হয় না। তাতেকরে ভোগদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প মূলধনী সাজসরঞ্জাম তৈরীকারী শিল্পের তৈরীকৃত পণ্যাদি হজম করতে হয়। ফলে, অতি উৎপাদন ঘটে এবং তা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর তার প্রকাশ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে অর্থনৈতিক জড়তায় ও বন্ধ্যাত্বে।

৪. উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

মার্ক্স আর তাঁর অনুসারীরা পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের উপরও জোর আরোপ করেছেন। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যকে দুষ্ট চরিত্র রূপে চিত্রায়িত করেছেন। মার্ক্স যুক্তি দেন যে গোড়াতে উপনিবেশ-বাদের সম্প্রসারণের ফলেই পুঁজিবাদ প্রথা শক্তিশালী হয়ে উঠে। দৃষ্টান্তভাবে

---

২১. Marx, Capital, iii, পৃঃ ২৮৬—২৮৭।
২২. ঐ, ২৮৭।

খুঁটি গেড়ে বসে। "আমেরিকায় সোনা-রূপার আবিষ্কার; আদিম অধিবাসীদের মূলোচ্ছেদ, দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ, তাদের ধনসম্পদ লুটে-পুটে নেওয়া; পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে তাদের ধনসম্পদ লুটে নেওয়া এবং আফ্রিকায় কালোচামড়ার ব্যবসা জুড়ে"[২৩] অগাধ ধন-সম্পত্তি জড়ো করা হয়। তা দিয়ে আদিতে পুঁজি গঠন করা হয়। আর সেই পুঁজিতে ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন। আর তারপর বিশ্ব-বাজার দখল করে তৈরী সামগ্রী বিক্রি করা। বাস্, হয়ে গেল। পুঁজিবাদ খুঁটি গেড়ে বসল।

অন্যদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশে বৈদেশিক বাণিজ্য এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পুঁজিপতি দেশগুলো শিল্পজাত দ্রব্য নিষ্কাশিত করার অপূর্ব সুযোগ পায়। অপরদিকে, অল্প ব্যয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সমগ্র সুবিধা নিজেদের আয়ত্তে আনার নিমিত্তে পুঁজিপতি দেশ উপনিবেশ গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হয়। উপনিবেশগুলোর উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। মার্ক্সবাদী মন্তব্য করেন যে, দরিদ্রদেশ চোষে স্বীয় পকেট ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে নেয়ার জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশ উপনিবেশ ব্যবস্থা দৃঢ় করে নেয় এবং সাজিয়ে-গুছিয়ে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে নেয়।

পুঁজিবাদতন্ত্র দ্রুত একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে নেয়। এই পর্যায়ে বিদেশী বাজার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের কাছে জড়ো হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠে। এই পর্বে সাম্রাজ্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তাই লেনিন বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ মানে পুঁজিবাদ। অবশ্য সেই পর্যায়ে যেই পর্যায়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচ্ছত্র হয়ে উঠে এবং মূলধন সর্বেসর্বা হয়ে বসে; .. যেই পর্যায়ে বিশ্ব আন্তর্জাতিক ট্রাষ্টে বিভাজিত হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং বিশ্বের সব দেশ বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়।"[২৪]

এই পর্বে এসে ধনিকতন্ত্রের প্রসার ক্রমাগত বন্ধ্যাত্বের সম্মুখীন হয়। মুনাফা হার হ্রাস পেয়ে পেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়। অতি-

---

২৩. Marx, Capital i, পৃঃ ৮২৩।

২৪. V.I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism in New Data for V.I. Lenin's Imperialism, Edited by E. Verga and L. Mendelsohn, International Publishers, New York, 1940, 194.

উৎপাদন অহরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোণঠাসা হতে থাকে। বহির্বিশ্বে পথ খুঁজে বেড়ায়। নিজকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠে। মূলধন নির্গম ঘটাতে থাকে। সেই সব অঞ্চলে যেথায় মূলধনপ্রসূত মুনাফা অধিক। এই চেষ্টা দিয়ে নিজকে অবশ্যম্ভাবী মরণের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। অতি উৎপাদন গোলাঘর থেকে বাইরে পাঠাবার প্রচেষ্টায় নিরত থাকে।

মূলধন-নির্গম জোরদার হয়। দরিদ্রদেশের উপর ধনীদেশের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। তবে সহজে নয়। বাধার সম্মুখীন হতে হয়। দরিদ্র-দেশবাসী সহজে পথ ছাড়ে না। নির্মম হাতে পুঁজিবাদী দেশ তা সংহার করে। শোষণমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। নিজের লাভের ভাগ অধিক ও সুনিশ্চিত করে। অন্যদিকে, অপরাপর পুঁজিপতি দেশকে হটিয়ে রাখতে চেষ্টা চালায়। অন্যরাও যে একই বিপদের সম্মুখীন। তারাও বসে নেই। ঠেলাঠেলি করে নিজেদের স্থান করে নিতে হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, নল-খাগড়ার প্রাণ যায় অর্থাৎ দরিদ্র দেশবাসী অধিক অত্যাচারিত হয়। অথচ লাভের ভাগী হয় না তেমন কিছুই। তাদের জীবনধারা ব্যাহত হয়। আচার-প্রথা বিনষ্ট হয়ে যায়। মূল্যবোধ লোপ পায়। চারু-কারু শিল্পের বিলুপ্তি ঘটে। সস্তাদরে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হয়। তার ঠেলায় কুটির শিল্পের টিকে থাকা দায় হয়। দেশবাসী উৎপাদনী-উপকরণ হারিয়ে বসে। "বিদেশী পুঁজি ও ট্রাষ্ট দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হারে ব্যবধান কমিয়ে দেয়া দূরে থাক, বরং বাড়িয়ে দেয়।"[২৫]

সে যাই হউক, শেষ রক্ষা কিন্তু করা সম্ভব হয় না। দু'দিন আগে আর পরে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বিনাশের বীজ যে তাঁর মধ্যেই নিহিত। ঠেকাবে কি করে? নিরন্তর দ্বন্দ্বে রত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্ববিরোধিতা অবশেষে তাকে গ্রাস করে বসে। কাজেই অনুন্নত বিশ্বে ব্যবসা-প্রতিপত্তি বিস্তার করে তাঁর অবধারিত অধঃপতন রোধ করা যায় না। কিছুকাল হয়ত ঠেকিয়ে রাখা যায়। দরিদ্র-বিশ্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগী করে নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। একে অন্যের ঘাড় মট্‌কাতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সবায় উদগ্রীব হয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়; সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এদিকে, ধনতান্ত্রিক

---

২৫. Marx, Capital, পৃঃ ২০৬

সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গন ধরে। তার দুর্বলতার লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে উপনিবেশ দেশগুলো জেগে ওঠে। তাদের মধ্যে সচেতনতার বাণ ডাকে। স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি পায়। জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হয়। পুঁজিবাদী সমাজের ভাঙ্গন তীব্রতর হয়। অবশেষে তার বিলুপ্তি ঘটে। জন্ম নেয় শ্রেণীহীন সমাজ বা সমাজতন্ত্রবাদ।

৫. মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের মূল্যায়ন

মার্ক্স বর্ণিত ধনতন্ত্রবাদের রূপরেখা নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। তাঁর অনুসারী লক্ষ লক্ষ। বিরুদ্ধবাদী অসংখ্য। তাঁর বিশ্লেষিত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি খুঁজেই শান্ত থাকেননি। বরং তার সার্বিক আঙ্গিকে আঘাত হেনেছেন। বলেছেন ধনতন্ত্রবাদের সর্ব অঙ্গে জরা-ব্যাধি বিদ্যমান। সর্বত্র বৈপরীত্ব বিরাজমান। ধনতন্ত্রের কানায় কানায় ধ্বংসের বীজ নিহিত। তার অলি-গলিতে বিনাশের বীজাণু লুক্কায়িত। কাজেই, কেউ ধনতন্ত্রবাদকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ধনতন্ত্রের অধঃপতন অবধারিত। ধনতন্ত্রবাদ মুছে যাবে। তার ধ্বংসস্তূপের উপর গজিয়ে উঠবে সমাজতন্ত্রবাদ এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে। স্বাভাবিক গতিতে ও নিয়মে। তারজন্য ধরপাকড় প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ক্রমহ্রাসমান বিধি নিয়ে টানা-হেচড়া। মার্ক্স বলেন, তাঁর যুক্তিতর্কের স্বতঃসিদ্ধতা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ নেই। তার সত্যাসত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ নেই। অবশ্যম্ভাবীরূপে তা ঘটবে। ধনতন্ত্রবাদের আসল রূপ বুঝতে চেষ্টা করুন। তাহলেই তার আপাতবৈসাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং অনুধাবন করা সহজ হবে কেন সময়ের করাল গ্রাসে তা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু, সময় বয়ে চলেছে। অনেককাল অতীত হয়েছে। মার্ক্সবাদী পুরোপুরি সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারেননি। তার শ্রম-তত্ত্ব অসম্পূর্ণ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। মার্ক্স শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান লাঞ্ছনার কথা বলেছেন। কিন্তু, তা হয়নি। অসাম্য বিদ্যমান রয়েছে বটে। তবে মার্ক্সবাদীর হারে নয়। বরং উল্টো গতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বরং বেড়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা হ্রাস পায়নি।

দ্বিতীয় পর্বে তা আলোচিত হবে।[২৬] মার্ক্স প্রযুক্তিক-বিদ্যাজনিত বেকারত্বে আহদা জোর প্রদান করেছেন। প্রযুক্তিক-জ্ঞান সম্প্রসারণের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত বেকারত্বের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তবে অর্থনীতির সর্ব-ক্ষেত্রে নয়। কাজেই, ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। সুতরাং স্থায়ী বেকারী দল জন্ম নেমে এমন মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। বরং প্রযুক্তিক অগ্রগতির নীট প্রভাব ভিন্ন রকম হতে দেখা যায়। তা পরিশেষে শ্রম-চাহিদায় হ্রাস না ঘটিয়ে বরং সম্প্রসারণ ঘটায়। কেননা, এই অগ্রগতির ফলে সাকুল্য চাহিদা বেড়ে যায়। বিনিয়োগে সংযোজন ঘটে। পরিণামে আয় বৃদ্ধি পায়।

মার্ক্স-এর বহু ভক্ত যুক্তি দেন যে মার্ক্স শ্রমিকের আপেক্ষিক পাওনা নিয়ে কথা বলেছেন। তার মোট পাওনা নিয়ে নয়। মোট পাওনা হয়ত বেড়ে যেতে পারে। ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হতে পারে। কিন্তু, তুলনামূলক বা আপেক্ষিক হিসাবে তা পড়ে যাবে। অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিকের আপেক্ষিক পাওনা অধিক হবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। কিন্তু, মার্ক্স-এর লেখা থেকে এ যুক্তিব সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদতন্ত্রে শ্রমিকেব প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায় না। তা জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়-তাব ধারে-কাছে সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই, এই দৃষ্টি থেকে দূরে চলে যাওয়ার মত মালমশলা মার্ক্সে পাওয়া যায় না। তদুপরি, মার্ক্স পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থাকে পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই ভাগে বিভক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতবাং, তাঁর অনুসারীদের উপরোক্ত বক্তব্য গ্রহণ করতে হলে তার এই বিভাজন ভেঙ্গে পড়ে। অর্থাৎ জাতীয় আয় এই দুয়ের মধ্যে বণ্টিত হয় বলে যে প্রতিপাদ্য দাঁড় করানো হয়েছে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে মার্ক্স যে তত্ত্ব উপস্থাপিত কবেছেন তা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সঠিক প্রতিপাদ্য। তিনি সুস্পষ্টভাবে ধনতন্ত্র বিকাশের ধারা অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সামনে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয়েছিল যে, প্রযুক্তিক অগ্রগতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বড় আকার ধারণ করতে বাধ্য। কিন্তু, এখানেও হিসাবে কিছুটা গড়মিল রয়েছে বৈকি। তিনি কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতার উপর অত্যধিক জোর আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বুঝতে ভুল করেছেন কি হারে

---

২৬. দেখুন, নবম পরিচ্ছেদ, প্রথম ভাগ।

এবং কতটুক পরিমাণে এই সমাহরণ প্রথা এগিয়ে যাবে। তাঁর বিশ্লেষণও তেমন সূক্ষ্ম কিছু নয়। সাদামাঠা কথায় মোটাবুদ্ধি যুক্তিতর্ক দিয়ে কাজ সারতে চেষ্টা করেছেন।

এবারে আসা যাক মুনাফা হারে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর যুক্তিতর্কের অনুধাবনে। শ্রীমতি রবিনশন এই সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন "মুনাফাহারে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা কিছুই উদ্ভাষিত করতে সক্ষম হয়নি।"[২৭] মার্ক্স মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের ফলে মূলধন-আঙ্গিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতার জন্ম নেয়। অর্থাৎ ধ/(ধ+চ) বেড়ে যায়। তার মানে শ্রমিক প্রতি পুঁজি-বিনিয়োগ অধিক হয়। মুনাফা-হার হ্রাস পায়।

প্রথমেই বলে নেয়া যাক যে, মার্ক্সের এই আলোচনায় একটা বৈপরীত্য গোড়াতেই লক্ষ্য করা যায়। মুনাফা-হার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য সঠিক হলে মজুরী হার নিয়ে তাঁর যুক্তিতর্ক বে-ঠিক হয়ে পড়ে। তিনি বলেছেন, প্রকৃত মজুরী ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে। তাই যদি হয় তাহলে মুনাফা হার নিয়ে তাঁর বক্তব্য সঠিক হতে পারে না। কেননা, শ্রমিক প্রতি পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে শ্রমিক অধিক উৎপাদনশীল হয়। শ্রমিক-উৎসারিত ফলন বেশী হয়। শোষণ হার সম্পর্কে তাঁর মত (যে তা ধ্রুব) মেনে নিলে বলা যায় যে, নীট উৎপাদন শ্রমিক ও পুঁজিপতিতে বণ্টিত হয়। পুঁজিপতি পায় মুনাফা, শ্রমিক পায় মজুরী এবং তা একটা নির্দিষ্ট হারে। সুতরাং, শ্রমিক বাড়তি উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশ পায়। তার অর্থ তার মোট প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বলা যায়, মার্ক্স এই তত্ত্ব উদঘাটনে প্রকৃত মজুরীর ধরন-ধারণ পুরোপুরি অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। মজুরী ধ্রুব হলে শোষণ হার বেড়ে যেতে বাধ্য। চাই কার্যকাল বাড়িয়ে দিক আর নাই দিক। উৎপাদন যে বেড়ে চলেছে। কাজেই শ্রমিকের পাওনা পূর্ববৎ থাকলে পুঁজিপতির পাওনা বেশী হতে বাধ্য। এদিকে উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে চলে। কাজেই উ/চ এর তুলনায় ধ/(ধ+চ) এমন ভাবে বেড়ে যেতে পারে না যে উ/(ধ+চ) পড়ে যাবে। অন্তত: তার যুক্তিতার্কিক কোন

---

২৭. Joan Robinson-এর An Essay on Marxian Economics, Macmillan and Co., London, 1949. পৃ : ৪২। পরবর্তী আলোচনা প্রায় সবটাই এই বই থেকে নেয়া।

ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই, বলা যায় যে মার্ক্স ক্রমহ্রাসমান মুনাফাহার নিয়ে তাঁর যুক্তিতর্কে ভুল করেছেন।

মার্ক্স-এর বাণিজ্য চক্র বিশ্লেষণ বেশ জোরালো। যুক্তিতর্ক বেশ বলিষ্ঠ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিন্তনে তা স্থায়ী অবদান হিসাবে চিহ্নিত হতে পেরেছে। এটুকু মেনে নিয়ে তার পর্যালোচনা করা যাক। তখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতির চক্রময় নক্সার স্বরূপ তেমন উদঘাটিত হয়নি। তেমনি তার যথাযোগ্য মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। মার্ক্স বলেন, চক্রময় হ্রাস-বৃদ্ধি পশ্চিমী দুনিয়ার অগ্রগতি ধারণ করেছে ঐতিহাসিকভাবে। তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রন্ধ্রে নিহিত। তার সম্প্রসারণে উজ্জীবিত মুদ্রাবিষয়াদির অবদান এক্ষেত্রে তেমন কিছু নয়। তৎপূর্ববর্তী চিন্তাধারা এটুকু অনুধাবনে সক্ষম হয়নি। ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা তার যথাযোগ্য গুরুত্ব স্বীকার করেনি। মেনে নেয়া গেল। কিন্তু তার পরেও যে কথা থেকে যায়। মার্ক্স-এর আলোচনাও যে তেমন সুষ্ঠুভিত্তিক নয়। খুব বেশী করে হলেও তাঁর চিন্তাধারা ইঙ্গিতবহ হিসাবে সম্মান পেতে পারে। বৈপ্লবিক কিছু বলে নয় বা নতুন দিগ্ দিশারী হিসাবে নয়। তাঁর আলোচনায় কার্যকরী চাহিদার কোন সুষ্ঠু তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি না ক্লাসিক্যালদের নাকচ করেছেন, না তা গ্রহণ করেছেন, এই বিষয়ে তাঁর মধ্যে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ দেয়া যাক, স্বল্পকালীন বিবেচনায় মুনাফা হারে হ্রাস সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করা যাক। সাময়িক কোন ঘটনার (যেমন নতুন বাজার আবিষ্কার) প্রভাবে পুঁজি গঠন জোরদার হয়। শ্রমিক-বেকারত্ব হ্রাস পায়। মজুরী বাড়ে। বাড়তি মজুরি মুনাফা কমিয়ে দেয়। ফলে মূলধন সরবরাহ সীমিত হয়। পুঁজি-সংগঠন শিথিল হয়ে উঠে। ফলে মজুরী হার নেমে যায়। বেকারত্ব বাড়ে।

এই হল তাঁর বক্তব্য। তা অনেকাংশে ক্লাসিক্যাল যুক্তিতর্কের ন্যায়। মার্ক্স-এর মতে পুঁজি-গঠন হ্রাস পায় বিনিয়োগ পরিবেশ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য নয়। বরং যেহেতু বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সরবরাহ কমে যায়। মোট উৎপাদন (ভোগ ও বিনিয়োগ সমাহার) সমান থাকে। কেবল বণ্টনে তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ তাঁর মতে মোট কার্যকরী চাহিদায় তেমন একটা ওলট-পালট ঘটে না। কেবল বিনিয়োগযোগ্য পুঁজিতে আপেক্ষিক ভাঁটা দেখা দেয়। যুক্তিটা ক্লাসিক্যাল স্থবির তত্ত্বের ন্যায় নয় কি? আমাদের ধারণা তাই। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সঙ্কট বিশ্লেষণে তা যথেষ্ট নয়।

সাকুল্য উৎপাদনে ভাঁটা না পড়ে পূর্ণাঙ্গ সঙ্কট দেখা দিতে পারে না। কাজেই মার্ক্স প্রদত্ত তত্ত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অংশত হয়ত সত্য। বাণিজ্য-চক্র বিশ্লেষণে তা যথেষ্ট নয়। অন্য একটা জরুরী বিষয়ও মার্ক্স উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, পুঁজি সংগঠন জোরদার হওয়ার ফলে শ্রম-চাহিদা বেড়ে যায়। তাতে টাকার হিসাবে শ্রমিক-মজুরী সমপ্রসারিত হয়। কিন্তু তাতে প্রকৃত মজুরী বেড়ে যায, এমন কথা সঠিক করে বলা যায় না। দরমাত্রা হয়ত বেড়ে যেতে পারে। তাতে শ্রমিক ও পুঁজিপতির আপেক্ষিক পাওনা সমরূপ থেকে যেতে পারে। সুতরাং তাঁর যুক্তিতর্ক নিয়েই বোঝানো যায় যে মুনাফা হার এমনকি আপেক্ষিক হারে পড়ে যাবে এই প্রতিপাদ্য স্থাপনেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

চলিষ্ণু, প্রবহমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি কালে পুঁজিপতিরা তাদের উৎপাদন হিসাব-নিকাশে মারাত্মক ভুল-ভ্রান্তি করে বসেন। মার্ক্স-এর এই বক্তব্য ও আলোকবর্তিকাধারী তেমন কিছু নয় বরং তিনি পুরানো মদ নতুন বোতলে সাজিয়ে নিয়েছেন---একথা বলা চলে। তাঁব এই আলোচনাও পুরানো ধাঁচপন্থী। মোটামুটি সবায় এই মত পোষণ করেন যে, হতাশা-বিভ্রান্তি দেখা দিতে পাবে। কোন কোন শিল্পে হয়ত তার আঘাত বেশ মারাত্মক রূপও নিতে পারে। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, কতকগুলো শিল্পক্ষেত্রে অতি-উৎপাদন কি ঊন-উৎপাদনের প্রভাবে অর্থনীতির সার্বিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং নিম্নমুখী মোড় নিয়ে চক্রময় মন্দার জন্ম দেবে। তা হওয়া স্বাভাবিক নয়।

অথচ মার্ক্স এই অনুকল্পেব আঙ্গিকে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করতে এগিয়েছেন। তিনি এ-ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কার্যকরী চাহিদায় দীর্ঘকালীন অপর্যাপ্ততা দেখা দিতে পারে না। কিন্তু, সে যাই হউক, তাঁর এই আলোচনাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং তা অস্পষ্ট, আভাসদানকারী ও ঘোলাটে।

মার্ক্স একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভোগ-অপর্যাপ্ততার ফলে সঙ্কট জন্ম নেয়। শ্রমিক পেতে পায় না---যেহেতু তার আয় কম। পুঁজিপতি সঞ্চয়ে অধিক আগ্রহী। কাজেই, তার ভোগও যথেষ্ট নয়। সুতরাং, এই কথা থেকে বোঝা যায় যে, সঞ্চয়ের ব্যাপারে পুঁজিপতির নজর মুনাফাহারের উপর নয়। লাভের ভাগ কম-বেশী যাই হউক, সে তার প্রবৃত্তি অনুসারে অধিক সঞ্চয় করে যাবে। একথা যদি সত্য হয়, তবে আর সমস্যা কোথায়? অধিক পুঁজি-সাজ-সরঞ্জাম উৎপন্ন হয়ে স্বল্প

ভোগদ্রব্য উৎপাদনের স্থান পূরণ দেবে। এক অর্থে এগুলো হবে পুঁজিপতিদের ভোগের নামান্তর। আর যদি বিনিয়োগ স্পৃহা মুনাফা হারে নির্ভরশীল হয় (তা হতেই হবে; না হলে যে সঙ্কট দেখা দিতে পারে না) তাহলে উদ্ভাসন করতে হবে কি করে মুনাফা হারে পরিবর্তন মার্ক্সের ঊন-ভক্ষণ তত্ত্বের জন্ম দেয়। কিন্তু মার্ক্স তা করেননি। তিনি তা উদ্ভাসনে ব্যর্থ হয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদের যে ব্যাখ্যা মার্ক্স প্রদান করেছেন তাও তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। এই ব্যাখ্যা ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণাভিত্তিক সমালোচনা-প্রসূত। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের যে আভ্যন্তরীণ রূপ কাঠামো তিনি গড়ে তুলেছেন সেই ভিত্তিতে তাঁর এই ব্যাখ্যা প্রস্ফুটিত। সুতরাং সেই রূপ-কাঠামোই যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে তদ-উৎসারিত ব্যাখ্যাও ভুল-প্রমাদে পরিপূর্ণ।

আলোচনায় ইতি টানা যাক। সংক্ষেপে দু'কথা বলে। আলোচনার সুষ্ঠু আঙ্গিক হিসাবে মার্ক্সীয়ান মতবাদ সুষ্ঠু নয়। ভুল-ত্রুটি যথেষ্ট বিরাজমান। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে আপাত-বৈসাদৃশ্য উদঘাটনে এই মতবাদ গড়ে তোলা হয়েছে সেই 'আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য' বরং এই নীতিতে অধিক বিদ্যমান। দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন যে আচরণ বিধি ধনতন্ত্রবাদে অঙ্গীভূত বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা যুক্তিতর্কের ধোপে টেকে না, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে টেকসই বলে প্রতিপন্ন হয় না। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক যে ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মার্ক্সীয় আলোচনার আঙ্গিক গড়ে উঠেছে সেই ব্যাখ্যাই দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। কাজেই তাঁর বিশ্লেষণ সুষ্ঠু হতে পারে না।

সে যাই হোক, দোষ-ত্রুটির কথা বাদ দিয়ে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মার্ক্সীয় মতবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন আঙ্গিক পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ করেছে। বহু কিছু স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। উন্নয়ন সমস্যা অনুধাবন সহজতর হয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে। আজকের বিশ্বে মার্ক্সীয় মতাদর্শের আবেদন অসীম। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশে তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপাদ্য হিসাবে সম্মান পেয়ে চলেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদ

১৮৭০ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক চিন্তনের প্রধান ধারাগুলিতে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা বদলাতে শুরু করে। তৎস্থলে ক্রমশঃ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া তেমন কিছু কঠিন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিক অগ্রগতির ঢেউ মানুষের মনে নতুন চেতনা জাগায়। তেমনি বৃহদাকারে সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। চারিদিকে উন্নয়ন-অগ্রগতির বান ডেকে যায়। শুধু তাই নয়, প্রযুক্তিক অগ্রগতির কল্যাণে একটা অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অগ্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রকৃত মজুরী ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার পর্যায় থেকে বেশ কিছুটা উর্ধ্বে বিরাজ করতে থাকে। মুনাফা হার বেশ আশাপ্রদ হয়। খাজনা আর বিপজ্জনকভাবে জাতীয় আয়ের একটি প্রধান অংশ হয়ে থাকে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে জীবনধারণোপযোগী ন্যূন মজুরীহার সম্বলিত স্থবির পরিস্থিতি জড়িত দুর্ভাবনার অবসান হয়।

এইসব ঘটনাবলীর পরিপেক্ষিতে নব্য-ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা তাঁদের আলোচনার সূত্রপাত করেন।[১] ক্লাসিক্যাল মতবাদে যে একটা দৃপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান ছিল তা পরিত্যাগ করে তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ক্লাসিক্যাল ও মার্ক্সীয় আলোচনায় উদ্বৃত্তের যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল তাঁদের আলোচনায় তা তেমন পাত্তা পায়নি। তা যেন তেমন প্রাসংগিক বলে বিবেচিত হয়নি। নব্য-ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা এমন এক যুগে ও পরিবেশে বাস করছিলেন যখন মজুরী সমস্যারূপে তেমন আর প্রতিভাত হয়নি। কেননা তা তখন ন্যূনতম মাত্রা ছাড়িয়ে উর্ধ্বরাজ্যে বিরাজ করছিল। কাজেই, তাঁরা ন্যূনতম মজুরী তত্ত্বের নাগপাশ

---

১. প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালীন প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানীদেরকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সময় সীমাকে এভাবে নির্ধারিত করে নিয়েও বহুরকম চিন্তাধারার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই স্বল্পপরিসর এই আলোচনায় সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ও মার্ক্সীয় মতবাদে যে বণ্টন-নক্সা ও সঞ্চয় মাত্রা উদ্ভাসিত হয়েছিল তার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে আলোচনায় অগ্রণী হতে পেরেছিলেন।

পশ্চিমী দুনিয়ার অগ্রগতি বৈচিত্র্য নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীদের সম্মুখে করোজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় পরিস্ফুট করে তুলেছিল ম্যালথুশীয় হতাশা ও বিভ্রান্তির অসারতা। তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আয় ও জনসংখ্যা বর্ধনে তেমন সহজ সংযোগ বিরাজমান নয় যেমনটা ম্যালথাশ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের চোখে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল যে মূলধন-সংগঠন মূলতঃ প্রযুক্তিক-বিদ্যা ও সম্পদ-আবিষ্কারসঞ্জাত। আর প্রযুক্তিক-বিদ্যার যে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি তা অর্থনীতির আইন-কানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ধারণা করে নেন যে, অর্থ-নৈতিক বিচার-বিবেচনায় তথাকথিত 'ভারী' উপকরণ বলে চিহ্নিত, যেমন লোকসংখ্যা, মূলধনী-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিবিদ্যা, বিষয়াবলীর নিয়ামক-সমূহ অর্থনৈতিক জগৎ-বহির্ভূত অন্যত্র বিদ্যমান। ধনবিজ্ঞান জগতের ঘটনাবলী তাদেরকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। এই চিন্তাধারায় তাঁরা ক্লাসিক্যাল ধারণা থেকে অনেক দূরে চলে আসেন। ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা মনে করে নিয়েছিলেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যা দেয় বলে ধারণা করে নেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। আর মাথাপিছু আয়ে নির্ভর করে জনসংখ্যা উঠা-নামা করে। এই চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাঁদের মতানুযায়ী মূলধন-সংগঠন প্রণালী ও জনসংখ্যা বর্ধন বিশ্লেষণ করেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকালীন পটে উন্নয়ন-অগ্রগতি হার ও তার চিত্র-বিচিত্র গতিবিধি নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করেন। নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা উপকরণ সরবরাহে পরিবর্তন স্বতঃপ্রণোদিত বলে মনে করে নেন। তেমনি তা অননুমেয় বলে চিহ্নিত করেন। এই পটভূমিকায় আলোচনা বেশ কিছুটা সীমিত হতে বাধ্য। কেননা, এক্ষেত্রে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া উদঘাটন মানে উপকরণ পরিস্থিতি পরিবর্তনজনিত প্রভাবাবলী উদ্ভাসন। কার্যতঃও তাই হয়েছে। ফলে, ক্লাসিক্যালবাদীদের বিশ্লেষণে উন্নয়ন-অগ্রগতির যে ব্যাপক অবয়ব ফুটে উঠে তা নব্য-ক্লাসিক্যাল আলোচনায় অনুপস্থিত দেখা যায়।

নব্য-ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা তাঁদের আলোচনা সময়ের বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত করে নেন। অর্থাৎ তাঁরা স্বল্পকালীন ধারা পরিসর উন্মোচনে

দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আয়-বণ্টন প্রথা পর্যালোচনা কি মূল্য-তত্ত্ব বিশ্লেষণ অথবা সাধারণ ভারসাম্য নীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সময়-দিগন্ত কাট্-ছাট্ করে ছোট করে নেন। তাঁরা সময়ের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। ব্যাপ্তপরিসরে আচরণ-পদ্ধতি নির্দেশনা অবহেলা করেন। তাঁদের আলোচনায় সম্পদের সুষ্ঠু বরাদ্দকরণ অধিক গুরুত্ব পায় এবং যথার্থ বরাদ্দকরণ উৎসারিত উন্নয়ন-প্রক্রিয়া উদঘাটিত হয়। তাই নব্য-ক্লাসিক্যাল নীতিবাগীশ মনে করেন যে, দেয় উপকরণ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মনোপলি অপেক্ষা অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। কেননা, পূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পদ বরাদ্দকরণ সুষম করে। অবশ্য তাঁদের স্বল্পপরিসর বিশ্লেষণে একটা ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ব্যতিক্রমটি সুদের হার বিষয়ে। সুদের হার বিশ্লেষণে তাঁরা বিস্তৃত পটভূমিকা গ্রহণ করেন। সুদের হার বর্তমানকে ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়াকর্মকে ভবিষ্যতের আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলে। সুদের হারের বিশ্লেষণ দিয়ে পুঁজি-সংগঠনের বিষয়টি উদ্ভাসিত করে। তাঁদের এই বিশ্লেষণ অর্থ-নৈতিক অগ্রগতি চিন্তাধারায় মৌলিক অবদান হিসাবে সম্মান পায়।

১. মূলধন সংগঠন তত্ত্ব

মূলধন-তত্ত্ব নিয়ে নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন মত বিরাজমান বটে। তবে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ একই রূপ।[২] প্রথমে তাঁরা শ্রম ও মূলধনের স্থায়ী অনুপাতের ধ্রুপদী উপকল্প বাদ দিয়ে নেয়। অর্থাৎ ধারণাভিত্তিক উৎপাদন-আঙ্গিকে উৎপাদনের জন্য শ্রম ও পুঁজির নির্দিষ্টকৃত অনুপাত বর্জন করে নেয়। শ্রমের জায়গায় মূলধনের সংস্থাপন সম্ভাবনা মেনে নেয়। তার নির্জলা অর্থ, শ্রমশক্তি না বাড়িয়েও পুঁজি-সংগঠন হতে পারে। ফলে, মূলধন-তত্ত্ব জনসংখ্যাতত্ত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠে। মূলধন বেড়ে যেতে পারে। লোকসংখ্যা তথৈবচ

২. মূলধন-তত্ত্ব নিয়ে নব্য-ক্লাসিক্যালদের মতপার্থক্য জানতে হলে তাঁদের লেখা অর্থনৈতিক মতবাদের ইতিহাস দেখুন। যেমন J. A. Schumpeter-এর History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1954, পৃঃ ৮৯৮—৯০৯ ও ৯২৪—৯৩২; G. J. Stigler-এর Production and Distribution Theories, The Macmillan & Co., New York, 1946.

থাকায় আপত্তি নেই। তাতে জাতীয় আয় ও পরিণামে, মাথাপিছু আয়ে সম্প্রসারণ ঘটে। এখানে এসে নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদী একটা উপকল্প ধরে নেয়। তাঁরা মনে করে নেয় যে নির্দিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার আঙ্গিকে মূলধন গঠন হতে থাকলে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পায়।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীর মতে সুদের হার ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ সঞ্চয়-হার নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ মানেই অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিবহুল। কাজেই হাতের এক পাখী বনের তিন পাখী অপেক্ষা শ্রেয়। আজকের এক টাকা আগামী কালের তিন টাকা অপেক্ষা কাম্য। কাজেই, সঞ্চয় হার বাড়াতে হলে সুদের হার যথাযথ হতে হবে। সুদ থেকে পাওয়া আয় সম্ভাবনা নিশ্চিত না হলে কেউ সঞ্চয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সব খেয়ে বসে থাকবে। নির্দিষ্ট আয় থেকে অধিক হারে সঞ্চয় পেতে হলে সুদের হার চড়িয়ে দিতে হবে। আয়ের একটা দেয় পর্যায়ে ব্যক্তির সঞ্চয়মাত্রা সীমিত হয়। আর কিছুটা সঞ্চয় করলেই তার মধ্যে সঞ্চয়-স্পৃহা ঋজুভাবে হ্রাস পেয়ে যায়। সুতরাং, তাকে অধিক সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হলে অধিক সুদের লোভ দেখাতে হবে। তার আয়মাত্রা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি ছাড়িয়ে গেলে অবশ্য সুদের হার তেমন সম্প্রসারিত না হলেও তার মধ্যে অধিক হারে সঞ্চয়ের ঝোঁক দেখা দেবে।

নয়া-ক্লাসিক্যাল ছাঁচে (model) সুদের হার বিনিয়োগ মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য ধারণাভিত্তিক প্রযুক্তি-আঙ্গিক ও জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে। লগ্নীকারক ঋণ চায় কারবারে মূলধন নিয়োগের নিমিত্তে। মূলধন বিনিয়োগ দিয়ে উৎপাদন বাড়ে। সুদের হার ব্যবসায়ীর চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে। সুদ বেশী হলে চাহিদা কম হয়। কম হলে বেশী হয়। লগ্নীকারক লগ্নী ঘটায় সেই ইউনিট অবধি যা হতে প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যায় অন্ততঃ খরচের সমানুপাতিক। সুদের নিম্ন হার বিনিয়োগ তেজী করে।

লোকসংখ্যা দেওয়া বলে ধরে নিলে নয়া-ক্লাসিক্যাল্র মতে মূলধন সংগঠন ক্রিয়া এইরূপ হয়। হঠাৎ করে মনে করুন, কোন কারণে বিনিয়োগ ক্রিয়াকর্ম বেড়ে যায়। তা আধুনিকীকরণ করার জন্য হতে পারে। সে যাই হউক, বিনিয়োগ দ্রব্যাদির চাহিদা চড়ে যায়। সুদের হার ঊর্ধ্ব-গতি নেয়। সঞ্চয় অধিক হয়। বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সাথে মূলধনী সামগ্রীর আপেক্ষিক দরও চড়ে যায়। কেননা, উপাদান সামগ্রীতে টান পড়ে। নানারূপ সীমাবদ্ধতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উচ্চ সুদ ও

উপকরণ সামগ্রীর আপেক্ষিক দাম বেড়ে যাওয়ায় যত্রতত্র লগ্নী ঘটানো লাভজনক হয় না। তাই কেবল বাছাই করা প্রকল্পে বিনিয়োগ সীমিত হয়ে উঠে। কেবলমাত্র উচ্চতর উৎপাদিকা-শক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলোতে সবায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই সকল প্রকল্প এগিয়ে চলে। সময়ের কপোলতলে সাবালক হয়ে উঠে। পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। তখন আবার সুদের হার পড়তে থাকে। দ্রবসামগ্রীর আপেক্ষিক দামেও ভাঁটা পড়ে। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়। তাতে করে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তা এগিয়ে চলে। সুদের হার আরও পড়ে যায়। সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস পেয়ে পেয়ে দ্রুত শূন্যের দিকে ধাবমান হয়। এই পর্যায়ে এসে মূলধন সংগঠন লোপ পায়। অর্থনীতি স্থবির পর্যায়ে ঠেকে।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী বলেন যে, মূলধন সংগঠন প্রক্রিয়া চলাকালে সর্বসময় পূর্ণ কর্মসংস্থান পরিস্থিতি বিরাজ করে। মুদ্রা সরবরাহ ধ্রুব থাকে, সাধারণভাবে। তাতে করে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দরমাত্রা কমে যেতে থাকে। তাঁরা আরও বলেন, মূলধন-গঠন সক্রিয়কালে শ্রমিকপিছু পুঁজি পরিমাণ বেড়ে যায়। এই প্রথা 'মূলধন গাঢ়ত্ব' নামে অভিহিত। তা 'মূলধন বিস্তৃতি' থেকে পৃথক। মূলধন বিস্তৃতি মানে শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে মূলধন বৃদ্ধি সমানুপাতিক হওয়া।

লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে কি দাঁড়ায়? বিশেষ করে শ্রমিক সংখ্যা? নির্দিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার আঙ্গিকে? নয়া-ক্লাসিক্যাল মত অনুযায়ী শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে মজুরী হার কমিয়ে দেয়। তাতে কর্ম-সংস্থান বেড়ে যায়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে সাকুল্য মুদ্রাচাহিদা ধ্রুব থাকে। অথচ মজুরী কমে যায় অর্থাৎ চাহিদা তালিকা স্থির থাকে। মজুরী মাত্রায় হ্রাস ঘটে। ফলে অধিক উৎপাদন লাভজনক হয়ে উঠে। উৎপাদকরা অধিক শ্রম নিয়োগ করে অধিক উৎপন্নে সচেষ্ট হয়। মূলধনী সাজ-সরঞ্জাম অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ফলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেড়ে যায়। তাতে করে বিনিয়োগ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেশী হয়। সুদের হার ঊর্ধ্বগতি নেয়। সঞ্চয় স্পৃহা ও প্রবৃত্তি জোরদার হয়। লগ্নী হার বৃদ্ধি পায়। মূলধন সংগঠন প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলে। অচিরে স্থবির পর্যায়ে এসে হাজির হয়। ঠিক একই পথে অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত পথে। উৎপাদন অধিক

হয় বলে দরমাত্রা নেমে যায়। নতুন স্থবির পর্যায় পরিবেশে মাথাপিছু আয় আদিপর্ব অপেক্ষা অধিক হতে পারে, কম হতে পারে অথবা সমানও হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত হলে এবং মূলধন সংভার ও শ্রম সরবরাহ বৃদ্ধি সমানুপাতিক হলে মাথাপিছু আয় অধিক হওয়া স্বাভাবিক।[৩] কিন্তু, তা না হয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। কেননা লোকসংখ্যা যে বেড়ে যায়।

প্রযুক্তিক অগ্রগতি জাতীয় আয় বর্ধনের অপর উপাদান। এই জাতীয় অগ্রগতির ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। উৎপাদন প্রণালী উন্নত হয়। উৎপাদক শ্রেণী অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী বলেন, প্রযুক্তিবিদ্যা সম্প্রসারণে শ্রম প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। উৎপাদন অধিক পুঁজিভিত্তিক হয়। নব নব উদ্ভাবনী আবিষ্কার মানুষ অপেক্ষা পুঁজি বেশী খাটায়।[৪] প্রখ্যাত আমেরিকান ধন-বিজ্ঞানী জে. বি. ক্লার্ক (ইনি নব্য-ক্লাসিক্যালবাদের একজন হোতা ব্যক্তিও বটেন) এ-সম্প্রর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন "একটা ধারণা সবার মধ্যে বদ্ধমূল, যে প্রথা শ্রম কম খাটায় তা পুঁজি অধিক খাটায়; তাতে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। ধারণাটি খুবই যুক্তিযুক্ত। তা বর্তমান শতাব্দীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের আলোকে এই মন্তব্য করা যায়।"[৫] প্রযুক্তি বিদ্যায় উদ্ভাবনী আবিষ্কারের মূলধনী সামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। কথাটা ছোট্ট। কিন্তু, গুরুত্ব যথেষ্ট। এই বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। মূলধন সংগঠন ও উন্নয়ন অগ্রগতি প্রক্রিয়ার মধ্যকার নিগূঢ় সম্পর্ক। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীরা এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং যথারীতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে কেন এই সম্পর্ক

৩. অন্য কথায়, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি সচল থাকতে পারে।

৪. উদ্ভাবনী আবিষ্কার হেতু শ্রম কম লাগে, পুঁজি বেশী লাগে। নয়া-ক্লাসিক্যাল এই বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন যে, নব নব আবিষ্কার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় আর শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৫. দেখুন J.B. Clark-এর Essentials of Economic Theory, The Macmillan Company, New York, 1907, পৃ: ৩০১। তিনি অবশ্য বলেন যে, সেই প্রবণতা আজকে আর তেমন সবল নয়। পূর্বে যেমনটা ছিল। এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করতে পারেন G. Cassel-এর The Theory of Social Economy, Translated by J. McCabe, T. Fisher Unwin, Ltd., London, 1923, I, পৃ: ২১৯।

নিগূঢ় তা কিন্তু তাঁরা ব্যক্ত করতে সক্ষম হননি। দেখে শুনে মনে হয় তাঁরা যেন "প্ররোচিত" উদ্ভাবনী আবিষ্কার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না।[৬]

২. ক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

নয়া-ক্লাসিক্যাল মতবাদে সংগঠন ক্রিয়ার যে আকৃতি-প্রকৃতি তা উদ্ভাসন করা গেল। উন্নয়ন অগ্রগতি সাধনে তার গুরুত্ব খতিয়ে দেখা হল। উন্নয়ন-অগ্রগতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল। তবে এই সমাষ্টিগত আলোচনায় নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীদের উন্নয়ন ধ্যান-ধারণার পূর্ণ রূপটি পাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য কতকগুলো বিশেষ ধ্যান-ধারণা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। অন্ততঃ আন্তঃসম্পর্কভিত্তিক তিনটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। তাতে করে এই মতবাদের অধিকাংশ প্রবক্তার মূল বক্তব্য অনুধাবন সহজ হবে। প্রথমতঃ, উন্নয়ন ধারা যে ক্রমিক ও নিরন্তরপ্রবাহী একটা প্রক্রিয়া তাঁদের এই মত যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা বলেন যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঐক্যতান বিশিষ্ট বা সুসমঞ্জস এবং পুনঃপৌনিক বা পুনরাবৃত্তধর্মী। এই বিশেষ ধারণাটি আলোচনা করা যেতে পারে এবং তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ নয়া ক্লাসিক্যালবাদী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশাবাদী। তাঁদের মতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল এবং তা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য। এই উচ্চাশাও খতিয়ে দেখার অপেক্ষা রাখে।

ক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেকে যুক্তিতর্ক প্রদান করেছেন। তবে এই মতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধারক হচ্ছেন প্রখ্যাত বৃটিশ ধন-বিজ্ঞানী হয়ত বা বৃটিশ নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীদের সর্বাগ্রগণ্য আলফ্রেড মার্শাল।[৭] ডারউইন ও স্পেন্সার-এর বিবর্তন মতবাদ তাঁর মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। অর্থনৈতিক বিষয়াবলী বিবর্তন-ধর্মী ও আকৃতি-প্রকৃতি রূপান্তরকারী একথা মার্শাল অবগত ছিলেন।

৬. দেখুন J. R. Hicks-এর Theory of Wages, Peter Smith, New York, 1948, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪—১২৫।

৭. উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মার্শালীয় মতবাদ জানতে হলে আলোচনা করুন T. Parsons-এর The Structure of Social Action, Mc Graw Hill Book Co., New York, 1937, চতুর্থ অধ্যায়; B. Glassburner রচিত "Alfred Marshall on Economic History and Historical Development," Quarterly Journal of Economics, LXIX, No. 4, 577-595 (Nov. 1955); A. J. Youngson-এর "Marshall on Economic Growth," Scottish Journal of Political Economy, III, No. I, 1-18 (Feb: 1956).

এই অবগতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বিচারে জীববিজ্ঞান শাস্ত্রের উপমা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনায় খাটিয়ে গিয়েছেন।[৮] অথচ স্থৈতিক যন্ত্রবৎ উপমা তেমন ব্যবহার করেননি। তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে অর্থনীতি হচ্ছে মূলতঃ রূপান্তরধর্মী। তাই তিনি মনে করেন "উন্নয়ন অগ্রগতি বা বিবর্তন; চাই তা শিল্পক্ষেত্রে হউক কি সামাজিক বিষয়ে হউক, মানে কেবল হ্রাস-বৃদ্ধি নয়। তার নির্জলা অর্থ রূপান্তরিত পরিবর্ধন (organic growth)।"[৯] অথবা চিন্তা করুন, তাঁর বক্তব্য "ধনবিজ্ঞানীর জন্য মক্কা-মদিনা হচ্ছে অর্থনৈতিক জীববিদ্যা, অর্থনৈতিক গতিবিদ্যা (economic dynamics) নয়।"[১০]

ডারউইনের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত ব্যক্তি স্বভাবতঃ অর্থনৈতিক জীবন স্রোতকে ক্রমবর্ধমান ও নিরন্তরপ্রবাহী বলে ধরে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কি! মার্শালও তাই করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি মানে ক্রমিক ও নিরন্তরপ্রবাহী প্রক্রিয়া। মার্শাল বলেন— "প্রকৃতি সইচ্ছায় লম্পঝম্প করে না এই যে স্বতসিদ্ধ নীতি......তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন জগতে বিশেষভাবে প্রযুজ্য।"[১১] সুতরাং এই বিশ্বাসের সূত্র ধরেই মার্শাল এগিয়েছেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন জগৎ বিশ্লেষণে। ধীরে-সুস্থে, রয়ে-সয়ে অগ্রগতি স্রোত প্রবাহিত হয়। তাইত মার্শাল ও তাঁর অনুসারীরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন অঙ্গ পর্যালোচনায় স্থৈতিক অংশত ভারসাম্য (Static Partial equilibrium) নীতি প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু, কথা হল এই চিন্তাধারায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর অভাবনীয় উদ্ভাবনী-আবিষ্কার কি করে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে? অর্থাৎ ধীরপ্রবাহী পরিবর্তন আঙ্গিকে এই অচিন্তনীয় সংযোজন কি-ভাবে সন্নিবেশিত করা চলে? তা কি সম্ভব? তাহলে সুম্পিটার যে বলেন এই উদ্ভাবনী আবিষ্কার অর্থনৈতিক-অগ্রগতি ক্ষেত্রে বিষম, বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যতানহীন অগ্রগমনের ভিত্তি হিসাবে ক্রিয়া করেছে।

৮. Glassburner-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৫৮১।

৯. A.C. Pigon সম্পাদিত Memorials of Alfred Marshall, Macmillan & Co. Ltd., London, 1925, পৃ: ৩১৭ দেখুন।

১০. Alfred Marshall-এর Principles of Economy, Eight edition, Macmillan & Co. Ltd., London, 1930, XIV দ্রষ্টব্য। এখন থেকে Marshall, Principles বলে উল্লেখ করা হবে।

১১. A. Marshall, Industry and Trade, Macmillan & Co. Ltd., London, 1919, পৃ: ৬।

(পরবর্তী অধ্যায়ে সুম্পিটারের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে)। অবশ্য নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীরা উদ্ভাবনী আবিষ্কার অবহেলা করেছেন এমন নয়, বা গুরুত্ব কম দিয়েছেন তাও নয়। যথেষ্ট সমাদর দিয়েছেন বটে। এই যেমন মার্শালের কথাই ধরুন না। বৃটেনের দ্রুত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে যেযে তিনি বলেছেন যে, ১৭৬০ সাল পরবর্তীকালে যানবাহন, বস্ত্রশিল্প, কৃষি, লৌহ ও কয়লা বৃটেনের উন্নতি-অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তবে তাঁদের ধারণা সার্বিক চিন্তাধারার ছকে বিধৃত। তাঁরা বলেছেন, উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও নব নব আঙ্গিক-প্রণালী সংযোজনও ক্রমিক ও নিরন্তর খাতে প্রবাহিত। অর্থাৎ এই সবও আস্তে-ধীরে রয়ে-সয়ে অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে যায়। তাই মার্শাল বলেন "দেখে-শুনে মনে হতে পারে যে ধী-শক্তিসম্পন্ন আবিষ্কার সঙঘটক কি পুঁজিপতি এক ধাক্কায দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকদূব এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু, আসলে তা নয়। তার যে বলিষ্ঠ চিন্তাধাবা সমাজকে প্রভাবিত করে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে যায় তা গভীবভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তা স্বতঃপ্রবহমান গঠনমূলক চিন্তাস্রোতের পরিস্ফুটিত রূপ বই অন্য কিছু নয়।"[১২]

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, নয়া-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতিকে আলাদা কিছু বলে ভাবেন নি। তাঁদের মতে তা ক্রমবর্ধমান "জ্ঞানের অগ্রগতি ও তার প্রসার"[১৩] সঞ্জাত। অর্থাৎ উদ্ভাবনী-আবিষ্কার হঠাৎ করে ঘটা কিছু নয়। তা পশ্চিমা দুনিয়ায় প্রবহমান সুলভ্য স্বনির্ভরশীল জ্ঞান-স্রোত উৎসারিত। আজকে যা চমকপ্রদ ও তাক লাগিয়ে দেয়ার মত উদ্ভাবনী–আবিষ্কার বলে মনে হয়, নিবীড়ভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তা আকাশ থেকে পাওয়া কিছু নয়। বরং বহু শতাব্দীর বহু সাধকের চিন্তা-সাধনার মিলিত ফল। একটা অব্যাহত গতি বয়ে চলেছে। সেই গতিস্রোত আঙ্গিকে

---

১২. Marshall: Principles, XIII J. S. Nicholson-ও সমধর্মী মত প্রকাশ করেছেন, তাঁর মতে "ইতিহাস............যে নীতি বা প্রবণতা নির্দেশ করে তা হচ্ছে, (১) উদ্ভাবন প্রথায় আমূল পরিবর্তন আস্তে-ধীরে অথচ অনবিচ্ছিন্ন গতিতে সংযোজিত হয়ে যাবে এবং (২) এই আমূল পরিবর্তন তথা, বিচ্ছিন্ন উল্লম্ফ অল্প-স্বল্প করে উদ্ভাবনী-আবিষ্কারে প্রেরণা যোগাবে।" দেখুন J. S. Nicholson-এর The Effects of Machinery on Wages, Swan Sonneschein and Co., London, 1892, 33.

১৩. Marshall: Principles, পৃ ২২২।

প্রতিভাবান ব্যক্তি কালে কালে নব নব উন্মেষণী বুদ্ধি প্রদান করে চলেছেন। অর্থনীতি ধেয়ে চলেছে সম্মুখ পানে নব নব উৎপাদন আঙ্গিক অন্তরীত করে নিয়ে। জন্ম দিয়ে চলেছে সম্যকজ্ঞান জ্ঞানীগুণীর জন্য। তাঁরা আবার নতুন চিন্তায় রত হচ্ছেন। নতুন আঙ্গিক ও উৎপাদন-প্রণালী প্রদানের নিমিত্তে।

৩. সুসমঞ্জস-উন্নয়ন-প্রক্রিয়া

উন্নয়ন-অগ্রগতি এগিয়ে যায় ধীর-স্থির গতিতে। শুধু তাই নয়, তার চলার পথ হয় সুসমঞ্জস ও সুসংহত। বাধাবিপত্তিহীন মসৃণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা এগিয়ে চলে। চলার পথে শক্তি সঞ্চার করে চলে। ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষমতা পুষিয়ে নতুন শক্তি জন্ম দিয়ে এগোয়। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী তাই বলেন। তাঁদের মতে উন্নয়ন-অগ্রগতি সবার জন্য কল্যাণময়ী। লাভের ভাগ সবার ভোগে আসে। শ্রমিক-শ্রেণী বিশেষভাবে লাভবান হয়। এই মতবাদের হোতা ব্যক্তিরা মন্তব্য করেন। অর্থনীতিতে মোটামুটি পূর্ণ কর্মসংস্থান পরিস্থিতি বিরাজ করে। তাঁদের ধারণা। তবে মাঝে-মধ্যে কিছুটা বেকারত্ব হয়ত দেখা যেতে পারে। মুদ্রানীতির চলন-বলন ঝামেলা বাধাতে পারে। যুদ্ধ জট বাধিয়ে দিতে পারে। নব আঙ্গিক সংযোজন সাময়িক অস্বস্তি জন্ম দিতে পারে। তবে এগুলো অবশ্য সবই ক্ষণকালিক ব্যাপার। সামান্য কিছুকাল হয়ত কিছুটা গোলমাল বাধিয়ে রাখতে পারে। কিছুলোক চাকুরী-বাকুরী বহির্ভূত থাকতে পারে। তবে দীর্ঘদিন ধরে তা ঘটতে পারে না। সময়ের স্রোতে সব শাখায় সাঙ্গীকরণ ঘটে যায়। কাজেই, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে ব্যাপক বেকারত্ব বিরাজ করতে পারে না। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী ধারণা করে নেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বেড়ে যায়। সাধারণভাবে তা সম্প্রসারিত হয়। শ্রম কম নিয়োগী যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করার ফলে হয়ত সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্র গুলোতে শ্রম-চাহিদায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে। কিন্তু, তা গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু নয়। অচিরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাই গুষ্টাভ ক্যাশল বলেন, "......দ্রব্যসামগ্রীর দাম প্রচুর কমে যায়। তাদের চাহিদা বাড়ে ব্যাপকহারে, ফলে শ্রমের চাহিদাও সম্প্রসারিত হয় এবং তা প্রচুর পরিমাণে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে মজুরী ঊর্ধ্বমুখী মোড় নেয়। এদিকে

নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে মোট আয় বেড়ে যায়। তাতে কর্ম-ক্রিয়া জোরদার হয়। ফলে, এই কারণেও শ্রম চাহিদা বেড়ে যায়। অর্থনীতির সর্ব শাখায় একই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পরিণামে শ্রমিকশ্রেণী প্রচুর সুবিধা পায়। অর্থাৎ আঙ্গিকগত অগ্রগতির ফলে শ্রম-শক্তিও প্রচুর লাভবান হয়ে থাকে।"[১৪]

নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী ধনবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেন যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি কালে জমিদারশ্রেণী ও পুঁজিপতিদল অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে। তাদের মোট আয় বেশ বেড়ে যায়।[১৫] কিন্তু, মজার কথা, আপেক্ষিক আয় নিয়ে কিন্তু এই মতের প্রবক্তারা তেমন কোন উচ্চবাচ্য করেননি। অথবা শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্পর্কেও কিছু বলেননি। এদিক থেকে তাঁরা রিকার্ডো ও মার্ক্স থেকে আলাদা। রিকার্ডো ইঙ্গিত করেছেন যে, উন্নয়ন-অগ্রগতিকালে শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। মার্ক্স ত এই সম্পর্কে ঢাক-ঢোলই বাজিয়েছেন। কিন্তু, নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী বলেন, উন্নয়ন অগ্রগতি সবায়কে সুযোগ দেয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সুফল পায়।

নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী একটা মূল্যবান প্রত্যয় প্রদান করেছেন। প্রত্যয়টি বহির্ব্যয় সংকোচ প্রত্যয় বা ব্যয় কমার 'বাহ্যিক' কারণ (external economics) নামে অভিহিত। এই প্রত্যয়টি উৎপাদন-ধারা উদ্ভাসন-সঞ্জাত। অর্থাৎ উৎপাদন পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সাথে তা জড়িত এবং এই বিশ্লেষণ থেকেও সুসমঞ্জস ও পুনরাবৃত্তিধর্মী অগ্রগতির আভাস পাওয়া যায়। বহির্ব্যয়-সংকোচ প্রত্যয়ের জন্মদাতা হচ্ছেন মার্শাল। এই প্রত্যয় উন্নয়নকামী দেশের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বিশেষ উপযোগী।[১৬]

ব্যয়সঙ্কোচের 'আভ্যন্তরীণ' কারণ প্রত্যয়ও মার্শালের দেয়া। অর্থাৎ মার্শাল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার কারণগুলোকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ (internal) এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। বৃহদায়তন উৎপাদন থেকে এই সকল সুবিধা পাওয়া যায়। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিক

---

১৪. Cassel-এর প্রাগুক্ত বই I, পৃষ্ঠা ৩১৯। Marshall, Principles, পৃঃ ৫৪২ এবং Clark-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৩১২—৩১৭-ও দেখতে পারেন।

১৫. Marshall, Principles, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭৮—৬৮১।

১৬. দেখুন Stigler-এর Production and Distribution Theories, The Macmillan Co., New York, 1046, পৃঃ ৬৮—৭৬ এবং T. Scitovsky -এর "Two Concepts of External Economics" Journal of Political Economy, LXII, No. 2, পৃ: ১৪৩-১৫১। (April, 1921).

মূলধন খাটিয়ে, অধিক শ্রম নিয়োগ করে কি বেশী যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে বড় আকার ধারণ করে। এই আয়তন বৃদ্ধির ফলে ঐ সব শিল্প অনেক-গুলো সুবিধা পায়। তাতে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এই সব সুযোগ-সুবিধাকে মার্শাল উৎপাদন-ব্যয় কমার 'আভ্যন্তরীণ' কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে শিল্পসমূহে সাধারণ প্রসার ঘটলে শিল্প-কারখানার মালিকরা অনেকগুলো সুবিধা পায়। তাতেও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এই জাতীয় কারণগুলোকে মার্শাল চিহ্নিত করেছেন উৎপাদন-খরচা কমার 'বাহ্যিক' কারণ হিসাবে।

উৎপাদন পরিমাণ বেড়ে যে ব্যয় কমে তাকে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সঙ্কোচ বলে। নানা কারণে এই ব্যয়সঙ্কোচ ঘটতে পারে। ভাল ভাল দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়! উৎপাদন বেড়ে কারখানার আয়তন সম্প্রসারিত হয়। তাতে কাঁচামাল কেনা, জিনিস বিক্রি করা, শ্রম নিয়োগ করা ইত্যাদি বিষয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। তাতে পরিচালনা সুষ্ঠু হয়। বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সহজ হয়। নৈপুণ্য বাড়ে। ফলে ব্যয়সঙ্কোচ হয়। হিসাব-নিকাশের সুবিধা হয়। গবেষণা কাজ জোরদার করা যায়। অর্থসংগ্রহ সহজলভ্য হয়। ঝুঁকি কমাবার অবলম্বন করা যায়। এই সকল কারণে বড় বড় কারখানায় কম ব্যয়ে জিনিস উৎপাদন করা যায়।

অন্যদিকে, শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ উন্নতির ফলেও ব্যয়ে হ্রাস ঘটে। শিল্প পরিবেশ অধিকতর সুস্থ হওয়ার ফলে যে সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তার থেকেও ব্যয়সঙ্কোচ ঘটানো সম্ভব হয়। ব্যয়সঙ্কোচের এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধাকে বলা হয় বাহ্যিক কারণ। মার্শাল-এর ভাষায় ব্যয়-সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ "আশে-পাশে একজাতীয় উৎপাদন-বর্ধন উৎ-সারিত। অর্থাৎ শিল্পের কেন্দ্রীকরণের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার অধিকাংশ বাহ্যিক কারণের অন্তর্ভুক্ত। অনেকগুলো সুবিধা আবার জ্ঞান ও উন্মেষণী বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধা সভ্য-জগতের মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।"[১৭] অন্যত্র এক জায়গায় তিনি বলেছেন, ব্যয়সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ "পরস্পর নির্ভরশীল ও সহায়ক শিল্পশাখা উৎসারিত। একে অন্যকে সহায়তা করে, সুযোগ করে দেয়। কারখানাগুলো হয়ত একই অঞ্চলে অবস্থিত।

১৭. **Marshall : Principles,** পৃঃ ২৬৫—২৬৬।

অথবা এমন এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখান থেকে অতি সহজে আনা নেওয়া করা যায়। উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা বিদ্যমান। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুলভ্য। ছাপাখানা ইত্যাদি বিরাজমান।"[১৮]

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মার্শাল অর্থনীতিকে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পূরকধর্মী বলে অভিহিত করেছেন। কোন একটা বিশেষ শি: কোথায়ও প্রসারলাভ করে চলেছে। ফলে দক্ষ কর্মীদল সেথায় ছুটে আসবে। চিন্তাধারার আদান-প্রদান চলবে। একে অন্যের কার্যপদ্ধতি জানবে। তাতে প্রযুক্তিক জ্ঞান-বহর বেড়ে যাবে। যন্ত্রপাতি উৎপাদনীয় শিল্প জড়ো হবে। তাদের তৈরী জিনিসের চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে তাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাবে। কমদামী যন্ত্রপাতি কিনে শিল্পগুলো অধিক সুযোগ পাবে। যানবাহন প্রণালী উন্নত হবে। আনুষঙ্গিক বা উপজাত দ্রব্য (by-product) তৈরী শিল্প গড়ে উঠবে। ফলে চারিদিক থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে তাতে করে শিল্প কারখানায় অধিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। আর সম্ভাবনার আঙ্গিকে আরও বিস্তৃতি ঘটবে। এই বিস্তৃতি সম্প্রসারণের আরও অধিক প্রবণতা জন্ম দেবো। শুধু এক্ষেত্রে নয়। অন্যত্রও।

Allyn Young ব্যয়সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ আরও ব্যাপক করে তুলেন। আকৃতি-প্রকৃতি সুস্পষ্ট করে দেন। তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান বিধির বিখ্যাত আলোচনায় মার্শালের বহু ধ্যান-ধারণার প্রকৃষ্ট রূপ মেলে ধরেন।[১৯] বলেন, "কোন একটা বিষেশ শিল্প কারখানা কি শিল্পের আকার-পরিমাণ পর্যালোচনা করে ক্রমবর্ধমান বিধির পূর্ণরূপ পাওয়ার জো নেই। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিভাগ নৈপুণ্য একটা নিরন্তর প্রবাহী প্রক্রিয়া। তা ক্রমবর্ধমান নীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একের প্রভাবে অন্যের সম্প্রসারণ ঘটে চলে।"[২০] ধরা-বাধা শিল্পের হিসাবে ক্রমবর্ধমান বিধির কার্যপ্রণালী অবলোকন সম্ভব নয়। কারণ তা স্থৈতিক পর্যালোচনার নামান্তর। ক্রমবর্ধমান বিধির ঐতিহাসিকগত রূপ পেতে হলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহে গুণাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করতে হবে এবং নব নব উৎপন্ন দ্রব্য ও বাজার পরিস্থিতি যাচাই করে দেখতে হবে। "তার জন্য প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রের সার্বিক গতিধারা অনুধাবন।"[২০]

১৮. Marshall : Principles, পৃষ্ঠা—৩১৭।

১৯. দেখুন Allyn Young-এর Increasing Returns and Economic Progress", Economic Journal, XXXVIII, No. 152, 527-542 (Dec.1928.)

২০. ঐ পৃ: ৫৩৯।

আলোচনার এই পটভূমিকায় ইয়ং মন্তব্য করেন, "ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিরন্তর প্রবাহী শ্রম-বিভাগের উপর নির্ভরশীল। আর শ্রম বিভাগের সুবিধা পেতে হলে গ্রহণ করতে হবে ঘোরপ্যাচালো বা পরোক্ষ উৎপাদন-রীতি-নীতি।"[২০] অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী মতে উৎপাদন ঘটাতে হবে। আর যদিও "শ্রম-বিভাগ বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল....... আবার বাজার বিস্তৃতিও শ্রম-বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।"[২০] সুতরাং এই যুক্তিতর্কের আঙ্গিকে পাওয়া যায় উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রগতিশীল রূপ। এর থেকে তার পুনরাবৃত্তিধর্মী রূপও প্রকাশ পায়।

ইয়ং প্রদত্ত উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রক্রিয়া জোর আরোপ করে শিল্পে শিল্পে পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর। একের সম্প্রসারণ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক ক্ষেত্রে বর্ধনের ফলে অন্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা দেয়। শিল্পের সামগ্রিক আঙ্গিকে মোড় নিলে সর্বত্র নড়াচড়া শুরু হয়। মনে করুন, আদিতে একটা শিল্প এগিয়ে যায়, তার প্রভাবে অন্য শিল্পে সম্প্রসারণ ঘটে, চাহিদা বাড়ে। বাজার-বিস্তৃতি ঘটে। শ্রম-বিভাগ বেড়ে যায়। তার ফলে ক্রমবর্ধমান বিধি সক্রিয় ও সবল হয়। পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয়। কেন্দ্রীকরণ প্রথা কার্যকরী হয়ে উঠে। তাতে সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যায়। তবে আসল সুবিধা পাওয়া যায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-আঙ্গিক সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে।

শ্রম-বিভাগ জোরদার হয়ে শিল্পকাজ বহুমুখী করে তোলে। ছোট ছোট শিল্প কারখানায় সব কাজ এক সঙ্গে করতে হয়। কাঁচামাল কেনা, গুদামজাত করা, শ্রমিক নিয়োগ করা, পুঁজির হিসাব-নিকাশ রাখা, উৎপন্ন করা, তৈরী দ্রব্য বাজারজাত করা ইত্যাদি হাজারো কাজ একসঙ্গে করতে হয়।[২১] তার ফলে শিল্প কারখানার পক্ষে পারদর্শিতা অর্জন সম্ভব হয় না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিধি বেড়ে গেলে বিভিন্ন কাজ আলাদা আলাদা বিভাগে ভাগ করে নিয়ে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায়। বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে তদারক কাজ চালানো যায়। তাতে করে প্রতিটি বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠার সুযোগ পায় এবং বেশ কিছুদিন

---

২০. ঐ পূর্বোক্ত বই দ্রষ্টব্য।

২১. আলোচনা করুন G.J. Stigler-এর The Division of Labour is Limited by the Extent of the Market", Journal of Political Economy, LIX, No. 3, 187 (জুন, ১৯৫১)।

ধরে বিনা প্রতিযোগিতায় চলার সুবিধা পায়। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন যেমন পাওয়া যায় তেমনি তার মজাও লুটা যায় অনেক দিন ধরে। ইতিমধ্যে কিন্তু নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। প্রতি-যোগিতা দেখা দেয়। উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠে। তাতে করে নতুন উৎপাদন-আঙ্গিক জন্ম নেয়।

নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। তাতে তা উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং অধিক উৎপাদনে লিপ্ত হয়। এদিকে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে অর্থনীতিতে অস্থির পরিবেশ জন্ম দেয়। এক শাখায় অগ্রগতি অন্য শাখায় প্রভাব বিস্তার করে, অন্য শাখায়ও অগ্রগতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইয়ং বলেন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন একটা ধীরমন্থর গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া, তার ধরন-ধারণও মসৃণ নয়। অর্থাৎ বন্ধুর পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। এই বিধির সুযোগ-সুবিধা নতুন নতুন আঙ্গিক প্রণালী সংযোজনে নির্ভরশীল. তেমনি জনসংখ্যার বণ্টন-প্রথাও তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, সর্বোপরি পুঁজি-সংগঠন প্রণালী তার ধারাপ্রবাহের নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করে। এর সবগুলোই আস্তে-ধীরে রয়ে-সয়ে এগোয়, এক ধাঁপ এগিয়ে যায়, চিন্তাভাবনা করতে হয় পরবর্তী ধাঁপে পা ফেলতে, সুস্থ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম অগ্রগমন ঘটে, দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণে পটভূমিকা যাচাই করে নিতে হয়, সম্ভাবনা বাঁছাই করে নিতে হয়।[২২] প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার, জনসংখ্যা বর্ধন ও সম্যক-জ্ঞানে অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান উৎপাদনবিধি বলশালী ও বেগবান করে। তারা কিন্তু পুরোপুরি স্বনির্ভরশীল ও স্ব-প্রণোদিত অগ্রগতি নয়। অর্থনৈতিক বিষয়াবলী বহির্ভূত ঘটনাবলীই কেবল তাদের রূপরেখা নিয়ন্ত্রণ করে না। ইয়ং বলেন শিল্প-সম্প্রসারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবুদ্ধিকে সম্মুখ পানে নিয়ে যায়। এদিকে আবার শিল্প সম্প্রসারণ জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত হয়।

৪. উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে উচ্চ আশাবাদী ধারণা

নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী ধন-বিজ্ঞানীরা উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী, তাঁদের মতে অগ্রগতি নিরন্তর-প্রবাহী হতে বাধ্য। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বলময়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেও এই চিন্তাধারার আভাস

২২. Young-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৫৩৫।

পাওয়া যায়। সুতরাং, তাঁদের বক্তব্য ক্লাসিক্যাল বক্তব্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধ্রুপদী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে একটা হতাশার ভাব সেথায় বিরাজমান, রিকার্ডো উন্নয়ন-অগ্রগতির ঐতিহাসিক আঙ্গিক উর্বরা জমির পরিমাণ দিয়ে সীমিত বলে উল্লেখ করেছেন। যান্ত্রিক অগ্রগতি এই সীমাবদ্ধতাকে হয়ত কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু হটিয়ে দিতে পারে না, ক্রমহ্রাসমান বিধি অবশেষে জয়যুক্ত হয়। অর্থনীতি বন্ধ্যাত্ব পর্যায়ে নেমে আসে। রিকার্ডো বৃটিশ অর্থনীতিকে স্থবির পর্যায়ের ধারেকাছে অবস্থিত বলে মন্তব্য করেছেন।

অথচ নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের চোখে ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল ঝলমল। উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার প্রাচুর্যে সম্ভাবনাময়। "স্থবির পর্যায়ে নেমে যাওয়ার কোন সঙ্গত হেতু দেখি না"[২৩] এই তাঁদের অভিমত। মানুষের জন্য কোন বাধাই বাধা নয়। উপাদান সীমাবদ্ধতা খুব একটা বড় কথা নয়। প্রযুক্তি-বিদ্যায় অগ্রগতি 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মাত্র'। শ্রম দক্ষতা ক্রমবর্ধমান হতে বাধ্য। ঐতিহাসিক এই বিবর্তন ধারার ছকে হতাশা বিভ্রান্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কাজেই, দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান বিধি অধিকতর সবল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মার্শাল যুক্তি দেন "উৎপাদনে প্রকৃতির অবদান নিম্নমুখী হতে পারে। কিন্তু মানব-অবদান উর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনায় সম্ভাবনাময়।"[২৪] সার্বিক অর্থনীতির আঙ্গিকে "ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব কাটাকাটি হয়ে যাওয়া অধিক সঙ্গত। কখনো হয়ত একটা একটু বেশী বলশালী হতে পারে। কিন্তু, পরমুহূর্তে অন্যটা তা দাবিয়ে দেবে।"[২৫] কাজেই, এই শর্তসাপেক্ষে, শ্রম ও পুঁজির আনুপাতিক বর্ধন ইউনিট প্রতি উৎপাদন তদনুরূপ করে তুলবে। সুতরাং শ্রমিক পিছু মজুরী অপরিবর্তিত থাকা স্বাভাবিক। সুদের হারও। অবশ্য পুঁজি-বিনিয়োগ শ্রম অপেক্ষা অধিক হলে মজুরী হার বেড়ে যেতে পারে। তাতে সুদের হার হ্রাস পেতে পারে। এই যুক্তিতে নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা অধিক পুঁজি-বিনিয়োগের পক্ষে রায় দেন। তাঁদের

২৩. Marshall : Principles, পৃঃ ২২৩।

২৪. ঐ, পৃঃ ৩১৮।

২৫. Marshall : Principles, পৃঃ ৬৭০। সুতরাং, বোঝা যায় মার্শাল বিশ্বাস করতেন যে ঐতিহাসিক আঙ্গিকে অর্থাৎ প্রযুক্তিক-জ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমনৈপুণ্য বর্ধন পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম ও পুঁজির ফলন ধ্রুব হওয়াই স্বাভাবিক।

মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে পুঁজি সংগঠন ও লোকসংখ্যা বর্ধনে দৌড় প্রতিযোগিতার নামান্তর।

নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদী প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতিকে তেমন বাধা বলে গণ্য করেননি। প্রযুক্তিবিদ্যায় সম্প্রসারণ জটিলতা বিরাজমান থাকলেও তেমন একটা কিছু আসে-যায় না। তা সত্ত্বেও শ্রমিক পিছু উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে। ধারণা-ভিত্তিক প্রযুক্তিক আঙ্গিক ও শ্রম-শক্তি দিয়েও জাতীয় আয়ে যথেষ্ট বর্ধন ঘটানো যেতে পারে। আসল বিষয় পুঁজি-সংগঠন। মূলধন সংগঠন অধিক হারে ঘটলে উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনে তেমন একটা বাধা কিছু নেই। পুঁজি পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সাথে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা হয়ত হ্রাস পেতে পারে। তবে তা নামমাত্র হারে। ব্যাপকহারে কিছু নয়। উদাহরণ হিসাবে ক্যাশল-এর মন্তব্য শুনুন। তিনি বলছেন, সুদের হারে নামমাত্র হ্রাস মূলধন সামগ্রীর ব্যবহার চড়িয়ে দেবে এবং তা এমন হারে যে অতি সত্বর সরবরাহ ফুরিয়ে যাবে। তাতে সুদের হার আর নামবে না।"[২৬] এই বলেই কিন্তু তাঁরা ক্ষান্ত হননি। আরো এগিয়ে গিয়েছেন। ধারণা করে নিয়েছেন যে, প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাবে। অনেকটা স্বয়ংক্রিয় উপায়ে। তেমনি সামাজিক চাহিদার মাত্রাও। ফলে, নব নব সম্ভাবনা দেখা দেবে। মাথাপিছু আয় বেড়ে যেতে থাকবে।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী সঞ্চয়-স্পৃহায় অধিক জোর আরোপ করেছেন। উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই, সঞ্চয় বাড়াবার জন্য সুপারিশ করেছেন। বলেছেন মিতব্যয়িতা বিরাট গুণ। কেননা, সঞ্চয় ছাড়া উন্নয়ন হতে পারে না। প্রযুক্তিক জ্ঞান একা যথেষ্ট নয়। পুঁজির সাথে মিলে তবে তা আশানুরূপ ফল দিতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের মাঝে সঞ্চয়স্পৃহা স্বাভাবিকভাবে বিরাজমান এবং তা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। মার্শাল-এর ভাষায় "মানুষ তেমন স্বার্থপর নয়। সে অধিক কর্মোদ্যোগী এবং সঞ্চয়প্রয়াসী। নিজের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তে। ইতিমধ্যেই লক্ষণ ফুটতে শুরু করেছে যে, ভবিষ্যতে মানুষ সামাজিক অবস্থা ভাল করার এবং উন্নততর জীবনযাত্রা অর্জনে অধিক প্রয়াসী হবে এবং অধিক সঞ্চয় করবে।"[২৭]

২৬. Cassel-এর প্রাগুক্ত বই, I, পৃঃ ২১৫।
২৭. Marshall : Principles, পৃঃ ৬৮০।

সে যাই হোক, নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা কিন্তু, ম্যালথুশিয়ান ভয়-ভীতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা ও রঙীন ছবি এঁকেছেন বটে। তবে তেমন আত্মবিশ্বাসের সুরে নয়। প্রখ্যাত সুয়েডিশ ধন-বিজ্ঞানী **Kunt Wicksell** মন্তব্য করেছেন, "অতি সাম্প্রতিককালে ইউরোপে ব্যাপকহারে লোকসংখ্যা বেড়েছে। ইউরোপের বাইরের কতকগুলো দেশেও তাই ঘটেছে। এই অতি বর্ধনের চাপ অগ্রগতি হারে পড়তে বাধ্য; দুদিন আগে আর পরে। হয়ত বা বর্তমান শতাব্দীতেই। তাহলে উন্নয়ন-অগ্রগতি হ্রাস পাবে এবং কালে হয়ত পুরোপুরি স্থবির পরিস্থিতি জন্ম নেবে।"[২৮] এমনকি মার্শালও এই ভয় থেকে অব্যাহতি পাননি। তাই তিনি বলেছেন, "সে যাই হউক, লোকসংখ্যা বর্তমানে যেভাবে বেড়ে চলেছে ভবিষ্যতে এমন কি তার এক-চতুর্থাংশ হারে সম্প্রসারিত হলেও বিপদ দেখা দিতে পারে। ভূমির সাকুল্য ব্যবহারের (ধরে নেওয়া হচ্ছে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ভূমি আজকের মতই মাগ্না হবে) জন্য দেয় খাজনার পরিমাণ আর আর উপাদান থেকে পাওয়া মোট আয় পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।"[২৯]

বৈদেশিক বাণিজ্যের অপ্রতিহত গতি সম্পর্কেও তাঁরা তেমন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাই মার্শাল সতর্ক করে দেন "বিশ্বের অল্প কয়টি ছোট্ট দেশ" শিল্পকাজে ব্যবহারযোগ্য শ্রম-শক্তি ও পুঁজির ভাগী নয়। "যাদের কাঁচামাল অধিক আছে তারাই ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আঙ্গুল ঘোরাবে। .... এই কথা চিন্তা করে আমি ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠছি। অন্য কারণে নয়।"[৩০] তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কালের কপোলতলে আজকের উন্নত দেশ ভবিষ্যৎ বিপদের সম্মুখীন হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের সুযোগ-সুবিধা আস্তে-ধীরে ক্ষয়ে যাবে।

---

২৮. দেখুন K. Wicksell-এর Lectures on Political Economy, Translated by E. Classen, George Routledge and Sons, Ltd. : London, 1934, I, 214.

২৯. Marshall : Principles, পৃ: ৬৮০।

৩০. Alfred Marshall-এর Memorandum on the Fiscal Policy of International Trade," Official papers, Macmillan & Co. Ltd., London, 1926, 402, দ্রষ্টব্য।

অনুন্নত দেশ বসে নেই। তারা তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হয়ে উঠবে। তখন উন্নত দেশগুলিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। "স্বাধীনতা আর নিয়মানুবর্তিতা, ব্যক্তি-প্রচেষ্টা আর রীতিসিদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধতায় ইংল্যাণ্ড সবার উপরে। এই সব গুণের বলে শিল্পোৎপাদনে সে অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা দিয়ে আর ভবিষ্যৎ রক্ষা করা যাবে না। কারণ, আজকে বিজ্ঞানের যুগ। যন্ত্রের জয়জয়কার। কাজেই, দিনে দিনে ইংল্যাণ্ডকে ক্রম-বর্ধমান বাধাব সম্মুখীন হতে হবে। তা কেবল জাপানের কাছ থেকে নয়। জাপান সূক্ষ্ম বিশারদ, সে নির্বিবাদে পশ্চিমা প্রণালী নিজের করে নিতে পারে। অন্যান্য দেশ থেকেও বাধা আসবে। বিশেষ করে নিম্নক্ষমতাধারী শ্রমিক সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান অথচ উদ্যোক্তা তেমন নেই সেই সব দেশ থেকেও প্রতিযোগিতা আসবে। আমেরিকাতে ইতিমধ্যেই সেই প্রবণতা জন্ম নিয়েছে। অন্যান্য মহাদেশও পিছপা হয়ে থাকবে না।"[৩১]

৫. উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক দিক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কেও নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী ধন-বিজ্ঞানীরা মত ব্যক্ত করেছেন। রূপরেখা গড়ে তুলেছেন। বর্তমান আলোচনায় এদিকটাও একটু জেনে নেয়া দরকাব। কারণ, তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাব আজও প্রবহমান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিগ্-বলয়ে আপন গরিমায় বিরাজমান। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনায় মুখর।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা আঙ্গিক হিসাবে ক্লাসিক্যালবাদীদের নক্সাই অনেকটা মেনে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা-প্রকৃতি স্থৈতিক কাঠামোতে আলোচনা করেছেন। মূলতঃ তাঁরা দুটো সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন। দেশে দেশে কেন বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে এবং কিভাবে তার আকার-ইঙ্গিত রূপায়িত হয় ? কোন্ পথ অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাব নিষ্কাষিত হয় ? কিভাবে দেনা-পাওনা মেটানো হয় ? এই দুটো বিষয়ের উত্তর প্রদানে আলোচনা মোটামুটি সীমিত রেখেছেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য কেন ঘটে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে তাঁরা ক্লাসিক্যাল তুলনামূলক ব্যয় বিধিতে আরও স্পষ্টতা দান করেছেন।

৩১. Marshall-এর প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা ৪০৪।

সীমারেখা বিস্তৃত করেছেন। এই বিধির মূল বক্তব্য হচ্ছে অবাধ বাণিজ্য পরিবেশে প্রতিটি দেশ দক্ষতার ভিত্তিতে জিনিস-পত্তর উৎপাদনে প্রয়াসী হয়। যে দেশ যে জিনিস উৎপাদনে অধিক দক্ষ সেই দেশ সেই জিনিস উৎপন্ন করে এবং বিদেশে রপ্তানি করে আর যে জিনিস উৎপাদনে তার দক্ষতা অপেক্ষাকৃত কম সেই জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী করে। তুলনামূলক বিধির সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে প্রতিটি দেশ উৎপাদন স্থির করে এবং আমদানী-রপ্তানি ঘটায়। উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ সবদেশে সমান নয়। কোন দেশে উর্বরা জমি বেশী। কোন দেশে পুঁজি-সংভার অধিক। যেদেশে জমি অধিক সে দেশ কৃষি-পণ্য উৎপাদন করবে। যে দেশে পুঁজি-সামগ্রী বেশী সে দেশ শিল্পজাত দ্রব্য অধিক উৎপন্ন করবে। অর্থাৎ উপাদান সামগ্রীর আপেক্ষিক পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে মনোনিবেশ করে এবং তুলনামূলক ব্যয় বিধির সূত্র ধরে আমদানী-রপ্তানির রূপরেখা গড়ে তোলে। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সব দেশ লাভবান হয়। যে দেশে যে জিনিসের উৎপাদন সুবিধা বিরাজমান সেই দেশ সেই পণ্য উৎপাদন করে আর বাকী জিনিস বিদেশ হতে আমদানী করে। ফলে, সকলেরই লাভ হয়। বিশ্ব-উৎপাদন অধিক হয়। অথচ বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত না হলে এই সুযোগটুকু থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

তুলনামূলক ব্যয়ের এই তত্ত্বকে পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করে ক্লাসিক্যাল মতবাদীদের ন্যায় নয়া-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরাও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রতিটি দেশের জাতীয় আয়ে প্রকৃত বর্ধন ঘটে। বাজার-পরিসর ব্যাপ্ত হয়। ফলে শ্রম-বিভাগ অধিক হয়। দক্ষতা বাড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অথচ ব্যয় কমে। আয়ে সম্প্রসারণ ঘটে। অধিক আয় থেকে অধিক হারে সঞ্চয় আসে। তাতে আভ্যন্তরীণ মূলধন-সংগঠন জোরদার হয়।

অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে কিন্তু নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা ক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিকদের ন্যায় তেমন উচ্চবাচ্য করেননি। তাঁরা বরং অবাধ বাণিজ্যের অসুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ক্লাসিক্যালবাদীরা বাধাহীন বাণিজ্যের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাঁদের প্রদত্ত তুলনামূলক ব্যয়বিধি ও অধিক শ্রম বিভাগ অবাধ বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে উদঘাটিত হয়েছিল। নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে তেমন সোচ্চার হতে

পারেননি। যুক্তিও দেননি যে অবাধ বাণিজ্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়। তাই তাঁরা বলেন, "অবস্থাভেদে আমদানী-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তাতে হয়ত দেশ অধিক লাভবান হতে পারে।"[৩২] বাণিজ্য শর্ত (terms of trade) অনুকূল হয়ে অধিক সুবিধা দিতে পারে। এদিকে প্রযুক্তিক অগ্রগতির ফলে দেশ হয়ত কিছুটা বেকায়দায় পড়তে পারে। কেননা তার বাণিজ্য অনুপাত সরাসরি প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে।[৩৩] 'শিশুশিল্প' (infant industry argument) যুক্তিও প্রদর্শন করেছেন। এই যুক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানব শিশুকে যেমন শৈশবে সংরক্ষণ ও লালন-পালন করা প্রয়োজন, তেমনি দেশের কঁচি শিল্পকেও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশে শিল্পের প্রতিযোগিতার কবল থেকে মুক্ত রাখা বাঞ্চনীয়। "পরিপুষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার নিমিত্তে সংরক্ষণী শুল্ক আরোপ সমর্থন করা যেতে পারে।"[৩৪] বলেছেন মার্শাল। মার্শাল অপর একটা মজার যুক্তিও প্রদান করেছেন। বলেছেন, দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ প্রাচীর গড়ে তোলা যেতে পারে। তাতে অর্থনীতির শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টি সাধন হতে পারে।" "গুটি কয়েক উন্নতমানের শিল্প গড়ে উঠলে তার প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাতে দেশের শিল্প অগ্রগতি বলবান হতে পারে।"[৩৫] কোন কোম নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের ফলে আজকের সুপ্রতুল উপাদান ভবিষ্যতে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। অনেক উপকরণ থেকে পাওয়া আয় হ্রাস পেতে পারে।[৩৬]

সে যাই হউক, অবাধ বাণিজ্যের এই সব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা মোটামুটি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন। "কতক দেশে হয়ত সংরক্ষণ

---

৩২. দেখুন F. Y. Edgeworth-এর Papers Relating to Political Economy, Macmillan and Co. Ltd., London, 1925, II, 16-17. এখন থেকে Edgeworth, papers বলে উল্লেখ করা হবে।

৩৩. আলোচনা করুন C.F. Bastable-এর The theory of International Trade, 4th. Edition, Macmillan and Co., Ltd., London, 1903, Appendix C, 185-187, Edgeworth ও Nicholson-এর বাদানুবাদ তাতে পাবেন।

৩৪. A. Marshall-এর Money, Credit and Commerce, Macmillan and Co. Ltd., London, 1929, 218, এখন থেকে উল্লেখ করা হবে Marshall, Money Credit and Commerce বলে।

৩৫. দেখুন H. Sidgwick-এর Principles of Political Economy, Macmillan and Co. Ltd., London, 1883, 494-497.

নীতি কিছুটা লাভজনক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে সরকারকে সচেতন হতে হবে এবং বিজ্ঞচিত নীতিমালা প্রণয়ন করে নিতে হবে। শিল্পে শিল্পে গুণাগুণ বাছাই করে এগুতে হবে এবং কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কিন্তু, বহুদেশই এই শর্ত মেনে চলতে অপারগ।"[৩৭] তাই তাঁদের অনেকেই বলেছেন, "সাধুতার ন্যায়, অবাধ বাণিজ্যই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।"[৩৮]

রীতিসিদ্ধ আঙ্গিক গাঁথতে যেয়ে নব্য-ক্ল্যাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা (ক্লাসিক্যালবাদীদের মত) উন্নয়ন-অগ্রগতির ঐ সকল প্রান্তে জোর প্রদান করেছেন যেগুলো সম্পদ বরাদ্দকরণের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ উপাদান বরাদ্দকরণ সুষ্ঠু হয়ে সদ্ব্যবহার মাধ্যমে অগ্রগতি বেগবান করায় সক্ষম। তেমনি বাণিজ্য উৎসারিত জাতীয় আয় বর্ধনজনিত উপকরণ সম্প্রসারণ ক্রিয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত। শ্রম ও পুঁজি সঞ্চালন আন্তর্জাতিকভাবে প্রবাহিত হয়ে উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম জোরদার করে বলে কিন্তু মত প্রকাশ করেননি। বরং এই গতিধারার সমালোচনা করেছেন।[৩৯]

এদিকে আবার নিজেদের প্রদত্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, উৎপাদন উপকরণ তথা শ্রম ও পুঁজি আন্তর্জাতিকভাবে তেমন স্থবির নয় বটে, তবে অন্তর্দেশীয় চলাচলের তুলনায় অবশ্যই নগণ্য। তাই মার্শাল বলেন, "সাধারণভাবে পুঁজিপতি নিজের দেশেই পুঁজি খাটাতে চায়। সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল না হলেও। লাভালাভের ভাগ তেমন অধিক না হলেও, অন্য দেশে সহজে যেতে চায় না। দেশের অন্য অংশে যেতে হয়ত তেমন আপত্তি নেই, যদি একই কাজ দিয়ে অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু, অন্যদেশে চলে যাওয়া স্বতন্ত্র কথা। তা সহজে হতে চায় না।[৪০] এই যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁরা স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির কথা বলেছেন।

৩৭. Edgeworth, Papers II, পৃঃ ১৮।

৩৮. ঐ, পৃঃ ১৭। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের সমালোচনা পঞ্চদশ অধ্যায় তৃতীয় ভাগ ও ঊনবিংশ অধ্যায়, প্রথম ভাগে দেখুন।

৩৯. বিশদ জানতে হলে J. H. Williams-এর Postwar Monetory Plans and other Essays, Alfred A. Knopt, New York, 1945, 134-135 দেখুন।

৪০. Marshall : Money Credit and Commerce, পৃঃ ১০।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী আরও বলেছেন যে, তাঁদের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত 'পুরানো' ও 'নতুন' দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনায় তেমন পারঙ্গম নয়। গাণিতিক যে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা তুলনামূলক ব্যয়বিধি উদঘাটিত করেছেন তা দুটো উন্নত দেশের মাপকাঠিতে। অনুন্নত দেশের আঙ্গিকে নয়। উপকল্প হিসাবে ধরেছেন যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ-হেতু আন্তর্জাতিকভাবে জনাগম ও মূলধনাগম নেই বলে ভাবা যায়। শিল্পোন্নত দেশ ও নব অধ্যুষিত দেশেব বাণিজ্যিক সম্পর্ক বরং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যনীতির পরিমাপে হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি এক্ষেত্রে তেমন প্রযুজ্য নয়।

নব অধ্যুষিত দেশে শ্রম ও মূলধনাগম প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সেই দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে থাকে। একথা তাঁরা বলেছেন এবং বলেছেন বেশ স্পষ্টভাবে। মার্শাল মন্তব্য করেন, "আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুসারে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য রূপ নেয়। কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক জলপথ উৎসারিত না হলে বাণিজ্য উন্নত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ন্যায় হয়। এ একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে বটে। আর এই ব্যতিক্রম উপনিবেশবাদী দেশের বেলায়। উন্নতদেশ থেকে আগত ঔপনিবেশিক দল খনিজ, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো নিজেদের এখতিয়ারে নিয়ে নেয়। কিন্তু, মূলধন আনে স্বদেশ থেকে। তা দিয়ে রেলপথ ইত্যাদি স্থাপন করে দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর অবধি। শত শত উপায়ের মধ্যে এই উপায়েও বৈদেশিক বাণিজ্য শিল্পের বহুমুখীকরণ সম্ভব করে তোলে।"[৪১] শিল্পখাত সম্প্রসারিত হয়। উন্নয়ন পথে এগিয়ে যায়। সার্বিক উন্নয়ন জোরদার করে। "প্রাচুর্য এনে দেয় পুরানো ও নতুন দেশে।[৪২] পুরানো দেশ নতুন বাজার পেয়ে লাভবান হয়, তেমনি শ্রম বিভাগ দিয়ে। নতুন দেশ লাভপায় বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসূত সম্পদ দিয়ে। রাস্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদির উন্নতি দিয়ে। পোতাশ্রয় উন্নয়নের মাধ্যমে।[৪৩] উপাদান সঞ্চালন উৎসারিত এই উন্নয়ন-অগ্রগতি অনেকটা আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণের ন্যায়। আর এই সম্প্রসারণ সুসমঞ্জসধর্মী হয়। বিশেষ করে গোড়ার দিকে।[৪৩]

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
৪২. ঐ, পৃঃ ২০৩।
৪৩. মার্শাল সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশা বোধ করেছেন। পূর্বে তা উল্লেখিত হয়েছে।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীদের যুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক মূলধন স্থানান্তর মোটামুটি শান্তভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাণিজ্যিক লেনদেনে তেমন বিষম পরিস্থিতির জন্ম দেয় না। দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত যন্ত্রে (balance of payments mechanism) সাম্য বজায় রাখার মত যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে—বলেন তাঁরা। দুইটি দেশের মধ্যে সকল বস্তু ও সেবার মূল্য বাবদ মোট দেনা-পাওনার হিসাব মানে দেনা-পাওনা উদ্বৃত্ত। তাঁরা বলেন, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মূলধন স্থানান্তর পরিমাণ নির্ণীত হয়। আমদানী-রপ্তানি দ্রব্য ও সেবার বাবদ মোট মূল্য সাম্য পর্যায়ে থাকা মানে আন্তর্জাতিক লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি বিরাজ করা। তাঁদের মতে আমদানী-রপ্তানির বিয়োগফলে কেবল স্থানান্তরিত মূলধনের উদ্বৃত্ত দেখা যাবে। অন্য উদ্বৃত্ত ঘটবে না। আর যদি বা ঘটে স্বর্ণ চলাচল অথবা স্বল্পমেয়াদী মূলধন সঞ্চালন হয়ে ভারসাম্য বজায় রাখবে। কেননা, হিসাব-নিকাশেব আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উভয় দিক সদৃশ হতে বাধ্য। কিন্তু, স্বর্ণ বা স্বল্পমেয়াদী মূলধন বেশীদিন একদিকে প্রবাহিত হতে পারে না। কারণ দেশের স্বর্ণ-পরিমাণ সীমাহীন নয়। কাজেই অনেককাল ধরে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিতে পারে না। তাই, ক্ল্যাসিক্যালবাদীর মত নয়া ক্লাসিক্যালবাদীরাও বলেন যে, দীর্ঘকালীন পরিসরে মূলধন সঞ্চালন স্বর্ণ বা স্বল্পমেয়াদী পুঁজি গতায়াত অপ্রয়োজনীয় করে তুলে।[৪৪]

নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা ঋণ দেয়া-নেয়ার অন্তত পাঁচটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। দেশকে এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করতেই হবে। প্রথমতঃ, উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রথম দিকে যে কোন দেশ অধিক হারে পুঁজি আমদানী করতে বাধ্য হয় দীর্ঘকালীন সময়েব বিবেচনায়। দেয় নীট সুদ ও লভ্যাংশ নীট মূলধনাগম অপেক্ষা অধিক হয়। কাজেই দেশের চলতি হিসাবে (current account) নীট ঘাটতি ঘটবে। এমনকি দেয় নীট সুদ ও লভ্যাংশ বাদ দিলেও।[৪৫] দেশ নবীন। খাতক হিসাবেও নতুন। আস্তে আস্তে সুদের পরিমাণ বেড়ে যায়। লভ্যাংশ

---

৪৪. ক্লাসিক্যালবাদীদের ভারসাম্য পন্থা জানতে হলে প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠভাগ আলোচনা করুন। নব্য-ক্লাসিক্যাল ধ্যান-ধারণা মোটামুটি একইরূপ।

৪৫. চলতি হিসাবে দ্রব্য সামগ্রী কায়-কারবার, সুদ ও লভাংশ (দেনা-পাওনা উভয়) ধরা হয়। যানবাহন, বীমা, পর্যটন ইত্যাদি খাতে দেনা-পাওনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ঘাটতি ঘটে যখন এইসব খাতে মোট পাওনা দেনা অপেক্ষা কম হয়। বিপরীতক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ঘটে।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী আরও বলেছেন যে, তাঁদের তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত 'পুরানো' ও 'নতুন' দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনায় তেমন পারঙ্গম নয়। গাণিতিক যে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা তুলনামূলক ব্যয়বিধি উদঘাটিত করেছেন তা দুটো উন্নত দেশের মাপকাঠিতে। অনুন্নত দেশের আঙ্গিকে নয়। উপকল্প হিসাবে ধরেছেন যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ-হেতু আন্তর্জাতিকভাবে জনাগম ও মূলধনাগম নেই বলে ভাবা যায়। শিল্পোন্নত দেশ ও নব অধ্যুষিত দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বরং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যনীতির পরিমাপে হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি এক্ষেত্রে তেমন প্রযুজ্য নয়।

নব অধ্যুষিত দেশে শ্রম ও মূলধনাগম প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সেই দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে থাকে। একথা তাঁরা বলেছেন এবং বলেছেন বেশ স্পষ্টভাবে। মার্শাল মন্তব্য করেন, "আভ্যন্তরীণ যোগা-যোগ ব্যবস্থা অনুসারে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য রূপ নেয়। কিন্তু এই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক জলপথ উৎসারিত না হলে বাণিজ্য উন্নত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ন্যায় হয়। এ একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে বটে। আর এই ব্যতিক্রম উপনিবেশবাদী দেশের বেলায়। উন্নতদেশ থেকে আগত ঔপনিবেশিক দল খনিজ, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো নিজেদের এখতিয়ারে নিয়ে নেয়। কিন্তু মূলধন আনে স্বদেশ থেকে। তা দিয়ে রেলপথ ইত্যাদি স্থাপন করে দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর অবধি। শত শত উপায়ের মধ্যে এই উপায়েও বৈদেশিক বাণিজ্য শিল্পের বহুমুখীকরণ সম্ভব করে তোলে।"[৪১] শিল্পখাত সম্প্রসারিত হয়। উন্নয়ন পথে এগিয়ে যায়। সার্বিক উন্নয়ন জোরদার করে। "প্রাচুর্য এনে দেয় পুরানো ও নতুন দেশে।[৪২] পুরানো দেশ নতুন বাজার পেয়ে লাভবান হয়, তেমনি শ্রম বিভাগ দিয়ে। নতুন দেশ লাভপায় বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসূত সম্পদ দিয়ে। রাস্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদির উন্নতি দিয়ে। পোতা-শ্রয় উন্নয়নের মাধ্যমে।[৪৩] উপাদান সঞ্চালন উৎসারিত এই উন্নয়ন-অগ্রগতি অনেকটা আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণের ন্যায়। আর এই সম্প্রসারণ সুসমগ্রসধর্মী হয়। বিশেষ করে গোড়ার দিকে।[৪৩]

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
৪২. ঐ, পৃঃ ২০৩।
৪৩. মার্শাল সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশা বোধ করেছেন। পূর্বে তা উল্লেখিত হয়েছে।

নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীদের যুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক মূলধন স্থানান্তর মোটামুটি শান্তভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাণিজ্যিক লেনদেনে তেমন বিষম পরিস্থিতির জন্ম দেয় না। দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত যন্ত্রে (balance of payments mechanism) সাম্য বজায় রাখার মত যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে—বলেন তাঁরা। দুইটি দেশের মধ্যে সকল বস্তু ও সেবার মূল্য বাবদ মোট দেনা-পাওনার হিসাব মানে দেনা-পাওনা উদ্বৃত্ত। তাঁরা বলেন, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মূলধন স্থানান্তর পরিমাণ নির্ণীত হয়। আমদানী-রপ্তানি দ্রব্য ও সেবার বাবদ মোট মূল্য সাম্য পর্যায়ে থাকা মানে আন্তর্জাতিক লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতি বিরাজ করা। তাঁদের মতে আমদানী-রপ্তানির বিয়োগফলে কেবল স্থানান্তরিত মূলধনের উদ্বৃত্ত দেখা যাবে। অন্য উদ্বৃত্ত ঘটবে না। আর যদি বা ঘটে স্বর্ণ চলাচল অথবা স্বল্পমেয়াদী মূলধন সঞ্চালন হয়ে ভাবসাম্য বজায় রাখবে। কেননা, হিসাব-নিকাশেব আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব উভয় দিক সদৃশ হতে বাধ্য। কিন্তু, স্বর্ণ বা স্বল্পমেয়াদী মূলধন বেশীদিন একদিকে প্রবাহিত হতে পারে না। কারণ দেশের স্বর্ণ-পরিমাণ সীমাহীন নয়। কাজেই অনেককাল ধরে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিতে পারে না। তাই, ক্ল্যাসিক্যালবাদীর মত নয়া ক্লাসিক্যালবাদীরাও বলেন যে, দীর্ঘকালীন পরিসরে মূলধন সঞ্চালন স্বর্ণ বা স্বল্পমেয়াদী পুঁজি গতায়াত অপ্রয়োজনীয় করে তুলে।[৪৪]

নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদীরা ঋণ দেয়া-নেয়ার অন্তত পাঁচটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। দেশকে এই পাঁচটি স্তব অতিক্রম করতেই হবে। প্রথমতঃ, উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রথম দিকে যে কোন দেশ অধিক হারে পুঁজি আমদানী কবতে বাধ্য হয় দীর্ঘকালীন সময়ের বিবেচনায়। দেয় নীট সুদ ও লভ্যাংশ নীট মূলধনাগম অপেক্ষা অধিক হয়। কাজেই দেশের চলতি হিসাবে (current account) নীট ঘাটতি ঘটবে। এমনকি দেয় নীট সুদ ও লভ্যাংশ বাদ দিলেও।[৪৫] দেশ নবীন। খাতক হিসাবেও নতুন। আস্তে আস্তে সুদের পরিমাণ বেড়ে যায়। লভ্যাংশ

৪৪. ক্লাসিক্যালবাদীদেব ভারসাম্য পন্থা জানতে হলে প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠভাগ আলোচনা করুন। নব্য-ক্লাসিক্যাল ধ্যান-ধারণা মোটামুটি একইরূপ।

৪৫. চলতি হিসাবে দ্রব্য সামগ্রী কায়-কারবার, সুদ ও লভাংশ (দেনা-পাওনা উভয়) ধরা হয়। যানবাহন, বীমা, পর্যটন ইত্যাদি খাতে দেনা-পাওনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ঘাটতি ঘটে যখন এইসব খাতে মোট পাওনা দেনা অপেক্ষা কম হয়। বিপরীতক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ঘটে।

(Divident) অধিক হয়। সময় পরিধিতে ঋণের চাপ নীট মূলধনাগম ছাড়িয়ে যায়; দেশ দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তার চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তি দেখা দেয়; দেয় নীট সুদ আর লভ্যাংশ বাদ দিয়ে। কিন্তু, নীট সুদ আর লভ্যাংশ যে ফুলে ফুলে বিরাট বপুসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কাজেই, দেশের সার্বিক চলতি হিসাবে নীট ঘাটতি দেখা দেয়।

উত্তরণ-পর্ব এগিয়ে চলে। দেশের টনক নড়ে। ঋণের মাত্রা কমতে শুরু করে। অন্যান্য দেশে পুঁজি খাটাতে প্রবৃত্ত হয়। দীর্ঘকালীন বিবেচনায় এই মূলধন-নির্গম মূলধনাগম ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ দেশ খাতক থেকে মহাজন হয়ে ওঠে। তার দীর্ঘমেয়াদী মূলধন রপ্তানি অধিক হয়। কিন্তু, দেয় সুদও লভ্যাংশের বোঝা এখনো ঘাড়ে চেপে। পাওনা সুদ আর লভ্যাংশ অপেক্ষা তা এখনো অধিক। সুতরাং নীট হিসাবে দেশ এখনো অধমর্ণ। অবশ্য তার চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। অর্থাৎ দেশ সাবালক হয়ে উঠেছে। এখনো খাতক বটে, তবে পাকা-পোক্ত খাতক—আগের মত অর্বাচীন নয়।

চতুর্থ পর্যায় এগিয়ে আসে। দেশের পাওনা নীট সুদ ও লভ্যাংশ অধিক হয়। দেশ নবীন মহাজন হয়ে উঠে। মূলধন-নির্গম অবশ্য এখনো বেশী। অর্থাৎ পাওনা সুদও লভ্যাংশ অপেক্ষা অধিক। সুতরাং তার চলতি হিসাব সুদ এবং লভ্যাংশ বাদ দিয়েও উদ্বৃত্ত হয়।

সর্বশেষ পর্যায়ে দেশের প্রাপ্য নীট সুদ ও লভ্যাংশ সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মূলধন-নির্গম ছাড়িয়ে যায়। প্রাপ্য নীট সুদ ও লভ্যাংশ বাদ দিলে চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা যায় বটে। কিন্তু, সার্বিক হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। দেশ হয়ে দাঁড়ায় সাবালক উত্তমর্ণ।

৬. নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদের মূল্যায়ন

উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কিত তত্ত্বের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে উন্নয়ন কার্যক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বলিষ্ঠ উদঘাটনে। আন্ত-সম্পর্কিত উপাদানাবলীর স্পষ্ট উদ্ভাসনে। নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদ ও তার ব্যতিক্রম নয়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া প্রস্ফুটিত করার তার সক্ষমতার মানদণ্ডে তার স্বার্থকতা যাচাই করতে হবে। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা ধারণাভিত্তিক আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীও একই পথ অনুসরণ করেছেন। উন্নত পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি

বিশ্লেষণে তাঁরা দেয় ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন। ধরে নিয়েছেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান বলে। কল্পনা করেছেন দেশবাসী 'অগ্রগতি লাভে' পাগল হয়ে আছে। মেনে নিয়েছেন সঞ্চয়স্পৃহা ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান বলে। রুচিজ্ঞান ও মাত্রা দেয় বলে। দক্ষ শ্রমিক ও নিপুণ কার্য-নির্বাহী সরবরাহ পর্যাপ্ত হিসাবে। উপাদান সামগ্রীর অন্তর্দেশীয় সঞ্চালন তীব্রতর বলে। ধারণা করেছেন অর্থনীতিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান হিসাবে। অর্থনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি স্বতঃপ্রবহমান বলে। জোর আরোপ করেছেন লোকসংখ্যা বর্ধনে, ধন-সম্পদ ও পুঁজি-সামগ্রীর পরিমাণগত সম্প্রসারণে এবং আঙ্গিকগত পরিবর্ধন ও সংযোজনে। উন্নয়ন কার্যক্রিয়ার ধারাপ্রবাহ অনুধাবনে এগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে।

কিন্তু, উন্নয়ন সমস্যা অনুধাবনে এই দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ নয় কি? পট সীমিত বলে সমালোচনা করা যায় না কি? অবশ্যই করা যায়। কেননা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হিসাব-নিকাশের বস্তু নয়। দেশবাসীর দৃষ্টি-ভঙ্গি কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসাব করা যায় না। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দিয়ে এই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে না। এই সকল কথা ভেবে মার্শাল অবশ্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন। বলেছেন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতার কথা। আট-ঘাট বাধা তাত্ত্বিক নাগপাশে তাই নিজকে জড়িয়ে রাখেননি। পর্যালোচনায় ছাড়িয়ে গিয়েছেন ধরা-বাধা বুলি। অতিক্রম করে গিয়েছে রীতিসিদ্ধ বিধি-প্রণালী। অর্থনৈতিক জগৎ ছাড়িয়ে বিচরণ করেছেন অন্যত্র। সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন বাইরের ঘটনাবলী। তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনুধাবনে। কিন্তু, তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বাকী সবায় স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছেন। ধরা-বাধা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বিস্তৃত পট উপেক্ষা করেছেন।

নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদ সম্পর্কে অপর একটা শক্ত সমালোচনা হচ্ছে উন্নয়ন-অগ্রগতি শক্তিনিচয় সম্পর্কে তাঁদেয় বদ্ধমূল ধারণা। তাঁদের মতে উন্নয়ন ক্রমধারাবাহী হয়। উন্নয়ন-অগ্রগতি সংঘটনকারী শক্তিনিচয় আস্তে ধীরে অথচ নিরন্তর গতিতে প্রবাহিত হয়। তার মানে উন্নয়ন পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে বিরাজমান থাকে। ফলে, হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে চলা যায়। চুলচেরা বিচার-বিবেচনা করে মাঠে নামা যায় এবং তাহলে

ফল অবধারিত। অর্থাৎ স্বার্থকতা সুনিশ্চিত। কাজেই মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব কার্যকরীভাবে ক্রিয়া করতে পারে। উৎপাদন-আঙ্গিক সুসমঞ্জস ও সুসংহত করে দিতে পারে। বর্তমানকালে যেমন ভবিষ্যতেও তেমন। সুদের হার বিনিয়োগ-মাত্রার সপুষ্ট নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। কাজেই, উন্নয়ন-অগ্রগতিতে বাধা বলে কিছুই নেই। বিষম ও অসংযত পরিবেশ বলে কিছু নেই। ক্ষেত্র একেবারে পরিষ্কার। কেবল চাষ করলেই সোনা ফলবে। কিন্তু যদি ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহলেই তাঁদের আলোচনা কুপোকাত। ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সহজ নয়। সুতরাং, সুদের হারে অধিক গুরুত্ব আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, তেমন অবস্থায় সুদের হার বিনিয়োগকারীর গতিবিধি পর্যালোচনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

তারপর নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীরা বলেছেন উন্নয়ন-অগ্রগতি ঐক্যতানধর্মী। উন্নয়ন সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। সমাজের সর্বস্তরে সুবিধা প্রদান করে। এই ধারণা ক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া চিন্তাধারারই সর্বশেষ পরিণতি। এক্ষণে উন্নয়ন ক্রমবিকাশে সন্দেহ দেখা দিলে এই আলোচনায় গুরুত্ব হারিয়ে বসে। ভাঙ্গনধর্মী প্রবণতা ও ক্ষতিকারক প্রভাব বিশ্লেষণে অক্ষম হয়ে উঠে। অথচ নব্য-ক্লাসিক্যালবাদী এদিকে তেমন লক্ষ্যই দেননি।

সর্বশেষ মন্তব্য হিসাবে নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীদের কর্মসংস্থান উপকল্প নিয়ে দু'কথা বলা যাক। তাঁরা বলেছেন, সবসময় পূর্ণ কর্মসংস্থান পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে। অথচ পূর্ণ কর্মসংস্থান পরিবেশে সাকুল্য চাহিদা কেমন হবে তা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেননি। অথবা উল্লেখ করেননি কিভাবে সাকুল্য চাহিদামাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে বজায় রাখা যাবে। তাঁদের প্রদত্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বও একই দোষে দুষ্ট। মনে করা যাক পূর্ণ কর্মসংস্থান বিরাজমান নয় (এবং ইহাই বাস্তব সত্য)। বিভিন্ন দেশের সরকার স্বর্ণ মানের 'আইনবিধি' মেনে চলতে তেমন ইচ্ছুক নয়। তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাঁদের প্রদত্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেন-দেন পদ্ধতি যে স্বীয় কার্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে উঠবে। সুতরাং, তাঁদের এই আলোচনাও সুষ্ঠু নয়। তাতেও সংশোধন অত্যাবশ্যকীয়। যদি তাই হয়, তাহলে মূল্য তত্ত্ব দিয়ে যে সব কথা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক্ষেত্রেও যে অন্য হাতিয়ারের সাহায্য নিতে হবে।[৪৬]

৪৬. দেখুন একাদশ অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ।

শুধু তাই নয়, উন্নয়ন অগ্রগতি ক্রমিক হারে এগোয় না বরং বিচ্ছিন্ন ও হঠাৎ করে কোন সময়ে এগিয়ে যায় একথা সত্য হলে তাঁদের অবাধ বাণিজ্য-নীতিও যে অনেকাংশ অপ্রাসংগিক হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সুসমঞ্জস গতিতে এগোয় না। অথচ তাঁরা তাই ধরে নিয়েছেন এবং সেই ছকে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালাই করে নিয়েছেন। কিন্তু, বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা সত্য নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুম্পিটারীয় বিশ্লেষণ

উন্নয়ন ধারা বিশ্লেষণে ধনবিজ্ঞানীরা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তাই নিয়ে মাথাব্যথা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রবাদকে নিরন্তর প্রবাহী স্বার্থক অগ্রগতি সাধনে অক্ষম বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রিকার্ডো যুক্তি দিয়েছেন, ধনতন্ত্রবাদ স্থবির পর্যায়ে নেমে আসবে, মজুরীহার ন্যূনতম প্রয়োজনের পর্যায়ে থাকবে। মার্ক্স বলেছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আপনা থেকে ফেটে পড়বে এবং লাঞ্ছনাময় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে। বন্ধ্যাত্ব বা স্থবিরত্ব মতবাদীরা (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যুক্তি দিয়েছেন যে, পরিপক্ক ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঙ্কটময় বেকারত্বের কোলে ঢলে পড়বে।

এই হতাশাব্যঞ্জক যুক্তিজালে বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্ম হয়েছে এবং অনেকেই তার শিকার হয়েছেন। কিন্তু, সুম্পিটার তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। পুঁজিবাদ নিয়ে তাঁর আলোচনা, অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে, এদিনকার উৎকণ্ঠার একটা আনন্দময় পরিসমাপ্তির নির্দেশ বহনকারী।

সুম্পিটারের বিশ্লেষণে অমোঘ ক্রমহ্রাসমান বিধি অনুপস্থিত। তেমনি ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের ভয়ভীতি অবর্তমান। কাজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেয়ার মত প্রবণতা (যেমন আছে রিকার্ডোর ব্যাখ্যাতে) বিদ্যমান নেই। অথবা আয়ের সহজাত বৈষম্যমূলক ঝোঁক বিরাজমান নেই। সুতরাং মারাত্মক সংকট পরম্পরা (মার্ক্সবাদ অনুযায়ী) দেখা দেয়া স্বাভাবিক নয়। তাঁর আলোচনায় এমন কথাও নেই যে বিনিময় সম্ভাবনা সর্বক্ষণ সীমিত থাকবে যা নাকি প্রতিষ্ঠানিক ঋজুবদ্ধতার সাথে সংযুক্ত হয়ে পূর্ণ সংস্থান পরিস্থিতিতে না পৌঁছেই বন্ধ্যাত্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে (বন্ধ্যাত্ববাদী বা জড়ত্ববাদী)। বরং তাঁর আলোচনার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ পাওয়া যায়। কেবল অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর জোরেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিনে দিনে উচ্চ থেকে উচ্চতর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। মাঝে মাঝে হয়ত কিছুটা বাধা-বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। তবে তা মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু কষ্টকর একটা ক্ষত তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় এবং এদিক থেকে তিনি অনেকটা মার্ক্স-এর অনুসারী। তাঁর মতেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

স্বার্থকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে তার ধ্বংসের বীজ। পুঁজিবাদতন্ত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিকে এমন সব পরিবর্তন এনে দেয় যা সমস্ত ব্যবস্থাটাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং "এক অর্থে সুম্পিটার সবচেয়ে অনমনীয় জড়ত্ববাদী"।[১]

১. সুম্পিটারীয় পরিজ্ঞান (Schumpeters Vision)

সুম্পিটার প্রথমেই নাকচ করে দেন নয়া-ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা। সুষম ও ক্রম অগ্রসরমান উন্নয়ন-অগ্রগতি বলে তাঁর ধারণায় কিছু নেই।[২] তিনি বলেন, উন্নয়ন ঘটে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে। উৎপাদন পরিসর ব্যাপ্ত হয় তাল-লয়হীন তালে। নব নব বিনিয়োগ দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সাথে সাথে উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম জোরদার হয়ে উঠে। কিছুকাল প্রাচুর্যপর্ব চলে। আবার মন্দা দেখা দেয়। গত শতাব্দীর রেলপথ প্রসার উন্নয়নে জোয়ার এনে দিয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর বৈদ্যুতিক ও মোটরযান উন্নয়ন-বেগ ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁর মতে এই জাতীয় ঘটনা উন্নয়নক্ষেত্রে ত্বড়িত প্রবাহ জন্ম দেয়। ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রসারে তা যেমন চিত্তবিনোদনকারী তেমনি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণও বটে।

সুম্পিটার-পূর্ব ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র মার্ক্স এই জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন উন্নয়ন গতি চলমান, তবে অনবচ্ছিন্ন ধারায় নয়। সুতরাং সুম্পিটারের উপর মার্ক্স-এর প্রভাব পরি-দৃশ্যমান। তবে এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী নয়। সুম্পিটাব মার্ক্স-এর চলিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়েছেন বটে। কিন্তু, তাঁর বিশ্লেষণীয় আঙ্গিক ও হাতিয়ার মেনে নেননি। সবচেয়ে মতের দিক থেকে তাঁদের গরমিল

---

১. দেখুন Arthur Smithies-এর "Joseph Alois Schumpeter," American Economic Review, XL, No. 4, 640 (Sept. 1950).

২. উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কিত সুম্পিটারের প্রধান প্রধান রচনাবলী হচ্ছে: The Theory of Economic Development, Translated by R. Opic (বাংলায় অনুবাদ, মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিতব্য): Business cycles, Capitalism, Socialism and Domocracy; Imperialism and Social classes. এখন থেকে Schumpiter, Theory of Economic Development, Business cycles, Capitalism, Socialism and Democracy, Imperialism and Social classes বলে উল্লেখ করা হবে।

আকাশ-পাতাল। বস্তুতঃ খুব কম ধনবিজ্ঞানীই সুম্পিটারের মত মার্ক্স-এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি বরং নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীদের পথ অনুসরণ করে এগিয়েছেন। বিশেষ করে ওয়ালরাস-এর সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীদের ভারসাম্য আঙ্গিক ধরে মার্ক্স বর্ণিত পুঁজিবাদতন্ত্রের চলিষ্ণু মূর্তি মিলিয়ে তিনি তাঁর যুগান্তকারী নীতি-নক্সা গড়ে তুলেন।

সুম্পিটারের আলোচনার মূল নায়ক হচ্ছে উদ্যোক্তা। তাঁর বিশ্লেষণে কেন্দ্রবিন্দু সে। তাকে ঘিরেই যত ক্রিয়াকাণ্ড। সে উদ্ভাবক। তার কাজ উৎপাদন-উপকরণ নব নব রূপে সাজিয়ে তোলা। নব নব সংযোজন সাধন। তার উদ্ভাবনী প্রতিভা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন সে (১) সম্পূর্ণ নতুন দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারে, (২) উৎপাদনের নব পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, (৩) নতুন বাজার খুঁজে বের করতে পারে, (৪) কাঁচামাল সরবরাহের নতুন সূত্র অনুসন্ধান করে বের করতে পারে, কি (৫) কোন শিল্পক্ষেত্র পুনসংগঠন সাধন করে নিতে পারে।

উদ্যোক্তার ক্রিয়াকর্ম অনুধাবনে সুম্পিটারীয় ধ্যান-ধারণার পরিব্যাপ্তি। তার কর্ম-কাণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতিতে উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে সুম্পিটারীয় চিন্তাধারার রহস্য নিহিত। সুতরাং তাকে খতিয়ে দেখতে হবে। উদ্যোক্তা মানে কার্যনির্বাহক নয়। আরো সঠিক করে বললে সাধারণ কার্যনির্বাহক নয়। কার্যনির্বাহী ধরাবাধা তালে উৎপাদন ক্ষেত্রে উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করে। উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করে। আর উদ্যোক্তা করে নব সংযোগসাধন। তাকে পুঁজিপতি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। হতেও পারে। নাহলেও ক্ষতি নেই। পুঁজিপতি পুঁজি যোগায় আর উদ্যোক্তা উদ্যোগজনিত কর্ম সম্পন্ন করে। পুঁজিপতির পুঁজিকে খাটাবার পথ নির্দেশ করে।

"নেতৃত্ব অধিক প্রয়োজন, মালিকানা তেমন কিছু নয়।"[৩] উদ্যোক্তা আবিষ্কারক হতে পারে। তবে তাও প্রয়োজন নয়। তার কাজ নূতন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া জন্ম দেয়া। সুম্পিটারের ধারণায় উদ্ভাবনী আবিষ্কার নিরন্তর ঘটে চলে। অবিছিন্ন ধারায় তা প্রবাহিত হয়।[৪] এদিক থেকে তিনি মার্ক্স-এর সমধর্মী। তার মতে উদ্ভাবনী আবিষ্কার সম্ভাবনা

৩. **Schumpeter : Business Cycles, I, পৃঃ ১০৩।**

৪. ঐ, পৃঃ ১৩০।

উন্নয়ন অগ্রগতির শর্ত হিসাবে ক্রিয়া করে। তবে অগ্রগতির জন্য ইহাই যথেষ্ট নহে। তার জন্য প্রয়োজন উদ্যোক্তার কর্ম। উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী চিন্তাধারা দিয়েই উন্নয়ন ধারা এগিয়ে চলে।

ক্লাসিক্যাল ও নয়া-ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা উদ্যোক্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। প্রতিভাবান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[৫] কিন্তু, সুম্পিটারের চোখে উদ্যোক্তা সর্বেসর্বা। তার ভূমিকা একান্ত আবশ্যকীয়। সে সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের হোতা। চলমান অর্থনৈতিক জগতে তার ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই হঠাৎ করে বর্ধন আসে। তড়িৎ গতিতে উন্নয়ন এগিয়ে যায়। নয়া-ক্লাসিক্যালবাদীর চোখে উন্নয়ন ঘটে স্বতঃপ্রবহমান বেগে ও অনেকটা নিরাপদ ভঙ্গিতে। সুতরাং হিসাব-নিকাশ কষে আট-ঘাট বেঁধে বিনিয়োগ-সিদ্ধান্ত নেয়া চলে। কাজেই লগ্নীতে তেমন একটা জটিলতা নেই। সঞ্চয় পরিমাণ যথেষ্ট হলেই হল। তাহলেই উন্নয়নধারা আপনবেগে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সুম্পিটারীয় পরিজ্ঞানে, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মাত্রা সমধিক। কাজেই, যুক্তি-ভিত্তিক হিসাব-নিকাশ দিয়ে তেমন একটা কাজ চলে না। দরকার হয় অনেকটা বেপরোয়া দৃষ্টিভঙ্গির। সাধারণ ব্যবসায়ীকে দিয়ে তা হবার নয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত। হয়তবা আপন গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

উজ্জীবিত দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্মেষণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি শত বাধার মুখে আপন পথ করে নেয়। অর্থনৈতিক জগৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। ঝুঁকিবহুল বন্ধুর পথ। এমনি পরিবেশে ডাল-ভাত চিন্তাধারা নিয়ে কাজ আদায় সম্ভব নয়। তার জন্য চাই দৃপ্তভঙ্গি ও উদ্দীপ্ত প্রেরণা ও চেতনা। অবস্থা বুঝতে হবে। পরিবেশ যাচাই করে নিতে হবে। মুনাফা সম্ভাবনা খতিয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সাপটে ধরে আপন আয়ত্তে বাঁধতে হবে। একাজ উদ্যোক্তার। অন্য কারো নয়। সুম্পিটার বলেন, উদ্যোক্তা জয়ের নেশায় মেতে বসে। আপন ভোগ-বিলাস বাড়িয়ে তোলাই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। বরং যুদ্ধে জয়লাভ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকা, আপন আধিপত্য বিস্তার করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য। নব নব সৃষ্টি তার অভিলাষ।

৫. উদাহরণ হিসাবে A. Marshall-এর Industry and Trade উল্লেখ্য। বইটি Macmillan & Co. Ltd., London কর্তৃক ১৯১৯ সালে প্রকাশিত। ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা আলোচনা করুন।

কিন্তু, তাই বলে কি সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ নয়? উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম তাহলে অব্যাহত থাকবে কি করে? তা সামনে এগিয়ে যাবে? অবশ্যই তা তাৎপর্যে ভরা। গুরুত্ব সমধিক। তবে সুম্পিটার তাকে দেখেছেন ভিন্নভাবে। উদ্যোক্তার অবশ্যই মূলধন চাই। তবে তা চলতি আয়ের সঞ্চয় থেকে নয়। সে তা পাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রস্তুত ঋণ থেকে। সুতরাং সুম্পিটারের দৃষ্টিভঙ্গি ক্লাসিক্যাল নয়। ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর এই মত তাদের পরিমণ্ডলের পাওয়া যায় না। তিনি পুরোপুরি ভিন্ন আঙ্গিক প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেছেন মুদ্রাপরিমাণ ধ্রুব থাকে। হয়তবা নামমাত্র বাড়ে কমে। তাতে করে দরমাত্রায় তেমন উঠা-নামা দেখা দেয় না। টাকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে তার ক্রিয়া কলাপ নেহায়েত নগন্য। অর্থনৈতিক জগতে কঠিন ছাচের আবরণে তা ঢাকা পড়ে থাকে। তেমন সুস্পষ্ট সুযোগ পায় না। কাজেই, তার গতিধারা ধ্রুব বলে চিন্তা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই ধ্রুব সত্য কল্পনা করে পূর্ববর্তী বিশ্লেষকগণ বাণিজ্য চক্রের আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। দরমাত্রার নামমাত্র চড়াবৃদ্ধি অবলোকন করেছেন। Lord keynes-এর General theory of Employment, Interest, and Money (১৯৩৬) প্রকাশ পেয়ে এই মায়াজালের ফানুস তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু, সুম্পিটার তার আগেই এই অবাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

সুতরাং সুম্পিটারীয় পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ক্রেডিট-সৃজন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর ক্রেডিট-সৃজন মেনে নেয়া মানে অগ্রগতি প্রক্রিয়া অসম বলে ধরে নেয়া। কেননা, এমতাবস্থায় বিনিয়োগ-পরিমাণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তড়িৎ গতিতে বাড়িয়ে দেয়া যায়। পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তা তার ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রেখে দরমাত্রা চড়িয়ে দেয়। উপাদান সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যায়। উপাদান-সামগ্রী হয়ত ভোগ-দ্রব্য উৎপাদনী শিল্পখাত থেকে ছাড়া পেয়ে উদ্যোক্তার মাধ্যমে পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদনী শিল্পে বিচরণ করতে শুরু করে। তাতে ভোগদ্রব্যের উৎপাদনে হ্রাস ঘটে। অর্থনীতি অধিক হারে সঞ্চয় ঘটাতে "বাধ্য" হয়। অর্থাৎ প্রকৃত হিসাবে ভোগমাত্রা কমতে শুরু করে। তার মানে ক্রেডিট সৃজন জনিত সুযোগ-সুবিধা তীব্রতর হয়ে লগ্নীকারককে

অধিকতর মুক্ত করে তোলে। তাকে আর জনসাধারণের ইচ্ছা-প্রণোদিত সঞ্চয় পানে তাকিয়ে বসে থাকতে হয় না। "বাধ্যতা-মূলক সঞ্চয়" পুঁজি-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতিজনিত এই সঞ্চয় প্রথা অনির্দিষ্টকাল অবধি চলতে পারে না। এই প্রথার একটা স্বভাবিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দরমাত্রা বেড়ে চলে। মুদ্রা সরবরাহ সম্প্রসারিত হয় (সবাই মিলে যে ঋণ নিতে থাকে)। উদ্যোক্তা ক্রমে ক্রমে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দ্রব্য-সামগ্রী যোগাড় করা জটিলাকার ধারণ করে। স্যুম্পিটার বলেন, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই বা আশংকা প্রকাশের কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, উদ্যোক্তাদল আপন আপন প্রকল্প বাস্তবায়িক করে তোলে। ঋণ পরিশোধ করে দেয় মুনাফা থেকে। নীট ফল হিসাবে দাঁড়ায় বিনিয়োগে উৎক্ষেপ। এই উৎক্ষেপন ক্রেডিট-বর্ধন উৎসারিত। ক্রেডিট-সৃজন সীমিত তা সম্ভব হত না। স্যুম্পিটারীয় মডেলের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, উদ্যোক্তা ক্ষমতাবান হয়ে উঠে আর ভোক্তার সর্বময় কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া সামনে এগিয়ে যায়। উদ্যোক্তাদল কর্তৃত্ব করতলগত করে নেয়। ভোক্তা তেমন আর ঘাড় ফুলিয়ে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে না। নিজের পছন্দমাফিক কেনাকাটা করার সুযোগ পায় না। উৎপাদক তার রুচি নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে। তার পছন্দে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্যুম্পিটার বলেন, এই পরিবর্তন হয়ত ভোক্তার কর্মকলাপের ফল হিসাবেও দেখা দিতে পারে। তবে উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় তা তেমন ধর্তব্য কিছু নয়। তাই তিনি উপকল্প হিসাবে মেনে নেন যে, রুচি ও পছন্দ আঙ্গিকে সৃজনে উৎপাদকের ভূমিকা সমাধিক। ভোক্তার ভূমিকা নগণ্য।

ধারণাভিত্তিক এইসব উপকল্পের ভিত্তিতে স্যুম্পিটার উদ্যোক্তার বিনিশ্চায়ক ভূমিকা উদ্‌ঘাটিত ও উদ্ভাসিত করেন। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় তার বলিষ্ট ভূমিকা মেলে ধরেন। তাকে ছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব নয়। ত্বরান্বিত উন্নয়ন পেতে হলে তাকে ছাড়া গতি নেই।

২. ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ

সুতরাং, আঙ্গিক হিসাবে স্যুম্পিটার মেনে নেন যে, সর্ব কর্মের নায়ক হচ্ছে উদ্যোক্তা। কাজেই, তার সুষ্ঠু লালন-পালনের পরিবেশ একান্ত

প্রয়োজনীয়। তার উদ্ভব বাধাহীন হওয়া উচিত। তার গতিবিধি যেন স্বতঃস্ফূর্ততা পায়। তার চাল-চলন যেন ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। এই সম্ভাবনা বিরাজমান আছে বলে ধরে নেয়া যাক। তাহলে উদ্যোক্তা শ্রেণী উন্নয়ন-ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে পারে। উন্নয়ন-প্রক্রিয়া বলবান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কিভাবে? সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরও তদোধিক সহজ।[৬]

সুম্পিটার আলোচনা শুরু করেন ধারণ-ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি কল্পনা করে। অর্থনীতিতে স্থবির অবস্থা বিরাজমান। অর্থাৎ বিনিয়োগ নেই। জনসংখ্যা বাড়ছে না। পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বিরাজমান। তবে উপাদানের নতুন সংযোগ-উদ্ভাবনা বিদ্যমান। উদ্যোক্তা এ খবর রাখে এবং তা কাজে লাগাতে প্রস্তুত। নতুন উদ্ভাবনী আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হতে যে রসদ ইত্যাদি প্রয়োজন তা করায়ত্ত করায়ত্ত নিমিত্তে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেয় ও চলমান 'বৃত্তপ্রবাহে হানা দেয়।" এই ধার পেতে তাকে খোরপোষ যোগাতে হয় যা সুদের হার বই অন্য কিছু নয়। এই সুদ তার ভবিষ্যত মুনাফার অংশ-বিশেষ।[৭] নামমাত্র কয়েকজন উদ্যোক্তা পথ করে দেয়। নতুন উৎপাদন-আঙ্গিক কাজে লাগায়। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুকারী দল। "মৌমাছিবৎ" তারা ছেয়ে ফেলে উদ্যোগ-ক্ষেত্র। শুরু হয়ে যায় উদ্যোগজনিত ক্রিয়াকর্মের হৈ-হুল্লোড়।

পালে হাওয়া লাগে। সমৃদ্ধি-পর্ব দ্রুত এগিয়ে আসে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম তীব্রতর হয়। দরমাত্রা ঊর্ধ্বগতি নেয়। মুদ্রা-আয়ে বর্ধন দেখা দেয়। অর্থনীতির সর্বত্র মনোরম অবস্থা বিরাজ করতে শুরু করে।

---

৬. সুম্পিটারের এই উন্নয়ন-তত্ত্বের সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ তাঁর বই Business Cycles, I চতুর্থ অধ্যায়ে পেতে পারেন।

৭. তাঁর প্রথম দিককার বই The Theory of Economic Development (পঞ্চম অধ্যায়)-এ সুম্পিটার মন্তব্য করেছেন যে, স্থবির পর্যায়ে সুদের হার শূন্য হয়। সুতরাং চলিষ্ণু অর্থনীতিতে একমাত্র উদ্যোগলব্ধ মুনাফা থেকে সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু, দুঃখের ব্যাপার এই গুরুত্বহীন বিষয়ে তিনি অধিক সময় ব্যয় করেছেন। ফলে তাঁর আলোচনা আগোছালো ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। আসল বক্তব্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি তা শুধরে নিয়েছেন তাঁর Business Cycles নামক পুস্তকে। বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন P.A. Samuelson এর "Dynamics, Statics and stationery states", Review of Economic statistics, xxv no. I (Feb. 1943).

ভোগ-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প থেকে ছাড়া পেয়ে উপাদান-সামগ্রী দ্রুত-বেগে পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে প্রবাহিত হতে থাকে। কেননা, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় যে বেড়ে যেতে থাকে। ক্রিয়াকর্মে নব নব ঢেউ জড়ো হয়। আঙ্গিতে যে নামমাত্র উদ্যোগ ছিল তা অধিক বল প্রাপ্ত হয়। পুরানো ফার্ম লাভের আশার আশান্বিত হয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে চলে। ফটকা বাজারী ও দূরকল্পী প্রচেষ্টা জোরদার হয়। সবাই ক্ষেপে উঠে অধিক লাভের আশায়। দরমাত্রা অধিক চড়ে উঠে মুদ্রা-আয় বেড়ে যায়। ব্যাঙ্কসমূহে আসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। কেবল উদ্যোগে টাকা খাটিয়ে তারা আর সন্তুষ্ট নয়। প্রাক্তন শিল্প সমূহে ও (অর্থাৎ পুরানো রীতিনীতি মাফিক যারা উৎপাদন ঘটিয়ে চলেছিল) টাকা আগাম দিতে শুরু করে। সর্বত্র সম্প্রসারণ দেখা দেয়। হয়ত অনুকারীদল উদ্যোক্তা শ্রেণীকে ছাড়িয়ে যায়। বিনিয়োগ মাত্রা অত্যধিক হয়ে উঠে।

উর্ধমুখী এই উত্তরণ পর্যায়ের শুরুতে ভোগ দ্রব্য উৎপাদন কমে যায়। মূলধনী সামগ্রী উৎপাদন বাড়তে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপন্নে আঙ্গিকগত পরিবর্তন দেখা দেয়। তা পুঁজি-সামগ্রীর অনুকূলে এবং ভোগ-দ্রব্যাদির প্রতিকূলে। আস্তে আস্তে উদ্যোগ-কাজ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু, তদ-উৎসারিত উৎপাদন অধিক হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয়ে যায় "গঠনমুখী মারামারী" (creative destruction)। পুরানো উৎ-পাদকদের বাজার বিনষ্ট হয়ে যায়। নয়ত সীমিত হয়ে উঠে। তাদের স্থলে নতুন উৎপাদনী দ্রব্য বাজারস্থ হয। নতুন বাণিজ্য সংস্থা গড়ে উঠে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। নতুন দ্রব্যাদির দাম কম। কাজেই, পুরানো দ্রব্যাদি লাটে উঠার অবস্থায় পড়ে, বহু পুরোনো ফার্ম ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকগুলো দেউলিয়া হয়ে উঠে। আর যারা বা টিকে থাকে তারাও কোন রকমে নামখানা বজায় রেখে চলতে পারে। পুরানো সেদিন আর সেই মর্যাদা পায় না। দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে দাঁড়ায় মার-মুখো। চলে বেদনাদায়ক পুনর্সংগঠন, সংযোজন ও সাঙ্গীকরণ। ধীরে ধীরে নব উদ্যোগজনিত প্রচেষ্টায় বৃত্তপ্রবাহে অন্তরিত হয়ে যায়।

এদিকে উদ্যোগ-সঞ্জাত ফল হাতে পেয়ে উদ্যোক্তাদল ব্যাঙ্কের পাওনা মিটায়ে দিতে উঠে লেগে পড়ে। ফলে মুদ্রা-সঙ্কোচন প্রভাব জন্ম নেয়। তা কাটিয়ে তোলার উদ্যোগ দেখা দেয় না। নতুন উদ্যোক্তাশ্রেণী এগিয়ে আসে না, সবায় নতুন সৃষ্ট পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যস্ত থাকে।

হিসাব-নিকাশ মিলাতে সচেষ্ট হয়ে উঠে। একটা অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। অসাম্য পরিস্থিতি প্রবলতর হয়। দোদুল্যমান এই পরিবেশে নতুন উদ্যোগে তেমন আর কেউ উৎসাহী হয় না। অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি উদ্যোগজনিত ব্যাহত করে। ক্রমে ক্রমে তা হ্রাস পায় ও অবশেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এমন নয় যে উদ্ভাবনী-অবিষ্কার থেমে থাকে। আসল ব্যাপার এই যে অর্থনৈতিক জগতে প্রতিকূল এমন তীব্রতর হয়ে উঠে যে নতুন কাজে হাত দিতে কেউ আর সাহস পায় না। উদ্যোগ-ক্রিয়ায় এই অবনতির ফলে মুদ্রা-অবপাত বেগবান হয়। ঋণ-পরিশোধ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পরিণামে দর পড়ে যায় ও মুদ্রা-আয় নিম্নমুখী হয়ে উঠে ফলে নতুন পরিবেশে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম খাঁপ খাইয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা আরও ব্যাহত হয়। সাঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠে। অবশ্য এই কারণে মন্দাবস্থার সৃষ্টি হয় না। একটু খানিক ঝামেলা বাড়ে আর কি। পুরোপুরী অবনতি আসে না। পশ্চাদপসরণ ঘটে বটে। কিন্তু, অচিরেই পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠে। কুয়াশা কেটে যায়। নতুন করে উদ্যোগ-কাজ শুরু হয়।

সে যাই হউক, পশ্চাপসরণ অবশ্যই যথেষ্ট বেকায়দা অবস্থার সৃষ্টি করে। উদ্যোজনিত কর্মে জড়তা আসার ফলে নব নব বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। লগ্নীকাজ পশ্চাৎমুখী হয়ে উঠে। যাতে করে পুরোপুরি মন্দাবস্থা জন্ম নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। প্রথম দিকে মুনাফা সম্ভাবনা প্রচুর বিদ্যমানহেতু ঢালাই হারে লগ্নীকাজ চলছিল। দরমাত্রা বেড়ে তা আরও তীব্রতর করে দিয়েছিল। প্রাচুর্যপর্ব বেশ জেকে বসেছিল। সবাই বেশ আশণ্বিত হয়ে উঠেছিল। তদনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম বাড়িয়ে তুলছিল। কিন্তু, হঠাৎ করে বাধা পেয়ে তাই সবাই থমকে দাড়িয়ে যায়। গঠনমূলক মারমুখিতা উৎসাহে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। বিনিয়োগ-কর্ম সীমিত হয়ে আসে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে জড়তা নামে। ফলে নিম্নমুখী মোড় জন্ম নেয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশা-নিরাশার বিভ্রান্তিকর এই পরিস্থিতি মাত্রা ছাড়িয়ে উঠে। প্রাথমিক যে উচ্ছ্বাস জন্ম নিয়েছিল তা তিরোহিত হয়। স্রোত প্রতিকূল বইতে থাকে এবং বেশ জোরের সাথে। মন্দাবস্থারূপ পরিস্থিতি উঁকিঝুঁকি মারে। কিন্তু, তা সাময়িক ব্যাপার। অচিরেই, অর্থনীতি পূর্বশক্তি ফিরে পায়। ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যায়। পূর্ণ কর্ম-সংস্থান সম্ভব হয়। অবশ্য, সুম্পিটার এও

বলেন যে, তাত্ত্বিক বিবেচনায় একথা চিন্তা করা চলে বটে যে মন্দা পরিবেশ। ভাংগাচুরা ফর্ম তিরোহিত হয়ে যায়। দুর্বল প্রচেষ্টা লাটে উঠে। সমন্বয়সাধন সম্পন্ন হয়। উপযোজন ক্রিয়া সাঙ্গ হয়। মঞ্চ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে গাঢ় হয়। চক্রময় ক্রিয়াকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করে।

নতুন যে সাঙ্গীকরণ পর্ব পাওয়া গেল তা কিন্তু পূর্বাপেক্ষা অনেক উচ্চতর পর্যায়ে। অর্থাৎ যে পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার তুলনায় নতুন পর্যায় অনেক ঊর্ধ্বে। *চক্রময় হ্রাসবৃদ্ধি ধরে জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় অনবিচ্ছন্ন হারে বেড়ে চলে। সমাজের সর্ব স্তরের লোকের অবস্থা ভাল হয়। বন্টন প্রথায় তেমন বৈষম্য ঘটে না কাজেই শ্রেণীবদ্ধ বলে তেমন কিছু নেই। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী বেশ লাভবান হয়। উন্নতির অধিকাংশ মজা তারা লুটে। কেননা নতুন পুঁজিবাদতন্ত্রের উদ্যোগ ক্রিয়াকর্ম সরকার জন্য ভোগদ্রব্য উৎপাদনে অধিক প্রয়াসী হয়।

সুম্পিটার তাঁর আলোচনায় ইতি টানেন কতকগুলো ধারণা–কল্পনা করে নিয়ে। তিনি যুক্তি দেন যে, চলতি আয়ের সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ ঘটে। তেমনি লোকসংখ্যা বেড়ে চলে। প্রতিযোগিতা তেমনটা তীব্র নয়। বেশ কিছুটা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে। স্থবির পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু হবে এমন কথাও নয়। উদ্ভাবনী আবিষ্কার কেবল ভারসাম্য আস্থা থেকে জন্ম নেবে তাও ঠিক নয়। এই সকল উপকল্প হয়ত আলোচনায় কিছুটা যুক্তিহীনতার আভাস দিতে পারে। কিন্তু, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আসল যে বক্তব্য অথবা বক্তব্যের বৈশিষ্টা-বলী তা অটুট থেকে যায়। এতে তেমন কিছু বেশ-কম ঘটে না।

সুতরাং, সংক্ষেপে বলা চলে যে, সুম্পিটারীয় দৃষ্টিভঙ্গির আসল নায়ক-উদ্যোক্তাশ্রেণী। তাদের ক্রিয়াকর্ম দিয়েই উন্নয়ন অগ্রগতি অগ্রসর হয়। তাদের কর্মাবলীর ফলে যাত্রা শুরু হয়। জাতীয় উৎপাদন বর্ধিত হয়। এই বর্ধন স্বাভাবিক নিয়মে আসে না ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে মসৃন গতিতে প্রবাহিত হয় না। ঝড়ের বেগে তার উদ্ভব ঘটে। চলে অমসৃন ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় ঘোরপ্যাঁচালো পথে। চক্রাকার হ্রাস-বৃদ্ধি জন্ম দিয়ে। চক্র-ময় এই উঠানামা যেন উন্নয়ন অগ্রগতির খেসারত স্বরূপ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় খেসারত প্রদান অবশ্য দেয়।

৩. ধনতান্ত্রিক বিকাশে সামাজিক ভিত্তি

সুতরাং সুম্পিটারের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে চলে। অর্থনৈতিক কোন ঘটনা তাতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। জাতীয় উৎপাদন মুহুর্মুহু বেড়ে যায়। কিন্তু একটা ফ্যাকড়া বা আঁকড়া আছে বটে। সুম্পিটারের নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করা যাক। তিনি বলেন......"ধনতান্ত্রিক বিকাশে বা তার বাস্তব ও সম্ভাব্য ক্রিয়াকর্মে ঋণাত্মক এমন কঠিন কিছু নেই যার ভারে তা ভেঙ্গে পড়বে। অথবা হিসাব নিকাশের গরমিলে বিপথগামী হয়ে পড়বে। কিন্তু.........তার স্বার্থকতার মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তাকে ধারণ করে তা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার ফলে পরিবেশ এমন প্রতিকূল হয়ে উঠে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর সুষ্ঠুভাবে এগুতে পারে না। ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থায় এসে দাঁড়ায় বিকল্প হিসাবে দৃশ্যমান সমাজতন্ত্রবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"[৮]

উপরোক্ত মন্তব্যে পৌঁছার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে সুম্পিটার যুক্তি দেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক দিকটাও মেপেঝোকে এগোয় যুক্তি-তর্কের তুলাদণ্ডে তা বিকশিত হয়। অথচ ব্যবস্থায় তা তেমন নয়। আপন গতিতে তা ধেয়ে চলে। ধরা-বাধা হিসাব নিকাশের ধার ধারে না। প্রয়োগ-লব্ধ জ্ঞানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে না। অবশ্য হিসাব নিকাশ ভিত্তিক সভ্যতা মানে এই নয় যে তার মধ্যে চুলচেরা মানদণ্ডের ব্যাতিক্রম কিছু নেই। তা আছে বটে। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে নিরন্তর প্রবাহী যান্ত্রিক চিন্তধারা সংস্কৃতি জগতে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে তোলে। সুম্পিটার আরও বলেন যে, এটাও সত্য নয় যে কেবল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই যুক্তিবাদের একমাত্র ধারক। অন্য ব্যবস্থায়ও তা বিরাজমান। তবে পুঁজিবাদী তার উপর অধিক জোর আরোপ করে এবং তা সম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়। কড়াক্রান্তির হিসাব দিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এগিয়ে চলে। লাভ লোকসানের মাপকাঠিতে সব কিছু যাচাই করে। আয় ব্যায়ের নিরীখে ব্যবসা চালায়। ব্যক্তি চিন্তাধারায় এই যে কাঠিণ্য তা অন্যত্রও দ্যোতনা সৃষ্টি করে। শিক্ষা-দিক্ষা শিল্প, ধর্ম, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে ব্যক্তি-

৮. দেখুন Schumpeter-এর Capitalism, Socialism and Democracy, পৃঃ ৬১।

স্বার্থকতার মর্যাদা স্বীকৃতি দিয়ে সমাজিক পরিবেশ ঘুরিয়ে দেয়। ফলে ধীশক্তি সম্পন্ন ও প্রতিভাবান সবাই ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। তাতে করে চুলচেরা হিসাবের মাত্রা আরও বিস্তৃত ও বলবান হয়। পরিণামে "আধুনিক শিল্পব্যবস্থা ও তদ-উৎসারিত অধিক ফলন যেমন পুঁজি-বাদী ব্যবস্থার ফল তেমনি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিক-জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সংগঠন ও এই ব্যবস্থা সঞ্জাত। শুধু তাই নয়। আধুনিক সভ্যতার সার্বিক চেহারা ও তার অবদান প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রভাবে প্রভাবিত।"[১]

এই পরিব্যাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি পটভূমিকা হিসাবে মেনে নিয়ে সুম্পিটার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন ও বলেন যে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক কাঠামো ধ্বসে পড়তে শুরু করে। কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন তিনটি ঘটনা: (১) উদ্যোগজাত ক্রিয়াকর্মে অধঃপতন, (২) প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ভাঙ্গন ও (৩) ধারণকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা।

উদ্যোগজাত ক্রিয়াকর্ম মানে ধরাবাঁধা গণ্ডীর বাইরে বিচরণ করা। বিদ্যমান ব্যবস্থা ডিঙ্গিয়ে নতুন কিছু সাধন করা। বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যাওয়া। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে পরিবর্তন আনা। এই সবই শিল্পাধ্যক্ষ বাণিজ্যিক নেতৃত্বের অবদান। এই শ্রেণীর লোকেরা ক্রিয়াকর্ম দিয়ে উদ্যোগ-কাজ সম্পন্ন হয়। তাদের স্বার্থকতার অর্থনীতির চেহারায় পরিপুষ্টি আসে। কিন্তু, এই স্বার্থকতার কাঁটাহীন পুষ্প নয়। এই স্বার্থ-কতার ফলে উদ্ভাবনী আবিষ্কার রুটিন মাফিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রযুক্তি-বিদ্যায় উন্নতি অবনতি আজ আর কারো একার কাজ নয়। বিশেষজ্ঞ দল বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় পরিপুষিত হয়ে তা এগিয়ে নিয়ে চলে। বাজারজাতকরণ কি নব নব ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা আজ সঙ্ঘবদ্ধ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার অধীন। স্বাভাবিক নিয়মে ধরাবাঁধা তালে সম্পন্ন হয়। নতুনত্ব কিছু নেই। চমৎকারী কিছু নেই। সবই যেন সাদামাঠা রুটিনমাফিক কাজ। উদ্ভাবন-আবিষ্কার আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তা হয়ে ওঠে দলবদ্ধ অতিশিক্ষিত আমলাতান্ত্রিক পরিচালক গোষ্ঠীর কাজ। সেই অনুপম অদ্বিতীয় উদ্যোক্তা আজ আর বিদ্যমান নেই। তার কাজ সর্বাংশে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে গোষ্ঠীগত বিশারদ দলের কর্মে।

---

১. **Schumpeter-এর** Capitalism, Socialism and Democracy, পৃঃ ১২৫।

কাজ নে কর্ম নেই নিধিরাম সর্দার। উদ্যোক্তা আজ তাই তেমনি তার দোসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অথচ উদ্যোগজনিত ক্রিয়াকর্ম ছিল তাদের এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু সেদিন হয়েছে বাসী। কাজে কাজেই তার সামাজিক মানমর্যাদাও অবনতি ঘটে। ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠে শ্রমিক-শ্রেণী দলভুক্ত। তার আয়ের সূত্র আজ আর মুনাফা নয়। তার প্রায় সবটাই মজুরী- উৎসারিত। প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যা পায় তা দিয়ে খোরপোষ চলে।

উদ্যোক্তা নিজের স্বার্থকতা দিয়ে যে কেবল নিজের বিনাশের পথ করে নেয় তা নয়। অধিকন্তু, যে প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিকে সে বিচরণ করে তাও ভেঙ্গেচুরে দেয়। একদিকে নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বিনষ্ট করে তোলে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানিক ছকে ঝড়-ঝাপটা সৃষ্টি করে দেয়। অর্থ সম্পদ মুষ্টিমেয় হাতে সমাবেশ ঘটিয়ে এবং বৃহদায়তন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তি ক্ষয়িয়ে দেয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও মালিকানা সীমিত করে তোলে। চুক্তি-সম্পাদন স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। অথচ এগুলো হচ্ছে পুঁজি-বাদী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। অর্থনৈতিক বিবেচনায় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন দোষণীয় নয়। সুম্পিটার বলেন, তাতে বরং উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান হয়। কিন্তু, আসল সমস্যা হল এই যে বিরাট বপু সম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানা ও চুক্তি সম্পাদন স্বাতন্ত্র্য খর্ব করে দেয়

বড় বড় কল কারখানায় মালিক বা তার স্বত্ত্ব বলে তেমন কিছু নেই। প্রায়শঃ তা অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। অথবা বিদ্যমান হলেও তেমন প্রভাবশালী কিছু নয়। মালিকের স্থান দখল করে নেয় একদল বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষ। শেয়ার মালিকরা হয়ে দাঁড়ায় অধিক ক্ষমতাবান। তার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা তেমন আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকে না। তেমনি চুক্তি-সম্পাদনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব বলে প্রতীয়মান হয় না। বেতনভোগী কর্মচারীদল চাকুরেসুলভ দৃষ্টি নিয়ে কাজ সম্পন্ন করে। স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। এদিকে শেয়ার মালিকরা পরি-চালনা থেকে বহু দূরে। কাজেই তারাও মালিকের দৃষ্টি নিয়ে ব্যবসার প্রতি তাকায় না। "বিষয়াসক্তিহীন, দায়িত্বহীন ও গরহাজির মালিকানা ব্যক্তিগত মালিকানার তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। তার প্রতি তেমন দরদ নেই।

কাজেই, চেষ্টাও তেমন নেই। অবশেষে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' অবস্থা দাঁড়ায়। কেউ তা নিয়ে তেমন আর মাথা ঘামায় না। এই হল বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চেহারা।"[১০]

এখানেই শেষ নয়। অবস্থা আরো খারাপের দিকে ধাবমান হয়। উদ্যোক্তা তিরোহিত ও প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিক ভেঙ্গে পড়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক গগনও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠে। যে শক্তিবর্গ এযাবত ধনতান্ত্রিক ব্যস্থাকে লালন-পালন ও সংরক্ষণ করে এসেছে সেই একই শক্তি আজ ভিন্নমুখী রূপ নেয়। কথাটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রাজতন্ত্র পরবর্তীকালে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে সংরক্ষণ করেছে। ভূম্যাধিকারী মুছে গিয়ে শিল্প-বাণিজ্য ধনকুবের দল গড়ে উঠেছে। রাজতন্ত্র রাজনৈতিক দিক থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছে আর তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজতন্ত্রকে সমর্থন যুগিয়েছে। এই উভয় স্বার্থ পাশাপাশি চলে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পন্ন করে তুলেছে। এই ব্যবসায় স্বার্থকতা এনে দিয়েছে। কিন্তু কালে এই স্বার্থকতাই হয়েছে কাল। এই স্বার্থকতা অনুসৃত পথেই অবসান ঘটেছে রাজতন্ত্রের। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ধন-সম্পদে ফেঁপে-ফুলে উঠেছে। হিসাব-নিকাশ মাফিক চলতে শিখেছে। সর্বত্র যুক্তিতর্কের বীজ বুনে দিয়েছে। ঢুকে পড়েছে রাজনৈতিক আঙ্গিনায়। ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। সাধন করেছে রাজনৈতিক সংস্কার। যুক্তিবাদী মন নিয়ে। কিন্তু দুঃখের কথা এরা শাসন চালাতে জানে না। রাজ্য চালানো তাদের কাজ নয়। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্ররূপ জাহাজ চালনা সম্ভব নয়। তাই সুম্পিটার বলেন, "অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা তার (শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী) নেই। অথচ রাজ্য-চালনায় তা একান্ত আবশ্যক।"[১১] সুতরাং, তাকে ঘিরে কোন মোহজাল বিস্তার করে নাই। কাজেই, মানুষ তার প্রতি তেমন অনুরক্ত নয় যেমনটা ছিল রাজার প্রতি। সুতরাং, তার পক্ষে আভ্যন্তরীণ কি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর সুষ্ঠু সমাধান দেয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং উদ্যোক্তার অবক্ষয়, ব্যক্তিগত মালিকানার অধঃপতন এবং রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিনাশের সম্মুখীন করে তোলে। তা কিন্তু তাকে ভেঙ্গে দিতে পারে না বা বিনাশ করে দিতে পারে না।

---

১০. প্রাগুক্ত, ১৪২ পৃষ্ঠা।
১১. ঐ, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

মরি মরি করেও তা টিকে থাকে। বরং, সুম্পিটার বলেন বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার আঘাত হানা জরুরী। আঘাত যত শক্ত হয় তত ভাল। এই আঘাত আসে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শ্রেণী থেকে। তারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফলগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেন। অথচ মজার ব্যাপার হল এই যে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাধীন পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে মুক্ত হাওয়ায় অবগাহন করে এই বুদ্ধিজীবীদল তার উপর আঘাত হানে। তার কর্তাব্যক্তিদের চাল-চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা করে। তেমনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর চুল-চেরা বিশ্লেষণ দেয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বানে জর্জ্জরিত করে শ্রেণী স্বার্থ, কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোকে। এদিকে এই শ্রেণীর সাথে যুক্ত হয় শ্বেতবস্ত্র পরিহিত আমলাতন্ত্র। এখানেও মজার ঘটনা। শ্বেত-কলার ধারী এই আমলাতন্ত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক পরিবেশে লালিত পালিত। অথচ আজ তারা ও বিদ্রোহ করে বসে। সুযোগ-সুবিধা আর সুখী নয়। আরো অধিক চাই। শিক্ষা-দীক্ষায় ও ট্রেনিংয়ের মানে নেহায়ত যা পাই তা মোটেও যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার জের হিসাবে বিদ্বেষ আরও তীব্রতর হয়। কেউ আর বিদ্যমান ব্যবস্থা নিয়ে সুখী নয়। সুতরাং, ঢালাই পরিবর্তন আনা হোক সবাই বলে চেঁচাতে শুরু করে। এদিকে শ্রমিকদলও বসে নেই। তারা ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠে। এটিও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। সঙ্ঘবদ্ধ এই শ্রমিকশ্রেণীকে বুদ্ধিজীবীদল অনায়াসে হাতিয়ার হিসাবে পেয়ে যায়। তাদেরকে সামনে রেখে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত আন্দোলন চালিয়ে যায়। রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হয়। ফল হিসাবে রাজনৈতিক কাঠামোতে বিকৃতি ও বিয়োজন শুরু হয়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধারণকারী রাজনৈতিক ছক ভেঙ্গে পড়ে। তার স্থলে সমাজতন্ত্রবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে।

সর্বশেষে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে সুম্পিটার তাঁর আলোচনায় সমাপ্তি টানেন। মধ্যবিত্তশ্রেণী আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে থাকে। যুক্তিবাদীমন পারিবারিক জীবনেও অনুপ্রবেশ করে। মা-বাপ, ছেলেমেয়ে জন্ম দিতেও হিসাব করে দেয়। কড়াক্রান্তির হিসাব দিয়ে "বাপ হওয়ার আনন্দ" বিচার করে। ভোগ বিলাস, অধিক স্বাধীনতা প্রভৃতি আয়ের তুলাদণ্ডে যাচাই করে নেয়। দুঃখজনক ঘটনা বৈকি। ঐতিহ্যবাহী চিন্তাধারা ঠেলে দিয়ে নতুন আলোর আঙ্গিকে আচার-প্রথা

গড়ে নিতে সচেষ্ট হয়। সনাতনী জীবনধারা ব্যাহত হয়। ঘর আর ঘরের আনন্দ আহবান দিয়ে তেমন অপেক্ষা করে থাকে না। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়। ঘরের মোহ কেটে গিয়ে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সঙ্কীর্ণমনা হয়ে উঠে। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তার চিন্তাস্রোত খেই হারিয়ে ফেলে। স্বীয় জীবনকালের পরিমণ্ডলে সে বিচরণ করতে শুরু করে। দিগন্ত ছাড়িয়ে তার দৃষ্টিসীমা বিস্তৃত হয় না। পারিবারিক রাজত্ব গড়ে তোলায় সে আর তেমন উৎসাহী নয়। অধিক সঞ্চয় স্পৃহা কি প্রবৃত্তি তার মধ্যে আর দেখা যায় না। অথচ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার এক বড় হাতিয়ার তা। ফলে পরিবেশ পরিপন্থী হয়ে উঠতে থাকে।

৪ সুম্পিটারীয় বিশ্লেষণের মূল্যায়ন

উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সুম্পিটারের আলোচনা বিশেষ মূল্যবান হিসাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাঁর তত্ত্ব সর্বাঙ্গীন বিবেচনায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দাবীদার। স্মিথ, রিকার্ডো মিল, মার্ক্স, মার্শাল ও কেইনসের মত প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানীদের পর্যালোচনার সমতুল্য। কি যুক্তিতর্কে কি পরিদৃষ্টিতে তা মহান তত্ত্ববাদীদের পর্যালোচনার সমকক্ষ। কিন্তু, তাই বলে তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতা নেই এমন নয়, বরং দোষ ত্রুটিতে তা ভরপুর। মাত্র এক জাতীয় সম্পর্কের প্রতি তাঁর আলোচনা সাধারণ্যের উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

সুম্পিটারের আলোচনা আমরা দেখেছি যে কেবল উদ্যোক্তাই হচ্ছে সর্ব কর্মের নায়ক। তাকে কেন্দ্র করেই সার্বিক অর্থনৈতিক জগত আবর্তিত হয়। তার উদ্ভাবন-আবিষ্কারের জোরেই উন্নয়ন অগ্রগতি ঘটে। সত্য বটে, তবে তা আংশিকভাবে। উদ্যোগজাত ক্রিয়াকর্ম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা অনুধাবনে তা বিশেষ সহায়ক। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এসে এই ধারা ভিন্নমুখে মোড় নিয়েছে। উদ্ভাবনী-আবিষ্কার অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। সেকালে আবিষ্কর্তা নিজেই ছিলেন উদ্যোক্তা। অধিকাংশক্ষেত্রে, কোথায়ও কোথায়ও হয়ত ব্যতিক্রম দেখা যেত। আবিষ্কারকের আবিষ্কার-স্বত্ত কিনে নিয়ে হয়ত উদ্যোক্তা প্রচেষ্টা চালাতেন। গড়ে তুলতেন নতুন প্রক্রিয়া না হয় উৎপন্ন করতেন নতুন দ্রব্য। কিন্তু একালে এসে

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আর ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সঙ্ঘবদ্ধ বিশারদদলের কর্ম-প্রচেষ্টার ফল। গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ আর ব্যক্তি-কেন্দ্রীক নয়। তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গোষ্ঠী-কেন্দ্রীক। বড় বড় শিল্প কারখানা, কর্পোরেশন ইত্যাদির আওতায় আজ উদ্ভাবন-আবিষ্কার চলে। অংশ নেয় বহু লোক। অন্য দশটা কাজের ন্যায় এটাও একটা বাঁধাধরা নিয়মে হিসাব মাফিক তালে চলে।[১২] এতে নতুনত্ব কিছু নেই। চমৎকৃতও কিছু নয়। তাক লাগিয়ে দেয়ার মত কোন ঘটনা নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার স্থান এখানে নেহায়েৎ নগণ্য। কাজেই, সুম্পিটার উদ্যোক্তাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন সেই চিত্র আজ আর বিদ্যমান নেই। তাঁর ধরণ-ধারণ, আকৃতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। পূর্ববর্তী বংশধরদের সাথে তার চেহারা মিলের চেয়ে অমিল অধিক। ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্য দশটা কাজ যেমন চলে অনেক-গুলো লোকের সংমিশ্রণে, তেমনি উদ্ভাবন-আবিষ্কারের কাজটাও সম্পন্ন হয় বিরাট একদল কর্মীর সমবেত প্রচেষ্টায়। শুধু তাই নয়, এই কর্মীদল একাধারে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কাজেই, ইনি উদ্যোক্তা, তিনি নন, এমন কথা বলার সুযোগ আজ আর তেমন একটা নেই। তেমনি রুটিন-বাঁধা কাজ থেকে উদ্যোগজনিত কাজ আলাদা করে চিহ্নিত করার সুবিধাও তেমন একটা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য খাতে ব্যয় করে তেমনি গবেষণা ইত্যাদি কাজেও নিয়মিত ব্যয়-বরাদ্দ করে থাকে। অন্য-খাতে ব্যয় থেকে যেমন মুনাফা পায় তেমনি গবেষণা খাতে ব্যয় করেও লাভালাভের আশা করা হয়ে থাকে। গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নব নব দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়। নতুন নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার সহজ হয়। তার ফলে স্বভাবিক মুনাফা পাওয়া যায়। অন্য দশ খাত থেকে যেমনটা পাওয়া যায়।

অবশ্য সুম্পিটারীয় বিশ্লেষণে বিশেষভাবে তীক্ষ্নদৃষ্টি দিলে হয়ত এই কথার পূর্বাবাস তার মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। যেমন তিনি মন্তব্য করেছেন উদ্যোক্তার আবির্ভাব ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে চলেছে। সুম্পিটার প্রতিভা-বান ব্যক্তি। তাঁর আলোচনা যে আধুনিক রুচিসম্মত হচ্ছে না তা তিনি টের পেয়েছিলেন। তাঁর বর্ণিত উদ্যোক্তা যে আজ আর বিদ্যমান নেই তা

১২. দেখুন C. Solo-এর Innovation in the Capitalist Process : A critique of the Schumpiterian theory", Quarterly Journal of Economics, Lxv, No. 3, পৃ: ৪১৭—৪২৮ (আগস্ট, ১৯৫১)।

তিনি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বলেছেন যে তাঁর বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ এমন নয়। বরং তাঁর আলোচনার সাথে বর্তমান জগত অসংগতিহীন বলে বাঝা যাচ্ছে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে।

সুম্পিটার উদ্যোক্তার যে ছবি এঁকেছেন তা হয়ত গত দুইশত বৎসরের পটভূমিকায় সত্য। তাঁর সেই ক্ষণজন্মা উদ্যোক্তা নব নব উদ্ভাবনী আবিষ্কার প্রদান করেছেন বৈ-কি। যেমন ধরুণ, স্টীম-ইঞ্জিন আবিষ্কার কি বিদ্যুৎ-মটর আবিষ্কার অথবা পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবন। এই জাতীয় উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও তাদের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক জগতে ঐ অকল্পনীয় বর্ধন ঘটে। কিন্তু সেই উদ্যোক্তা আজ কোথায়? তর্ক উঠতে পারে—কেন, আজকাল কি আর উদ্ভাবন-আবিষ্কার ঘটছে না? স্বীকার করব, ঘটছে। কিন্তু, সেই অনুপাতে নয়। অথবা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার মত নয়। সংখ্যার বিবেচনা হয়ত অনেক অধিক হারে সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবন ঘটছে। কিন্তু, অচিন্তনীয় পরিবর্তন আনায় এরা সক্ষম নয়। যেমনটা ছিল অতীত কালের উদ্ভাবন-আবিষ্কারে। হয়ত তার জন্য আজকের দিনের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-কাবখানা দায়ী। বৃহদায়তন শিল্প কারখানায় সহজে ঢেউ উঠে না। যেন-তেন পরিবর্তন তেমন একটা সাড়া জাগাতে পারে না। ছোট-খাট, উদ্ভাবন-আবিষ্কার অনায়াসে অন্তরিত হয়ে যায়। বড় রকমের কিছু একটা ঘটলেও তেমন তোলপাড় অবস্থা সৃষ্টি হয় না, যেমনটা আগে হত। আগেকার দিনের সেই তুলকালাম ঝড়-ঝাপ্টা আজ আর বিদ্যমান নেই। কাজেই, সাত তাড়াতাড়ি যে কোন পরিবর্তন পরিশোষিত হয়ে যায়।

কাজে কাজেই, সুম্পিটার প্রদত্ত বাণিজ্যচক্র-তত্ত্বও সুষ্ঠু নয়। আধুনিক কালের অর্থনৈতিক পরিবেশ অভিযোজিত করে নেয়ায় তা সক্ষম নয়। সুতরাং, তাতে সংশোধন আবশ্যক। সুম্পিটারের যুক্তিতর্ক অনুযায়ী নিম্নগামী মোড় জন্ম নেয় অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য। একটা উদ্ভাবনী আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলে অর্থনীতিতে দোলায়মান পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একটা দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস দেখা দেয়। হিসাব-নিকাশ গরমিল হয়ে উঠে। কাজেই, বড় আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান যদি উদ্যোগজনিত ক্রিয়া কর্মের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ নমনীয় করে তুলতে কি হজম করে ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে

সুম্পিটারের বিশ্লেষণ ভুল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বর্ণিত সংকট-পরিস্থিতি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানেও মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তাঁকে যে এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্বীকার করেন .... "তারা (বৃহদায়তন ব্যবসা-বাণিজ্যের একনায়কত্বধর্মী আচরণ প্রথা) পরিশেষে হয়ত স্থিতিশীল উৎপাদন সম্ভব করে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, হয়ত মোট উৎপাদন সবিশেষ সম্প্রসারণ সাধন করতে পারে। সেই তুলনায় বল্গাহীন অগ্রগমন তেমনটা ফল দিতে পারে না। শুধু তাই নয়, বল্গাহীন অগ্রগমন বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।"[১৩] অন্য কথায় তিনি বলতে চান যে, তাঁর বাণিজ্য-চক্রতত্ত্ব দোষনীয় বা অসম্পূর্ন নয়। বরং বড় বড় শিল্পকারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে শান্ত পরিবেশে সংকট সৃষ্টিকারী প্রভাবসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু, আধুনিক বানিজ্যচক্র তত্ত্বিকরা তা মেনে নিতে পুরোপুরি রাজী নন। তাঁরা বলেন, হাঁ, সুম্পিটারের নিম্নগামী মোড়ের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কতকাংশে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। তা খোপে টেক্কার মত নয়। অবিঘ্নিত পরিবেশে মন্দাপর্ব জন্ম দেয়ার তা হয়ত একটা কারণ বটে। তবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

সুম্পিটার উপকল্প হিসাবে ধরে নিয়েছেন যে, উদ্যোক্তা ঋণদানকারী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে ধার নিয়ে উদ্ভাবনী-আবিষ্কার ঘটিয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই উপকল্প কতটুকু বাস্তবসম্মত। উদাহরণ হিসাবে জার্মান শিল্পায়নের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় জার্মানীতে শিল্পোন্নয়ন এই পন্থা অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছিল। জার্মান ব্যাঙ্কাররা স্বল্পমেয়াদী ঋণ সমূহের মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কার্যক্ষেত্রে তা দীর্ঘমেয়াদী করে তুলেছিল। কিন্তু এ-ত এক দেশের কাহিনী। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান অন্য সব দেশে সে তা হয়নি। যেমন ধরুণ, ব্রিটেনের কথা। সেখানে তা ঘটেনি (অষ্টম অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে)। ব্যাঙ্ক বরং সাধারণ স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। অথচ উদ্ভাবনী-আবিষ্কারের জন্য চাই দীর্ঘ-মেয়াদী স্থায়ী মূলধন। তা পেতে হবে অন্য সূত্র থেকে।

সুম্পিটার বলেন, উদ্ভাবনী-আবিষ্কারে নিয়োজিত টাকা পয়সার সূত্র ধরে ঋণ-পরিমাণ সম্প্রসারিত হয়। এবং এটাই নাকি স্বাভাবিক বা "যুক্তিসঙ্গত"। কথাটা কিন্তু মোটেই পরিষ্কার নয়। একটা ব্যাখ্যা হয়ত

১৩. Schumpeter : Capitalism, Sócialism and Democracy, পৃ: ৯১।

দেয়া যেতে পারে। অর্থনীতি স্থবির পর্যায়ে বিরাজমান। উৎপাদকদল প্রচুর মুনাফা-সম্ভাবনা আঁচ করতে পারে। টাকা খাটালেই লাভ অবধারিত। তাই ধার করতে শুরু করে। লগ্নী বাড়াতে থাকে। টাকার জন্য দ্বারস্থ হয় ব্যাঙ্কসমূহের কাছে। এতে স্বল্পমেয়াদী চাহিদা মেটে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পায় দেশের সঞ্চয় থেকে। মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে যায়। দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। আয় বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মুনাফার পরিমাণ অধিক হয়। মুনাফাভোগীদের সঞ্চয়-স্পৃহা অধিক, কাজেই অধিক হারে সঞ্চয় ঘটে। এই সঞ্চয় দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ জোরদার ও ব্যাপক হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উদ্যোগ-কাজ ও ঋণ-পরিমাণ সম্প্রসারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান।

এই ব্যাখ্যা সত্য হলে, ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয় না—স্নুম্পিটারের প্রতি এই যে সমালোচনা তা অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।[১৪] কেননা, তিনি তার নির্জলা তাত্ত্বিক ছাঁচে শুধু এইটুকু বলেছেন যে, মুদ্রাসরবরাহে সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে বর্ধন একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বিরাজমান অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি প্রথা অনুসরণ করে প্রকৃত বিনিয়োগ বর্ধন সম্ভাবনা কতটুকু তা বিবেচ্য। মনে হয় স্নুম্পিটার এক্ষেত্রে একটু বেশী জোর দিয়ে ফেলেছেন।

স্নুম্পিটার ধনতান্ত্রিক বিকাশে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো পরিদৃশ্যমান করে তুলেছেন তা প্রশংসার্হ। সবায় এ সম্পর্কে মোটামুটি একমত। কিন্তু, তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ মানতে তেমন কেউ রাজী নয়। তাঁর যুক্তিতর্ক বলিষ্ঠ বটে। কিন্তু, তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

একটা কথা এখানে স্মর্তব্য। স্নুম্পিটার বলেছেন যুক্তিবাদী মন ও কর্মপন্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থকতা আনে। তেমনি তার ধ্বংসের জন্যও তা দায়ী। অবশ্যই পুঁজিবাদতন্ত্র যুক্তিতর্কের জন্ম দেয়নি। তার জন্মলগ্নের জন্য দায়ী শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লব সমাজের সার্বিক চেহারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। অর্থনৈতিক বিষয়াবলীতে অচিন্তনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে চুলচেরা হিসাব-নিকাশের মনোবৃত্তি গাঢ় হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুনাফা সম্ভাবনা এত ব্যাপক ছিল যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এক্ষেত্রে ঢুকে পড়ত এবং অচিরে জয়মাল্যে ভূষিত হত। তাদের এই অভূতপূর্ব স্বার্থকতা তাদের মনে এমন বিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল

---

১৪. Schumpeter : Business cycles, 1, পৃঃ ১০৯ (টীকা-টিপ্পনী)।

যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করেছিল। অথচ উদ্যোগজনিত কাজকর্ম তেমন যুক্তিমাফিক সম্পন্ন হত না। তার স্বার্থকতা আসত অনেকটা অভাবিত উপায়ে। এই অভাবিত পরিবেশ উদ্যোক্তার জন্য হুমকি হিসাবে কাজ করত এবং সে তার মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর হয়ে উঠত। শুধু তাই নয়, নিজের ক্রিয়া-কর্ম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে রাজনৈতিক কার্যাবলী অনুকূলে রাখার জন্যও উদ্যোক্তা উদ্যোগী হত এবং তা করেই স্বার্থকতা অর্জন করত। বার বার জয়যুক্ত হয়ে তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হত। যুক্তিমাফিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হতে শুরু করত। ফলে যুক্তিতর্কভিত্তিক কার্য-প্রণালী অধিক গুরুত্ব লাভ করত। এদিকে ব্যবসায়িক স্বার্থকতা ব্যাপক হয়ে প্রবহমান প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিক পরিবর্তন ও পরিযোজন ঘটিয়ে দিত। ফলে উদ্যোক্তা তার গুরুত্ব হারিয়ে বসত।

সুতরাং, সুম্পিটার যুক্তিজালের যে সাধারণ চেহারা তুলে ধরেছেন তা বেশ ব্যাপক। যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন তার পরিসর বেশ ব্যাপ্ত। এই আলোতে হয়ত তার প্রদত্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশের সাংস্কৃতিক ভিত্তি মেনে নেয়া যেতে পারে। আপত্তি করার হয়ত তেমন কিছু নেই। মানুষ তার কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় বৈ কি! যে বৈষয়িক পরিবেশে সে মানুষ তার প্রভাব অবশ্যই তার উপর যথেষ্ট। যে চিন্তাধারা দিয়ে সে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় ও বাণিজ্য জগতে চলাফেরা সে চিন্তা-ধারা তার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃতি লাভ করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার হয়ত তেমন কিছু নেই। কিন্তু, বহু লেখক তাঁর সাথে একমত নন। অন্ততঃ তাঁর মত এমন করে সমস্যাটিকে দেখতে রাজী নন। তাঁদের মত ক্রিয়াকর্ম জগতের চিন্তাপ্রণালী অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমভাবে ঢুকে পড়বে—এমন কোন কথা নেই। মার্ক্স-এর মত সুম্পিটারও পশ্চিমা জগতের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় অতিশয়োক্তি করেছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে সুম্পিটারের যে হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য তাতে সায় দেয়ার মত লোকও নেহায়েত নগণ্য। তিনি বলেছেন পুঁজিবাদতন্ত্র ধ্বসে পড়ছে। তার স্থলে সমাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক ধারা বিকাশ ভিন্নমুখী হয়ে উঠেছে। আগের তুলনায় সবায় একমত। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে পুঁজি-বাদতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপে সমাজতন্ত্র গজিয়ে উঠবে। হাঁ, সরকারী সক্রিয়তা

বেড়েছে। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি অধিক গুরুত্ব পেয়ে চলেছে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আজ আর তেমন সর্বেসর্বা নয়। সরকার কেবল তার স্বার্থ রক্ষায় রত নয়। অন্যদেরকে সমান চোখে দেখে চলেছে। উদ্যোগজনিত ক্রিয়াকর্মের চেহারাও বদলেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা সেদিনের তুলনায় তেমন সুদৃঢ় নয়। সীমাহীন স্বাতন্ত্র্য বলে আজ আর কিছু নেই। পারি-বারিক জীবনের প্রতিও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দূর এগিয়েছে। সুম্পিটারের এই সকল মন্তব্য হয়ত মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু, এগুলো এক কথা আর সমাজতন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে এবং পুঁজিবাদতন্ত্রকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে তা অন্য কথা।

সুম্পিটারের দৃষ্টিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওলট-পালট ঘটিয়ে দেয়া তেমন একটা বড় কাজ নয়। তাঁর মতে উদ্যোক্তা একটা বিশেষ বলবান ব্যক্তি। কোন বাধাই তার কাছে বাধা নয়। অনায়াসে সে তা অতিক্রম করে যায়। কিন্তু, সে কেবল অর্থনৈতিক জগতে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু, সে দুর্বল ব্যক্তি ও অপটু। বিশেষ করে রাজনৈতিক সামাজিক আঙ্গিনায় সে বড্ড নাজুক। নব নব রাজনৈতিক পরিবেশে সে নিজকে মানিয়ে নিতে পারে না। তেমনি বুর্জোয়াশ্রেণী শাসন করতে শেখে না। সুম্পিটার আরও বলেন, কড়ায়-ক্রান্তির হিসাব দিয়ে রাজ্য শাসন চলে না। কিন্তু, এখানে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। শেষ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে যুক্তিবাদী মনকে জনতায় ছড়িয়ে দেন। চিত্রায়িত করেন ক্ষুব্ধ একদল জ্ঞানী-গুণীকে যারা শ্রমিক শ্রেণীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন সমাজতন্ত্রের জগতে।

সুম্পিটারের বিশ্লেষণ উস্কানিমূলক, তা মদের নেশা ধরিয়ে দেয়ার মত। সবায়কে তা ভাবিয়ে তুলতে পারে। বিচলিত করে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে হবে কি, তাঁর আলোচনা একদেশদর্শী এবং অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ইতিহাস বিবর্তনধর্মী—এই বক্তব্য এক কথা। আর "ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গলিত শবের ধ্বংসস্তূপ ফুঁড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গজিয়ে উঠবেই,"[১৫] এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সুম্পিটার মার্ক্স বর্ণিত ইতিহাসের ব্যাখ্যায় যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা এখানে পরিস্ফুট।[১৬] ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হতে দেখে তিনি

---

১৫. Schumpeter : Capitalism, Socialism and Democracy, XIII.

১৬. দেখুন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম ভাগ।

আঁতকে উঠেছেন। ভয় পেয়েছেন তা অবনতির ধাবমান বলে। মন্তব্য করেছেন তার বিনাশ সুনিশ্চিত। এই মন্তব্যে পোঁছাতে হলে ইতিহাসের আলাদা ব্যাখ্যা দিতে হয়। কিন্তু, এখানে তিনি নীরব। পুঁজিবাদ কেন ধ্বংস হবে? কেন তা সমাজতন্ত্রবাদের ঠেলায় হটে যাবে? কেন সমাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে নেবে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে, তিনি অস্পষ্ট। ...."কোন পথে সমাজতন্ত্রবাদ এগিয়ে আসবে তা আজও জানি না। অবশ্য সম্ভাব্য বহু পথ ধরে তা আসতে পারে। আমলাতন্ত্রের দাপটে তার আগমন ঘটতে পারে। তেমনি তাক লাগানো বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করেও সে মঞ্চে আবির্ভূত হতে পারে।"[১৭]

সে যাই হউক, সুম্পিটারীয় পরিবর্তন ধারা মেনে নিয়েও একথা বলা চলে যে ধনতান্ত্রিক বিকাশধারা বিবর্তনে বহু সম্ভাবনা বিরাজমান। অনন্তর তা পরিবর্তিত হয়ে চলতে পারে। তাতেও তার আঙ্গিক একেবারে বদলে যাওয়ার মত কিছু নয়। অথবা, যদিবা অবশেষে বদলে যায় তা হয়ত তাঁর বর্ণিত সমাজবাদ অপেক্ষা বহুভাবে ভিন্নরূপ হতে পারে।

১৭. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, ১৬২-১৬৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কেইন্‌সীয়োত্তর বিশ্লেষণ

উত্তর-কেইন্‌সীয় ধনবিজ্ঞানীরা বরাবর চেষ্টা চালিয়ে চলেছেন কেইন্‌-সীয় ধ্যান-ধারণায় দীর্ঘমেয়াদী আঙ্গিক প্রদানের নিমিত্তে। তাঁদের এই বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক অগ্রগতি-তত্ত্বে অতি সাম্প্রতিককালের এক বিশেষ সংযোজন হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। বাণিজ্য জগতে চক্রাকার উঠা-নামা বিশ্লেষণে কেইন্‌স্‌-এর পুস্তক General Theory একটি বৈপ্লবিক সংযোজন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল স্বল্পমেয়াদী ঘটনাবলী উন্মোচনে। কেইন্‌সের আলোচনা ধারণা নির্ভর—অনেকগুলো প্রত্যয়কে তিনি দেয় ও নিত্য ধ্রুব বলে ধরে নিয়েছেন। যেমন ...."বিদ্যমান নৈপুণ্য ও প্রাপ্তিযোগ্য শ্রম, প্রাপ্ত সরঞ্জামাদির বিদ্যমান পরিমাণ ও গুণাগুণ বিদ্যমান উৎপাদনী কৌশল, প্রতিযোগীতার মাত্রা, ভোক্তার রুচি ও অভ্যাস আচরণ ....।"[১] স্থৈতিক বিশ্লেষণে কেইন্‌স্‌ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। অথচ ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানী মার্ক্স ও সুম্পিটার যে সকল দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার প্রান্তরে অধিকাংশ সময় বিচরণ করেছেন কেইন্‌স্‌-এর দৃষ্টি সে সব দিকে নিপতিত হয়নি।

কেইন্‌সীয়োত্তর সাধকেরা তাঁর অবহেলিত ক্ষেত্র কর্ষণে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন। দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে উৎপাদিন ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের একটা পুর্ণাবয়ব প্রদানে নিরত রয়েছেন। অন্য কথায়, কেইন্‌-সীয় পর্যালোচনার বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদী রূপ প্রদানে ব্যাপৃত রয়েছেন। স্বল্পায়ত হ্রাসবৃদ্ধি চক্রকে উন্নয়ন অগ্রগতির ব্যাপক ও বিস্তৃত পটে ঢেলে সাজানোর চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছেন। এটা করতে গিয়ে তাঁরা যে সব মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন তা হচ্ছে: (১) মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসং-কোচন বর্জিত স্থিতিশীল পূর্ণ কর্মসংস্থান উন্নয়ন পেতে হলে, বিশেষ করে তা বজায় রাখতে হলে কি কি প্রয়োজন? এবং (২) গড়ধর্মী

১. J. M. Keynes-এর The Theory of Employment, Interest money, Harcourt Brace and Co.; New York, 1936, পৃ: ২৪৫। আরও দেখুন পৃ: ২৪ ও ২৮।

দীর্ঘমেয়াদী বন্ধ্যাত্ব কি গড়ধর্মী মুদ্রাস্ফীতি বাঁচিয়ে এই উন্নতি অগ্রগতি পাওয়া কি সম্ভব ?

লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে মাথা পিছু আয়ের পতন ঘটে। তা বজায় রাখতে হলে প্রকৃত আয় বেড়ে যেতে হবে। শ্রমসংখ্যা উর্ধ্বমুখী হলে উৎপাদনও উর্ধ্বগামী হতে হবে। না হলে বেকারী দেখা দেবে। পূর্ণ-কর্মসংস্থান বজায় রাখা যাবে না। নীট লগ্নী বেড়ে গেলে প্রকৃত আয় বেড়ে যেতে হবে। নতুবা নিষ্ক্রিয় ক্ষমতা জন্ম নেবে। কেইন্সী-য়োত্তর বহু ধনবিজ্ঞানী এই প্রশ্নগুলো খতিয়ে দেখেছেন। হ্যারড্ ও ডোমার উন্নয়ন অগ্রগতির যে মডেল প্রদান করেছেন তাতে এই সমস্যা-গুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে এবং অতীব যত্নের সাথে বিশ্লেষিত হয়েছে।

১. অক্ষুণ্ণ উন্নয়ন সম্পর্কে হ্যারড্-ডোমার বিশ্লেষণ

হ্যারড্ ও ডোমার উভয়ে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সম্ভাবনা উদ্ঘাটনে উদ্যোগী। নির্দিষ্ট অগ্রগতির হারে, পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থানের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার শর্ত নির্ণয়নে প্রয়াসী, জাতীয় আয়ে অবিঘ্নিত নিরবচ্ছিন্ন সংযোজন সম্ভাবনা খুঁজে বের করায় নিরত। বাহ্যিক দিক থেকে উভয়ের আলোচনার পার্থক্য যথেষ্ট, বিশ্লেষণ বিস্তৃতিতে ব্যবধান প্রচুর, কিন্তু আসল বক্তব্যে মোটামুটি একই রূপ।[২]

---

২. দেখুন—Evsay Domar-এর "Expension and Employment," American Economic Review, XXXVII, 34-35 (Mar. 1947), "The Problem of Capital Formation," American Economic Review, XXXVIII, 777-794 (Dec. 1948) ; "Economic Growth, an Econometric Approach," American Economic Review, Papers & Proceedings, XLII, 378-495 (May 1952), "Capital Expansions, Rate of Growth and Employment," Economometrica, XIV, 137-147 (April, 1946), "Depreciation, Replacement, and Growth," Economic Journal, LXIII, 1-32 (March, 1953), R. F. Harrod-এর "An Essay Dynamic Theory," Economic Journal, XLIX,No 1934, 14-33 (March 1939); Towards a Dynamic Economics, Machmillan and Co. Ltd., London, 1948 ; "Supplement on Dynamic Theory," in Economic Essays, Macmillan & Co. Ltd.,

পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে হ্যারড্ ডোমার পুঁজি সংঘটনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয়, পুঁজি সংগঠন দুই জাতীয় ভূমিকা পালন করে বলে মন্তব্য করেছেন। প্রথমে তা বিনি-য়োগ ঘটিয়ে আয় বর্ধন করে। অন্যদিকে মূলধন-সংভার সম্প্রসারিত করে অর্থনীতির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়ে দেয়। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা মূলধন সংগঠনের সামর্থ্য-শক্তির প্রতি নজর দিয়েছিলেন। চাহিদা স্বাভা-বিকভাবে হয়ে যাবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, কেইন্‌স্ তাঁর প্রথম দিককার আলাপ আলোচনায় চাহিদাক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। সামর্থ্য-শক্তি নিয়ে তেমন বাগ-বিতণ্ডা করেননি। একদিক থেকে অবশ্য কেইন্‌সীয় বিশ্লেষণ পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যার আলোকপাত ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু বিনিয়োগ-উৎসারিত দীর্ঘসূত্রী উৎপাদিকা শক্তি নিয়ে তেমন আলোচনা করতে পারেননি। হ্যারড-ডোমার বিশ্লেষণ বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার এই উভয় দিকে সমান নজর দিয়ে উন্নয়ন অগ্রগতির সুষ্ঠু মডেল রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

সংক্ষেপে, সহজ কথায় বলতে গেলে কেইন্‌সীয়োত্তর হ্যারড-ডোমার মডেল এইরূপঃ শুরুতে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সবলিত ভারসাম্য অবস্থা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া যাক। বৎসরের পর বৎসর এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। তজ্জন্য প্রয়োজন লগ্নী-সঞ্জাত ব্যয় পরিমাণ এমন হবে যেন তা বিনিয়োগ-উৎসারিত বর্ধিত উৎপাদন অন্তরিত করে নিতে পারে। প্রান্তিক সঞ্চয়-স্পৃহা ধরুন সমরূপ, তাহলে অধিক হারে পুঁজি-সংগঠন হতে থাকে। জাতীয় আয় উচ্চতর পর্যায়ে বিধায়, নীট বিনিয়োগের মোট পরিমাণ অধিকতর হারে হতে হবে। কাজে কাজেই, পূর্ণ বিনিয়োগ ও কর্ম-সংস্থান সম্ভাবনা বজায় রাখতে হলে নীট লগ্নী নিরন্তর হারে বেড়ে যেতে হবে। তা সম্ভব হবে কেবল প্রকৃত জাতীয় আয় বর্ধনে অনবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত থাকলে। অন্যথায় নয়।

London, 1952, হ্যারড ডোমারের বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য আলোচনা করুন W.J. Banmal-এর Economic Dynamics, The Macmillan Co., New York, 1951, Chapter 4, W. Fellner-এর Trends and Cycles in Economic Activity, Hexry Holy & Co., New York, 1956, Chap. 4, D. Hambulg-এর Economic Growth and Instability, W. W. Norton & Co., New York, 1956, Chapter 2, 3.

প্রতিপাদ্যটিকে অন্যভাবে দেখা যাক। প্রকৃত আয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়চড় ঘটছে না এমন একটা অবস্থা কল্পনা করে নেয়া যাক। তাহলে নীট বিনিয়োগে ফলাফল কি দাঁড়াবে? নীট বিনিয়োগ মানে পুঁজি-সংগঠন। তাতে অর্থনীতির উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে যায়। কাজেই নব নব মূলধনী সাজসরঞ্জাম সংযোজনহেতু নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(১) নব্য মূলধনী সরঞ্জাম অব্যবহৃত পড়ে থাকবে;

(২) নব্য মূলধনী সাজসরঞ্জাম পুরানো সরঞ্জামকে স্থানান্তরিত করে, তাদের শ্রম ও বাজার করায়ত্ব করে নেবে;

(৩) নতুন মূলধনী সরঞ্জাম শ্রম অপসারিত করে দেবে।

সুতরাং, আয় বর্ধন রহিত পুঁজি-সংযোজন মানে শ্রম ও পুঁজির অবধারিত বেকারত্ব। স্পষ্ট পুঁজিসামগ্রী শ্রমে বেকারী এনে দেবে। এদিকে বাড়তি সামগ্রী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে। কাজে কাজেই, আয়ে বর্ধন আবশ্যক। অন্যথায় বাড়তি পুজি-সামগ্রী অব্যবহৃত পড়ে থাকবে। অথচ বেকারত্ব তীব্রতর হতে থাকবে।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কীয় মডেলের লক্ষ্য হতে হবে এমন যেন তা গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সম্ভাবনার ইঙ্গিত নির্দেশ করতে পারে। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শর্তাবলী বিধৃত করে নিতে পারে। অগ্রগতির যথাযোগ্য হার বিধিবদ্ধ করে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থানের সমানুপাতিক করে তুলতে পারে।

ডোমার তাঁর ছাঁচে নিম্নোক্ত প্রশ্নের সমাধান সন্নিবেশিত করেছেন: লগ্নী উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। আয় জন্ম দেয়। কাজেই, বিনিয়োগবর্ধন কি হারে হওয়া উচিত যাতে আয় বর্ধন উৎপাদিকা-শক্তির সমানুপাতিক হয়ে উঠতে পারে এবং পরিণামে পূর্ণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিরাজমান রাখতে পারে?

উপকল্প হিসাবে মেনে নিয়েছেন:

(১) আদিতে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান আয় পর্যায় অর্জিত হয়ে আছে।[৩]

৩. দুই শ্রেণীর অগ্রগতি হার মেনে নেয়া প্রয়োজন—পূর্ণক্ষম অগ্রতি হার ও পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান অগ্রগতি হার। প্রথমোক্তটি পূর্ণক্ষম অবস্থায় পুঁজিসামগ্রীর অনবচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়টি ক্রমবর্ধমান শ্রম সরবরাহের পূর্ণ কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করে।

(২) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অনুপস্থিত; বৈদেশিক বাণিজ্য অবর্তমান;
(৩) সাঙ্গীকরণে ফাঁক বিদ্যমান নেই;
(৪) সঞ্চয়-স্পৃহার গড় ও প্রান্তিক প্রবণতা সমান;[৪]
(৫) সঞ্চয়-স্পৃহার ও মূলধন সহগ (পুজি-সংভার ও উৎপাদন অনুপাত) অপরিবর্তনীয়।

অবশ্য বলা হয়েছে যে এর সবগুলো উপকল্পই অত্যাবশ্যক নয়। কতকগুলো বিশ্লেষণ সহজীকরণে সুবিধা এনে দেয়। উঁচুস্তরের আলোচনায় এই সব শিথিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। আয়, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় নীট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যাবনতি (depreciation) বাদ দিয়ে হিসাবে নেয়া হয়েছে।[৫]

এবারে সমাধান দেখা যাক, তা নিম্নরূপ

মনে করা যাক নূতন সৃষ্ট পুঁজি সামগ্রীর ডলার পিছু উৎপাদিকা শক্তি গড়ে S-এর সমান। অর্থাৎ S নতুন সৃষ্ট পুঁজিসামগ্রীর এক ডলার উৎসারিত প্রকৃত আয়ে বার্ষিক বর্ধনের প্রতিভূ। তার মানে S হচ্ছে মূলধনী সামগ্রীর বর্ধনের তুলনায় প্রকৃত আয় বা উৎপাদনে বর্ধনের অনুপাতের সমান। অন্য কথায় তা হচ্ছে বিনিয়োগ বর্ধক (accelerator) বা প্রান্তিক মূলধন সহগের বিপরীত।[৬] উদাহরণ দেয়া যাক: মনে

দেখুন, যথা D. Hamberg-এর Economic Growth and Instability, W. W. Norton and Co., New York 1956 পৃ: ১৫৭ ২৭২।

Domar-এর মডেলে অবশ্য ধরে নেয়া হয়েছে যে, গোড়াতে শ্রম ও পুঁজির পূর্ণ ব্যবহার বিরাজমান। সেই এক অগ্রগতি হার ক্রম অগ্রসবমান শ্রমের পূর্ণ কর্ম-সংস্থান দেবে এবং পুঁজি সামগ্রীর পূর্ণক্ষম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৪. অর্থাৎ মনে করা হয়েছে যে সঞ্চয় অপেক্ষক (Saving function) রেখাকার (linear) এবং আদি বিন্দু হয়ে এগিয়ে যায়।

৫. মূল্যাবনতি-ব্যয় ও প্রতিস্থাপন-খরচ অভিন্ন বলে ধরা হয়। বাস্তবে কিন্তু, বর্ধনশীল অর্থনীতিতে বিপরীত ঘটে। প্রতিস্থাপন-খরচা মূল্যাবনতি ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম হয়। অবশ্য তাতে আলোচনায় হেরফের হওয়ার কিছু নেই। তাই, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কেবল অবচয় বিবর্জিত বলে বর্ণনা করা হবে।

৬. বিনিয়োগবর্ধক বলতে সাধারণতঃ প্ররোচিত বিনিয়োগ (অর্থাৎ আয়ে পরিবর্তন হেতু বিনিয়োগ) বোঝায়। কিন্তু, স্বনির্ভরশীল বিনিয়োগ (অর্থাৎ কিনা, আয়বর্ধন সম্পর্কহীন লগ্নী) ও উৎপাদন বাড়াতে পুঁজি যোগায়। কাজেই, সত্যি করে বলতে হলে বিনিয়োগবর্ধককে প্রান্তিক মূলধন সহগের ভগ্নাংশ হিসাবে আখ্যায়িত করতে হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই সম্পর্কে কিছু বলা হবে এবং S-এর স্থলে σ কে বিবেচনা করা হবে।

করুন এক ডলার অধিক উৎপাদন ঘটাতে দুই ডলার বাড়তি পুঁজি দরকার পড়ে। সুতরাং, S মানে $\frac{1}{2}$ অথবা বার্ষিক ৫০ শতাংশ। সুতরাং, এক ডলার বিনিয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদিকা শক্তির সাকুল্য বর্ধন পাওয়া যাবে ১× বার্ষিক S ডলার।

মূলধনে এই যে নূতন সংযোজন তা কিন্তু পূর্ববর্তী পুঁজি-সামগ্রিককে কতকাংশে বাতিল করে দেবে। কেননা নব্যসৃষ্ট মূলধনী-সামগ্রী প্রাক্তন সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগীতায় নামবে। একদিক থেকে বিদ্যমান বাজার নিয়ে টানাহেচ্‌ড়া করবে। অন্যদিক থেকে উপাদান সামগ্রী করায়ত্ব করে নেবে। তাতে পূর্ববর্তী সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পাবে। ফলে অর্থ-নীতির সাকুল্য উৎপাদিকা-শক্তি ১×S ডলার হবেনা, তদপেক্ষা কম হবে। তা হবে ১×σ-এর সমান। S ও σ তে ব্যবধান হবে। আর এই ব্যবধান নতুন পুঁজি সামগ্রীতে নিয়োজিত প্রতি ডলার উৎসারিত উৎপাদিকা-শক্তিতে বর্ধন ও সাকুল্য অর্থনীতিতে বর্ধনের ব্যবধানের সমান। অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট সামগ্রীতে যে সুযোগ পাওয়া গেল তার থেকে পূর্বতন সামগ্রীর অবক্ষয় বাদ দিয়ে যা থাকল তা। কাজে কাজেই, S অপেক্ষ σ কম হবে।

সুতরাং, ১×σ= অর্থনীতির মোট উৎপাদনে নীট সাকুল্য বর্ধন। তা অর্থনীতির সরবরাহ দিককার সমষ্টির প্রতিভূ। অর্থনীতির চাহিদার সমাহার কোনটি? তা হচ্ছে সেই সর্ব পরিচিত কেইন্‌সীয় গুনক বা আয় বর্ধক (mullplier)। মনে করা যাক বিনিয়োগ বাড়ছে বার্ষিক নির্জলা (absolute) ΔI হারে এবং আয় বাড়ছে বার্ষিক নির্জলা Δy হারে। সঞ্চয়-স্পৃহা সূচিত হচ্ছে ∝ হারে। আয়ে বর্ধন তাহলে হবে গুণক (I/∝)× বিনিয়োগে বর্ধন :

$$(১) \qquad \Delta y = \frac{I}{\propto}(\Delta I)$$

অর্থনীতি গোড়াতে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান ভারসাম্যে অবস্থিত। অর্থাৎ জাতীয় আয় উৎপাদিকা-শক্তির সমান। সুতরাং, জাতীয় আয় ও উৎপাদিকা শক্তিতে একই হারে সমপ্রসারণ ঘটতে হবে। তাহলেই কেবল পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান বজায় থাকবে। উৎপাদিকা-শক্তির বার্ষিক সম্ভাব্য সম্প্রসারণ I×σ-এর সমান আর আয়ে বার্ষিক বর্ধন (I/∝) (ΔI)-এর সমান। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে পূর্ণ বিনিয়োগ ভারসাম্য

বজায়ে $(I/\propto)(\triangle I)$ এবং $I\sigma$ সমান হতে হবে। তার থেকে পাওয়া যাচ্ছে ডোমার মডেলের মৌলিক সমীকরণ:

$$(২) \qquad \frac{I}{\propto}(\triangle I) = I\sigma$$

২ নম্বর সমীকরনের বাম পক্ষ প্রতিভূ আয়ে বার্ষিক বর্ধনের এবং তা সমস্যার চাহিদা দিক। দক্ষিণ পক্ষ উৎপাদিকা শক্তির বার্ষিক বর্ধন এবং তা সমস্যার সরবরাহ দিক।

এই সমীকরণকে $\propto$ দিয়ে পূরণ করে এবং I দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায়,

$$(৩) \qquad \frac{\triangle I}{I} = \propto\sigma$$

৩ নম্বর সমীকরণের বামপক্ষ প্রতিভূ বিনিয়োগে বার্ষিক নির্জলা বর্ধন/বিনিয়োগ পরিমাণ। অর্থাৎ তা হচ্ছে বিনিয়োগ অগ্রগতির বার্ষিক শতকরা হার। কাজে কাজেই, দেখা যাচ্ছে পূর্ণ বিনিয়োগ-সংস্থান বজায় রাখায় এই পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। ফলে বার্ষিক শতকরা আয় বাড়ে $\propto\sigma$ হারে।[৭] সুতরাং, সমাধানে এসে পৌঁছা গিয়েছে। পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থানের নিরন্তর সম্ভাবনা বজায় রাখতে হলে উন্নয়ন অগ্রগতি হার কেমন হতে হবে? তা হবে এই যে বিনিয়োগ ও প্রকৃত আয় বাড়তে হবে বার্ষিক নির্দিষ্ট শতকরা অগ্রগতির হারে (অথবা চক্রবৃদ্ধি হারে) যা হবে সঞ্চয়-স্পৃহা ও বিনিয়োগের গড় উৎপাদন (মূলধন সহগ বা বিনিয়োগবর্ধকের বিপরীত) সঞ্জাত উৎপন্নের সমান।

ডোমার সমস্যার উদ্ভাসনে একটা গাণিতিক উদাহরণও প্রদান করেছেন। মনে করা যাক σ বার্ষিক শতকরা ২৫ ভাগ, $\propto$ ১২ ভাগ আর y আদিতে বার্ষিক ১৫০ বিলিয়ন ডলার, পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান বজায় রাখায় লগ্নী হতে হবে ১৫০×১২/১০০ অথবা ১৮ বিলিয়ন ডলার। তার মানে লগ্নী পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সঞ্চয় মাফিক হতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণ সংস্থান পর্যায়ে যে হারে সঞ্চয় ঘটে থাকে লগ্নী তা শোষে নিতে হবে। এই বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিনিয়োগ পরিমাণ ×σ হারে। অর্থাৎ বর্তমান উদাহরণে ১৫০×১২/১০০×২৫/১০০ অথবা

---

৭. $\triangle y = (1/\propto)(\triangle 1)$ দেয়া থাকলে সমাকলন করে $y = (1/\propto)(1)$ এবং বিভাজন প্রথা অনুসরণ করে পাওয়া যায় $\triangle y/y = \triangle 1/1$. কাজেই আয় বাড়ে প্রত্যাশিত হারে যে হার ৩ নম্বর সমীকরণে বিনিয়োগের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

৪.৫ বিলিয়ন ডলার। জাতীয় আয়ও ৪.৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে যেতে হবে। নতুবা অব্যবহৃত শক্তি পড়ে থাকবে। কিন্তু, আয়ে আপেক্ষিক বর্ধন হবে নির্জলা বর্ধন ÷ (ভাগ) আয় পরিমাণ, অর্থাৎ,

$$\frac{১৫০ \times \frac{১২}{১০০} \times \frac{২৫}{১০০}}{১৫০} = \frac{১২}{১০০} \times \frac{২৫}{১০০} = \alpha\sigma = ৩ \text{ শতাংশ}$$

সুতরাং, আয় বেড়ে যেতে হবে বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ হারে। তবেই পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং পুঁজি-সামগ্রী যথাযথ ব্যবহৃত হবে।

দীর্ঘকালীন এই বিশ্লেষণ স্বল্পকালীন আয় বিশ্লেষণের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ অগ্রগতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়না। তার বক্তব্য হচ্ছে আয় পর্যায় বজায় রাখার নিমিত্তে লগ্নী হতে হবে সঞ্চয় মাফিক। সঞ্চয় যা লগ্নী তা পুরোপুরী শোষে নেবে। "গতকাল" (প্রাক্তন কাল) এর সঞ্চয় "আজ"কের (সাম্প্রতিক কাল) বিনিয়োগে অন্তরিত হয়ে যেতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী স্থিতাবস্থা বিদ্যমান রাখতে হলে কিন্তু "আজ"কের বিনিয়োগ "গতকাল"-এর সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হতে হবে।[৮] তার মানে, লগ্নী বাড়বে ক্রমবর্ধমান নির্জলা হারে (অথবা নিত্য চক্রবৃদ্ধি হারে)। আর এই হার হবে সঞ্চয়-স্পৃহা (α) পূরণ মূলধন সহগের বিপরীত (σ)।

৩ নম্বর সমীকরণ থেকে লক্ষ্য করা যায় α যত অধিক হবে বিনিয়োগ তত বেশী হতে হবে। তবেই কেবল আয় পর্যায় বজায় রাখা সম্ভব হবে। তেমনি σ-এর আকার অনুসারে বিনিয়োগ-উৎসারিত উৎপাদিকা-শক্তিতে সম্প্রসারণ ঘটে। এই উৎপাদিকা-শক্তির পরিমাপে আয় বেড়ে যেতে হবে। তবে নিষ্ক্রিয় শক্তি β বলে কিছু পড়ে থাকবে না। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান আয়ের নিয়ামক হচ্ছে নিরন্তর বর্ধিত বিনিয়োগ হার। সুতরাং, আয় বাড়তে হলে লগ্নী বেড়ে যেতে হবে। বিনিয়োগ কতটুকু সম্প্রসারিত হবে তা পাওয়া যায় $\alpha\sigma$ এর ফলাফল থেকে।

---

৮. যদি সরকারী ক্রিয়াকর্ম ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিদ্যমান বলে ধরা হয়, তাহলে আজকের বেসরকারী বিনিয়োগ যোগ সরকারী ব্যয় যোগ রপ্তানি গতকল্যকার সঞ্চয় যোগ কর যোগ আমদানী অপেক্ষা অধিক হতে হবে। তবেই, উন্নয়ন-অগ্রগতি যথাযথ হতে পারবে।

কাজে কাজেই, অর্থনীতিকে একটা জটিলাবর্তের সম্মুখীন হতে হয়। বিনিয়োগ যথেষ্ট না হলে বেকারত্ব ঘটে আজকে। কিন্তু, আজ বেশী লগ্নী ঘটালে কালকে আরও অধিক ঘটাতে হয়। চাহিদা বাড়াবার নিমিত্তে তাহলেই শুধু সম্প্রসারিত উৎপাদিকা-শক্তি পুরোপুরী কাজে লাগানো যায়, অথচ পুঁজি সামগ্রীর অপচয় ঘটেনা। অন্যথায় পুঁজি সামগ্রীতে অপচয় দেখা দেয়। অতিরিক্ত মূলধন অব্যবহৃত পড়ে থাকে। তাতে বিনিয়োগ উল্টা বইতে শুরু করে। নিম্নগামী হয়ে উঠে। পরিণামে, পরশু মন্দাবস্থা দেখা দেয়। সুতরাং, অর্থনীতিকে ঘোড়দৌড় দৌড়াতে হবে। বেগে, আরও বেগে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারবে। না হয় হোচট্ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। পেছন দিকে সরতে থাকবে।

বিনিয়োগ অল্প করে হলে যেমন অবনতি দেখা দেয় তেমনি তা প্রত্যাশিত হার অপেক্ষা অধিক হলে কিছুটা জটিলতা জন্ম দেয়। অগ্রগতি হার প্রয়োজনাতিরিক্ত হলে বিদ্যমান উৎপাদিকা-শক্তিতে চাপ সৃষ্টি করে অথচ বিনিয়োগক্ষেত্রে উস্কানী যোগায়। আর এই উস্কানী পেয়ে তা আরও বেগে ধেয়ে চলে। উৎপাদন বেগবান ও জোরদার করে। কিন্তু, উৎপাদিকা-শক্তিতে ভীষণ চাপ দিয়ে অবস্থা কাহিল করে তোলে। সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুঁজি সক্রিয় রাখায় আরও অধিক পুঁজি-সামগ্রী গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলধনী-সামগ্রীর অপ্রতুলতা এড়াতে হলে বিনিয়োগ হ্রাস করে নিতে হয়। এই যে বেখাপ্পা পরিস্থিতি তা অনুধাবন করতে হলে খতিয়ে দেখতে হবে উৎপাদন বা বিনিয়োগে বর্ধন চাহিদায় কি প্রভাব সৃষ্টি করে। অতি-উৎপাদন বা অতি-বিনিয়োগ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। চাহিদা বাড়ে আরও চড়া হারে। ফলে দেখা দেয় উন-উৎপান ও মূলধনী-সামগ্রীতে অপ্রাচুর্য। এই অপ্রাচুর্য সারিয়ে তুলতে বিনিয়োগ কমাতে হয়। তাতে চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদিকা-শক্তির চাপ হালকা হয়। বিপরীত দিকে শ্লথগতিসম্পন্ন উৎপাদন উৎপাদিকা-শক্তি নিষ্ক্রিয় করে তুলে। তা সক্রিয় করার লগ্নী তেজী করতে হয়। তাতে চাহিদা বাড়ে।

পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ অগ্রগতি হার নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডোমার প্রশ্ন তোলেন: বাস্তবে বিনিয়োগ যথাযথ পরিমাণ হবে কি? যাতে

বর্ধন যথাযোগ্য হতে পারে? ডোমার এই প্রশ্নের আশাপ্রদ উত্তর প্রদান করেন। ক্লাসিক্যাল বাদীদের ন্যায় স্থবির পর্যায়ের কথা বলেননি। অথবা মার্ক্সের ন্যায় পুঁজিতন্ত্রবাদের বিনাশের বাণী শোনাননি। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অথবা একথা ভাবারও সুযোগ নেই যে, পুঁজিবাদে নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ হতে পারে না। অন্ততঃ সহজাত সীমাবদ্ধতা বলে কিছু লক্ষ্য করা যায় না। ডোমার অবশ্য একথা বলেন যে অগ্রগতি-ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে কিছু বিশেষ পন্থা অনসরণ করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদতন্ত্রে সামনে বাড়ার স্বাভাবিক, স্বয়ংক্রিয় ও স্বনির্ভরশীল প্রবণতা তেমন একটা নেই। "সামনে ও উর্ধ্বে" যেতে হলে বিশেষ পন্থা অনুসরণ করে এগুতে হবে।

তাছাড়া, ডোমার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, একচেটিয়া ব্যবসা দেখা দিয়ে পুঁজি সামগ্রীতে বেকারত্ব ঘটিয়ে দিতে পারে। তেমনি উদ্ভাবন আবিষ্কার নির্জীব করে শ্রম-বেকারত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে। বিনিয়োগক্ষেত্রে এই বাধা অপসারণ করিয়ে নিতে হবে বিচরণক্ষেত্র সম্প্রারিত করে, প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতি ঘটিয়ে কি লোকসংখ্যা বর্ধন মাধ্যমে। বাহ্যিক এই জাতীয় শক্তি বিদ্যমান না হলে দীর্ঘস্থায়ী মন্দাবস্থা ও ক্রমবর্ধমান অব্যবহৃত পুঁজিসামগ্রী দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গড়ধর্মী দীর্ঘস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব নিয়ে পরবর্তী পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

ডোমারের ন্যায় হ্যারডও অক্ষুণ্ন-উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তা বজায় রাখার পন্থা-পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন ও সঙ্কেত দিয়েছেন কোন্ পথে অর্থনীতিকে এগিয়ে যেতে হবে।

হ্যারড তাঁর আলোচনায় সূত্রপাত ঘটিয়েছেন সেই বহুল প্রচলিত কথা দিয়ে যে সঞ্চয় বিনিয়োগের সমান হয়। নিম্নোক্তভাবে তা প্রকাশ করেছেন:

$$GC = s \quad (৪)$$

G উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতীক যা, যে কোন সময়ে মোট আয়ের তুলনায় আয়-বৃদ্ধির অনুপাত বোঝায়। C মূলধন বৃদ্ধির প্রতিভূ এবং আয়-বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগের অনুপাত। s মানে সঞ্চয় যা কিনা আয়ের

ভগ্নাংশ। Gকে $\Delta y/y$, Cকে $1/\Delta y$ ও sকে S/y হিসাবে প্রকাশ করা চলে। সুতরাং ৪ নম্বর সমীকরণ হয়ে দাঁড়ায়,

(৫) $$\frac{\Delta y}{y} \times \frac{1}{\Delta y} = \frac{S}{y}; \quad \frac{1}{y} = \frac{S}{y}; \quad 1 = S$$

উক্ত সমীকরণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমীকরণের নামান্তর মাত্র। এক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে "বাস্তব," "বাস্তবায়িত" অথবা "গত" (export) ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

সেই অনুসারে দুটো আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়: সঞ্চয় নির্ভরশীলে আয়-মাত্রায় আর অগ্রগতির হার হচ্ছে বিনিয়োগের নিয়ামক, দ্বিতীয় সম্পর্কটিতে বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব পাওয়া যায়। বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব মানে আয় অগ্রগতির সাথে তাল রেখে বিনিয়োগ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আয় বেড়ে চলে, উৎপাদন ত্বরান্বিত ও জোরাল হয় মূলধনী সামগ্রীর ক্রিয়াকর্মের ফলে। আবার আয়ের প্রভাবে মূল-ধনী সামগ্রী সম্ভারে সম্প্রসারণ ঘটে। অর্থাৎ এই দুয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান এবং একে অন্যের উস্কানী হিসাবে কাজ করে।

পূর্ণ ভারসাম্য অবস্থা বিরাজমান এমন আয় পূর্বে প্রত্যাশিত, কি পরিকল্পিত বিনিয়োগমাত্রা এমন হবে যেন তা প্রত্যাশিত, কি পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিমাণ নিঃশেষে শোষে নিতে পারে। লগ্নীমাত্রা তেমন হবে বিঘ্নহীন অগ্রগতি ঘটতে থাকলে। হ্যারড সমীকরণ উপস্থাপিত করেছেন বিঘ্নহীন ভারসাম্য অগ্রগতি চিহ্নিত করায়।

(৬) $$GwCr = s$$

Gw মানে "ইপ্সিত অগ্রগতির হার" (**Warranted rate of growth**) অর্থাত পরিধি ক্রম-প্রসারিত মূলধনী-সরঞ্জাম পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য উন্নয়ন-অগ্রগতির হার।[৯] তাতে করে উদ্যোক্তাশ্রেণী বিনিয়োগ ঘটিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। Cr হচ্ছে প্রয়োজনীয় মূলধন অর্থাৎ কিনা ভোক্তার আয়ে প্রান্তীয় সংযোজন-সঞ্জাত ভোগদ্রব্যের চাহিদা মিটাতে সক্ষম অগ্রগতি ধারণ করায় প্রয়োজনীয় মূলধন-সহগ। অন্য কথায়, Cr প্রতিভূ মূলধনের যে মূলধন Gw উৎসারিত অগ্রগতি হার বজায় রাখায় অত্যাবশ্যকীয়। হ্যারড বলেন সঞ্চয়-প্রবৃত্তি সর্ব সময়ে বিরাজমান। কাজেই, প্রত্যাশিত সঞ্চয় মাত্রা ও প্রত্যাশিত বিনিয়োগ মাত্রায় ব্যবধান ঘটা মানে অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার।

৯. ইপ্সিত অগ্রগতি হার মানে পূর্ণক্ষম বর্ধন হার।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসল বক্তব্যে হ্যারড ও ডোমার সমরূপ। পার্থক্য যেটুকু তা বিশ্লেষণ মাত্রায়। কাজেই, হ্যারডের দেয়া মডেল ডোমারের মডেলে রূপান্তরীত করা যায়। তাঁদের উভয়ের মতে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ মাত্রা এমন হবে যেন তা প্রত্যাশিত সঞ্চয় পরিমাণ পুরোপুরী কাজে লাগিয়ে নিতে পারে। তাহলেই পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান ধারণ করা সম্ভব হবে।

প্রত্যাশিত সঞ্চয় S* দিয়ে চিহ্নিত করে নিয়ে বলা যাক যে তা প্রান্তিক (বা গড়) সঞ্চয় স্পৃহা পূরণ আয় এর সমান, অর্থাৎ $S^*=\propto y$. তেমনি 1* দিয়ে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ চিহ্নিত করে বলা যাক যে তা v দ্বারা চিহ্নিত মূলধন-সহগ পূরণ আয়-বর্ধন এর সমান। অর্থাৎ $1^*=v\triangle y$ [১০]. কাজেই, পূর্ণ ভারসাম্য অবস্থায় S* যদি 1*-এর সমান হয় তাহলে $\propto y=v\triangle y$ অথবা,

$$(৭) \qquad \frac{\triangle y}{y}=\frac{\propto}{V}$$

এই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় যে অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধারা বার্ষিক শতকরা $১00\times(\propto/v)$ হারে সম্প্রসারিত হতে হবে। এই হার ডোমারের $\propto$ এর সামিল এবং হ্যারডের Gw-এর সমান। আয় বাড়তে হবে, তবেই বিনিয়োগ বাড়বে। উদ্যোগী ব্যবসায়ী অধিক লগ্নী ঘটাবে। তবে তা কেবল অধিকতর আয়-প্রসারণ পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যথায় নয়। কাজেই, অগ্রগতির হার ক্রমবর্ধনশীল হয়ে কেবল পূর্ণ চাকুরী সংস্থানমুখী অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারে। ভারসাম্য অবস্থা বিদ্যমানোপযোগী অগ্রগতি আয়বর্ধক গুণক ($\propto$ ও নব বিনিয়োগ (σ বা $1/v$ উৎসারিত উৎপাদন দিয়ে নির্ণীত) এর উপর নির্ভরশীল। অগ্রগতি হার এইরূপ হয়ে বর্তমান বৎসরের আয় গত বৎসর অপেক্ষা অধিক করে দেবে। এই বাড়তিটুকু হবে গত বৎসরে প্রতিষ্ঠিত পুঁজি-সামগ্রীর উৎপাদনের সমান।

৬ নম্বর সমীকরণে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমীকরণ উপকল্প দিচ্ছে যে অর্থনীতি সর্বক্ষণ কেইন্সীয় ভারসাম্যে বিরাজ করছে আর প্রত্যাশিত বিনিয়োগ কাম্য সঞ্চয়ের সমানুপাতিক হয়ে চলেছে। অর্থাৎ ৬ নম্বর সমীকরণ উন্নয়ন-অগ্রগতির কেবলমাত্র একটা পথ নির্দেশ করছে

---

১০. $V=1/\sigma$ এক্ষেত্রে σ হচ্ছে ডোমার-এর ভাষায় নব সৃষ্ট মূলধনসামগ্রীর প্রতি ডলারে উৎসারিত উৎপাদিকা-শক্তির নীট বর্ধন।

এবং তা হচ্ছে অক্ষুণ্ণ অগ্রগতি। বাস্তবে কিন্তু ভিন্নরূপ হতে দেখা যায়। অর্থনীতি আরও বহুপথ অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে পারে।

যেমন ধরুন, যদি G(প্রকৃত অগ্রগতি হার) Gw (অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নিশ্চিতকারী ইপ্সিত অগ্রগতি হার) অপেক্ষা অধিক হয়, তবে C-এর মূল্য (প্রকৃত মূলধন সংগঠন) Cr (অক্ষুণ্ণ অগ্রগতি অব্যাহত রাখার অত্যাবশ্যকীয় মূলধন গঠন) অপেক্ষা কম হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে, মূল-ধন-সামগ্রীর অপ্রতুলতা দেখা দিবে। কাম্য মূলধন-সামগ্রী প্রকৃত পুঁজি-সামগ্রী অপেক্ষা অধিক হবে। তাতে দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি-ফাঁক দেখা দেবে। প্রত্যাশিত বিনিয়োগ কাম্য সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হবে। উৎপাদন সাকুল্য চাহিদা অপেক্ষা কম হবে। ডোমারের বক্তব্য থেকেও এই কথা আঁচ করা যায়। তিনি স্বীকার করেন যে ασ অপেক্ষা অধিক হারে 1 সম্প্রসারিত হতে পারে।

বিপরীত দিকে Gw অপেক্ষা G কম হতে পারে। ইপ্সিত বর্ধন অপেক্ষা প্রকৃত অগ্রগতি কম হতে পারে। তাহলে, প্রকৃত মূলধন-সংগঠন প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে। অর্থাৎ Cr অপেক্ষা C বেশী হবে। ফলে মুদ্রা-সঙ্কোচন ফাঁক জন্ম নেবে। ব্যবসায়ীরা সব বিক্রি করতে পারবে না। উৎপন্ন দ্রব্য বেশ কিছুটা অবিক্রিত থেকে যাবে। এই বক্তব্যও ডোমারের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ασ-র তুলনায় 1 অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে সম্প্রসারিত হবে।

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে একটা আপাতঃ বিসদৃশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ডোমার বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতাবস্থা ও পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বজারের নিমিত্তে বিনিয়োগ ও অগ্রগতি সরাসরি হারে বেড়ে যেতে হবে। অথচ দেখা যাচ্ছে প্রকৃত বর্ধন-হার অতি উচ্চ হলে (Gw অপেক্ষা G অধিক) অর্থনীতিতে উৎপাদন ঘটে স্বল্প মাত্রায়। বিপরীতক্ষেত্রে (G অপেক্ষা Gw অধিক) উৎপাদন হয় অত্যধিক হারে। আচ্ছা জট বটে। আসলে কিন্তু তা নয়। একটু গোড়ায় তাকিয়ে দেখলে সমাধান পাওয়া যায়। চাহিদার দিকটা বিবেচনায় নিলেই জট খুলে যায়। Gw অপেক্ষা G বড় হলে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু, চাহিদা বাড়ে আরও চড়া হারে। কেননা, প্ররোচিত বিনিয়োগ যে সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে উন-উৎপাদন দেখা দেয় ও দরমাত্রা উর্ধ্বগতি নেয়।

হ্যারডের বক্তব্যও মোটামোটি একরূপ। তিনি অনবিচ্ছিন্ন অগ্রসর থেকে বিচ্যুতি নির্দেশ দিতে যেয়ে মন্তব্য করেছেন যে Gw থেকে G দূরে যাওয়ার প্রবণতা বিরাজমান এবং এই বিচ্যুতি স্থিতি-হীন প্রকৃতিধর্মী। G একবার Gw থেকে দূরে সরে গেলে তা ক্রমে আরো দূরে সরে যেতে থাকে। একবার পথভ্রষ্ট হলে অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধাবা ব্যাহত হতে থাকে আর এই বিচ্যুতি স্ব-পুষ্টিধর্মী। একবার তর পেয়ে গেলে আপনা থেকে বাড়তে থাকে। দানা বেঁধে উঠলে লতা-গুল্মে গজিয়ে উঠে। যেমন Gw অপেক্ষা G অধিক হলে, প্রত্যাশিত বিনিয়োগ কাম্য সঞ্চয়মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অগ্রগতি পথে হাওয়া লাগে। ধূমায়িত হয়ে উঠে কর্ম-ক্রিয়া। আবার বিপরীত দিকে, প্রতিকূল স্রোত জোরদার হয়ে উঠে। Gw অপেক্ষা G ন্যূন হলে সঞ্চয়মাত্রা লগ্নী পরিমাণ অতিক্রম করে যায়। অনাহুত সংযোজন হতে থাকে। উদ্যোগী ব্যবসায়ী গুণ ধমকে দাঁড়ায়। উদ্যোক্তাশ্রেণী হতাশা-বিভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে। উৎপাদন কিছুতেই Gw -এর ধারে কাছে পৌঁছুতে পারে না। ফলে অবস্থা আরও অসহনীয় হয়ে উঠে। অগ্রগতি অধিক হারে ব্যাহত হয়।

ভিন্নতর অভিমুখে যাওয়া যাক। ধরা যাক সঞ্চিত আয়েব ভগ্নাংশে তেমন তারতম্য নেই। মূলধন-সহগ ও মোটামোটি সন্তোষজনক স্থিতি-শীল পর্যায়ে বিরাজমান। এমতাবস্থায় অগ্রগতি কি চিরকাল ঊর্ধ্বমুখে ধেয়ে যাবে? না ধপ্ করে নীচের দিকে আছাড় খেয়ে পড়বে? হ্যারড বলেন, উৎপাদন সম্প্রসারণের একটা স্বাভাবিক উচচ সীমা বিরাজমান রয়েছে এই উচচ সীমার নিয়ামক হিসাবে কাজ করে "প্রকৃতিদত্ত" পরিবেশ, যেমন শ্রম-সংখ্যার আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি-সামগ্রী ও কৌশলী-বিদ্যা। এই সীমা "পূর্ণনিয়োগ ও চাকুরী-সংস্থান-মুখী সীমা।" সম্ভাব্য সর্বোচচ অগ্রগতি অর্জনের সীমা। এই সর্বোচচ-সীমা অর্জিত হয় শ্রম সংখ্যায় বর্ধন ঘটে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সম্প্রসারণ হয়ে।[১১] সময়ের কপোলতলে এই উচচতর সীমা পরিবর্তিত হয়। উপাদানসামগ্রী অধিক হয়ে, কৌশল-প্রক্রিয়া উন্নত হয়ে এই সীমাকে

---

১১. Hambecg-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৯৬; J. R. Hicks-এর A. Contribution to the Theory of Trade Cycles, Oxford University Press, Oxford, 1950, সপ্তম ও দশম অধ্যায়।

উর্ধ্বে নিয়ে যায়। হ্যারড সর্বোত্তম অগ্রগতির এই পর্যায়কে আখ্যায়িত করেছেন "অগ্রগতির প্রাকৃতিক হার" বলে—যা তাঁর পরিভাষায়, Gn রূপে চিহ্নিত। কিন্তু, Gn Gw অপেক্ষা ন্যূন হতে পারে। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অগ্রগতি হার ইপ্সিত হারের তুলনায় যথেষ্ট না-ও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে কিছুকাল হয়ত ইপ্সিত হারে বর্ধন ঘটতে পারে। তার পথে হয়ত তেমন কাঁটা নাও দেখা দিতে পারে। পূর্ণ উৎপাদিকা-শক্তি মাফিক উৎপাদন ও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, অতঃপর? অগ্রগতি আর ইপ্সিত হারে এগুতে পারবে না। অতি-উৎপাদন দেখা দেবে। পুনরাবৃত্তিধর্মী উল্টো মোচড় ঘটতে থাকবে। কাজে কাজেই Gw যদি G এবং Gn অপেক্ষা অধিক হয় তাহলে অর্থ-নীতি আস্তে-ধীরে অবনতির পথে নেমে আসবে, ক্রমে দীর্ঘমেয়াদী গড়ধর্মী জড়ত্বে জড়িয়ে পড়বে। জন্ম নেবে জটিলাকার অপূর্ণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি।

বাস্তবজগতে কিন্তু, বাণিজ্যচক্রের চক্রময় হ্রাসবৃদ্ধিতে প্রতিরোধক বিদ্যমান রয়েছে। লাগামহীন হযে তা ছুটে বেড়াতে পারে না। অচিরেই সীমায় আটকে পড়ে। উর্ধ্বগামী পরিক্রমণে Gn বাধা হয়ে দাঁড়ায়। "পূর্ণ চাকুরী সংস্থান পর্যায়ে" এসে অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়। স্বল্পকালীন বিবেচনায় প্রকৃত আয় বাড়তে পারে না।

শ্রম অপ্রাচুর্য ও পুঁজি-সামগ্রী অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিম্নমুখী পরিক্রমায় ও সীমা ছাড়িয়ে নীচে যাওয়ার জো নেই। স্বনির্ভরশীল বিনিয়োগ সক্রিয় হয়ে পড়তি থামিয়ে দেয়। ভোগবিচিত্রা নিম্নতম পর্যায়ের নিম্নে যেতে পারে না। সাকুল্য বিনিয়োগ ঋণাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। Hicks এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১২] তিনি হ্যারড-ডোমার বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছেন। নানা রকম ফাঁক নির্দেশ করে, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিয়ে ও মুদ্রাতাত্ত্বিক বিষয়াবলী অন্তরীত করে হ্যারড-ডোমার আলোচনার সর্বাঙ্গীন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

হ্যারড-ডোমার বক্তব্যের প্রধান প্রধান মন্তব্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক:

---

১২. Hicks-এর প্রাগুক্ত বই, দ্বিতীয় অধ্যায়।

১. সকল কলকাঠির নায়ক বিনিয়োগ। অক্ষুণ্ণ অগ্রগতির মূলে এই বিনিয়োগ। একে ঘিরেই নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের যত সমস্যা। কেননা, তার ক্রিয়াকাণ্ড দুই জাতীয় প্রভাব জন্ম দেয়। একদিকে আয় বাড়ায়, অন্যদিকে অর্থনীতিকে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলে। অর্থনীতির উৎপাদিকা শক্তি তেজী করে তুলে।

২. আয়ের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচরণ-প্রথা অনুসারে বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তি অধিক উৎপাদন ঘটাতে পারে অথবা অধিকতর বেকারত্ব জন্ম দিতে পারে।

৩. বৃহদায়তন সময় পরিসরে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থানমুখী অবিচ্ছিন্ন অগ্রসরের শর্তাবলী বিধৃত করা যায়। আয়ের আচরণবিধি যথাবিহিত করে তোলার শর্তসমূহ নিয়মনিষ্ঠভাবে বিধিবদ্ধ করা যায়। নির্দিষ্ট বর্ধন হার এই সব বিধি-বিধানে বিধৃত। সেই অগ্রগতি পূর্ণবিনিয়োগ সংস্থান নিশ্চিত করে। দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য অবস্থায় সঞ্চিত সঞ্চয়ের পূর্ণ ব্যবহার ঘটায় এবং পুঁজি-সামগ্রী পুরোপুরী কাজে লাগায়।

ডোমারের মতে সাযুজ্য এই অগ্রগতি হার নির্ভর করে আয়-বর্ধক বা গুণক ও নব প্রতিষ্ঠিত পুঁজি-সামগ্রীর উৎপাদিকা-শক্তির উপর। এই অগ্রগতি হার সঞ্চয়-স্পৃহা ও বিনিয়োগ-বর্ধক-বিপরীতের গুণফলের সমান। কাজেই, আয়ে বর্ধন ঘটতে হবে চক্রবৃদ্ধি হারে। তবেই, পূর্ণ চাকুরী-সংস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে।

৪. বিশেষ ধারণাবদ্ধ এই শর্তাবলী অর্থনীতির জন্য অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির পথ চিহ্নিত করে। কিন্তু, বাস্তবিক সম্প্রসারণ ঈপ্সিত অগ্রগতি অপেক্ষা পৃথক হতে পারে। প্রকৃত বর্ধন-হার ঈপ্সিত বর্ধন অপেক্ষা অধিক হলে অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির খপ্পরে নিপতিত হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রী মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

৫. বাণিজ্য-চক্র অক্ষুণ্ণ অগ্রগতি পথে বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। আভ্যন্তরীণ এই বিচ্যুতি আপনা থেকে কেটে যাওয়ার জো নেই। বরং তা আরও গাঢ়ত্ব লাভ করে। এদিকে ঊর্ধ্বগমন নিরন্তর চলতে পারে না। সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সীমায় এসে আটকে যায়। তেমনি নিম্নগতিও অনির্দিষ্ট-কাল চলতে পারে না। তথাকথিত স্বনির্ভরশীল বিনিয়োগ ও ভোগবিচিত্রা তা থামিয়ে দেয়। প্রকৃত অগ্রগতি হার ঈপ্সিত হার অপেক্ষা অধিক

হয়েও অর্থনীতিকে অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে যদি বর্ধনের প্রাকৃতিক হার ইপ্সিত হার অপেক্ষা ন্যূন হয়। কারণ, এমতাবস্থায় উৎপাদন-পরিসর সহসা ত্বরিত গতিতে সম্প্রসারিত হতে পারে না।[১৩]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো সম্পর্কে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। হ্যারড ও ডোমার তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন নির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপকল্প মেনে নিয়েছেন।[১৪] ফলে তাঁদের আলোচনা আঁট-ঘাট বাঁধা হয়ে উঠেছে। দৃপ্ত ও উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারেনি।

---

১৩. আরও বহু ধনবিজ্ঞানী কেইন্সীয় বিশ্লেষণকে দীর্ঘমেয়াদী পটে বিন্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে Robinson, Kalecki, Rostow, Keirstead-এর নাম অগ্রগণ্য। তবে তাঁদের বিশ্লেষণ উন্নয়ন অগ্রগতির সাধারণ প্রতিকৃতিরূপে ফুটে উঠেনি। বিশেষ বিশেষ কিছু ধারণার গুরুত্ব উদ্ভাসিত করেছে মাত্র। হয়ত সর্বাঙ্গীন ও সুচারু পর্যালোচনায় এ সব ধারণা প্রত্যয় কাজে আসতে পারে। হাঁ, এক কথা, ভিন্নতর পোশাকী কাঠামোতে তাঁদের সবাই বেশ কিছু বিচ্যুতি নির্দেশ করেছেন। এইসব বিচ্যুতি নির্ধারণের নিমিত্তে আরও অধিক পর্যালোচনা আবশ্যক। বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, যথা—Joan Robinson-এর Accumulation of capital, Macmillan & Co. Ltd., London, 1956 ; M. Kalecki-এর Theory of Economic Dynamics, Rinehart, New York, 1954 ; W. W. Rostow-এর Process of Economic Growth, W. W. Norton & Co., New York, 1952 ; B. S. Keirstead প্রণীত The Theory of Economic Change, The Macmillan & Co. Ltd., London, 1948.

Harrod-Domar-Hicks-এর চলিষ্ণুধর্মী বিশ্লেষণে নকশা সম্বলিত সুষ্ঠু-আলোচনা পেতে পারেন K. E. Boulding প্রণীত "In Defence of Statics", Quarterly Journal of Economics, LXIX, No. 4, পৃঃ ৪৯২—৪৯৩ (নভে. ১৯৫৫) এ। স্থায়ী অনুপাত ধারণা বাদ দিয়ে Harrod-Domar-এর বাকী সব উপকল্প মেনে নিয়ে R. M. Solow ও দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। দেখুন তার প্রবন্ধ "A contribution to the Theory of Economic Growth", ঐ, LXX, No. 1, 65-94 (Feb. 1956).

১৪. এই সব বিশ্লেষণের সমালোচনার জন্য দেখুন L. B. Yeager-এর "Some Questions about Growth Economics", Amrican Economic Review, XLIV. পৃঃ ৫৩- ৫৩ (মার্চ, ১৯৫৪)।

উদাহরণ হিসাবে সঞ্চয়-স্পৃহা ও মূলধন-উৎপাদন-অনুপাত প্রত্যয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁদের মডেলে এই দুটো উপকল্প নির্দিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু, আসলে তা নয়। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে এরা পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই, তাঁদের প্রদত্ত নিয়মনিষ্ঠ অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধারা ব্যাহত হতে বাধ্য। অনুপাতে তারতম্যহেতু আলোচনার জট বাধা কাঠিন্য শিথিল হয়ে উঠা স্বাভাবিক। ফলে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত পথে সমপ্রসারণ এগিয়ে যাবেনা। যেমন ধরুন, পুঁজিসামগ্রীতে যে সংযোজন তা তেমন একটা টেকসই দীর্ঘস্থায়ী কিছু নয়। ফলে বিনিয়োগ-উৎসারিত উৎপাদিকা-শক্তি তেমন একটা বাড়ে না। এদিকে ভোগ-স্পৃহা অধিক বিদ্যমান। তাহলে, হয়ত পূর্ণ বিনিয়োগ-সংস্থান বজায় রাখায় লগ্নী অগ্রগমন অবিরত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এবারে দেখুন উৎপাদনে নির্দিষ্ট অনুপাতের বিষয়টি। এই ধারণা আলোচনা বহির্ভূত করে দেয়া যাক। ধরা যাক, শ্রম পুঁজির স্থান দখল করতে পারে। তাহলে অবস্থা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতির যে আটঘাট বাধা শর্তাবলী সেগুলো আর অনঢ় হয়ে প্রতিভাত হয় না।[১৫] কাঠিন্য কিছুটা শিথিল হয়। ঋজুবদ্ধতা কিছুটা আলগা হয়। বজ্রআঁটুনী একটু ঢিলা হয়ে অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুসমঞ্জস ও সাঙ্গীকরণ করায় কিছুটা নমনীয়তা এনে দেয়। ফলে, একটু এদিক-ওদিক হয়ে সার্বিক পদবাচ্যে অর্থনীতি সমপ্রসারণ পথে সহজভাবে এগিয়ে যেতে পারে। হ্যারডের ভাষায় একেবারে ছুরির মাথা ছুঁয়ে কি ফুলসিরাতের তীক্ষ্ণধার অথচ সূক্ষ্ম পুল বেয়ে এগুতে হয় না। 'নড়েছ কি মরেছ' অবস্থায় পড়তে হয় না। ইপ্সিত হার আর বাস্তব হার এক না হলেই ডুবেছ—এমন কথা নেই।

শুধু তাই নয়, হ্যারড-ডোমার প্রদত্ত মডেলদ্বয় দরমাত্রায় পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। অথচ তা বাস্তব সত্য। দরমাত্রায় কিছুটা নড়চড় বরং স্থিতিহীন পরিবেশে কিছুটা স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারে। যেমন দেখুন, দর বেড়ে যেয়ে উন্নয়ন অগ্রগতি হারের আস্ফালন কমিয়ে দিতে পারে। তাতে অগ্রগতি-হার মোটামুটি একটা পর্যায়ে স্থিতিলাভ করার সুযোগ পায়। কারণ, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিমাত্রায়

---

১৫. Solow-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৬৫—৮৪।

উৎপাদন স্বল্পহারে বেড়ে যায়। ফলে, সেই অনুসারে বিনিয়োগমাত্রা সীমিত পর্যায়ে রাখা যায়।[১৬] সুতরাং, বলা চলে যে দরমাত্রায় পরিবর্তন ও উৎপাদন-উপকরণ অনুপাত নির্দিষ্ট বলে না ধরে এগুলে বরং সুষ্ঠু অগ্রগতি পাওয়া যেতে পারে। তেমনি অর্থনৈতিক অগ্রগতির আভ্যন্তরীণ স্থিতিহীনতা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকতে পারে। অথচ হ্যারড অথবা ডোমার কেউ বিষয়টিকে এভাবে নেননি।

সে যাই হউক, হ্যারড-ডোমার আলোচনায় হয়ত যথেষ্ট দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে। হয়ত অনেক উন্নতি অগ্রগতি সাধিয়ে নেয়া যায়। হয়ত তাঁদের সার্বিক পদভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি আলাদাভাবে দেখানো যেতে পারে। তাতে হয়ত উন্নয়ন অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যাবলী অধিকতর বলিষ্ঠাকারে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, এতসব বলা সত্ত্বেও একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হবে যে, হ্যারড ও ডোমার উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে মৌলিক প্রত্যয় ধারণা দিয়েছেন। তাঁদের অবদান নিঃসন্দেহাতীতভাবে যুগোত্তীর্ণ বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কীয় যেসব সমস্যা তাঁরা তুলে ধরেছেন সেই সব সমস্যা আজকের দিনের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকা ও ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। যেসব দেশ উন্নতির পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে অথচ তা বজায় রাখায় আজকে বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে সেই সব দেশ তাঁদের লেখা থেকে বেশ উপকৃত হবে এই সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

২. গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব তত্ত্ব

গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব নিয়ে বিশ্লেষাত্মক পর্যালোচনা শুরু হয়েছে সেই আদিকাল থেকে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় এই ধারণা স্থান পেয়েছে মর্যাদাবান প্রতিটি বিশ্লেষণে। রিকাডো, মার্ক্স, সুম্পিটার, ডোমার, হ্যারড সবাই এ ব্যাপারে সোচ্চার। একবাক্যে সবাই যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক পর্যায়ে এসে অধঃপাতে নিপতিত হবে। ভেঙ্গে পড়বে তার আঙ্গিক-কাঠামো। দেখা দেবে

১৬. দেখুন, যথা— S. Alexander-এর "Mr. Harrod's Dynamic Model," Economic Journal, LX, No. 240, 737 (Dec. 1950).

"অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব।" তাঁদের যুক্তিতর্ক বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে বটে। কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। এবারে এইসব খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। বাস্তব আলোতে বিচার করা হবে পরে। আপেক্ষিক গুরুত্ব ও মূল্যায়ন করা হবে চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে। দেখা হবে আজকের উন্নত দেশ তার উন্নতি বজায় রাখতে কতটুকু সক্ষম।

"গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব" কথাটায় ধনতান্ত্রিক উচ্চতর বিকাশের পর্যায়ের ধারণা বিধৃত। পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগমন পরিপক্ক পর্যায়ে এসে নাকি থমকে দাড়াবে নীট সঞ্চয় বেশী হবে অথচ নীট বিনিয়োগে মন্দা দেখা দেবে।[১৭] দীর্ঘ সময় ধরে এমন একটা ধারা সূচিত হবে যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে আপেক্ষিক সঙ্কোচন জন্ম নেবে এবং স্বল্পকালীন মন্দা পর্বগুলো তীব্রতর হয়ে উঠবে এবং পরিসরে বৃদ্ধি পাবে। চক্রময় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে বটে। তবে প্রাচুর্য পর্বগুলো অধিকতর দুর্বল হয়ে উঠবে এবং স্বল্পকাল বিরাজমান থাকবে। তার তুলনায় অধোগতি গাঢ়তর হবে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। অর্থনীতি আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে এগুতে থাকবে। পরিশেষে, অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠবে। এক কথায়, দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব মানে "জিরজিরে বাঁচা; একটুখানী চাঙ্গা হয়ে উঠা; অচিরে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া; মন্দাকাল, তা আবার আপনাতেই পরিপুষ্ট এবং পরিণামে, বিপদশঙ্কুল পরিস্থিতি ও দীর্ঘকালীন কঠিন বেকারী।"[১৮]

উদ্ভব এই পরিস্থিতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি বিবর্জিত পূর্ণ চাকুরী সংস্থানকারী আয়-ধারা ও বাস্তবিক আয়-ধারার মধ্যকার ব্যবধান ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে। যত গোলমালের মূলে ক্রমবর্ধমান এই ফাঁক। কাজেই, জড়ত্ব উপপাদ্য ক্রমবর্ধমান মাথাপিছু আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এমনকি, ক্রম-প্রসারিত মোট বিনিয়োগেও আপত্তি নেই। তেমনি জড়ত্বের মূলে নিহিত রয়েছে সম্ভাব্য চাকুরী সংস্থান ও বাস্তব চাকুরী পরিস্থিতির মধ্যকার ক্রম-প্রসারমান ফাঁক। কাজেই, জড়ত্ব তত্ত্ব

---

১৭. গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব তত্ত্বকে নানাভাবে আখ্যায়িত করা যায়, যেমন "অর্থনৈতিক পরিপক্কতা", "ক্রম-প্রসারিত মুদ্রাসঙ্কোচন ফাঁক" কি "ক্রমবর্ধমান বেকারী"। দেখুন, যথা B. Higgins-এর "The Theory of Increasing Under Employment," Economic Journal, LX 255 (June, 1950).

১৮. দেখুন, A. H. Hansen-এর Fiscal policy and Business Cycles, W. W. Norton & Co., New York, 1941, 353. এখন থেকে Hansen, Fiscal Policy বলে উল্লেখ করা হবে।

ক্রমবর্ধমান চাকুরী সংস্থানের সাথেও সাযুজ্যপূর্ণ যদি একই সময়ে ক্রমাগত হারে বেকারী বেড়ে যেতে থাকে। সুতরাং, জড়ত্ব মতবাদের সাথে স্থবির অর্থনীতি বিরাজমান এমন মনে করার কোন কারণ নেই। অর্থনীতি হয়ত এগিয়েই চলেছে। মাথাপিছু আয়ও হয়ত বেড়ে চলেছে। কিন্তু, বেড়ে চলেছে ক্রম-হ্রাসমান শ্লথগতিতে। এদিকে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মোটা করে বললে বলতে হয় যে অর্থনীতি তার ক্ষমতানুসারে বাড়তে পারছে না। ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে তার জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছে। ক্ষণে হয়ত তা মুচড়ে পড়ছে। ক্ষণে আবার বেঁকিয়ে পড়ছে। অন্য সময় হয়ত শ্লথ মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং, অর্থনৈতিক জড়ত্ব নানারূপ সম্ভাবনায় ভরপুর। ৫·১ চিত্রে সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।[১৯] yp রেখা সম্ভাব্য মোট প্রকৃত জাতীয় আয় নির্দেশ করে, অর্থাৎ তা পূর্ণ চাকুরী সংস্থানকালীন আয়-ধারা নির্দেশক রেখা। ya প্রতিভূ বাস্তবিক মোট প্রকৃত জাতীয় আয়-ধারার। সুতরাং, জড়ত্ব জন্ম নেয় S চিহ্নিত সময়কালে। তারপর থেকে সম্ভাব্য আয়-ধারা ও প্রকৃত আয়-ধারার মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে। মোট চাহিদা সাকুল্য সরবরাহের পেছনে পড়ে যায়। ডোমারের ভাষায় $1 \angle \alpha\sigma$ হয়ে উঠে আর হ্যারডের ভাষায় $G \angle G_w$ ও $G_n \angle G_w$ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব ও দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণ, কি দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতিতে তুলনা করা যায়। দীর্ঘকালীন সম্প্রসারণ কালে সাকুল্য চাহিদা সাকুল্য সরবরাহ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ডোমারের সমীকরণে হয়ে দাঁড়ায় $1 > \alpha\sigma$ আর হ্যারডের ধারণায় $G > G_w$ ও $G_n > G_w$. ৫·১ চিত্রে যদি ya নির্দিষ্ট মূল্যে না হয়ে চলতি মূল্যে হয় তবে ya yp কে ছাড়িয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি ফাঁক জন্ম নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের চক্রাকার নক্সা দীর্ঘসময়ের বিবেচনায় উর্ধ্বগতিসম্পন্ন হবে, উর্ধ্বমুখী মোড় বলশালী ও ব্যাপকতর হবে। অন্যদিকে নিম্নগামী মোড় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও স্বল্পকালীন হবে। দীর্ঘকালের পরিসরে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি পূর্ণমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। পুঁজি-সামগ্রী নিবিড়ভাবে

১৯. দেখুন, যথা— B. Higgins-এর "The Concept of Secular Stagnation," American Economic Review, XI, পৃঃ ১৬০-১৬৭ (মার্চ, ১৯৫০)।

ব্যবহৃত হবে। দরমাত্রা ঊর্ধ্বগামী হবে। এতকাল যাবত ধনবিজ্ঞানীরা জড়ত্ব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে দীর্ঘ-মেয়াদী সম্প্রসারণ নিয়েও মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। ঘাটতি-নীতি প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকে এই চিন্তা দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু সে যাই হউক, আজও কিন্তু, বহু ধনবিজ্ঞানী মত পোষণ করে চলেছেন যে, ব্যাপক আকারে ঘাটতি বাজেটনীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্বের ভয় কেটে যায়নি।
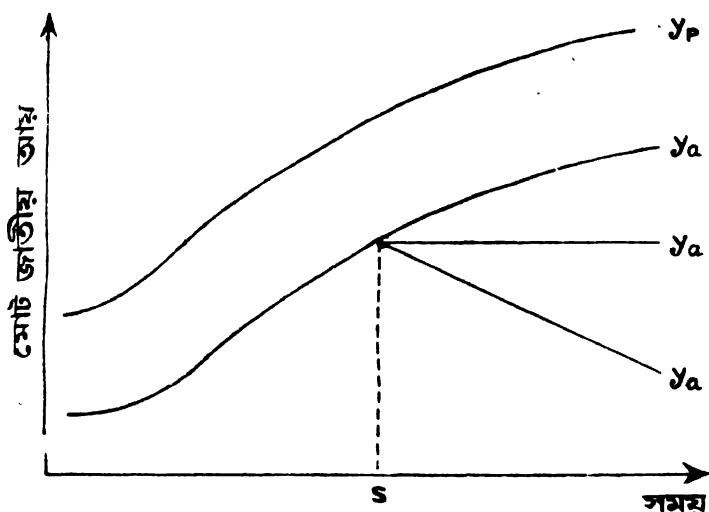
চিত্র ৫.১. দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব সম্ভাবনা

বহু রকম জড়ত্ব মতবাদ উপস্থাপন করা হইয়েছে। নানাজনে নানা উপকল্প দিয়েছেন। নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগে প্রায় সব কয়টা ধরা পড়ে।[২০]

২০. দেখুন, A. H. Hansen-এর "Growth Stagnation in the American Economy," Reviw of Economics and Statistics, XXVI No. 4, 409 (Nov. 1954). এখন থেকে Hansen, "Growth or, Stagnation" বলে উল্লেখ করা হবে। মিসেস রবিনসন ও বেশ কয়েক ধরনের জড়ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সবেও নিপতিত হতে পারে। তাঁর মতে জড়ত্ব দেখা দিতে পারে (১) প্রকৌশলিক দুর্বলতাহেতু, (২) সন্তৃপ্তি পর্যায় এসে যাওয়ার ফলে, (৩) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় দোষ-ত্রুটি হেতু ও মুদ্রা-নীতিতে বিকলতার কারণে, এবং (৪) পাঁচ সিকা কামাই করে সাত সিকা খেয়ে বসার ফলে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন—Joan Robinson-এর The Accumulation of Capital, Macmillan & Co. Ltd., 1956.

১. বহু অনুকল্প বাহ্যিক বিষয়ে জোর আরোপ করে। যেমন প্রযুক্তি-জ্ঞান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উঁচু উৎপাদন ফল উৎসারণে নতুন এলাকা আবিষ্কার।

২. অনেক অনুকল্প সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদিতে মৌলিক পরিবর্ত-নের কথা বলে, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রম-বর্ধমান সরকারী সক্রিয়তা ও হস্তক্ষেপ, শ্রম-ইউনিয়ন জন্ম নেয়া ইত্যাদি।

৩. আবার অনেক অনুকল্প আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যে জোর দেয়, যেমন অপূর্ণ প্রতিযোগিতা জন্ম নেয়া,* শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠা ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত মতবাদের সোচ্চার প্রবক্তা হচ্ছেন হ্যানসেন। তাঁর মতে জড়ত্বের জন্য দায়ী বাহ্যিক ঘটনা। তিনি বলেন, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নব নব এলাকা আবিষ্কার, নব সম্পদ আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দ্রুত অগ্রসর নীট বিনিয়োগে উস্কানী যোগায়। তাব ফলে সঞ্চিত আয় বিনিয়োজিত হয়ে যায়। ফলে আয় বাড়ে কিন্তু, তার ব্যাত্যয় ঘটলে নীট বিনিয়োগে আঘাত লাগে। তাতে সঙ্কোচন ঘটে। ফলে সঞ্চিত আয় অন্তরিত হওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে উঠে। প্রকৃত আয় পড়ে যেতে থাকে। সম্ভাবনাময় পূর্ণ বিনিয়োগ আয় অর্জন সম্ভব হয় না। পরিণামে অপচয় দেখা দেয় ও ক্রম-প্রসারিত বেকারত্ব বেড়ে যেতে থাকে।

ক্লাসিক্যাল মতবাদে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু, কেইন্সীয় পর্যালোচনায় ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে জনসংখ্যা বেড়ে যেয়ে অর্থনীতিকে দৃঢ় করে তোলে।[২১] ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সাকুল্য চাহিদা যথাবিহিত পর্যায়ে রাখে। বিনিয়োগ আশানুরূপ হারে ঘটতে পারে। অবশ্য কেইনস্ বলেছেন যে, কেবল লোকসংখ্যা বেড়ে গেলেই হবে না। ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে হবে। "ভিখারীদের সংখ্যা বাড়ায় বাজার-পরিধি বিস্তৃত হয় না,"[২২] প্রযুক্তি-জ্ঞানে অগ্রগতি হওয়া

---

২১. দেখুন, J.M. Keynes-এর "Some Economic Consequnces of a Declining Population," Eugenics Review, XXIX, No. 1 (April, 1937); Joan Robinson-এর "Economic Consequnces of a Decline in the Population of Great Britain" in Collected Economic Papers, Basil Blackwell, Oxford, 1951, 115-132.

২২. দেখুন—Kalecki প্রণীত Theory of Economic Dynamics, Rinehart, New York, 1954, পৃ: ১৬১।

চাই। যেন শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যেতে পারে। তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শ্রমের চাহিদা সমানুপাতিক হারে বেড়ে যেতে হবে। তবেই জনসংখ্যা বেড়ে সুফল পাওয়া যাবে।

সুতরাং, কোন কারণহেতু জনসংখ্যা বর্ধন কমে গেলে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়। সাকুল্য চাহিদা নিম্নগতি নেয়। এমনকি মূলধন সংগঠনও ব্যাহত হয়। উদ্যোগী ব্যবসায়ী দমে যায়, কারণ বাজার সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠে। মুনাফা পড়তি ধরে। ফলে বিনিয়োগ অধিকতর ঝুঁকিবহুল হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

শুধু তাই নয়, পড়তি জনসংখ্যা চাহিদা মাত্রায় তারতম্য ঘটিয়েও বিনি-য়োগে প্রতিকূল পরিবেশ জন্ম দিতে পারে। জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে থাকলে ঘর-বাড়ীর প্রয়োজনীয়তা অধিক হয়। জনকল্যাণ-মূলক ক্রিয়াকর্ম তেজীভাব নেয়। কিন্তু, জনসংখ্যায় সঙ্কোচন দেখা দিলে এই সকল কাজকর্মে হালকাভাব পরিদৃষ্ট হয়। ফলে এই সকলক্ষেত্রে বিনিয়োগ স্বল্প হবে উঠার প্রবণতা দেখা দেয়। আরেক মজার ব্যাপার : এই সকলক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্মে ভোগকৃত অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা মূলধন অধিক লাগে। কাজেই, এখানে কাজে ভাটা পড়া মানে অধিকতর হারে পুঁজি অব্যবহৃত থাকা। পরিণামে ভোগদ্রব্যের গঠন-চরিত্র ভিন্নরূপ হয়ে উঠে।[২৩]

জনসংখ্যায় পড়তিহেতু পুঁজি-প্রাচুর্য দেখা দিতে পারে। কারণ শ্রম-সংখ্যা তেমন বাড়ছে না। এদিকে অব্যাহত গতিতে পুঁজি-সংগঠন হয়ে চলেছে। সুতরাং, মূলধন অপেক্ষাকৃত অধিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শ্রমের তুলনায় পুঁজির অনুপাত বেড়ে যেতে পারে। তাতে পুঁজির প্রান্তিক ফলন হ্রাস পায়। ফলে পুঁজি-সংগঠন ক্রিয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়।

নতুন নতুন এলাকা আবিষ্কৃত হলে পুঁজি-সংগঠন জোরদার হয়। আর না হলে দুর্বল হয়ে উঠে। নতুন এলাকায় জনাগম ঘটে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী হয়। সম্পদাদি ব্যবহৃত হয়। আবিষ্কৃত হয়। নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ফলে প্রভূত পুঁজির দরকার হয়। কিন্তু, যদি নতুন এলাকা আবিষ্কার বন্ধ হয়ে যায় তবে এই সুযোগ নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে বিনিয়োগ-সম্ভাবনা সীমিত হয়ে উঠে।

২৩. Hansen, *Fiscal Policy*, পৃষ্ঠা ৩৫—৩৮। এটা হ্যারডের Cr কে ন্যূন করে দেবে আর ডোমারের σ কে বাড়িয়ে দেবে। ফলে অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি হার বজায় অধিকতর শক্ত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে, প্রতিষ্ঠানিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা যায়। সংস্থাগত অগ্রগতির ফলে উৎসাহ-উদ্দীপনা নির্জীব হয়ে উঠতে পারে। উদ্ভাবন-আবিষ্কার প্রতিহত হতে পারে। ফলে বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সীমিত হয়ে উঠতে পারে। প্রতিস্থাপন কাজ তেমন একটা জরুরী বলে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে। ভোগস্পৃহা প্রদমিত হওয়া পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে শ্রম ইউনিয়ন ও শ্রম-সঞ্চয় জোরদার হয়ে উঠতে শুরু করে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা মাথা উঁচিয়ে বাজার শক্তিনিশ্চয় ভণ্ডুলাকার করে তোলে। প্রচারণা অধিক গুরুত্ব পায়। জিনিসপত্রের দাম দিয়ে প্রতিযোগিতা ব্যাত্যাহত হয়। তার কারণেও উদ্যম উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। আর যেটুকুবা উদ্যোগ উৎসাহ কি উদ্দীপনা দেখা যায় তারও পুঁজি আসে বাণিজ্যিক আয় থেকে। বাহির সূত্র থেকে নয়। ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় অকেজো থেকে যায়। তার সাথে নামমাত্র উদ্যোগ-উৎসাহ যা ঘটে তা যদি পুঁজিভিত্তিক না হয়ে পুঁজি-রক্ষাকারী হয় তাহলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠে। মোট উৎপাদন-পুঁজি অনুপাত আরও হ্রাস পায়।

উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় বহির্জাত প্রভাবাবলীর শক্তি নিয়ে হ্যারড-ডোমারের তেমন একটা বাদ-বিসম্বাদ নেই। তবে তাঁদের দেয়া মডেলদ্বয় অন্য একটা কথায়ও জোর দেয়। বিনিয়োগ তেমন শক্তিশালী নাই বা হল। তাতে অগ্রগতি হার একেবারে পড়ে যাবে এমন মনে করার কি আছে? ভোগমাত্রা বেড়ে যেয়ে (α তে পতন) তা উঁচুতে রাখতে পারে। অর্থনীতি হয়ত উচচ বিনিয়োগ সম্পন্ন হল না। কিন্তু, উচচ ভোগমাত্রা সম্পন্ন হতে আপত্তি কি? ভোগমাত্রা অধিক হয়েও যে অগ্রগতি হার ধারণ করা যায়। আপত্তি আমাদেরও নেই। কিন্তু, আছে উন্নয়ন অগ্রগতি বিশারদ বহু ধনবিজ্ঞানীর। তাঁরা বলেন এই সম্ভাবনা একেবারে অবাস্তব। কারণ সঞ্চয়মাত্রা এমন হারে হ্রাস পেতে পারে না যে এই বিশ্লেষণ সত্য হয়ে উঠবে। সময়ের করালগ্রাসে সঞ্চয় হয়ত মাত্রার দিক থেকে কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। তবে ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে বহুকাল ধরে তা মোটামুটি স্থির পর্যায়ে বিরাজমান রয়েছে এবং বর্তমান কালেও এমন কোন নজির দেখা যায়নি যে তা সরাসরিভাবে পড়ে যাবে। কাজে কাজেই, হ্যারড ডোমারের উপরোক্ত মন্তব্য তেমন ঠাঁই পেতে পারে না। সুতরাং,

অগ্রগতির নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতিকে, না হয় সম্পদাদির সম্প্রসারণকে নতুবা জনসংখ্যায় বৃদ্ধিকে।[২৪] তা না হলে বিনিয়োগ-পরিসর সীমিত হয়ে উঠবে। প্রকৃত আয় ধারা প্রবাহ সম্ভাব্য আয়-ধারা প্রবাহ থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। ধারে কাছে এগিয়ে আসার সুযোগ পাবে না। অর্থনীতিতে ব্যাপক দুর্দশা দেখা দেবে। অগ্রগতির হার দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ সুতরাং, ইঙ্গিত দিচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব ঘিরে যে যুক্তিজাল গড়ে উঠেছে তা মূলতঃ বহির্জাত ঘটনাবলীসঞ্জাত। বাহ্যিক প্রভাবাবলী ক্রমাগত দুর্বল হয়ে গড়ধর্মী জড়ত্বের জন্ম দেয়। কিন্তু, তাই বলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর অবদানও উপেক্ষা করার বিষয় নয়। তারাও যথেষ্ট সক্রিয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহজাত শক্তি হিসাবে তারাও যথেষ্ট ঋণাত্মক প্রভাবের জন্ম দিয়ে চলে। ফলে জড়ত্ব পরিবেশ আরও সবল হওয়ার সুযোগ পায়।

এখানে সুম্পিটারের আলোচনা স্মর্তব্য। মনে করা প্রয়োজন যে, তিনি বলেছেন উদ্ভাবনী আবিষ্কার ক্রমে ক্রমে বাধাধরা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমষ্টিতে রূপ পায় ও যান্ত্রিকবৎ এগুতে থাকে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-বিকাশে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যায়। মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ আলাদা আলাদা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মালিক বা মালিকীস্বত্ত্ব বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। তা হাওয়া হয়ে করপোরেশনের সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে যায় অথচ কোথায়ও তার কর্তৃত্ব অনুভূত হয় না। এদিকে সরকারী নীতি-প্রণালী। বিশেষ করে করপদ্ধতি, সরকারী লগ্নী ও শ্রমিক সংশয় আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।[২৫] রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুকূল হলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অভাবনীয় ফলন দিতে পারে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সুম্পিটার বলেন, ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই তার বিনাশের বীজ নিহিত রয়েছে। তার বিকাশই এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জন্ম দেয় যা পরিশেষে তাকে খেয়ে বসে।

২৪. অথবা মনে করুন, এই পর্যায়ে এসে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সরকারী সক্রিয়তা শুরু হয়। তাহলে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি ও ঘাটতি ব্যয় থেকে উস্কানী আসতে পারে। প্রবাদ বলে সর্বসময় চারটি প্রভাব বিরাজমান : উচ্চ বিনিয়োগ, উচ্চ ভোগ, উঁচু রপ্তানি ও অধিক ঘাটতিনীতি।

২৫. দেখুন, যথা, চতুর্থ অধ্যায়।

জড়ত্ব তত্ত্বের তৃতীয় মতে এসে গিয়েছি। এই মত বলে আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে পরিবর্তনহেতু জড়ত্ব পরিবেশ জন্ম নেয়। অর্থনীতিতে একচেটিয়া ব্যবসা ও ওলিগোপলি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে। উন্নত অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একনায়কত্ব গড়ে উঠে মুনাফা মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে অধিক উৎপাদিকা শক্তি জন্ম নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বাড়তি উৎপাদিকা-শক্তি বিদ্যমানহেতু পুঁজি-সংগঠন হার ব্যাহত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা এই বাড়তিটুকু হজম করে নিতে পারে। কিন্তু, মনোপলি কি ওলিগোপলি তা সারাতে পারে না। দরমাত্রা তথৈবচ থেকে যায়। পড়তি পরিলক্ষিত হয় না। ফলে অগ্রগতি শ্লথ-গতিসম্পন্ন হয়ে উঠে। উদ্বৃত্ত মূলধন অন্তরিত হওয়ার পথ পায় না। অর্থনীতিতে ভেসে বেড়ায়। বাড়তি উৎপাদিকা শক্তি বিনিয়োগে প্রতি-রোধক-শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।[২৬] অবনমিত লগ্নী-স্পৃহায় গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়।

ডোমার মনোপলিকে অন্য দিক থেকেও দোষী করেছেন। বলেছেন, মনোপলি অবস্থা উদ্ভাবন আবিষ্কার রহিত করে তুলতে পারে। কেননা, তা নব উন্মেষণী শক্তি প্রয়োগ করতে দেয় না। নতুন উদ্ভাবিত প্রণালী কাজে লাগাতে বাধা প্রদান করে। স্বীয় স্বার্থ বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কাউকে মাথা উঁচু করতে দেয় না। কায়েমী স্বার্থ আসন গেড়ে বসে থাকে। অন্য কাউকে মাথা গলাতে দেয় না। তাতে শ্রম বেকারত্ব যেমন দেখা দিতে পারে তেমনি পুঁজি-সামগ্রীর অপচয় ও অপব্যবহার ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। মনোপলি ব্যবসা স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখায় সক্ষম। এবং এটাই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। যাই কর বাবা, আমাদের পুঁজি-সামগ্রী বিনষ্ট হতে দেয়া যাবে না এইভাব নিয়ে আকড়ে থাকে। নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত করে না। বরং নানা বাধা সৃষ্টি করে আটকে রাখে। কেবলমাত্র বিদ্যমান পুঁজি-সামগ্রীর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে এলে তবে নতন বিনিয়োগ হতে দেয়। সুতরাং, নব প্রণালী গজিয়ে উঠতে পারে কেবল পুরানো সামগ্রীর ধ্বংসস্তূপের উপর। কেবলমাত্র মূল্যাবনতি-সংচিতি (depreciation reserve) দিয়ে। ফলে এই সংচিতি নব নব

---

২৬. দেখুন, যথা **Hansen, "Growth or Stagnation," J. Steindl -এর Maturity and Stagnation in American Captalism, Bapil Blackwell, Oxford 1952.**

বিনিয়োগ-দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে না। পরিণামে, বৃত্তপ্রবাহের বাইরে অবস্থিত সঞ্চয় দিয়ে নব বিনিয়োগ ঘটার সুযোগ নেই।[২৭]

জড়ত্ববাদ তত্ত্বের মোটামুটি বিশ্লেষণ করা গেল। সংক্ষেপে তার বিভিন্ন দিক উদঘাটিত করা হল। নানা জনের নানা যুক্তি খতিয়ে দেখা হল। কিন্তু, প্রতিটি যুক্তির জন্য আবার বহু সমালোচক রয়েছেন। যত মত তত বিভেদ। যত যুক্তি তত প্রতি-যুক্তি। সমালোচকদল স্বীকার করেন, হাঁ যেভাবে যুক্তি দেয়া হয়েছে সেভাবে সব কিছু এগুলো পরিপক্ক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আর উপায় কি? অবশ্যই জড়ত্ব পর্যায়ে এসে পৌঁছাতে হবে। বাহ্যিক উপকরণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী তথৈবচ হলে, তাদের আচার-আচরণ বক্তব্যমাফিক হয়ে উঠলে নীট বিনিয়োগ প্রতিহত হতে বাধ্য। তাছাড়া ধারণাভিত্তিক অন্যান্য বিষায়াবলী নির্দিষ্ট থাকলেও আর কথায়ই নেই। অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু, প্রবক্তাদের দুর্ভাগ্য বা দুঃখের কারণ এই যে, (ক) তাদের দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঘটনাপ্রবাহ প্রবাহিত নাও হতে পারে, এবং (খ) অন্যান্য যে সব বিষয় তাঁরা ধ্রুব বলে ধরে নিয়েছেন। সেগুলোও তেমন নয়।[২৮] কাজেই, জড়ত্ব মতবাদ অতিরঞ্জন দোষে দূষিত। জড়ত্ব তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনাকারীদের যুক্তিতর্ক চতুর্থ পর্বে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নির্দেশিত হল মাত্র। উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতির শর্তাবলী তুলে ধরেছে এবং অক্ষুণ্ণ অগ্রসর থেকে বিচ্যুতি ও তাদের নিদানের পথ নির্দেশ করেছে। এবং তা করতে যেয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে

---

২৭. Evsoy D. Domar-এর "Investment, losses and Monopolies" in Essays in Honour of Hansen, W.W. Norton & Co., New York, 1948, 39, Hamberg-এর প্রাগুক্ত বই পৃ: ১২৭-১২৮; Robinson-এর the Accumulation of Capital, Macmillan & Co. Ltd., London, 1856, 407.

২৮. দেখুন, যথা- G. Terborgh প্রণীত, the Bogey of Economic Maturity, Machinery and Allied Products Institute, Chicago, 1945, J. A. Schumpeter রচিত Capitalism, Socialism and Democracy. Hanper and Brothers, New York, 1942, Chapter X.

জড়ত্ব সম্ভাবনার। তাঁদের বক্তব্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে বন্ধ্যাত্ব সম্পের্কে একটা ইঙ্গিত। তাঁরা অবশ্য একথা বলেননি যে, বন্ধ্যাত্ব অবধারিত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা এড়াতে পারবে না। শুধুমাত্র এইটুকু সঙ্কেত দিয়েছেন যে, নিরন্তর প্রবাহী সম্প্রসারণ অতিশয় বিপজ্জনক এবং আগে-ভাগে সাবধান না হলে বিপদ ঘটতে পাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উন্নয়ন-তত্ত্বাবলীর তুলনামূলক পর্যালোচনা

গেল পাঁচটি অধ্যায়ে উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কীয় তত্ত্বাবলীর প্রধান প্রধান অবদানগুলো তুলে ধরা হল। স্মিথ থেকে শুরু করে উত্তর-কেইনসীয় জগত অবধি বিচরণ করা গেল। এক্ষণে ভিন্নমুখী এইসব তত্ত্বাবলীর সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হবে। এই পর্যালোচনা দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পর্বের আলোচনায় পটভূমি হিসাবে কাজ করবে। যথার্থ পটভূমি বিন্যস্ত করার নিমিত্তে গুনাগুণ যাচাই করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুধাবনে চেষ্টা করা হবে।

১. অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দিয়ে উন্নয়ন বিশ্লেষণে অসুবিধা :

কেউ একজন একবার টিপ্পনী কেটেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট জট পাকানো সমস্যা। তা একা ধনবিজ্ঞানীর কাজ নয়। কথাটা শুনতে তেমন সুমধুর না হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। উন্নয়ন-অগ্রগতি বিশ্লেষণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দিয়েই হয়ে থাকে বটে, তবে তা অচিরে অর্থনৈতিক জগত ছাড়িয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ-দেহের সর্বঅঙ্গ অন্তরিত করে নেয়। সার্বিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ জড়িয়ে নেয়। অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশারদ ঐতিহাসিক মাত্র তা অবগত আছেন। কাজে কাজেই, আন্তসম্পর্কে বিজড়িত সামাজিক লতাতন্তর হাজার প্রবাহ অগ্রগতির পথে দ্যোতনা সৃষ্টি করে। কাজেই, সামান্য জ্ঞানের বহর দিয়ে উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সহজ নয়। তার পূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত করায় আরও গভীরে যেতে হবে। সাহায্য নিতে সামঞ্জস্যমূলক সামাজিক অঙ্গনের একটা দর্শনের। তবেই আলোচনা হবে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুষ্ঠু।

ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যাল ধারায় উদ্বুদ্ধ নীতি-বাগীশ আশপাশের নিয়ামকসমূহ বিবৃত করেই সন্তুষ্ট। অর্থনীতির সম্প্রসারণে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত বিষয়াবলী উদ্ভাসিত করেই খুশী। ধারে-কাছের এই সমস্ত নিয়ামকগুলো হচ্ছেঃ (১) জ্ঞান-পরিসর, বিশেষ করে প্রকৌশলিক; (২) শ্রম-শক্তির পরিমাণ ও বিস্তৃত অর্থে তার "গুণাবলী"; (৩) পুঁজি-সামগ্রীর পরিমাণ ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য, এবং (৪) প্রাকৃতিক অর্থসম্পদ, নিয়মনিষ্ঠ এই

আঙ্গিকে উন্নয়ন বেড়ে চলে উপাদানাবলীর সম্প্রসারণ ও ব্যবহার পদ্ধতির পরিমাপে। সঙ্কীর্ণ এই দৃষ্টিকোণেও কিন্তু অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে সক্ষম নয়। নানা রকম বাধা এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। বহু উপাদানের পরিমাণাত্মক হিসাবে গোলমাল বেধে যায়। ফাঁপর দেখা দেয় পরিবর্তনসুলভ প্রভাবাদি চিহ্নিত করণে। আলোচনায় গিট বেঁধে যায় সামাজিক লতাতন্তু।[১] রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক, গণিতিক ইত্যাদি শত-সহস্র প্রভাব জড়ো হয়ে জন্ম দেয় ঘোর প্যাঁচালো পরিস্থিতির। অথচ এগুলোকে নীতিনিষ্ঠ নিয়মে সুবিন্যস্ত করার জো নেই। কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত করার উপায় নেই। কারণ সবার মধ্যে ঘনিষ্ট আন্তসম্পর্ক বিরাজমান। একটাকে ছাড়িয়ে অপরটা বিচারের সুবিধা নেই।

যে সমস্ত ধনবিজ্ঞানীর গল্প আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরেছি তাঁদের প্রায় সবাই এই সকল অসুবিধা বুঝতে পেরেছিলেন। অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কেবল মানুষের একান্ত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কর্তৃক শাসিত নয়। তাই তাঁরা উন্নয়ন-অগ্রগতির "সাধারণ" চিত্র তুলে ধরায় প্রয়াসী হননি। বরং সামান্য কিছু উপাদান সম্বল করে আলোচনার পথে এগিয়েছেন। যুক্তি দিয়েছেন অগ্রগতি বিশ্লেষণে এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাকীসব ব্যক্তভাবে না হয় আভাসে-ইঙ্গিতে ধারণাভিত্তিক বলে মেনে নিয়েছেন। অর্থনৈতিক অগ্রগতি সার্বিক জাগতিক অগ্রগতির জটিল ফলাফল-প্রসূত—একথা স্বীকার করেছেন বটে। তবে সাথে সাথে আলোচনা সহজীকরণের নিমিত্তে ধনদৌলত পরিসর ছাড়িয়ে অন্যত্র বিচরণ সীমিত রেখেছেন নানারূপ দেয় ধারণার ভিত্তিতে। সুতরাং, প্রশ্ন তোলা চলে তাঁদের আলোচনার সত্যাসত্য কতকাংশে নির্ভরশীল ঐ সমস্ত ধারণাবলীর যথার্থতায়। কালের ব্যবধানে, দেশে দেশে তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আলোচনায় সংস্কার সাধিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কাট্-ছাট্ কি সংযোজন ঘটিয়ে নিতে হবে।

মার্ক্স এমন একজন ধনবিজ্ঞানী যিনি উন্নয়ন-অগ্রগতির সার্বিক চিত্র অঙ্কণে প্রয়াসী হয়েছেন, অন্য কেউ তেমন করতে পারেননি। সমাজ

---

১. পূর্বাপর সংঘাতভিত্তিক প্রগতি-প্রক্রিয়া উন্মোচনে সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করেছেন J.J. Spengler তাঁর প্রবন্ধে। দেখুন J.J. Spengler-এর "Theories of Socio-Economic Growth." Problems in the Study of Economic Growth. National Bureau of Economic Research, New York, 1949. তিনি ১৯টি নিয়ামক বিবৃত করেছেন।

কাঠামোর পূর্ণ বিকাশ তাঁর মডেলে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। একমাত্র উৎপাদনে বস্তুতান্ত্রিক শক্তিনিচয়ের বিকাশ ব্যতিরেকে। তিনি তা "দেয়" বলে মেনে নিয়েছেন। বাকী সব অন্তরিত করে নিয়ে এগিয়েছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁর বিশ্লেষণ সহজীকরণ দোষে দোষী হয়ে পড়েছে। সামাজিক শক্তি নিচয় তাঁর হাতে সাদামাঠা রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তদুপরি আলোচনা এমন ব্যাপকভিত্তিক হয়ে উঠেছে যে বিশেষ কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বর্ণনায় তা অপারগ হয়ে পড়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, সে সব নেহায়েত ধারণাভিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের আলোকে তা টেকসই হতে পারেনি। এমনকি উৎপাদন প্রক্রিয়ার তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি।

"সাধারণ" রূপ প্রস্ফুটিত করায় সুম্পিটারও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি সব পরিবেশে অগ্রগতির বিশ্লেষণ দেননি। তাঁর আলোচনা সীমিত রয়েছে পুঁজিবাদ-তান্ত্রিক সমাজ বিকাশে। তবে তিনি পট নিয়েছেন বড় বিস্তৃত। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিস্তৃত আঙ্গিক নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে যুক্তিবাদী চেতনা সব কিছুর মূলে। কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি সর্বোতভাবে যুক্তিবাদী মননে নির্ভরশীল। এই করতে যেয়ে তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণা নিয়মনিষ্ঠ আঙ্গিকে বেঁধে ফেলেছেন। অথচ তা করা যুক্তিযুক্ত নয়। মার্ক্সের ন্যায় তিনিও সস্তা কথায় বাজীমাত করায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে ধরাবাধা যুক্তির বাইরে সমাজে অন্যান্য যে সব প্রভাব ক্রিয়া করে, তা চিত্রায়িত করায় ব্যর্থ হয়েছেন।

মার্ক্স ও সুম্পিটারকে ছাড়িয়ে অন্যদের প্রতি দৃষ্টি দিলে পাওয়া যায় একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা সবাই ব্যস্ত থেকেছেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম দিয়ে অগ্রগতি উদ্ভাসণে। এদিক-ওদিক নামমাত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছেন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জগতে। তার বাইরে নজর দেয়ার সুযোগ তাঁদের তেমন একটা হয়নি। ফল দাঁড়িয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি ঘটনা তাঁদের বিশ্লেষণে তেমন স্থান বা সমাদর পায়নি।

স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, কেইনস, হ্যানসেন সবাই মিলে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মানুষ এমন একটা জীব যে সর্বক্ষণ আপন মঙ্গল চিন্তায় মশগুল। বস্তুগত উন্নতিতে সদাসর্বদা উৎসাহী। তার মধ্যে অন্যান্য প্রেরণা ক্রিয়া করে বটে তবে তার প্রধান উপজীব্য অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গল। শ্রমিক, পুঁজিপতি, ভূস্বামী সবাই সুযোগ সন্ধানী। অনুকূল পরিবেশ খুঁজে নেয়ায় ব্যস্ত। আর যেমনি টোপ ফেলা অমনি দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রয়াসী। তন্মধ্যে, রিকার্ডোর চোখে, পুঁজিপতিশ্রেণী সবচেয়ে অগ্রণী। তারা এমনিতেই বেশ স্বচ্ছল। খেয়েপরে আরাম-আয়েশে দিন কাটাতে সক্ষম। ভবিষ্যত আরও সুখের করে তোলার নিমিত্তে তারা দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্তমান ভোগমাত্রা কমিয়ে ভবিষ্যত লাভের সম্ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠে। বাকী দুই দল তেমন উৎসাহী নয়। শ্রমিক শ্রেণী প্রয়োজনাতিরিক্ত আয় পেলে তা ধুমধাম করে উড়িয়ে দেয়। বিয়ে-সাদী করে অধিক মাত্রায় সন্তানাদি জন্ম দিয়ে দু'দিনে সব নিঃশেষ করে দেয়। ভূস্বামীও তেমনি। আরাম-আয়েশে গা ঢেলে দিয়ে বাড়তি আয় নিঃশেষিত করে দিয়ে বসে। সঞ্চয়ের বালাই তার মধ্যে নেই।

নব্যক্লাসিক্যালবাদীরা আরও এক ধাপ ঊর্ধ্বে। একেকবারে আটসাঁট বাঁধা দৃষ্টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। প্রতিটি মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসী। তার কাছে আর সব চাইতে প্রিয় জিনিস বস্তুগত মঙ্গল। আর যাই হউক না কেন, টাকা-পয়সা চাই। এই চিন্তা তার মধ্যে সর্বাগ্রে। সুতরাং, উঠেপড়ে লাগা ছাড়া গত্যন্তর কি। কাজেই, তার সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় জাগতিক চিন্তাধারার চক্রে। শুধু তাই নয়, দরমাত্রায় নামমাত্র পরিবর্তন তার মধ্যে সাড়া জাগিয়ে দেয়। অতিমাত্রায় সে সজাগ। একটু এদিক-ওদিক হলেই আর কথা নেই। সাথে সাথে ধ্যান-ধারণা বদলে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কেও তাঁদের ধ্যান-ধারণা ধরাবাধা। সমাজ-ব্যবস্থা স্থিতিশীল। রাজনৈতিক অঙ্গণ মুক্ত। সরকার সহানুভূতিশীল ও কার্যক্ষম। আইন-শৃঙখলা বজায় রাখতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদি অব্যাহত রাখায় সদাজাগ্রত, ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা ও মালিকানায় সংবেদনশীল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ রাখায় উদগ্রীব। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনে মুক্ত পরিবেশ

সৃষ্টি করায় সক্রিয়। সামাজিক বাধা বলে তেমন কিছু নেই। জ্ঞান প্রবাহ বিনাবাধায় প্রবাহিত হয়। ভৌগোলিক কি পেশাগত অন্তরায় অবর্তমান। বাজার-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সক্রিয়। টাকা-পয়সার আদান-প্রদান অব্যাহত। বিনিময় ব্যবস্থা পরিপুষ্ট। ঋণ ব্যবস্থা উন্নত। ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি আধুনিক। মূলধন-বাজার সুসংহত।

আরও আছে। আদিতে উন্নয়ন পর্যায় বেশ অনুকূল। ভবিষ্যত সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী ও উজ্জ্বল। গোড়াতে বন্টন-ব্যবস্থা সুষম এবং সঞ্চয়মাত্রা বেশ। তার সাথে উন্নয়ন পরিবেশ মিলে বেশ একটা রমরমা ভাব। বাজার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা বড় একটা নেই। ভবিষ্যত অগ্রগমণে কার্যনির্বাহী দল উপস্থিত। তেমনি দক্ষ শ্রমিকও। না হয় সুযোগ পেয়ে অচিরে পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। সম্পদ পরিমাণ যথেষ্ট। প্রযুক্তি-বিদ্যা বেশ উন্নত। অর্থাৎ সব কিছু মিলে পবিবেশ বেশ সুস্থ ও অনুকূল। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আর বাধা কই? কেবল মাঠে নেমে গেলেই স্বর্ণফসল পাওয়া যাবে। দেখা দেবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

সুতরাং, পোশাকী এই কাঠামোর আঙ্গিকে নয়াক্লাসিক্যালবাদী দল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত একান্তভাবে অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে যাচাই করেছেন। উপাদানাবলীর গুণগত বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়ে পরিমাণগত সমস্যায় দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছেন।

দরিদ্র দেশেব সমস্যা উন্মোচণে এই সমস্ত উপকল্প যথার্থ নয়। তৃতীয় পর্বে তা নির্দেশ করা হবে। উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোর অগ্রগতি বিশ্লেষণে এগুলো জন্ম নিয়েছে। নির্দিষ্ট ধারণায় উপপাদ্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু, কথা থেকে যায় এই যে দেয় ধারণা, উপকল্প, উপসিদ্ধান্ত তাদের আগমন কোত্থেকে? এগুলো কি কিয়দংশে অন্ততঃ উন্নযন-অগ্রগতি উৎসারিত নয়? স্বীকাব কবে নিতে হবে যে, হাঁ, তারাও উন্নয়নেরই ফল। এবং সেই কারণেই পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এমন সুষ্ঠুভাবে উপযোজিত। সুতরাং উন্নয়ন-অগ্রগতির পূর্ণরূপ মেলে ধরায় তাদেরকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

সাংস্কৃতিক চেতনার সার্বিক পরিবৃত্তে তত্ত্ব-প্রণালী দেওয়া হয়নি এমন নয়। বেশ কিছু আলোচনা অবশ্যই হয়েছে। মার্ক্স ও সুম্পিটার এ পথের অগ্রনায়ক—একথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এমন আরও অনেকে বিস্তৃত জাগতিক ও মানসিক পটে উন্নয়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণে প্রয়াসী

হয়েছেন।[২] যেমন ম্যাক্স ওয়েভার।[৩] তিনি পশ্চিমা জগতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় ক্যালভ্যানীয় নৈতিক বোধের কথা উল্লেখ করেছেন। তা মুনাফা অর্জনে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সোমবার্ট বলেছেন, আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিকাশে "পুজিবাদ চেতনা" বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছে।[৪] যুক্তি দিয়েছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সার্বিক চেহারার আঙ্গিকে। এই মতবাদের অপর হোতা ব্যক্তি প্যারেটো।[৫] তিনি সমাজ বিবর্তনের চক্রময় নক্সা উপস্থাপিত করেছেন। ভেবল্যান তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী পথ ডিঙ্গিয়ে গিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা করেছেন।[৬] অতি সাম্প্রতিক কালে আমেরিকাবাসী অপর ধনবিজ্ঞানী আয়ারসও এই মত প্রকাশ করেছেন।[৭] পারসন্‌স ঐতিহ্যবাদী অর্থনৈতিক চিন্তাজগতে সামাজিক মতবাদ অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন।[৮] ধনবিজ্ঞানী নন এমন আরও অনেকে জটিলাকার অর্থনৈতিক সমস্যার সম্প্রসারিত রূপ তুলে ধরায় অগ্রণী হয়েছেন। টয়েন্‌বি "হুমকি ও প্রতি উত্তর" তত্ত্ব দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাধারণ কাঠামোতে অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টিত হয়েছেন।[৯] সরোকিন শিক্ষা-সংস্কৃতির

---

২. এই বিষয়ে বিশদ জানতে হলে দেখুন J.J. Spengler-এর "Theories of Socio-Economic Growth." Problems in the study of Econom ic Growth. National Bureau of Economic Research, New York, 1949.

৩. দেখুন T. Parsons অনূদিত Max Wever-এর The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Allen and Unwin 1930. অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পর্বে ওয়েভারকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

৪. W. Sombart-এর Der moderne Capitalisms, Second edition, Duncker and Humblot, Leipzig, 1916.

৫. A. Bongiorno ও A. Livingston অনূদিত V. Pareto-এর The Mind & Society, Harcourt, Brace and Co., New York, 1935.

৬. দেখুন T. Veblen-এর The Instinct of Workmanship, The Macmillan & Co., New York, 1914.

৭. C. E. Ayres প্রণীত The Theory of Economic Progress, University of North Carolina Press, Chappel Hill, 1944.

৮. T. Parsons-এর the Structure of Social Action ও The Integration of Economic and Sociological theory দেখুন।

৯. A. Toynbee রচিত A study of History, Oxford University Press, New York, 1947.

বিকাশে তিনটি স্তর-বিন্যাস তত্ত্ব প্রদান করেছেন।[১০] স্পেংলার অঙ্গ-সংস্থান তত্ত্বের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক উঠানামার কথা উল্লেখ করেছেন।[১১] এমন আরও অনেকে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাধারণ আঙ্গিক উন্নয়ন-সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন।

সুতরাং, সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি পেতে হলে এই সবার চিন্তা-ধারনা বিবেচনায় নিতে হবে।[১২] একা ধনবিজ্ঞানীর জ্ঞান এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সব শাস্ত্রের মত মিলিয়ে তবে ধনবিজ্ঞানী উন্নয়ন সমস্যার পূর্নরূপ প্রতিভাত করে তুলতে পারেন। আজ অবধি তা তেমন করা হয়ে উঠেনি। নামমাত্র কিছুটা হয়ত যোগসাধন করা হয়েছে।

সুতরাং, পূর্বে বিশ্লেষিত তত্ত্বসমূহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে উন্নয়ন সমস্যা অনুধাবণে এগুতে হবে। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দিক্‌দিশারী হিসাবে ধনবিজ্ঞানীদের অবদান নগণ্য। তা মোটেই নয়। বরং তাঁদের মননশীল চিন্তাভাবনার ফলেই উন্নয়ন অগ্রগতি সমস্যা আজ ব্যাপকতা লাভ করেছে। তা অনুধাবণ সহজ হয়েছে। কেননা, তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণে অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতির মৌলিক উপাদানাবলী সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, উপাদানাবলীর সম্প্রসারণে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহ চিহ্নিত করায় সম্যক উপলব্ধি-জ্ঞান দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের চিন্তাধারা অর্থনৈতিক জগতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অন্যত্র বিচরণের সুযোগ পায়নি। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, এই কারণে তাঁদের প্রদত্ত তত্ত্বাবলী অপ্রাসংগিক হয়ে পড়েছে। তত্ত্বসমূহ পূর্ণ প্রতিকৃতি উদ্ভাসণে সক্ষম হয়নি বটে। কিন্তু, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এগিয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্থ করেছে। বহু সমস্যার সমাধান দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্ন তুলে ধরেছে। ইঙ্গিত দিয়েছে অন্যত্র সন্ধান নেবার। অন্যান্য বিষয়াবলী প্রাসংগিক ও গুরুত্বপূর্ণ বটে। তবে অর্থনৈতিক জগত ছাড়িয়ে নয়। বরং, এই পরিবৃত্তের অঙ্গীভূত

---

১০. P. A. Sorokin-এর Social and Cultural Dynamics, দেখুন।

১১. O. Spengler রচিত The Decline of the West, Alfred A. knopt, New York, 1947.

১২. কিন্তু, এককভাবে এই সব তত্ত্ব ব্যবহার করার জো নেই। কেননা, এই সবে অর্থনৈতিক তেমন একটা কিছু নেই।

হয়ে তবে তারা উন্নয়ন-সমস্যার বাস্তব রূপ তুলে ধরতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে নয়।

পরবর্তী তিন পর্বে পূর্বে বিশ্লেষিত তত্ত্বাবলীর অর্থনৈতিক ভিত্তি সংক্ষিপ্ত করে তোলা হবে। প্রথমে লোকসংখ্যা নিয়ে গল্প ফাঁদা হবে। বিভিন্ন মতবাদীর মত আলোচিত হবে। কারণ ও ফলাফল চিহ্নিত করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে মূলধন-সংগঠন নিয়ে তাঁদের মতামত আলোচিত হবে। সর্বশেষ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক প্রভাব সমপর্কে বলা হবে। উন্নয়ন অগ্রগতিতে তার গুণাগুণ যাচাই করা হবে, বিশ্লেষিত তত্ত্বাবলীর আলোকে।

২. জনসংখ্যা-বর্ধন

রিকার্ডীয় পর্যালোচনায় জনসংখ্যা একটা নির্ভরশীল প্রত্যয়। মূলধন সংগঠনের সাথে তা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পুঁজি সংগঠনের বাড়তি কমতিতে জনসংখ্যায় বাড়তি কমতি ঘটে। পুঁজি-সংগঠন হারে বৃদ্ধি দেখা দিলে মজুরী বেড়ে যায়। আর মজুরী বেড়ে গেলে জনসংখ্যা বর্ধন বেগবান হয়। রিকার্ডো অবশ্য বলেন যে, পুঁজি-গঠন হার জনসংখ্যায় বর্ধন হার ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাতে অনেককাল অবধি মজুরী মাত্রা জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার উর্ধ্বে বিরাজ করতে পারে। কিন্তু, তা দু'দিন আগে আর পরে নিঃশেষিত হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা, এমতাবস্থায় জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা অধিক। ফলে কিছু সময়ের মধ্যে বাড়তি মজুরীটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়। কাজেই, প্রযুক্তি বিদ্যায় স্বল্প অগ্রগর আর কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী বিধায় সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে মজুরী হার জীবনধারণের ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক।

আদম স্মিথ ও মার্ক্স সমস্যাটিকে তত কঠিনভাবে দেখেননি। পুঁজি-সংগঠন ও জনসংখ্যার সমপ্রসারণ তেমন ঋজুবদ্ধভাবে সমপর্কিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। এই যেমন স্মিথ বলেছেন, পুঁজি-সংগঠন জোরদার হলে শ্রম চাহিদাও অধিক হবে। তার ফলে "নিরন্তর বর্ধমান চাহিদা মিটাতে ক্রম-বর্যমান লোকসংখ্যা জন্ম নেবে শ্রমিকদের অধিকমাত্রার বিয়ে-সাদী ও সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়ে।"[১৩]

১৩. দেখুন, A. Smith-এর An Inquriy into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. Edwin Cannan, The Modern library, Randons House, New York, 1937, পৃষ্ঠা ৮০।

কিন্তু, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থায় স্বচ্ছলতা হেতু জন্ম-হার বৃদ্ধি পাওয়ার এই প্রবণতার ভিত্তিতে স্মিথ দীর্ঘমেয়াদী ন্যূনতম মজুরী-তত্ত্ব গড়ে তোলেননি। মার্ক্স আরও আলগাভাবে সমস্যাটিকে দেখেছেন। পুঁজিসংগঠন হার ও জনসংখ্যা বর্ধন-হার নিয়মনিষ্ঠ কোন নীতি প্রদান করেননি। বলেছেন, "তারা (শ্রমিকদল) সাধারণভাবে যা মজুরী পায় তা দিয়ে খোরপোষ মিটিয়ে স্বাভাবিক গতিতে বেড়েও যেতে পারে।"[১৪] তবে উভয়ের মধ্যে আটঘাট বাধা কোন সম্পর্ক নেই। পুঁজি-সংগঠন জনসংখ্যা বর্ধন হয়ত ত্বরান্বিত করতে পারে।[১৫] তবে এমন হবেই তা মনে করার তেমন কারণ নেই। তাঁর এই মনোভাবের কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট।[১৬]

নয়াক্লাসিক্যালবাদী যবে লিখতে শুরু করেছেন তদ্দিনে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, পুঁজি-সংগঠনের হার ও জন্ম-হারে তেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান নয়। এনিয়ে বেশী মাতা-মাতির তেমন কিছু কারণ নেই। বরং, নয়াক্লাসিক্যালবাদীরা অর্থনৈতিক নয় এমন বহু জটিল ঘটনায় জনসংখ্যা বর্ধনের কারণ লক্ষ্য করেছেন।[১৭] সেই অনুসারে, তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণে জনসংখ্যাকে স্বাভাবিক গতিতে নির্ণিত বলে চিহ্নিত করেছেন।

রিকার্ডের ন্যায় জনসংখ্যা নিয়ে তাঁরা তেমন ঝামেলায়ও পড়েননি। মাথা পিছু আয়ে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তারকারী বলে মতে সায় দেননি। তাঁরা বরং শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, মাথাপিছু আয় ন্যূনতম পর্যায়ের বেশ উর্ধে। প্রকৌশলিক অগ্রগতি উচচ পর্যায়ে এবং কৃষিপ্রধান দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। কাজেই, রিকার্ডীয় ভয়ভীতি নিয়ে হতাশ হওয়ার তেমন কিছু নেই। খাওয়া-পরায় অভাব-অনটন তীব্রতর

---

১৪. দেখুন F. Engels সম্পাদিত Karl Marks-এর Capital, Cuarles H. Kerr and Co., Chicago, 1926. 1. পৃ: ৬৩৬।

১৫. ঐ, III, পৃ: ২৫৬।

১৬ পুঁজি সংগঠন উর্ধহারে থাকাকালে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সমাজতন্ত্রবাদেও হয়ত মজুরী হার ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসতে পারে।

১৭. দেখুন, যথা—Principles of Economics, Macmillan and Co., London, 1930, Eighth edition, Book IV, Chapter 4 এ মার্শালের আলোচনা।

হওয়ার মত নয়। তাই মার্শাল বলেন, ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে বরং বলতে হয় যে জনসংখ্যা ও পুঁজি-সংভার সমানুপাতিক হারে সম্প্রসারিত হলে সমপরিমাণ উৎপাদন (Constant returns) পাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া, পুঁজি-সামগ্রী অধিক হারে বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশী। সেই তুলনায় শ্রম-সংখ্যা বরং অপেক্ষাকৃত ন্যূন হারে বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য সুদূরপ্রসারী দিগন্তে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন বটে।

হ্যানসেন গণেশ উলটিয়ে দিঁয়েছেন।[১৮] রিকার্ডোকে চিৎপটাং করে উল্টো কথা শুনিয়েছেন। রিকার্ডো অধিক বর্ধন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। হ্যানসেন পড়েছেন অপর্যাপ্ত বর্ধন সমস্যায়। অবশ্য তাঁদের আলোচনা ক্ষেত্র ভিন্ন ছিল। রিকার্ডো আলোচনা করেছেন মজুবী হারে জনসংখ্যার অধিক বর্ধন। কিভাবে তা মজুরী হারকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর মতে ক্ষণকালের জন্য হলেও জনসংখ্যা বাড়তি হয়ে মজুরীহার ন্যূনতম পর্যায়ের নিম্নে নিয়ে আসতে পারে। এই প্রভাব মূলধন সম্প্রসারণ উৎসারিত। হ্যানসেন পরিপক্ক অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সেই অর্থনীতি আবার শিল্পপ্রধান। কাজেই, এই সমস্যা তেমন একটা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাঁর চোখে বরং জনসংখ্যা বর্ধনহেতু বিনিয়োগমাত্রা তেজী ও বেগবান হয়ে অধিকতর কর্ম-সংস্থান জন্য দেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হ্যানসেন জনসংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণে কেইনসীয় কাঠামো ব্যবহার করেন। এই আঙ্গিকে, পূর্ণ কর্ম-সংস্থান পর্যায় অপেক্ষা নিম্ন পর্বে ভারসাম্য অর্জন সম্ভব। নয়াক্লাসিক্যাল নক্সায় বেকারী বিদ্যমান হলে মজুরী হার হ্রাস পায়। কিন্তু, সাকুল্য মুদ্রাচাহিদা তথৈবচ থাকে। ফলে দরমাত্রা সহসা নেমে যায় না।[১৯] কাজেই, উৎপাদক লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। সুতরাং, উৎপাদন বাড়িয়ে বেকার শ্রমদল অন্তরিত করে নেয়।

১৮. দেখুন A.H. Hansen-এর "Economic Progress and Declining Population Growth", American Economic Review, XXIX, No. I. পৃঃ ১—১৫ (মার্চ, ১৯৩৯)

১৯. নয়া ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রে সাকুল্য মুদ্রা চাহিদা মুদ্রা পরিমাণ ও মুদ্রার আয়-গতিবেগের (আয় ও মুদ্রা সরবরাহে অনুপাত) উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ নয়া ক্লাসিক্যালবাদী ধারণা করে নেন যে মুদ্রার আয়-গতিবেগ ধ্রুব থাকে অথবা সময় পরিসরে সামান্য বেগে পরিবর্তিত হয়। বিশেষভাবে তাঁরা মনে করে নেন যে, মুদ্রা-মজুরী হ্রাস করায় আয়-গতিবেগ কি মুদ্রা সরবরাহে তেমন পরিবর্তন আসে না।

কেইনসীয় নক্সায় (দর ও মুদ্রা-মজুরী নমনীয় ভেবে নিয়ে) মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস ঘটলে সাকুল্য মুদ্রা চাহিদায় ভাঁটা পড়ে। ফলে দরমাত্রা নেমে আসে। মজুরী হারে হ্রাস ও দরমাত্রায় কমতি সমানুপাতিক হয়ে প্রকৃত ভোগ ব্যয় সমপর্যায় রেখে দেয়। কাজেই, কর্ম-সংস্থান তথৈবচ থাকে। কিন্তু, দরমাত্রায় সমানুপাতিক কমতি দেখা না দিলে বণ্টন ব্যবস্থায়ও অদল-বদল ঘটে এবং তা পুঁজিপতির অনুকূল হয়ে উঠে। তার ফলে ভোগ-বিচিত্রা তথা ভোগ-অপেক্ষক (Consumption function) নিম্নগতি নেয়। তাই, কেইনস বলেন, বেকারত্ব বেড়ে যায়।

কার্য্যকরী চাহিদার অপর পৃষ্ঠায় বিরাজমান বিনিয়োগ। কেইনস্ বলেন, মুদ্রা সরবরাহ অপরিবর্তিত রেখে মুদ্রা-আয় হ্রাস করে দিলে সুদের হার কমে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা-পয়সা দরকার হয় কম। তাই সুদের হার পড়ে যায়। সুদের হারে পড়তি ঘটে নগদ টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা-তালিকার (liquidity function) স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপে আর লগ্নীতে সম্প্রসারণ ঘটে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তালিকার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে। অবশ্য এই দুই প্রবণতা এমনভাবে চালিত করা যেতে পারে যার ফলে তা বিনিয়োগ প্রবাহ প্রবল করায় অক্ষম বলে বিবেচিত হতে পারে। এবং তার ফলে কর্ম-সংস্থান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে।[২০] নমনীয় দরমাত্রা ও মজুরীহার বিদ্যমান অবস্থায় শ্রমশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে না পারলে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। তাই কেইনস্ অনমনীয় মুদ্রামজুরী ধারণা করে নিয়েছেন।

কেইনসীয় এই পোশাকী ছকে হ্যানসেন বলেছেন যে, লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে বিনিয়োগ মাত্রায় প্রেরণা যোগাবে। কেননা তা চাহিদামাত্রায় ঊর্ধ্বগামী করে তুলবে। ঘরবাড়ী, কল্যাণমূলক কর্ম ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম জোরদার করে চাহিদামাত্রায় পরিবর্তন এনে দেবে। তাছাড়া, জনসংখ্যা স্বল্প-কালীন ভোগমাত্রা চড়িয়ে দেয়। 'কামের বেলায় না হলে ও খাওয়ার বেলায়' মুখ বাড়িয়ে জনসংখ্যা ভোগ-ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। তাতে সঞ্চয় ততটা হতে পারবে না অন্যথায় যতটা হত। তাই হ্যানসেন যুক্তি দেন যে, লোকসংখ্যা কমে গেলে বেকারত্বের ছড়াছড়ি দেখা দেবে এবং উন্নয়ন

২০. দেখুন J. M. keynes-এর General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt, Brace & Co, New York, 1936 Chapter 19.

অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অন্য অনেকে অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, জনসংখ্যা কমে যেয়ে বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করে দিলেও ভয়ের কিছু নেই। কারণ অন্যত্র লগ্নী বেড়ে গিয়ে তা পুষিয়ে দেবে।

"উন্নয়ন অগ্রগতি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক হার" তথা পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান নিশ্চিতকারী অগ্রগতি নির্ভর করে প্রযুক্তি বিদ্যায় সম্প্রসারণ ও জনসংখ্যা বর্ধনের উপর। হ্যারডের মত তাই। জন্মহার যত বেশী হবে সময়ের দীর্ঘ পরিসর বাস্তবিক অগ্রগতির গড় হার তত উর্ধ্বে হবে। পঞ্চম পরিচ্ছদে আমরা দেখেছি যে প্রাকৃতিক হার ইপ্সিত হার তথা সর্বোত্তম অগ্রগতি অপেক্ষা ন্যূন হলে অর্থনীতি ক্রমগতিতে মন্দা পথে এগিয়ে যায় ও দীর্ঘসূত্রী বেকারী দেখা দেয়। জন্মহার অধিক হলে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।[২১] অন্যদিকে, স্বাভাবিক হার ইপ্সিত হার অপেক্ষা অধিক হলে উন্নয়ন অগ্রগতি সর্বক্ষণ সবল থাকে। তাতে পূর্ণ চাকুরী সংস্থানমুখী অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়। যদি তা না হয়ে বাস্তব অগ্রগতি ও ইপ্সিত অগ্রগতি সমানুপাতিক হয় অথচ স্বাভাবিক অগ্রগতি ইপ্সিত অগ্রগতি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব জন্ম নেয়।[২২] এমতাবস্থায় পূর্ণক্ষম উৎপাদন চালিয়েও সব শ্রম কাজে অন্তরিত করে নেয়া সম্ভব হয় না। পরিনাম হিসাবে মার্ক্স বর্ণিত বেকারী দেখা দেয়। কাজে কাজেই, স্বল্প জন্মহার এই বেকারত্বে হ্রাস ঘটাতে পারে। তবে বলতে হয়, জনসংখ্যা অপরিবর্তিত অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধি ঘটার যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তা অধিক বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। সঞ্চয় প্রবণতায় যথাযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। বেকারী তীব্রতা ন্যূন হওয়ার যে যুক্তি তা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। ইপ্সিত হার অধিক হয়ে হয়ত তেমনটা নাও ঘটাতে পারে।[২৩]

বেকার সমস্যার প্রকৃতিগত বেশিষ্ট্য বিবেচনা নিয়ে মনে হয় শিল্পোন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা পরিস্থিতি কেইনসীয় ও উত্তর কেইনসীয় আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা অধিকতর বাস্তবসম্মত। ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যাল মডেল ততটা কার্যকরী নয়। জন্মহার অধিক হলে উন্নয়ন অগ্রগতি হার

---

২১. পঞ্চম পরিচ্ছেদ, প্রথম ভাগ দেখুন।

২২. দেখুন D. Hamberg-এর Econmic Growth and Instability, W.W. Norton & Co., New York, 1956, পৃ: ১৬৭—১৭২।

২৩. ঐ, পৃ: ১৮৬।

জোরদার হয়। তেমনি তা পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থান সম্ভাবনা জন্ম দেয়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজিকার শিল্পোন্নত দেশসমূহে বাস্তব অগ্রগতি হার পূর্ণ বিনিয়োগ অগ্রগতি হারের ন্যায় হওয়ার মত নয়। অন্ততঃ উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক এমন ইঙ্গিত প্রদান করে না। বরং, কেইনসীয় ও কেইনসীয়োত্তর আলোচনা জোর দেয় যে বাস্তবিক অগ্রগতি হার ও পূর্ণ বিনিয়োগ বর্ধন হার সমানুপাতিক হতে অনেকগুলো নিয়ামক ক্রিয়া করে। যেমন প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সঞ্চয়-স্পৃহা, বিনিয়োগ তত্ত্বের মাত্রা, সুদের হার উঠানামায় বিনিয়োগ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহু বিষয় এই উভয়ে সামঞ্জস্য আনয়ন সহায়ক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। কাজে কাজেই, মাথাপিছু আয়ের ধারা নির্ণয়েও এরা ক্রিয়াশীল।

কৃষিপ্রধান দেশসমূহে অবশ্য অবস্থা ভিন্নরূপ বলে মনে হয়। তাদের জনসংখ্যা বিশ্লেষণে ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যাল মতবাদ অধিক পারঙ্গম বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে বেকার সমস্যা ও তার চাবিত্রিক আঙ্গিক শিল্পোন্নত দেশের মত নয়। কাজেই, বাড়তি শ্রম তেমন একটা ঝামেলা ব্যতিরেকেই পারিবারিক উৎপাদন ইউনিটে অন্তরিত হয়ে যেতে পারে। তজ্জন্য অবশ্য জমি ও পুঁজি সামগ্রীর নিবিড় ব্যবহার সম্ভব করে নিতে হবে। কর্ম-সংস্থান পরিস্থিতি সুখপ্রদ হবে। উৎপাদন বেড়ে যাবে। অবশ্য মাথাপিছু আয় হ্রাস পাবে। কেননা, উপাদান-সংযোগ বিষম হয়ে উঠবে যে। এদিকে পুঁজি-সংভার অধিক ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তার প্রান্তিক ফলন বেড়ে যাবে এবং সাথে সাথে পুঁজি সামগ্রীর চাহিদাও।

সুতবাং, মাথাপিছু আয় হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু, পুঁজি-সংগঠন হার তা ঠেকিয়ে দিতে পারে। তবে তা নির্ভর করে সঞ্চয়-ঝোঁক ও প্রযুক্তি-বিদ্যায় অগ্রসরের উপর। পুঁজি-সামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায় বলে সুদের হার ঊর্ধ্বগতি নেয়। সুদের হারে ঊর্ধ্বমুখী মোড় সঞ্চয়-স্পৃহায় উস্কানী যোগায়। ফলে সঞ্চয়-মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। চাকুরী-বাকুরীর বাজার সবল হয়ে মোট আয় বাড়িয়ে দেয়। তার ফলেও সঞ্চয় বেড়ে যেতে পারে। তবে হ্রাসও পেতে পারে যদি মাথাপিছু আয় নিম্নতম পর্যায়ে বিরাজমান হয়। সঞ্চয় হার কম হলে এবং প্রকৌশলিক জ্ঞান তেমন উন্নত না হলে লোকসংখ্যা বেড়ে মাথাপিছু আয় কমিয়ে দেয়। বাধা পায় কেবল ম্যালথুশীয় 'বিনাশমূলক পন্থায়' এসে। তার আগে নয়। অন্যদিকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান বাজারব্যবস্থা ও কার্য-নির্বাহী

ক্ষমতার অপটুতা ও মাথাপিছু আয় নিম্নদিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি জীবনধারণের ন্যূনতম পর্যায়ের ধারেকাছ অবধি।

বিপরীতপক্ষে, জন্মহার বর্ধন যদি শুভলগ্নে হয় তবে তা 'সোনায় সোহাগা' হয়ে উঠতে পারে। উন্নয়ন-অগ্রগতি দ্রুতহারে সম্প্রসারিত করে দিতে পারে। মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তজ্জন্য প্রযুক্তিক জ্ঞান সমহারে বেড়ে যেতে হবে। সঞ্চয়-মাত্রা উর্ধ্বগতি নিতে হবে। বাজার-ব্যবস্থায় পূর্ণপ্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকতে হবে। উদ্যোগী ব্যবসায়ী গুণ তীব্রতর হতে হবে। তবেই জনসংখ্যা বর্ধন কল্যাণময় হয়ে উঠতে পারবে।

৩. মূলধন-সংগঠন

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠবে: গত দুই শত বৎসর ধরে উন্নত দেশগুলোয় দ্রুতহারে পুঁজি-সংগঠনের মূলে রয়েছে প্রযুক্তিক-জ্ঞানে দ্রুতহারে অগ্রগতি ও নব নব সম্পদ আবিষ্কার, অধিকাংশ লেখক তা স্বীকার করেন। তবে কিছু কিছু মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায় তাঁদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে তাঁদের মডেলে সন্নিবেশিত করেছেন। মার্ক্স ও সুম্পিটার প্রযুক্ত বিদ্যায় দ্রুত অগ্রগতি ও সম্পদ আবিষ্কারে সাফল্যতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় "দেয়" বলে মত প্রকাশ করেছেন। পুঁজিবাদের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁদের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ সম্ভাবনার কারণে নয়। মার্ক্স বরং বলেন, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কারিগরি বিদ্যা অধিকতর পুঁজিভিত্তিক হয়ে এগিয়ে যায়। ফলে অবস্থা বেসামাল হয়ে উঠে। শ্রম-আধিক্য দেখা দেয়। সুম্পিটার মন্তব্য করেন, কারিগরি অগ্রসর দিয়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই সার্থকতার মধ্যে তার বিনাশের বীজ নিহিত। সামাজিক পরিবেশে ওলট-পালট ঘটিয়ে তা নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে নেয়। পরিশেষে, মার্ক্স ও সুম্পিটার যুক্তি দেন যে, (ভিন্নতর কারণ দর্শিয়ে) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

বিপরীতপক্ষে, নয়া ক্লাসিক্যালবাদীরা বলেন, কারিগরি অগ্রগতি ঘটে রীতিসিদ্ধ ও সুসংহতভাবে। জন্মহার মাত্রাতিরিক্ত না হলে অভ্যাস-আচরণ সংযত হলে এবং গুণাত্মক বিচারে শ্রমশক্তি সবল হলে, তাঁরা বলেন, মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় ক্রমগতিতে।

অন্যদিকে, বহুধনবিজ্ঞানী মত দিয়েছেন যে, প্রযুক্তিক অগ্রগতি আপনা থেকে হয়না বটে। তবে তা স্ব-নির্ভরশীল কতকগুলো প্রভাবের কর্তৃত্বাধীন। রিকার্ডো, কেইনস্, জড়ত্ববাদী ও উত্তর-কেইনসীয় তত্ত্ববাদী দল এই মতের প্রবক্তা। তাঁরা আরও বলেন, কারিগরি-বিদ্যায় অগ্রগতি ও সম্পদ আবিষ্কার সম্ভাবনায় পরিবেশ তেমন অনুকূল নয়। কাজেই, দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। বরং অদূর ভবিষ্যতে তার উপস্থিতি অনেকটা নিশ্চিত, রিকার্ডোর চোখে জড়ত্ব মানে মজুরী হার জীবনধারণের ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসা এবং মূলধন-সংগঠন বন্ধ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। অন্যদের দৃষ্টিতে, জড়ত্ব দেখা দেয় পূর্ণ বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের সম্ভাব্য পর্যায় ও বাস্তব পর্যায়ে ফাঁক সৃষ্টি হয়ে, যা দৃঢ়গতিতে বড় হয়ে যেতে থাকে।

সুতরাং, কারিগরি অগ্রগতি নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। মিলের চেয়ে অমিল বেশী। মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্য অধিক। শুধু তাই নয়, মূলধন-সংগঠনে নব নব কারিগরি আবিষ্কারের প্রভাব নিয়েও বাদানুবাদের শেষ নেই। এক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত।

ক্লাসিক্যাল নক্সায় সমস্যাটি সহজভাবে ধরা পড়েছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। পুঁজিপতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে নেয়। নতুন আঙ্গিক সংযোজন করে নিতে পারলেই দুনা লাভ। সুতরাং সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু, বেশীকাল মজা লুটার জো নেই। অচিরে অন্যান্যরাও অনুগামী হয়ে নতুন উদ্ভাবন গ্রহণ করে নেয়, ফলে আপেক্ষিক দরমাত্রা হ্রাস পায়। কেননা, উৎপাদনে শ্রম-প্রয়োজন হ্রাস পায়, এদিকে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে প্রভাব সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদল এগুলো ভোগ করে। ফলে মুদ্রামজুরী বর্ধনে নিম্নগতি নেয়। কিন্তু, দ্রব্য-দরে হ্রাস ঘটে বলে তাদের প্রকৃত আয় অধিক হয়, তারা বিয়েসাদীতে অধিক মনোযোগী হয়ে উঠে। অধিক হারে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়। অচিরে বাড়তি আয়টুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়। ফলে মুদ্রা-মজুরী আরও স্বল্প হারে বাড়তে থাকে। ফলে মুনাফা-হার তেমন সরাসরি গতিতে নেমে আসে - না। পুঁজিপতিদল তাদের আয়ের বিরাট অংশ সঞ্চয় করে। এক্ষণে জাতীয় আয়ের সিংহভাগ তাদের ভাগে পড়ে। কাজেই, পুঁজি-সংগঠন বেড়ে যায়। অর্থাৎ বণ্টন-ব্যবস্থা পুঁজিপতির অনুকূলে এসে মূলধন-গঠন বেগবান করে দেয়। এখানে রিকার্ডোর পরিবর্তিত মত উল্লেখ করা

প্রয়োজন। তিনি তাঁর বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে এসে শ্রমিকের উপর এই জাতীয় পুঁজি-সংগঠনের প্রভাব সম্পর্কে একটু ভিন্নমত দিয়েছেন। বলেছেন, খাদ্য-দ্রব্যের দাম কমিয়ে নতুন কারিগরি আঙ্গিক যেমন শ্রমিকের মুদ্রা-মজুরী কমিয়ে দিতে পারে, তেমনি তা বেকারত্বেরও জন্ম দিতে পারে। এতে ইতিমধ্যেই নিম্নগতিসম্পন্ন মজুরী মাত্রায় আরও চাপ পড়ে। মার্ক্স এই ধারণাটিকে সুন্দর করে তাঁর মজুরী নির্ধারণ তত্ত্বে কাজে লাগিয়েছেন।

নয়াক্লাসিক্যাল মতবাদে তা আরও সুচারুসম্মত। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগী বাজার ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আলোচনা দেয়া হয়েছে। নব উৎপাদন-প্রণালী সংযোজন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় কমিয়ে দেয়। তা দরমাত্রার নিম্নে নিয়ে আসে। তাতে উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়। অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ হয়। ফলে বিনিযোগমাত্রা বেড়ে যায় এবং সুদের হার চড়ে উঠে। সঞ্চয় অধিক হয়ে উঠে। ভোগমাত্রা কমে আসে।

ঘূর্ণন শুরু হয় পরিচিত বাধাধরা পথে। সুদের হার অধিক। পুঁজি-সামগ্রীর দাম বেশী। কাজেই অধিক ফলনশীল প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার পায়। যত তাড়াতাড়ি অতি-উৎপাদনশীল প্রকল্পগুলো ফুরিয়ে আসে, সুদের হার পড়তে শুরু করে। পুঁজি-সামগ্রীর দাম নিম্নগতি নেয়, অপেক্ষাকৃত স্বল্প উৎপাদনশীল প্রকল্প লাভবান হয়ে উঠে। পরিশেষে সুদের হার মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে নেমে আসে। সঞ্চয় স্পৃহা দুর্বল হয়ে পড়ে। মূলধন-সংগঠন বন্ধ হয়ে যায়। স্থবির পর্যায় দ্রুত এগিয়ে আসে। অথচ মজুরী-হার নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে না।

মূলধন-সংগঠন সমপর্কে মার্ক্সীয় আলোচনা অনেকটা ক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণের সমধর্মী। তবে মার্ক্স বলেন, আঙ্গিকগত উন্নতি-অগ্রগতি ও সমপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে যে সঞ্চয় ঘটে তা বিষম-প্রকৃতির ও ধ্বংসাত্মক। ক্লাসিক্যাল বা নয়াক্লাসিক্যাল মত তত তীব্র নয়। মার্ক্স মন্তব্য করেন, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সহজাত বৈপরীত্ব বিরাজমান তা এই জাতীয় সংগঠনের ভিতর দিয়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। শিল্পসংস্থাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নৈপুণ্য পটুতা অচল হয়ে উঠে। উৎপাদন সংস্থা ক্রম-প্রসারণশীল বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্তরিত হয়ে যায়। তার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা, নব নব উদ্ভাবন-আবিষ্কার অব্যাহত গতিতে শ্রমিক-ছাঁটাই করে দেয়। ফলে বেকারী স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। বেকার শ্রমিকদল অর্থনীতিতে ভেসে বেড়ায়। ফলে, মজুরী হার ন্যূনতম পর্যায়ে

ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠার সুযোগ পায় না। পরিণামে উন্নয়ন-অগ্রগতির ভোগ শ্রমিকের ভাগে পড়ে না। পুঁজিপতিও অবশ্য অধিককাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তারও কোমর বাঁকা হয়ে যায়। থেকে থেকে সঙ্কট দেখা দেয়। মুনাফা-হার নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে নেমে আসতে থাকে। ফলে, পুঁজি-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তি ক্ষয়ে আসে।

সুম্পিটার ক্লাসিক্যাল, নয়াক্লাসিক্যাল ও মার্ক্সীয় ধ্যান-ধারণা একত্রিত করে তাঁর বক্তব্য করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের মৌলিক অবদান এই যে ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যাল চিন্তাজগত ছাড়িয়ে তিনি বলেছেন, বিনিয়োগ ক্রিয়াকর্ম ধরাবাধা নিয়মে ঘটে না। তা রুটিন-মাফিক ব্যাপার নয়। ধ্রুপদী ও নয়াধ্রুপদীবাদীরা বলেছেন, হিসাব-নিকাশ কষে পূর্ব-চিন্তামাফিক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সুদের হার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে লাভালাভ হিসাব কষে বিভিন্ন প্রকল্পের তুলনামূলক ভিত্তিতে অগ্রগতি এগিয়ে যায়। তার জন্য বড় প্রতিভার প্রয়োজন নেই। সঞ্চয় পুরোমাত্রায় ঘটলেই হল। ভোগবিলাসী মনোভঙ্গি অগ্রগতি পথে বড় বাধা। অন্যথায়, কারিগরি বিদ্যায় ধারণামাফিক আঙ্গিকে অনবচ্ছিন্ন অগ্রসর অবধারিত।

অথচ সুম্পিটার বলেন, কারিগরি অগ্রগতি উন্নতি-অগ্রগতির একটা শর্ত বটে, তবে তা এমন কিছু নয়। তা দেয় বলে ধরে নিলেও তেমন কিছু একটা আসে-যায় না। আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে নেয়া বড় কথা। এই ক্ষমতা রাম-শ্যামে উপস্থিত নয়। সুযোগ-সুবিধাটুকু বুঝে নিয়ে কাজে নামার মত সৎসাহস থাকতে হবে। এই দুই গুণের সমন্বয় যথাতথা পাওয়া যায় না। উদ্যোগী ব্যাবসায়ী গুণ সবার মধ্যে বিরাজমান নয়। একমাত্র কর্মপাগল উদ্যোক্তাশ্রেণী এই গুণদ্বয়ের অধিকারী এবং তাদের ক্রিয়াকর্ম দিয়ে কেবল উন্নয়ন-অগ্রগতি কাজের সূচনা ঘটে। অন্যের চেষ্টায় নয়। কেননা, বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন মুখের চাট্টিখানী কথা নয়। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় তা ভরপুর। এই বিপদের মোকাবিলা করায় প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রয়োজন। বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যক। তেল-নুনের হিসাব মিলিয়ে একাজ সম্ভব নয়। চুলচেরা হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে একাজে এগুনো যায় না। সুতরাং ঝুঁকি নিতে হয় বড়। সাহস প্রয়োজন হয় প্রচণ্ড। অদম্য কর্মস্পৃহা হয় আবশ্যক। বহুক্ষেত্রে নব নব জিনিস তৈরী করতে হয়। তার জন্য চাই ভোক্তা ও বাজার। অথচ তা বিদ্যমান নয়। কাজেই, একমাত্র সম্ভাবনার ভিত্তিতে ঝুঁকি নিতে

হয়। হয় পোয়াবারো না হয় নিঃশেষ। এই পরিস্থিতিতে সুদের হার তেমন একটা ধর্তব্য জিনিস নয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে তা একটা বড় কিছু নয়। অথচ নয়াক্লাসিক্যালবাদী যুক্তি দেন, উদ্ভাবন-আবিষ্কার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকারী বলে। কাজেই, ক্রিয়াকর্মে অনিশ্চয়তা কি ঝুঁকি তেমন একটা বড় কিছু নয়।

সঞ্চয় নিয়ে আলোচনায় সুম্পিটার অনেকাংশে ক্লাসিক্যাল ও মার্ক্সীয়ান আলোচনার অনুসারী। তাঁর মতেও কেবল একটা দল সঞ্চয় করে। দলটি হচ্ছে উদ্যোক্তাশ্রেণী। উদ্যোক্তা নতুন বিনিয়োগ ঘটায়। টাকা-পয়সা পায় ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে। তা দিয়ে সে বিদ্যমান বৃত্তপ্রবাহে হানা দেয়। উপাদান ও পুঁজি সামগ্রী করায়ত্ত করে নেয়। অতঃপর প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে তুলে। অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতিজনিত বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঘটে। অবশেষে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিজেই সঞ্চয় করতে শুরু করে এবং তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে।

মার্ক্সের মত সুম্পিটারও পুঁজি-সংগঠন প্রক্রিয়ার ধ্বংসমুখী প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য ততটা জোরালোভাবে নয়। নতুন জিনিস তৈরী হয়ে পুরানো জিনিস অচল করে দেয়। পুরানো প্রক্রিয়া ঠাঁই পায় না, দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে, মন্দাবস্থা দেখা দেয়। অবশ্য তা বেশীকাল স্থায়ী হতে পারে না। অচিরে নতুন ভারসাম্য পর্যায় উপস্থিত হয়। অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং সবায় লাভের ভাগী হয়।

বিনিয়োগ নিয়ে কেইনসীয় বিশ্লেষণ নয়াক্লাসিক্যাল পন্থা অনুসারী। সুদের হার মিলিয়ে মূলধনী প্রকল্পে আশাব্যঞ্জন মুনাফা পরিবেশ বিনিয়োগ নির্ধারণ করে। তবে সুদের হার সঞ্চয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ামক নয়। সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের উপর। সুদের হারে তেমনটা নয়। কাজেই, পূর্ণ চাকুরী সংস্থান অর্জিত হয়ে গেলে কেইনসের মতে, বিনিযোগ মাত্রা সীমিত হয়ে উঠে পূর্ণ বিনিয়োগ সংস্থানমুখী সঞ্চয়ের মাত্রা অনুসারে।

উত্তর কেইনসীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি তত্ত্ববাদীরা বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব মাধ্যমে কেইনসীয় বিশ্লেষণের উপসংহারে চলমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন এবং সেই অনুসারে জাতীয় আয় নির্ধারণ পন্থা নির্দেশ করেন। কেইনস্ স্বল্পমেয়াদী সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীরা ক্রমপ্রসারমান বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। প্রগতিশীল এই বিশ্লেষণে

কারিগরি অগ্রগমন ও জন্মসংখ্যা বর্ধন বিদ্যমান। সঞ্চয় কেইনসীয় সমিকরণমাফিক ঘটে থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত সঞ্চয় আয়মাত্রায় নির্ভরশীল। কিন্তু, বিনিয়োগ বিশ্লেষণে তাঁরা কেইনসকে ছাড়িয়ে যান। অনেকটা সুম্পিটারের অনুসারী হয়ে উঠেন। সুম্পিটারের ন্যায় বিনিয়োগের নিয়ামক হিসাবে সুদের হারের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে উপেক্ষা করেন। আলোচনার গোড়ার দিকে ধ্রুব সুদের হার মেনে নিয়ে অপ্রতিরোধ্য মুদ্রাসরবরাহ ধরে নেন। ধারণাভিত্তিক এই আঙ্গিকে যুক্তি দেন, নীট বিনিয়োগ অংশত স্বয়ংক্রিয় উপায়ে কারিগরি অগ্রগতি দিয়ে নির্ণীত হয়। অর্থাৎ নব নব উন্মেষণী প্রবাহ ব্যয়মাত্রা কমিয়ে দেয় ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। আয়মাত্রা এক্ষেত্রে তেমন প্রভাবশীল কিছু নয়। অবশ্য তা আংশিকভাবে আয়মাত্রা তথা উৎপাদন সম্প্রসারণে নির্ভরশীল। উৎপাদন বেড়ে গিয়ে উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে লগ্নী বেড়ে যায়। অন্য কথায়, বিনিয়োগ ক্রিয়ার নিয়ামক হিসাবে কারিগরি অগ্রগতি কতকাংশে ও আয়মাত্রায় বর্ধন কতকাংশে দায়ী। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মাত্রায় সম্পর্ক গড়ে তোলে তাঁরা উদ্ভাসনে সক্ষম হন যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-সহগ অপরিবর্তিত অবস্থায় লগ্নীর অগ্রগতি হার নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে। তবেই চক্রময় ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অন্যথায় নয়।

সুতরাং, মূলধন-সংগঠন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদীর মত আলোচনা করা গেল। এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়ায় বর্ধনশীল অর্থনীতির জন্য এই সমস্ত আলোচনা কি শিক্ষা প্রদান করে?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় আজকের শিল্পোন্নত দেশসমূহে পুঁজি-সংগঠন সমস্যা পর্যালোচনায় ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যাল মত তেমন পারঙ্গম নয়। তাদের পূর্ণ বিনিয়োগ ধ্যান-ধারণা তেমন প্রাসংগিক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তার তুলনায় কেইনসীয় বিশ্লেষণ অধিক পারঙ্গম বলে মনে হয়। কেননা, কেইনসীয় উপসংহারে পূর্ণ-বিনিয়োগ সংস্থান স্বাভাবিকভাবে ঘটে না। তার জন্য আলাদা চেষ্টা-চরিত্র প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, সাম্প্রতিককালের বহু বিশ্লেষণ যুক্তিতর্ক দেয় যে প্রগতিশীল শিল্প-প্রাধান্য অর্থনীতিতে বিশ্লেষণ এমন তাত্ত্বিক কাঠামোতে হতে হবে যেন তা দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে বাণিজ্য চক্রসমূহ সংযোজিত করে নিতে পারে। এদিক থেকে সুম্পিটারীয় মার্ক্সীয়ান

ও কেইন্সীয়োত্তর আলোচনা অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সেই তুলনায় কেইনসীয় কি স্থূল নয়াক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণ তেমন যুক্তিসম্মত মনে হয় না।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বিনিয়োগের নিয়ামক নিয়ে সাম্প্রতিক-কালের ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে তেমন মতৈক্য লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য সবায় স্বীকার করেন যে, কারিগরি অগ্রগতি বিনিয়োগে প্রেরণা যোগায়। তেমনি সবায় মোটামুটি ধারণা দেন যে, উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ অধিক মাত্রায় ঘটে থাকে। কিন্তু, এই জাতীয় বিনিয়োগের আকার-চরিত্র নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই।[২৪]

উত্তব কেইনসীয় মতবাদী দল অতি সহজ বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব দিয়ে সমস্যাটি বোঝাতে চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, স্বনির্ভর-শীল বিনিয়োগ ঘটে উৎপাদন হারে সম্প্রসারণ অনুযায়ী। তার সাথে ধরে নেন বিনিয়োগবর্ধক-সহগ ধ্রুব হিসাবে। কিন্তু, লগ্নীর এই চাল-চরিত্র সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক সমালোচক বহু, পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি। 'বিশুদ্ধ' বিনিয়োগবর্ধক প্রবণতা সচল থাকার নিমিত্তে অন্ততঃ তিনটি শর্ত বজায় থাকতে হবে। শর্তগুলো হচ্ছে, (১) বিদ্যমান ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে হবে: (২) বিনিয়োগবর্ধক উৎসারিত চাহিদা মেটাবার মত টাকা-পয়সা পর্যাপ্ত থাকতে হবে এবং (৩) উৎপাদনে পরিবর্তন স্থায়ী বিষয় হিসাবে গণ্য হতে হবে। এই আদর্শ পরিস্থিতি পাওয়া কি সহজ? কাজেই, এই নীতি ভুল-ত্রুটিতে ভরা। তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা প্রচুর।

স্ব-নির্ভরশীল লগ্নীর নিয়ামক হিসাবে অন্যান্য বিষয় অন্তরিত করে নেয়া যেতে পারে। তাহলে 'বিশুদ্ধ' বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়ে যেতে পারে।[২৫] যেমন ধরুন, স্বনির্ভর-শীল বিনিযোগ কেবল বিনিযোগবর্ধক-সহগে নির্ভরশীল না হয়ে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারমাত্রার উপরও নির্ভরশীল হিসাবে ভাবা যায়। তেমনি, বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব প্রচলনে টাকা পয়সার সমস্যাটা মুনাফা-সূচক প্রবর্তিত করে চিন্তা করা যায়। তার সাথে প্রত্যাশা-আচরণ

২৪. দেখুন, যথা— A. J. Youngson-এর "The Disaggregation of Investment in the Study of Economic Growth, Economic Journal, LXVI, No. 262, পৃঃ ২৩৬—২৪৩ (জুন, ১৯৫৬)।

২৫. Hamberg-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৩১৭-৩৩০।

সংযোজিত করে নেয়া চলে। কিন্তু, বহু ধনবিজ্ঞানী এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। যুক্তি দেন, এই সব বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্য সম্পর্কে। তাতে মিলের চেয়ে অমিল অধিক লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীদেরকে এক জয়গায় একমত হতে দেখা যায়। তাঁদের অধিকাংশ স্বীকার করেন যে, নয়াক্লাসিক্যালবাদীরা বিনি-য়োগের নিয়ামক হিসাবে সুদের হারে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ততটা সহজ নয়। তা অনিশ্চয়তায় ভরা। অনিশ্চয়তার এই বেড়াজালে সুদের হারে উঠা-নামা বিনিয়োগমাত্রাকে তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারে না।

সুতরাং, সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া মুশ্‌কিল। সুতরাং, ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই এই প্রশ্ন নিয়ে; কেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে অনবচ্ছিন্ন অগ্রসর হার লক্ষ্যকরা যায় না? বিশেষ করে, কি কারণে জাতীয় আয়ের উর্ব্বগমন মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়ে মন্দাবস্থা দেখা দেয়? নিম্নমুখী মোড় জন্ম নেয়ার মূল কারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। চক্রময় অগ্রগতির যত লেখক তাঁরা সবায় এই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এক মতাবলম্বী দুজন খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেউ বলেন, ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যেই পরিবর্তনশীল এই অবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে। আবার কেউ বলেন, যুক্তি বিশুদ্ধ মুদ্রাব্যবস্থার বৈকল্যহেতু তা ঘটে থাকে।[২৬] এই দুই যুক্তি দুই প্রান্তে অবস্থিত। মধ্যবর্তী মতবাদীর সংখ্যাও বহু। কিন্তু, সর্বোতভাবে কেউ সত্য নন। কারণ, বাস্তব দুনিয়ার পরিবেশে এক চক্র অন্য চক্র থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি তাদের জন্মদাতা কারণসমূহও। কাজেই, সর্বদর্শনের সারবস্তু নিংড়িয়ে সমস্যাটির সমাধান পেতে হবে।

সুতরাং, সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণী বিশারদদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। তবে এই পার্থক্য নিয়ে বেশী টানাহেঁচড়া করে লাভ নেই, বরং, চক্রময় দুষ্কৃতির সংশোধনে তাঁদের দেয়া সুপারিশগুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রতিকারসমূহে কিন্তু আশ্চর্যরকম মিল দেখা যায়, উর্ধ্বমুখী মোড় ও নিম্নগামী মোড় বিশ্লেষণে অধিক পার্থক্য লক্ষ্য

---

২৬. বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন **R.A. Gordon**-এর **Business Fluctuation, Harper and Brothers, New York, 1952.** একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়।

করা গেলেও চক্রময় হ্রাসবৃদ্ধি পুনরাবৃত্তিধর্মী হয়ে উঠার কারণসমূহ চিহ্নিত করায় যথেষ্ট মতৈক্য দেখা যায়। তেমনি আজকের উন্নত অর্থনীতিতে তীব্র বেকারত্ব কি মুদ্রাস্ফীতি রোধের পন্থা নির্দেশেও তাঁরা প্রায় একমত। চিন্তাধারায় এই মতৈক্য সমস্যাটি অনুধাবন সহজ করে তুলেছে। উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রক্রিয়া উন্মোচন সুলভ্য করে দিয়েছে। অগ্রগতি অব্যাহত রাখার পথ সুগম করে দিয়েছে। পরিণাম হিসাবে উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সচল ও সপুষ্ট রাখার পথ অধিকতর উন্মুক্ত হয়েছে।[২৭]

মূলধন-সংগঠন নিয়ে যেসব তত্ত্বপ্রণালী পাওয়া গিয়েছে তাতেও ঐতিহাসিক আঙ্গিকে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া অনুধাবন অধিকতর সহজ হয়ে উঠেছে। তেমনি অনুন্নত দেশের পুঁজি-সংগঠন সমস্যা উদ্ভাসনে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে।[২৮] অবশ্য সব উত্তর পাওয়ার জো নেই। অতীতের ধনবিজ্ঞানী (আজকের ধনবিজ্ঞানী) তাঁর পরিচিত পরিবেশের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। কাজেই, আজকের দুনিয়ার সব খবর তাঁর মধ্যে পাওয়ার উপায় নেই।

উন্নয়ন-অগ্রগতি নিয়ে আলোচনাকারী প্রায় সব ধনবিজ্ঞানী ভিত্তি হিসাবে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিকাশের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছেন। সেই পটভূমিকায় সমস্যাবলী তুলে ধরেছেন। অনুন্নত দেশের সমস্যা উদ্ঘাটনে এই সব বিশ্লেষণ তেমন পারঙ্গম নয়। কাজেই, এগুলো বাস্তব আলোতে সংশোধিত করে নিতে হবে। কেইনসীয় বিশ্লেষণ দরিদ্র দেশে তেমন প্রাসংগিক নয়। কেননা, তিনি উন্নত দেশের উন্নয়ন-পর্যায় বজায় রাখায় নিমগ্ন ছিলেন। কেইনসীয় বেকারত্ব দরিদ্র দেশে তেমনটা নেই। বরং শ্রম-শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার এখানে ছড়াছড়ি। পুঁজি সামগ্রী ও সম্পদ-উপকরণের সাথে তাল রেখে শ্রম-শক্তি ব্যবহৃত হয় না, তেমনি নব্য-ক্লাসিক্যাল মতবাদও দরিদ্র দেশের সমস্যা নিরসনে তেমন পরিপক্ক নয়। কারণ এই মত সুষ্ঠু দরব্যবস্থা মেনে নেয়। সেই ভিত্তিতে সুসম সম্পদ বরাদ্দকরণ নির্ণীত করে। দরিদ্র দেশে এই উপকল্প খাটে না। তৃতীয় পর্ব তা প্রদর্শিত করবে। উন্নত দেশে কারিগরি-জ্ঞান অনেক উঁচু পর্যায়ে অবস্থিত। দরিদ্র দেশ তার থেকে লাভবান হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, কি ভাবে? কোন্

২৭. চতুর্থ পর্বে তা আলোচিত হবে।

২৮. এই বিষয় দুইটি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে আলোচিত হবে।

পথে এই জ্ঞান দরিদ্র দেশে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে? কোন লেখকই এই প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর প্রদান করেননি। একমাত্র সুম্পিটার কিছুটা পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু, তাঁর আলোচনা তেমন বাস্তব সম্মত নয়। সমস্যাটি আরও অধিক জটিল। তিনি ধারণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে সমাধান দিয়েছেন। অথচ দরিদ্র দেশে তথৈবচ প্রতিষ্ঠান ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া মোটেই সহজ নয়।

সে যাই হউক, মূলধন-সংগঠন সমস্যার বিশ্লেষণে আলোচিত ধনবিজ্ঞানীদের প্রায় সবায় মূল নিয়ামকগুলো মেলে ধরেছেন। যে কোন অর্থনৈতিক পরিবেশে কথাগুলো সত্য। কাজেই, তথাকথিত অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিবর্জিত হয়েও ঐ সমস্ত নিয়ামক উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও বলশালী করে তুলতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা দিগন্ত তুলে ধরতে পারে। তদুপরি, বিনিয়োগের নিয়ামক হিসাবে সবায় অনেক ধ্যান-ধারণা প্রদান করেছেন। এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও সমাধান অনুন্নত দেশে মূলধন-সংগঠনের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচুর সহায়তা করতে পারে। সংগঠন-হার উর্ধ্বমুখী করায় শর্তাবলী চিহ্নিত করতে পারে। তেমনি সংগঠন-প্রক্রিয়া বেগবান করাব নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিতে পারে।

৪. উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক দিক

উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব সম্পর্কে প্রায় সব ধনবিজ্ঞানী সোচচার। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবদীতে আজকের শিল্পোন্নত দেশসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্য দিয়ে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল। একথা ক্লাসিক্যাল, নয়াক্লাসিক্যাল এমনকি মার্ক্সবাদীরাও বলেন। ক্লাসিক্যাল ও নব্য-ক্লাসিক্যালবাদীদের দেয়া তুলনামূলক ব্যয়-বিধি নির্দেশ করছে যে বিশ্বব্যাপী সুষম সম্পদ বিতরণ সুগম করে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রচুর সুবিধা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাজার বিস্তৃত করে, শ্রম-বিভাগ অধিক করে, ব্যয়সঙ্কোচের 'বাহ্যিক' কারণ জন্ম দেয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর করে তুলে। এই সকল কারণে উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান হয়। ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যালবাদীদের এই মত।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা সম্পর্কে মার্ক্স ওমন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এই বাণিজ্যহেতু ধনতান্ত্রিক বিকাশ সুগম হয়। ওপনিবেশ

দেশগুলোতে জিনিসপত্তর বিক্রি করে ওপনিবেশবাদী দেশ বেশ দু'পয়সা লুটে নিয়ে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে নেয়। বাজার-পরিসর সম্প্রসারিত হয়ে সামন্ততন্ত্র বিনষ্ট করে দেয়। তার ধ্বংশস্তূপের উপর পুঁজিবাদতন্ত্র গজিয়ে উঠে। তাছাড়া, পরিপক্ক ধনতন্ত্রের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার। কিন্তু তা তার মরণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আভ্যন্তরীণ উন্নয়-অগ্রগতি হার নিম্নতম পর্যায়ের নিম্নে চলে আসে। কাজেই, নিজকে জড়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পরিপক্ক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহে হাত বাড়ায়। পুঁজি-নির্গম বাড়িয়ে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়াস পায়। কিন্তু, এপথেও রক্ষা নেই। তার মুখগহ্বর ছোট্ট। কাজেই অচিরে উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি শুরু করে। বিশ্ব-বাজার নিজ করায়ত্তে নেয়ার চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে।

তৈরীকৃত দ্রব্য বিদেশী বাজারে বিক্রি করায় বৃটেন একদিন সর্বাগ্রে ছিল। নয়াক্লাসিক্যালবাদীদের কালে এসে তার সেই আধিপত্য হ্রাস পেতে শুরু করে। জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। তাই দেখা যায়, এই মতবাদীদল বিদেশী বাণিজ্যের কুফলগুলো চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে, বৃটিশ ধনবিজ্ঞানীরা বেশ অস্থির হয়ে উঠেন। নানা রকম ফন্দি-ফিকির নির্দেশ করতে থাকেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করতে থাকেন ও পরামর্শ দিতে থাকেন কারিগরি জ্ঞানে নিরন্তর উন্নতি ঘটিয়ে যাওয়ার জন্য। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে রপ্তানি মূল্যের তুলনায় আমদানী মূল্যের বর্ধনের সম্ভাবনা সম্পর্কেও সতর্ক করে দিতে থাকেন। সে যাই হউক, এইসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বৃটেনের জন্য অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ সুবিধাজনক বলে মন্তব্য করেন।

উপরোক্ত আলোচনা শিল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অ-শিল্প প্রাধান্য দেশের বেলায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সুবিধা বয়ে আনে? খতিয়ে দেখা যাক। ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যালবাদী ব্যবসায়লিপ্ত সবদেশের সুবিধার কথা বলেছেন। শিল্পপ্রাধান্য দেশ যেমন লাভবান হয়, তেমনি অ-শিল্পপ্রধান দেশও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করে। তুলনামূলক ব্যয়বিধি অনুসরণ তা সম্ভব করে তুলে। এই বিধির আঙ্গিকে তাঁরা কিছুটা

চলিষ্ণু বৈশিষ্ট্যও প্রদান করেছেন। কঁচি-শিল্প যুক্তির ভিত্তিতে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ হয়ত সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারে। তবে এই নীতি সংক্রমনশীল, অচিরে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই তাঁরা এই সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন।

পুঁজি ও শ্রম সঞ্চালন আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহণ করে সব দেশে সুবিধা দিতে পাবে। ক্লাসিক্যাল ও নব্য ক্লাসিক্যালবাদী বলেন, পুরানো দেশগুলোতে মজুরী বাড়ে (অথবা হ্রাস রহিত করতে পারে), পুঁজি-পতিরা অধিক মুনাফা পায়। বাস্তুত্যাগীরা তাদের আয় বাড়াতে পারে। নব অধ্যুষিত দেশ অতি প্রয়োজনীয় পুঁজি-সামগ্রী আমদানী করতে পারে। কাজেই, পুঁজি ও শ্রমের আন্তর্জাতিক সঞ্চরণ উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক। তা সম্পদ সুষম বণ্টনের নামান্তর।

মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নরূপ। তা ক্লাসিক্যাল মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁদের চোখে অ-শিল্পায়িত দেশ দাবার বোঁড়ে মাত্র। দরিদ্র দেশগুলো নামমাত্র সুবিধাও পায় কিনা সন্দেহ। কারণ, শিল্পোন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করা তাদের কর্ম নয়। বরং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধনতান্ত্রিক শোষণক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে দেয় এবং অনুন্নত দেশগুলোকে পুঁজিবাদ-বৈপরীত্বের বেড়াজালে আটকে ফেলে।

সাম্প্রতিক কালের বহু ধনবিজ্ঞানী মার্ক্সীয় মতবাদের সাথে একমত নন বটে। তবে উল্লেখ করেন বৈদেশিক বাণিজ্যে নেমে দরিদ্র দেশ তেমন একটা সুবিধা পায় না। ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যালবাদীরা দরিদ্র দেশের সুবিধা বর্ণনায়, প্রগলভ হলেও আসলে তারা তেমন সুবিধা পায় না। বরং, দীর্ঘকালের বিবেচনা তাদের দ্রব্য-বাণিজ্য-অনুপাত অধিকতর অবনতির পথে এগিয়ে যায়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা তাদের জন্য প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ-নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।[২৯] তাঁরা আরও বলেন, বহু দরিদ্র দেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রাকৃতিক সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে নেয়। অথচ তথাকার জনসাধারণকে সচেতন করায় চেষ্টিত হয় না। তাছাড়া, দরিদ্র দেশের জন্য সংরক্ষণ-নীতি অধিকতর ফলপ্রসূ। ক্লাসিক্যাল কি নয়াক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিকদের আলোচনায় বিষয়টি তেমন সমাদর পায়নি।

২৯. একাদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ; পঞ্চদশ অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ; ঊনবিংশ অধ্যায়, প্রথম ভাগ।

উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব উদ্ঘাটনে বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি তথা তা নিষ্কাশনের পথ পরীক্ষা করে দেখাও বাঞ্ছনীয়। ক্লাসিক্যাল ও নয়াক্লাসিক্যাল মতবাদীরা বলেছেন যে লেন-দেন পরিস্থিতিতে সঙ্গীকরণ ঘটে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের আপেক্ষিক দরমাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে। আধুনিক লেখকবর্গ এই মতেরও শক্ত সমালোচক। তাঁরা বলেন, পুঁজি-নির্গমন ও আগমন হেতু মুদ্রা আয়ে পরিবর্তন ঘটে এবং তা বাণিজ্যিক লেন-দেন উদ্বৃত্তে প্রভাব বিস্তার করে। উপরোক্ত মত এই প্রভাব বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণ হেতু আমদানীতে যে প্রভাব পড়ে অর্থাৎ আমদানীর প্রান্তিক-স্পৃহা অঙ্গীভূত করায় এইমত সক্ষম হয়নি। অথচ প্রান্তিক প্রবণতায় পরিবর্তন হেতু ঋণমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এমনকি দরমাত্রায় পরিবর্তন ব্যতিরেকেও ধ্রুব দরমাত্রা বিদ্যমান অবস্থায় ও ঋণগ্রহিতা দেশে বেশ কিছুটা আয় বেড়ে যায়। আমদানীর প্রান্তিক প্রবণতা ধনত্মাকসূচক হলে, বর্ধিত আয় আমদানী মাত্রা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য। অবশ্য আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগও বিনিযোগবর্ধক তত্ত্বের মারফতে উর্ধ্বমুখী করে তুলতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আয় ও আমদানী আরো বেড়ে যায়। উত্তম দেশে পুঁজি-নির্গম হয়ে আয় ও আমদানী মাত্রা কমে যেতে পারে।

এই সকল ঘটনা একত্রিত হয়ে অধমর্ণ দেশের আমদানী বাড়িয়ে দেয়, অথচ রপ্তানি কমে যায়। এবং এই বাড়া-কমা এমন পর্যায়ে এসে উপস্থিত হতে পারে যে দুই দেশের দরমাত্রায় পরিবর্তন ব্যতিরেকে ঋণ-পরিশোধ অসম্ভব হয়ে উঠে।[৩০] তা না হলে অবশ্য ক্লাসিক্যাল নিষ্কাশন-নীতি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হতে পারে। হয়ত কিছুটা রদবদল প্রয়োজন হতে পারে।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্লেষনাদি উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজি-স্থানান্তর জনিত সমস্যার হিসাব-নিকাশ সংশোধনের প্রথা অনুধাবন সহজ করে দিয়েছে।[৩১] এই বিশ্লেষণ এও নির্দেশ করেছে যে, মজুরী ও মূল্যস্তর অনমনীয় বিধায় উন্নত দেশসমূহের মুদ্রা ও রাজস্বনীতি যথাবিহিত করে নিয়ে সঙ্গীকরণ প্রথা সহজ করে নিতে হবে। আধুনিক তত্ত্বে দরিদ্র

---

৩০. আলোচনা সরল রাখার নিমিত্তে দুই-দেশভুক্ত মডেল গ্রহণ করা হয়েছে।

৩১. দেখুন, একাদশ অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ।

দেশের জন্যও বাণী রয়েছে। দরিদ্র দেশকে সচেতন হতে হবে। ক্রয় ক্ষমতা হারে পরিবর্তন ঘটে যেন অবস্থা ওলট-পালট ঘটিয়ে না দিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। ঋণ গ্রহণ করে যেন তা ফাল্‌তু আমদানীতে বিনষ্ট করে না দেয়া হয়। তেমনি আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় তজ্জন্য কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

"সুতরাং, অতীত আমায় ডাক দিয়ে যায়। তা আমায় জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। তাকে জানা যায় একমাত্র তার আবর্তন-ধারা পরিলক্ষ্য করে। অন্য কোন দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। সম্যক জ্ঞানের এই উপলব্ধি তার আকার-আকৃতি ও চরিত্র মেলে ধরে। উন্মুক্ত করে দেয় তার 'দর্শন'। উদ্ভাসিত করে দেয় তার অনুবন্ধী তথা পূর্বাপর সংঘাতভিত্তিক প্রগতি-প্রক্রিয়া, অথবা তার অনুপস্থিতি, বর্তমান দুনিয়ার নিমিত্তে।"

এল. বি. ন্যামিয়ের

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ঐতিহাসিক রূপরেখা

প্রারম্ভিক

অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বস্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি। উন্নয়ন-অগ্রগতির ঐতিহাসিক পরিব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ হতে পারে। তা দেশবিশেষের অগ্রগতি-প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে পারে। ঐতিহাসিক 'দর্শন' উন্মোচনজনিত হতে পারে। হতে পারে তেমনি আবো বহু রকম। কালে কালে, দেশে দেশে, যে বৈপরীত্বধর্মী পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে ইতিহাস মেলে ধরে অদ্বিতীয় অনুপম চরিত্র। অন্যদিকে দর্শন-চিন্তন যেমন মার্ক্সীয়ান, ঐতিহাসিক প্রগতি-প্রক্রিয়ার বিধান বিবৃত করে। ঐতিহাসিক পরিবৃত্তে বৃহত্তর পট তথা প্রণালীসিদ্ধ বিবর্তন চিহ্নিত করে ইতিহাস-দর্শন আবর্তক-প্রবাহ নির্দেশ করে।

কোন এক নির্দিষ্ট সময়কালে দেশে দেশে নানা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী ভিন্নতর হয়। বহুতর অর্থনৈতিক প্রথা-পদ্ধতি পাশা-পাশি পা-পা-হাটি-হাটি করে চলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্নতর অর্থনৈতিক প্রণালী হাত মিলিয়ে এগিয়ে যায়। তেমনি সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন পট ধারণ করে। আজকের রূপ বদলে কালকে ভিন্ন পোশাক পরিধান করে। দেশে দেশে এই যে বিভেদ, কালের কপোলতলে এই যে ব্যবধান, আপাতদৃশ্য এই যে বৈসাদৃশ্য তা তুলে ধরা মুখের কথা নয়। লক্ষ লক্ষ বুলি দিয়েও তা পরিস্ফুটিত করে তোলা সহজসাধ্য নয়।

অন্যদিকে, ইতিহাস-দর্শন ঘেটেও তেমন লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য। উন্নয়ন-অগ্রগতির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত হয়ত তুলে ধরা যেতে পারে। সুখ-সমৃদ্ধির অলীক চিত্র হয়ত অঙ্কন করা যেতে পারে। হতাশা-বিভ্রান্তির কালো-নক্সা হয়ত এঁকে নেয়া যেতে পারে। মার্কীয়ান অবধারিত অধঃপতন হয়ত ঘেটে দেখা যেতে পারে। টয়েনবির 'সভ্যতা' বিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র হয়ত পর্যালোচনা করা যেতে

পারে। কিন্তু, তাতে লাভের মাত্রা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা তেমন নয়। ইতিহাস-দর্শন উন্নয়ন-অগ্রগতির বলিষ্ঠ চিত্র দিতে সক্ষম নয়। বরং তা যে প্রক্রিয়া তুলে ধরতে পারে তা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যে তেমন সুস্পষ্ট নয়। অস্পষ্টতা ও আভাষধর্মী মন্তব্য আমাদের জন্য তেমন উপকারী নয়। কাজেই, দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি আপাততঃ স্থগিত রেখে আমাদের উচিত উন্নয়ন-প্রক্রিয়া বিশদভাবে উপলব্ধি বাস্তব কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসের আলোতে সূচনা ও সমাপ্তি বিন্দু হদিস করা সহজ কাজ নয়। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তীকালে আকাশ-পাতাল ঘটে যেতে পারে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত খেই হারিয়ে বসতে পারে। অবশ্য প্রগতি-প্রক্রিয়া অনুধাবনে অতীত কথা বলে। অতীত অভিজ্ঞতা সম্যক জ্ঞান দান করে। কাজেই, শত বাঁধা সত্ত্বেও ইতিহাস জেনে নিতে হবে। দিগন্তব্যাপী সময় পরিসরে সূত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত বটে। কিন্তু, তবু অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাঠে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতার এই খনি খুজে পেতে বৃটিশ অর্থনীতির বিকাশ পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। শিল্পোন্নয়নক্ষেত্রে এদেশ দিগ্‌দিশারী হিসাবে সম্মান পেয়ে এসেছে। তাছাড়া, তার ওপনিবেশ পরিধি ছিল অতি বিস্তৃত। কাজেই, তার অভিজ্ঞতা উন্নয়ন-অগ্রগতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রভাবাবলীর প্রকৃত রূপ উদ্ভাসনে সক্ষম।

বৃটিশ অর্থনীতির প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লব এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব অর্থনীতির পরিক্রমন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্লব উৎসারিত বৃটিশ অগ্রগতির ধারা পর্ব ও বিশ্ব অর্থনীতিতে তার প্রাধান্যলাভ বর্ণিত হবে। অতঃপর বিশ্ব অর্থনীতির আবর্তনে বৃটেনের ভূমিকা বিশ্লেষিত হবে। এই পর্যায়ে বৃটেন থেকে পুঁজি ও শ্রম নির্গমণ তাৎপর্য অধিক গুরুত্ব পাবে। তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত হবে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ব্যাপক রূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে প্রধান প্রধান ধারাসমূহ বিবৃত করায়। ঐতিহাসিক আঙ্গিকে প্রধান প্রধান প্রভাবসমূহ উন্মুক্ত করায়।

ঐতিহাসিক এই পর্যালোচনা আমাদেরকে বেশ কিছু জ্ঞান দান করবে। প্রথমতঃ, আমরা তাত্ত্বিক ধারণাবলী পরীক্ষা করে নিতে সক্ষম হব। দ্বিতীয়তঃ, এই আলোচনা আমাদেরকে দিব্যজ্ঞান দিতে সমর্থ হবে। কালগত ও স্থানগত পার্থক্যাবলী চিহ্নিত করে তাৎপর্যবহ লক্ষণাবলী বাছাই করে নিতে পারব। অগ্রগতির হার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়ার প্রবণতাসমূহ যাচাই করে নিতে সক্ষম হব। অতপর সাম্প্রতিককালে ভিন্নতর উন্নয়ন হার বিদ্যমান থাকার কারণসমূহ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করতে পারব। তৃতীয়তঃ, এই বিশ্লেষণ প্রগতি-প্রক্রিয়ার সংখ্যাভিত্তিক দিগন্ত দিতে পারবে। পরিসংখ্যান দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে বিভিন্ন ঘটনাবলীর আপেক্ষিক গুরুত্ব মোটামুটি-ভাবে যাঁচাই করে নিতে সক্ষম হব। চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা যে শিক্ষা দেয় তা পাব। অতীতে বহু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়া হয়েছে। বহু বাধা অতিক্রান্ত হয়েছে। উন্নয়ন পথে বহু প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। সেই আলোতে সাম্প্রতিককালের প্রতিবন্ধকতা প্রতিবিধানের পথ বেছে নিতে পারব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রের উদ্ভব-১

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় সাধারণ কাঠামো পরিস্ফুট হয়ে উঠতে বাধ্য। তবে প্রগতি-প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রস্ফুটিত করে তোলাও বাঞ্ছনীয়। সেই খাতিরে, শ্রেণীবদ্ধ বিস্তৃত পট বর্ণনা করা আবশ্যক। তাই, বক্ষমান নিবন্ধে প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক আঙ্গিকে বিভিন্ন দেশে অগ্রগতির 'স্তর-বিন্যাশ' সম্ভাবনা আলোচিত হবে।[১] অবশ্য নানা কারণে পরে তা নাকচ করে দিয়ে বিকল্প সম্ভাবনা হিসাবে কেন্দ্র ও তার পরিধি—এই ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতির স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হবে। শেষোক্ত পথ অধিকতর যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়। আলোচনায় বাকী সময়টুকু বিশ্ব-অর্থনীতিতে কেন্দ্র হিসাবে বৃটেনের উদ্ভব এই পর্যালোচনায় অতিবাহিত হবে।

১. অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে স্তর-পর্যায় (?)

ধনবিজ্ঞান বিশারদ বহু ঐতিহাসিক যুক্তিজাল প্রক্ষিপ্ত করেন এই বলে যে প্রতিটি দেশ তার উন্নয়ন পরিক্রমণে বেশ কয়েকটা স্তর অতিক্রম করে যায়। স্তর মানে "নব্য পরিস্থিতি পুরানো অবস্থাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হয়।"[২] আদম স্মিথের ভাষায় অর্থনীতি শিকার পর্যায় অতিক্রম করে রাখালী কালের ভিতর দিয়ে কৃষি-স্তরে উন্নীত হয়। অতঃপর বাণিজ্যিকস্তর পার হয়ে শিল্পজাত পর্যায়ে এসে হাজির হয়। স্তরবিন্যাসের মধ্যমণি হচ্ছেন মার্ক্স। তিনি হ্যাগেল প্রদত্ত প্রত্যয়াবলীর ভিত্তিতে সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। জার্মান ধনবিজ্ঞানীরা স্তরবিন্যাস পর্যালোচনায় বেশ বিমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। লিস্ট (১৮৪৪) অর্থনৈতিক

---

১. দেখুন N.S.B. Gras রচিত "Stages in Economic History," Journal of Economic and Business History, II, 397 (May, 1930)

২. প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৩৯৭।

অগ্রগতির পাঁচটি স্তর চিহ্নিত করেছেন। স্তরগুলো হচ্ছে, বর্বর-স্তর, গ্রামীন রাখালী জীবন, কৃষি-স্তর, কৃষি ও শিল্পজাত পর্যায় এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-স্তর। হিলেডব্রাণ্ড (১৮৬৪) মেতে উঠেছেন বিনিময় বাণিজ্যক্রমে। তাঁর কাছে অর্থনীতি অতিক্রম করে দ্রব্যবিনিময় পর্যায়, মুদ্রাবিনিময় পর্যায় ও ধারে বিক্রি পর্যায়ে। বুশার (Bucher, ১৮৯৩) দেখেছেন অগ্রগতি-স্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তিতে। তাঁর দৃষ্টিতে অর্থনীতি এগোয় প্রথমে গৃহভিত্তিক স্বতন্ত্র উৎপাদনে (স্বীয় চাহিদা মেটাবার নিমিত্তে, ব্যবসা-বাণিজ্য অনুপস্থিত), পরে শহরভিত্তিক উৎপাদনে (শুল্ক আদায় করে উৎপাদন, উৎপাদকে উৎপাদকে প্রত্যক্ষ দ্রব্যবিনিময়) ও সর্বশেষে দেশভিত্তিক উৎপাদন (পাইকারী বিক্রির নিমিত্তে উৎপাদন, ব্যাপকহারে দ্রব্য বিনিময় ইত্যাদি)। বৃটিশ ও আমেরিকান বহু ধনবিজ্ঞানীও উন্নয়ন-অগ্রগতির স্তর-বিন্যাসে প্রয়াসী হয়েছেন। এ্যাশলী ও আনউইন ক্রম হিসাবে মেনে নিয়েছেন: গৃহভিত্তিক উৎপাদন, গিল্ড প্রথা, স্বীয় পরিধিতে উৎপাদন ও কারখানাভিত্তিক উৎপাদন। গ্রাস (Gras) ভাগ করেছেন বাজার প্রথার মাধ্যমে: গ্রাম, শহর, জাতি, বিশ্ব।

বিশ্ব অর্থনীতির আঙ্গিনায় এসে বহু ধনবিজ্ঞানী শিল্পায়ন মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশকে ভাগ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ আবার পুঁজিসামগ্রী ব্যবহারের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে দেশে দেশে ভেদাভেদ করতে চেয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে হফ্‌ম্যান-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি শিল্পায়ন মাত্রার পরিমাপ করেছেন ভোগদ্রব্য ও পুঁজিসামগ্রী উৎপয়ের নীট মূল্যের অনুপাতে। তাঁর মতে শিল্পায়নের গোড়ার দিকে ভোগদ্রব্যের মূল্য পুঁজিসামগ্রীর মূল্য অপেক্ষা ৪।৫ গুণ বেশী হয়। শিল্পায়নকালে পুঁজিসামগ্রীর উৎপাদন দ্রুতহারে বেড়ে যায়। ভোগদ্রব্য সেই হারে বাড়ে না। শিল্পোন্নত দেশে তারা প্রায় সমানুপাতিক হয়ে উঠে। ক্ষেত্র বিশেষে পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হয়ত ভোগসামগ্রী উৎপাদন ছাড়িয়েও যেতে পারে।[৩]

বেশ কতকগুলো দেশে অর্থনৈতিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন-অগ্রগতির পর্যালোচনায় কলিন ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন, দেশ

৩. দেখুন, W.G. Hoffman-এর "The Growth of Industrial Production in Great Britain, A Quantitative Study," Economic History Review, II, No. 2 169 (1949).

অগ্রগতি পথে এগিয়ে যেতে থাকলে প্রাথমিক শিল্পে (কৃষি, বনজ ও মৎস্য) নিয়োজিত শ্রমসংখ্যা হ্রাস পায়, প্রশাখা শিল্পে (বাণিজ্য, পরিবহন, সেবাকার্য) নিয়োজিত শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পায় আর মাধ্যমিক শিল্পে (শৈল্পিক, খণিজ, হর্ম) নিয়োজিত শ্রম-শক্তি সর্বোচ্চে পেঁৗছে আবার হ্রাস পেতে শুরু করে। এই প্রবণতা নির্দেশ দিয়ে মন্তব্য করেছেন প্রতিটি দেশ শিল্পায়নের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করে অবনতির পথে ধাবিত হয়। তার তুলনায় প্রশাখা শিল্পসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।[৪]

সে যাই হউক, এই সমস্ত শ্রেণীবিভাগ কিন্তু, সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সাধারণভাবে হয়ত কোন কোনটা ইতিহাসের ধারাপর্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। দেশওয়ারী বিবেচনায় হয়ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যেতে পারে। কিন্তু, এর কোনটাই সর্বোতভাবে সন্তোষজনক নয়। প্রতিটি দেশের বেলায় সত্য এমন শ্রেণী বিভাগ আজও পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে এমন ইঙ্গিত। লক্ষ্য করা যায় না। একথা কেউ জোরের সাথে ঘোষণা করতে পারেন না যে, অতীতে এইরূপে ছিল, ভবিষ্যতেও তাই হবে। বরং আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না যদি দেখা যায় একটা দেশ তথাকথিত 'পরবর্তী' পর্যায়ে বিরাজ করছে, অথচ 'পূর্ববর্তী' পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আসেনি। লম্ফ দিয়ে বহু স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী পর্যায়ে এসে পেঁৗছে গিয়েছে। অথবা যে স্তরে আপাততঃ বিরাজ করছে তার পূর্ববর্তী স্তর ধারণামাফিক ছিল না। উদাহরণ হিসাবে রাশিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। রাশিয়া মার্কসীয় স্তর বিন্যাশ মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছে। অধিকন্তু, এক স্তর থেকে অন্যস্তরকে আলাদা করে দেখার জো নেই। একে অন্যের মধ্যে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে যায় না। বরং পূর্ববর্তী স্তর লক্ষ্যণাবলী সহ পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হয়। উভয়ের সংমিশ্রণে নূতন রূপ পরিগ্রহণ করে। কৃষিকে বাদ দিয়ে বাণিজ্য স্তরে পেঁৗছানো যায় না। বরং কৃষি ও বাণিজ্য পাশাপাশি চলে। তেমনি কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্প হাত মিলিয়ে এগিয়ে যায়।[৫] সোজা

৪. ঐতিহাসিক আঙ্গিকে অর্থনৈতিক নক্সা ও স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন W. S. Woytinsky ও E.S. Woytinsky প্রণীত World and Population and Production, Twentieth Century Fund, New York, 1953.

৫. দেখুন, C.R. Fay এর English Economic History, W. Heffer & Sons; Cambridge, 1940 পৃ: ৪৫।

কথায়, আলোচনায় একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্তরবাদীরা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। উন্নয়ন প্রবাহের প্রকৃত রূপ ধরতে পারেননি। ইতিহাসের রৈখিক বিশ্লেষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। তার সীমাবদ্ধতা আজ সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাই সাম্প্রতিককালে স্তরবিন্যাসের দহরম-মহরম তেমন আর একটা শোনা যায় না।

সুতরাং, স্তর-বিন্যাস আলোচনা অপূর্ণাঙ্গ ভেবে নিয়ে নাকচ করে দেয়া যায়। বিকল্প কোন শ্রেণীবিভাগ করা যায় কি? ভেবে দেখা যাক। করা যেতে পারে হয়ত। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বাছাই করে নেয়া যেতে পারে। অতঃপর এগুলো আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তেমনি বিশ্ব-বাজারে দেশের অবস্থিতির পরিবেশ চিন্তা করে সংযোজন ঘটিয়ে নেয়া যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ পোশাকী নক্সায় উপরোক্ত স্তর-বিভাজন নির্দেশ করে যে প্রতিটি দেশে দুই জাতীয় অর্থনৈতিক সংঘটন বিরাজমান। এক, জীবন-ধারণ ভিত্তিক উৎপাদন প্রণালী এবং দুই, বাজারজাতকরণ উৎপাদন প্রণালী।[৬]

জীবনধারণোপযোগী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম মানে কাজে-কর্মে তেমন কোন ভেদাভেদ নেই। বাছ-বিচার বড় একটা নেই। সুশৃঙ্খলা নেই। শ্রম বিভাগ বলতে কিছু নেই। বাজার-পরিধি সঙ্কীর্ণ। পুঁজিসামগ্রী যৎসামান্য। বিনিয়োগ বড় একটা নেই। যার যার প্রয়োজন নিজেরা তৈরী করে নেয়। ঘর-গৃহস্থালীতে দরকারী জিনিসপত্তর চাষবাস করে ফলিয়ে নেয়। অর্থনৈতিক অন্য কোন ক্রিয়াকর্ম তেমন একটা বিরাজমান নয়। অধিকাংশ দরিদ্রদেশ এই পর্য্যায়ভুক্ত।

অপরদিকে, বাজারজাত উৎপাদনপ্রণালী মানে বিশেষ বিশেষ অর্থ-নৈতিক সংস্থা বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পন্ন করে। শ্রম-বিভাগ অধিক পরিমাণে হয়। বাজার-পরিসর বিস্তৃত। পর্যাপ্ত পুঁজিসামগ্রী। বিনিয়োগ মাত্রা অত্যধিক। জিনিসপত্তরের বেচাকেনা দেদার। এই জাতীয় উৎ-পাদন প্রথা কৃষিভিত্তিক হতে পারে, শিল্পভিত্তিক হতে পারে, অথবা এই দুয়ের সংমিশ্রণজাত হতে পারে। তবে বড় কথা, তা বাজার সম্পর্কে বিধৃত। টাকা-পয়সার মাধ্যমে বিনিময় নিষ্পন্ন হয়। কেবল নিজেদের খাওয়া-পরার নিমিত্তে উৎপাদন ঘটে না। উন্নত দেশগুলো এই জাতীয়।

৬. দেখুন, যথা—Woytisky ও Woytinsky রচিত প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৪১৬-৪২৩।

অর্থনীতির এই শ্রেণীবিভাগ যথা, জীবনধারণোপযোগী উৎপাদন প্রণালী ও বাজারভিত্তিক উৎপাদন প্রথা সাদামাঠা শ্রেণী বিভাগ। তেমন সুষ্ঠু কিছু নয়। এই শ্রেণী বিভাগে স্তর-বিন্যাসের বহু বৈশিষ্ট্য অন্তরিত করে নেয়া যায়। অথচ তার ক্রমিকতা চিহ্নত করার সুযোগ নেহায়েত নগণ্য। যেমন ধরুন, বিশেষ অর্থনীতি অতকাল জীবনধারণো-পযোগী থেকে অতঃপর বাজারভিত্তিক উত্তীর্ণ হয়—এমন কথা বলার সুযোগ নেই। ঐতিহাসিক পরিক্রমায় এই সুক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নয়। বরং এমন হতে পারে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী দরিদ্র দেশের অর্থনীতি জীবন-ধারণাভিত্তিক রয়ে যায়। উন্নয়ন-স্রোত অন্তঃসলিলা হয়ে উঠে না। দেশ হয়ত "উন-উন্নত ভারসাম্যে" তথা কেইনসীয় স্বল্পমেয়াদী "উন-চাকুরী সংস্থান ভারসাম্যের"[৭] দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে বিরাজ করতে থাকে। এই শেণীবিভাগ দিয়ে একথা বোঝারও জো নেই যে, অগ্রগতির উন্নত স্তরে উত্তরণের নিমিত্তে দেশকে কৃষিপ্রাধান্য পরিবেশ কাটিয়ে শিল্প প্রাধান্য হয়ে উঠতে হবে। তাছাড়া, উন্নত দেশ মাত্রেই বাজারভিত্তিক, হয়ত সত্য; কিন্তু, বাজারভিত্তিক অর্থনীতি মানেই উন্নত এমন নয়। কেননা, 'উঁচু' ও 'নিম্ন' এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত দেশের সংখ্যাও কম নয়। এই সব দেশের অগ্রগতি হার ও পর্যায়ে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য অধিক বাজারভিত্তিক উৎপাদন পন্থা বিরাজমান বহু দেশ 'মাধ্যমিক' এই পর্যায়ে অবস্থিত।

অধিকন্তু, এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে হয়ত জীবনধারণভিত্তিক ও বাজারভিত্তিক উৎপাদন পাশাপাশি বিরাজমান রয়েছে। কতকগুলো ক্ষেত্রে হয়ত খোরপোস মেটাবার মত উৎপাদন হয়। অন্যসব ক্ষেত্রে বিপণী-করণোপযোগী উৎপাদন চলে। কোথায়ও হয়ত টাকা-পয়সার আদান-প্রদান নেই। অন্যত্র হয়ত তা সচলমান। এই কৃষিকাজ চলে জীবন ধারণের চাহিদা মেটাবার জন্য। অন্য-সব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদিত হয় টাকা-পয়সা মাধ্যমে এবং উৎপাদন ঘটে বাজারভিত্তিক। অবশ্য, এই দুয়ের আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে দেশকে জীবন ধারণভিত্তিক অথবা বাজার-ভিত্তিক বলে অভিহিত করা চলে।

এই শ্রেণীবিভাগের সাথে অন্য দিগন্ত যোগ করা যেতে পারে।

---

৭. দেখুন, R. Nurkse-এর Problems of Capital Formation in Under-developed Countries, Basil Blackwell, Oxford, 1953, পৃঃ ১০

বিশ্ব-অর্থনীতি সম্মুখে রাখুন। পৃথক পৃথক দেশসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করুন। সেই অনুসারে বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত দেশ-সমূহ আলাদা করে নিন। অতঃপর সীমান্তে অবস্থিত দেশসমূহ চিহ্নিত করে নিন। বিশ্ববাণিজ্য ভূমিকার গুরুত্ব অনুসারে দেশ বিশ্ব-অর্থনীতির কেন্দ্রে অথবা সীমান্তে অবস্থিত। যে দেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে দেশ কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। বাকী সব সীমান্তে অবস্থিত। কেন্দ্রে অবস্থিত দেশ, চাই তা কৃষিভিত্তিক হউক, কি শিল্পভিত্তিক হউক সাধারণ ধনী দেশ। তাতে বাজারভিত্তিক উৎপাদন বিরাজমান। বিশ্ব বাণিজ্য তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তার আমদানী অধিক। রপ্তানী অত্যধিক। পুঁজি নির্গমন প্রচুর। বিপরীত দিকে সীমান্ত অবস্থিত দেশের বহির্বাণিজ্য নামমাত্র। বিশ্ববাণিজ্যে তার স্থান নগণ্য। তার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাজারভিত্তিক হতে পারে অথবা জীবনধারণভিত্তিক হতে পারে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা নাভিবিন্দুতে অবস্থিত দেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আমদানীর জন্য যেমন, রপ্তানীর জন্যও তেমন। তেমনি পুঁজিসামগ্রী তথা মূলধনের জন্য।

২. কেন্দ্র ও সীমান্ত (Centre and Periphery)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার বিশ্ব অর্থনীতির প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বৃটেন। শিল্পক্ষেত্রে তার মান-মর্যাদা অত্যধিক। বহির্বাণিজ্যে সে গৌরবময়। তার স্থান সর্বোচ্চে। তার তুলনায় অন্যান্য দেশগুলো নেহায়েত নিষ্প্রভ। তাদের ভূমিকা নেহায়েত নগণ্য। তারা সীমান্তে অবস্থিত। সীমান্তবর্তী দেশসমূহের অগ্রগতির মাত্রায় অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য বিরাজ-মান ছিল। অনেকগুলো বেশ উচ্চতর পর্যায়ে বাকীগুলো নিম্নতর পর্যায়ে। তবে কেউ বৃটেনের ধারে-কাছে নয়। তাদের বহির্বাণিজ্য নগণ্য। বৃটেনের তুলনায় তা নামমাত্র। এমন কি বহু দেশ তখনো বিশ্ব বাণিজ্যে অন্তরিত হতে পারেনি। শতাব্দীর শেষ পাদে এসে সে কেবল কিছুটা স্থান পেয়েছে।

১৮৫০ সাল নাগাদ সীমান্তবর্তী দেশসমূহ দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ও অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবহির্ভূত

দেশ। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। তার পরিধি ক্রমহারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু, সাম্রাজ্যধীন কি সাম্রাজ্যবহির্ভূত সীমান্তে অবস্থিত সব দেশ তখনো অনুন্নত পর্যায়ে। কোথায়ও কোথায়ও কিছুটা উন্নতি-অগ্রগতি হয়ত ঘটেছে। দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য ও দূরপ্রাচ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান ও চীন সবায় অনুন্নত। ইউরোপীয় কতক-গুলো দেশ যেমন বেলজিয়াম, ফরাসী ও জার্মানী কিছুটা উন্নতি হাসিল করেছে। তেমনি আমেরিকান রাষ্ট্রও।

বর্তমান অধ্যায়ের বাকী সময় ও পরবর্তী অধ্যায়ে ১৮৫০ সাল নাগাদ শিল্প-বিপ্লব-কাহিনী 'অতীতপট' হিসাবে বর্ণিত হবে। তার সাথে উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রবাহধারা, কারণসহ চিহ্নিত করে বিশ্ব-অর্থনীতিতে বৃটেনের অগ্রাধিপত্য বিস্তার বিশ্লেষিত হবে।

৩. বৃটেনে শিল্প-বিপ্লব

শিল্পবিপ্লব ১৭৬০ সালে শুরু হয়ে ১৮৩০ সালে শেষ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মধ্যবর্তী এই সময়ে ইংলণ্ডের চেহারা-সুরৎ বদলে রীতিমত নাদুস-নুদুস হয়ে উঠে। এখানে একটা কথা বলে নেয়া দর-কার। ব্যাপারটা শিল্প-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব নয়। রাষ্ট্র-বিপ্লব তথা রাজ-নৈতিক বিপ্লব হয়ত নির্দিষ্ট সময়সীমায় বাধা যায়। কিন্তু, অর্থনৈতিক বিপ্লবকে সময়ের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা দুরুহ কাজ। কাজেই, শিল্প-বিপ্লবকে নির্দিষ্ট আয়তন সীমায় সীমায়িত না করে বরং স্বতঃপ্রবাহমান ধারা, যে ধারা জন্ম নিয়েছে ১৭৬০ সালের বহু আগে, রূপে বর্ণনা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এনিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছে। বহুজন বহু প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ হয়ত 'শিল্প' কথাটা মেনে নিতেই তেমন রাজী-নন। 'বিপ্লবের'[৮] ত কথাই উঠে না এবং

---

৮. দেখুন, যথা--H.S. Beales, "Historical Revisions. The Industrial Revolutions," History, XIV, 16-18 (July, 1929), D. C. Coleman এর" Industrial Growth and Industrial Revolutions" Economica, XXIII, No 89, 1-22 (Feb. 1956), J. U. Nef রচিত "The Progress of Technology and the Growth of large-Scale Industry in Great-Britain, 1540-1640", Economic History Review, V, Nos. 1,3, J. U. Nef-এর "The Industrial Revolution Reconsidered" Journal of Economic History, III. No. I, 1-31 (May, 1943).

তাঁদের কথাতে সারবত্তাও যথেষ্ট রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার বহুকাল আগে থেকেই খনিজ-শিল্প ও অন্যান্য বহু শিল্পক্ষেত্রে বিরাটাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিরাজমান ছিল যাদের মালিক ছিল বড় বড় পুঁজিপতি। তাছাড়া, শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম এবং তাদের আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনায়যে অভাবনীয় উন্নতি-অগ্রগতি ১৭৬০-১৮৩০ সালে লক্ষ্য করা যায় তাদের ও মূল নিহিত ছিল অতীতে। অতীতের ক্রম-অগ্রসরমান ধারাপথ অনুসরণ করেই 'খোল-নলচে' পরিবর্তন এসেছে শিল্পক্ষেত্রে। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক চিন্তন স্বভাবতঃ শিল্প-বিপ্লব কালে পূর্ণ বিকাশ পেয়েছে।

সুতরাং প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়েছিল অনেককাল আগে থেকে। তবে ১৭৬০ সালকে ঐতিহাসিক সীমারেখা ধরে এগিয়ে যাওয়াতে আপত্তি নেই। বরং যুক্তিযুক্ততা রয়েছে বহু। কেননা, তখন থেকে 'সতেজ জোয়ার' জন্ম নিয়েছিল। শিল্পোন্নয়ন সবল ও বেগবান হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে সংস্থাগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল বহুল পরিমাণে। গুণের দিক থেকে যেমন সংখ্যার দিক থেকেও তেমন। তার পূর্ববর্তী সময়ে উন্নয়ন-অগ্রগতি ঘটেনি এমন নয়। তবে গতি ছিল শ্লথ-মন্থর।[৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে 'অগ্রগতির ঢল নেমে আসে। অনুন্নত শক্তিপ্রবাহ পূর্ণবেগে ধাবমান হয়; সুপ্ত ও অর্ধস্ফুট উন্নয়ন-বীজ ফলবতী হয়ে উঠে ও পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।[১০] ধীরে-সুস্থে যে প্রযুক্তিক-অগ্রগতি বয়ে চলেছিল তা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ফলে বৃটিশ অর্থনীতি দ্রুতবেগে সম্প্রসারিত হতে থাকে।

---

৯. এই প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন জাতীয় আয়ের সাম্প্রতিক হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে। সাম্প্রতিক অনেক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন জাতীয় আয় ১৭৭০ সাল নাগাদ বেশ বেড়ে যায়। অত:পর তা জন-সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে পড়ে যায় এবং এই গতি অব্যাহত থাকে ১৮২০ সাল নাগাদ। দেখুন **Phyllis Deane** এর **"The Implications of Early National Income Estimates for the Measurement of long-term Economic Growth in the United Kingdom", Economic Development and cultural change, IV, No. 1, 3-38 (April 1955),**

১০. দেখন **Paul Mantonx**-এর **The Industrial Revolution in the Eigh teenth Century, Jonathan Cape, London, 1928,289.**

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল নাগাদ বৃটিশ অর্থনীতিতে যে অচিন্তনীয় অগ্রসর ঘটে তা বিশ্বে কেউ আর কোনকালে দেখেনি। অভাবনী অগ্রগতির এই নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া কররছে অনুকূল বহুশক্তি। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে জনসংখ্যা বর্ধন, প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও মূলধন সংগঠনের তাত্ত্বিক বিরচিত হয়েছে এবং উদ্ভাষিত করা হয়েছে, অগ্রগতিতে তাদের আন্ত-সম্পর্ক। তাত্ত্বিক এই সব কাঠামোর এক্ষণে বৃটিশ অর্থনীতির সম্প্রসারণ আঙ্গিকে যাচাই করে নেয়া যেতে পারে।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল সমস্যা : জাতীয় আয় জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হারে বেড়ে যেতে হবে। তাহলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যেতে পারবে। বৃটিশ শিল্প-বিপ্লবের কাহিনী এই স্বার্থকতার ইতিহাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এমনিতে জীবনযাত্রা মান উন্নত করতে পারে না। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা "শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কৃষি ও পরিবহন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বৃটেনের অতি-লোকসংখ্যা ধারণ করতে সক্ষম হয়। ডাল-ভাত খাওয়া জীবন থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।"[১১] বৃটেনের শিল্প-বিপ্লব অগ্রগতি-হার ব্যাপকহারে বাড়িয়ে দেয়। জনসংখ্যা বাড়তে সক্ষম হয়। তেমনি মাথাপিছু প্রকৃত আয়ও। ম্যালথুশীয় হতাশা-বিভ্রান্তির কালোছায়া কাটিয়ে বৃটেন প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, জনসংখ্যা সমস্যা তেমন বড় সমস্যা নয়। অতি-প্রজা সমস্যা (Overpopulation) সমাধান করা যেতে পারে। তজ্জন্য মাথা ঘামাবার তেমন কিছু নেই। ম্যালথুশীয় সমস্যার নয়া-ক্লাশিক্যাল বক্তব্য ইতিহাস সত্য বলে প্রমাণিত করে দেয়। বৃটিশ শিল্প-বিপ্লব মার্শালীয় 'ক্রমবর্ধমাননীতি'র প্রতি স্পষ্ট সমর্থন যোগায়। অনুকূলে মত ব্যক্ত করে যে, উদ্ভাবনী আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠানিক অগ্রগতি "ক্রমবর্ধমাননীতি" জন্ম দেয়। ব্যয়-সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ সৃষ্টি করে। ফলে, ক্রমহ্রাসমান-বিধি কার্যকর হতে পারে না।

---

১১. J. H. Clapham-এর An Economic History of Modern Britain, I, 2nd ed. Cambridge University Press. Cambridge, 1930, 54.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। ১৬৫০ সাল থেকে ১৭৫০ সাল এই একশত বৎসরে যেখানে লোকসংখ্যা বেড়েছে মাত্র এক মিলিয়ন সেখানে পরবর্তী ৫০ বৎসরে বেড়েছে ৫ মিলিয়ন এবং ১৮০০ সালে থেকে ১৮৫০ সাল অবধি ৫০ বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ মিলিয়নেরও অধিক। ১৯১৩ সালকে ভিত্তি করে অর্থাৎ ১০০ ধরে হিসাব কষে দেখা যায় যে ১৭৫০ সালে লোকসংখ্যা সূচক ছিল ১৮, ১৮০০ সালে ২৬ এবং ১৮৫০ সালে ৫০।[১২] বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যার গড় পরিমাণ ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ১৭৫০ সালে ছিল ১০৬, ১৮০০ সালে ১৬২ এবং ১৮৪৬ সালে ছিল ২৭৮ জন।[১৩]

সুতরাং, লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর হারে। সাথে সাথে উৎপাদনও। উভয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত বলা যায়কি? তা না হলে কিভাবে তা ব্যাখ্যা করা যায়? ম্যালথ্যাশের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে? না কেইনসকে অনুসরণ করে?[১৪] শিল্প অগ্রগতি জনসংখ্যা-বৃদ্ধি বেগবান করে কি? অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্প সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করে কি? নিঃসন্দেহে এগুলো প্রাসংগিক প্রশ্ন। তবে জনসংখ্যা বিশারদ আজও সঠিক উত্তর জানে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক নিয়ে আজও তাঁর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রচুর। তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন অগ্রগতি সম্প্রসারণের মধ্যবর্তী অনুবন্ধী সম্পর্ক নিয়ে আজও বাদানুবাদের অন্ত নেই।

---

১২. আলোচনা করুন W. G. Hoffman-এর British Industry 1700-1950, Basil Blackwell, Oxford, 1955, 331-332. অষ্টাদশ শতাব্দীর জনসংখ্যা বিষয় জানতে হলে দেখুন G. Talbot Griffith-এর Population Problems of the Age of Malthus, Cambridge University Press, Cambridge 1926 ; M. C Buer-এর Health, Wealth and Population in the Early Days of the Industrial Revolution, G. Routledge & sons, London, 1926; T. H. Marshall রচিত "The Population Problem during the Industrial Ravolution", Economic History, J, 429-456 (January, 1929),

১৩. দেখুন W. Bowden, M. Karpovich ও A. P. Usher প্রণীত An Economic History of Europe Since 1750, Ameican Book Co., New york, 1937, পৃষ্ঠা: ৩

১৪. দেখুন পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল মৃত্যুহার কমে যেয়ে। একথা মোটামুটি সবায় স্বীকার করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি ও গণস্বাস্থ্যে ব্যাপক অগ্রগতি মৃত্যুহার সরাসরি কমিয়ে দেয়।[১৫] ফলে, জন্মহার অধিক হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীত প্রবক্তা বলেন শিল্প-অগ্রগতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উস্কানি যোগিয়েছে। অগ্রগতির ফলে সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। চাকরি-বাকরি সহজলভ্য হয়েছে। শ্রম-চাহিদা বেড়েছে। প্রকৃত মজুরী অধিক হয়েছে। ফলে বাল্যবিবাহ ও অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদন উৎসাহিত হয়েছে। ফলে, জন্মহার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা জন্ম নিয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, স্মিথ ও ম্যালথাশ জনসংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধিকে "নিরবচ্ছিন্ন তীব্র শ্রম-চাহিদার" ফল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। শিল্প-বিপ্লবের উপর লিখিত তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থে Mantoux ও মোটামুটি একই কথা বলেছেন। যুক্তি দিয়েছেন, শিল্প-অগ্রগতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান জন্মহার দিয়ে সম্পর্কিত[১৬] অতি সাম্প্রতিক কালে হাবাকুক (Habakkuk) যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, অষ্টাদশ শতাবদীর শেষ পাদে জনসংখ্যায় দ্রুত দৌড় উঁচু জন্মহারের পরিণতি।[১৭] হাবাকুক বলেন, এই মত অধিক-তর যুক্তিসম্মত। ভিত্তি হিসাবে প্রাগশৈল্পিক সমাজে জনসংখ্যা সম্প্র-সারণের আচার-প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেন। তার তুলনায় মৃত্যুহার হ্রাস পেয়ে জন্মহার অধিক হওয়ার যুক্তি তেমন টেক্‌সই নয়। কেননা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অধিকতর হয়ে বাল্যবিবাহে প্রেরণা দেয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। অধিক জনসংখ্যা ভরণ-পোষণের সুযোগ করে দেয়। ফলে, জনসংখ্যা বেড়ে যায়।

---

১৫. দেখুন, যথা- J. R. Hicks-এর Social Framework, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 1955, 41 ; G. Talbot Griffith, Population Problems of the Age of Malthus, Cambridge University Press, Cambridge 1926.

১৬. Mantax-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৩৫৪-৩৬৪।

১৬. দেখুন H.J : Habakkuk এর "English Population in the Eighteenth century," Economic History Review, Vl, No 2, পৃ: ১১৭-১৩৩। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উচচ জন্মহার নিয়ে T. H. Marshall ও আলোচনা করেছেন, দেখুন তাঁর প্রবন্ধ "Population Problem during the Industrial Revolution" Economic History, 1, 429. (Jan, 1929-456).

সে যাই হউক, জনসংখ্যা বিতর্কে কে ঠিক আর কে বেঠিক তা সঠিক করে বলার জো নেই। তবে একথা সত্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই বেশ উর্ধ্বে ছিল। উন্নয়ন-অগ্রগতির কারণেও জন্মহার অধিক হয়েছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে অগ্রগতি, পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া ও সাধারণভাবে উন্নততর জীবনযাত্রা প্রণালী মৃত্যুহার হ্রাস করে দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার জন্মহার ন্যূন করে দিয়েছিল।

সুতরাং, প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগতি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ব্যাপক উৎকর্ষতা হেতু মৃত্যুহারে হ্রাস ঘটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে তার সম্পর্ক কি? উত্তরে বলতে হয় জনসংখ্যা তাহলে, শিল্প বিপ্লবক্ষেত্রে বাহ্যিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব সম্পাদনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব তেমন কিছু নয়। অন্যদিকে, যদি মনে করা হয় যে জনসংখ্যায় বৃদ্ধি এসেছে মূলতঃ জন্মহার অধিক হওয়ার ফলে আর এই উচ্চ জন্মহার ক্রমবর্ধমান শ্রম-চাহিদা উৎসারিত, তাহলে মেনে নিতে হয় যে জনসংখ্যায় বর্ধন এসেছে শিল্প অগ্রগতির ফলে। এই অবস্থায় শিল্প বিপ্লবের কারণ খোঁজে নিতে হবে অন্যত্র। অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার কথা বর্ণনা করতে হবে অন্য কারণ দিয়ে। শিল্প-বিপ্লবের যাত্রা শুরু হওয়ার পরে হয়ত বর্ধিত জনসংখ্যা তা সপুষ্ট রেখেছে। হয়তবা অগ্রগতি বিস্তৃত হওয়ার পথ খুলে দিয়েছে।

উন্নয়ন-অগ্রগতির এই উত্তরণকালে প্রযুক্তি-বিদ্যায় দ্রুত অগ্রগমন প্রধান উৎস হিসাবে ক্রিয়া করেছে। এক্ষণে তার অবদান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

৫. প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রগতি

কারিগরি বিদ্যায় চমকপ্রদ উন্নতি ঘটে বয়নশিল্পে। ১৭৬০ দশকে হরগ্রীবস্ বেশ সহজ একখানা হস্তচালিত যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটির নাম 'সচল কপিকল' তথা 'জেনি' (Jenny)। এর দ্বারা অনেকগুলো মাকু একসাথে চালানো যেত। ১৭৬৮ সালে আর্করাইট আবিষ্কার করেন 'ফ্রেম'। তা চলানো মাধ্যমে মোটা সুতা কাটতে সক্ষম ছিল এবং তা তন্তুতে পরিণত করতে পারত। জেনি চালাতে তেমন বেগ পেতে হত না। তাই, কুটির শিল্পী ঘরে বসে তা কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু

ফ্রেম চালানো বেশ শক্ত ছিল। ফলে দেখা দেয় কারখানা শিল্প। গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় প্রথমে ঘোড়া ও পরে জল। জল-তাড়িত ফ্রেম কুটির শিল্পে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। জন্ম দেয় কারখানা-শিল্প। অতি দ্রুত উৎপাদন-প্রক্রিয়া ঘরের সীমা ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানিক আওতায় চলে আসে।

বস্ত্রশিল্পে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ঘটে ১৭৮০ দশকে। জেনিও ফ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ক্রমপটন উদ্ভাবন করেন নূতন সুতাকাটা যন্ত্র 'মেউল' (mule)। এই যন্ত্রে জেনি অথবা ফ্রেম অপেক্ষা অধিকতর সুক্ষ্ম সূতা কাটা যেত। ফলে উন্নততর বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হয়। এদিকে সুতাকাটায় ওয়াট্ আবিষ্কৃত ষ্টীম-ইঞ্জিন ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ১৭৯০ সালের পর হতে 'মিউল' চালনায় বাষ্প-শক্তি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তার ফলে বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সহজ হয় এবং তা শহর-কেন্দ্রিক হয়ে উঠে।

১৭৮০ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ কার্টরাইট আবিষ্কৃত শক্তিচালিত তাঁত আবির্ভূত হয়। এই তাঁত ঘোড়া, জল-তাড়িত চাকা অথবা বাষ্পীয়-ইঞ্জিন দিয়ে চালানো যেত। অবশ্য শক্তিচালিত ব্যাপক হারে প্রবর্তিত করার নিমিত্তে আরও অনেক কিছু করে নিতে হয়েছিল। সে যাই হউক, ১৮২০ সাল নাগাদ বৃটেনে শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ১৪,০০০ হয়ে উঠে। ১৮৩৩ সালে তা প্রায় ১,০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়।[১৮] অবশ্য হস্তচালিত তাঁতে তখনো অবলুপ্তি ঘটেনি। বরং তার সংখ্যা তখনো তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। প্রযুক্তিক অগ্রগতি কেবল চকচকে করা (brushing), সুতাকাটাও বয়নকার্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পরবর্তী পর্যায়ে পরিসফুটন, রং, ছাপা ইত্যাদি কার্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এই সকল কাজেও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যায়। শিল্প-রসায়ন শাস্ত্রে উন্নতি ঘটে নবতর পরিস্ফুটন প্রক্রিয়া (bleaching method) জন্ম দেয়। তার সাথে পরিস্ফুটন কার্যে ব্যবহৃত রসায়ন দ্রব্যাদিরও আবির্ভাব ঘটে।

অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক বয়নশিল্পে প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের জন্য ততটা প্রয়োজন নয়। তবে সংক্ষেপে মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। বস্ত্রশিল্পে

১৮. দেখুন T.S. Ashton প্রণীত The Industrial Revolution, Oxford University Press, London, 1948. পৃ: ৭৫।

কারিগরি অগ্রসরের প্রধান প্রধান দিকগুলো হচ্ছে, নব নব শক্তি ব্যবহার, নব আবিষ্কৃত যন্ত্র কর্তৃক শ্রম স্থানান্তরকরণ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যাপক ব্যবহার। ১৮৫০ সাল নাগাদ বস্ত্রশিল্প প্রায় পুরোপুরি যন্ত্রায়িত হয়ে উঠে। যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহে তার স্থান হয়ে দাঁড়ায় চতুর্থ। অথচ সেদিন অবধি তা তেমন ছিল না। বহুদিনের কাবিগরি অগ্রগতির পরিণতি হিসাবে সে তাব নব মর্যাদা লাভ করে।

এদিকে লৌহ উৎপাদন (এবং ১৮৫০ দশকের মাঝামাঝি সময় হতে ইস্পাত উৎপাদন) প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলে। প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রগতির অপর দিক অধিক মাত্রায় লৌহ ব্যবহার। লৌহ দিয়ে যন্ত্রপাতি নির্মাণ সহজ হয়। বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার চালু হয় আব লৌহশিল্প তার দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব কবে তোলে।

আকরিত লৌহ বিগলন বেশ শক্ত সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিকগণ তা নিয়ে গবেষণা চালান। অবশেষে ১৭০৯ সালে ডারবি কাঠকয়লার স্থলে পাথুরে কয়লা ব্যবহার করে লৌহ উৎপাদন সহজ করে তোলেন। অতঃপর আসে খনিজ জ্বালানি ব্যবহাব করে লৌহদণ্ড উৎপাদনের যুগ। ১৭৮০ দশকেব গোড়াব দিকে কর্ট আলোড়ন চুল্লী (Puddling) ও আবর্ত-ঘর্ষণ (rolling) প্রক্রিয়ায় সংমিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হন। তার ফলে লৌহ-বিগলন ও পিণ্ডাকাব করা উভয় কাজে কয়লার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠে। লৌহশিল্পে অপর উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে ওয়াট আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার। এই ইঞ্জিন প্রথমে মারুতচুল্লীতে (blast furnace) ব্যবহৃত হয়। তাবপর হাতুড়ী চালনার কাজে লাগানো হয়। অতঃপর আবর্তন ও কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৮২৮ সালে নেইলসন আবিষ্কার করেন তপ্ত বায়বীয় মারুত-চুল্লী। তার ফলে কয়লা ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস কবা সম্ভব হয়।

খনিজ কয়লা উত্তোলন কর্মটিও আস্তে আস্তে এগিযে চলে। লৌহ শিল্পের উন্নয়ন খনিজ কয়লার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কয়লা খনি থেকে পানি নিষ্কাশন এক জটিল সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। বহু কাল ধরে এই সমস্যা সবাকার মাথা ঘুলিয়ে চলেছিল। অতঃপর ১৭০৮ সালে নিউকমেন নূতন ধরনের এক আবহীয় ইঞ্জিন (atmospheric engine) উদ্ভাবন করেন। তার ফলে পানি নিষ্কাশন সহজ হয়ে উঠে। পরিণামে কয়লা উত্তোলন বেড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে।

কয়লা লৌহশিল্পে ব্যাপক উন্নতি এনে দেয়। আবার লৌহশিল্প কয়লা উত্তোলন প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ করে তোলে। খনিজাত কাজ-কর্ম অধিক সুবিধাজনক হয়ে উঠে। লৌহের ব্যবহার বাড়িয়ে অধিক নীচে অনুসন্ধান সম্ভব হয়। কাঠ দিয়ে তৈরী পথের স্থলে লৌহ তৈরী পথ প্রবর্তিত হয়। তার ফলে কয়লা বয়ে আনার কাজ সুগম হয়। তেমনি ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে। লোহার তৈরী রশি দিয়ে কয়লা উঠানো সহজ বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ এদ্দিন অবধি মাথায় বয়ে উঠানো হত।

এভাবে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠে। লৌহ উৎপাদন বেড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। লৌহশিল্পের নব নব ব্যবহার সম্ভব হয়। প্রকৌশলিক আঙ্গিক সম্প্রসারিত হয়। তেমনি প্রকৌ-শলিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন সহজতর হয়। কাঠ, ধাতু ও হাতে পেটানো লোহা দিয়ে কতটুকু আর যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যেত। এগুলো একদিকে যেমন ছিল রুক্ষ ও অমসৃন তেমনি অন্যদিকে পরিমাণে ছিল সীমিত। লৌহ উৎপাদন সুগম হয়ে এই সকল অসুবিধা দূরীভূত করে দেয়। তার ফলে যান্ত্রিক অগ্রগতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং ধাতবদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

সুতরাং, একদিকে ঘটেছে প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি, অন্যদিকে ধাতব-দ্রব্যের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে ব্যাপকহারে। পরিণামে প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে প্রচুর। তার সাথে যুক্ত হয়েছে গতিসঞ্চালিত শক্তি। আর্করাইট যেই সালে তাঁর বিখ্যাত জলীয় ফ্রেম উদ্ভাবন করেন, ঠিক সেই সালে জেমস্ ওয়াট্ আবিষ্কার করেন বাষ্পীয় যন্ত্র। বহু কালের বহুজনের (বিশেষ করে বোল্টন কারখানার কারিগরদের) সাধারণ ফল একত্রিত করে জেমস্ ওয়াট উদ্ভাবন করেন তাঁর সুবিখ্যাত বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তাই এশটন বলেন, "ওয়াট বড় ভাগ্যবান ছিলেন। পেয়েছিলেন সুযোগ্য সহগামীদল।.. .. .. অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তিনি যে কেবল বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান শিল্পকাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়, অধিকন্তু পূর্বসূরীদের সাধনার নির্যাস একত্রীভূত করে যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন জটিলাকার এক যন্ত্র।"[১৯]

অবশ্য কম ঝক্কিমারী পোহাতে হয়নি। বাষ্পীয় ইঞ্জিন সহজে প্রবর্তন

১৯. Ashton-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৬৯।

করা সম্ভব হয়নি। প্রায় এক দশক পরে যেয়ে জেমস্ ওয়াটের যন্ত্রে আরো পারঙ্গমতা আসে। তা হয়ে উঠে যন্ত্রদানব চালনায় অধিকতর পরিপক্ক। ফলে তার ব্যবহার হয় ব্যাপকতর। বিভিন্ন শিল্পে প্রচলিত হতে থাকে। একে একে বয়নশিল্প, খনিজ শিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৭৭৬ সালে মারুত-চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়। ১৭৮২ সালে মৃৎশিল্পে, ১৭৮৫ সালে কাপড়ের কলে ও ১৮১৪ সালে ছাপাখানায় চালু হয়। নৌ-পরিবহণ শিল্পে ব্যবহৃত হয় ১৮২০ দশকে আর ১৮৩০ দশকে চালু হয় রেল চালনায়। "সুতরাং তিনটি পর্যায়ে তা অগ্রগামী হয়েছে প্রথমতঃ, খনি থেকে জল-নিষ্কাশনে, দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রদানব চালনায় ও সর্বশেষে আকর্ষ-পরিচালনায়। গোড়াতে কলেরিজের ভাষায় যা ছিল 'বিরাট এক উত্তরণী চিন্তন' তা পরিশেষে হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক শিল্প ও পরিবহণ অগ্রগতির নাভিবিন্দু।"[১৯]

অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিক অগ্রগতি দ্রুত সম্পন্ন হতে থাকে। পরিবহণ ব্যবস্থা ও যানবাহন প্রণালী উন্নততর হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ বেড়ে যায়। খাল-নালা কাটা সহজ হয়। রেলপথ স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাস্তাঘাট নির্মাণে ধুম লেগে যায়। খাজনা আদায়কারী বহু বেসরকারী রাস্তাঘাট নির্মাণ সংস্থা গজিয়ে উঠে। গোটা দেশে রাস্তাঘাট ছড়িয়ে পড়ে। টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম-এর মত প্রখ্যাত পরিবহণ সংস্থা জন্ম নেয়। তাতে করে দূরপ্রসারী সড়কগুলোর বহন-ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়।

কিন্তু, কেবল রাস্তাঘাট বানিয়ে চলাচল ব্যবস্থা সুষ্ঠু করা যায়নি। তাই শুরু হয় খাল-বিল কাটা পর্ব। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল অবধি এই পর্ব বিস্তৃত হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় খাল-বিল সংস্কার সম্পাদিত হতে থাকে। ১৭৯০ সাল নাগাদ এই প্রচেষ্টা বেশ জোরদার হয়ে উঠে। সে ছিল স্বল্প সুদের কাল। ১৮৩০ সাল নাগাদ প্রায় দুই হাজার মাইল খাল কাটা হয়ে যায়। আরো প্রায় ১৩০০ মাইল নদীপথে সংস্কার সাধিত হয়। ফলে সারা দেশে নৌ-যান চলাচল সহজতর হয়।

উত্তর ১৮৩০-এ খাল কাটায় ভাটা পড়ে। রেলপথ প্রাধান্য পায়। লৌহনির্মিত রেলপথ অগ্রাধিকার লাভ করে। বাষ্পীয়-যন্ত্র সংযোজিত হয়ে রেল চলাচলে বিপ্লব এনে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেলের বগী ব্যবহৃত

---

১৯. দেখুন E. Lipson-এর The Growth of English Society, Adam and Charles Black, London, 1949, পৃ: ২০৮।

হত কেবল কয়লা ও লৌহ টানায়। সেই রেলপথ ছিল অপরিপক্ক, বার্কেনশ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে উন্নততর রেল নির্মাণে সক্ষম হন। ১৮২৯ খ্রীস্টব্দে স্টিফেনশন তাঁর আলোড়নসৃষ্টিকারী 'রকেট' প্রবর্তন করেন। তার ফলে বাষ্পীয়-যন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপক আকারে রেল উন্নয়ন হতে থাকে এবং তা বেসরকারী উদ্যোগে। ১৮৪০ দশকে এসে ছোট ছোট উদ্যোগ একত্রিত হয়ে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। রেলপথ সংযোজন সুসম্পন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন ও এলোপাথাড়ী রেলপথ স্থাপন বন্ধ হয়ে যায়। আজকের সুসংগঠিত রেলপথের বীজ উপ্ত হয়েছিল সেদিন। শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে এসে প্রায় ৭,০০০ মাইল বিস্তৃত রেলপথ পোতা হয়ে যায়। রেলপথে ভ্রমণ ও মালামাল সঞ্চালন ব্যাপক হয়ে উঠে। রাস্তাপথ ও নৌ-পথের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়।

প্রযুক্তিক এই সম্প্রসারণ বৃটেনের কৃষিজীবনে দ্যোতনা সৃষ্টি করে ও গ্রাম্যজীবনের গোড়া ধরে নাড়া দেয়। প্রথম দিকে কুটির শিল্পে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। অতঃপর অধিক হারে যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে সুতাকাটা ইত্যাদি অবসর সময়ের কাজে ভাটা ধরে। গ্রামবাসীরা অধিকতর লাভজনক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুরু করে দেয় চামড়ার কাজ। হাত দেয় গম ভাঙ্গানোর কাজে। ব্যাপৃত হয় মদ তৈরীতে, মুচিগীরিতে, সেলাই কাজে, ওয়াগন তৈরীতে। এগুলো সার্বক্ষণিক কাজ এবং সম্পন্ন করতে হয় কারখানাতে, ফলে নাগরিক জীবন গড়ে উঠে। শিল্প-শহর জন্ম নেয়। গ্রাম্য জীবন ভাঙ্গতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে এই নির্গমন বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। পরিবর্তিত কর্মপরিবেশ শ্রমিককে আকর্ষণ করতে থাকে। ভিড় জমতে থাকে শিল্পাঞ্চলে ও খনি-অঞ্চলে। হ্যাঁ, না-এর দোটানায় সমাজ জীবন দুলতে থাকে। একদিকে অধিক ও স্থিতিশীল মজুরী আহ্বান জানাতে থাকে। নাগরিক জীবনের বিলাস-ব্যসন হাত উঁচিয়ে আকর্ষণ করতে থাকে।[২০] গ্রাম্য জীবনের অভাব-অনটন ও ক্রমপ্রসারিত লোক-সংখ্যার চাপ গ্রামের সাদাসিধে মানুষকে শহরমুখো করে তুলে।[২১] অন্যদিকে প্রকৃতির শান্ত-সমাহিত সাদামাঠা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন আকুতি জানাতে থাকে। এই দুই শক্তির টানাপোড়েনে অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

২০. দেখুন, যথা—A. Redford প্রণীত Labour Migration in England, Longmans, Green & Co. London, 1926, পৃঃ ৬০।

২১. সবায় মনে করেন যে, Enclosure movement বিতারণী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে কৃষিক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ ঘটিয়ে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম-সরবরাহ নিশ্চিত

মাঝামাঝি সময়ে এসেও অধিবাসীরা শহরবাসী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই ১৮৫১ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় দেশের অর্ধেক লোক তখনো গ্রামবাসী এবং কৃষি তখনো প্রধান উপজীবিকা। প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোক তখনো কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে খোলামাঠে চাষবাস পদ্ধতি লোপ পেয়ে যায়। Enclosure movement তা নিঃশেষিত করে দেয়। অবশ্য ১৭৬০ সালেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি খোলামাঠে চাষ পদ্ধতি অনুযায়ী চাষ করা হত। কিন্তু এই পদ্ধতি উন্নয়ন-অগ্রগতির পরিপন্থী হিসাবে বিবেচিত হয়। এই প্রথায় জমির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হত। কৃষককুল আচার-প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। নিষ্কাশন-প্রথা চালু করা সম্ভব ছিল না। খণ্ড-বিখণ্ড ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমি সুচারুরূপে চাষের উপযোগী ছিল না। ভূমিস্বত্ব প্রথা ছিল সেকেলে। সুতরাং, সব মিলে কৃষি-ব্যবস্থার স্থবির পরিস্থিতি জন্ম দিয়ে রেখেছিল।

১৭৭০ দশক থেকে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর সম্প্রসারণ ঘটে। ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। প্রয়োজন পড়ে অধিক ফসল ফলাবার। জনসংখ্যার আধিক্য অন্যদিকে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের (১৭৯৩-১৮১৫) প্রভাব-হেতু কৃষিদ্রব্যের দাম উন্মার্গগামী হয়। এই দুমুখী প্রবণতার চাপে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তিত গতি নেয়। মালিকানা স্বত্ব রূপ বদলায়। রায়তী ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হতে শুরু করে। Enclosure movement জোরদার হয়। ফলে বড় বড় খামার ভেঙ্গে ছোট ছোট আকার নেয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জমির স্থলে কেন্দ্রীভূত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষক উন্নততর উৎপাদন প্রণালী গ্রহণ করে ফলন বাড়াতে সক্ষম হয়।

কৃষি-ব্যবস্থায় সমপ্রসারণ ঘটে। চিরাচরিত কৃষি-প্রথায় ভাঙ্গন জন্মে। অধিক ভূমি চাষবাসে আসে। জনমজুর অধিক পরিমাণে খাটতে থাকে।

করেছে। কিন্তু, পরবর্তীকালে অনুসন্ধান গবেষণা বিপরীত তথ্য পরিবেশন করেছে। গ্রামদেশ ছেড়ে শহরাঞ্চলে চলে আসার অনুপ্রেরণা হিসাবে ক্রম-সম্প্রসারিত উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় নাগরিক জীবন অধিক আকর্ষণ ঘটিয়েছে। দেখুন, যথা J. D. Chambers-এর "Enclosure and Labour Supply in the Industrial Revolution", Economic History Review, V. No. 3, পৃঃ ৩১৯-৩৪৩ (১৯৫৩)।

ফলে ফলন আরো কিছুটা বাড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি কৃষি ফলনে বর্ধন হয়ত এই সকল কারণে বেশী হয়েছে। উৎপাদিকাশক্তি বেড়ে হয়ত তেমনটা হয়নি। একদিকে পড়ো জমি চাষাবাদে আনা হয়েছে। অন্যদিকে অধিক পরিমাণে বীজ বোনা হয়েছে। শ্রম বেশী খাটানো হয়েছে। পরিণামে ফলন বেড়েছে।

অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বৈ কি! উন্নততর বীজ ব্যবহৃত হয়েছে। নব নব বীজ প্রবর্তন করা হয়েছে। বীজ-আবর্তন ঘন ঘন করা হয়েছে। নিড়ানী অধিক দেয়া হয়েছে। অধিক বাছাই দেয়া হয়েছে। শক্ত মাটি নরম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধুনিক প্রণালীতে বীজ বাছাই ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। সুতরাং, এই সকল কারণে ব্যাপক উন্নতি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। বস্তুত: ঊনবিংশ শতাব্দীকে "ভূস্বামীর অগ্রগতি" কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা, বহু ভূস্বামী ভূমিতে পুঁজি খাটিয়েছে। আধুনিক চাষবাসপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে। উন্নত বীজ উদ্ভাবনে মাথা ঘামিয়েছে। টুল ও টাউনশেড বীজ-আবর্তন ও উপযুক্ত সার প্রয়োগে উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার পথ উন্মুক্ত করেন। কৃষি মন্ত্রী আর্থার ইয়ং আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি জনপ্রিয় করে তুলেন। এই সম্পর্কীয় কারিগরি জ্ঞান জনসাধারণ্যে প্রচার করে তুলেন। কিন্তু, এই সকল প্রচেষ্টা তেমন ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি। ক্ষুদ্রাকার খামার কৃষি-উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। কাজেই, খামার-আকার বৃহৎ করার চেষ্টা করা হয়। অধিক পুঁজি খাটিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষবাসের প্রেরণা দেওয়া হয়। তার ফলে ব্যাপক আকারে আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়।

কাজেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধি প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষি-কাজে তেমন সুবিধা করে উঠতে পরেনি। তার প্রভাব সরাসরি কৃষি কাজে পড়েনি। পরোক্ষভাবে কিছুটা বিস্তৃত হয়েছে শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে। শিল্প-অগ্রগতি গ্রাম্যজীবনে ফাটল ধরিয়ে, কুটির শিল্পে-ভাঙ্গন সৃষ্টি করে কৃষিক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ যা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাও ঘটেছে প্রতিষ্ঠানিক দিক থেকে। নূতন নূতন মালিকানায় ভূমি এসেছে। অনাবাদী জমি আবাদে এসেছে। একত্রীকরণের ফলে খামারের আকার বর্ধিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক মালিকানা ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়েছে। কৃষক ফলন বাড়াবার নিমিত্তে অধিক যত্নবান হয়েছে। নিজেদের ভরণপোষণ

মিটিয়ে বিক্রি করার মত বাড়তি ফসল ফলিয়েছে। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় সংস্কার-হেতু প্রজাগণ অধিক যত্নের সাথে চাষবাসে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষিক্ষেত্রে অধিক হারে অন্তরিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ব্যাপক হারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। ফলে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ভূমি ব্যবস্থায় অধিক সংস্কার সাধিত হয়ে প্রজাস্বত্ব নিশ্চিত করেছে। ব্যক্তি-কালিকানা সুদৃঢ় করেছে। ফলে কৃষককুল উন্নতি–অগ্রগতিতে মনোনিবেশ করার অধিক প্রেরণা পেয়েছে। ব্যবহার ঘটিয়েছে আধুনিক চাষবাস–পদ্ধতি। প্রচেষ্টা চালিয়েছে নিবিড় চাষবাসে। বাষ্পীয় ও যান্ত্রিক আবিষ্কারসমূহ কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রের উদ্ভব-২

গেল অধ্যায়ে উদ্ভাবনী-আবিষ্কারের ধারাপর্বসমূহ উল্লেখিত হল। এক্ষণে তাদের নিয়ামকসমূহ বিবৃত করা প্রয়োজন। আলোচনা করা দরকার সেই সব শর্তসমূহ—যাদের ক্রিয়াকর্মের ফলে উদ্ভাবনী-আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। অতঃপর গুরুত্বের দিক বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ প্রাগ ১৮৫০ সাল অবধি বৃটিশ অগ্রগতিতে শিল্প-উদ্ভাবনী-আবিষ্কার ও মূলধন-সংগঠনের ভূমিকা আলোচিত হবে।

১. শিল্প-উদ্ভাবন-অবিষ্কার প্রক্রিয়া

শিল্প-আঙ্গিক বিবর্তন নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তেমনি ব্যক্তিগত আবিষ্কার সম্পর্কেও অনুসন্ধান-গবেষণার অন্ত নেই।[১] তবে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ তেমন একটা পাওয়া যায়নি। অবিষ্কারক আবিষ্কার করে। কিন্তু তা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়া সমাজ-বহির্ভূত বিষয় নয়। বরং তাতে জড়িয়ে থাকে সামাজিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক চলিষ্ণুতা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ। মোদ্দাকথায়, গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরস্পর সংঘাত-ভিত্তিক শক্তিনিচয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভাবন-আবিষ্কার এগিয়ে চলে। সুতরাং, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু বিশ্লেষণে এই সব কিছু প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---

১. দেখুন, যথা- G. N. Clark-এর Science and Social Welfare in the Age of Newton, Oxford University Press, Oxford, 1937 ; R. C. Epstein প্রণীত, "Industrial Inventions : Heroic or Systemetic ?" Quarterly Journal of Economics, XL, 232-272 (1926); S. C. Gilfillan রচিত, The Sociology of Invention, Follett Publishing Co., Chicago. 1935 ; W.F. Ogburn and Dorothy Thomas-এর "Are Inventions Inevitable ?" Quarterly Journal of Economics, XXXVII, No. 1, 83-98 ; A. P. Usher লিখিত A History of Mechanical Inventions (rev. ed.) Harvard University Press, Cambridge, 1954.

অথচ আজ পর্যন্ত তেমন একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনই কি উদ্ভাবন-আবিষ্কারের একমাত্র জন্মদাতা? ব্যক্তি-প্রতিভাই কি আবিষ্কারের জন্য একমাত্র দায়ী? নাকি গোটা সমাজ পরিবেশ? অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিস্তৃত পট? সুতরাং, অনুসন্ধান করে জেনে নিতে হবে 'কেন' এবং 'কিভাবে' স্ফুটনোন্মুখ অথচ তদবধি অজ্ঞাত উৎপাদন প্রক্রিয়াবলী আবিষ্কৃত হল! অর্থাৎ উদ্ভাবনী-আবিষ্কারের প্রগতি-প্রক্রিয়ার বিধান তৈরী করে নিতে হবে।

উদ্ভাবনী-আবিষ্কার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মূলতঃ দুই শ্রেণীর তত্ত্ব পাওয়া যায়। এক পক্ষ প্রদান করেন "বীরত্বব্যঞ্জক তত্ত্ব" (Heroic theory)। অন্যপক্ষ তুলে ধরেন "রীতিবদ্ধ তত্ত্ব" (Systemetic theory)। বীরোচিত তত্ত্ব অনুসারে, প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে একটি মাত্র প্রতিভা ক্রিয়া করে। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার পাওনা। বিশেষ এক অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে স্বীয় প্রতিভার যাদুময়ীস্পর্শে সে সৃষ্টি করে নতুন আবিষ্কার। হয়ত সামাজিক পরিবেশ, কি প্রয়োজনীয়তা তথা অর্থনৈতিক মঙ্গলাকাঙক্ষা তার মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে তা তেমন কিছু নয়। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা-ইন্দ্রজাল কর্মঠ হয়ে কেবল একটা আবিষ্কার সম্ভব করে তুলে। ক্রম্পটন না হলে সুতাকাটার 'মিউল' তৈরী হতে পারত না। জেমস্ ওয়াট্ ব্যতিরেকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন পাওয়া সম্ভব নয়।

তাঁদের এই মত সবৈব গ্রহণ করা কষ্টকর বৈ কি! ক্রম্পটন না হলে কি সত্যিই 'মিউল' আবিষ্কৃত হত না? ওয়াটকে বাদ দিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কি দিনের আলো দেখতে পেত না? তাহলে দুই বা ততোধিক আবিষ্কারক স্বতন্ত্রভাবে একই আবিষ্কার করে বসেন কি করে? কি করে তাঁরা একই সিদ্ধান্তে অথবা উপসিদ্ধান্তে উপনীত হন? কাজেই, সম্পূর্ণভাবে এক ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় আবিষ্কার সম্ভব হয় এমনটা বলা হয়ত তেমন যুক্তিসম্মত নয়। সমাজকে ছাড়িয়ে কেবল আপন অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বস্তু আবিষ্কার একটু অবাস্তব বৈ কি! কাজেই, রীতিবদ্ধ তথা রীতিসিদ্ধ তত্ত্বে যুক্তি খুজে পাওয়া যায়।

কখনো দেখা যায় একই পথ অনুসরণ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই প্রতিভা সমরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, মোটামুটি একই সময়ে। আবার কখনো দেখা যায় ফল এক অথচ পথ ভিন্ন। অর্থাৎ অব্যর্থ লক্ষ্য এক অথচ

ভিন্ন জন ভিন্ন পথে হেঁটেছেন।[২] সুতরাং, এই প্রত্যয় থেকেও অনুধাবন করা যায় যে, উদ্ভাবন আবিষ্কারের প্রণালীসিদ্ধ তত্ত্ব অধিকতর যুক্তিসম্মত। অর্থাৎ উদ্ভাবন আবিষ্কার ঘটে চলে সমাজস্রোতের টানাপোড়েনে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথা সামাজিক গোটা পরিবেশ নব নব আবিষ্কারের মাতৃ-সদন। তাই দেখা যায় একই প্রয়োজনে বহু জন মাথা ঘামিয়েছেন। সার্থক হয়েছেন অনেকে। সমাধান খুঁজে পেয়েছেন বহুজনে। মোটামুটি একই সময়-কালে। তাঁদের অনেকগুলো আবিষ্কার সমধর্মী, কতকগুলো আবার ভিন্নতর। কিন্তু, একই উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত।

এবার অন্যদিকে তাকানো যাক। একটা আবিষ্কার মানে একটা ইউনিট। কিন্তু, তা অনেকগুলো অংশের সমন্বয় মাত্র। এর প্রতিটি অংশ আবার অনেকগুলো অঙ্গের সমাহার। এই অঙ্গেরও আবার অঙ্গ রয়েছে। যেমন ধরুন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এর প্রতিটি অঙ্গ আলাদাভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অতঃপর সংযোজন ঘটিয়ে ষ্টিম-ইঞ্জিনের উদ্ভব।[৩] তার থেকে কি মনে হয়না যে প্রতিটি আবিষ্কার ঘটনাপ্রবাহের অবধারিত ফল? অতীতের বহু সাধনা সমন্বয়িত হয়ে তবে একটা আবিষ্কার বাস্তব রূপ লাভ করে? প্রবহমান অগ্রগতি ধারা একত্রিত হযে তবে একটা বিশেষ উদ্ভাবন জন্ম দেয়! কেবল জেমস্ ওয়াটের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়।

সুতরাং, এই সকল বিষয়াবলী বিবেচনা করে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনোবিজ্ঞানী ও ধনবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন যে, বিখ্যাত আবিষ্কার কোন একজন প্রতিভার বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল নয়। বরং তা স্বতঃপ্রবাহিত আবিষ্কার পরম্পরার উত্তুঙ্গ পরিণাম। আজকের যে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট একটু আবিষ্কার, কালকে তা পরিধিতে ও চিন্তনে আরও বিস্তৃত। পরশু তা প্রকাণ্ড মহীরুহে সুবিখ্যাত অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। সুতরাং, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, তা যত সুদূরপ্রসারীই হউক না কেন, বৃহৎ আবিষ্কারে সামান্য ঘটন-মাত্র। বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত আবিষ্কারধারা একদিন সঞ্জীবনী প্রতিভার

---

২. Gillifillan-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৩৭-১৩৯। আরও দেখতে পারেন Gillifillan প্রণীত "The Prediction of Technical Change", Review of Economics and Statistics, XXIV, No. 4, 378-380 (Nov. 1952).

৩. R.H. Thurston-এর A History of the Growth of the Steam Engine, D. Appleton & Co, New York, 1878, 55.

সংস্পর্শে এসে নবরূপ ও নবজীবন লাভ করে। "এমন প্রমাণ কোথায়ও পরিলক্ষিত হয়না যে শূন্য থেকে হঠাৎ করে নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে। এমন ঘটনা স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। হয়ত অলীক কল্পনা দিয়ে চিত্রিত করা যেতে পারে। বাস্তবে আবিষ্কারের ইতিহাস মানে আবিষ্কারক গোষ্ঠীর কাহিনী। শুধু তাই নয়, তা যৌথ প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। সামাজিক ব্যপ্ত চাহিদা মেটাবার পথে তা ধীর-প্রবাহী ফলদায়ক।"[৪]

রীতিবদ্ধ অগ্রগতির প্রধান উদ্‌গাতা হচ্ছেন উশার (Usher)। ক্রমে ক্রমে অগ্রসরমান ধারাপ্রবাহের পূর্ণ পরিণতি মানে আবিষ্কার এই প্রতি-পাদ্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে প্রযুক্তিক অগ্রগতি বাহ্যিক কোন ঘটনা নয়। তা সামাজিক প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ মাত্র। সামাজিক মূল্যবোধ তার আচার-চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ তার নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করে। যান্ত্রিক আবিষ্কার ঘটনা-প্রবাহের সমন্বয়মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অন্তদৃষ্টি এক পর্যায়ে সংমিশ্রিত হয়ে বড় আবিষ্কার জন্ম দেয়। অবশ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে তা ঘটে না। সমাজে একটা চাহিদা জন্ম নেয়। তার কোন সমাধান হয়ত তখনো জানা নেই। অথবা জ্ঞাত জ্ঞানের ভিত্তিতে সুষ্ঠু সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। এমনি পরিবেশে প্রতিভাধর উৎসাহী হয়ে উঠেন। ব্যক্তি-প্রতিভা সচেতন হয়ে উঠে। স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান পেতে সচেষ্ট হয। কিন্তু, এই সজ্ঞানতাই যথেষ্ট নয়। তৃতীয় উপাদান হিসাবে স্বচ্ছ মঞ্চ বা পট চাই। প্রাপ্য উপাদানাবলী যথাযথ বিন্যস্থ করা চাই। যথোপযুক্তভাবে সমন্বয়িত করা চাই। নূতন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়কারী হওয়া চাই। পরিশেষে, ক্রম-অগ্রগতির পরাম্পরা যথার্থ রেখে লক্ষ্যবিন্দুতে এগিয়ে যাওয়া চাই। নূতন প্রত্যয়, নূতন নক্সা তথা আঙ্গিক কি আকৃতি অর্জনে সক্ষম হওয়া চাই। ইহাই আবিষ্কার। উদ্ভাবন আবিষ্কারের ক্রমবিকাশের শেষধাপ্ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং তা "প্রণালীমাফিক অগ্রগতির অঙ্গবিশেষ। এই অঙ্গে প্রাক্তন প্রচেষ্টা দ্রবীভূত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং তদ্বারা আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ করে।"[৫]

---

৪. দেখুন Mantoux-এর The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, Jonathan Cape, London, 1828, 201-211; Thurston -এর প্রাগুপ্ত বইও দেখতে পারেন, পৃঃ ২-৩।
৫. Usher-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ১৬-১৯।

সুতরাং, কোন এক ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল হিসাবে উদ্ভাবন-আবিষ্কার বিবেচিত হতে পারে না। তা বহুদিনের বহু সাধনার ফল। বহু সাধকের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রতিভারসে জারিত হয়ে সঞ্জীবনী ফল হিসাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। অতঃপর আরো বহু জ্ঞানী-গুণীর সমালোচনা পেয়ে বহুজনের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে ও পূর্ণ কার্যক্ষম হয়ে উঠে।

এখন কথা হল, উদ্ভাবন-আবিষ্কারের সময় কিসে নির্মীত হয়? শিল্প-বিপ্লব কালে অত সব বড় বড় আবিষ্কার কেন সম্পন্ন হল? অন্য সময়ে ত হতে পারত? উদ্ভাবন-আবিষ্কার আকস্মিক ঘটনা হলে অথবা উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ব্যক্তিবিশেষের নির্বস্তুক চিন্তাপ্রসূত হলে, আবিষ্কার এলোপাতাড়িভাবে যে সম্পন্ন হওয়ার কথা; অর্থাৎ আবিষ্কার বিষয়টি যে স্বতঃস্ফূর্ত তথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার কথা। অন্যদিকে, স্থান ও কালগত পরিবেশ উদ্ভাবন-আবিষ্কারের নিয়ামক হলে তারা উল্টাপাল্টাভাবে যখন তখন আবির্ভূত হতে পারে না। বরং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে একটা স্বাভাবিক ক্রিয়ারূপে নিষ্পন্ন হয়। অবশ্য যুক্তিসম্মত চিন্তাধারা আবিষ্কারের পেছনে লুকিয়ে থাকে। পুনঃ পুনঃ ভুলত্রুটির পথ ডিঙ্গিয়ে তবে আবিষ্কার অর্জন সম্ভব হয়। দুই বা ততোধিক পূর্বসূরীর চিন্তন প্রত্যয় সমন্বয়িত করে আবিষ্কারক আবিষ্কারে পূর্ণ রূপ প্রদান করেন। বহু সাধকের সাধনা ও পরিবেশগত হাজারো ঘটনা সন্নিবেশিত করে তবে আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। কাজেই, অচিন্তনীয় তথা আকস্মিক চিন্তাস্রোতের তাৎপর্য আবিষ্কারে তেমন ধর্তব্য কিছু নয়। আবিষ্কারকের চিন্তাজালে শত শত চিন্তাস্রোত আবির্ভূত হয়। সাম্প্রতিক বহু জটিলাবর্ত দ্যোতনা সৃষ্টি করে। সবকিছু অঙ্গীভূত করে তাঁর প্রতিভা একটা আকার বা অবয়ব প্রদান করে। সুতরাং, "সহজাত প্রতিভা হয়ত বিরাজমান। কিন্তু তা পরিবেশগত ঘটনাবর্তে ক্ষুরধার হয়ে উঠতে হবে এবং অতঃপর তা প্রয়োগ করতে হবে। সমস্যা অনুধাবন করতে হবে। সমীক্ষায় নিতে হবে। তার সমাধান সমাজে কাম্য হতে হবে। প্রতিভা প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করে নেবে। অতঃপর সমস্যা নিরসনে প্রবৃত্ত হবে।"[৬] কাজে কাজেই বলতে হয়, যে উদ্ভাবন-আবিষ্কার প্রক্রিয়া সামাজিক চিন্তাস্রোত ও পরিবেশ দিয়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়, সেই তুলনায়, স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

৬. Ogburn ও Thomas-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৯২।

স্বতঃস্ফূর্ত আবিষ্কার হয়ত আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহের ফল হতে পারে বা ব্যক্তিবিশেষের উৎসুক্যজনিত হতে পারে। অথবা তাউসিগের ভাষায় "আবিষ্কারের আনন্দে" হতে পারে। এই জাতীয় আবিষ্কারে প্রয়োজনীয়তা বড় কথা নয়। বরং, আবিষ্কার নিজেই তার যথার্থতার বলিষ্ঠ যুক্তি।[৭]

বিপরীতদিকে, প্ররোচিত ঘটনাবর্তে আবিষ্কার নিষ্পন্ন হলে তা অবশ্যই "উদ্ভাবনী-আবিষ্টতার" ফলস্বরূপ এবং "প্রয়োজনের তাগিদে" তার জন্ম। কাজে কাজেই শিল্প-বিপ্লব কালের সেই সব যুগোত্তীর্ণ আবিষ্কারের ব্যাখ্যা পেতে হলে সম্যক উপলব্ধি করে নিতে হবে যুগ-প্রবণতা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। জটিলাকার অর্থনৈতিক আশা-আকাঙক্ষা মেটাবার নিমিত্তে বহুমুখী উদ্ভাবন-আবিষ্কার জন্ম নিয়েছিল। তাছাড়া, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উদ্ভাবন-আবিষ্কারেব অনুকূল হয়ে উঠেছিল।

আবিষ্কার-ক্রিয়া জোরদার করায় নানারূপ অর্থনৈতিক প্ররোচনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নিম্নভাবে তা তালিকাভুক্ত করা যায়:

ক) ক্রম-প্রসারিত বাজার সুবিধা উপভোগ কবা;

খ) উৎপাদন-সমস্যাব বাস্তবধর্মী সমাধান কামনা;

গ) উপাদান-দরে আপেক্ষিক পরিবর্তনহেতু সুবিধাবলী ভোগ করার উচ্চাভিলাষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাজার-পরিধি ক্রম-প্রসারিত হয়ে চলেছিল। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহু কারণ তজ্জন্য দায়ী ছিল। একদিকে, সাগর-পারের বহুদেশ আয়ত্তে এসে বাজার বিস্তৃত করে তুলছিল। পরিবহণ ও যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত হয়ে বাজার-পরিসর বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অন্য-দিকে, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বাজার-চাহিদা ব্যাপৃত করে দিয়ে চলেছিল। হু হু করে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছিল। ভোগবিচিত্র্য বিস্তৃত আকার ধারণ করে চলেছিল। জীবনযাত্রার মান ঊর্ধ্বগতি নিয়েছিল। প্রকৃত আয়মাত্রা ক্রম-প্রসারিত হচ্ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ বেড়ে চলেছিল। ফলে, চাহিদা-মাত্রা ব্যাপৃত ও বহুমুখী হয়ে উঠছিল।[৮]

---

৭. দেখুন, যথা-Arnold Plant-এর "The Economic Theory Concerning Patents for Inventions," Economica, N. S. I, পৃ: ৩৩-৩৪ (ফেব্রু, ১৯৩৪)।

৮. দেখুন, যথা-E. W. Gilboy-এর প্রবন্ধ "Demand as a Factor of the Industrial Revolution," in Facts and Factors in Economic

মাথাপিছু আয়ে নিম্নগতি না হয়ে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছিল।[৯] ম্যালথুশীয়ান প্রতিপাদ্য ভুল বলে প্রমাণিতহয়ে উঠেছিল। কেইন্‌সীয় লোকসংখ্যা সমপ্রসারণ বরং কেইন্‌সীয় প্রত্যয়মাফিক হয়েছিল। তা বিনিয়োগ উস্কানি যুগিয়েছিল। ফলে আয়মাত্রা ও চাকুরী সংস্থান উন্মার্গ-গামী হয়ে উঠেছিল। জনসংখ্যা বেড়ে চাহিদা পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়তি চাহিদার জন্য অধিক উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অন্য-দিকে, ভোগমাত্রা (বিশেষ করে বস্ত্র-শিল্পে) পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। তার কারণেও উৎপাদন প্রচুর সমপ্রসারিত হয়। এদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ একা-ধারে লেগেছিল। ফলে সরকারী ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল বিপুল হারে। তা যুদ্ধসামগ্রীর জন্য যেমন শিল্পদ্রব্যের জন্যও তেমন। বহুতর উদ্ভাবন-আবিষ্কার এই সময়ে আবির্ভূত হয়। ফলে বিরাট আকারে উৎপাদন সম্পন্ন হতে থাকে। তার থেকে বোঝা যায় যে বিস্তৃত বাজার চাহিদা মেটাবার নিমিত্তে চাই উচ্চতর উৎপাদন-প্রণালী ও আঙ্গিক। উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ

History, Harvard University Press, Cambridge, 1932, পৃ: ৬২০-৬২৯। হাবাকুকও মন্তব্য করেন, শিল্প-বিপ্লব কালের অধিকাংশ আবিষ্কারের পেছনে ক্রিয়া করেছে ক্রম-বর্ধমান চাহিদা পরিস্থিতি। ব্যক্তিবিশেষের এলোপাতাড়ি চিন্তাধারা তেমন একটা সবল শক্তি ছিলনা, তেমনি উপাদান-দরে আপেক্ষিক পরিবর্তন তার জন্য তেমন দায়ী নয়। অথবা সুম্পিটারীয় উদ্ভাবকও এই বিপ্লব আনেনি। দেখুন H. J. Habakkuk প্রণীত "The Historical Experience on the Basic Conditions of Economic Progress" in L. H. Dupriez (ed.), Economic Progress, Institut de Recherches Economiques et Sociales, Louvain, 1955, পৃ: ১৫০-১৫১।

৯. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রকৃত মজুরী হারে বর্ধন সম্পর্কে পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রমাণ পেতে হলে দেখুন, E. W. Gilboy-এর "Wages in Eighteenth Century England," Journal of Economic and Business History, II, No. 4, 603-629 (Aug, 1930); A. P. Wadsworth ও J. de L. Mann প্রণীত The Cotton Trade of Industrial Lancashire, 1600-1780, Manchester University Press, Manchester, 1931, Bk. IV ; M. D. George-এর London Life in the Eighteenth Century, A. A. Knopf, New York, 1925 ; A. D. Gayer, W. W. Rostow ও A. J. Schwartz-এর The Growth and Fluctuations of the British Economy, Clarendon Press, Oxford, 1953, II, Chapter XI.

করা যাক। তৎকালীন বস্ত্রশিল্পের কথা ধরা যাক। বস্ত্রশিল্পের চাহিদা হু হু করে বেড়ে চলছিল। ভিন্নতর বহু উদ্ভাবন-আবিষ্কার আবির্ভূত হয়ে ক্রম-বর্ধমান এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, পরিবর্তিত রুচি তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নততর বস্ত্র বয়ন সম্ভব করে তুলেছিল। সুতরাং, বলা যায় উৎপাদন আঙ্গিকে পরিবর্তন এসেছিল চাহিদা-মাত্রা ও বৈচিত্র্যতার প্রতিক্রিয়ারূপে। অন্যদিকে, শিল্পপতিদল হন্যে হয়ে উঠেছিল উন্নতমানের উৎপাদন প্রণালীর নিমিত্তে যাতে তারা বর্ধিত হারে উৎপাদন সম্পন্ন করতে পারে। এই কারণেও উদ্ভাবন-আবিষ্কার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিল।

বহু উদ্ভাবন-আবিষ্কার নিষ্পন্ন হয়েছিল উৎপাদন সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজে পাওয়ার উত্তর হিসাবে। হয়ত বিশেষ কোন কাঁচামালের অপর্যাপ্ত সরবরাহ কাটিয়ে তোলার নিমিত্তে প্রয়োজন পড়েছিল এমন প্রথা উদ্ভাবন যাতে এই উপকরণ কম খরচে হয়। অন্য উপকরণ দিয়ে তার প্রয়োজনীয়তা মেটানো যায়। অথবা, উৎপাদন-প্রক্রিয়া ভিন্নমুখী করে তোলে চাহিদা অন্যমুখী করে দিয়েছিল। তাতে অপর্যাপ্ত এই উপকরণে চাপ লঘু হয়েছিল, যেমন কর্ট তাঁর আলোড়ন ও প্রেষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন কাঠকয়লার স্বল্প সরবরাহ কাটিয়ে তোলার নিমিত্তে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাঠ-দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে জ্বালানি হিসাবে কয়লার চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণ। ফলে খনিজ কয়লা উত্তোলন ক্রিয়া জোরদার হয়। সাথে সাথে তার উত্তোলন ও আহরণ-ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রযুক্তিক জ্ঞানে বিপুল প্রসারলাভ করে। কাষ্ঠ অপ্রাচুর্যতা হেতু লৌহশিল্পেও সম্প্রসারণ ঘটে।

তাছাড়া, একের পিঠে অন্যে এগোয়। একটা আবিষ্কার নিষ্পন্ন হল ত দ্বিতীয় একটা প্রয়োজন পড়ে। তৃতীয় একটা মাথা উঁকি দেয়। আবিষ্কার হয়ত আবশ্যকের মাতৃস্বরূপ হয়ে উঠে। এক জায়গায় আবিষ্কার হল ত অন্যত্র চাপ পড়ে অথবা প্রয়োজন দেখা দেয়। দরকার পড়ে পূর্বতন প্রক্রিয়ায় উন্নতিসাধন বা সমধর্মী প্রথায় আধুনিকীকরণ অথবা সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে নব সংযোজন।[১০] দৃষ্টান্ত হিসাবে বয়ন শিল্পে যন্ত্র

---

১০. দেখুন T. S. Ashton-এর The Industrial Revolution, Oxford University Press, London, 1948, পৃঃ ৮৯। সাধারণভাবে হয়ত বলা চলে যে, শিল্প-বিপ্লব কালের অভাবনীয় আবিষ্কারসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল

প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা চলে। যন্ত্র চালু হওয়ায় সুতায় উদ্বৃত্তি ঘটে। বাড়তি সুতা কাজে লাগাবার নিমিত্তে নতুন ধরনের বয়নযন্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজন পড়ে। টুক্‌রা কাপড়ের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজন দেখা দেয় বিরঞ্জন প্রণালী জোরদার করার। ফলে, শিল্প রাসায়নিক বিদ্যায় সম্প্রসারণ দরকার হয়ে পড়ে।

উপাদান-দরে আপেক্ষিক পরিবর্তন উদ্ভাবন-আবিষ্কারের তৃতীয় অর্থনৈতিক উস্কানি হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। এই পরিবর্তনহেতু অপেক্ষাকৃত স্বল্প সরবরাহ সম্পন্ন উপাদান তথা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ উপকরণ ব্যবহার হ্রাস করতে হয়। তার জন্য চাই নবতর উৎপাদন আঙ্গিক। সুতরাং, দরকার পড়ে নব উদ্ভাবন-আবিষ্কার। মূলধন অধিক হারে সংগঠিত হয়। অথচ শ্রম সরবরাহ সেই পরিমাণে বাড়ে না। কাজেই, আবশ্যক হয় স্বল্পশ্রম-ভিত্তিক উদ্ভাবন-আবিষ্কার।[১১] অন্য কথায়, অধিক পুঁজিভিত্তিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন প্রয়োজন পড়ে।

উপাদান-দরে আপেক্ষিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাই এ্যাশটন বলেন, 'তৃতীয়' ও 'চতুর্থ' দশকে তুলনামূলকভাবে পুঁজি অধিক হওয়ায় এবং শিল্প-শ্রম স্বল্প হওয়ার বৈজ্ঞানিকদল স্বল্প-শ্রমভিত্তিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। যেমন বস্ত্র শিল্পে কে ও পল উদ্ভাবিত প্রণালী। এই ধারা চলে 'ষষ্ঠ' ও 'সপ্তম' দশক অবধি। তখন হারগ্রীভস্ আর্করাইট ও ক্রম্পটন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় ।...... শতাব্দীর শেষপাদে এবং পরবর্তীকালে যখন সুদের হার উন্মার্গগামী হয় তখন বেশ কিছুসংখ্যক আবিষ্কর্তা (অবশ্য সবায় নয়) পুঁজি-সংকোচক প্রণালী আবিষ্কারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। বুল ও ট্রিভিথিক আবিষ্কৃত ইঞ্জিন এবং বিদ্যুত সঞ্চারণকারী নবতর প্রথা-প্রণালী অধিক ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রাদি ব্যবহার সঙ্কোচিত করে। নয়া বিরঞ্জন

ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তাদের বহুল ব্যবহার ঘটে। তার জন্য হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যাপক অগ্রগতি দায়ী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবন-আবিষ্কার অগ্রগতি এমন ধাপে এসে উন্নীত হয় যে, তাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ফলে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। দেখুন যথা—L. C. A. Knowels-এর Industrial & Commercial Revolution in Great Britain during the Nineteenth Century, George Routledge & Sons, London, 1941, 20-23।

১১. দেখুন, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম ভাগ।

প্রক্রিয়া সময় সংক্ষেপ ঘটাতে সক্ষম হয়। অধিক গতিসম্পন্ন উন্নত যান-বাহন পুঁজি ব্যয়সঙ্কোচ ঘটায়। তা দ্রব্যমালিক থেকে দ্রব্য-উৎপাদক অথবা দ্রব্য-উৎপাদক থেকে ভোক্তার দ্বারে মাল সঞ্চালনে আবদ্ধকৃত পুঁজি বেশ কিছুটা অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়।"[১২]

সুতরাং, মন্তব্য করা যায় যে উদ্ভাবন-আবিষ্কারের নিয়ামক হিসাবে অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণা প্রচুর ক্রিয়া করে। বিস্তৃত বাজার, উৎপাদন-সমস্যা ও উপাদান-দরে আপেক্ষিক পরিবর্তন সরাসরিভাবে উদ্ভাবন-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে আবিষ্কার সম্ভব হয় না। সমাজ যা চায়, অর্থনৈতিক যে প্রয়োজন তার তাগিদে আবিষ্কর্তা অনুপ্রাণিত হন। সচেষ্ট হন সন্তোষজনক প্রণালী উদ্ভাবনে। তার ব্যতিক্রম বেশী একটা লক্ষ্য করা যায় না। আকস্মিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রযুক্তিক অগ্রগতির অভাবনীয় সম্প্রসারণে তার অবদান নেহায়েতই নগণ্য।[১৩] তাই বীরোচিত তত্ত্বে আজ আর কেউ তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। বরং, অধিকাংশ চিন্তাবিদ জোর প্রদান করেন বিধিবদ্ধ তত্ত্বে। অভিমত প্রকাশ করেন শিল্প-বিপ্লব কালের উদ্ভাবনী আবিষ্কার একটা রীতিসিদ্ধ প্রথামাফিক এগিয়েছিল এবং এই রীতিসিদ্ধতার অধিকাংশ কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান ছিল।

অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণা যেমন প্রযুক্তিক অগ্রগতিতে উস্কানি যোগায় তেমনি যুগধর্মের প্রভাব ও তার অগ্রগমনে ক্রিয়া করে। অনুজ্ঞাধর্মী হাজারো প্রবণতা সবল হয়ে উদ্ভাবন-আবিষ্কারের পথ সুগম করে দেয়। এনে দেয় অনুকূল পরিবেশ। বিশেষীকরণে বিস্তৃতি, বৈজ্ঞানিক চেতনা

---

১২. Ashton-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৯১-৯২। কঠিন করে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা উদ্ভাবন চালু করার মুহূর্তে বিরাজমান আপেক্ষিক উপাদান-দর বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। উদ্ভাবন-আবিষ্কার আজ ঘটল। তার প্রয়োগ হল বহুকাল পরে। এই ফাঁকে দরমাত্রা পবিবর্তীত হয়ে নূতন পর্যায়ে চলে এল। এমতাবস্থার তখন যে প্রক্রিয়া লাভজনক ছিল তা হয়ত আজ আর তেমন নেই।

১৩. Clark-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৪-৮। রষ্টোও জোর দেন যে, "শিল্প-উদ্ভাবন কোন্ দিকে বইবে এবং তার প্রয়োগ কোন খাতে প্রবাহিত হবে তার দিকমাত্রা নির্ণীত হয় অনুধাবনীয় অর্থনৈতিক অনপ্রেরণা অনুসারে।"

ও উদ্ভাবন-আবিষ্কারের পুনরাবৃত্তিধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অগ্রগতি পথে বলিষ্ঠ শর্ত হিসাবে প্রেরণা যোগায়।[১৪]

প্রযুক্তিক অগ্রগতির ফলে বিশেষীকরণ সম্ভব হয় আর বিশেষীকরণের ব্যাপক বিস্তৃতির পরিণাম হিসাবে প্রযুক্তি বিদ্যায় সম্প্রসারণ অধিক সহজতর হয়। তাই স্মিত বলেন, শ্রম-বিভাজনের পরিণতি হিসাবে উদ্ভাবন আবিষ্কার জোরদার হয়। কেননা, শ্রমিক এক্ষণে কেবল বিশেষ একটা কাজে নিয়োজিত থাকে। ফলে তার পক্ষে, সেই কাজ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিতে অধিক মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়। শ্রম-বিভাগ অধিকতর সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে শ্রমিকের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় কোথায় গলদ নিহিত রয়েছে। কোথায় একটু সারিয়ে নিলে ফলন বাড়ানো যেতে পারে। কোথায় একটু নড়চড় করে নিলে উপাদান ব্যয় হ্রাস পায়। কাজেই, এই কারণে উদ্ভাবন ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়।

অবশ্য এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্রগতি ব্যতিরেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত সুদূরপ্রসারী অগ্রগমন সম্ভব ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে পটভূমিকা হিসাবে কার্য করেছিল। এদিকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বাস্তব সমস্যা সমাধানে সক্ষম ছিল না। শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে জটিলাকার সমস্যা বিরাজমান ছিল তার সুষ্ঠু সমাধানে বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যেমন অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তেমনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিল্প-আন্দোলন, ধর্মীয় অনুভূতি ও অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা ও সঞ্চালোক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করেছেন।[১৫] সংঘাতভিত্তিক এই সকল শক্তিনিচয় ঘাত-প্রতিঘাত শক্তি হিসাবে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন বেগবান করে তুলেছিল। ফলে বিশুদ্ধ চিন্তাধারা এগিয়ে গিয়েছিল। তার কিছুটা বাস্তবে রূপলাভ করে উদ্ভাবন-আবিষ্কার হিসাবে

---

১৪. পেটেন্ট প্রথা উদ্ভাবন কার্যক্রিয়া জোরদার করেছে, এ-নিয়ে বাদানুবাদ রয়েছে। একমতে, পেটেণ্ট-প্রথা ব্যতিরেকে উদ্ভাবন-আবিষ্কার তেমনটা নাকি হওয়া সম্ভব ছিলনা। ভিন্নমতে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে একচেটিয়া আধিপত্য প্রদান করে পেটেণ্ট-প্রথা উদ্ভাবন-আবিষ্কারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ফলে অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে। দেখুন, যথা—Plant-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৩৮-৪৩, Ashton-এর পূর্বোক্ত বই পৃঃ ১২-১৩।

১৫. Clark-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৮৬।

চিহ্নিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তাস্রোত কি বক্তব্যে, কি পরিসরে, বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে উদ্ভাবন-আবিষ্কার জোরদার হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার আঙ্গিক সম্প্রসারিত হয়েছিল। চেহারায় নিগূঢ়তা ও নিপুণতা এসেছিল।

প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতির অপর শক্তিশালী প্রভাব ছিল এক ক্ষেত্রে অগ্রগমন অন্য ক্ষেত্রে বিনিযোজিত হওয়া। কোথায়ও এক জায়গায় অগ্রগতি দেখা দিল। অন্যত্র তাব প্রভাব অচিরে ছড়িয়ে পড়ত। শুরু হয়ে যেত একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে অগ্রগতি আরও প্রসারলাভ করত।

২. শিল্প-উদ্ভাবন ও উদ্যোগ

অর্থনৈতিক বিবেচনায় আবিষ্কার এমনিতে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তার আসল তাৎপর্য বাণিজ্যিক প্রজ্ঞা হিসাবে তা কতটুকু কার্যকরী তার উপব নিহিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বড় কথা নয়। প্রযুক্তিক আঙ্গিক হিসাবে তা কতদূর কার্যক্ষম তাই বিবেচ্য। আবিষ্কার এমনিতে একটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু উদ্ভাবন, সুম্পিটারের পরিভাষায় বলতে গেলে, হচ্ছে অর্থনৈতিক ঘটনা। সুতরাং, প্রশ্ন দাঁড়ায়, কি এমন ব্যাপার ছিল যার জন্য হাজারো আবিষ্কার উদ্ভাবন হিসাবে রূপলাভ করেছিল? সহজ ভাষায়, উদ্ভাবন-আবিষ্কারে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবা গিয়েছিল কেন?

উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণ করে মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে। সেদিনের উদ্যোক্তাদলও উজ্জীবিত হয়েছিল মুনাফামাত্রা স্ফীত কবার কারণে। তাই তারা নব উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। উদ্ভাবন হয় উৎপাদন-ব্যয় কমিয়ে দেয়, না হয়, চাহিদা সৃষ্টি করে। তা বিদ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি ইউনিট উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করে দেয় অথচ গুণগত বৈষম্য সৃষ্টি করে না। নতুবা উন্নত প্রণালীর দ্রব্য জন্ম দেয়, না হয় সম্পূর্ণ নূতন আকৃতির দ্রব্য সৃষ্টি করে যা পুরানো বহু দ্রব্য লুপ্ত করে দেয়।

অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণা আবিষ্কারে যেমন প্রেরণা যোগায় তেমনি উদ্ভাবনীক্ষেত্রেও উজ্জীবনী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। উপাদান-দরে তারতম্য, বিস্তৃতিশীল বাজার, ক্রমবর্ধমান চাহিদামাত্রা নব আবিষ্কারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ফলে স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান উপাদানের ব্যয়সঙ্কোচ ঘটানো সম্ভব

হয়। নয়ত উৎপাদন পরিমাণ বাড়িয়ে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সক্ষম করে তোলে। সোজা কথায়, অর্থনৈতিক উপাত্ত (data) পরিবর্তিত হয়ে যায়। সরবরাহ পরিস্থিতি, না হয় চাহিদা মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে। কাজেই, পুরানো প্রথা অচল হয়ে পড়ে। তা বাতিল করতে হয়। নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করতে হয়। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে সাযুজ্য ঘটিয়ে উদ্যোক্তা নূতন উৎপাদন আঙ্গিক গ্রহণে অগ্রণী হয়। অথবা প্রচলিত উৎপাদন-পন্থায় পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে প্রবৃত্ত হয়।

মোটা কথায় বলা যায়, শিল্পবিপ্লবের কাহিনী—মানে পরিবর্তিত চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতির বিস্তৃত কেচ্ছা। প্রতিরুদ্ধ চাহিদা উৎপাদনের অপরিবর্তিত চেহারা ও বন্ধ্যাত্ব উৎপাদন-আঙ্গিক দিয়ে শিল্প-বিপ্লব ঘটে না। উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় উজ্জীবনী শক্তি জন্ম নেয় না। কাজেই শিল্প-বিপ্লব তথা উদ্ভাবনী ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে এগুলো সক্রিয় ছিল। ব্যয়-সঙ্কোচজনিত সমস্যা কতকক্ষেত্রে জটিলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার সমাধানে উদ্ভাবনীস্রোত জন্ম নিয়েছিল। অন্যত্র ব্যাপক মুনাফা-সম্ভাবনা বিরাজমান ছিল। এই মুনাফা অর্জনের নিমিত্তেও উদ্ভাবনী-ঢল নেমেছিল। তা একবার শুরু হয়ে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দ্যোতনা সৃষ্টি করেছিল। ফলে সর্বত্র উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল।

উদ্ভাবনী মাত্রার একটা মোটামুটি সঙ্কেত পাওয়া যেতে পারে পেটেণ্ট-এর সংখ্যা থেকে। পেটেণ্ট (Patent)-এর বার্ষিক সংখ্যায় ক্রম-বর্ধমান ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়।[১৬] তার সর্বোচ্চ সংখ্যা আবার বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধি পর্বের চরম মাত্রার কয়েক সালের সাথে সাযুজ্যমান হতে দেখা যায়। অথচ মন্দাকালে তেমনটা নয়। সুতরাং, মন্তব্য করা চলে যে, মুনাফা-অর্জন সম্ভাবনা উদ্ভাবনী-ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদায়িনী শক্তিরূপে ক্রিয়া করেছিল। ক্ষয়-ক্ষতি পোষাবার নিমিত্তে তেমনটা নয়।

---

১৬. পেটেণ্ট সম্পর্কে পরিসংখ্যান তাত্ত্বিক আলোচনার নিমিত্তে দেখুন Ashton-এর "Some Statistics of the Industrial Revolution in Britain," Manchester School of Economic and Social Studies, May, 1948, 229.

প্রযুক্তিক উদ্ভাবন সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন M. T. Hodgen কৃত Change and History, Viking Fund Publications in Anthropology, New York, 1952, Table 5.

অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, উদ্দীপক মুনাফা সম্ভাবনাই উদ্ভাবনের একমাত্র কারণ নয়। তার আড়ালে আরও বহু শক্তি সক্রিয় থাকে। যেমন ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিক জ্ঞান। তেমনি সম্ভাবনা অনুধাবন করার মত দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তাদল। শুধু তাই নয়, তা বাস্তবায়িত করার মত উৎসাহী উদ্যোক্তাশ্রেণী। তার উপরেও বড় কথা, উপযুক্ত পুঁজি সংগ্রহ করে নূতনতর উৎপাদন-আঙ্গিক কাজে খাটাবার মত উদ্যোগী ব্যবসায়ীগুণ। এই সব একত্রিত হয়ে তবে উদ্ভাবনী ধারায় বিপ্লব এনেছিল। উদ্ভাবনী-আবিষ্কার কার্যক্রম নিয়ে ইতিমধ্যেই কিছুটা আলোচনা হয়েছে। এক্ষণে উদ্যোক্তার ভূমিকা এবং আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা যাক।

সুম্পিটারের সেই বলদৃপ্ত "উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা" আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। সোমবার্ট উদ্যোক্তার "উদ্দীপনা-ময়ী তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি" লক্ষ্য করেছেন। তার এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি জয়ের লালসায়, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চাশায় ও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনার মানদণ্ডে নিয়ন্ত্রিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৭] একথা সত্য বটে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর আকাশে বাতাসে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল। কিন্তু, তাই বলে এমন নয় যে, কারো উদ্যোগ ছাড়াই সব কিছু যথাবিহিত এগিয়ে চলেছিল। তা কিন্তু মোটেই নয়, বরং বহু উদ্যোগী ও চরম সাহসী পুরুষ এগিয়ে এসে প্রচুর ঝুঁকি স্কন্ধে নিয়ে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছিল বলেই বিপ্লব সাধিত হতে পেরেছিল। টাকা পয়সা অর্জনের উচ্চাশায় মদমত্ত হয়ে তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল। তাই, অগ্রগতি বেগবান হয়ে উঠেছিল। অন্যথায় তেমনটা হওয়া সম্ভব ছিল না। এবং বৃহদাকার ব্যক্তিগত মালি-কানাও হয়ত বাস্তব রূপ লাভ করতে পারত না।

ধনবিজ্ঞানী উদ্যোক্তাশ্রেণীর উদ্ভবের কারণ খুঁজে বেড়ান। তেমনি মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানীও। কি হেতু ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়? কোথায় তার মূল নিহিত? কতক লোক কেন ঝুঁকি মাথায় নিতে উদগ্রীব? কেনইবা তারা টাকা-পয়সার মোহে লালায়িত? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকেরও জিজ্ঞাস্য।

---

১৭. দেখুন W. Sombart-এর "Economic Theory and Economic History, "Economic History Review II, No. I, 1-19, (Jan, 1929).

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে বাণিজ্যিক এই দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে প্রোটেস্টান্টিস্‌ম্ থেকে।[১৮] তিনি বলেন, ধর্মীয় এই 'ইস্‌ম্' বিশেষ করে ক্যালভিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ধনতান্ত্রিক বিকাশে অনুকূল শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। তেমনটা আর অন্য কোন বিশ্বাস ক্রিয়া করতে পারেনি। তিনি আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির যে ঢেউ নেমেছিল তা পিউরিটানিস্‌ম্ তথা 'বিশুদ্ধি অভিযান' উৎসারিত। প্রোটেস্টান্‌ট্ ধর্মমতে এই ধরায় সুকাজ মাধ্যমে স্রষ্টার কীর্তন ছিল মানব সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য। ধনলাভ কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়, তা মানবসমাজের করণীয় কর্তব্য। তা তার স্ববিকাশের পরিপক্ষে। উৎপাদন, উদ্যোগ, প্রকৃতিকে জয় ও মিতব্যয়িতা উচ্চতর মহৎ গুণ। ক্যালভিনীয় মতাদর্শীর চোখে বাণিজ্য ও ধর্মে ভেদাভেদ নেই। তা একে অন্যের সম্পূরক ও পরিপূরক। জন্ম নিয়ে, ভাগ্যের কপালে হাত রেখে বসে থাকলে চলবে না। স্বনির্বাচিত এই কাঁটা জয় করতে হবে। নিজকে উন্নীত করতে হবে উচ্চতর পর্যায়ে এবং তার জন্য কর্তব্য সাধন করতে হবে ধর্মীয় আবেগ নিয়ে। নিয়তি নির্ধারিত ক্যালভিনীয়-তত্ত্ব সবার মধ্যে ধর্মীয় চেতনা এনে দিয়েছিল এমনভাবে যে, অধ্যাবসায়ী বাণিজ্যিক স্বার্থকতা লাভে সবায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কেননা, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কর্ম ও সুশৃঙ্খল জীবন-প্রণালী দিয়ে উচ্চতর শ্রেণীর মানমর্যাদা নির্ণীত হয়। ব্যর্থকাম পুরুষ চিহ্নিত হয় ইতরস্তর রূপে।

আরও বহু লেখক ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও ধর্ম-চেতনায় নিকটতর সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন।[১৯] ভিন্নমতাবলম্বী, স্কট ও ইহুদী সম্প্রাদায়ভুক্ত লোকেরা বৃটেনের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের এই বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণ হিসাবে হয়ত অনেক কিছু উল্লেখ করা যায়। তবে আসল

---

১৮. দেখুন—প্রাগুক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম ভাগ। আরও দেখা যেতে পারেন Max Weber প্রণীত General Economic History, The Free Press, Glencoe 1950, 366-369,

১৯. দেখুন যথা—W. Sombart-এর The Quintessence of Capitalism, T. F. Unwin Ltd., London, 1915, 287-290 ; T. S. Ashton -এর Iron and Steel in the Industrial Revolution, Longmans Green and Co., London, 1924, 211-226 ; E. D. Bebb, Nonconformity and Social and Economic Life, 1660-1800,

কথা হচ্ছে যে, উদ্যোক্তাশ্রেণীর বিরাট একটা অংশ এসেছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে যারা মূলতঃ ছিল ভিন্নমতাবলম্বী।

উদ্যোক্তাশ্রেণীর তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নয়। তারা সংখ্যায় ছিল প্রচুর। তাদের ক্রিয়া কর্ম ছিল ব্যাপক। কেউ হয়ত নূতন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিল। কেউ হয়ত নবজাত দ্রব্য সৃষ্টি করেছিল। আবার কেউ হয়ত ভিন্ন প্রকৃতিব শিল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। তারা এসেছিল সমাজের সর্বস্তব থেকে। তবে সবায় মিলে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আকৃতিতে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল। তারা উদ্ভাবন-সম্ভাবনা এবং ঔজ্জ্বল্য চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল। দুর্লঙঘনীয় বাধা অতিক্রমণে বদ্ধপরিকর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বার্থকতার প্রতীকরূপে মেনে নিযেছিল। উদ্যোগজনিত ক্রিয়া কর্মের ফলপ্রসূত মুনাফা দিয়ে মানমর্যাদার মই ডিঙ্গাতে সচেষ্ট হয়েছিল। আপন বলিষ্ঠতা স্বপ্রমাণে প্রয়াস পেয়েছিল।[২০] শিল্প-বিপ্লব সাধনকারী বড় বড় হোতারা বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপক হিসাবে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা একাই একশ রূপে প্রতিপন্ন হতে পেরেছিল। একাধারে পুঁজি-পতি, কার্যনির্বাহক, বণিক ও বিক্রয়িক (Salesman) হিসাবে ক্রিয়া করতে সক্ষম হযেছিল। এক কথায় "নবতর প্রকৃতির পূর্ণ ব্যবসায়ী"-রূপে প্রতিপন্ন হতে পেরেছিল।[২১] অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলা যায় যে, এই উদ্যোক্তাদল এমন গুণের অধিকারী ছিল যা দিয়ে তারা সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং তা বাস্তবায়িত করার মত ক্ষমতাধারী ছিল।[২২] ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যেক্তার কাজ হচ্ছে নিপুণতা অর্জন আর

The Epworth Press, London, 1935, W. J. Warver কৃত The Wesleyan Movement in the Industrial Revolution, Longmans Green and Co., London, 1930; A. Raistrick প্রণীত Quakers in Science and Industry, Bannisdale Press, London, 1950.

২০. দেখুন Charles Wilson-এর "The Entrepreneur in the Industrial Revolution in Britain, Explorations in Entrepreneurial History, VII, No. 3, 132 (Feb. 1955).

২১. Mantoux-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৩৮২।

২২. Wilson-এর উপরোক্ত বই, পৃঃ ১৩২।

তা অর্জনে তার হাতিয়ার হচ্ছে সুশৃঙ্খল নীতি অনুসরণ ও চিন্তামাফিক কর্ম সম্পন্ন করা। আজকের পরিবেশে হয়ত তা তেমন বৃহৎ বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ী গুণ-সম্পন্ন এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব খুব বড় বেশী একটা দেখা যায় না।[২৩]

কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের প্রচুর সমাবেশ ঘটেছিল। ফলে উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য তা হয়ে উঠেছিল লক্ষ্মীর বরপুত্রস্বরূপ। তারা সংখ্যায় যেমন ছিল বহু, তেমনি শ্রেণী-সচেতনতায় ছিল সচেতন। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে ছিল সংঘবদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে নেমেই তাদেরকে মুখাপেক্ষী করতে হয়েছিল ভূস্বামীদের সাথে। তা অর্থ-নৈতিক অঙ্গনে যেমন, তেমনি রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনেও। ক্রমে ক্রমে তারা প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়ে উঠেছিল। পরিবেশ তাদের অনুকূল ক্রিয়া করে। কৃষি-জগতের ধরা-বাধা আচার-প্রথার দেওয়ালে ফাটল ধরে অচিরে ঋজুবদ্ধতা কেটে যায়। সমাজের চোখে ব্যবসায়িক স্বার্থকতা মানমর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী গণ্যমান্য হিসাবে পরি-গণিত হয়।

সুতরাং, শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার কাহিনী বেশ কিছুটা উদ্ভাবনী দৃষ্টি-সম্পন্ন উদ্যোক্তাশ্রেণীর চারিত্রিক আচরণ দিয়ে বর্ণনা করা যায়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত উদ্যোক্তার সংখ্যা ও প্রযু-ক্তিক জ্ঞানের বলেই কেবল উদ্ভাবনী-ক্রিয়া এগোয়নি। তার সাথে অন্যান্য শর্ত জড়িত হয়েছিল। বিশেষ করে উদ্ভাবনী কর্মে প্রয়ো-জনীয় টাকা-পয়সা যোগানো। টাকা-পয়সা জড়ো করার উপযুক্ত ক্ষমতা উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়াকে বেগবান করায় প্রচুর সহায়তা করেছিল। পরবর্তী ভাগে তা বিশেষভাবে আলোচিত হবে। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে "আবিষ্কারে বিজ্ঞান মা হলে টাকা-পয়সা অবশ্যই বাবা।"[২৪]

উদ্ভাবন-কর্মের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, তা উপাদান অনুপাত সংমিশ্রণে পরিবর্তন ঘটায়। উদ্ভাবন মূলধন সঙ্কোচনকারী হলে মূলধনের

---

২৩. দেখুন E. H. Phelps Brown কৃত Economic Growth and Human Welfare, Ranjit Printers & Publishers, Delhi, 1953, পৃঃ ১২।

২৪. দেখুন T. H. Marshall-এর James Wall, Small, Maynard & Co., Boston, 1925, পৃঃ ৮৪।

তুলনায় শ্রমের ব্যবহার অধিক হয়। বিপরীতক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ বেশী হয়। শিল্পবিপ্লবকালে বাণিজ্যচক্রের উর্ধ্বগতি মোড়ে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার অর্থাৎ মূলধন অধিক ব্যবহারকারী উদ্ভাবনের উদ্ভব ঘটেছিল। শ্রম-ব্যয় অধিকহেতু এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। মন্দাকালে বিপরীত প্রবণতা জন্ম নিয়েছিল। কেননা তদ্দিনে শ্রম-প্রাচুর্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘসূত্রী বিবেচনায় অবশ্য উদ্ভাবন-প্রক্রিয়া অধিক পুঁজিভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। কারণ তুলনামূলকভাবে শ্রমের অপ্রতুলতা বিরাজমান ছিল। কাজেই শ্রম-ব্যয়ে সঙ্কোচ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল। প্রায় সর্বত্র পুঁজি-সহগ বেড়ে গিয়েছিল। ফলে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বেড়ে গিয়েছিল তা না হলে লোক সংখ্যার চাপ-বর্ধন অগ্রগতিতে সীমা টেনে দিত। যেমনটা রিকার্ডো ভেবেছিলেন।

আঙ্গিকগত সংযোজন হেতু উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ফলাফল হিসাবে তা চিহ্নিত করা যায়। এই প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদ্যোক্তা তার দিব্যজ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেই উদ্ভাবন কাজে মনোনিবেশ করত। নূতন সংযোগ সাধনে প্রয়াসী হত। তাতে যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেত, তাতে করে সমপরিমাণ ফল পাওয়া যেত। অথচ উপাদান লাগত কম। এই উদ্বৃত্ত উপাদান দিয়ে উৎপাদন পরিমাণ বাড়ানো যেত, না হয় নূতন দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হত।[২৫] সে যাই হউক, বোঝা যাচ্ছে নূতন উদ্ভাবনী ক্রিয়ার ফলে প্রকৃত আয় বেড়ে যেত। উপাদান সামগ্রী অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যেত।

শিল্প-উদ্ভাবন ব্যয়সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণেরও জন্ম দিয়েছিল। প্রযুক্তিক অগ্রগতির ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যেত। তার ফলে

২৫. চরমক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা না হওয়ারই কথা। চাহিদা নমনীয়তা তথা স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের কোঠায় হলে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার ফলে তৈরীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়তে পারে না। অর্থাৎ যে শিল্পে নব উদ্ভাবন ঘটল, সেই শিল্পে উৎপাদন সম্প্রসারিত হতে পারে না। সেই শিল্প উৎসারিত দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা একক অপেক্ষা ন্যূন হলে অন্যান্য শিল্পে সম্প্রসারণ ঘটবে। একক অপেক্ষা অধিক হলে অন্যত্র প্রসার ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে, তা নির্ভর করে উদ্ভাবনশীল শিল্পে ক্রমবর্ধমান রীতির কার্যকারীতা ও অন্যান্য শিল্পে ক্রমহ্রাসমান নীতির মাত্রানুসারে। দেখুন, যথা, N. Kaldor-এর "A Case Against Technical Progress ?" Economica, XII, No. 36, 186-189 (May, 1932).

প্রায়শঃ উৎপাদিত দ্রব্যের দরে হ্রাস ঘটত। দরে এই পড়তি হেতু অন্যান্য শিল্পও লাভবান হত, বিশেষ করে যে সব শিল্প উদ্ভাবনশীল শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য উপাদান হিসাবে নিয়োগ করে।

উৎপাদন আঙ্গিকে উন্নতি হেতু অপর উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখা দিয়েছিল শিল্প-সংস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন। বস্তুতঃ শিল্প-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছিল। ব্যাপক হারে উন্নতমানের দ্রব্যাদি উৎপাদিত হওয়ার ফলে ছোটখাট কুটির শিল্পসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। পারিবারিক পরিবেশে উৎপাদন লোপ পায়। তার স্থলে কারখানা শিল্প গড়ে উঠে। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিক সুবিধাদি পুরোপুরী ভোগের নিমিত্তে শিল্প-সংস্থা বড় করে তোলা হয়। শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা হয়। তার ফলে যান্ত্রিকতা আরও প্রসার লাভ করে। শিল্প-ব্যবস্থায় অধিকতর সংহতি ঘটে। একে অন্যের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়ে আনুসঙ্গিক সমস্ত প্রক্রিয়ায় অধিকতর সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে। শ্রম-বিভাগ মাত্রার দিক থেকে অধিক হয়। প্রগতি-প্রক্রিয়ার এই সার্বিক অগ্রগতিকে সাধারণতঃ মোটা কথায় "কারখানা পন্থার উদ্ভব" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ নাগাদ শিল্প-ব্যবস্থায় এই ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। কারখানাশিল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে নাগরিক জীবন গড়ে উঠে। শ্রম-সঞ্চালন দ্রুততর হতে থাকে। এদিকে ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতা ও নাগরিকতা ঐতিহ্যগত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে চলে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সম্পর্কে তিক্ত-বিরক্ততা বাড়তে থাকে। শ্রমিক ব্যাপক হারে যন্ত্রায়ণে বাধা দান করে। সদ্য প্রচলিত কারখানা-নিয়ম-তান্ত্রিকতা গ্রহণে তার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই প্রতিবন্ধকতা বেশ শক্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। কারখানা-শিল্পে অধিক মজুরী দেয়া হত। কিন্তু, তা সত্ত্বেও শ্রমিকগোষ্ঠী কারখানা-সম্প্রসারণে রাজী ছিল না, যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে ঘোর বিপত্তি বাধাত, এমনকি সময় সময় কাটাকাটি, ফাটাফাটি পর্যন্ত ঘটে যেত। উনবিংশ শতাব্দীর সেই গোড়ামীপন্থী সমাজ-ব্যবস্থা একদিকে, অন্যদিকে কারখানা মালিকদের অসহিষ্ণু ও উন্নতনাসা মনোভাব অসহনীয় বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছিল। শ্রমিক-নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে অমানুষিকতার পর্যায়ে নেমে এসেছিল।[২৬] অন্ততঃ তৎকালীন অর্থনৈতিক

২৬. উদাহরণস্বরূপ J. L. Hammond ও Barbara Hamamond রচিত The Town Labourer, Longmans, Green & Co., London,

ও সামাজিক ইতিহাস তাই বলে। অবশ্য পরবর্তীকালে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে বহু ঐতিহাসিক মত ব্যক্ত করেছেন যে, উপরোক্ত চিত্র বহুলাংশে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করা হয়েছিল।[২৭]

সে যাই হউক, প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি ও বিক্ষোভ যে দেখা দিয়েছিল সেই সম্পর্কে দ্বিমত নেই। শ্রমিকগণ কারখানায় ঢুকতে তেমন রাজী ছিল না। কাজেই, মালিকপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। কৃষি-খামার ও চারু-কারু শিল্প থেকে শ্রমিক ও কারিগর উঠিয়ে আনা যথেষ্ট কষ্টকর হিসাবে পতিপন্ন হযে উঠেছিল। সহজে কেউ আসতে চায়নি। আস্তে আস্তে বহু দিনের চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা চরমে উঠেছিল। অবশ্য মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে বৃটিশ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এই সকল অস্থিরতা হজম করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।[২৮] আস্তে আস্তে প্রতিবন্ধকতা কেটে গিয়েছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়ে উঠেছিল। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছিল। শ্রমিক সংঘ জন্ম নিয়ে চলেছিল। শ্রমিক-আইন প্রণীত হয়ে উঠেছিল। সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছিল।

উপরে যা বর্ণিত হল তার থেকে যেন এই মনে করা না হয় যে, বড় বড় শিল্প-কারখানা জন্ম নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়েছিল। হাঁ, তাদের প্রাধান্য বেড়ে চলেছিল বটে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধিও তারা একেবারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারেনি। বহু আবিষ্কার ছোটখাট আকৃতির ছিল। হয়ত নামমাত্র হাতিয়ার যা হাত দিয়ে চালনা করা যেত। কাজেই পারিবারিক পরিবেশে এগুলো কাজে লাগাতে বেগ পেতে হত না। সুতরাং, বড় বড় শিল্প–

1917 এবং J. L. Hammond প্রণীত "The Industrial Revolution and Discontent," Economic History Review, II, No. 2, 215-228 (Jan. 1930) দেখুন, Mantoux-এর প্রাগুক্ত বইও দেখা যেতে পারে, পৃঃ ৪০৯-৪৫০.

২৭. দেখুন F. A. Hayek সম্পাদিত Capitalism and the Historians, University of Chicago Press, Chicago, 1954.

২৮. দেখুন W. Woodruff-এর "Capitalism and the Historians," Journal of Economic History XVI, No. I, 1-17 (March, 1956).

কারখানার পাশাপাশি পরিবারভিত্তিক শিল্পগুলোও এগিয়ে চলেছিল। আস্তে আস্তে সেই সব লোপ পেয়ে চলেছিল। অবশেষে শক্তিচালিত যন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, তবে পরিবারভিত্তিক শিল্পসংস্থাসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে এমনটা হয়। কেননা, তক্ষণে কারখানাভিত্তিক শিল্প ব্যতিত অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব ছিল না। হয়ত টিকে থাকাই মুশকিল ছিল। নব নব আঙ্গিক-প্রক্রিয়া জন্ম নিয়ে একে একে বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, তেতো মদশিল্প, মৃৎশিল্প, ও কয়লা-শিল্প করায়ত্ত করে নিয়েছিল। যেই বস্ত্রশিল্পে ১৮৩০ সালেও হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা শক্তিচালিত তাঁত অপেক্ষা চারগুণেরও অধিক ছিল। ১৮৫০ সালে এসে সেই বস্ত্রশিল্প পুরোপুরী যন্ত্রায়িত হয়ে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক চাপে পরে তাঁতশিল্পীরা ১৮৩০ সালোত্তর কালে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সে যাই হউক, মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল নাগাদও বহু শিল্প গৃহভিত্তিক ছিল। ১৮৫১ সালের এক হিসাব মতে দেখা যায় যে, এক শতাংশেরও কম মিল-মালিক তাদের প্রতিষ্ঠানে শতাধিক শ্রমিক নিয়োগ করত। শিল্পজগতে অভাবনীয় উদ্ভাবনের ফলে রূপান্তর শুরু হয়েছিল। ছোটখাট কারিগরদের হস্তচালিত ক্রিয়াকর্ম প্রথমে জল-তাড়িত যন্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে পরে বাষ্পীয় যন্ত্রে অন্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ধাতব শিল্প এই নিমজ্জন ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল নাগাদও উভয়রূপ শিল্প-ব্যবস্থা পাশাপাশি চলছিল। অতঃপর বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান পুরোপুরী প্রাধান্য পেয়েছিল।

৩. মূলধন-সংগঠন

মূলধন-সংগঠনের নির্ভরশীল তথ্য তেমন একটা পাওয়া যায় না। মূলধন-গঠনের হার সম্পর্কে তথ্যবহুল হিসাবের অপ্রতুলতা সবার চোখে পড়ে। তবে পরোক্ষ হিসাব মতে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ঘরবাড়ী নির্মাণে, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে ও উৎ-পাদনের নিমিত্তে যন্ত্রপাতি স্থাপনে প্রচুর বিনিয়োগ ঘটেছিল। এই সব সম্প্রসারণের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শিল্প-উৎপাদন প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। যান-বাহন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শিল্প-কেন্দ্রীকরণ জোরাল হয়েছিল। পরিণামে বাসস্থান শিল্পে আরও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। জন-কল্যাণমূলক কাজ বেড়ে গিয়েছিল।

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি তত্ত্বে মূলধন-সংগঠনের উপর জোর আরোপ করা হয়েছে। প্রগতি-প্রক্রিয়ার সংবিধানে গোড়ার কথা মূলধন-সংগঠন বলে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং, এক্ষণে যাঁচাই করে দেখা প্রয়োজন, ঐসব শর্তাবলী যেগুলো বৃটেনের পুঁজি সামগ্রী সংগঠনে সহায়ক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করেছিল। কিভাবে ঐসব শক্তিনিচয় পুঁজিসামগ্রীতে তেজীভাব জন্ম দিয়ে শিল্প-বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিল? অর্থ-সামগ্রীতে অবশ্যই সংযোজন ঘটেছিল। সম্পদাদি অবশ্যই বেড়ে গিয়েছিল, প্রকৃত হারে। তার ফলেই পুঁজি-সংগঠন সম্ভব হয়েছিল। বিনিয়োগ-স্পৃহাও অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এই সকল শক্তিনিচয় একত্রিত হয়ে তবে পুঁজি-সংগঠনের উভয় দিক তথা সরবরাহ ও চাহিদা জোরদার করে তুলেছিল।

জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার ঊর্ধ্বে অবস্থিত অর্থনীতির সবটাই ভক্ষণ হয়ে যায় না। কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকে। বৃটিশ অর্থনীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বহু আগেই জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে পুঁজিসামগ্রী জন্ম দেয়ার মত উপাদান সামগ্রী ক্রমহারে প্রসারিত হয়ে চলেছিল।

অর্থসামগ্রীতেও (finance) সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল। হ্যামিলটন মন্তব্য করেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুনাফা-মুদ্রাস্ফীতি বিনিয়োগ-ব্যয়বরাদ্দ সুসাধ্য করে দিয়েছিল।[২৯] ১৭৫০-১৮০০ সময়-কালের দর ও মজুরী মাত্রায় পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, জবরদস্তিমূলক সঞ্চয়ের ফলে পুঁজি-সংগঠন সহজ হয়েছিল। মুদ্রামজুরী ও ক্রমবর্ধমান দরমাত্রায় বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে এই জবরদস্তিমূলক সঞ্চয় জন্ম নিয়েছিল। এই সঞ্চয় দিয়ে নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে বৈষম্য-ফাঁক আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। যা শিল্প-ক্ষেত্রে অন্তরিত হয়ে কারখানা-শিল্প আরও বিস্তৃত করে তুলেছিল।

কথা ঠিক যে, হ্যামিলটন বিষয়টা একটু বেশী রঙ-চঙ দিয়ে ফেলেছেন। একটু বাড়িয়ে-বতিয়ে বলেছেন। কেননা, অন্য আরো বহু দেশেও মুনাফা-

২৯. দেখুন : Earl J. Hamilton-এর "Profit Inflation and the Industrial Revolution, 1751-1800," Quarterly Journal of Economics, LVI, No. 2, 256-273 (Feb. 1942) এবং "Prices and Progress," Journal of Economic History, XII, No. 4, 325-349 (Fall 1952).

মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছে। কিন্তু, শিল্পায়ন ঘটেনি, তা ছাড়া, সব ঘটনা মিলিয়ে দেখলে কি প্রাসাংগিক উপাত্ত সব একত্র করে ব্যাখ্যা দিলে হয়ত দেখা যাবে যে, প্রকৃত মজুরী তেমন একটা সরাসরিভাবে পড়ে যায়নি যেমনটা হ্যামিলটন ভেবেছেন।[৩০] তাঁর যুক্তি-তর্কেও যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। দাম-দর নিয়ে তাঁর যে আলোচনা তা বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। পড়তি মজুরী অথচ কার্যকরী চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণ—এমনটা কি করে হয়? হ্যামিলটন তা উদ্ভাসিত করেননি। অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত হলেই লগ্নীকাজ যথেষ্ট হবে এমন কথা নেই, তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিমাণ বাজার-চাহিদা। অথচ হ্যামিলটনের আলোচনায় এই সবের সুষ্ঠু বিকাশ দেখা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর বিশ্লেষণ বর্তমান দুনিয়ার ধ্যান-ধারণার সাথে তেমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্পে নিয়োজিত অর্থ এসেছে আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে। বাহ্যিক সূত্র তেমনটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও স্টক বাজার এই অর্থ যুগিয়েছে। টাকা পয়সা ওয়ালা লোক অধিকাংশ ছিল ভূ-স্বামী। বিত্তবান এই সব লোক আয় পেত বাড়ী ভাড়া থেকে। ব্যবসা বাণিজ্যে স্বার্থক, তা দেশে কি বিদেশে, ব্যবসায়ীশ্রেণীও কিছুটা যোগাত। মূলধনী-বাজার বড় একটা ছিল না। বড় বড় ভূম্যাধিপতি, সওদাগরশ্রেণী ও শিল্পপতিরা নিজস্ব সঞ্চয়, তার সাথে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া ধার নিয়ে, যেন-তেন-প্রকারের একটা প্রকল্প শুরু করে দিত। কাজেই, সেকালে শিল্প স্থাপনে পুঁজি এসেছিল ব্যক্তিবিশেষের পকেট থেকে। বড়জোর অংশীদারিত্ব প্রয়াস থেকে।[৩১] উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধি এই ধারা অব্যাহত থাকে। সেই সময়ে এসে বাহ্যিক সূত্র প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ঋণ-পত্র (Securities) মাধ্যমে বিদেশী পুঁজি আসতে শুরু করে। ১৮৫৫ সালে কোম্পানী আইনে সংশোধন ঘটিয়ে কোম্পানীতে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের নীতি গৃহীত হয়। তারপর হতে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর পদযাত্রা শুরু হয়। অচিরে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার

৩০. ৯ নম্বর ফুটনোটে প্রদত্ত বইগুলো দেখুন।

৩১ দেখুন, যথা : **T. S. Ashton-এর An Eighteenth Century Industrialist, University of Manchester Press, Manchester,**

ঘটে।[৩২] কিন্তু, তখনো মূলধনী বাজার সুসংবদ্ধ হয়নি। কাজেই, অর্থ-সামগ্রী সংগৃহিত হয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে এবং অর্জিত মুনার পুনর্বিনিয়োগ দিয়ে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও বহির্জগতের পুঁজি আকর্ষণে তেমন সক্ষম হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা-বাজার সরকারী আদান-প্রদানের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত ছিল। শিল্পোদ্যোগে টাকা খাটাবার মত সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনটাই তেমন ছিল না। জমিদার শ্রেণী অবশ্য বেশ কিছুটা ঋণ ব্যাঙ্ক থেকে পেত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। তারা ধার গ্রহণ করে জমির উন্নতিতে ব্যয় করত। রাস্তা-ঘাট নির্মাণে প্রয়াসী হত। খাল-বিল কর্তনে উদ্যোগী হত। তাতে করে কৃষি-ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। যানবাহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সবল হয়। তার ফলে শিল্পায়ন প্রচেষ্টা সুগম হয়। সুতরাং শিল্পোন্নতিতে জমিদার শ্রেণীর অবদান নেহায়েত নগণ্য নয়।[৩৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে বেসরকারী ব্যাঙ্কিংয়ে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এক হিসাব মতে ১৭৬০ সালে লণ্ডনে বেসরকারী ব্যাঙ্কিং প্রতি-ষ্ঠান ছিল ৩২টি। তা বেড়ে ১৭৮৬ সালে দাঁড়ায় ৫২টিতে।[৩৪] লণ্ডনের বাইরে

1939, 116 : Iron and Steel, op.cit., 46-48 ; L.H. Jenks-এর The Migration of British Capital to 1875, A. A. Knopf, New York, 1927, 15; B.F. Hoselitz প্রণীত "Entrepreneurship and Capital Formation in France and Britain Since 1700," in National Bureau of Economic Research, Capital Formation and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton, 1955, 320-325.

৩২ দেখুন G. Todd-এর "Same Aspects of Joint Stock Companies 1844-1900," Economic History Review, IV, No. 1, 46-71 (Oct. 1932).

৩৩. দেখুন যথা—H. J. Habakkuk-এর Economic Functions of British Landowners in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, "Explorations in Enterpreneurical History, VI, No. 2, 92-101 (Dec. 1953).

৩৪. আলোচনা করুন D. M. Joslin-এর "London Private Bankers 1720-1785," Economic History. Review, VII, No. 1, 173 (Aug, 1954).

ছিল মাত্র ১২টি ব্যাঙ্ক। ১৮০০ সাল নাগাদ তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০-র উপরে। এরা সবায় মুদ্রা ছাপাত।[৩৫] ১৮২৬ সালে আইন পাশ হয়। তখন থেকে মুদ্রা–ইস্যুকারী জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কের উদ্ভব ঘটে। তার ফলে কৃষিখাত থেকে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় শিল্পখাতে নিয়ে আসা সহজ হয়। ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট প্রথা প্রচলিত হয়। ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট সাধারণতঃ চলতি-পুঁজি যোগাত। বদ্ধমূলধন কিন্তু আসত ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে ও পুনর্বিনিয়োজিত মুনাফা থেকে। ক্লাফাম লণ্ডনস্থ মুদ্রা বাজারের সংক্ষিপ্তি দিয়েছেন, "চলতি মূলধনের যোগানদার ও ব্যয়-সংকোচকারী হিসাবে।........সওদাগরশ্রেণী কেবল তার দ্বারস্থ ছিল। কেননা বাণিজ্যে চলতি পুঁজি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদকশ্রেণী তাকে নিয়ে তেমন উৎসাহী ছিল না। ....আঞ্চলিক ব্যাঙ্কার তার চেনা-জানা লোককে সাহায্য করত। তাকে যথেচ্ছা টাকা যোগাতে দ্বিধা করত না। কিন্তু, যন্ত্রপাতি, কার-খানা ইত্যাদি গচ্ছিত রেখে আগাম দিতে সেও দ্বিধা করত। ১৮৫০ সাল অবধি শিল্পকাজে বদ্ধ-পুঁজি এসেছে তৎকালীন ধন-বিজ্ঞানীর ভাষায় যারা যক্ষ বলে পরিচিত ছিল, তাদের কাছ থেকে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ উৎপাদক তথা আঞ্চলিক ব্যাঙ্কারের বিশ্বাসভাজন এই সব লোকের আপাতঃদৃষ্টিকটু কৃপণ-দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্জাত সঞ্চয় শিল্পজগতে বদ্ধ-পুঁজি যেমন যুগিয়েছে তেমনি পরবর্তী ৩৬ বৎসর নাগাদ সংযোজন ও নূতনকরণ সম্ভব করে তুলেছে।"[৩৬]

সুতরাং, উদ্ভাবনী কাজে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ এসেছে বহু সূত্র থেকে। বহু উদ্যোগ ব্যক্তিগত সঞ্চয় দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে। যেমন Rotherham-এ অবস্থিত ও ১৭৪০ দশকে পরিবর্ধিত Walkers-এর বিরাট লৌহ ব্যবসা সঞ্চিত আয়ের পুনর্নিয়োজন দ্বারা ফেঁপেফুলে উঠেছিল। ১৮৮০ দশকে Lever-এর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় £ ৫০,০০০ পাউণ্ড, অথচ জীবন-ধারণে

৩৫. দেখুন A. Andreanes প্রণীত History of the Bank of England, P. S. King and Son, London, 1909, 171. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন A.E. 'Feaveryear-এর The Pound Sterling, Oxford University Press, Oxford, 1931. W. F. Crick J. E. Wordsworth-এর A 100 Years of Joint Stock Banking, Hodder and Stronghton, London. 1936.

৩৬. দেখুন J. H. Clapham-এর An Economic History of Modern Britain, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1932, 355-356.

ব্যয় করত মাত্র 800 পাউণ্ড। বাকী সবটা স্বীয় সাধারণ শেয়ারে লগ্নী করত। বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণ পাওয়া যেত ব্যাঙ্ক থেকে। কেবল-মাত্র বড় বড় সংস্থাসমূহ যেমন টোল আদায়কারী বৃহৎ সড়ক সংস্থা, খাল-বিল প্রতিষ্ঠান, পোতাশ্রয় ইত্যাদি জন-মালিকানায় ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, জাতীয় মুদ্রা-বাজার থেকে পুঁজি পেত। বাকীসব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল।[৩৭]

মূলধন-সংগঠনের চাহিদার দিক হচ্ছে বিনিয়োগ অনুপ্রেরণা, এই সম্পর্কে বেশ কিছুটা আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক-সমূহ বিবৃত করা কালে উদ্ভাবন-প্রণালী গ্রহণ প্রসঙ্গে। মূলধন-সংগঠনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি উত্তেজক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। কেইনস্ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, ১৮৬০—১৯১৩ পর্যান কালে সঞ্চিত মূলধনের প্রায় অর্ধেকের অধিক ব্যায়িত হয়েছিল কেবল মাথাপিছু আয় বজায় রাখতে।[৩৮] প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। পেটেণ্ট সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ জোরদার হয়েছিল। পেটেণ্ট সংখ্যার উঠানামার বাণিজ্য ও শিল্প কার্যকালাপে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছিল। পেটেন্ট সংখ্যার সর্বোচচ মাত্রায় দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর সম্প্রসারণ তাল রেখে এগিয়েছিল।[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনার আলোতে অবশ্যই মন্তব্য করা চলে যে, পুঁজি-সামগ্রীর পরিমাণ বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল। একথাও ঘোষণা করা যায় যে, মূলধনী বাজারের চাহিদামাত্রা সরবরাহ দিক নয়, মূলধন-সংগঠনে বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নত দেশগুলোতে টাকাপয়সা সরবরাহের সমস্যা তেমন একটা মারাত্মক কিছু ছিল না। সব সময়েই চাহিদানুযায়ী সরবরাহ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য তজ্জন্য মুদ্রা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে

৩৭. Wilson-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৩৯।

৩৮. দেখুন J. M. Keynes-এর "Some Economic Consequences of a Declining Population," Eugenics Review, XXIX, No. 1 (April, 1937).

৩৯. দেখুন A. D. Gayer, W. W. Rostow ও A. A. Schawartz প্রণীত The Growth and Fluctuations of the British Economy, 1790-1850, Clarendon Press, Oxford, 1953, 1. XI.

হয়েছিল। তাই শ্রীমতি রবিনশন বলেন, "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়"। উদ্যোগ দেখা দিলে টাকা-পয়সা তার সাথে সাথে যোগার হয়ে যায়। যে শক্তি উদ্যোগী ব্যবসার জন্য দেয়, সেই একই শক্তি বিত্তবান লোক-দেরকে দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করে। বিনিয়োগ কাজে অদম্য-স্পৃহা টাকা-পয়সার অভাবে আটকে থাকে না। বাঁধা অপসারিত হয়ে যায়। উপায় বেড়িয়ে পড়ে (জয়েন্ট স্টক কোম্পানী চালু হওয়া প্রযুক্তিক বিপ্লবের নামান্তর, যা বাষ্পীয়-যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে তুলনীয়)। আচরণ-প্রথা তখৈবচ হয়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানাদি গজিয়ে উঠে (ইংল্যাণ্ডে শিল্পোদ্যোগে ব্যাঙ্কের অংশগ্রহণ নিয়ে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাধতে পেরেছিল। কেননা সেখানে অন্যান্য সূত্র থেকে টাকা-পয়সা পাওয়া যেত। কিন্তু, জার্মানীতে তেমনটা হয়নি। কেননা, সেখানে অন্যান্য সূত্র অকিঞ্চিতকর ছিল)।[৪০] মূলধন-সংগঠনে ক্রেডিট সম্প্রারণের অবদানও যথেষ্ট। তা অর্থ-সামগ্রীর অপ্রাচুর্যতা নিরসনে প্রচুর সহায়তা করে।

৪. মহা-প্রদর্শনী

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল। বৃটিশ বাণিজ্য ও শিল্প প্রাধান্য তখন মধ্য-গগনে। জনসংখ্যা বেড়ে, প্রযুক্তিক অগ্রগতি বলশালী হয়ে, উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়া দানা বেঁধে ও মূলধন-সংগঠন জোরদার হয়ে বৃটেনকে উন্নীত করেছে অর্থনৈতিক শ্রেষ্টত্বের সর্বোচ্চ মানে। মাথাপিছু আয়ে ব্যাপক বৃদ্ধি লাভ ঘটেছে। ১৮০০-১৮৫০ পর্যায়-কালে তা প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।[৪১] হিসাব তেমন নির্ভরশীল নয় বটে। নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ও তেমন বড় একটা নেই, তবু প্রাপ্ত হিসাব-নিকাশ মতে দেখা যায় দশক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণ ঘটেছে ১৮০০-১৮২২ সালে ৮ শতাংশ, ১৮১২-১৮৩১ কল্পে ৩৩ শতাংশ, ১৮২২-১৮৪৬ পর্যায়-কালে ১৩ শতাংশ এবং ১৮০০-১৮৪৬ কালে ১১ শতাংশ।

৪০. দেখুন Joan Robinson প্রণীত "The Generalization of the General Theory" in the Rate of Interest and other Essays, Macmillan and Co. Ltd., London, 1952, 86-87.

৪১ সাংপ্রতিককালে প্রদত্ত জাতীয় আয়ের ছয়টি ভিন্নমুখী হিসাব থেকে এই নিকাশ প্রদত্ত হল। দেখুন Phyllis Deane এর "Contemporary Estimates of National Income in the First Half of the Nineteenth Century," Economic History Review, VIII, No. 3, 353 (April, 1956).

এত প্রসার, এত প্রাচুর্য, ব্যাপক উন্নতি-অগ্রগতি। তার জন্য জয়-ঢক্কা চাই। বিশ্ব-অর্থনীতির শিরোমণি তখন বৃটিশ অর্থনীতি, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা জাহির করা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চাশা, আগামী-কালের অগ্রগতি সুনিশ্চিত—এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বপ্রমাণ আবশ্যক। তাই আয়োজন করা হয় মহা-প্রদর্শনী, ১৮৫১ সালে, লণ্ডনের হাইড্ পার্কে। অকল্পনীয় ও অবিস্মরণীয় সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয় অপরিমিত সম্পদ-ভাণ্ডার। প্রদর্শন করা হয় হাজার রকম যন্ত্রপাতি ও অন্তহীন দ্রব্য-সামগ্রী। খোলা হয় অসংখ্য স্টল ও বিপণীকেন্দ্র। বিদেশী বহু প্রতিষ্ঠান ও তাদের মালামাল প্রদর্শনীতে জড়ো করে। অতীতকে মেলে ধরা হয়। বর্তমানকে প্রমাণিত করা হয়। ভাবী-কালের দিক্‌নির্দেশ উন্মোচিত হয়।

শিল্প জগতের এই মহোৎসবের জন্য স্যার জোসেফ্ প্যাক্সটন গড়ে তোলেন স্থাপত্যবিদ্যার এক অনবদ্য অবদান—স্ফটিক প্রাসাদ। স্বচ্ছ কাঁচের বড় বড় চাঁদোয়ার আবরণে আচ্ছাদিত বাইশ একর জমির উপর এই হর্ম্য নির্মিত হয়। ছান্দিক কাব্যের বৈচিত্র্যে-বৈচিত্র্যময় এই প্রাসাদ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের চোখে সবিশেষ অর্থবহ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

"উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদনের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা। এই প্রাসাদে ব্যবহৃত সমগ্র উপকরণ আন্তঃপরিবর্তনশীল ছিল। কড়িকাঠ, স্তম্ভ, ছাদের নালী, শার্সি সব কিছু একই প্রকৃতির ছিল। তার ফলে হর্ম্যটির নির্মাণ কার্য সহজ হয়েছিল এবং দ্রুতগতিতে তা সম্পন্ন হতে পেরেছিল। সবাই দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। .. .. এমনকি পঞ্চাশ বৎসর আগেও এমন বৈচিত্র্যময় নির্মাণ কল্পনা করা যেত না। ১৮৫১ সালে যা ছিল বাস্তব সত্য, ১৮০১ সালে তা ছিল অকল্পনীয়। শিল্প-বিপ্লবজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি নির্মাণকারী দক্ষ কারিগরদের কর্ম-প্রচেষ্টার ফলেই ব্যাপক বিনিময় সম্ভব হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বোলটন, মৌডসালী, হোয়াইটওয়ার্থ ইত্যাদির নাম করা যায়। তাদের প্রচেষ্টার ফলে ব্যাপক আকারে সমমানের দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়। অবশ্য সুনিপুণ যন্ত্রাবলী এসেছিল অন্য সূত্র থেকে। এই সব যন্ত্রাদির কার্যাবলীর ফলে সংহতি বজায় সম্ভব হয়েছিল।"[৪২]

স্ফটিক প্রাসাদ স্থাপত্যকলায় এক নবযুগের জন্ম দেয়। তবে তার

---

৪২. দেখুন C. R. Fay রচিত Palace of Industry, 1851, Cambridge University Press, Cambridge, 1951; 15-16.

অভ্যন্তরস্থিত প্রদর্শনী ও প্রদর্শিত দ্রব্যাবলী আরও বৃহৎ যুগের সূচনা করে। শিল্প জগতে বৃটেনের যে অবদান তা এখানে প্রদর্শিত হয়। "বিশ্ব-কারখানার" সূতিকাগার বৃটিশ সাম্রাজ্যের কীর্তিস্তম্ভ এখানে উপস্থাপিত হয়। স্ফটিক-প্রাসাদের ভিতরে চলুন এক পাক্ ঘুরে আসা যাক। তবেই কিছুটা ধারণা করা যাবে।

প্রাসাদ-অভ্যন্তরে ঢুকে দেখতে পাই সর্বকালের বৃহত্তম কাঁচের পাত। নজরে আসে বিবিধ প্রকৃতির হাজারো ধাতবদ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী। সামনে পড়ে লিভারপুল পোতাঙ্গনের একটা ছাঁচ (বৃহত্তম ভোক্তা বৃটেন); রেলওয়ের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সমন্বিত ও ইঞ্জিনধারী বড় বড় যন্ত্রপাতি; সোহোর জেমস্ ওয়াই যেন সামনে দাঁড়িয়ে; ব্রিটানিয়ার নলযুক্ত সেতু উত্তোলনকারী ঔদক যন্ত্র (hydraulic press) মাথা উঁচিয়ে ... ... শিল্প জাত দ্রব্য ও হাতিয়ার সামগ্রী। জেমস্ ন্যাস্মীথের বাষ্পীয় হাতুড়ী আপনার নজরে পড়বেই। এত বড় অথচ কেমন যেন শান্ত। আরো এগিয়ে চলুন। এই যে সেতু আর বাতিঘর। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি ফেরান। জাহাজের ডক্ আর জলে ভাসার কটিবন্ধ। সামনে দেখুন, পড়ে আছে শিকারের নিমিত্তে হাজারো বন্দুক। ... ... এদিকে আসুন। এই যে কৃষি-যন্ত্রপাতি ... ... আর রয়েছে দার্শনিক (বৈজ্ঞানিক) কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। এই দেখুননা রস্ সাহেব কি সুন্দর তাঁব দূরবীক্ষণযন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরো আছে। এই যে ছবি তোলার নানারূপ যন্ত্রপাতি। আরে সাহেব, অপনি যে বড্ড মজার লোক! কোন্ যুগে বাস করেন তাও জানেন না! এযে বেলুনে চড়ে আকাশে উঠার যুগ। তাই দেখুন না, রকমারী কত বেলুন গাদা হয়ে আছে ... ...।

শিল্পকাজে ইংল্যাণ্ডের হাতে খড়ি বস্ত্রশিল্পে। কাজেই, বস্ত্রশিল্পের হাজারো নমুনা দেখবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! ইংলেণ্ডত টাকা বানিয়েছে কাপড় বুনেই। আজকে না হয় সে রেলপথ নির্মাণে অধিক মনোনিবেশ করেছে। সুতা কেটে সে কাপড় তৈরী করেছে। তারপর জুতা তৈরীতে প্রসার লাভ করেছে। চামড়া ব্যবসায় দু'পয়সা কামিয়েছে। হাড্সন বে কেম্পানীকে তাইত দেখছেন কেমন জাকিয়ে বসে আছে। আরে দেখুন, লোহার তৈরী কত হরেক যন্ত্রপাতি। কবজা, চুল্লী, তালা, চাবি আরও না কত কিছু......।

প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষদর্শী হতবাক হয়েছিলেন। স্ফটিক-প্রাসাদে প্রদর্শিত

যন্ত্রপাতির পাহাড় দেখে আমরাও কি আজ কম বিস্মিত হই।......যন্ত্রপাতির পাহাড় তোলা হয়েছিল দুই সারিতে। একদিকে গতিশীল যন্ত্রপাতি, অন্য দিকে স্তূপীকৃত যন্ত্রপাতি। সংখ্যায় তারা অন্তহীন। গুনে শুমার করা দায়।.........

উঃ, আপনাকে যে রাজকীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। উপ-নিবেশগুলো থেকে আগত দ্রব্যসামগ্রীও বুঝি দেখতে চান....। বেশী বলার সময় নেই বটে। সংক্ষেপে বলি শুনুন। মাত্র সাতটি বিভাগে তাদের মালামাল বিন্যাস করে রাখা হয়েছে।

সব ত দেখলেন। এবারে বলুন ইংল্যাণ্ড কি আর হেলাফেলার দেশ। ১৮৫০ এবং ১৮৬০ দশকের ইংলাণ্ডকে কি ছোট করে দেখতে পারেন? মোটেই না। হয়ত বলতে পারেন যে, এটা নেহায়েত পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। শুল্ক প্রাচীর না তুলেই ইংল্যাণ্ডের মত ছোট একটা দ্বীপ মাতবরী করে বেড়ায়। খুব হাত বেড়ে ঔপনিবেশিক দেশগুলোর দ্রব্য সামগ্রী জাক্ করে দেখায়। আরে বাবা। বেশী বড়াই ভাল নয়। অচিরেই ঔপনিবেশগুলোর আনুগত্য হারাতে হবে।

কিন্তু, মনে রাখবেন ইংল্যাণ্ড আপনার এই সব কথা মোটেই বিশ্বাস করে না। তার ধারণা, সে কলোনীগুলোকে সব যোগাতে পারে, তেমনি সারা বিশ্বকেও। সে তার দ্রব্য সামগ্রী ভোগ করতে বাধ্য করিয়েই ছাড়বে, চাই বিশ্ববাসী চাক্ বা না চাক্। তার হাতিয়ার অবাধ বাণিজ্য নীতি। অবাধ বাণিজ্য নীতির ঘোড়ায় চড়ে সে আরামসে সবাইকে তার দ্রব্য কিনতে বাধ্য করবে। কেননা, শিল্প বিপ্লবের সরবরাহ রূপ-লাগাম যে তার আয়ত্তাধীনে।[৪৩]

বাব্বারে বাবা, স্ফটিক-প্রাসাদের বিরাট বড় কাহিনী শোনা গেল। সে যাই হউক, যত বিরক্তই হয়ে থাকুন না কেন, আপনাকে কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বৃটেন শিল্প অগ্রগতিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বিদেশেও তার প্রচুর প্রসার হয়েছে। কাঁচের তৈরী প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে এই অভিজ্ঞতাটুকু, হে পর্যটক, আপনার অবশ্যই হয়েছে যে, বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বৃটেন অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অনেক দূর এগিয়ে রয়েছে এবং বিশ্বকে সে অনেক কিছু শেখাতে পারে। সেই তুলনায় বিদেশী যে সব প্রদর্শনী কেন্দ্র দেখলেন তা কিছুই নয়। শিল্পজাত

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০-৮৯।

দ্রব্য বড় একটা দেখা গেল না। তাদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য এত প্রকট তা কারো দৃষ্টি এড়ায় না। সুতরাং, হে পথিক, যদি বলি অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তারতম্যের দিক থেকে বৃটেন ও অন্যান্য দেশ সম্পূর্ণ দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত, তাহলে আপনার অবশ্যই আপত্তি করার কিছু নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধি বিশ্বে যে বৈষম্যমূলক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তার একটা উৎকৃষ্ট নমুনা আপনি দেখতে পেলেন। ভবিষ্যতের আভাস হিসাবে এই বিরাট মচ্ছব (মহোৎসব) সঙ্কেত দিয়ে গেল যে, শিল্পজ, খনিজ, ধাতব দ্রব্যের ভবিষ্যৎ আতীব উজ্জ্বল। মহা-প্রদর্শনীতে পরিলক্ষিত পরিক্রম দ্বারা আগামী এক শত বৎসর অবধি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অব্যাহত থাকে। বৃটেন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপান অতিক্রম করে করে প্রাচুর্যের মধ্য-গগনে এসে উপস্থিত হয়। তার এই প্রাচুর্য-কাল আগামী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রে নিগূঢ় অগ্রগতি

উত্তর-মহা-প্রদর্শনী কালের কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে পরবর্তী এক-শত বৎসরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তুলে ধরা যাক। বৃটেনে এই সময়কালে ব্যাপক যান্ত্রিকরণ চলে। শিল্প ও কৃষি এই উভয়ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ অব্যাহত থাকে। উৎপাদিকা শক্তিতে প্রচুর প্রসার লাভ করে। বৃটিশ উন্নয়ন অগ্রগতির এই এক শতাব্দীর ইতিহাস মূলতঃ আধুনিকীকরণ ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তিরই ইতিহাস। বর্তমান নিবন্ধে ১৮৫০ সাল-উত্তর বৃটিশ অগ্রগমনের কাহিনী চার পর্যায়ে বিবৃত করা হবে। নিগূঢ় অগ্র-গতির সংক্ষিপ্ত-বিধান তৈরী করা হবে। পর্যায়গুলো এইরূপ:

(ক) প্রকৃত আয়ের বর্ধন;
(খ) জন-শক্তি বৃদ্ধি ও মূলধন-সংগঠন;
(গ) উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রসূত লাভালাভ; এবং
(ঘ) শিল্প কাঠামোতে আকৃতিগত পরিবর্তন।

১. প্রকৃত আয়ের ধারা-প্রবাহ

প্রকৃত আয়ের ধারা প্রবাহ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। পরি-সংখ্যান তথ্যও প্রচুর জড়ো হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রগতির একটা ব্যপক রূপরেখা প্রণীত করা চলে। ১৮৭০ সালকে যাত্রাপর্বের সূচনাকাল ধরে পরিসাংখ্যিক যে-সব হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বৃটিশ অগ্রগতির একটা সন্তোষজনক নিদেন ও পরিমাপ সম্ভব হয়।[১] ৯.১ নক্সা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কি ব্যাপক হারে প্রকৃত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ে সমপ্রসারণ ঘটেছে। ১৮৭০-১৯৩৯

---

১. Hoffman বৃটিশ শিল্প-অগ্রগতির সার্বিক চেহারার অনুক্রমণী নির্মাণ করে হিসাব কষেন যে, ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি শিল্প-উৎপাদন বার্ষিক ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ হারে বর্ধিত হয়। ১৮৭৮ সালোত্তর কালে এই হার নিম্ন ২ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫১ সালের তুলনায় ১৯৩১ শিল্প-উৎপাদনে-মোট পরিমাণ প্রায় ৩০ গুণেরও অধিক হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন W. Hoffman -এর British Industry 1700-1950, Basil Blackwell, Oxford, 1955, 33, 50. অবশ্য তাঁর হিসাবের সত্যাসত্য নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। উন-বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের হিসাব হয়ত মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু, তাঁর আগের হিসাব মোটেই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

সময়ে জাতীয় আয় প্রায় চতুর্গুণ হয়ে গিয়েছে। ৭৬৯০ লক্ষ পাউণ্ড (১৯০০ সালের দর হিসাবে) থেকে বেড়ে ১৯৩৮ সালে ২৭,২৫০ লক্ষ পাউণ্ডে (সেই ১৯০০ সালের দরমাত্রার হিসাবেই) উন্নীত হয়েছে।[২] লোক-সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ১৮৭০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ২৫ পাউণ্ড (১৯০০ সালের ভিত্তিতে)। সেই আয় বেড়ে ১৯৩৮ সালে দাঁড়ায় ৫৮ পাউণ্ডে (ভিত্তি একই) এবারে সারণী ৯·১ লক্ষ্য করুন। এই পরিমাপে মাথা-পিছু হিসাবে নীট জাতীয় আয় ১৯১২-১৯১৩ সালের দরমাত্রার ভিত্তিতে যেখানে ১৮৭০-৭৯ দশকে ছিল ৩০·৪ পাউণ্ড, তা ১৯৪৮-১৯৫২ সময়ে গড়ে ৭৪·০ পাউণ্ডে উন্নীত হয়। ১৮৭০-১৮৭৯ থেকে শুরু করে ১৯৪০-১৯৪৯ সময়কার হিসাব মতে মাথাপিছু নীট জাতীয় আয় প্রতি দশকে প্রায় ১৩ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়।
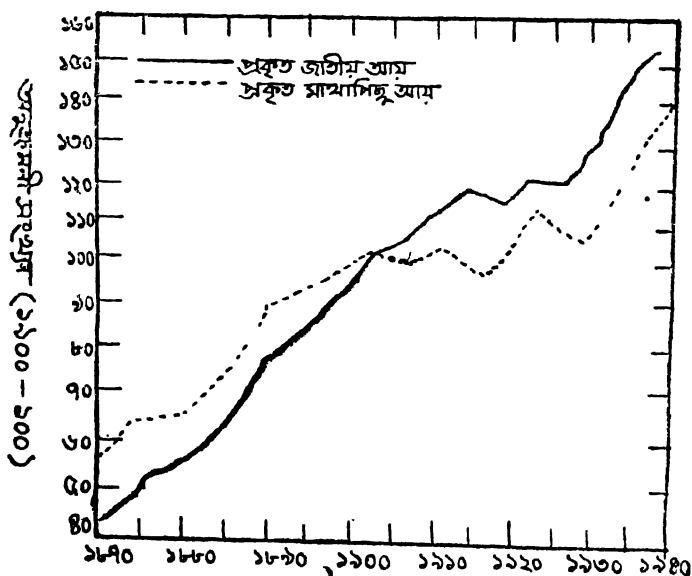
নক্সা—৯·১. প্রকৃত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ে বর্ধন, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৭০-১৯৩৮ (Prest প্রদত্ত হিসাবের ভিত্তিতে Economic Journal, LVIII, 58—59)।

২. দেখুন A. R. Prest-এর "National Income of the United Kingdom 1870—1946, Economic Journal, LVIII, 58-59 (March, 1948).

সারণী ৯·১ জন-সংখ্যা ও মাথাপিছু আয় হিসাবে নীট জাতীয় আয়, ১৯১২-১৩ সালের ধ্রুব দরমাত্রায়, বৃটিশ যুক্তরাজ্যে, ১৮৭০-১৯৫২

	লোক-সংখ্যা (দশকের গড়ে) (লক্ষ হিসাবে)	দশক-প্রতি শতাংশ হারে পরিবর্তন (শতকরা হারে)	মাথাপিছু আয় হিসাবে নীট জাতীয় আয় (পাউণ্ড হিসাবে) (দশক প্রতি গড়)	দশক-প্রতি শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ হিসাবে)
১৮৭০-১৮৭৯	৩২৭	—	৩০·৪	—
১৮৭৫-১৮৮৪	৩৪৪	—	৩২·০	—
১৮৮০-১৮৮৯	৩৫৯	৯·৯	৩৫·৬	১৭·০
১৮৮৫-১৮৯৪	৩৭৪	৮·৮	৪০·১	২৫·৩
১৮৯০-১৮৯৯	৩৯১	৮·৯	৪৪·৪	২৫·০
১৮৯৫-১৯০৪	৪১০	৯·৬	৪৬·৯	১৬·৮
১৯০০-১৯০৯	৪২৯	৯·৭	৪৮·০	৮·০
১৯০৫-১৯১৪	৪৪৬	৮·৯	৫০·০	৬·৬
১৯১০-১৯১৯	৪৬০	৭·৩	৪৯·৭	৩·৫
১৯১৫-১৯২৪	৪৫৪	১·৮	৪৯·৩	—১·৩
১৯২০-১৯২৯	৪৪৯	—২·৫	৫২·৭	৬·১
১৯২৫-১৯৩৪	৪৫৮	০·৯	৫৬·৪	১৪·৫
১৯৩০-১৯৩৯	৪৬৮	৪·৩	৬২·০	১৭·৭
১৯৩৫-১৯৪৪	৪৭৯	৪·৫	৭০·২	২৪·৩
১৯৪০-১৯৪৯	৪৯১	৪·৯	৭৩·৫	১৮·৬
১৯৪৮-১৯৫২	৫০০	—	৭৪·০	—
১৮৭০/৭৯-১৯৪০/৪৯	—	৬·১	—	১৩·৭

সূত্র: S. Kuznets সম্পাদিত Income and Wealth, Series V. Bowes and Bowes, London, 1955-এ প্রকাশিত J. B. Jefferys ও D. Walters প্রণীত "National Income and Expenditure of the United Kingdom, 1870-1952", পৃ: ১৪।

কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে নীট জাতীয় আয় বেড়ে যাবে—এত সোজা কথা। অধিক শ্রমিক খাটছে, কাজেই উৎপাদন অধিক হতে বাধ্য, সুতরাং মোট লোকসংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে শ্রমিক পিছু আয় খতিয়ে দেখা অধিকতর যুক্তিসম্মত। ফেল্‌পস্ ব্রাউন কর্মক্ষম শ্রমের মাথা-পিছু আয়ের একটা হিসাব দিয়েছেন। হিসাবটি ১৮৬২-১৯৩৪ পর্যায়কালের জন্য। ৯·২ নক্সায় তা প্রতিফলিত করা হয়েছে। সঙ্কীর্ণ এই সময় পরিসরের হিসাব থেকেও বৃটিশ অর্থনীতির ব্যাপক সম্প্রসারণের রূপটি ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে শ্রমিক পিছু আয় প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক বেড়ে যায়।

৯·১ নক্সা ও ৯·২ নক্সা মিলিয়ে দেখলে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এই দুই নক্সা পরিস্ফুট করে তুলে যে সংশ্লিষ্ট সময়কালে
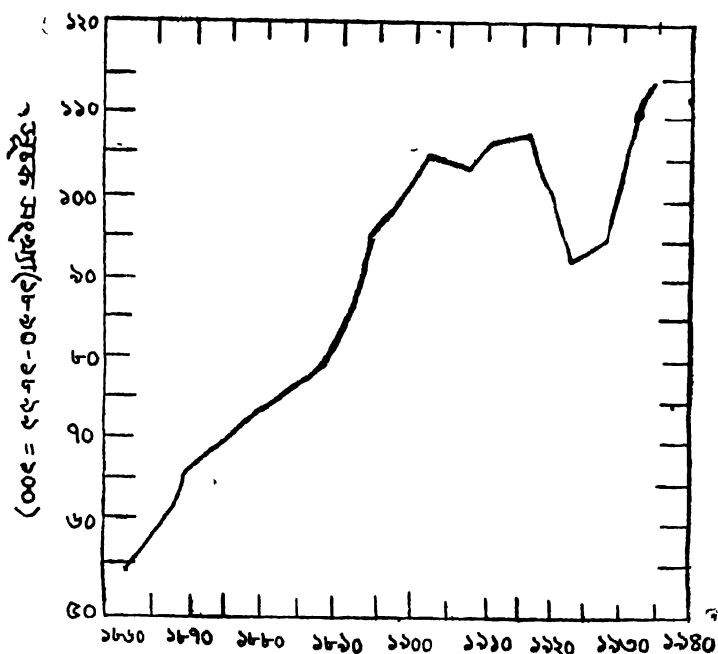
নক্সা ৯·২. কর্মরত লোকের মাথাপিছু আয়ের প্রকৃত বর্ধন, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৬২-১৯৩৮ [E. H. Phelps Brown S. V. Hopkins প্রদত্ত হিসাবের ভিত্তিতে : দেখুন, তাঁদের লেখা "The Course of Wage Rates in Five Countries. 1860-1939," Oxford Economic Papers, II, No. 2, 276 (June, 1950)]।

প্রকৃত আয় বেশ জোরেসোরে ঊর্ধ্বগামী ছিল। কিন্তু, ১৮৯০ দশকে এসে বর্ধন যেন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। ১৯৩০ সালের পূর্বে যে অক্ষুণ্ন অগ্রগতি প্রবাহ বিরাজমান ছিল তা যেন পরবর্তী সময়ে বেশ একটু ঝিমিয়ে এসেছিল। অগ্রগতির এই বৈষম্যমূলক চিত্র স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, প্রগতি-স্পৃহা সর্বক্ষণ তেমন জোরদার থাকে না। কখনো তা প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, আবার কখনো তা প্রাণ-বন্যায় স্তিমিত। কাজেই, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত কিছু নেই।

বস্তুত, ১৯৩০ সালের ধারে কাছে এসে বৃটিশ অর্থনীতির ঝিমিয়ে পড়া ভাব থেকে অনুসিদ্ধান্ত দেয়া চলে যে, আধুনিক শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী গড়ধর্মী বন্ধ্যাত্ব প্রবণতা একেবারে অনুপস্থিত নয়।[৩] বরং ভাব-লক্ষণ অনুধাবন করে উপসিদ্ধান্তে পেঁছা যায় যে, অর্থনীতি পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে প্রতিবন্ধকতামূলক শক্তির সম্মুখীন হয়, যার ফলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হতে পারে। কাজেকাজেই, বৃটিশ অগ্রগমনের ধারা-অনুক্রমী লক্ষ্য করে নিকেশ নেয়া প্রয়োজন দুই জাতীয় শক্তিনিচয়ের। প্রথমতঃ, ধনাত্মক ঐসব শক্তিনিচয় যাচিয়ে নেয়া আবশ্যক যারা অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ও প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তর কালে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণাত্মক শক্তিনিচয় চিহ্নিত করা প্রয়োজন যারা চক্রান্ত করে শতাব্দীর ক্রান্তিকালে অগ্রগমন-প্রবাহ স্তিমিত করে দিয়েছিল।

ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, উপাদান সামগ্রী বাড়িয়ে নিলে এবং উৎপাদন-দক্ষতা সবল হয়ে উঠলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যেতে বাধ্য। তেমনি রপ্তানি পরিমাণ বাড়াতে পারলে তা সুধাশক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। আগামী দুই পর্যায়ে উপাদান সরবরাহে গতি-প্রকৃতি ও উৎপাদিকা শক্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি খতিয়ে দেখা হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে রপ্তানির গল্প ফাঁদা হবে।

---

৩. দশটি দেশের অগ্রগতি হারে দীর্ঘমেয়াদী পশ্চাৎমুখীতা, ধ্রুবতা অথবা অগ্রগমন সম্পর্কে সংখ্যাতাত্ত্বিক খবরাখবর জানতে হলে দেখুন S. Kuznets-এর "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations," Economic Development and Cultural Change, V, No. I, 35-43 *(Oct. 1956).*

২. উপাদান সরবরাহে ধারা-প্রকৃতি

উৎপাদনের মূল উপাদান হচ্ছে শ্রম ও পুঁজি। এই দুই উপাদানের গতি-প্রকৃতি উৎপাদনের মোট পরিমাণ নির্ণীত করে। বৃটেনের বেলায়ও তার ব্যত্যয় নয়। কাজেই, এই দুই উপাদান সামগ্রীর গতিপ্রবাহ দিয়ে বৃটিশ অর্থনীতির উৎপাদন কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। ৯.৩ নক্সা কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি প্রদান করে। এটা জন-সংখ্যায় বর্ধন চিহ্নিত করে। ১৯১৩ অবধি মোটামুটি স্থিতিশীল বর্ধন লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দ্রুত সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়।[৪] এই পরিবর্তন মোট জনসংখ্যার বর্ধন অপেক্ষাও অধিক হয়।

জনসংখ্যা অধিক হারে কর্মীদলে অন্তরীত হয়ে মাথাপিছু কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু, মজার ব্যাপার এই যে, ঘণ্টা হিসাবে
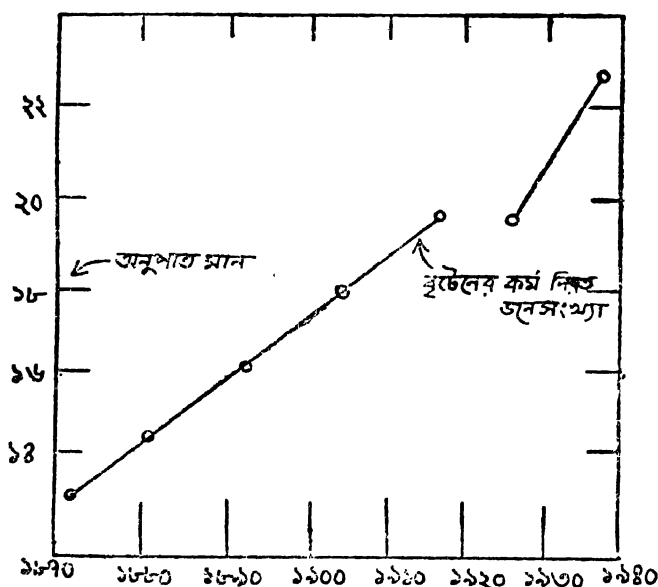
নক্সা ৯.৩. শ্রমশক্তির অগ্রগতি, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৭০-১৯৩৮ (Pheps Brown ও Weber প্রণীত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, Economic Journal, LXIII No. 250, 265)।

৪. যুদ্ধে হতাহত এবং দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে ১৯১৩ সালে ও ১৯২৪ সালে পার্থক্য দেখা যায়।

কাজের পরিমাণ কমে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই প্রবণতা অধিক তীব্রতর হয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশ দেয়া অবশ্য তেমন সম্ভব নয়। কেননা, প্রাসংগিক উপাত্ত তেমন বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে বিপরীতমুখী বিভিন্ন প্রবণতা মুখোমুখি চিন্তা করে মোটামুটিভাবে মন্তব্য করা চলে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে মাথাপিছু বার্ষিক কাজের পরিমাণ তেমন বড় একটা বাড়েনি। নামমাত্র কিছুটা হয়ত বেড়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে এসে তা নিম্নগামী হয়ে উঠেছে। গুরুত্ব হিসাবে শ্রমের এই বিবর্তন উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। তার তুলনায় পুঁজির বিবর্তন যেমন অধিক অর্থবহ তেমনি পরিমাণের দিক থেকেও তা ছিল অনেক বেশী।

মূলধনে সংগঠন হয় ব্যাপক হারে। দালান-ইমারত বাদ দিয়ে পুঁজি-সামগ্রীর এক হিসাবে দেখা যায় যে তার পরিমাণ ১৮৭০ সালে ছিল মাত্র ১'৫ বিলিয়ন পাউণ্ড। ১৯৩৮ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ৫'৫ বিলিয়ন পাউণ্ড। (এই উভয় হিসাবে ১৯১২-১৯১৩ সালের মূল্যমান ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।[৫] নক্সা ৯'৪ কর্মীর মাথাপিছু প্রকৃত মূলধন-বর্ধন
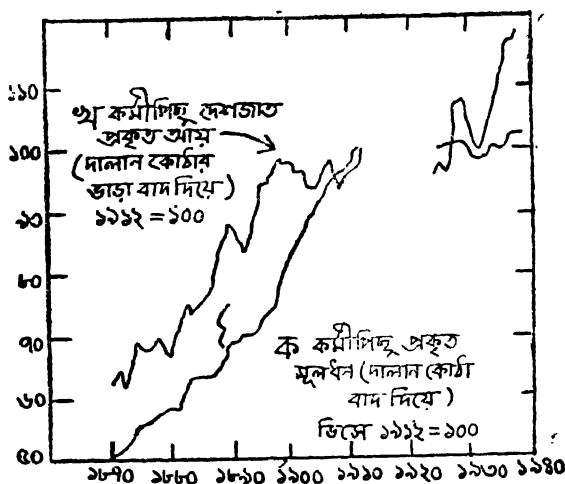
নক্সা ৯.৪. কর্মী পিছু প্রকৃত মূলধন ও প্রকৃত আয়ের সম্প্রসারণ, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৭০-১৯৪০ (Phelps Brown ও Weber থেকে গৃহিত) Economic Journal, LXIII, No. 250, 269).

৫. দেখুন E. H. Phelps Brown এবং B. Weber-এর "Accumulation Productivity and Distribution in the British Economy, 1870-1938," Economic Journal, LXIII, No. 250, 286-287 (June, 1953).

চিহ্নিত করে (দালান-কোঠা বাদ দিয়ে) এবং এই বর্ধন ও কর্মীপিছু দেশজাত প্রকৃত আয়ের দালান (কোঠার ভাড়া বাদ দিয়ে) সম্প্রসারণে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে।[৬] উপরোক্ত সময়কালে মূলধন ও আয়ের অগ্রগতি-হার মোটামুটি সমানুপাতিক হয়। মাথাপিছু প্রকৃত মূলধন ও জনপ্রতি প্রকৃত আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। মধ্যবর্তী কোন কোন সময়কালে কিন্তু মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল-সময়ে উভয়ে মোটামুটি সমতালে এগিয়ে চলে। কর্মে নিরত ব্যক্তির হিসাবে উভয়ে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যায়। ১৯০০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মোটেই বাড়েনি। কিন্তু মূলধন-সংগঠন একই হারে এগিয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে আয়-পরিমাণ আবার উর্ধ্বগতি নেয়। কিন্তু, ১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে মাথাপিছু হিসাবে মূলধন মোটেই সম্প্রসারিত হয়নি।

মূলধন-সংগঠন ও প্রকৃত আয়ের এই প্রবাহ-ধারা দুইটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রথমতঃ, কি সব শক্তিনিচয়ের ক্রিয়াকর্মের ফলে মূলধন-গঠন এমনতর হয়? দ্বিতীয়তঃ, মূলধনে সংযোজন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ১৯০০ দশকের দিকে প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণ প্রতিহত হল কেন?

মূলধন-সংগঠনে প্রযুক্তিক অগ্রগতি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল, যেমন ছিল তা শিল্পবিপ্লব কালে। নূতন ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়িত করায়, নব নব উৎপাদন-প্রণালী প্রবর্তন করায় এবং নিত্য নূতন উৎপন্ন দ্রব্য তৈরী করায় প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তিক অগ্রগমনে বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রচলন ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। তারফলে কয়লা শিল্পের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কয়লা উৎপাদনে সম্প্রসারণ ঘটে (১৮৬০ সাল ও ১৯০০ সালের মধ্যে তার উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বর্ধিত হয়। ফলে কয়লাশিল্পে প্রচুর লগ্নী প্রয়োজন হয়)। এদিকে, ইস্পাত উৎপাদন সহজতর হয়ে উঠে। তা এক বৃহৎ উদ্ভাবনী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। Bessemer প্রক্রিয়া ও Siemens খোলা-চুল্লী পদ্ধতি ইস্পাত শিল্পে ব্যাপক সম্প্রসারণ সাধন করে

৬. দেশজাত প্রকৃত আয় মানে মোট নীট জাতীয় প্রকৃত বিয়োগ বিদেশাগত সম্পত্তি-আয়। সুতরাং নক্সা ৯.৪-এ প্রদত্ত খ রেখা নক্সা ৯.২-এ প্রদত্ত প্রকৃত আয়ের রেখা থেকে নিম্নে অবস্থিত। কেননা, নক্সা ৯.২-এ বিদেশাগত সম্পত্তি-আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(১৮৬০ সালে উৎপাদন ছিল মাত্র আধা মিলিয়ন টন; ১৯০০ সালে তা হয়ে যায় প্রায় ৫ মিলিয়ন টন) সস্তায় উৎপাদন সম্ভব হল বলে ইস্পাত উৎপাদন প্রচুর হয়ে উঠে। তার ঢেউ সারা অর্থনীতির আনাচে-কানাচে শিহরণ জাগায়। প্রকৌশল শিল্পে ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। যন্ত্র-ভিত্তিক ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয় এবং অচিরে তা অসংখ্য শিল্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে আবার রসায়নবিদ্যা শিল্প ক্ষেত্রে অন্তরীত হতে থাকে, তার প্রভাবও সুদূর প্রসারী হয়ে উঠে। বহু জাতের উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। নব নব দ্রব্য আবির্ভূত হতে থাকে। সাংশ্লেষিক তথা কৃত্রিম রঞ্জন-ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। সার উৎপাদন বেড়ে যায়। ব্যাপক পরিমাণে বিস্ফোরক উৎপাদিত হতে থাকে। বৈদ্যুতিক শিল্পে সম্প্রসারণ ঘটে। তেমনি কাগজ, কাঁচ, রবার ইত্যাদি বহুতর শিল্পেও প্রযুক্তিক অগ্রগতি অনুভূত হতে থাকে।

১৮৭০ সালের মধ্যেই প্রধান রেলপথগুলো স্থাপিত হয়ে যায়। শতাব্দীর শেষপাদে সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিতে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। শহরাঞ্চলেও যানবাহন ব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়ে উঠে। ১৮৭০ দশকে ট্রামপথ প্রচলিত হয়। শতাব্দীর শেষ ভাগে ভূ-গর্ভস্থ রেলপথ স্থাপিত হয়। জাহাজ পথও কিন্তু পিছিয়ে নেই। ১৮৭০ ও ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জলপথে আকর্ষণীয় অগ্রগতি ঘটে।

রেলপথ প্রবর্তিত হয়ে সুদূর প্রসারী প্রভাব জন্ম দেয়। তেমনি বাষ্পচালিত জাহাজ প্রচলিত হয়ে সর্বত্র অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৮৫০-১৯০০ সময়কালে জাহাজপথে বৃটেনের পরিবহণ ক্ষমতা প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি পায়। তেমনি তৈলবাহী জাহাজ ও হিমাগার সম্পন্ন জাহাজ চালু হয়। এই সকল উন্নয়নে প্রচুর পুঁজি নিয়োজিত হয়। জাহাজ শিল্পে অগ্রগতির ফলে বৃটিশ দ্রব্য সামগ্রী বিস্তৃত বাজার নাগালে পায়। অন্যদিকে, বিদেশ থেকে সস্তাদরে খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানী সহজ হয়। এই উভয়বিধ সুযোগ-সুবিধা অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব জোরদার করে। ফলে অন্যান্য বহুশিল্পও সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে প্রযুক্তিবিদ্যায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আভ্যন্তরীণ-দহন ইঞ্জিন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ধাতব ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশ উৎপাদন পূর্ণতা লাভ করে। খাদ-মিশানো ধাতু-বিদ্যায় অগ্রগতি ঘটে। ধাতু-খণ্ডে জোড়া দেয়ার কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। নব নব রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ব্যাপকতর হয়। তার ফলে বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রসার ঘটে। যানবাহন তৈরী সুগম হয়। চক্রযান তৈরী হয়। সিল্ক ও কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন সহজ হয়।[৭] চলাচল ব্যবস্থায়, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তিক অগ্রগতি বলবান হয়ে বৃটিশ অর্থনীতিকে সম্মুখ পানে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। ফলে পুঁজি-সংগঠন ক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বলবান হতে থাকে। ৯'২ সারণী নীট মূলধন সংগঠনের চিত্র প্রদর্শন করে। হিসাবটি ১৮৭০-১৯৫২ সময়কালে সীমাবদ্ধ।

সারণী ৯'২. চলতি দরে নীট পুঁজি-সংগঠন, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৭০-১৯৫২।

নীট আভ্যন্তরীণ পুঁজি-গঠন, স্টক পরিবর্তন ও বিদেশে নীট ধার-দেওয়া সহ।

কাল	বার্ষিক গড়ে (লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)	শতকরা হার
১৮৭০-১৮৭৪	১,৫২০	১২'৮
১৮৭৫-১৮৭৯	৮২০	৭'০
১৮৮০-১৮৮৪	১,২৩০	৯'৭
১৮৮৫-১৮৮৯	১,৩৩০	১০'৩
১৮৯০-১৮৯৪	১,২০০	৮'৫
১৮৯৫-১৮৯৯	১,৫৯০	১০'০
১৯০০-১৯০৪	১,৭৫০	৯'৫
১৯০৫-১৯০৯	২,২৫০	১১'৩
১৯১০-১৯১৩	২,৪৫০	১১'২
১৯২৪-১৯২৮	৩,৪২০	৮'১
১৯২৯-১৯৩৩	১,৮১০	৪'৫
১৯৩৪-১৯৩৮	৩,২৫০	৭'২
১৯৪৮-১৯৫২	১২,০৯০	১০'৮

সূত্র : Jefferys ও Walters-এর "National Income and Expenditure of the United Kingdom, 1870-1952" in S. Kuznets (ed.), Income and Wealth, Series V. Bowes and Bowes, London, 1955, 18.

---

৭. দেখুন R.S. Sayers-এর "The Spring of Technical Progress in Britain, 1919-39, Economic Journal LX. No. 238, 275-291 (June, 1950).

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মূলধন-গঠন কেবলমাত্র প্রযুক্তিক অগ্রগতিরই ফল নয়। বরং তা তদপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল শক্তি-সঞ্জাত। মূলতঃ তা একটা প্রক্রিয়া যাকে "সঞ্চয় রাশিকৃত হওয়ার হিতকারী প্রভাব" হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। উন্নয়ন তত্ত্বসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মনে করে দেখুন, প্রায় সবগুলো তত্ত্ব জোর দিয়েছে যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি সূচিত হয়ে গেলে অচিরে তা শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেননা, উন্মার্গগামী বিনিয়োগ-ক্রিয়া উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। ফলে আয় পরিমাণ ক্রম-বর্ধনশীল হয়। অর্থনীতিতে সঞ্চয়-শক্তি বাড়ে। তাতে বিনিয়োগ আরো চড়ে যায়। পরিণামে অগ্রগতি-হার জোর-দার হয়। উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ে। প্রকৃত আয় উর্ধ্বমুখী মোড় নেয়। কাজেই মূলধন-সংগঠন অধিক হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! তা তখন বরং আপনা-আপনিতে বেড়ে চলে।

১৮৭০-১৯১৩ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, এই সময়ে অধিকাংশ সঞ্চয় এসেছে ক্রম-প্রসারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। ১000 পাউণ্ড বা তার নিম্ন আয়ধারী লোকেরা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়নি। ১000 পাউণ্ড থেকে ২৫,000 আয়ধারী ব্যক্তিদের অবদান প্রায় ৪0 ভাগেরও অধিক।[৮] সুপ্রতিষ্ঠিত মূলধনী-বাজারগুলো যানবাহন ও জন-কল্যাণমূলক শিল্পসমূহে পুঁজি যুগিয়েছে। অথচ শিল্প-বিনিয়োগে অর্ধেকেরও বেশী টাকা এসেছে অবণ্টিত মুনাফা থেকে। মূলধন-সংগঠনে পুনর্বিনিয়োজিত মুনাফার অবদান ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই তুলনায় পুরানো কি নব প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলো, স্টক বাজার থেকে তেমন পুঁজি পায়নি।[৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন অগ্রগতির সফল পুঁজি-সংগঠনে ব্যাপক সহায়তা করে। তবে তাদের অবদান উৎপাদনের ইউনিট কিছু মূলধন বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়ে অধিক পুঁজির তাগাদা বাড়িয়ে দেয়। আবার আয়-পরিমাণ ব্যপ্ত হয়ে পুঁজির-মাত্রা বাড়িয়ে তুলে। অর্থাৎ একে অন্যের উস্কানি শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করতে থাকে। উৎপাদন মাত্রা বেড়ে চলে। কাজেই,

---

৮. দেখুন A.K. Cairncross প্রণীত Home and Foreign Investment, 1870-1913, Cambridge University Press, 1953, পৃঃ ৮৬।

৯. ঐ, পৃঃ ৯৯।

সংভার-সামগ্রী ও চলতি কর্ম বসে থাকতে পারে না, তারাও তাল রেখে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ বিনিয়োগ ক্রিয়া প্ররোচিত হয়। বিনিয়োগ বর্ধক নীতি অনুসারে তা পরিপুষ্টি লাভ করে ও সবল হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও বসে নেই। সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কাজেই, বর্ধিত জনসংখ্যা নিমিত্তেও কিছুটা লগ্নী দরকার। ঘরবাড়ী নির্মাণ, আহার-বিহারের বন্দোবস্ত, স্কুল কলেজ স্থাপন করা, যানবাহন বাড়িয়ে তোলা, কল্যাণ-ধর্মী কাজ অধিক করা ইত্যাদি কাজেও যথেষ্ট ব্যয় প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ এই সকল কাজে প্রচুর পুঁজি নিয়োজিত হয়। এমনকি শিল্পক্ষেত্রেও ততটা হয়নি।[১০]

১৯২৪-১৯৩৮ সালে কিন্তু মূলধন-গঠন ব্যাহত হয়। সুদীর্ঘ এই চৌদ্দটি বৎসর ধরে পুঁজি-সামগ্রীতে নামমাত্র সংযোজনও ঘটেনি। ব্যাপারটা অবশ্যই মারাত্মক বৈকি! তা সুস্পষ্টভাবে কেইনসীয়োত্তর প্রত্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে। উত্তর-কেইনসীয় বহু আলোচনায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয় যে, অক্ষুণ্ণ অগ্রসরের ধারণা অতীব ভয়াবহ অনবচ্ছিন্ন অগ্রসর অব্যাহত রাখা যথেষ্ট জটিল কাজ।

১৯১৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল নাগাদ বৃটিশ অর্থ-নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তন ধারা অর্থনীতিতে গলদ সৃষ্টি করে। অনেকে এই গলদকে ভূ-তত্ত্বীয় দোষ-ত্রুটির সমরূপ বলে অভিহিত করেন।[১১] আয়-বণ্টনে অস্বাভাবিক বৈষম্য দেখা দেয়। খাজনা ও মুনাফা সঙ্কোচন দেখা দেয়। অথচ অর্জিত আয় দেশজাত জাতীয় আয়ের হিসাবে ৫৫ ভাগ থেকে ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়।[১২] সঞ্চয়ের সূত্র হিসাবে মুনাফা গুরুত্ব হারিয়ে বসে। শুধু তাই নয়, তার উপরে করভার অত্যধিক হয়। তাতে সঞ্চয়স্পৃহা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদিকে আবার শিল্পে নিয়োজিত মূলধন-উৎসারিত আয়ের হার সরাসরি পড়ে যায়। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল অবধি সময়কালে এই হার ছিল শতকরা ১০ থেকে ১৩ ভাগ। ১৯১৪-১৯২৬ সালে তা কমে কমে এসে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৭ ভাগের কাছাকাছি। এমনকি ১৯৩৭-৩৮

---

১০. প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৬, ১০২।

১১. Phelps Brown ও Weber-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৮০-২৮১।

১২. বিশদ জানতে হলে দেখুন Phelps Brown ও Hart-এর "The Share of Wages in National Income," Economic Journal, LXII, 246 (June, 1952).

সালেও তা ৯ ভাগেরও নিম্নে অবস্থিত ছিল। অথচ এখন কিনা তা সর্বোচ্চ শিখরে। এই সকল কারণহেতু যুদ্ধকালীন সময়ে লগ্নীকাজ বেশ ঝিমিয়ে পড়ে। ফলে প্রকৃত আয়ে বর্ধন ব্যাহত হয়। তবু রক্ষা সে প্রতিরোধকারী দুয়েকটা প্রভাব জন্ম নিয়েছিল। যেমন উৎপাদিকা-শক্তিতে বর্ধন এবং অনুকূল পতন ঘটতে বাণিজ্য-অনুপাত। এই সবের ফলে আয়ে তেমন পারেনি। তবে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে শিল্পকাজে নিয়োগযোগ্য মূলধন-গঠন ব্যাহত হওয়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে শিল্পোন্নত দেশে অবিচ্ছিন্ন অগ্রসর অব্যাহত রাখা সোজা কাজ নয়। যথোপযুক্ত বিনিয়োগমাত্রা বজায় রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

৩. উৎপাদিকা শক্তিতে ঝোঁকসমূহ

বৃটিশ অগ্রগতির অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদিকা-শক্তিতে ব্যাপক বর্ধন। সুষম সম্পদ ব্যবহার ও উন্নত উৎপাদন-প্রণালী একত্রিত হয়ে প্রতি ইউনিট শ্রম ও পুঁজির ফলন বাড়িয়ে দেয়। অব্যাহত গতিতে এই ধারা এগিয়ে চলে।

শিল্প উৎপাদনে এই ঊর্ধ্বমুখী মোড় কর্মে নিরত ব্যক্তির প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে এগিয়ে যায়। ৯·৫ নক্সা লক্ষ্য করুন। এই নক্সার সাথে ৯·২ নক্সা মিলিয়ে দেখুন। তাহলেই বিশেষ বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ৯·৫ চিত্রে খনিজ ও শিল্প উৎপাদনে শ্রমিক-পিছু ফলনের নক্সা তুলে ধরা হয়েছে।[১৩]

ফেলপ্‌স্ ব্রাউন[১৪] প্রদত্ত এই হিসাব অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, ১৮৮৫ সালের পরে এসে শিল্প উৎপাদিকা-শক্তিতে বেশ পড়তি ঘটে।

---

১৩. শিল্প উৎপাদিকা-শক্তির এই পরিমাপ পাওয়া গিয়েছে ফলন-সূচককে (এই সূচকে অধিকাংশ শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট শিল্প-অবদানের প্রায় ৭০ ভাগ হিসাবে নেয়া হয়েছে) প্রাসংগিক শিল্পসমূহে নিয়োজিত মোট শ্রমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। ৯·৫ নক্সায় যে হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তা বাণিজ্য-চক্রজনিত। শ্রমিক-সংখ্যার সাথে বেকারত্বে সাজীকরণ ঘটিয়ে নেয়া হয়নি বলে এমনটা হয়েছে।

১৪. E. H. Phelps Brown 3 S. J. Handfield-Jones-এর "The Climacleric of the 1890's ; A Studay in the Expaneding Economy," Oxford Economic Papers, IV, No. 3, 266-307 (oct. 1952).

অবনতির মাত্রা এত অধিক যে, চিত্রটির দিকে দৃষ্টি দিয়েই বোঝা যায় সে ১৮৬০ থেকে ১৮৮৫ সাল অবধি বেশ চড়াহারে বৃদ্ধি ঘটে শ্রমিক পিছু উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বর্ধিত করে দেয়। অথচ তার পরবর্তীকালে হঠাৎ করে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ঊর্ধ্বগামী গতি নামমাত্র হারে অব্যাহত
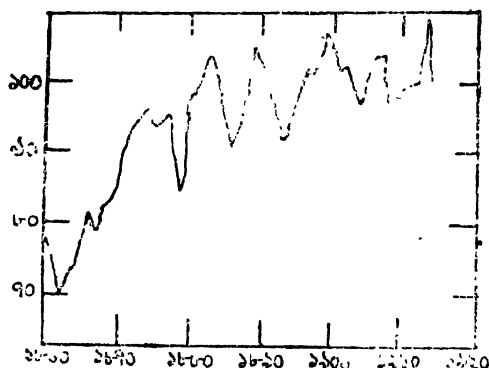
নক্সা ৯.৫. খনি ও শিল্পে শ্রমিক-পিছু উৎপাদন বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৬০-১৯১৪ (১৮৯০-১৮৯৯=১০০). (Phelps Brown ও Handfield-Jones হতে গৃহীত, Oxford Economic Papers, IV, No, 3, 271)

থাকে। ১৯১৪ সাল অবধি একই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অবস্থা আবার মোড় নেয়। উৎপাদিকাশক্তি আবার বাড়তে শুরু করে। ১৯২৪ ও ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রমিক-পিছু ফলন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যায়।[১৫]

সুতরাং, শ্রমিক-প্রতি প্রকৃত-আয় ও শ্রমিক-পিছু উৎপাদন একই ধারাপথ বেয়ে এগিয়ে চলে। ১৯০০ সাল অবধি উভয়ে বেশ সবল বেগে এগিয়ে যায়। তারপরে এসে যেন ঝিমিয়ে পড়ে, কি প্রকৃত আয়, কি উৎপাদিকা-শক্তিতে সম্প্রসারণ বড় একটা ঘটে না। অতঃপর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি

১৫. দেখুন L. Rostas-এর "Comparative Productivity in British and American Industry", National Institute of Economic and Social Research, Occasional papers, XIII, Cambridge University Press, Cambridge, 1948, 42-43. Rostas তাঁর হিসাবে শিল্প, খনিজ, দালান-কোঠা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী সন্নিবেশিত করেছিলেন।

সময় থেকে উভয় ধারা পুনরায় উর্ধ্বমুখী মোড় নেয়। তৃতীয় দশকের শেষপাদ নাগাদ এই অগ্রগমন অবিচলিত থাকে।[১৬]

প্রকৃত আয় ও উৎপাদিকা-শক্তির এই সমানুপাতিক উত্তরণ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। ফেলপ্‌স ব্রাউন মন্তব্য করেন যে, উৎপাদিকা-শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণেই ১৯০০ দশকের দিকে প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণ ঘটেনি। আর উদ্ভাবন প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারেনি। তাঁর এই মন্তব্যের ভিত্তি হিসাবে ফেলপ্‌স ব্রাউন যুক্তিতক দিয়েছেন যে, ১৯০০ সালের পূর্ববর্তী কালে ব্যাপক হারে প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধিত হয়। "বাষ্প ও ইস্পাতের সেই স্বর্ণযুগে" যানবাহন ব্যবস্থা, শক্তি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রসর সাধিত হয়। এই সকল অগ্রগতি বাস্তব রূপ লাভ করে প্রকৃত আয় বাড়িয়ে দেয়। অথচ ১৯০০ সালের ধারেকাছে এসে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার অগ্রগমন স্থিমিত হয়ে পড়ে। ফলে প্রকৃত আয়ে বর্ধনও ঝিমিয়ে পড়ে। "বাষ্পচালিত জাহাজ পালখাটান নৌকার স্থলাভিষিক্ত হওয়া এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত........। বাষ্পচালিত জাহাজ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে যানবাহন ব্যবস্থা উন্নততর হয়। তাতে উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে যায়। কিন্তু, বাষ্পচালিত জাহাজ চালু হয়ে যাওয়ার পরে তেমন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সহজে ঘটে না। নামমাত্র অগ্রগতি সাধিত হয়। বাষ্পচালিত জাহাজেই ধরাবাধা ছাদে কিছুটা উন্নতি ঘটে।"[১৭] অথবা ধরুন বৈদ্যুতিক আবিষ্কার, কি আভ্যন্তরীণ-দহন ইঞ্জিন বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির কথা। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ও পরবর্তী সময়ে কেবল এই সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়, তার আগে নয়।

---

১৬. সংমিশ্রিত শ্রম ও পুঁজির প্রতি-ইউনিট উৎপাদন তথা "মোট উৎপাদন" শ্রমিক-পিছু উৎপাদন তথা "শ্রমিক উৎপাদন" অপেক্ষা স্বল্পহারে সম্প্রসারিত হয়।

বৃটিশ শিল্পজগতে উৎপাদিকাশক্তিব এক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯০৭ ও ১৯৪৮ সালেব মধ্যবর্তী সময়ে কর্মে নিবত শ্রমিকের প্রতি ঘন্টার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হয়ে যায় (১৯০৭=১০০; ১৯২৪=১৪২; ১৯৩৫=১৭১ : ১৯৪৮=২০৩)। দেখুন A. Maddison কৃত "Output, Employment and Productivity in British Manufacturing in the last Half Century," Bulletin of the Oxford Univer-sitey Institute of Statistics, XVII, No. 4, 380 (Nov. 1955).

১৭. Phelps Brown ও Handfield-Jones-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২৮২—২৮৩।

ফেলপস্ ব্রাউন বিকল্প কোন ধারণা মানতে রাজী নন। সাম্প্রতিক-কালে বহুজন যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন যে, একদিকে ব্যবস্থাপনায় শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল এবং অন্যদিকে শ্রমিকগোষ্ঠী প্রতিবন্ধকতামূলক নানারূপ পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছিল। তার ফলে উৎপাদিকা-শক্তিতে বর্ধন প্রতিহত হয়েছিল। কেননা ব্যবস্থাপনায় ও শ্রমিক উৎ-পাদনে দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছিল। কিন্তু, ব্রাউন এই যুক্তি স্বীকার করতে রাজী নন। তিনি বলেন, যদি তাই হবে, তাহলে পরবর্তীকালে কিভাবে আবার উৎপাদিকা-শক্তি বেড়ে যেতে পারে? তখনো যে একইরূপ দুর্বলতা বিরাজ করছিল, ব্যবস্থাপনা ও শ্রম এই উভয়ক্ষেত্রে। কাজেই, তাঁর মত এই সকল দুষ্ট প্রভাব উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস করায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।[১৮]

মূলধন গঠনের দুর্বলতা দিয়েও উৎপাদিকা-শক্তি প্রকৃত আয়ে প্রতি-হতের এই চিত্র ব্যাখ্যা করা চলে না। কেননা, পুঁজি-সামগ্রীর মাথাপিছু পরিমাণ প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ বেড়ে যায়। আসল ঝকমারী বাঁধিয়েছে উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়া। উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলেই মনে হয় উৎপাদিকা-শক্তি তেমন সম্প্রসারিত হতে পারেনি। "কর্মে নিরত শ্রমিকের তুলনায় হয়ত বাষ্পীয় পোতের পরিবহণ ক্ষমতা অধিক হারে বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু, বাষ্পীয় পোতে সংযোজন এক কথা, বাষ্পীয় পোত পালখাটা নৌকার স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এই স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা সংযোজন দিয়ে হবার নয়।"[১৯]

পরিশেষে কৃষিক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। কই, কৃষি-শিল্পে ত তেমনটা ঘটেনি! কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকের উৎপাদনে তেমন ওলট-পালট ত সৃষ্টি হয়নি। কাজেই, কৃষিফলন ব্যত্যাহত হয়ে প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।[২০]

উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ায় অধঃগতি মোড় বৃটেনের জন্য আরো মারাত্মক হয়ে উঠে এই কারণে যে, তার বাণিজ্য অনুপাত (terms of trade) প্রতিকূল হয়ে উঠে। বাষ্প ও ইস্পাত শিল্পে অগ্রসরের ফলে বৃটেন অতি সহজে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানী করতে পারছিল। কিন্তু, ১৮৯০ সালের

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮০-২৮১।

১৯. ঐ, পৃ: ২৮৬।

২০. ঐ, পৃ: ২৭৬-২৭৮।

কাছাকাছি সময়ে এসে এই সুবিধা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে বিদেশ থেকে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল আমদানী বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এদিকে কিন্তু জনসংখ্যা বেশ বেড়ে চলেছিল। পরিণামে বৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্য (প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্য ও কয়লা) ও আমদানী বাণিজ্যে (প্রধানতঃ খাদ্যসামগ্রী কাঁচামাল) ভারসাম্য ব্যাহত হয়। তা বৃটেনের জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠে। আমদানী দরমাত্রা চড়ে যায়। রপ্তানি দরমাত্রা তাল রেখে এগুতে পারে না।[২১] বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যের এই বিপরীত পরিবেশ ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৩ সাল অবধি প্রকৃত আয় সম্প্রসারণও প্রতিহত করে। তবে, আয় বর্ধনে আসল প্রতিবন্ধক ছিল উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধিতে ন্যূনতা। নিম্নমুখী বাণিজ্য অনুপাত হয়ত তা কিছুটা জোরদার করেছে মাত্র।[২২]

ফেল্‌পস্ ব্রাউনের যুক্তিতর্কের সমালোচকও কিন্তু প্রচুর। অনেকেই তার উপপাদ্যের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তা বহুমুখী আপত্তির ভিত্তিতে। কেউ বলেছেন, উদ্যোগী ব্যবসায়ী গুণে হ্রাস পাওয়াতে এমনটা হয়েছে। অথচ ব্রাউন তার উপর তেমন জোর দেননি। সত্য বটে যে, পরবর্তীকালেও উৎপাদিকা-শক্তিতে ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি লাভ হয়েছিল এবং এই জন্য হয়ত অন্যসব বিষয়াবলী দায়ী ছিল। কিন্তু, কথা থেকে যায়। যদি একই সময়ে উদ্যোগী কর্মপ্রবাহ থাকত তাহলে উৎপাদিকা-শক্তিতে বৃদ্ধি আরো অধিক হতে পারত।[২৩] তাছাড়া, একথা

---

২১. বাণিজ্য অনুপাত সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

২২. Phelps Brown ও Handfield-joney-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২৬৯-২৭০। আরো যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, দালান-কোঠা নির্মাণে চক্রময় ঘূর্ণন ও মজুরীর তুলনায় মুনাফায় অধিক জোর আরোপ প্রকৃত আয় বর্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। দেখুন, যথা W. A. Lewis ও P J.O. Leary প্রণীত "Secular Swings in Production and Trade, 1870-1913," Manchester School Economic and Social Studies. XXIII, No. 2, 125, (May, 1955)

২৩. Landes তাই জার্মানীর তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে বৃটেনের প্রাধান্য হারাবার কারণ হিসাবে উদ্যোগজাত ঘটনাকে অধিক দায়ী করেন। দেখুন. David S. Landes-এর Entreprencurship in Advanced Industrial Countries : The Anglo-German Rivalry in Entreprenership and Economic Grouth. Harvard University Rasearch Center in Entreprencurial History, Nov. 1954.

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, উদ্ভাবনী কর্মস্পৃহা ও স্রোত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অথচ মূলধন-সংগঠন অনবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ফেলপস্ ব্রাউন শিল্প উৎপাদিকা-শক্তির যে নক্সা অঙ্কিত করেছেন তার থেকে স্বল্প-মেয়াদী হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাবসমূহ বিযোজন করে নিলে দেখা যায় যে ভাঙ্গনস্রোত দেখা দিয়েছিল ১৮৭০ দশকের দিকে, ১৮৯০ দশকের দিকে নয়।[২৪] অথচ ব্রাউন তাই বলেছেন, "উদ্ভাবনী-প্রক্রিয়ার অনুকূল প্রভাবে" ভাঙ্গনবশতঃ হয়ত উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি কিছুটা প্রতিহত হয়েছিল। কারণ, ১৮৭০ সালের দিকে এসে বাষ্পীয় যন্ত্র ও লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য প্রায় সব শিল্পেই স্থান করে নিয়েছিল। সুতরাং এই ধারার ব্যাপকতা সীমিত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে ইস্পাত শিল্প প্রবর্তিত হয়ে লৌহশিল্পের সেই রমরমা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।[২৫] কিন্তু, সে যাই হউক, ১৮৭০ দশকের দিকে উৎপাদিকা শক্তিতে অধঃপতন শুরু হয়েছিল একথা মেনে নিলে বরং শিল্প-উৎপাদন ও রপ্তানি পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে তা সূচিত হয়েছিল একথা বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, ১৮৭০ দশক থেকে এই সকল ক্ষেত্রেও সঙ্কোচন শুরু হয়েছিল। একাদশ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেয়া হবে।

৪. শিল্প-নক্সায় আকৃতিক পরিবর্তন

উৎপাদিকা-শক্তি নিয়ে সুতরাং, বেশ আলোচনা করা গেল। তার চিত্রময় পরিবর্তন নক্সা আরো একভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। শিল্প-ভিত্তিক মাথাপিছু উৎপাদন-সূচক খতিয়ে দেখে তার আকৃতি-চরিত্র উদ্ভাসিত করা যেতে পারে। ৯·৬ ও ৯·৭ নক্সাদ্বয় সামনে নিন। একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। বিনা আয়াসেই দেখতে পারেন যে, কয়লা খনি ও রেল-গতায়াতে অন্যান্য শিল্পগুলো অপেক্ষা অনেক পূর্বে মাথাপিছু উৎপাদন মোড় নিয়েছে। লৌহ ও ইস্পাত তৈরীতে এবং পশম উৎপাদনে কোন নড়চড় নেই। বাকী রইল আর মাত্র চারটি উল্লেখযোগ্য শিল্প, যথা বস্ত্রশিল্প, তেতো মদশিল্প, লৌহশলাকা, উত্তোলন-শিল্প ও ইস্পাত বিগলন

২৪. দেখুন D. J. Coppock-এর The Climacteric of the 1890's: A Critical Note, Manchester School of Economic and Social Studies, XXIV, No, 1, 3-8 (Jan. 1956).

২৫. পৃষ্ঠা ২২।

শিল্প। শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে এইসব শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিকা-শক্তি সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কৃষিকাজেও ফলন বাড়ে। তবে ততটা নয় যতটা শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রে। কিন্তু ১৯০০ সালের দিকে এসে তার ফলনে বাধা পড়েনি, যেমনটা পড়েছিল শিল্পক্ষেত্রে। শ্রমিকপিছু কৃষি উৎপাদনের সূচক ১৮৬৭-১৮৬৯ সালে ছিল ১০০। ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে বেড়ে ১৯০৪-১৯১০ সালে এসে উন্নীত হয় ১২৬-এ। পরবর্তী দশকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৯২০-১৯২২ সালে এসে দাঁড়ায় ১১৬-তে। তারপর আবার বাড়তে শুরু করে। ১৯৩০-১৯৩৪-এ এসে পৌঁছে ১৪০-এ।[২৬]
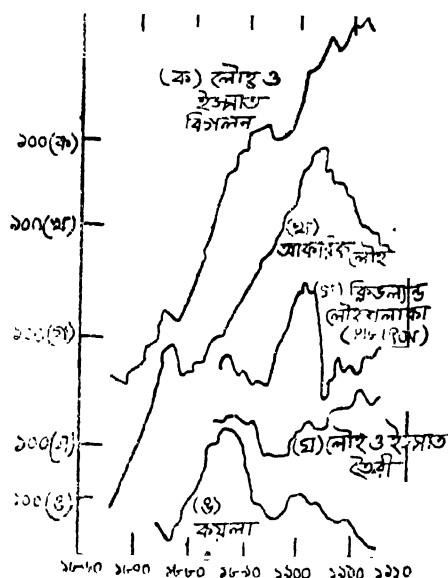
নক্সা ৯.৬ শ্রমিক-পিছু উৎপাদন-নির্দেশক। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৬০-১৯১৪ (৫ বৎসর অথবা ৭ বৎসর ব্যাপী চলমান গড়ে; ১৮৯০-১৮৯৯=১০০) (Phelps Brown ও Handfield Jones থেকে গৃহীত, Oxford Economic Papers, IV, No. 3, 273).

যন্ত্রপাতি শ্রমিক-উৎপাদনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। তার সহজলভ্যতা অনুযায়ী শ্রমিকের উৎপাদন কম-বেশি হয়। যে শ্রমিক যন্ত্রপাতি

২৬. দেখুন E. M. Ojala কৃত Agriculture and Economic Progress, Oxford University Press, Oxford, 1952, পৃ: ১৫৩।

দিয়ে কার্য সম্পন্ন করে তার উৎপাদন হাতিয়ারবিহীন শ্রমিক অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবে অধিক হতে বাধ্য। অবশ্য একথা মনে করবার কারণ নেই যে, কেবল যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই দড়্‌দড়্‌ করে শ্রমিকের ফলন অধিক হয়ে উঠবে। ফলন অধিক হওয়া না হওয়া শিল্প-সংস্থার আকারের উপরও নির্ভরশীল। আর এই আকারের নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করে বাজারের আকৃতি-প্রকৃতি। তাছাড়া, কেবল যন্ত্রপাতি বসিয়ে দিলেই শ্রমিক পিছু ফলন বেড়ে যাবে না। তার জন্য চাই উৎপন্ন দ্রব্যের মান যথাবিহিত করে নেয়া যেন তা নব-স্থাপিত যন্ত্রপাতির যথাযোগ্য ব্যবহার ঘটাতে পারে। একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, উৎপাদন-সামগ্রীর ইউনিট পিছু উৎপাদন (সাকুল্য উৎপাদিকা-শক্তি) শ্রমিকপিছু উৎপাদন (শ্রম-উৎপাদিকা-শক্তি) অপেক্ষা উৎপাদিকা-শক্তির প্রকৃত পরিমাপ।
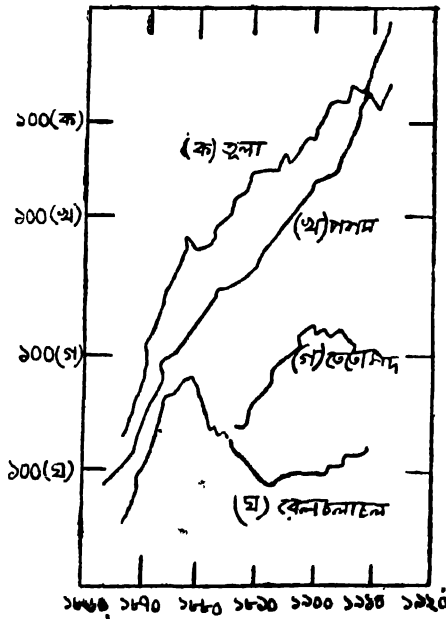
নক্সা ৯.৭. শ্রমিক-প্রতি উৎপাদন সূচক, বৃটিশ যুক্তরাজ্য. ১৮৬০–১৯১৪ (৫, ৭ অথবা ১০ বৎসরব্যাপী চলমান গড়ে; ১৮৯০–১৮৯৯=১০০) (Phelps Brown ও Handfield-Jones, Oxford Economic Papers, IV, No. 3, 274).

এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবেচনা বাদ দিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, যন্ত্রপাতির আকৃতি প্রকৃতি ভেদে শিল্পে শিল্পে শ্রমিক-পিছু উৎপাদন ভিন্নতর হয়। যন্ত্রপাতির পরিমাণ, তার গুণাগুণ, তার প্রতিস্থাপন হার ইত্যাদি ভেদে শ্রমিক উৎপাদনে তারতম্য ঘটে। তাছাড়া, বাজারের আকার, তৈরীকৃত দ্রব্যের মান ও কারখানার আকার ও শ্রমিক উৎপাদন প্রভাবিত করে। আধুনিকীকরণ-মাত্রা তথা উৎপাদন-আঙ্গিক এবং কারখানার সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে, শ্রমিকের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদীপ্তকারী বহু বিষয় যথা—কর্ম সময়। মজুরী আদায়-পন্থা, কার্য-পদ্ধতি সহজীকরণ ইত্যাদিও শ্রমিক উৎপাদন অধিক করার অতীব তাৎপর্যবহ। "শ্রমিক মনন" ও "শিল্প-সম্পর্ক" তথা কর্মী ও মালিকের মধ্যকার হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ শ্রমিক উৎপাদন বাড়াতে অতীব কার্যকরী।

কৃষি-ফলন তেমন বাড়েনি। শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আর যেটুকু বেড়েছিল তার জন্য দায়ী ছিল ক্রম-প্রসারিত প্রযুক্তিক-জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিতে চাষবাস ও শ্রমের অন্যত্র চাহিদা। শ্রমের এই চাহিদা বেড়েছিল কৃষিজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় মুদ্রা মজুরীহার সমপ্রসারিত হওয়ার কারণে। কৃষি উৎপাদিকা-শক্তি সীমিত হওয়ার পেছনে অনেকগুলো শক্তি ক্রিয়া করেছিল। তন্মধ্যে, কৃষি-শ্রমের স্বল্প সঞ্চালন, কৃষি-সংস্থার অনমনীয়তা, আদর্শ ফার্মের সংখ্যাস্বল্পতা, ক্রম-হ্রাসমানবিধি, পুঁজি-অপ্রাচুর্যতা ও খাদ্যসামগ্রীর চাহিদায় অস্থিতিস্থাপকতা উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিকা-শক্তিতে বর্ধন হার ভিন্নতর হতে দেখা যায়। একই পরিবৃত্ত কালে বৈষম্যপূর্ণ এই নক্সা লক্ষ্য করে দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত বয়সী শিল্পগুলোতে সম্প্রসারণ হার নিম্নমুখী হয়ে উঠেছিল। এখনকার তুলনায় পরবর্তীকালে তা অধঃমুখী পথে ধাবিত হয়েছিল। সাধারণভাবে প্রায় সব শিল্পগুলোর বেলার এই প্রত্যয় সত্য।[২৭]

পরিসংখ্যাণ তথ্যের ভিত্তিতে বৃটিশ শিল্পজগতের নক্সা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যিক খবরাখবর সঙ্কেত প্রদান করে যে, বয়সের পরিমাপে প্রতিটি শিল্পে উত্তরণ হার সঙ্কোচিত হয়ে উঠেছিল। যে শিল্পের

২৭. দেখুন, যথা—Solomon Fabricant-এর Economic Progress and Economic Change, National Bureau of Economic Research, New York, May 1954, পৃঃ ১৪।

বয়সকাল যত সেই পরিমাণে তার বর্ধন-হার কমে এসেছিল। তাই কুজনেট্‌ হিসাব কষে দেখিয়ে দেন যে কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, বস্ত্র ইত্যাদি বৃটিশ শিল্পে আইনানুগ নিম্নগামী সঙ্কেত রেখা পাওয়া যায়।[২৮] হফ্‌ম্যানের হিসাব-নিকাশও মোটামটি একই ধারণা প্রদান করে। তাঁর হিসাবেও দেখা যায় যে একই সময়কালে শিল্পভেদে অগ্রগতি হার ভিন্নতর হয়েছিল। এক শতাব্দীকালের প্রাপ্ত হিসাব থেকে শিল্প-অগ্রগতির তিনটি পরিষ্কার পর্যায় চিহ্নিত করা যায়, যথা : (ক) ক্রম অগ্রগতিহার সম্পন্ন শিল্প-সম্প্রসারণ পর্যায়; (খ) ক্রমহ্রাসমান গতিসম্পন্ন শিল্প-অগ্রগমন পর্যায় ও (গ) ধ্রুব পশ্চাতাভিমুখী অগ্রগতি-হার সমভিব্যহারে শিল্প-অগ্রগতি পর্যায়।[২৯] বৃটিশ শিল্পজগতের বেশ অনেকগুলো শিল্পের "জীবন বৃত্তান্ত" ৯.৩ সারণীতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্ফুটিত করে তোলা হল।

সারণী ৯.৩. বৃটিশ যুক্তরাজ্যের শিল্প-অগ্রগতির ধারা-পর্ব ১৭০১-১৯১৩

উৎপাদন অগ্রগতি

শিল্প	ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি-হার	ক্রম-হ্রাসমান অগ্রগতি-হার	ধ্রুব পশ্চাৎমুখী অগ্রগতি-হার
মূলধনী-সামগ্রী	.. ১৭০১-১৮৪৭	.. ১৮৪৭-১৯১৩	
কয়লা	.. ১৭০১-১৮৬০	.. ১৮৬০-১৯১৩	
আকরিক টিন	..	.. ১৮৫৪-১৮৭১	.. ১৮৭২-১৯১৩
আকরিক লৌহ	..	.. ১৮৫১-১৮৮০	.. ১৮৮০-১৯১৩
আকরিক তামা	.. ১৭২৮-১৭৯৮	.. ১৭৯৮-১৮৫৬	.. ১৮৫৬-১৯১৩
আকরিক সীসা	..	" ১৮৪৯-১৮৬৩	.. ১৮৬৩-১৯১৩

২৮. দেখুন S. Kuznets-এর Secular Movements in Production and Prices, Houghton Mifflin Co., New York, 1930, 124, 126, 129, 133. আইনানুগ রেখার চরিত্র এমন যে তা গোড়ার দিকে বেশ দ্রুতহারে সম্প্রসারিত হয়, অতঃপর শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে উঠে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রথম পর্যায়ে বর্ধন হার বেশ দ্রুত হয়। শেষ পর্যায়ে এসে শতকরা বর্ধন হার হ্রাসমান হয়ে উঠে।

২৯. Hoffmenn-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৮০।

আকরিক দস্তা	.. ১৮৫৪-১৮৭৫	.. ১৮৭৫-১৮৮৩	.. ১৮৮৩-১৯১৩
লৌহ ও ইস্পাত	.. ১৮০৩-১৮৪৭	.. ১৮৪৭-১৯১৩	..
লৌহদ্রব্য যন্ত্রপাতি	.. ১৭৮৭-১৮৪৭	.. ১৮৪৭-১৯১৩	..
তামা	.. ১৭৭২-১৮৮৩	.. ১৮৮৩-১৮৯২	.. ১৮৯৩-১৯১৩
সীসা	..	.. ১৮৪৯-১৮৬৪	.. ১৮৬৪-১৯১৩
এলুমিনিয়াম	..	.. ১৮৯০-১৯১৩	..
তাম্রদ্রব্য	..	.. ১৮২১-১৯১৩	..
জাহাজ তৈরী	.. ১৭৯০-১৮৫৩	.. ১৮৫৩-১৯০৬	.. ১৯০৬-১৯১৩
রেলপথ নির্মাণ	..	.. ১৮৩১-১৯০২	.. ১৯০২-১৯১৩
কাষ্ঠশিল্প	.. ১৮৩২-১৮৬৫	.. ১৮৬৫-১৯০৩	.. ১৯০৩-১৯১৩
শন শিল্প	.. ১৭৯১-১৮৩৫	.. ১৮৩৫-১৯০৩	..
দালান কোঠা	.. ১৭৮৬-১৮৬১	.. ১৮৬১-১৯০২	.. ১৯০২-১৯১৩
ভোগদ্রব্য	.. ১৭০১-১৮৩০	.. ১৮৩০-১৯১৩	..
সুতা	.. ১৬৯৯-১৮০০	.. ১৮০০-১৯১৩	..
টুকরা কাপড়	.. ১৬৯৯-১৮০০	.. ১৮০০-১৯১৩	..
পশমী সুতা	.. ১৭৮০-১৮৬৫	.. ১৮৬৫-১৯১৩	
পশমী দ্রব্য	.. ১৭৪০-১৮৬৬	.. ১৮৬৬-১৯১৩	
রেশমী সুতা	..	.. ১৭৬৮-১৮৫৭	.. ১৮৫৭-১৯১৩
রেশমী পোশাক	..	.. ১৭৬৮-১৮৫৫	.. ১৮৫৫-১৯১৩
ক্ষোম তন্তু (linen yarn)	..	.. ১৭৬২-১৮৭৩	.. ১৮৭৩-১৯০৩
ক্ষোম বস্ত্র	..	.. ১৭৬৭-১৯০৮	..
তেতোমদ	.. ১৭৮৮-১৮৬৪	.. ১৮৬৫-১৯০২	.. ১৯০২-১৯১৩
সীরা (Malt)	.. ১৭০৩-১৮৬৪	.. ১৮৬৪-১৮৯৮	.. ১৮৯৮-১৯১৩
স্পিরিট	.. ১৮০১-১৮৭০	.. ১৮৭০-১৯০০	.. ১৯০১-১৯১৩
চামড়ার দ্রব্য	.. ১৮০৩-১৮৬৬	.. ১৮৬৮-১৯১৩	
কাগজ	.. ১৭১৪-১৮৯৫	.. ১৮৯৫-১৯১৩	
সাকুল্য	.. ১৭০১-১৮৩০	.. ১৮৩০-১৯১৩	

সূত্র : W. G. Hoffmann-এর British Industry, 1700-1950, Basil Blackwell, Oxford, 1955, 184.

সুতরাং, বৃটিশ শিল্প অগ্রগতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শিল্পে শিল্পে বর্ধন হার ভিন্নতর ছিল। বৈষম্যধর্মী অগ্রগতির এই চিত্র লক্ষ্য করে অনেক লেখক মন্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতিতে একটা নিয়ম বিরাজমান এবং তদনুসারে 'অগ্রগতি নিয়ম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অগ্রসরের এই বিধি গণিতিক পরিভাষায় 'বর্ধন রেখা' দিয়ে নির্দেশিত করা যেতে পারে। এই রেখা অনেকটা জনসংখ্যা কি জীববিদ্যা পর্যালোচনায় ব্যবহৃত রেখার ন্যায় হতে পারে। তবে এই রেখার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ে সাধারণ মন্তব্য করা সম্ভব নয়। কারণ বর্ধন হার কি স্থায়িত্বে অথবা মাত্রায় শিল্পে শিল্পে ভিন্নতর হয়। শুধু এইটুকু হয়ত বলা যেতে পারে যে, বিশেষ শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধারণতঃ ক্রম-হ্রাসমান হারে নিষ্পন্ন হয়।[৩০]

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই পশ্চাৎধাবন কিভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে? উত্তর পেতে হলে বৃটিশ শিল্প অগ্রগতির গোড়ার কথায় যেতে হবে। খতিয়ে দেখতে হবে সার্বিক অর্থনীতি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রতিটি শিল্পের অবস্থান তথা শিল্পে শিল্পে অগ্রগতির বৈষম্যচিত্র উদ্ঘাটিত করায় শিল্পভিত্তিক অবদান। তার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে অর্থনীতিতে আবির্ভূত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন রূপ-কাঠামো। হফ্‌ম্যান বলেন, নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি হার-বৈষম্য নির্ণীত হয়।[৩১]

(ক) অর্থনীতির সাধারণ রূপ-নক্সা, ভোগ-দ্রব্য উৎপাদনশীল শিল্পসমূহে সম্প্রসারণ পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শিল্প সংস্থাকে উদ্দমিত করে, বিশেষ করে বিনিয়োগ বর্ধনকারী শিল্পসমূহকে;

(খ) বাজার-পরিসর; দেশীয় উৎপাদন দ্বারা দেশীয় চাহিদা মিটাবার অনুপাত অনুযায়ী এই বাজার-সীমা নিয়ন্ত্রিত হয়। বহির্বিশ্বে বাজার-পরিসর সম্প্রসারিত করার সম্ভাবনা ও তার অন্তর্ভুক্ত;

---

৩০. শিল্প অগ্রগতির বিষদ আলোচনা পেতে হলে দেখুন A. F. Burus-এর Production Trends in the United States Since 1870, National Bureau of Economic Research. New York, 1934, পৃঃ ১৬৯-১৭৩।

৩১. হফ্‌ ম্যানের প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১১১।

(গ) বাজার-চরিত্র : সদ্য-সৃষ্ট চাহিদা মিটাবার মত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পে অগ্রগতি হার অধিক হবে। আর এই চাহিদা যদি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মত হয় তাহলে সোনায়-সোহাগা এবং

(ঘ) অগ্রগতি হার পুঁজি ও শ্রম সরবরাহ অনপাতে হবে। অর্থাৎ পুঁজি ও শ্রম-শক্তি বিশেষ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলে তথায় বর্ধন হার জোরাল হবে। অন্যদিকে, পুঁজি ও শ্রমের অপ্রাচুর্যতায় সম্প্রসারণ সীমিত হতে বাধ্য।

মন্দাতালে অগ্রসরের ব্যাখ্যা দিতে যেয়েও অনেকে অনেক কারণ তুলে ধরেছেন। যেমন কুজ্‌নেট। তিনি শিল্পে শিল্পে হ্রাসমান অগ্রগতির তারতম্যের যুক্তি দিতে যেয়ে নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহকে তালিকাবদ্ধ করেছেন।

(ক) প্রযুক্তিক-অগ্রগতি শিথিল হয়ে পড়া :
(খ) সম্পদ সামগ্রী নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া :
(গ) স্বল্প সমপ্রসারণশীল শিল্পসমূহ পরিপূরকধর্মী দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পসমূহকে পিছু টানে : বিপরীতক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ; এবং
(ঘ) শিল্পোন্নত দেশের পরিপক্ক শিল্পের ঠেলায় অনুরূপ শিল্প অন্যদেশে বাধার সম্মুখীন হয়।[৩২]

শিল্প-অগ্রগতির ইতিহাসে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টি আপাতঃ-বিরোধী হলেও নিখাঁদ সত্য। অর্থনীতি যখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে ধাবমান তখন বিশেষ বিশেষ শিল্পে হ্রাসমান প্রবণতা জন্ম দেয়। অর্থাৎ সার্বিক অগ্রগতি ও শিল্পে ক্রমহ্রাসমান বর্ধন পাশাপাশি এগোয়।[৩৩] বৃটেনের ইতিহাস লক্ষ্য করুন। এই ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, উন্নয়নশীল দেশে উদ্ভাবনী শক্তিনিচয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা প্রভাবিত করে। একদিকে নিরন্তর নব নব সংযোজন ঘটে, অন্যদিকে বিদ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদায় সংকোচন বেড়ে চলে। প্রতিটি নব্যসামগ্রী পুরাতন দ্রব্যের চাহিদাক্ষেত্র থেকে ক্রয়ক্ষমতা গ্রাস করে নেয়। তা আপেক্ষিক হতে পারে, হয়ত বা পুরোপুরী হতে পারে। সমপ্রসারণ যত দ্রুত হয়

৩২. কুজ্‌নেটের প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১০-৫৮।

৩৩. বারনস্‌-এর পূর্বোক্ত বই, XVI, পৃঃ ১২২।

সঙ্কোচনী প্রভাব তত ব্যাপক হয়। তার ফলে পুরানো দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু করে। দীর্ঘকালীন বিবেচনায় এই সবের উৎপাদন অধিক করা যেতে পারে না। কারণ তাহলে, বাজারস্থ করা সম্ভব হবে না। অন্যদিক থেকে দেখুন। উৎপাদন প্রণালী উন্নত হয়ে কতকগুলো শিল্পে উৎকানিমূলক প্রভাব জন্ম দেয়। ফলে অন্যত্র সঙ্কোচন ঘটতে বাধ্য। উদাহরণ দেখা যাক। জাহাজ নির্মাণে অধিক পরিমাণে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই, কাষ্ঠশিল্পে সঙ্কোচন ঘটতে বাধ্য। অথবা দেখুন উৎপাদন-আঙ্গিক উন্নত হয়ে কাঁচামাল ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব করে তুলে। তাতে কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পসমূহে মন্দাভাব জন্ম নিতে বাধ্য। কারণ অধিক উৎপাদন ঘটিয়ে যে বাজার পাওয়া যাবে না। আবার দেখুন, সম্পদ পরিমাণ সীমিত। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহ বিদ্যমান শিল্পের সাথে প্রতি-যোগিতায় নামে। পুঁজি, শ্রম, কাঁচামাল ইত্যাদি করায়ত্ত করার নিমিত্তে। কাজেই, নব নব শিল্পের কলেবর বর্ধন মানে নির্ঘাত পুরানো শিল্প সংস্থা সমূহের সঙ্কোচন।

ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে অগ্রগতির এই বৈষম্যপূর্ণ চিত্র পেশাগত বন্টনেও প্রতিফলিত হয়। বৃটিশ অর্থনীতির খোল-নলচে রূপান্তরের কথা চিন্তা করুন। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকসংখ্যা সরাসরি হ্রাস পায়। সংখ্যাভিত্তিক প্রমাণ দেখুন : ১৮৫১ সালে কর্মীসংখ্যা ছিল শতকরা ২২ ভাগ। তা কমে কমে ১৮৮১ সালে এসে দাঁড়ায় ১২ ভাগে, ১৯১১ সালে ৮ ভাগে আর ১৯৩১ সালে ৬ ভাগের কাছাকাছি। শিল্পজগতের কর্মীসংখ্যা অবশ্য বাড়েনি। তথ্যগণিতের হিসাবে তা ছিল ১৮৫১ সালে শতকরা ৩৯ ভাগ। ১৮৮১ সালে নেমে আসে ৩৩ ভাগে। ১৯১১ সালে একটু বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ ভাগে। আবার ১৯৩১ সালে একটু নেমে হয়ে উঠে ৩৩ ভাগ। সেবধর্মী (Services) কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অবশ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫১ সালে ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। তা বেড়ে বেড়ে ১৮৮১ সালে হয় ৩৩ ভাগ, ১৯১১ সালে ৪৬ ভাগ আর ১৯৩১ সালে প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।[৩৪]

সুতরাং, শ্রমের গতি-পরিবর্তন ঘটে ব্যাপক হারে। প্রাথমিক শিল্প-সমূহ থেকে প্রচুর শ্রমিক চলে যায় তথাকথিত তৃতীয় পদের তথা সেবা-ধর্মী শিল্পসমূহে। এই গতি পরিবর্তনকে সাধারণতঃ জীবনযাত্রার মানের

---

৩৪. Ojala প্রণীত প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৮৪।

ঊর্ধ্বগতির সঙ্কেত বলে চিহ্নিত করা হয়। তেমনি তা ক্রমবর্ধমান জীবন-যাত্রা প্রণালীর পরিণতি বলেও উল্লেখিত হয়। তাই কলিন ক্লার্ক বলেন, "মাথাপিছু আয় স্বল্প হলে তৃতীয় পদের শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কম হয়, আর কৃষিকাজে অধিক লোক ব্যাপৃত থাকে। গড় আয় বেশী হলে তৃতীয় পদের শিল্পে-উৎপাদকের সংখ্যা বেড়ে যেতে বাধ্য। কারণ জানতে হলে মূলতঃ চাহিদা দিকটা খতিয়ে দেখতে হবে। আয় বেড়ে যায়। তার সাথে সেবাধর্মী নয়। তাই আভ্যন্তরীণ শ্রম সরবরাহ দিয়ে নিষ্পন্ন করতে হয়।"[৩৫]

এবারে ব্যাখ্যা দেখা যাক। কৃষিখাত থেকে ক্রমে ক্রমে শ্রমিক সরে যাওয়ার কারণ বিবৃত করা যাক। দুইটি কারণ একত্রিত হয়ে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রথমতঃ, শ্রমিক পিছু কৃষিফলন প্রচুর বেড়ে যায এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই তুলনায় মাথাপিছু কৃষিদ্রব্য ভক্ষণ হ্রাস পায়। এই দুয়ের সমন্বয়ে কৃষিকাজে শ্রমিক প্রয়োজনীয়তা ন্যূন হয়ে উঠে। ফলে মোট শ্রমিকের তুলনায় কৃষিকাজে নিরত শ্রমিক অনুপাত হ্রাস পায়। কৃষি ফলনে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে সংস্থা ও আঙ্গিকগত উন্নতি-অগ্রগতির ফলে। আর কৃষি-দ্রব্যের চাহিদা নিম্নগামী হয়ে উঠে পরিবর্তিত ভোগ-বিচিত্রার পরিণাম হিসাবে। পরিবর্তিত এই ভোগ-বিচিত্রার ফলে। অকৃষিজাতদ্রব্য কৃষি-দ্রব্যের স্থান অনেকটা দখল করে নেয়। এদিকে আবার সমাজ কাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। নাগরিক জীবন কলেবর বৃদ্ধি পায়।[৩৬] কৃষিকাজে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে প্রচুর উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। এই উদ্বৃত্ত নাগরিক জীবন ও শিল্পকেন্দ্রসমূহের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে (তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। বস্তুতঃ, বৃটেনে কৃষি-বিপ্লব শিল্প-বিপ্লবের অগ্রনায়ক হিসাবে ক্রিয়া করেছিল। শিল্প-অগ্রগতির ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিল। আজকের অনুন্নত দেশগুলোর জন্য এ এক

---

৩৫. দেখুন Colin Clark-এর Conditions of Economic Progress, Macmillan and Co. Ltd., London, 1940, পৃঃ ৬-৭। আরও দেখতে পারেন A. G. B. Fisher রচিত Economic Progress and Social Security, Macmillan and Co. Ltd., London, 1945, পৃঃ ৫-৬।

৩৬. দেখুন যথা R. Leckachman সম্পাদিত National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Doubleday & Co., New York 1955-এ প্রকাশিত S. Kuznets-এর "Towards a Theory of Economic Growth", পৃঃ ৯৯।

বড় শিক্ষা যে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করতে হলে প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে নেয়া একান্ত আবশ্যক। তৃতীয় ভাগে এই বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

বৃটিশ অর্থনীতিতে পেশাগত বন্টনের ধারাপ্রবাহ উপরোক্তরূপ ছিল। সাধারণভাবে এই প্রত্যয় সত্য বটে। তবে একটা সাবধানবাণী এক্ষণে উচ্চারণ করে রাখা ভাল।[৩৭] তথ্যগণিত পরিসাংখ্যিক হিসাব মাত্র। এই হিসাবে দোষ-ত্রুটি থাকা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই, পরিসাংখ্যিক চুলচেরা হিসাবে এই উপপাদ্য নিখাঁদ সত্য হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারেনি। অথবা চুলচেরা মাপকাঠিতে অর্থনৈতিক নিয়ম হিসাবে ব্যাপকত্ব লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া, বৃটেনের জন্য যা সত্য ছিল তা অন্যসব দেশেও সত্য হবে এমন কোন কথা নেই, অধিকাংশ দরিদ্রদেশে সেবাধর্মী কাজের মাত্রা এমনিতেই অধিক। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পেশাগত বন্টনে হয়ত অনুবন্ধী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু, তা যে তথ্যগণিতের আকস্মিক ঘটনা নয় তা কে বলবে? অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের ক্রিয়াকর্ম-প্রসূত মনে করার এমনকি হেতু আছে? কাজেই, কলিন ক্লার্কের মন্তব্যকে

---

৩৭. Baner and Yamey প্রদত্ত সমালোচনার আলোতে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাঁরা Clark প্রদত্ত প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। তার বিশ্লেষণী ও পারিসাংখ্যিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের আলোচনার মূল বক্তব্য এই "ক্লার্কের অভিমত ঠুনকো বিশ্লেষণী পাদমূলে প্রতিস্থাপিত। ...বেশ কতকগুলো স্বতন্ত্র কারণে তা এইরূপ। প্রথমতঃ, তৃতীয় পদের শিল্পসামগ্রী সবগুলোই ভোগবিলাসের দ্রব্য নয়। বেশ কিছু সংখ্যক সামগ্রী প্রয়োজনীয়ের আওতায় পড়ে। কাজেই তাদের চাহিদা আয় স্থিতিস্থাপকতা তেমন চড়া নয়। ভিন্নদিকে, প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পদের বহু সামগ্রী হয়ত ভোগ বিলাসের পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক অগ্রগমন কালে তৃতীয় মানের শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকহারে শ্রমিকের বদলে মূলধন ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয়তঃ, সার্বিক অর্থনীতির আঙ্গিকে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা প্রত্যয় সমষ্টিকরণ জটিলতার জন্ম দেয়। তার ফলে, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত ও অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তার গড়-মূল্য সম্পর্কে সর্বপ্রসারী মন্তব্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তা আরো জটিল প্রতিপন্ন হয় যখন আপেক্ষিক উপাদান দর ও বন্টন পরিবর্তিত হতে থাকে।" দেখুন **P. T. Baner & B.S. Yamey প্রণীত "Economic Progress and Occupational Distribution", Economic Journal LXI, No. 244, পৃঃ ৭৪৮-৭৫৪ (ডিসে. ১৯৫১)।**

খুব বেশী করে বললেও বলা যায় যে তা নেহায়েত একটা সাধারণ প্রবণতা মাত্র. যদি পেশাগত 'পারম্পরিকতা'র গুরুত্ব নগণ্য মনে করার কিছু নেই।[৩৮]

তাছাড়া, একথা ও সত্য যে বৃটিশ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পায়। জাতীয় আয়ের হিসাবে কৃষির অবদান ছিল ১৮৬৭-১৮৬৯ সালে ২০ শতাংশ। তা কমে ১৯১১-১৯১৩ সালে ৭ শতাংশে উপনীত হয়। আর ১৯৩৫-১৯৩৯ সালে তা হয়ে উঠে মাত্র ৪ শতাংশ।[৩৯] সুতরাং, এটা পরিষ্কার যে ১৮৬০ ও ১৮৭০ দশকের "বৃটিশ কৃষি-প্রধান্যের সেই স্বর্ণযুগ" কাটিয়ে এসে তা মন্দীভূত হয়ে দাড়ায়। প্রাধান্য হারিয়ে শিল্পের কাছে তাঁবেদার হয়ে উঠে।

সুতরাং, শিল্পজগত ফেঁপেফুলে উঠে, তার কলেবর বৃদ্ধি পায়। শিল্প অগ্রসরের এই চমৎকৃত স্বার্থকতার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যাপক হারে শহরাঞ্চলে জন-নির্গমণ চলে। ১৮৪১ সালে গ্রাম্য-জিলাসমূহের পরিমাণ ছিল দেশের মোট জিলার তুলনায় প্রায় ৩৯ শতাংশ। অথচ ১৯১১ সালে তা নেমে এসে দাঁড়ায় মাত্র ১৯ শতাংশে। অন্যদিকে, একই সময়কালে কয়লা-অঞ্চল গুলোতে লোকসংখ্যা বেড়ে যায় ৮ ভাগ থেকে ১৫ ভাগে আর শহরাঞ্চলে বেড়ে যায় ৫৩ শতাংশ থেকে ৬৬ শতাংশে।[৪০]

ক্যাসরনক্রস্ আভ্যন্তরীণ নির্গমণের কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন জনসংখ্যার এই পরিবর্তিত চিত্রের জন্য রেলপথ স্থাপন তথা

---

৩৮. দেখুন. যথা—Fisher-এর "A Note on Tertiary Production," প্রাগুক্ত, LXII, No. ২৪৮, পৃঃ ৮২০-৮৩৫ (ডিঃ, ১৯৫৩) এবং "Marketing Structure and Economic Development," Quarterly Journal of Economics, LXVII, No. 1 পৃঃ ১৫১-১৫৪ (ফেব্রু. ১৯৫৪); S. G. Triantis-এর "Economic Progress, Occupational Redistribution and International Terms of Trade," Economic Journal, LXIII, No. 251, পৃঃ ৬২৭-৬৩৭ (সে. ১৯৫৩); A. L. Minkes প্রণীত "Statistical Evidence and the Concept of Tertiary Industry," Economic Development and Cultural Change, III, No. 4, পৃঃ ৩৬৬-৩৭৩ (জুলাই, ১৯৫৫)।

৩৯. Ojala-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১২৯।

৪০. Cairncross-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৭৭, ৭৯।

যানবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নতির বিশেষভাবে দায়ী। "রেলপথ স্থাপনে কর্ম জন্ম নেয়; কর্মমাত্রা বাড়ে। শহরাঞ্চলে ধাতব কাজে অভিজ্ঞ কারিগরের দরকার পড়ে। প্রকৌশলী প্রয়োজন হয়। তেমনি হাজারো প্রকৃতির বহু কারিগরের উপস্থিতি প্রয়োজন পড়ে। রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় চলাচল ও মালামাল আনা-নেওয়া সহজ ও সস্তা হয়। গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত শ্রমিকের জন্য তা উস্কানি হিসাবে কাজ করে। পরিশেষে, যানবাহন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির ফলে (রেলপথ স্থাপনের কারণে) শহরাঞ্চলে অবস্থিত বৃহদাকার শিল্পসমূহের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি চড়িয়ে দেয়। তাতে করে গ্রাম্য কারিগর ও ছোট্ট-খাট্ট শিল্পসংস্থা টালমাটাল অবস্থায় পড়ে। বাধ্য হয়ে শহরাঞ্চলে হিজরত করে।"[৪১]

কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির নজির স্থাপন করেছিল বৃটেন। কিন্তু, তার সেই প্রাধান্য ১৮৭০ সাল থেকে শুরু হয়ে হারিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সে নির্ভরশীল হয়ে উঠে তার খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য বিদেশীদের উপর। ১৮৬০ দশকে যে বৃটেন আমদানী করত তার খাদ্যশস্যের (grain) মাত্র এক তৃতীয়াংশ, সেই বৃটেন ১৮৮০ দশকে এসে আমদানী করতে থাকে মোট চাহিদার প্রায় ৪৪ শতাংশ আর গম আমদানী করে প্রায় ৬৫ শতাংশ।[৪২] কর্ষিত জমির পরিমাণ কমে যায় এবং কৃষি নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

বৃটেন গম উৎপাদনে বিশেষভাবে পেছনে পড়ে যায়। ১৮৭০ ও ১৯১০ সময়কালে গম-চাষের জমি প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। আমেরিকা ও ক্যানাডার দিগন্তব্যাপী সেই বিশাল প্রান্তরে উৎপাদিত গমের সাথে প্রতিযোগিতায় বৃটিশ গম তাল সামলাতে পারেনি। রেলপথ স্থাপিত হয়ে অবস্থা আরো কাহিল করে দেয়। তার সাথে সমুদ্রগামী জাহাজ যুক্ত হয়ে পরিবহণ-ব্যয়ে বিপুল হ্রাস ঘটিয়ে দেয়।[৪৩]

কৃষি অবনতির এই চিত্র প্রমাণ দেয় যে জমি-সীমাবদ্ধতা শক্ত কিছু নয়। কাল ছিল যখন সীমিত ভূমির পরিমাণ কঠিন সমস্যার সৃষ্টি

---

৪১ Cairncross-এর পর্বোক্ত বই, পৃ: ৭৫।

৪২. দেখুন, R.C.K. Ensor-এর England 1870-1914, Glarendon Press, 1936, 116.

৪৩. দেখুন, J. H. Clapham-এর An Economic History of Modern Britain III, Cambridge University Press, 1951, পৃ: ৭২-৭৩।

করত। কিন্তু, সেদিন হয়েছে বাসী। এখন তা তেমন আর জটিল কিছু নয়। প্রযুক্তিক জ্ঞানে অর্থনীতি এগিয়ে চলে। নব নব বহুমুখী উৎপাদন-সম্ভাবনা জন্ম নেয়। অর্থনীতি জমি সরবরাহের সেই সুকঠিন নিগূঢ় থেকে অব্যাহতি পায়। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীর সেই লোমহর্ষক ভীতিভয় আস্তাকুড়ে নিপতিত হয়। তাঁর গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী ক্রমহ্রাসমান বিধি শিথিল হয়ে পড়ে। তার বাধন হাল্কা হয়ে উঠে। যে শক্তি-নিচয়ের ক্রিয়াকর্মের ফলে ভূমি তার অর্থনৈতিক অপরিসীম গুরুত্ব হারিয়ে বসে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) কৃষি-পণ্য উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উপাদান-সামগ্রী নিয়োজিত হয়;

(২) নিয়োজিত উপাদান সামগ্রীর মধ্যে ভূমির পরিমাণ সীমিত হয়। তা বাড়ে না। অথচ কিনা, উপাদান সংযোগে পুনর্বিন্যাস ঘটেছে যার ফলে শ্রম ব্যবহার হ্রাস পায়; এবং

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থানান্তর সম্ভব করে তুলে। বিনিময় সহজ করে দেয়। শিল্প-শ্রমিকের ফলন দিয়ে কৃষি-শ্রমিকের ফলন পাওয়া যায়। 'ক' দেশের শিল্প-শ্রমিক যা উৎপাদন করে তা দিয়ে 'খ' দেশের প্রচুর কৃষিপণ্য আমদানী করা যায়। অথচ 'ক' দেশের এই শ্রমিক নিজের দেশে কৃষিকাজে ব্যাপৃত থেকে অতটা ফলাতে পারত না।[৪৪]

সুতরাং, এই সকল শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হয়ে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস করে দেয়। তার ফলে উপাদান হিসাবে কৃষিজমির মূল্য-সংযোজন (value added) ন্যূন হয়ে উঠে। ক্রমে ক্রমে তা অন্যান্য উপাদানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে নগণ্য হয়ে উঠে। বৃটেনের জাতীয় আয়ে কৃষি অবদানের নিম্নগামী চিত্রটি প্রথম কারণটির সঙ্কেত দেয়। তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় বৃটিশ শ্রমিকের পরিবারওয়ারী ব্যয়চিত্র লক্ষ্য করে। ১৮০০ সালে প্রতিটি শ্রমিক পরিবার তার আয়ের ৭৫ ভাগ ব্যয় করত খাদ্যসামগ্রী কিনে। ১৯৪৮ সালে এসে তার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র

৪৪. (১) ও (২) নম্বর কারণদ্বয় বিশ্লেষণিক ও প্রয়োগিক ভিত্তিতে বিশদ আলোচিত হয়েছে T.W. Schuttz-এর Economic Organization of Agriculture, McGrow-Hill Book Co., New York, 1953, অষ্টম অধ্যায়। ভূমির গুরুত্ব নির্ণয়নে বহু রকম হিসাব-নিকাশ করা যেতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে "মূল্য-সংযোজন" নীতি গৃহীত হয়েছে।

২৭ ভাগে।[৪৫] খাদ্যসামগ্রীতে সুতরাং, ব্যয়পরিমাণ বিশেষভাবে কমে যায়। এদিকে কৃষিভূমির পরিমাণও অন্যান্য উপকরণের তুলনায় তেমন একটা সম্প্রসারিত হয়নি।[৪৬]

বৃটিশ অগ্রগতির ইতিহাস মেলে ধরলে দেখা যায় যে বৃটেন তার অগ্রগমণ পথে সর্বসময়ে প্রচুর পরিমাণ উপাদান-সামগ্রী পেয়েছে। বস্তুত, উপকরণ সামগ্রীর সরবরাহ সর্বকালে ক্রমবর্ধমানশীল ছিল। বৃটেন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে, কৃষিকাজে বেশী উপাদান খাটিয়ে লাভ নেই। অধিক মাত্রায় সম্পদ কৃষিক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা লাভজনক নয়। বৃটেন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পেরেছিল এই কারণে যে কৃষি-ফলন বিশেষভাবে বেড়ে যায়। একথা আমরা পূর্বেও বলেছি। তারচেয়েও বড় কথা, শ্রমিক-পিছু কষি-ফলন শ্রমিক-প্রতি শিল্প-ফলন অপেক্ষা কম বলে বিবেচিত হয়।[৪৭] তাব ফলে খাদ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করা অধিক সুবিধাজনক বলে গণ্য হয়। এদিকে, নব নব উৎপাদন-সম্ভাবনার বাস্তবায়নে ও পরিস্ফুটনে সমাজ অধিক হারে অকৃষিজাত দ্রব্যাদির প্রতি উৎসাহী হয়। এঙ্গেলস্ আইনের নীতি মেনে অধিক পছন্দনীয় ভক্ষণ-চিত্রে কৃষিপণ্য ক্রমে ক্রমে পরিমাণের আনুপাতিক হিসাবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

এবারে আলোচনায় ইতি টানা দরকার। সুতরাং কথা হল যে উন্নয়নশীল বৃটেনে কৃষি তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। ১৮৭০ দশকের পর হতে বৃটের বস্তুত, তার খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য বিদেশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শতাব্দী ডিঙ্গিয়ে এসে কৃষি একেবারে নগণ্য হয়ে উঠে। আর শিল্প সর্বময় গৌরবে, প্রাচুর্যে ও শোভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জীবন হয়ে উঠে নগর-কেন্দ্রিক। এই পাদমূলে দাঁড়িয়ে বৃটেন শিল্পজগতে ভবিষ্যৎ বিশেষী-করণের পথে এগিয়ে চলে

৫. নিবিড় উন্নয়ন অগ্রগতি: সংক্ষিপ্তি

সুতরাং, একথা পরিষ্কার যে বৃটিশ শিল্প-অগ্রগতিতে বহু শক্তি, বহু প্রভাব সক্রিয় ছিল। তারা পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে শিল্প প্রগতি-প্রক্রিয়া

---

৪৫. ঐ, পৃ: ১২৯।
৪৬. ঐ, পৃ: ১৩৪-১৩৯।
৪৭. Rostas প্রণীত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৭৯-৮০, ৯০-৯১।

সামনে বয়ে নিয়েছিল। পরিণতি হিসাবে আমরা দেখতে পাই জনসংখ্যা, প্রযুক্তি-বিদ্যা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ের পরিবর্তিত পট ও যুগপত সমাবেশ। নিবিড় এই অগ্রগতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সংক্ষিপ্তি দেয়া যাক :

(১) ১৮৭০ ও ১৯৩৯ সালে প্রকৃত জাতীয় আয় প্রায় চতুর্গুণ হয়ে যায় আর মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

(২) জাতীয় আয়ের এই উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের জন্য দায়ী বহু কারণের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উৎপাদন-ক্ষমতায় ব্যাপক বৰ্দ্ধন।[৪৮] প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও তার সার্বিক প্রয়োগ এই বর্ধন সম্ভব করে তুলেছিল। উদ্ভাবনী যুগের সেই 'বরফ-ভাঙ্গা' পর্বে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। মেশিনে তৈরী যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার বহুল প্রচলিত হয়। শিল্প ও কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি অন্তরিত হয়। রেলপথে ও জলপথে সমাদর লাভ করে।

(৩) অন্য উল্লেখযোগ্য সরাসরি অবদানকারী বিষয় ছিল জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও মূলধন-সংগঠনে তাল রেখে সম্পদ তথা উপাদান সরবরাহে সম্প্রসারণ। মূলধন-সংগঠন ঘটে সন্তোষজনক হারে এবং তা মূলতঃ প্রযুক্তিক অগ্রগতির পরিণতি হিসাবে।

(৪) কারখানা প্রথা চালু হওয়ার সময় থেকে, বাজার কাঠামো আটঘাট বেধে সুষ্ঠু হয়ে উঠার পর হতে এবং ব্যাঙ্কিং প্রথায় সম্প্রসারণ ঘটার সাথে সাথে সংস্থাগত আকার-আঙ্গিকে প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হয়।

(৫) লোকসংখ্যা বেড়েছে। ম্যালথুশীয় খড়গ মাথার উপর ঝুলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর পুরো আধাটা তেমনি কেটেছে। কিন্তু, অবশেষে সেই ভয় দূরীভূত হয়েছে। জমির সীমাবদ্ধতা বাঁধা হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষির প্রাধান্য লোপ পেয়ে শিল্প ও বাণিজ্যের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) শিল্প-পরিধি প্রসারিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজন হয় অধিক খাদ্যশস্যের। বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়

---

৪৮. পরবর্তী বাকী অধ্যায়সমূহে আন্তর্জাতিক শক্তিনিচয় লিপিবদ্ধ করা হবে। ঐ সমস্ত শক্তিনিচয় যারা প্রকৃত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কৃষিপ্রথায় রদবদল ঘটিয়ে, অধিক হারে বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষবাস প্রবর্তন করে কৃষি-ভূমি সম্প্রসারিত করে।

(৭) অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন হারে সম্প্রসারিত হয়। তবে বিশেষ বিশেষ শিল্প শাখা সাধারণতঃ হ্রাসমান হারে বর্ধিত হয়। শিল্পে শিল্পে বৈষম্যমূলক এই অগ্রগতির ফল হিসাবে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান ও গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়। পরিণামে কাঠামোগত নক্সা নিরন্তর রূপ বদলায় এবং আঞ্চলিক সম্পদ বন্টন পরিবর্তিত হতে থাকে।

(৮) ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সামাজিক পরিবর্তন অনুকূল হয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগমণ সহজ করে দেয়। অন্যথায় হয়ত তেমনটা হত না।

(৯) যে প্রতিষ্ঠানিক ও আদর্শের প্রেক্ষাপুটে বৃটিশ অগ্রগতি লালিত-পালিত হয়েছিল তা ছিল উদারপন্থী ধনতন্ত্রবাদ। কার্যকরী ও প্রশংসার্হ উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়ে উদ্যোক্তা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এবং পরিণামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিল। সরকার সরাসরি মাঠে নামেননি বটে তবে পরিবেশ সুস্থ রাখায়, অনুকূল আবহাওয়া বিদ্যমান রাখায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখায় এবং বাণিজ্য ও শিল্পগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখায় সক্রিয় ছিল। পুঁজি সরবরাহ ও শিল্পক্ষেত্রে বিধৃতি সাধিত হয়েছিল সরকারী খাতে নয়, বেসরকারী খাতে।

(১০) উৎপাদন-ক্ষমতা ও প্রকৃত আয়ে বর্ধন কিন্তু, স্থিতিশীল ছিল না। এই শতাব্দীর সূচনাপর্বে অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রসর অব্যাহত রাখা সহজ নয়। স্বাভাবিক নিয়মে তথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা অক্ষুণ্ণ থাকার প্রশ্নই উঠে না।

দশম পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিকভাবে উপাদান বিচলন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বৃটেনের উন্নয়ন-অগ্রগতি নিষ্পন্ন হয় বিশ্ব-অর্থনীতির বিস্তৃত পটভূমিকায়। সুতরাং, এই সময়কার অগ্রগতি ইতিহাস বিশ্ব-অর্থনীতির ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপুটে বিবেচ্য। যান্ত্রীকরণ এগিয়ে চলে। অন্যান্য দেশ উন্নতির পথে ধাবমান হয়। শ্রম ও পুঁজির আন্তর্জাতিক গতায়াত জোরদার হয়। দেশের পর দেশ আন্তর্জাতিক বাজারের আওতায় আসে। বিশ্ব-বাণিজ্য প্রবলতর ও সুসংহত হয়। ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায়। এক দেশ অন্য দেশেব সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে উঠে। একের উন্নতি অন্যের গায়ে দ্যোতনা সৃষ্টি করে। দেশে দেশে নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান হয়। এক দেশে নিবিড় অগ্রগতি অন্যদেশে বিস্তৃত অগ্রগতিব রূপে প্রতিভাত হয়। এক দেশে উন্নতি অন্য দেশে প্রভাব বিস্তার করে। অন্য দেশের অগ্রগতি ধারায় বলিষ্ঠতা প্রদান করে। এদিকে, আভ্যন্তরীণ অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহে প্রভাব বিস্তার করে চলে। বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে উঠে।

অগ্রগতির এই পূর্ণ চিত্র প্রস্ফুটনের ভূমিকা হিসাবে বক্ষমান নিবন্ধে শ্রম ও পুঁজির আন্তর্জাতিক গতায়াত আলোচিত হবে। পরবর্তী দুই অধ্যায়ে কেন্দ্রীভূত তথা নিগূঢ় ও বিস্তৃত অগ্রগতির আন্তঃক্রিয়ার রূপটি তথা মূল বৈশিষ্টাবলী উদ্ভাষিত করা হবে।

১. উপাদান সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

অন্তর্জাতিক অগ্রগতির ধারা-প্রক্রিয়া অনুধাবনে প্রথমে একটা সহজ অথচ মৌলিক কথা স্বীকার করে নেয়া দরকার। উপাদান-সরবরাহ দেশে দেশে ভিন্নতর হয়। সম্পদ বন্টনে দেশে দেশে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান। এক দেশে এক জিনিস অধিক বিদ্যমান অন্য দেশে তা স্বল্পমাত্রায়

পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দেশে হয়ত তা মোটেই নাই। সেই দেশে হয়ত অন্য আরেকটি সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তা হয়ত প্রথমোক্ত দেশে নামমাত্র পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সব বিষয়ে একই কথা, একই কাহিনী। কোথায়ও হয়ত জনবল পরিবেশ বিরাজমান। অন্যত্র তেমন নয়। আবার কোথায়ও হয়ত পুঁজিসামগ্রী তেমন নেই অথচ লোকসংখ্যা, কি গুণগত বিচারে কি বয়স-মাত্রার বিবেচনায় বেশ সুখপ্রদ। সোজা কথায়, উপাদান সামগ্রী বিশ্বে অসমভাবে বন্টিত।

সুতরাং, একথা মেনে নেয়া গেল যে দেশে দেশে বৈষম্যমূলক উপাদান-সরবরাহ বিরাজমান। তার সাথে যুক্ত করুণ অসম চাহিদা নক্সা।[১] কাজেই, উপাদান সামগ্রীর আপেক্ষিক দর দেশে দেশে ভিন্নতর হতে বাধ্য। উদাহরণ লক্ষ্য করুন, ১৮৭০ সালের দিকে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পুঁজি-সামগ্রী ছিল। অথচ সেই তুলনায় ভূমি ও শ্রম-সরবরাহ তেমনটা ছিল না। ফলে, পুঁজির দাম অল্প ছিল। সেই তুলনায় শ্রম ও ভূমির দাম বেশ চড়া ছিল। এবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসুন। সেথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি বিরাজমান ছিল। তাই ভূমির দাম ছিল নগণ্য। সেই তুলনায় শ্রম ও পুঁজির মূল্য ছিল অধিক। ভারতের কথা ভাবুন। এদেশে শ্রম-সরবরাহ ছিল প্রচুর। তাই তার দাম ছিল নামমাত্র। অথচ ভূমি ও পুঁজির আপেক্ষিক দর ছিল বেশ চড়া।

তৃতীয় অধ্যায়ের কথা স্মরণ করুন। ঐখানে আলোচিত হয়েছে যে দেশে দেশে উপাদান সামগ্রীর সরবরাহ অনুপাতে বৈষম্য হেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লাভজনক হয়ে উঠে। আনুপাতিক এই তারতম্যের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়। কথাটা

---

১. মনে রাখবেন কিন্তু, আমরা আপেক্ষিক সরবরাহের কথা বলছি। মোট সরবরাহ নয়। যেমন ধরুন একটা দেশের (যথা বেলজিয়াম) মোট লোকসংখ্যা তেমন বেশী নয়। কিন্তু, দেশের ভূমি ও পুঁজি সরবরাহের তুলনায় তার শ্রম সরবরাহ যথেষ্ট, হয়ত বা পর্যাপ্ত। অন্য আরেকটা দেশের (যেমন ভারত) কথা ভাবুন। তার জমির পরিমাণ হয়ত প্রচুর। কিন্তু, তার লোকসংখ্যাও মাত্রাতিরিক্ত। কাজেই, খাদ্যচাহিদা অসীম। সুতরাং, তুলনামূলকভাবে, ভূমি একটা অপর্যাপ্ত উপাদান। পুঁজি তার চেয়েও স্বল্পমাত্রায় বিরাজমান।

চিত্রাকারে প্রকাশ করা যাক।[২] নক্সাবন্দী হয়ে তা অনেকটা এইরূপ দেখাবে:

আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ	আপেক্ষিক উপাদান-দর	দেশ ক	দেশ খ	দেশ গ
"অত্যধিক পরিমাণ"	সস্তা	শ্রম	ভূমি	মূলধন
"অধিক পরিমাণ"	মাঝারি	ভূমি	মূলধন	ভূমি
"স্বল্প পরিমাণ"	ব্যয়সাধ্য	মূলধন	শ্রম	শ্রম

এই অবস্থায় দেশ ক শ্রমভিত্তিক উৎপন্ন দ্রব্য (যেমন কফি, চিনি, রবার) দেশ হতে রপ্তানী করতে উৎসাহী হবে। দেশ খ জমিভিত্তিক দ্রব্যাদি (যেমন শস্যদানা, পশম) দেশ গ কে বিক্রি করতে উৎসাহী হবে। আর দেশ গ দেশ ক কে পুঁজিভিত্তিক দ্রব্য-সামগ্রী (যেমন বস্ত্র) রপ্তানি করতে উদ্যোগ নেবে। বহুমুখী বাণিজ্য প্রয়াসের ফলে একদিকের স্বল্পতা অন্যদিকের প্রাচুর্য দিয়ে কেটে যাবে। দেশ ক তে গ থেকে প্রাপ্ত আমদানী উদ্বৃত্ত দেখা দেবে। তা খ থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি উদ্বৃত্ত দিয়ে পুষিয়ে দেয়া যাবে। দেশ খ ক থেকে পাওয়া আমদানী উদ্বৃত্তে নিপতিত হবে। সে চট করে গ থেকে পাওয়া রপ্তানি উদ্বৃত্ত দিয়ে তা মিটিয়ে দেবে। দেশ গ-এর বেলায় আমদানী উদ্বৃত্ত ঘটবে দেশ খ থেকে আর রপ্তানি উদ্বৃত্ত দেখা দেবে দেশ ক থেকে।

কালের বিবর্তনে অবশ্য, সম্পদ বন্ট-চিত্র পরিবর্তিত হয়। আপেক্ষিক সরবরাহ-নক্সা নব নব রূপ লাভ করে। শ্রম ও পুঁজির আন্তর্জাতিক বিচলন তেমনতর করে তুলে। প্রযুক্তিক অগ্রগতি সহায়ক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। আভ্যন্তরীণ মূলধন-সংগঠন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূমি-সংস্কার ও কর্ষিত ভূমির মাত্রা বর্ধিত হয়ে রূপনক্সা বিচিত্রতর করে তুলে। উপাদান-সরবরাহের ভিন্নতা এই চিত্র তুলনামূলক ব্যয়-নক্সার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের রূপ-কাঠামোর রঙ্গমঞ্চ বদলে দেয়। অবশ্য চিরদিনের মত তা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সময়ের কপোলতলে তা খোলস বদলিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

---

২. দৃষ্টান্তটি Karl-Erik Hansson-এর-"A General Theory of the System of Multilateral Trade," American Economic Review-XLII. No. 3, 59-68 (March, 1952) থেকে নেয়া। তবে Hansson এর সাকুল্য সুবিধার কথা বাদ দিয়ে তুলনামূলক সুবিধায় জোর আরোপ করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

১৮৩০ সালের ধারেকাছে উপাদান সামগ্রীর আপেক্ষিক সরবরাহ-চিত্র মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল :

আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ	গ্রীষ	কন্টিনেন্টাল ইউরোপ	বৃটিশ যুক্তরাজ্য
"অত্যধিক পরিমাণ"	শ্রম	শ্রম	মূলধন
"অধিক পরিমাণ"	ভূমি	ভূমি	শ্রম
"স্বল্প-পরিমাণ"	মূলধন	মূলধন	ভূমি

গৃহযুদ্ধের পরের কাহিনী। ইতিমধ্যে বাষ্পচালিত জাহাজ প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। ইস্পাত তৈরীর নব নব প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছে। রেলপথ আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। পরিণামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-অঞ্চল উন্নত হয়ে উঠেছে এবং ক্রমে ক্রমে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের জন্য জমি-ভিত্তিক দ্রব্যাদির সরবরাহের বিরাট আকরে পরিণত হয়ে উঠেছে। ১৮৫০ থেকে শুরু হয়ে ১৮৭০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ে কন্টিনেন্টাল ইউরোপেও প্রচুর মূলধন সংগৃহিত হয়। বিশেষ করে জার্মানী ও ফরাসী দেশ এই ব্যাপারে বেশ এগিয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় অধিক হয়ে তেমন করে তুলে, এদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকাসমূহে প্রচুর পরিমাণে লোকসংখ্যা বেড়ে যায়। ১৮৭০ দশকের গোড়ার দিকে উপাদান সরবরাহ—নক্সা পরিবর্তিত রূপ লাভ করে নিম্নরূপ হয়ে উঠে :

আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ	গ্রীষ্মমণ্ডল	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কন্টিনেন্টাল ইউরোপ	বৃটিশ যুক্তরাজ্য
"অত্যধিক পরিমাণ"	শ্রম	ভূমি	শ্রম	মূলধন
"অধিক পরিমাণ"	ভূমি	শ্রম	মূলধন	ভূমি
"স্বল্প-পরিমাণ"	মূলধন	মূলধন	ভূমি	শ্রম

রূপান্তর কিন্তু ঘটেই চলেছে। ১৮৭০ দশক থেকে ১৮৯০ দশক মধ্যবর্তী সময়। কন্টিনেন্টাল ইউরোপে দেশীয় সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি-সংগঠন তীব্রতর ও বেগবান হয়ে উঠেছে। ফলে, আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ—চিত্র নবতররূপ পরিগ্রহ করে :

আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ	গ্রীষ্মমণ্ডল	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কন্টিনেন্টাল ইউরোপ	বৃটিশ যুক্তরাজ্য
"অত্যধিক পরিমাণ"	শ্রম	ভূমি	মূলধন	মূলধন
"অধিক পরিমাণ"	ভূমি	মূলধন	শ্রম	শ্রম
"স্বল্প পরিমাণ"	মূলধন	শ্রম	ভূমি	ভূমি

১৮৯০ দশক কাল। তদ্দিনে পশ্চিম-প্রান্তর প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভূমির আপেক্ষিক স্বল্পতা মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। পুঁজি কিন্তু, অব্যাহত গতিতে এগিয়ে ছুটেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-মূলধনী বাজারের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তার ফলে আপেক্ষিক সরবরাহ চিত্র আবার নবরূপ ধারণ করে বসেছে :

আপেক্ষিক উপাদান-সরবরাহ	গ্রীষ্মমণ্ডল	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কন্টিনেন্টাল ইউরোপ	বৃটিশ যুক্তরাজ্য
"অত্যধিক পরিমাণ"	শ্রম	মূলধন	মূলধন	মূলধন
"অধিক পরিমাণ"	ভূমি	ভূমি	শ্রম	শ্রম
"স্বল্প-পরিমাণ"	মূলধন	শ্রম	ভূমি	ভূমি

সম্পদ সরবরাহের রূপচিত্র পরিবর্তনে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই উভয় শক্তি ক্রিয়াশীল। ভূমি ও শ্রম সরবরাহের পরিবর্তন মূলতঃ দেশীয় সূত্রজাত। মূলধন-গঠনের চিত্রনক্সা রূপান্তরণে কিন্তু বিদেশী প্রভাব বেশ প্রভাবশীল। বৈদেশিক বিনিয়োগ মূলধন সরবরাহের এক উল্লেখযোগ্য সূত্র। বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হওয়ার ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ বলশালী হয়ে উঠে। বৈদেশিক বিনিয়োগ যে কেবল টাকা-পয়সার চাহিদাজনিত যোগান দিয়েই ক্ষান্ত হয় তা নয়। তা মূলত: প্রকৃত মূলধন সংগঠনে সহায়ক হয়। বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে দেশ পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ এবং/অথবা লগ্নী ঘটাতে পারে। বিদেশী ঋণ গ্রহণ মানে আমদানী পরিমাণ অধিক হওয়ার নামান্তর আর তা প্রাপ্য সম্পদে সংযোজনের সামিল যা দিয়ে ভক্ষণ পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে এবং/অথবা লগ্নী পরিমাণ অধিক করে তোলা যেতে পারে। এক কথায় ঋণগ্রহিতা দেশের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, এক দেশে সঞ্চিত সম্পদ অন্যদেশে প্রকৃত মূলধন সংগঠনে সহায়তা করতে পারে।

২. কেন্দ্র থেকে বিদেশে বিনিয়োগ

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার দশক। এই সময়ে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যাপক হারে নিষ্পন্ন হয়। বস্তুত, ইতিহাসের কোন

পর্যায়েই এত অধিক পরিমাণ বেসরকারী বিদেশী লগ্নী সম্ভব হয়নি। এই সময়কার প্রধান উত্তমর্ণ ছিল বৃটেন। তবে ফরাসী, জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের দেয় ঋণের পরিমাণও নেহায়েত নগণ্য ছিল না। প্রমাণের জন্য ১০·১ সারণী দেখুন। তবে এই সব দেশের ঋণের পরিমাণ বৃটেনের তুলনায় অনেক কম ছিল। বৃটেনের পরেই ফরাসীর অবস্থান ছিল। কিন্তু, তার দেয় ঋণ-পরিমাণ বৃটেনের অর্ধেকের সমান মাত্র। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান এক-পঞ্চমাংশ অপেক্ষাও কম ছিল।

সারণী ১০ ১. দীর্ঘসূত্রী বিদেশী-লগ্নী ১৯১৩–১৯১৪

বিনিয়োগকারী দেশসমূহ	পরিমাণ (লক্ষ ডলারের হিসাবে)
বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র	১,৮০,০০০
ফরাসী	৯০,০০০
জার্মানী	৫৮,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫,০০০
বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, সুইজারল্যাণ্ড	৫৩,০০০
অন্যান্য দেশসমূহ	২২,০০০
মোট	৪,৪০,০০০
লগ্নীপ্রাপ্ত অঞ্চল	
আফ্রিকা	৪৭,০০০
এশিয়া	৬০,০০০
ইউরোপ	১,২০,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬৮,০০০
উত্তর আমেরিকার বাকী এলাকা	৩৭,০০০
লাতিন আমেরিকা	৮৫,০০০
ওসানিয়া	২৩,০০০
মোট	8,80,000

সূত্র : United Nations, Department of Economic Affairs, International Capital Movements during the Inter-war Period, Lake Success, Oct. 1949,2,

সে তখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল। বৃটিশ তার সঞ্চয়ের প্রায় সবটাই নিয়োজিত করেছিল রেলপথ স্থাপনে ও নগর নির্মাণে। বিদেশে বিনিয়োগ ঘটিয়েছিল নামমাত্র পরিমাণে। মাত্র ২,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। তার অধিকাংশই গিয়েছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে রেলপথ স্থাপনে এবং বাণিজ্যিক ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে। কিছুটা নিয়োজিত হয়েছিল দূরকল্পী প্রকল্পে। নিকট-প্রাচ্য অথবা দক্ষিণ-আমেরিকায়। ১৮৭০ দশকে এসে লগ্নী আচার-চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং পরিমাণেও বিপুল হারে বেড়ে যায়। এদ্দিন ধরে ইউরোপীয়ান দেশসমূহ কেবল বৃটেনের কাছ থেকে ঋণ পাচ্ছিল। এখন থেকে অন্যেরাও ভাগ বসাতে শুরু করে এবং খুব বড় করে। অধিকাংশ মূলধন প্রবাহিত হ'তে থাকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চল-সমূহে, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী চার দশক সময়ে লগ্নী ইউরোপে বৃটিশ লগ্নী প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে অথচ অন্যান্য দেশে তা বেড়ে যায় প্রায় ৫ গুণ। ১৮৭০ দশকে বিনিয়োগ চলতে থাকে মূলত: অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৮৮০ দশকের শেষ পাদে এসে সিংহভাগ পেতে থাকে আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশকে আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা অধিক ঋণ পায়।

১৮৭০ সালে বৃটিশ বিদেশী বিনিয়োগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে আবদ্ধ ছিল। তারপর তা ঊর্ধ্বগামী মোড় নেয় এবং ১৮৮৫ সালে এসে প্রায় অর্ধেকের মত হয়ে দাঁড়ায় এবং এই পর্যায়ে অবস্থিত থাকে ১৯১৩ সাল নাগাদ। সাম্রাজ্যভুক্ত অধমর্ণ দেশ-সমূহ ঋণ মাত্রার পরিমাপে এইরূপ ছিল: ক্যানাডা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকার নাম উল্লেখযোগ্য। লাতিন আমেরিকান দেশসমূহের মধ্যে আবার আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল পেয়েছিল অর্ধেকেরও বেশী বিনিয়োগ। পৃথিবীর বহু দেশ বিলাতি মূলধন পেয়েছিল বটে। তবে মাত্র অল্প কয়েকটা দেশই প্রায় অধিক ঋণ পেয়েছিল। ১৯১৩ সাল নাগাদ মাত্র ৮টা দেশ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ঋণ কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। দেশগুলো

ছিলো আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রাজিল, ক্যানাডা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৮৭৫ থেকে ১৯১৩ সাল সঞ্চয়ে বৃটিশ বিদেশী বিনিয়োগ প্রায় ২৫০ শতাংশ সম্প্রসারিত হয়। পরিমাণে হয়ে দাঁড়ায় তা প্রায় ৪ বিলিয়ন পাউণ্ডের কাছাকাছি। ১৯১৩ সালেই তা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে এবং বৃটিশ মোট সঞ্চয়ের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী হয়ে উঠে।[৩] ১৯১৩ সালকে সীমা ধরে পেছন দিকে ৪০।৫০ বৎসরকাল বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বৃটেনের বিদেশী বিনিয়োগ ভূমি বাদ দিয়ে প্রায় তার মোট শিল্প ও বাণিজ্যিক মূলধনের সমানুপাতিক। নীট জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে ১৭৮০-১৯১৩ সময়কালব্যাপী পর্যায়ে বার্ষিক লগ্নী গড় প্রায় শতকরা ৫ ভাগ হারে সম্প্রসারিত হয়। ১৯০৫-১৯১৩ সময়ে এই হার প্রায় ৭ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। ১৯১৩ সালে তা ৯ শতাংশে এসে উপস্থিত হয়।

প্রশ্ন উঠে: কি করে তা সম্ভব হল? কিভাবে বৃটেন এত বেশী লগ্নী বিদেশে ঘটাতে সক্ষম হল? উত্তর পেতে দেরী হয় না। বৃটিশ অর্থনীতি অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে ছুটেছিল। এদিকে আন্তর্জাতিক প্রবাহধারা অনুকূল-শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। বিনিয়োগ-প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লগ্নীধারা অব্যাহত রাখায় পরিপক্কে ক্রিয়া করেছিল, তাতে করে বিদেশী বিনিয়োগধারা স্বতঃচলমান হয়ে উঠতে পেরেছিল।

১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে বৃটেনের নীট জাতীয় আয় ৩ গুণ বেড়ে যায়। একথা আমরা পূর্বে বলেছি। জাতীয় আয়ে এই ব্যাপক অগ্রগতির ফলে এবং অসমঞ্জস্যপূর্ণ আয়-বণ্টন পরিস্থিতির পরিণামে জাতীয় সঞ্চয় অধিক হওয়ার সুযোগ পায়। মাত্রাতিরিক্ত এই সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল বলে বিনিয়োগযোগ্য প্রচুর মূলধন জমা হয়েছিল। তা না হলে, তেমন হতে পারত না।

জাতীয় আয়ের এই দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণের মাথায় কিন্তু চড়ে বসে চক্রময় হ্রাস-বৃদ্ধি। চিত্র-বিচিত্র উঠানামার তাল-লয়ে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশী বিনিযোগও এগিয়ে চলে। প্রাচুর্যপর্বে চড়া মাত্রায় বিদেশী লগ্নী হতে থাকে। বস্তুত, প্রাচুর্যপর্বও অতি মাত্রায়

৩. দেখুন A.K. Cairncross প্রণীত Home and Foreign Investment 1870-1913, Cambridge University Press, Cambridge, 1953,2.

বিদেশী বিনিয়োগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবলোকন করা যায়। নীট জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে পরিমাপ করে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ মূলধন-রপ্তানী ঘটে ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯০, ১৯০৭ ও ১৯১৩ সালে। ঠিক যেন ঘনিষ্ঠ অনুবন্ধী সম্পর্ক বজায় রেখে প্রাচুর্য-পর্বের শিখরে অবস্থিত, ১৮৭৩, ১৮৮৩, ১৮৯০, ১৯০৭ ও ১৯১৩ সালগুলোর সাথে।[৪] ধনাত্মক এই পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা উচ্চ বিদেশী লগ্নী, বাণিজ্যচক্রের প্রাচুর্যকাল ও সর্বোচ্চ মুনাফাকে একসূত্রে গ্রথিত করে তুলে[৫] এবং তার থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে বৃটেন তার বিদেশী বিনিয়োগের প্রায় সবটাই নিষ্পন্ন করে প্রাচুর্যপর্বের অর্জিত লাভ দিয়ে।

বিনিয়োগ-প্রক্রিয়া গতিশীল হয়ে উঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠার প্রবণতা জন্ম দেয়। নিজের মধ্যে এমন কতকগুলো সহায়কারী গুণের সমাবেশ ঘটিয়ে নেয় যার ফলে লগ্নীমাত্রা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের সুযোগ পায়। এমনিতর না হয়ে ভিন্নতর হলে এত অধিক বিদেশী বিনিয়োগ সম্ভব হয় কিনা সন্দেহজনক।

যে যে দেশ বিনিয়োগের ভাগ পেয়েছিল সে সব দেশে উন্নয়ন কর্মাবলী জোরদার হওয়ার সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, বিলাতি লগ্নী স্বয়ং উন্নয়ন-অগ্রগতি ক্রিয়া সূচিত করতে শুরু করে। তার ফলে দুমুখী সুফল ফলতে থাকে। লগ্নী চাহিদা তীব্রতর হয়। অন্যদিকে আয়-বর্ধক বিধির পথ বেয়ে ঋণপ্রাপ্ত দেশসমূহে বৃটিশ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা উন্মার্গগামী হয়ে উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আর্জেন্টিনা রেলপথ বানায়। বৃটেন অধিক হারে ইস্পাত-রেল ও রেলপথের অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিক্রি করে। অধিক হারে বস্ত্র চাহিদা মিটায়। তেমনি হাজারো রপ্তানীযোগ্য পণ্য বিদেশে অধিক মাত্রায় চালান দেয়। রপ্তানী পরিমাণ বিরাট আকার ধারণ করে। জাতীয় আয় আরো বাড়ে। সঞ্চয়-স্পৃহা প্রদমিত হয়। এদিকে তদ্দিনে বিদেশ থেকে আয় আসতে শুরু করে। লগ্নীজাত এই আয়ের মাত্রা অচিরে অধিক হয়ে উঠে। ১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে বৃটেন কেবলমাত্র বিদেশে নিয়োজিত মূলধনের সুদ

৪. দেখুন, W. W. Rostow-এর British Economy of the Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 1948, 33.

৫. দেখুন, A. R. Prest-এর "National Income of the United Kingdom 1870-1946," Economic Journal, LVIII, 58-59 (March, 1948).

লভ্যাংশ থেকে বার্ষিক প্রায় ১,০০০ লক্ষ পাউণ্ড করে পাচ্ছিল। জাতীয় আয়ের প্রায় ১০ শতাংশ আসছিল বহির্বিশ্বে ধারদেয়া টাকার সুদ থেকে।[৬] ১৯১৩ সালের অব্যবহিত পূর্বেকার ৪০ বৎসর বৃটেন বিদেশে প্রচুর লগ্নী ঘটায়। কিন্তু তা এতকাল বিদেশে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রাপ্য লভ্যাংশের ৪০ ভাগ অপেক্ষাও কম হয়। বহুকাল আগে থেকে বৃটেন লগ্নী ঘটিয়ে চলেছিল। এই সময়কালে এসে ঐ সমস্ত লগ্নী ডিম্ব প্রসব করতে শুরু করে। প্রসব করা এই ডিম্বের আকার এত বড় হয়ে উঠে যে তার মাত্র ৪০ ভাগ বিদেশী বিনিয়োগ ঘটা সত্ত্বেও পরিমাণে তা প্রচুর হয়। আদিতে বৃটেন প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন জড়ো করে নিয়েছিল। দ্রুত অগ্রসরমান বৃটেনের কাছে তা তেমন কিছু শক্ত ছিল না। এই সুবিধা দিয়ে বেশ কিছুটা বিদেশী বিনিয়োগ ঘটিয়ে নিয়েছিল। তাতে করে বিনিয়োগ ধারা কোমরে জোর পায়। তা স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠার সুযোগ পায়। তৎ উৎসারিত লাভ নিরন্তরবর্ধনী হয়ে উঠে। কইয়ের তেল দিয়ে কই ভাজার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অনন্তর প্রবাহী এই লাভের ভাগ থেকে নূতন মূলধন বিদেশে চালান দেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং, বিদেশে নিয়োগ করার মত প্রচুর টাকা বৃটেনের ছিল। কিন্তু, তবু কথা থেকে যায়। বৃটেন বিদেশে টাকা খাটাবার জন্য উৎসাহী হল কেন? নিজের ঘরে টাকা না খাটিয়ে বিদেশে খাটাতে গেল কেন? বিদেশে এই বিনিয়োগের নিয়ামকসমূহ কি কি?

বিদেশে টাকা খাটাবার জন্য সরকার কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি, বা সরাসরি কোন উৎসাহ যোগায়নি। বিনিয়োগে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়নি। ১৮৯০ দশকের দিকে এসে অবশ্য উপনিবেশ দফতরের মন্ত্রী যোসেফ চেম্বারলেইন উপনিবেশ দেশগুলোকে 'অনুন্নত এলাকা' বলে অভিহিত করেন। এতে পুঁজিপতি শ্রেণী সজাগ হয়ে উঠে। বিদেশী লগ্নী ঘটাবার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়। সরকারও কিছুটা উৎসাহ যোগাতে থাকে।[৭] তবে আটসাট্ বাধা

৬. Cairncross-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৩, ২৩।

৭. Chamberlain পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম আফ্রিকায় Imperial Department of Agriculture প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৯ সালের Colonial Loans Act-এর বলে উপনিবেশ দেশসমূহে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে ঋণ প্রদান করা হয়। এই একই সালে লণ্ডনে School of Tropical Medicine স্থাপিত হয়।

তেমন কোন কার্যক্রম দেয়নি। কাজেই, পরবর্তীকালের বিদেশী বিনিয়োগও মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, যৌথ উদ্যোগ তথা শেয়ারক্রেতাদের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়। বৃটিশ বিদেশী বিনিয়োগের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ১৯১৩ সাল নাগাদ তার বিনিয়োগের বিরাট একটা অংশ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশসমূহে সম্পন্ন হয়।[৮]

পুঁজিপতিশ্রেণী বিদেশে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। সুযোগ-সুবিধার অন্তহীন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে চলেছিল। নূতন নূতন এলাকা পরিচিত হয়ে উঠছিল। সম্পদ আবিষ্কার ঘটছিল। নব নব দ্রব্যসামগ্রী প্রবর্তিত হচ্ছিল। এব সব সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনার দীর্ঘসূত্রী বিবরণ এখানে প্রয়োজন নেই। কেননা, এ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরা ও স্বর্ণ নিয়ে বহু জনে আলাপ করেছেন। উত্তর আমেরিকাব শস্য সম্পদ নিয়ে দীর্ঘ কাহিনী শুনা গিয়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের চা, কফি ও রবার সম্পর্কেও প্রচুর গবেষণা হয়েছে।

বহুদেশ বৃটিশ মূলধনের ভাগ পেয়েছে। তবে সিংহ ভাগ গিয়েছে দরিদ্র-দেশসমূহে এবং তা বোধগম্য কারণে। বৃটিশ মূলধনের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে রেলপথ নির্মাণে ও সম্পদ সামগ্রী উত্তলনে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ সাল নাগাদ এই ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময়কালে রেলপথ স্থাপনে ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ১৯১৩ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটিশ বিনিয়োগের ৪০ ভাগেরও অধিক রেলপথ স্থাপনে সরাসরি নিয়োজিত আর ১৫ ভাগের মত খণিজ ও কাঁচামাল সামগ্রী-ক্ষেত্রে আবদ্ধ। আর ৩০ ভাগ পরোক্ষভাবে তথা এই দুই শাখার সম্পূরক ও পরিপূরক শিল্পসমূহে বিনিয়োজিত থাকতে দেখা যায়।

---

৮. সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন W. K. Hancock-এর Survey of British Commonwealth Affairs, II. Oxford Univesity Press, London, 1940 ; R Koebuer-এর "The Concept of Econmic Imperialism", Economic History Review, II, No. I, 1-29 (1949); R. Pares. প্রণীত "The Economic Factors in the History of the Empire" Economic History Review, VII, No, 2, 119-144 (May 1937) ; J.A, Schumpeter-এর Imperialism and Social Classes, Meridian Books, New York, 1955,7-22,64-98.

নব নব আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের মোহে লগ্নীকারকদল বিদেশে লগ্নী ঘটাতে থাকে। মূল্যবান সম্পদরাজির ভোগলালসায় বিদেশপানে মূলধন ছুটে যেতে থাকে। তবে আসল প্রদায়িনী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করেছে বৃটিশ অর্থনীতির অভাবনীয় অগ্রগতি। নিবিড় এই অগ্রগতির ফলে বৃটেনের পক্ষে ব্যাপকহারে বিদেশে টাকা খাটানো সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, অগ্রগতির এই করোজ্জ্বল চিত্রের দিকে তাকালে হবসন্ প্রভৃতি লেখকেব দোষারোপ ফিকে মনে হয়। হবসনের মতে "সাম্রাজ্য-বাদের মূল ছিপি" নাকি ঋণদাতা দেশের উন-ভক্ষণ বিচিত্রা থেকে পাওয়া যায়। তাঁর এই প্রত্যয় ভোতা বলে মনে হয়। কেননা, দেশে চাহিদামাত্রা অধিকহেতু বৃটেনের পক্ষে ঋণের মাত্রা বরং বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ইত্যাদি আম-দানী করা সম্ভব না হলে বৃটেনের পক্ষে তার ক্রম-প্রসারমান শিল্প-উৎ-পাদন বজায় রাখা সম্ভব হত না। তেমনি ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো সহজ হত না। লগ্নীকারকদল এই সম্পর্কে সজাগ ছিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিল যে, অধিকাংশ-ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ দেশজ বিনিয়োগের পরিপূরক স্বরূপ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা অপরিহার্য। ঋণ গ্রহীতা দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল বিদ্যমান এই জ্ঞান তাদের টনটনে ছিল। নিজেদের দেশে কাঁচামালের চাহিদা ফুরোবে না। সুতরাং সাগর-পারস্থিত দেশসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে থাকবে। এই জ্ঞানের আলোতে তারা তাদের বিনিয়োগকর্ম কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহে পরিচালনা করে। কাজেই, বলা যায় বৃটেন তার নিজের আমদানীর পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে লগ্নীজাল বিস্তার করেছিল।[৯]

সুতরাং, এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে বৃটেন তার বিদেশী লগ্নীর অধিকাংশটা কাঁচামাল রপ্তানিকারী অনুন্নত দেশসমূহে নিয়োগ করেছিল। তার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ ছিল রপ্তানিযোগ্য শিল্পসমূহ উন্নয়নে ও সরবরাহ উৎস থেকে পোতাশ্রয় অবধি স্থানে রেলপথ স্থাপনে। অন্যসব শিল্পে

৯. দেখুন যথা—R. Nurkse-এর "Some International Aspects of the Problem of Economic Development", American Economic Review, Papers and Proceedings, XLII, No. 2, 575 (May, 1952).

সে আগ্রহী ছিল না। ঋণ গ্রহীতা দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলে তার মাথা-ব্যথা ছিল না। বাজার-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করায় তার দৃষ্টি উদার ছিল না। বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তার উৎসাহ উদ্দীপনা সীমিত ছিল। তাই দেখা যায়, মোট লগ্নীর চার ভাগও এইসব প্রতিষ্ঠান পায়নি।

জনকল্যাণমূলক প্রকল্প (Public utilities) বেশ কিছুটা লগ্নী পেয়েছিল। অবশ্য তা প্রয়োজনের খাতিরে। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যাপকতর করায় সেবাধর্মী কাজকর্ম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই এই শাখা কিছুটা বিনিয়োগ পায়। সজ্ঞান এই প্রচেষ্টার ফলে একদিকে কৃষি ও খণিজ খাতে উৎপাদন বাড়ে, অন্যদিকে জনকল্যাণমূলক বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। তাতে করে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশসমূহে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল উৎপাদন জোরদার হয়। মালয় ও সিংহলে রবার ও নারিকেল, দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণ উত্তোলন, মালয় ও নাইজিরিয়ায় আকরিক টিন, উত্তর রোডেসিয়ায় তাম্র, সিংহলে চা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কোকো এবং আর্জেন্টিনায় শস্য ও মাংস ইত্যাদির উৎপাদনে সম্প্রসারণ এই প্রচেষ্টা প্রসূত। ১৯১৩ সাল নাগাদ যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, বৃটিশ বিদেশী লগ্নীর প্রায় ৮৮ শতাংশ কাঁচামাল রপ্তানিকারী দেশসমূহে নিয়োজিত।

বিদেশে নিয়োজিত মূলধনী প্রবাহের সূত্র লক্ষ্য করে দেখা যায় যে, বিশেষ কতকগুলো অনুকূল পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেন তার লগ্নী ঘটিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ক্যানাডার কথা চিন্তা করুন। ক্যানাডা ইতিমধ্যেই একথা স্বপ্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, বিশ্ববাজারে সে মাল চালু করতে পারে। অথবা গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলোর কথা বিবেচনা করুন। স্ফুটনোন্মুখ এই দেশগুলো যেন 'সোনার কাঠির' পরশের অপেক্ষায় ছিল। বিদেশী লগ্নীর ছোঁয়া পেয়ে তাদের অনন্ত সম্ভাবনাময় কাঁচামাল সামগ্রী উৎপাদন অগ্রসরের পথে ধাবিত হয়। আর অধিক এই উৎপাদন রপ্তানি সম্ভাবনার ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান ছিল। বৃটেন তার শ্যানদৃষ্টি দিয়ে এদিকে লক্ষ্য রেখে লগ্নীপথে এগিয়েছিল।

অন্যান্য আরো বহু অনুকূল ঘটনা একত্রিত হয়ে বিদেশে বিনিয়োগ সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। ভিক্টোরিয়ান যুগটাই ছিল মূর্তিমান আশাবাদের বলিষ্ঠ প্রতিবিম্ব। তার আকাশে-বাতাসে জুড়ে ছিল দৃপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষীপ্র আবহাওয়া। বৃটিশ অগ্রগতি সুনিশ্চিত ধ্যান-ধারণা

ছিল সবার মধ্যে ক্রিয়াশীল। 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত নয়' মনোভাব পরিপূর্ণ নিরাপত্তাবোধ এনে দিয়েছিল। ১৯০০ সালের Colonial Stock Act উপনিবেশভুক্ত দেশের সরকারী জামানত তথা প্রতিভূতি (Securities) "trustee securities" তালিকাভুক্ত করে দেয়। তাতে করে ট্রাস্ট অন্তর্ভুক্ত পুঁজি বিনিয়োগে সহজ অবস্থার সৃষ্টি হয়। উপনিবেশসমূহে রাজকীয় দালাল (Crown agents) ব্যবস্থা লগ্নীকাজ জোরান্বিত করায় সহায়তা করে। এই সকল দালালরা যথাযথ খবরাদি জোগাড় করে ভাবী লগ্নীকারককে পাঠিয়ে দিত। কলোনীস্থ ঋণ সংগ্রহে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করত এবং কইয়ের তেলে কই ভাঁজার নীতি অনুসরণ করে কলোনীগুলোর আয় মারফতে ঋণ জোগাড় করে দিত। এদিকে আবার তারা সরকারী পূর্ত কাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্রেতা দালাল হিসাবেও কাজ করত। ফলে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বৃটিশ মাল আমদানী করতে মোটামুটি সবাইকে রাজী করাত। তার ফলে বৃটিশ বিনিয়োগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ও ঋণ গ্রহীতা দেশে আপন পথ করে নিত।

বৃটিশ ঋণ পেয়েছিল বহু দেশ। উপনিবেশ দেশগুলো যেমন পেয়েছিল তেমনি উপনিবেশ বহির্ভূত বহু দেশও লাভবান হয়েছিল। এই সমস্ত দেশের সরকার জামীনদার হিসাবে নিশ্চয়তা প্রদান করত। যেমন আর্জেন্টিনার কথা ধরুন। ১৮৭৫ সালে এসে সেই দেশের সরকার বৃটেন কর্তৃক নিয়োজিত পুঁজির ৮০ ভাগের উপর ধার্যকৃত সুদের টাকা নিজে আদায় করতে অথবা তার পৃষ্ঠপোষকতায় উসুল করে দিতে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সরকারী এই নিশ্চয়তা প্রদানের ফলে বিনিয়োগমাত্রা তীব্রতর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

বৃটেনের অর্থনীতি তদ্দিনে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। তার বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক কাঠামো সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করেছে। সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে। তার পোতবাহিনী শক্ত ভিত্তিতে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য নিষ্পন্ন করার মত বহু প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কিং ও বীমা কোম্পানীগুলো সাবালকত্ব লাভ করেছে। বিদেশী বিনিয়োগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় এদের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ বিদেশে লগ্নী ঘটাবার কাজে এরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এদিকে, বৃটিশ

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল অভাবনীয় হারে। সম্প্রসারণশীল বৃটিশ অর্থনীতি ক্রম-বর্ধমান এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। সোনায় সোহাগা—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেন-দেন নিষ্পন্ন হয়েছিল বিনা বাধায়। অন্তরায়হীন পথে আন্তর্জাতিক সাঙ্গীকরণ ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। বাণিজ্যিক ভারসাম্যে তেমন কোন বড় সঙ্কট দেখা দিতে পারেনি, তাই বিদেশে বিনিয়োগ হতে পেরেছিল তেমন হারে, অন্যথায় যেমনটা হতে পারত না।

সুতরাং, বিদেশে বাণিজ্য-স্রোত তথা লগ্নী অব্যাহত রাখায় ক্রিয়াশীল ছিল বেশ অনেকগুলো অনুকূল পরিস্থিতি। তাদের সমাবেশ ঘটেছিল আকাঙ্ক্ষিত নিয়মে এবং বৃটেনের জন্য সৃষ্টি করে তুলেছিল সুবর্ণ সুযোগ। এই সুবর্ণ সুযোগের সৎব্যবহার ঘটিয়েছিল বৃটিশ পুঁজিপতি দল পূর্ণ মাত্রায়। তাঁদের মধ্যে অবশ্য অপর একটা শক্তিও বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। দেশে বিনিয়োগ অপেক্ষা বিদেশে লগ্নী অনেকবেশী লাভজনক ছিল। তার তুলনায় ঝুঁকি তেমন একটা ছিল না। যাও বা ছিল তা পরিমাণ ও মাত্রার দিক থেকে লাভের হারের ঠেলায় তেমন বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। লগ্নীকারক নিজের দেশের সরকারী ঋণপত্র না কিনে বরং তুরস্ক, মিশর, ভারত কি দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহের সরকারী ঋণপত্র কেনায় অধিক উৎসাহী ছিল। ১৮৮০ সালোত্তর কালে বিদেশী বিনিয়োগ বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে। দেশের তুলনায় বিদেশে টাকা খাটাতে উৎসাহ অধিক লক্ষ্য করা যায়। ১৯০০ ও ১৯০৪ সালের মধ্যকার সময়ে নিষ্পন্ন বিদেশী লগ্নীতে দেশ অপেক্ষা ২·২ শতাংশ অধিক লাভ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ১৯০৫-১৯০৯ কালে ১·৩ শতাংশ অধিক লাভের আশ্বাস দেয়া হয়।[১০] কাঁচামাল উৎপাদনে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশী লাভবান বলে প্রতিপন্ন হয় ১৯০৭-১৯০৮ সালে। কয়লা ও লৌহশিল্প ১৩·২ ভাগ মুনাফা প্রদান করে। তাম্রখনিতে পাওয়া যায় ৩০·৫ শতাংশ। হীরা উত্তোলনে আয় আসে শতকরা ৯·৩ ভাগ। স্বর্ণ প্রদান করে শতকরা ৮ ভাগ: টিন ১৫ ভাগ, তৈল ৮·২ ভাগ, রবার ৮·২ এবং চা ও কফি

১০. দেখুন, Sir Arthur Salter-এর Foreign Investment, Princeton University, International Finance Section, Feb. 1951, 5; Cairncross-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২২৬-২৩০।

দেয় ৮.৪ ভাগ।[১১] পরিশেষে, খতিয়ান নেয়া যাক্ বিদেশী বিনিয়োগের ফলনের। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯০০-১৯১০ পর্যায়কালে বিদেশী লগ্নীর গড় মুনাফা শতকরা ৫.২ ভাগ হয়েছিল। সেই তুলনায় দেশী বিনিয়োগ মাত্র ৩ ভাগের মত মুনাফা দিতে সক্ষম ছিল আর দেশী ঋণপত্র ৩.৫ ভাগ অর্জনে সক্ষম ছিল।[১২]

অন্তর্জাতিক অগ্রগতির ইতিহাসে বৃটিশ পুঁজিসামগ্রীর বিচলন এক নয়াদিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। পুঁজিসামগ্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রচুর শ্রম-নির্গমও ঘটে। এই শ্রম-নির্গমও কম উল্লেখযোগ্য তথা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন তার পুঁজিসামগ্রী পরিচালিত করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে। ঐ সকল অঞ্চলে শ্রমসরবরাহ সীমিত ছিল। তথাকথিত "নব অধ্যুষিত এলাকাসমূহে" বৃটেন তার মোট বিদেশী বিনিয়োগের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিয়োজিত করে। ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বহু দেশের এই নব অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ছিল দিগন্তপ্রসারী উর্বরা ও ফাঁকা জায়গা।[১৩] জনবিরল অথচ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল এই সকল দেশে লক্ষ লক্ষ বৃটেনবাসী বসতি স্থাপন করতে চলে যায়। অসম সাহসী উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসাবে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং মাতৃভূমি থেকে আগত মূলধন সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগায়। কাজেই, বৃটেন থেকে পরিপূরকধর্মী পুঁজিও শ্রমের নির্গমন ঘটে মোটামুটি একই সময়কালে। এক্ষণে তার হদিস নেয়া প্রয়োজন।

৩. বিদেশে বিনিয়োগ, প্রব্রজন (Migration) ও আভ্যন্তরীণ লগ্নী

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল নাগাদ ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আফ্রিকার কতকাংশ, সিংহল ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

১১. Sir George Paish-এর "Great Britain's Capital Investments in other Lands," Journal of Royal Statistical Society, LXXII, 465-480 (Sept. 1909).

১২. Satter-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৫।

১৩. দেখুন R. Nurkse-এর "International Investment Today in the Light of Nineteenth Century Experience," Economic Jourual, LXIV, No. 256, 745 (Dec. 1954).

প্রভৃতি দেশ ইংল্যাণ্ডের করায়ত্তে চলে আসে। ১৮২৫ সালে কারিগরদের উপর বাইরে যাওয়ার বাধা-নিষেধ উঠিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তী বৎসর সংসদীয় এক কমিটি বাড়তি লোক কাজে লাগাবার উপায় হিসাবে উপনিবেশ সমূহে চালান দিয়ে দেয়ার সুপারিশ প্রদান করে। ১৮৪০ সালে Colonial Land and Emigration Comission স্থাপন করা হয়। কর্তব্য দেয়া হয় কলোনীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্পন্ন করতে এবং বিদেশে গতায়াত সহজ করে তুলতে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে বেশ সন্তোষজনকভাবে পরিকল্পিত পুনর্বাসন নিষ্পন্ন করতে সক্ষম হয়। যেমন গিবন ওয়েক্‌ফিল্ড তাঁর স্বীয় চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে নবাগত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে প্রচুর সাহায্য-সুবিধা প্রদান করেন।[১৪]

বৃটিশ করায়ত্ত কলোনীসমূহে চলে যাওয়ার এই যে প্রবণতা ও সুযোগ-সুবিধা তা জনচিত্তে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে। ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানীদের অন্ন-আলোচনায়ও এই ঔৎসুক্য প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।[১৫] সাধারণভাবে ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানীরা জননির্গম বিষয়টিকে সুনজরে দেখেছেন। তাতে নাকি ক্রমহ্রাসমান বিধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। তদুপরি, তা বৃটিশ পুঁজির বিদেশ গমনে উদ্দীপনা যোগাতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং তাতে ইংল্যাণ্ডের লাভের হার নিম্নগামী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং, ক্লাসিক্যাল উপনিবেশন তত্ত্ব (Theory of Colonization) সরকারী উদ্যমে প্রদায়িনী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। সাগর-পারস্থিত এলাকাসমূহে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল ক্লাসিক্যাল মতধারা সেই প্রচেষ্টাকে বলিষ্ঠ সমর্থন যুগিয়ে জোরদার করে তুলে। কিন্তু, এত সব সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অবধি জননির্গম তেমন একটা ঘটেনি। নামমাত্র হারে তা এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৮২০ দশকে মাত্র হাজার পঞ্চাশেক লোক বাইরে যায়।

১৪. ওয়েকফিল্ডের উপনিবেশন ধ্যান-ধারণা ও উপনিবেশন সমস্যার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন Herman Merivale-এর Lectures on Colonization and Colonies, Oxford University Press, London. 1928.

১৫. প্রথম অধ্যায় সপ্তম ভাগ দেখুন; আরো দেখতে পারেন Brinley Thomas প্রণীত Migration and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge. 1954, প্রথম অধ্যায়।

১৮৪০ (আইরিশ দুর্ভিক্ষকাল সেটা) দশকে তা হয়ে দাঁড়ায় ১,২০,০০০ শতাব্দীর মধ্যবিন্দু অতিক্রম করে অবশ্য বহিরাগমনের ঢেউ একটু উত্তাল হয়। উর্বরা অথচ জনবিরল কলোনীসমূহ তখন হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছে। ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বেড়ে ছুটেছে অসমানুপাতিক হারে। এমতাবস্থায় বাইরের সুযোগের মোহ কাটিয়ে উঠা শক্ত বৈকি। তাই দলে দলে লোক ছুটে গিয়েছিল কলোনীসমূহে। তাছাড়া, আজ-কের মত বার্মা, ভারত ও সিংহল ইত্যাদি দেশে জনসংখ্যা তখনো সমস্যা হয়ে উঠেনি। এইত মাত্র সেদিন থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যার চাপ সমস্যা হিসাবে সম্মান পেতে শুরু করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কার বিশ্ব-জনসংখ্যা চিত্রে চারটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে (১) পশ্চিম ইউরোপ বিশেষ করে বৃটেনের জনসংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে ; (২) বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত কলোনীগুলোতে বিদেশীর পদচারণা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে তখনো তেমন জমজমাট হয়ে উঠেনি, যেমনটা শতাব্দীর শেষপাদে এসে হয়েছিল। (৩) কলোনীগুলোতে বৃটেনবাসীরা আস্তানা গেড়েছে বটে, তবে তখনো এগুলো তেমন জনাকীর্ণ হয়ে উঠেনি ; (৪) ইউ-রোপ বহির্ভূত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তখনো তেমন চড়া হয়ে উঠেনি, যেমনটা ইউরোপে হয়েছিল।

১০·১ ও ১০·২ চিত্রে প্রব্রজন উৎস ও গন্তব্যস্থলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল। ১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী অর্ধ-শতাব্দী সময়ে অত্যধিক জননির্গম ঘটে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ থেকে, আর স্থান পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে। জনসংখ্যার এই প্রচরণের ফলে কৃষিকার্যে নিযুক্ত বিশ্ব-শ্রমিকের পুনর্বণ্টন ঘটে এবং নব অধ্যুষিত কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহে বেশ কিছু লোক বসতি স্থাপন করে। শতাব্দীর শেষপাদে এসে এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানা-ডার শিল্পায়নে শ্রমিক সরবরাহে অন্তরিত হয়ে যায়।

বৃটেন থেকে প্রবাসনের বড় রকমের ঢেউ জাগে ১৮৮০ ও ১৯০০ দশকে। কৃষিকাজে মন্দাবস্থা হেতু ১৮০০ দশকে গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে লোক চলে আসতে থাকে। ১৯০০ দশকে বৃটেনের ক্রম প্রসারমান মজুরী হার থমকে দাঁড়ায়। দুর্যোগকাল ঘনিয়ে আসে। দুর্যোগের এই ঘনঘটায় বহু লোক ছিটকে পড়ে। মাথা গুজার ঠাঁই খুঁজে অন্যত্র, ফলে জননির্গম তীব্রতর হয়। তবে

জননির্গমের আসল কারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় নিহিত। নব আবিষ্কৃত দেশসমূহে অল্প আয়াসে লাইবেলাই সাজার সুবিধে বিদ্যমান ছিল। এই লালসার বশবর্তী হয়ে অধিকাংশ লোক দেশের মায়া ত্যাগ করে অপরিচিতের সন্ধানে পা বাড়ায়। ১৯১৩ সাল নাগাদ বৃটেন থেকে আগত অধিকাংশ বাসিন্দা জনবিরল এলাকাসমূহে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভীড় জমায়। এই সকল অঞ্চলে অনায়াসে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত বলে এমনটা হয়।[১৬] গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বৃটিশবাসীরা তেমন বড় একটা আসেনি। তবে সামান্য যারা এসেছিল গুণগত দিক থেকে তারা ছিল উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রশাসক, ব্যবসায়ী প্রকৌশলী, ক্ষেত্র-স্বামী তথা নীল-কর, চা-কর, ইত্যাদি দক্ষ কর্মীশ্রেণী অনুন্নত এই সকল অঞ্চলের উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় সহায়তা করে।

চিত্র ১০.১. আন্তঃমহাদেশীয় জন-নির্গম উৎস, ১৮৪৬-১৯৩২। (A.M. Carr-Saunders, World Population, Oxford University Press, Oxford, 1936-এর ভিত্তিতে)

১৬. এই বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন C. E. Carrington-এর The British Overseas, Cambridge University Press, Cambridge, 1950, 503ff ; Thomas প্রণীত প্রাগুক্ত বই, সপ্তম অধ্যায় ; R. T. Berthoff-এর British Immigrants in Industrial America, Harvard University Press, Cambridge, 1954, G. F. Plant-এর Oversea Sentement, Migration from the United Kingdom to the Dominious, Oxford University Press, London,

বৃটেন থেকে শ্রমিক বহির্গমনের একটা মনোযোগ আকর্ষণকারী দিক হচ্ছে এই যে, তা মূলধন বহির্নিঃসরণের পর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগোয়। মূলধন বাইরে যাওয়ার সর্বোচ্চ প্রবণতাকাল ও জননির্গমের তুঙ্গ সময়কাল সমানুপাতিক ভাবে এগিয়েছিল। ১৮৭১-১৮৮০ সময়কালে পুঁজি-রপ্তানি পরিমাণ ছিল ২৬৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৮১-১৮৯০ পর্যায়কালে এই পরিমাণ ৫৬১০ লক্ষ পাউণ্ডে উন্নীত হয়। ঠিক একই পর্যায়কালে প্রব্রজন মাধ্যমে বৃটেন তার জনশক্তি হারায় ২,৫৭,০০০ জন থেকে ৮,১৯,০০০ জন। অতঃপর পুঁজিনিঃসরণ ১৮৯১-১৯০০ সালের ২৮৬০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ১৯০০-১৯১০ ব্যাপ্তিকালে ৭২১০ লক্ষ পাউণ্ডের সীমায় এসে দাঁড়ায়। নীট জন-নির্গম বৃদ্ধি পায় ১৮৯১-১৯০০ সালের ১,২২,০০০ থেকে ১৯০০-১৯১০ সালে ৭,০৬,০০০ জনে।[১৭]
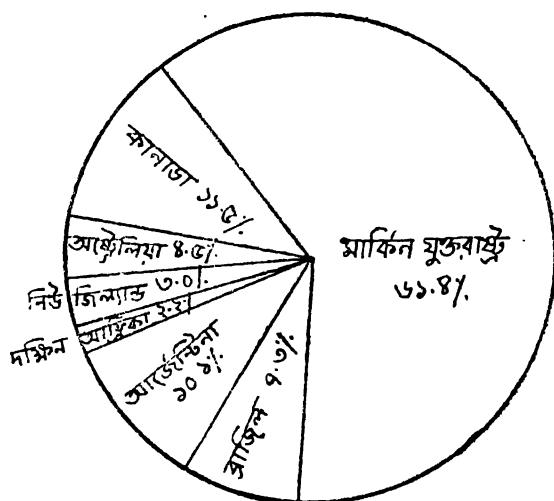
চিত্র ১০.২. জনাগমস্থল, ১৮২০-১৯৩০ (A.M. Carr-Saunders-এর World Population, Oxford University Press, Oxford, 1936 পুস্তকের অনুসরণে)।

1951 ; W. S. Shepperson-এর "Industrial Emigration in Early Victorian Britain," Journal of Economic History, XIII, No. 2, 179-192 (Spring 1953), W. F. Wilcox সম্পাদিত International Migrations, National Bureau of Economic Reseach, New York, 1929.

১৭. Cairncross-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ২০৯।

সুতরাং, বৃটেনের বিদেশী বিনিয়োগ ও তার জন-নির্গম মোটামুটি সমতালে প্রবাহিত হতে থাকে। একে অন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিদেশ ভূমিতে হাজির হয়। কিন্তু, মজার ব্যাপার, তার বিদেশী বিনিয়োগ ও স্বদেশী বিনিয়োগ সমানতালে এগিয়ে যাওয়া দূরে থাক বরং বিপরীতগামী পথে ধাবিত হয়। যে তিনটি পর্যায়কালে যথা—১৮৭০-১৮৭৩, ১৮৮৬-১৮৯০ ও ১৯০৫-১৯১৩ সময়কালে ব্যাপকহারে বিদেশী বিনিয়োগ ঘটে, সেই সময় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ নামমাত্র হারেও অগ্রসর হয়নি। স্বদেশী বিনিয়োগের মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল ১৮৭৩ ও ১৮৮৪ সালের এবং ১৮৯৫ ও ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তীকালীন সময়। অথচ এই সময়ে বিদেশে লগ্নী পরিমাণ ছিল নেহায়েত নগণ্য।

সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায়: বিদেশে বিনিয়োগ, প্রব্রজন ও আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে তেমন কোন সম্পর্ক বিরাজমান ছিল কি? ক্যায়রনক্রস্ তার একটা উত্তর দিয়েছেন[1]। তাঁর মতে একটা আন্তঃসম্পর্কীয় নক্সা বিদ্যমান ছিল যার ফলে বিদেশী লগ্নী ও স্বদেশী বিনিয়োগ বিপরীতমুখী হয়ে উঠেছিল অথচ পুঁজি ও জনসংখ্যার বহির্গমন সমানুপাতিক তালে নিষ্পন্ন হয়। তিনি প্রথমে বৃটেনের বাণিজ্য অনুপাতের (terms of trade) চিত্র মেলে ধরে মন্তব্য করেন যে, এই অনুপাতে তারতম্যের মাত্রাভেদে বৃটিশ বিদেশী লগ্নী উঠানামা করে। যে সময়ে এই অনুপাত খারাপের দিকে ধাবিত হয় সেই সময়ে লগ্নীর পরিমাণ উর্ধ্বগামী হয়। এই মন্তব্য আমাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্তের মত মনে হয়। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহে রপ্তানি-মূল্য (বৃটেনের জন্য আমদানী মূল্য) বেড়ে গেলে সেইসব দেশে বিনিয়োগ সুবিধা আকর্ষণীয় হয়। কাজেই, ক্যায়রনক্রসের এই অভিমত আমাদের বক্তব্যের অনুসারী।

১৮৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের পরবর্তীকালের বিদেশী বিনিয়োগের সুবর্ণক্ষণে ১৮৯০ দশকের গোড়ার দিকে এসে ভাটা পড়ে। খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের দামে অভাবনীয় পড়তি হেতু এমনটা ঘটে। ১৯০৩ সালের পরে বৃটেন বাণিজ্য-অনুপাতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলে পর আবার বিদেশী বিনিয়োগ উন্মার্গগামী হয়। ১৯০৫ সালের পরে তা চরম পর্যায়ে উঠে। এই উর্ধ্বগমন ও আমদানী দরে ক্রম-সমপ্রসারণ যুগপদ ঘটে। সেই সময় বাণিজ্য-অনুপাত প্রায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বাণিজ্য-অনুপাতে পরিবর্তনহেতু প্রকৃত মজুরী হারে টানা-হেঁচড়া জন্ম নেয়। বৃটেনের জন্য তা প্রতিকূল হয়ে উঠায় প্রকৃত মজুরী নিম্নগামী হয়। কেননা, আমদানী দরের মাত্রাভেদে শ্রমিক-শ্রেণীর জীবিকা-ব্যয় প্রভাবিত হয়। কারণ, প্রায় অর্ধেক খাদ্যসামগ্রী আমদানী থেকে আসে। পরিণামে, বাণিজ্য-অনুপাতে অবনতি মূলধন বহির্গমন তেজী করে তুলে। শুধু তাই নয়, এই অবস্থা জন-নির্গম উৎসাহিত করে। সুতরাং, অধ্যুষিত এলাকাসমূহে অধিক হারে মূলধন আগমন ঘটতে থাকে। তাতে করে চাকরী-বাকরীর নব নব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। এই সব সুযোগ-সুবিধার মোহে প্রলোভন বাড়ে। ফলে অধিক হারে জনাগম ঘটতে থাকে। সুতরাং, বলা যায়, বৃটেনের বাণিজ্য-অনুপাতে অধঃপতন মানে ক্রম-বর্ধমান জন-নির্গমও পুঁজি-বহির্নিঃসরণ। কেননা, এই অবনতি হেতু মজুরী হ্রাস পায় অথচ বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ লাভজনক প্রতিপন্ন হয়। ফলে শ্রমিক-শ্রেণী বাইরে যাওয়ার জন্য প্রলোভিত হয়।[১৮]

এবারে বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ ও দেশে লগ্নী বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। একটু তলিয়ে দেখলেই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পরিপুষ্ট হয়ে উঠে। দেশে লগ্নীর বৃহদাংশ নিয়োজিত হয় দালান-কোঠা ইত্যাদি নির্মাণে ও জনকল্যাণমূলক সেবা-কার্যাবলীর বাস্তবায়নে।[১৯] বহির্বিশ্বে বিনিয়োগ মাত্রা তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে এইসব কার্যাবলীতে ভাটা পড়ে, অর্থাৎ তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিপরীতগামী হয়। বৃটেনে হর্ম্য-ইমারত ইত্যাদি কাজের ধুম পড়ে ১৮৭০ ও ১৮৯০ দশকে। এই সময়ে বিদেশী বিনিয়োগ নামমাত্র ঘটে। আবার বিদেশী বিনিয়োগ চড়াকালে নির্মাণকার্য শ্লথ-গতি-সম্পন্ন হয়ে উঠে। অথচ জন-বহির্গমন তীব্রতর হয়। যোগ-সূত্র খুঁজে পেতে দূরে যেতে হয় না : জননির্গম ঘটায় বহু বাড়ীঘর খালি পড়ে থাকে। বাড়ীঘরের চাহিদা হ্রাস পায়।

---

১৮. ১৮৮০ দশককাল একটা বিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত। তজ্জন্য বহু কারণ দায়ী। নবম অধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগের মাঝামাঝি অংশ দেখুন।

১৯. ১৮৭০ ও ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দালান-কোঠা খাতে বিনিয়োগ মোট দেশী লগ্নীর ২৫ থেকে ৪৫ শতাংশ হতে দেখা যায়, দেখুন J.H. lenfant-এর "Investment in the United Kingdom, 1865-1914", Economica, XVIII, No. 70,163 (May, 1951).

কাজেই, নির্মাণকার্য ঝিমিয়ে পড়ে। সাথে সাথে জনসেবায় নিয়োজিত কার্যাবলীও, পূর্ত কাজও। কেননা, এই সকল ক্রিয়াকর্ম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও নগরাঞ্চল উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিণামে দেশী বিনিয়োগে ভাটা পড়ে। চিত্রটা হয়ে দাড়ায় অনেকটা এইরূপ:[২০]
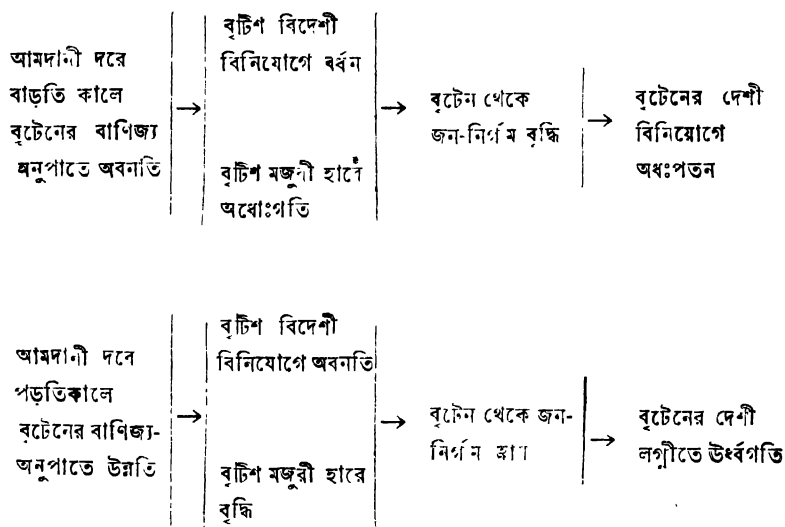
চিত্রিত এই নক্সা সঙ্কেত প্রদান করে যে, একদেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজি স্থানান্তর বিরাট একটা প্রেক্ষাপুটে সম্পন্ন হয়। বিষয়টি একটা বৃহত্তর পটে নিষ্পন্ন হয়। তা প্রতিফলিত করে বিশ্বে বিদ্যমান উৎপাদন-সামগ্রীর বিষম-বণ্টন চিত্র। আরো তুলে ধরে যে পুঁজি, ভূমি ও শ্রম বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে ব্যবহৃত হয়। প্রাগ-১৯১৪ সাল সময়কালে বৃটেন থেকে বিপুল হারে পুঁজি-সঞ্চালন ঘটে। গুরুত্বের দিক থেকেও তা ছিল অতীব তাৎপর্যবহ। পুঁজি-বহির্গমনের এই বিষয়টিকে প্রব্রজন সমস্যার সাথে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন। নব নব আবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহে পুঁজি ও শ্রমের সমাগম ঘটে কেন্দ্রভূমি থেকে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদরাজী বৃটেনে উঠিয়ে নেয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু, বৃটিশ মূলধন, প্রকৌশলী ও কারিগর নিয়ে আসা সম্ভব

২০. এই উপসিদ্ধান্তের সমর্থনে শক্তিশালী পারিসাংখ্যিক প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেছেন Thomas তাঁর প্রাগুক্ত বইয়ে, সপ্তম অধ্যায়, পরিশিষ্ট ৪।

ছিল এবং আসলে তা ঘটেও ছিল। কেন্দ্রভূমি বৃটেন থেকে পুঁজি ও শ্রমের এই যে বিচলন তা একদিকে যেমন চমকপ্রদ, পরিমাণে যেমন প্রচুর তেমনি অন্যদিকে গুরুত্বে ও প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিদেশে বিনিয়োগ

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ তখন শেষ। বৃটেন তার পুরানো মাহাত্ম্য হারিয়ে বসেছে। বিশ্ব-অর্থনীতিতে তার প্রাধান্য আজ স্তিমিত প্রায়। তার স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মার্কিন রাষ্ট্রের ঋণ প্রদানের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্বে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঋণদানকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। এদিকে বৃটেন যুদ্ধকালে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার বিদেশ থেকে উঠিয়ে নেয়। ১৯২০ দশকে এসে তার বিদেশী ঋণের বার্ষিক পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৯০ সালের পরে বিদেশী বিনিয়োগ জগতে অনুপ্রবেশ করে। ১৯১৩-১৯১৪ সালে তার দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী লগ্নীর পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় ৩·৫ বিলিয়ন ডলার (সারণী ১০·১) আর তার অভ্যন্তরে বিদেশীরা বিনিয়োগ ঘটায় ৬·৮ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং, বিশ্বযুদ্ধ সূচনাকালে যুক্তরাষ্ট্র ঋণী দেশ ছিল। কিন্তু, যুদ্ধকাল পেরিয়ে এসে তা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম উত্তমর্ণ দেশ। অবশ্য বেসরকারী খাতে। তবে সরকারী খাতেও তার অবদান দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকে।

বিদেশী ঋণ তথা লগ্নী নিয়ে আমেরিকার অভিজ্ঞতা বৃটিশ অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্নতর। আমেরিকান বিনিয়োগ, কি পরিমাণের দিক থেকে, কি গুরুত্বের মাত্রায় বৃটিশ লগ্নীর সমকক্ষ হতে পারেনি। আন্তর্জাতিক উন্নয়নধারা প্রভাবান্বিত করায় তা বৃটিশ ঋণের মত তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারেনি।

আমেরিকান বিদেশী লগ্নীর ঢল নামে ১৯২০ দশকে। এই সময়ে অধিকাংশ ঋণ বিদেশে যায়। এই দশকে আমেরিকান আয়ত্তাধীন বিদেশী ডলার বণ্ডগুলোর স্থিরমূল্য (Par Value) বেড়ে ২ বিলিয়ন ডলার থেকে ৭·৩ বিলিয়ন ডলার হয়ে যায়। পোর্টফোলিও ঋণ তথা বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়ের বার্ষিক হার ১৯২০ সালের ৪১৮০ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে ১৯২৭ সালে ১·১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। বেসরকারী সরাসরি বিনিয়োগ তথা আমেরিকান কোম্পানীসমূহের বিদেশী শাখা-প্রশাখায় লগ্নী পরিমাণ হয়ে উঠে ৩ বিলিয়ন ডলার।

১৯৩০ দশকে এসে বিদেশী বিনিয়োগ একেবারে থেমে যায়। তখন মহা-মন্দাকাল চলছে। অতীতের ভুলত্রুটি সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান। বৈদেশিক বিনিময় ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ চলছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে লগ্নীর মোহ নিঃশেষিত হয়ে যায়। আমেরিকান বিনিয়োগ কর্তারা হতাশ হয়ে পড়ে। বিদেশে ঋণের কথায় তারা আর কানও দিতে রাজী নয়। ফলে এই দশকে আমেরিকা মূলতঃ দীর্ঘমেয়াদী-ঋণের আমদানী-কারক হয়ে উঠে। দুই অবস্থার ফলে এমনটা হয়। প্রথমতঃ, আমেরিকা তদ্দিনে নিয়মিতভাবে তদ্দিনকার বিদেশী লগ্নীর মুনাফা পেতে শুরু করে। অপরদিকে, তার বিনিয়োগমাত্রা সরাসরিভাবে পড়ে যায়। অথচ বিদেশীরা তার প্রদত্ত ঋণপত্রসমূহ অধিক হারে কিনে চলেছে। ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সাল অবধি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ঘটে মাত্র ১৯৪০ লক্ষ ডলার আর ১৯৩২ সালের পরে সরাসরি বিনিয়োগ তেমন একটা ঘটেই না।

১৯৩০ সালে বিদেশে আমেরিকান লগ্নীর মোট পরিমাণ ছিল ১৭ বিলিয়ন ডলার। তা কমে কমে ১৯৩৯ সালে মাত্র ১১ বিলিয়ন ডলারে এসে ঠেকে। ১৯৩০ সালে আমেরিকার বেসরকারী সরাসরি বিনিয়োগ তার মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেকের মত ছিল। পরে তা কিছুটা বেড়ে যেয়ে ১৯৩৯ সালে হয়ে উঠে ৬৫ ভাগ।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে বিদেশী লগ্নী আবার পুনর্জীবন লাভ করে। তবে আগের মত চড়া হারে নয়। এই সময়ে বেসরকারী বিনিয়োগ মোটামুটি সরাসরিভাবে নিষ্পন্ন হয় এবং তার অধিকাংশটা নিয়োজিত হয় পেট্রোলিয়াম শিল্পে। স্বাভাবিক কারণে এই ঋণের সিংহভাগ পেট্রোলিয়াম সম্পদ বিদ্যমান দেশসমূহ পায়। যুদ্ধোত্তর কালের পরবর্তী দশকে আমেরিকান সরাসরি লগ্নী ধনী ও দরিদ্র দেশে মোটামুটি সমানভাবে বণ্টিত হয়। ধনী দেশগুলোতে তা প্রধানতঃ নিয়োজিত হয় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে এবং দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টন কাজে। নামমাত্র কিছুটা ব্যয়িত হয় আহরণধর্মী শিল্পসমূহে (extractive industries), দরিদ্র দেশগুলোতে ঘটে বিপরীত। লগ্নীর বৃহদাংশ যায় আহরণধর্মী শিল্পখাতে আর বাকীটা নিয়োজিত হয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ও বণ্টন-কার্য সম্পাদনে। সুতরাং দরিদ্রদেশে বিদেশী ঋণের যে ধারা অনেককাল আগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে

১৯২০ দশকের তুলনায় দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ নেহায়েত নগণ্য হয়। ১৯৪৬-১৯৫২ সময়কালে যেখানে সাকুল্য বেসরকারী লগ্নী বার্ষিক গড়ে ৭৮৮ লক্ষ ডলার হয় সেখানে ১৯১৯-১৯২৯ পর্যায়কালে বার্ষিক গড় ছিল ১·৬ বিলিয়ন ডলার (১৯৪৮ সালের দরমাত্রার হিসাবে)। অর্থাৎ প্রাগুক্ত সময়ে হার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ছিল। ১০·২ সারণীতে আমেরিকান আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের চিত্র দেয়া হল। হিসাবটি ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যকার নির্বাচিত কতকগুলো বৎসরের জন্য। ১০·৩ সারণী সংক্ষিপ্তি প্রদান করছে নির্বাচিত দেশসমূহের বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগের। হিসাবে প্রধান প্রধান শিল্পগুলোর ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালের চিত্র দেয়া হল।

সারণী ১০.২. নির্বাচিত বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ-চিত্র, সময়কাল ১৯১৪-১৯৫৫

(বিলিয়ন ডলারের হিসাবে)

	১৯১৪*	১৯১৯	১৯৩০	১৯৩৯	১৯৪৬	১৯৫৫§
বিদেশে আমেরিকান লগ্নী	৩·৫	৭·০	১৭·২	১১·৪	১৮·৭	৪৪·৯
বেসরকারী	৩·৫	৭·০	১৭·২	১১·৪	১৩·৫	২৯·০-
দীর্ঘসূত্রী	৩·৫	৬·৫	১৫·২	১০·৮	১২·৩	২৬·৬
সরাসরি	২·৬	৩·৯	৮·০	৭·০	৭·২	১৯·২
পোর্টফোলিও	·৯	২·৬	৭·২	৩·৮	৫·১	৭·৪
স্বল্প-মেয়াদী	†	০·৫	২·০	০·৬	১·৩	২·৪
যুক্তরাষ্ট্র সরকার ‡	—	—	—	—	৫·২	১৫·৯
যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী বিনিয়োগ	৭·২	৪·০	৮·৪	৯·৬	১৫·৯	২৯·৬
আমেরিকান নীট উত্তমর্ণ পরিস্থিতি	-৩·৭	৩·০	৮·৮	১·৮	২·৮	১৫·৩

* ৩০শে জুন।
† পাওয়া যায়নি।
‡ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালীন ঋণ বাদ দিয়ে।
§ প্রাথমিক।

উৎস: U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business. 15, Aug, 1956.

সারণী ১০.৩ নির্বাচিত দেশ ও প্রধান প্রধান শিল্পের ভিত্তিতে বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি লগ্নীর মূল্য, সময় ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ

(লক্ষ ডলারের হিসাবে)

দেশ	মোট	খনিজ ও বিগলন	পেট্রোলিয়াম	শিল্পদ্রব্য	জনসেবা	বাণিজ্য
সকল দেশ, মুদ্দতে	১,৯১,৮৫০	২১,৯৫০	৫৭,৯২০	৬৩,২২০	১৫,৮৮০	১২,৮৯০
ক্যানাডা	৬৪,৬৪০	৮,৬২০	১৩,২৯০	২৮,৩৪০	৩,১৪০	৩,৮৪০
লাতিন আমেরিকা, সাকুল্যে	৬৫,৫৬০	১০,২২০	১৭,৭৯০	১৩,৬৬০	১১,৩২০	৪,৪০০
ব্রাজিল	১১,০৭০	মেলেনি*	১,৮৬০	৫,৬৩০	১,৫৮০	১,৩৭০
ভেনেজুয়েলা	১৪,২৪০	,,	১০,৫৬০	৫৯০	১৮০	৫৫০
পশ্চিম ইউরোপ, মুদ্দতে	২৯,৮৬০	৪০০	৭,৬১০	১৬,৩০০	৩৫০	২,৯২০
আফ্রিকা :						
মিশর	৭২০	—	৪৯০	১৩০	মেলেনি	৪০
লিবারিয়া	২,৬১০	মেলেনি	২,০৫০	—	৯০	মেলেনি
দক্ষিণ আফ্রিকা	২,৫৭০	৭৩০	৬০০	৮৭০	মেলেনি	২৯০
অন্যান্য দেশ	৬২০	৪৩০	মেলেনি	—	,,	মেলেনি
ভারত	৯৬০	মেলেনি	,,	৩০০	২০	১০০
ইন্দোনেশিয়া	৮৬০	—	,,	২১০	মেলেনি	৩০

*= হিসাবগুলো সব মোটামুটি

উৎস : U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business. 19, Aug. 1956.

১৯৫৫ সালে বিদেশে আমেরিকান বেসরকারী লগ্নী বাড়ে ২'৪ বিলিয়ন ডলার। মোট পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় ২৯ বিলিয়ন ডলার। বাড়তিটুকুর ১'৫ বিলিয়ন ডলার সরাসরি বিনিয়োজিত হয়। ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি নাগাদ সরাসরি লগ্নীর মোট পরিমাণ ১৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এই সময়ে সরাসরি বিনিয়োগের প্রায় ৪০ শতাংশ ক্যানাডার ভাগে যায়। লাতিন আমেরিকায় তা বৃদ্ধি পায় ৩,০০০ লক্ষ ডলার। ১৯৫৫ সালের শেষ নাগাদ লাতিন আমেরিকায় আমেরিকান সরাসরি বিনিয়োগ ৬'৫ বিলিয়ন ডলার হয়ে উঠে। তার মধ্যে প্রায় ৪২ শতাংশ পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ খাতে ব্যয় হয়। লাতিন আমেরিকা ছাড়া অন্য অনুন্নত যে সব দেশ মার্কিন ঋণ পায় তারা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কতকগুলো দেশ। এইসকল দেশে পেট্রোলিয়াম সম্পদ বিদ্যমান হেতু এই ঋণ প্রবাহিত হয়।

১৯১৪ সাল পূর্বকালে আমেরিকান বিদেশী বিনিয়োগের যা চিত্র তা বৃটিশ চিত্র অপেক্ষা অবশ্যই স্বতন্ত্র। বৃটেন বিনিয়োগ ঘটিয়েছিল, পূর্ব-কথা স্মরণ করুন, তার নিজের দেশে লাভ তেমন ছিল না বলে; সেই তুলনায় বিদেশে অধিক লাভ পাওয়া যেত বলে। কাজেই বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণীয় ছিল। বাধাধরা ঋণের (tied loans) বালাই ছিল না। পারস্পরিক ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বিরাজমান ছিল। বিশ্ব-বাণিজ্য-পরিসর ক্রম-প্রসারমান ছিল। অবাধ বাণিজ্যের আবহাওয়া বয়ে চলেছিল। বহুমুখী চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষ্পন্ন হত। পূর্ব বিনিয়োগ উৎসারিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ সাধিত হত। পরিমাণের দিক থেকে বিদেশী বিনিয়োগ ছিল যথেষ্ট। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা-স্রোত ও বেশ অনুকূলধর্মী ছিল। ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রিয়া গঠনমুখী হয়ে উঠার সুযোগ পেয়েছিল। সাগর-পাড়স্থিত দেশে লগ্নী যথেষ্ট হারে জননির্গম, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি মিলে বেশ রমরমা অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছিল, প্রাগ ১৯১৪ কালে। পরিণামে আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু রূপ লাভের সুযোগ পেয়েছিল।

তার তুলনায় উত্তর ১৯১৪ কালের আমেরিকান বিদেশী লগ্নী পরিমাণে নেহায়েত নগণ্য ছিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৩ সাল অবধি বৃটেন তার জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ বিদেশে নিয়োগ করেছিল। ১৯৫০ দশকে এসে আমেরিকাকে তা করতে হলে বিদেশে তাকে বার্ষিক ২০ বিলিয়ন ডলার লগ্নী করতে হত। সেই তুলনায় বেসরকারী খাতে সে নামমাত্র বিনিয়োগ ঘটিয়েছিল, শতকরা হারে যা

কিনা তার জাতীয় আয়ের এক শতাংশের এক-তৃতীয়াংশেরও নিম্নে ছিল। বিদেশী বিনিয়োগক্ষেত্রে যে সব অন্তরায় আজ বিরাজমান সেগুলো বিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এক্ষেত্রে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিদেশী বিনিয়োগে যে ভাঙ্গন ধারা সৃষ্টি হয় তা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং বিশ্ব অর্থনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যে অসংহত প্রবণতা জন্ম নেয় তা তারই অঙ্গ-বিশেষ। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সাথে সাথে অবাধ বহু-মুখী বাণিজ্য প্রতিহত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তীব্র আকার ধারণ করে। শ্রম ও পুঁজির একত্রে বিচলন অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। মহামন্দাকালপর্ব আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ খাতে বৈষম্য সৃষ্টি করে। মুদ্রাসঙ্কট আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে আমেবিকান সরকারকে অধিক ভূমিকা পালন করতে হয়। নেমে আসতে হয় লগ্নীকারকের ভূমিকায়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারে না।

আলোচনায় ইতি টানা দরকার। তার আগে অবশ্য আমেরিকান বেসরকারী বিনিয়োগের আকার চরিত্রের সংক্ষিপ্তি জাল দিয়ে নেয়া প্রয়োজন। এই লগ্নীতে চারটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) পরিমাণে স্বল্প, (২) ১৯২০ দশকে ঘনীভূত, (৩) দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনী দেশে সরাসরি বিনিয়োগ অধিক এবং (৪) প্রাগ-১৯১৪ সালের বৃটেনের বিদেশী বিনিয়োগের গুরুত্বের তুলনায় উত্তর-১৯১৪ সালের আমেরিকান বেসরকারী বিদেশী বিনিয়োগের গুরুত্ব নামমাত্র হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নিগূঢ় উন্নয়ন ও বিস্তৃত অগ্রগতির একটা যোগসূত্র হচ্ছে উপাদান সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বিচলন। অবশ্য আরো অনেক যোগসূত্র রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সবের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও আঙ্গিকগত গঠন, বাণিজ্য-অনুপাত তথা বাণিজ্য-শর্ত এবং আন্তর্জাতিক লেন-দেন হিসাব নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রধান। দেশ বিশ্ব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করার পর মুহূর্ত থেকে এই সমস্ত ঘটনা-স্রোত তার উন্নয়ন অগ্রগতি ধারা ও মাত্রা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সব অঙ্গ একবারের মত সজীব হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে না। বরং তাদের ধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে। সময়ের কপোল-তলে রূপ বদলায় এবং রূপভেদে উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করে। দেশে দেশে এই রূপান্তর চিত্র ভিন্নতর হয়। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী এই সব পরিবর্তনের সম্যক চিত্র উদ্ভাসিত করা হবে।

১. রপ্তানি-শাখা

অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা একই তালে বর্ধিত হয় না। তেমনি একই সময়ে অগ্রসর হয় না। একটা এগোয় ত অন্যটা হয়ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তৃতীয় একটা হয়ত একটু পিছিয়ে পড়ে। তাইত সুম্পিটার বলেন, অর্থ-নীতিতে কতকগুলো গতি-সঞ্চালক শাখা বিরাজমান রয়েছে। তাদের ক্রিয়াকর্ম দিয়ে অর্থনীতির অগ্রসরমান নির্ণীত হয়। এক শিল্পে সম্প্রসারণ ঘটে। অন্যশিল্পে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সে আবার তৃতীয় এককক্ষেত্রে দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই খেলা দিয়ে অর্থনীতি অভীষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যায়। আর এই খেলা নিষ্পন্ন হয় বিনিয়োগ বর্ধক নীতির কার্যকরী ভূমিকা সাধনের মাধ্যমে কিছুটা এবং বাকীটা মার্শাল আলোচিত ব্যয়-সঙ্কোচের বাহ্যিক কারণ হেতু।

দেশের রপ্তানি-শাখা গতি সঞ্চালক শক্তি হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। রপ্তানি-বাণিজ্য বাজার পরিসর সম্প্রসারিত করে। তাতে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদামাত্রা বেড়ে যায়। ক্লাশিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা তাই বলেন, শিল্প-অগ্রগতি দ্রুততর হয় যদি শিল্প তার উৎপন্নদ্রব্য বিদেশে চালান দিতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র দেশী চাহিদা মিটিয়ে অত দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিল্প আকারে বর্ধিত হতে পারে। তার কলেবর ব্যাপ্তিলাভ করে বৃহৎ উৎপাদ-নের সুযোগ-সুবিধা লুটতে পারে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাতে পারে। পথ-প্রদর্শক হিসাবে অন্যদের দ্বার খুলে দিতে পারে। অন্যরা আবার সবল হয়ে ও সপুষ্টি লাভ করে অর্থনীতি জগতের সর্বত্র প্রতি-ক্রিয়া জন্ম দিতে পারে যার ফলে সামগ্রিক অগ্রগতির চেহারায় পদচারণার দুন্দভি শুনা যেতে পারে। সুতরাং মন্তব্য করা যায় যে শিল্প-অগ্রগতি প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদী ধারাপ্রবাহ, লগ্নী কর্মের দীর্ঘসূত্রী আকার-নক্সা ও রপ্তানি বাণিজ্যের দীর্ঘকালীন ধারাপর্ব একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত।[১]

রপ্তানি বাণিজ্যে সম্প্রসারণ অন্যভাবেও অগ্রগতিকে প্রেরণা যোগাতে পারে। তার পরিচলন পথ সহজ করে দিতে পারে। মনে করুন, নির্দিষ্ট কোন রপ্তানি শিল্প সামাজিক ব্যয় (**Social capital**) তেমনটা না বাড়িয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে। অথচ আভ্যন্তরীণ বাজারে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিপণীকরণ করতে হলে ব্যাপক সামাজিক-মূলধন ব্যয় প্রয়োজন হত। কাজেই, এমন রপ্তানি শিল্পের অগ্রগতিতে উন্নয়ন গতিবেগ বেগবান হয়। দেশীয় বাজার দুইটি বিষয় দিয়ে সীমিত, প্রথমতঃ প্রকৃত আয়মাত্রা তার পরিসরে সীমারেখা টেনে দেয় এবং দ্বিতীয়তঃ, সীমান্ত চৌহদ্দি তার পরিধি সীমিত করে তুলে। আভ্যন্তরীণ বাজার আবার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ তথা যোগসূত্র স্থাপন সোজা কাজ নয়। হয়ত বিরাট খরচা প্রয়োজন পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে ও দ্রব্যসামগ্রীর গতায়াত সহজীকরণে। কাজেই, দেশ আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে নিতে সক্ষম হলে এই জাতীয় অন্তরায়গুলো অতিক্রম করে যেতে পারে।

---

১. এই সিদ্ধান্তের কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায় ১৯১৩-১৯৩৭ পর্যায়কালের ইউ-রোপীয় দেশসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে, দেখুন **I. Svennilson**-এর **Growth and Stagnation in the European Economy, United Nations, Economic Commission for Europe, Geneva, 1954, 224-226.**

রপ্তানি বাণিজ্যের তৃতীয় সুবিধা হিসাবে কার্যকরী চাহিদার কথা উল্লেখ করা যায়। রপ্তানি নবতর কার্যকরী চাহিদার জন্ম দেয়। তার ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। এদিকে আবার রপ্তানি শিল্পসমূহ উপাদান সামগ্রীর জন্য দেশী চাহিদা মিটাবার মত শিল্পসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। ফলে দেশী শিল্পসমূহে উজ্জীবনী-স্পৃহা জন্ম নেয়। নব নব উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার প্রয়াস চলে।[২]

বৃটেনের অগ্রগতি ইতিহাসে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণগত গুরুত্ব বেশ আকর্ষণীয় ছিল। ১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে রপ্তানি পরিমাণ দেশী বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক ছিল। তা প্রায় জাতীয় আয়ের এক পঞ্চমাংশের সমান ছিল এবং মোট শিল্প উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের মত ছিল।[৩] বহু শিল্প প্রায় পুরোপুরি বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল, বস্ত্রশিল্প তার মোট উৎপাদনের ৫৭ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করত। সেটা ১৮৪১-১৮৪৫ সালের কথা। ১৮৮১-১৮৮৫ সালে তা এই পরিমাণ বেড়ে ৭৪ ভাগে উন্নীত হয়। লৌহদণ্ড (Pig iron) ও ইস্পাত শিল্প ১৮৪১-১৮৪৫ সালে রপ্তানি করত শতকরা ২৭ ভাগ। ১৮৮১-১৮৮৫ সালে তা বর্ধিত হয়ে ৪৫ ভাগে এবং ১৯০১-১৯০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ২৪ ভাগে এসে দাঁড়ায়। পশম শিল্প রপ্তানি করে তার মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ (১৮৪০ দশকে)। ১৮৭০ দশকে তার রপ্তানি প্রায় অর্ধেকের মত হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৭০ দশকে বৃটেন তার পাট শিল্পের ৩০ শতাংশ বিদেশে পাঠায় এবং ১০ ভাগ কয়লা বিদেশে রপ্তানি করে। পরে কয়লা রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ১৯০১-১৯১০ সালে ২২ ভাগ হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

এইসব শিল্পে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে তাদের উৎপাদন সরাসরিভাবে বেড়ে যায়। পরোক্ষফল হিসাবে এইসব শিল্পে পুঁজি

---

২. দেখুন, যথা: **W. A. Lewis-এর The Theory of Economic Growth, Allen & Unwin, London, 1955, 280.**

৩. **W. A. Lewis ও P. J. O'Leary-এর "Secular Swings in Production and Trade, 1870-1913", Manchester School of Economic and Social Studies, XXIII, No. 2, 120-122, (May, 1955).**

৪. **W. G. Hoffmann-এর British Industry, 1700-1950, Basil Blackwell, Oxford, 1955, 83-84.**

বিনিয়োগমাত্রা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। নব নব উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হয়। পরিণামে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে গিয়ে বিক্রির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। বহির্জগতে চাহিদামাত্রা ক্রমানুয়ে বেড়ে যাওয়ার ফল হিসাবে এই সব ঘটে।

বৃটেনের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির অবদান অপরিসীম। ১৮৫০ সাল নাগাদ বস্ত্র রাপ্তানি মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ ভাগের সমান হয়ে দাঁড়ায় (১৯১৩ সালের দরমাত্রার ভিত্তিতে)। বৃটেন তার এই বিরাট বস্ত্রশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য হজম করতে পারত না, কেবল বৈদেশিক বাজারের সহযোগিতায় সে এই অচিন্তনীয় অগ্রগতি লাভে সক্ষম হয়। বস্ত্রশিল্পের এই সম্প্রসারণ অন্যান্য সব শিল্পের অগ্রগতিকে ছাড়িয়ে যায়। এমনকি তাকে সাহায্যকারী সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোও তার সাথে পা মিলিয়ে এগুতে সক্ষম হয়নি। সুম্পিটারীয় উদ্যোক্তার উদ্যোগী ব্যবসায়ী গুণে গুণান্বিত হয়ে এই শিল্প অগ্রগতি পথে এগিয়ে যায়। এবং কৃষিখাতে বিদ্যমান উদ্বৃত্ত শ্রম ও ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি অংশ নিজের মধ্যে লীন করে নেয়। বস্ত্রশিল্পে শ্রম-উৎপাদিকা শক্তি কৃষি অপেক্ষা অধিক ছিল। ফলে বস্ত্রশিল্পের শ্রীবৃদ্ধিতে জাতীয় আয় অধিক হারে সম্প্রসারিত হতে পেরেছিল। অন্যথায় যেমনটা সম্ভব হত না।

বস্ত্রশিল্পেব শ্রীবৃদ্ধিজনিত বাড়তি আয়ের পালে আয়বর্ধক ও বিনিয়োগ বর্বক রীতি-নীতির হাওয়া লেগে একদিকে গতিবেগ যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি অন্যদিকে অন্যান্য শিল্পিসমূহে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য শিল্পশাখায় অনুপ্রেরণা পুঞ্জীভূত হয়ে প্ররোচিত সম্প্রসারণ বেগবান হয়ে উঠে। বস্ত্রশিল্পে পাওয়া বাড়তি আয়ের কিছুটা ভোগ সামগ্রীতে ব্যয়িত হত। ফলে ভোগ-সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাতে কবে ভোগদ্রব্য উৎপাদনকারী উপাদানসমূহ উস্কানি পায়। ফলে তাদেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাদের মালিকরা অধিক আয় পায়। শুরু করে অধিক হারে ভোগ করতে। উৎপাদন মাত্রা আরো চড়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। চলতে থাকে এই ধারা অব্যাহত গতিতে। ছড়িয়ে পড়ে অর্থনীতির আনাচে-কানাচে। আয়বর্ধক কর্মস্পৃহা ভরবেগ সম্পন্ন হয়ে উঠে।

বাড়তি আয় বাড়তি লগ্নীব সুযোগ সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন বর্ধনমাত্রা শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ জন্ম দেয়। ক্রমবর্ধমান আয়ের আঙ্গিকে বৃটেনও সেই অবস্থার সৃষ্টি করে তাতে লৌহ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, ইমারত

নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পে অধিক হারে পুঁজিলগ্নী ঘটতে থাকে। তাতে গুণক-প্রক্রিয়া আরো জোর পায়। হয়ে উঠে আরো শক্তিশালী গুণক-প্রক্রিয়া ও বিনিয়োগ বর্ধক নীতির মধুমিলনে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটেনের রপ্তানি ব্যবসায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। শেষের দিকে এসে একটু ঝিমিয়ে পড়ে। এক হিসাবে দেখা যায় যে ১৮২০-১৮৬০ সালে বৃটেনের শিল্প-পণ্য রপ্তানি বার্ষিক শতকরা ৫·৬ হারে সম্প্রসারিত হয় এবং ১৮৭০-১৯১৩ সময়কালে তা সঙ্কুচিত হয়ে ২·১ শতাংশে নেমে আসে। অপর এক হিসাব অনুযায়ী রপ্তানি-বাজার-সম্প্রসারণ ১৮৪০-১৮৬০ পর্যায়কালের বার্ষিক শতকরা ৪·৫ হারে থেকে হ্রাস পেয়ে পেয়ে ১৯০০-১৯১৩ সময়কালে শতকরা ১·৫ হারে নেমে আসে। তৃতীয় অপর এক হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, বৃটিশ তৈরীকৃত দ্রব্যের রপ্তানিহার বার্ষিক ৪·৮ হারে বৃদ্ধি পায় ১৮৭২ সাল অবধি। অতঃপর তা নিম্নগামী হয়ে উঠে এবং ১৮৭৬ থেকে ১৯১০ সাল নাগাদ তা গড়ে ২·১ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়।[৫] সারণী ১১·১-এ শ্লট (schlote) প্রদত্ত হিসাব উপস্থাপিত করা গেল। তিনি ১৭৮০-১৯০০

সারণী ১১·১. বৃটিশ রপ্তানি-বাণিজ্যে অগ্রগতি-হার ১৭৮০-১৯০০

সময়কাল		শতকরা হিসাবে রপ্তানি বাণিজ্যে বার্ষিক অগ্রগতি-হার
১৭৮০-১৮০০	...	৬·১
১৮০০-১৮২৫	...	১·২
১৮২৫-১৮৪০	...	৪·০
১৮৪০-১৮৬০	...	৫·৩
১৮৬০-১৮৭০	...	৪·৪
১৮৭০-১৮৯০	...	২·১
১৮৯০-১৯০০	...	০·৭

উৎস: W. Schlote, Birtish Overseas Trade from 1700 to the 1930's (tr. by W.H. Chaloner and W.O. Henderson), Basil Blalckwell. Oxford, 1952. 42.

৫. Lewis ও O'Leary-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ১২২; J. R. Meyer-এর "An Input-Output Approach to Evaluating the Influence of Exports on British Industrial Production in the Late 19th Century," Explorations in Entrepreneurial History, VIII, No. 1, 12, 21 (Oct. 1955).

সময়কালে বৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্যের চিত্র প্রদান করেছেন। তাঁর চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ১৮৬০ সালের পরবর্তী সময়ে এসে রপ্তানি-অগ্রগতি-হার হ্রাস পেতে থাকে। উপরোক্ত হিসাব-নিকাশ তেমন নির্ভর-যোগ্য নয় বটে। মাত্রার দিক থেকেও তাদের মধ্যকার বৈষম্য যথেষ্ট। কিন্তু, একটা বিষয় পরিষ্কার যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে বৃটিশ রপ্তানি বাণিজ্য ঝিমিয়ে পড়ে। তার বর্ধন-হার নিম্নগতি সম্পন্ন হয়ে উঠে, শুধু তাই নয়, এই সময়ে শিল্প অগ্রগতিতেও অবনতি পরিলক্ষিত হয়। সারণী ১১.২-এ প্রধান কতকগুলো শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিযার সমানুপাতিক গতায়াত তুলে ধরা হল।

সারণী ১১.২. বৃটিশ যুক্তরাজ্যের শিল্প ও রপ্তানির শতকরা হিসাবে বার্ষিক গড় অগ্রগতির হার

	১৮২৭/৩৬ থেকে ১৮৬৬/৬৭		১৮৬৬/৭৪ থেকে ১৯০৮/১৩	
শিল্প	উৎপাদন	রপ্তানি	উৎপাদন	রপ্তানি
কয়লা	৪.১	৮.৩	২.১	৪.৪
লৌহ ও ইস্পাত	৫.৪	৪.৮	২.৪	২.৩
যন্ত্রপাতি	৫.১	৮.১	২.৮	৫.১
তুলা	৩.৯	৪.৩	১.৫	১.৭
পশম	২.১	৪.৪	১.৬	—০.২

উৎস: D. J. Coppock. "The Climactic of the 1890's : A Critical Note", Manchester School of Economic and Social Studies, XXIV, No. 1, 28 (Jan. 1956), Based on Hoffman's Production Series and Schlote's exports series.

রপ্তানি বাণিজ্যে সঙ্কোচন ও শিল্প-উৎপাদনে অধঃপাতন, সুতরাং মোটামুটি সমানুপাতিক তালে এগোয়। কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায়: উভয়ের মধ্যে কারণিক-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল কি? উত্তরে, সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ১৮৭০ দশকের পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্কোচন শিল্প-সম্প্রসারণের রজ্জু টেনে ধরেছিল। অর্থাৎ রপ্তানিহারে পড়তি হেতু শিল্প উৎপাদনের সম্প্রসারণ হার শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরিখে এই সমস্যার এক উত্তরদাতা মন্তব্য করেন,

"তৃতীয় দশকের সেই গতি নিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য শেষ দশকেও সম্প্রসারিত হলে বৃটিশ শিল্প-অগ্রগতির চিত্র ভিন্নরূপ হত। তা পূর্ববর্তী অগ্রগতি হারকেও ছাড়িয়ে যেত।"[৬] লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, বৃটিশ অর্থনীতির একটা উৎপাদক-উৎপাদন চিত্রের (Input-output Table) ভিত্তিতে। ১৯০৭ সালে বৃটিশ শিল্প উৎপাদন কোন পর্যায়ে হতে পারত তার আঙ্গিকে। গল্পের কেন্দ্রে ধরে নিয়ে : ১৮৫৪ থেকে ১৮৭২ সাল অবধি রপ্তানি বাণিজ্য যে হারে বেড়েছিল সেই হারে ১৮৭২ থেকে ১৯০৭ সাল অবধি সম্প্রসারিত হলে। হফ্‌ম্যানের মতে ১৮৭২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত শিল্প-সম্প্রসারণ আসলে শতকরা ১·৭৫ হারে নিষ্পন্ন হয়েছিল। তবে যদি রপ্তানি বাণিজ্য ১৮৭২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ১৮৫৪ থেকে ১৮৭২ সালের হারে বর্ধিত হত, তাহলে শিল্প অগ্রগতি শতকরা ৪·১ হারে নিষ্পন্ন হতে পারত।[৭]

কেউ কেউ বলেন, রপ্তানি-বাণিজ্য পিছু হঠার কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে প্রতিকূল প্রভাব জন্ম নেয় তার ফলেই বৃটিশ শিল্প অগ্রগতি ব্যাত্যাহত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে তা শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে উঠে। উপরোক্ত মন্তব্য এই সিদ্ধান্তের পক্ষে মত প্রকাশ করে। কিন্তু, কেবল এই ঘটনা দিয়েই বৃটিশ শিল্প-অগ্রগতির পশ্চাৎমুখিতা বর্ণনা করা ঠিক হবে না। তার পেছনে হয়ত আরো বহু কারণ সংগুপ্ত ছিল। হয়ত তদ্দিনে দীর্ঘমেয়াদী গড়ধর্মী বন্ধ্যাত্বের কারণসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। উদ্যোগী ব্যবসায় গুণ হয়ত ঝিমিয়ে পড়েছিল। বাজার-ব্যবস্থা হয়ত একাধিপত্য-বৈশিষ্ট্য অধিক জড়িয়ে পড়েছিল। আয়-বণ্টন-প্রক্রিয়া হয়ত প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। উদ্ভাবনী আবিষ্কার হয়ত স্তিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু, তবু কথা থেকে যায়। এই সবের সমষ্টিগত প্রভাব যাই হয়ে থাকুকনা কেন, রপ্তানি বাণিজ্যে পড়তি হেতু শিল্প-অগ্রগতি অবশ্যই বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ, পরিমাণের দিক থেকে রপ্তানি বাণিজ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং, তার অধঃপতনে অধিক আঘাত লাগে শিল্পক্ষেত্রে।

বৃটিশ রপ্তানি বাণিজ্যের উপরোক্ত বিশ্লেষণ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। বস্তুতঃ এই পর্যালোচনা বেশ কয়টি মূল্যবান তথ্য

---

৬. Meyer-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১২।
৭. ঐ, পৃঃ ১৭।

তুলে ধরে। প্রথমতঃ, রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রীহীনতা সার্বিক অগ্রগতির কাঠামো ব্যাহত করে দিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে দেশী বিনিয়োগ, ভোগ অথবা সরকারী ব্যয় সম্প্রসারিত না হলে রপ্তানি বাণিজ্যে সঙ্কোচন অগ্রগতি হার শ্লথগতি সম্পন্ন করে দিতে পারে। কাজেই, যেসর দেশ রপ্তানি বাণিজ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল তাদেরকে শ্যানদৃষ্টি রাখতে হবে যেন বিশ্ববাণিজ্যে তার স্থান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পর্যায়ে থাকে। অন্যথায় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

২. বাণিজ্য-শর্ত অথবা বাণিজ্য-অনুপাত (Terms of Trade)

বাণিজ্য-শর্ত দেশের অগ্রগতির চেহারা-সুরত প্রভাবান্বিত করতে পারে। তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ধারা বাণিজ্য-শর্তকে পরিবর্তিত করতে পারে।[৮] বাণিজ্য-শর্তে উন্নতি অর্থাৎ (আমদানী-দরের তুলনায় রপ্তানি-দরের অনুপাতে বর্ধন) দেশের অগ্রগতিকে জোরদার করে। কেননা, তা আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তাতে সমপরিমাণ রপ্তানি দিয়ে অধিক পরিমাণ আমদানী করা যায়। তার ফলে দেশের অগ্রগতি সম্ভাবনা বাড়ে। কারণ রপ্তানি শিল্পে উপকরণ ব্যবহার হ্রাস পায় অথবা আমদানীর সাথে প্রতিযোগিতাধর্মী শিল্প থেকে কিছুটা উৎপাদক ছাড়া পায়। রপ্তানি-দর বৃদ্ধি পেয়ে বাণিজ্য-শর্ত অনুকূল হলে দেশে বিনিয়োগও অধিক হারে আসতে থাকে।

অন্যদিকে, বাণিজ্য-শর্তে অধঃপতন দেখা দিলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়-ক্ষমতা কমে যায়। উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কেননা, রপ্তানি-দরে পড়তিহেতু সমপরিমাণ আমদানী পাওয়ার নিমিত্তে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করতে হয়। তার ফলে রপ্তানিশিল্পে অধিক উৎপাদক

---

৮. অন্যভাবে ব্যক্ত না হলে, নিম্নোক্ত আলোচনা মানে "নীট বিনিময়" বা "দ্রব্য বাণিজ্য-শর্ত" যার সংজ্ঞা কিনা রপ্তানি ও আমদানী দরের মধ্যকার অনুপাত বাণিজ্য-শর্ত প্রত্যয় আরো বহুরূপ হতে পারে, যেমন "মোট বিনিময় বাণিজ্য-শর্ত" (Gross berter terms of trade) যার অর্থ আমদানী ও রপ্তানি পরিমাণের মধ্যকার অনুপাত, অথবা "আয় বাণিজ্য-শর্ত" যার মানে নীট বিনিময় বাণিজ্য-শর্ত পূরণ রপ্তানির পরিমাণ। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন J. Viner-এর Studies in the Theory of International Trade, Harper and Brothers, New York, 1937, 558-564.

নিয়োগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, বাণিজ্য-অনুপাত প্রতিকূল হওয়ার ফলে বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। হয়ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে সম্পদ বণ্টন পুনর্বিন্যাশ করা।

ছবির উল্টোদিকে নজর দিন। উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রবাহ ও বাণিজ্য-শর্তকে প্রভাবিত করে। অগ্রগতি এগিয়ে যাওয়াকালে ভোগ-বিচিত্রা পট বদলায়। প্রযুক্তি-জ্ঞানে রূপান্তর ঘটে, উপাদান-সরবরাহ বাড়ে-কমে। উপাদান-দর পরিবর্তিত হয়। বাজার-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে। প্রতিযোগিতা-মূলক একাধিপত্য চিত্র পরিবর্তিত হয়। এই সকল কারণে দ্রব্য-সামগ্রীর দরে পরিবর্তন ঘটে। ফলে বাণিজ্য-শর্ত পরিবর্তিত হয়।

অতীব শিক্ষাপ্রদ একটা সমস্যার নিরসন করা যাক। আলোকবর্তিকাধারী এই প্রশ্নটি হচ্ছে ঐতিহাসিক আঙ্গিকে বাণিজ্য-শর্তকে খতিয়ে দেখা। ঐতিহাসিকভাবে বাণিজ্য-শর্ত কিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে রত দেশসমূহের প্রকৃত আয়-পর্যায় প্রভাবিত করেছে? আলোচনায় একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টি রাখতে হবে যেন বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তন প্রসূত সুবিধা-অসুবিধা বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার (gains) সাথে তালগোল পাকিয়ে না যায়। প্রথমে নির্ণয় করে নিতে হবে কোন পথে বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তন সূচিত হল। অতঃপর ইউনিট প্রতি বাণিজ্য হিসাবে বাণিজ্য-শর্তকে মুদ্দত বাণিজ্য-পরিমাণের আঙ্গিকে বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসারিত সাকুল্য সুযোগ-সুবিধার সাথে যুক্ত করে যাচাই করতে হবে।

ক্লাশিক্যাল ও নয়াক্লাশিক্যালবাদীরা সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে তাঁদের আলোচনায় সমস্যাটি স্বীকার করে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই তাঁরা রপ্তানি পরিমাণের পেছনে দৃষ্টি প্রসারিত করে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণ সামগ্রী বিবেচনা করে দেখেছিলেন। তার ফলে মন্তব্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল যে, দ্রব্য বাণিজ্য-শর্তে (Commodity terms of trade, যা দ্রব্য বিনিময়ের শর্তের প্রতিভূ) হয়ত অবনতি ঘটতে পারে। তাতে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে; কিন্তু, উৎপাদক বাণিজ্য-শর্তে (factoral terms of trade, যা উৎপাদন উপাদান সামগ্রী বিনিময় শর্তের প্রতিভূ) অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। তার ফলে দেশ অধিক আমদানী পাবে, রপ্তানিদ্রব্যে অন্তরীত উপাদান সামগ্রীর বিনিময়ে।

বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তনহেতু বাণিজ্য-উৎসারিত সুযোগ-সুবিধায় তারতম্য

ঘটে। তবে তা শর্ত সাপেক্ষ আর এইশর্ত হচ্ছে চাহিদা-মাত্রার। চাহিদা-চিত্রে নড়চড় হেতু বাণিজ্য-শর্ত পরিবর্তিত হলে অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। রুচিজ্ঞান উৎসারিত কারণে আমদানী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার মাত্রাভেদ দেখা দিলে বাণিজ্য-শর্তে উন্নতির পরিণাম ফল নিরঙ্কুশ লাভ নয়। কারণ তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। তুলনা করা হয় ভিন্নরূপ দ্রব্যাদির বাণিজ্যের সাথে। অন্যদিকে, আমদানীদ্রব্যের চাহিদায় বর্ধনহেতু কারণে যদি বাণিজ্য-শর্তে অবনতি ঘটে তাহলে 'কাম্যতার' মানদণ্ডে হয়ত তা লোকসান নয়। কারণ এক্ষেত্রে কেবল আমদানী দ্রব্যের কাম্যতা বিচার করলে চলবেনা। বরং, আরো খতিয়ে দেখতে হবে আমদানী দ্রব্য ও দেশীয় দ্রব্যের আপেক্ষিক কাম্যতা। সেই সব দেশীয় দ্রব্য যেগুলোর উৎপাদন ভক্ষণ রহিত হয়েছে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদান সামগ্রীব কারণে। পরিমাপ করা সম্ভব বলে 'কাম্য বাণিজ্য-শর্ত' (utility terms of trade) এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী হিসাবে প্রতিপন্ন হবে।[৯]

১১·৩ সারণীতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান চিত্র পরিস্ফুট করে তুলছে বৃটেনের বাণিজ্য-শর্ত বর্তমান শতাব্দীর সূচনা পর্ব নাগাদ উন্মার্গগামী ছিল। অতঃপর তা নিম্নমুখী মোড় নেয়। ১৯১৮ সালের পরবর্তী সময়ে এসে তা আবার একটু ভাল হযে উঠে। ১৮৭০ দশক থেকে ১৯৩০ দশক কাল বিবেচনায় অবশ্য সারাটা সময় ধরেই উন্নতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

বাণিজ্য-শর্ত অনুকূল হলে দেশের জন্য তা মঙ্গলজনক। উন্নত বাণিজ্য অনুপাত দেশকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এই সুযোগ-সুবিধার হিসাব-নিকাশ করা যেতে পারে বহুভাবে। তার মধ্যে একটা উপায় হল এইরূপ: বাণিজ্য–পরিমাণ অপরিবর্তিত বলে ধরে নিন। দর-মাত্রায় পরিবর্তনের আগে হিসাব উদ্বৃত্ত (balance of payments) দেখে নিন। দবমাত্রা পরিবর্তিত হতে দিন। এবারে আবার হিসাব-উদ্বৃত্ত কষে নিন। এই দুই পর্যায়ের হিসাব উদ্বৃত্তের পার্থক্য বের করে নিন। প্রাপ্ত এই পার্থক্য যাচাই করে বাণিজ্য-শর্তে উন্নতিপ্রসূত লাভের মাত্রা অনুধাবন করা যেতে পারে। অন্যভাবেও এগুনো যেতে পারে। দেনা-পাওনার

---

৯. কাম্য বাণিজ্য-শর্তে রুচির পরিবর্তন অথবা রপ্তানি দ্রব্য উৎপন্নে ব্যাপৃত উপকরণ সামগ্রীর কারণে দেশী ভক্ষণ রহিত এমন সব আভ্যন্তরীণ দ্রব্য সামগ্রীর ইউনিট প্রতি ও আমদানী দ্রব্যের ইউনিট পিছু আপেক্ষিক গড় কাম্যতা প্রতিফলিত হয়। দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬০।

সাম্য (balance of payments) ধরা যাক, অপরিবর্তিত। অথচ দরমাত্রা কিন্তু নড়ে গেল। দরমাত্রায় এই তারতম্য হেতু যেটুকু অসাম্য সৃষ্টি হল তা পুষিয়ে যাওয়ার মত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হিসাব করে নিন। অতঃপর তার মূল্য নিরূপণ করুন। তাতে বর্ধিত সুযোগ-সুবিধার চিত্র-টুকু পেয়ে যাবেন। বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। তাওসিগ্

সারণী ১১·৩ বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য শর্ত
১৮৫০-১৯৩৮

বর্ষ	(১) বৃটিশ রপ্তানি-দর সূচক উৎপন্ন-দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য (১৮০০=১০০)	(২) আমদানী-দর সূচক (১৮০০=১০০)	(৩)* বাণিজ্য-শর্ত (ইমলা) (১৮৮০=১০০)	(৪) বাণিজ্য-শর্ত (কিণ্ডেলবার্জার) (১৯১৩=১০০)
১৮৫০	১০০·৮	৯০·৭	১১১·১	
১৮৫১	৯৯·১	৯০·১	১১০·০	
১৮৫২	৯৮·১	৯৩·৫	১০৪·৯	
১৮৫৩	১০৮·১	১০৭·২	১০০·৮	
১৮৫৪	১০৮·৭	১১৪·৯	৯৪·৬	
১৮৫৫	১০৬·১	১১৮·৭	৮৯·৪	
১৮৫৬	১০৮·৪	১১৮·৪	৯১·৬	
১৮৫৭	১১১·৭	১২৮·৩	৮৭·১	
১৮৫৮	১০৯·১	১১১·৩	৯৮·০	
১৮৫৯	১১১·৫	১১৩·৫	৯৮·২	
১৮৬০	১১০·৬	১১৬·৫	৯৪·৯	
১৮৬১	১১১·১	১১৩·৩	৯৮·১	
১৮৬২	১১৬·৯	১১০·৫	১০৫·৮	
১৮৬৩	১২৮·৮	১২০·১	১০৭·২	
১৮৬৪	১৪১·৩	১৩৪·৯	১০৪·৭	
১৮৬৫	১৩৪·৬	১২৫·৮	১০৭·০	

বর্ষ	(১)	(২)	(৩)*	(৪)
১৮৬৬	১৩৯·১	১২৬·৫	১১০·১	
১৮৬৭	১১০·৯	১২১·৪	১০৭·৮	
১৮৬৮	১২২·২	১২১·৮	১০০·৩	
১৮৬৯	১২১·৪	১১৭·৭	১০৩·১	
১৮৭০	১১৮·৫	১১৫·৮	১০২·৩	
১৮৭১	১১৮·০	১০৭·৯	১০৯·৪	
১৮৭২	১৩০·৪	১১৫·৬	১১৩·০	
১৮৭৩	১৩৫·২	১১৫·৪	১১৭·২	
১৮৭৪	১২৭·৭	১১২·৮	১১৩·২	
১৮৭৫	১২০·০	১০৭·৫	১১১·৬	
১৮৭৬	১১০·৫	১০৪·৮	১০৫·৪	
১৮৭৭	১০৬·২	১০৭·৮	৯৮·৫	
১৮৭৮	১০২·৩	৯৯·৯	১০২·৪	
১৮৭৯	৯৬·৪	৯৪·৮	১০১·৭	
১৮৮০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	
১৮৮১	৯৫·৮	৯৯·১	৯৬·৭	
১৮৮২	৯৭·৭	৯৮·১	৯৯·৬	
১৮৮৩	৯৪·৪	৯৫·৮	৯৮·৫	
১৮৮৪	৯০·৯	৯১·০	৯৯.৯	
১৮৮৫	৮৭·৪	৮৫·৩	১০২·৫	
১৮৮৬	৮৩·৬	৮০·১	১০৪·৪	
১৮৮৭	৮৩·৪	৭৮·৪	১০৬·৪	
১৮৮৮	৮২·৯	৮১·০	১০২·৩	
১৮৮৯	৮৪·৬	৮২·১	১০৩·০	
১৮৯০	৮৮·৩	৮০·৯	১০৯·১	
১৮৯১	৮৭·৫	৮১·৫	১০৭·৪	
১৮৯২	৮৩·৬	৭৮·১	১০৭·০	
১৮৯৩	৮৩·৪	৭৬·৩	১০৯·৩	
১৮৯৪	৭৯·২	৭১·১	১১১·৪	
১৮৯৫	৭৬·২	৬৮·৮	১১০·৮	

বর্ষ	(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮৯৬	৭৬·৯	৬৯·৪	১১০·৮	
১৮৯৭	৭৬·০	৬৯·১	১১০·০	
১৮৯৮	৭৬·২	৬৯·৭	১০৯·৩	
১৮৯৯	৭৯·৮	৭১·১	১১২·২	
১৯০০	৯১·৭	৭৬·৪	১২০·০	
১৯০১	৮৭·৩	৭৩·৯	১১৮·১	
১৯০২	৮৩·৩	৭৩·০	১১৪·১	
১৯০৩	৮৩·২	৭৪·০	১১২·৪	
১৯০৪	৮৪·২	৭৪·৩	১১৩·৩	
১৯০৫	৮৪·০	৭৪·৬	১১২·৬	
১৯০৬	৮৯·০	৭৭·৮	১১৪·৪	
১৯০৭	৯৩·৪	৮১·৩	১১৪·৯	
১৯০৮	৮৯·৮	৭৮·৩	১১৪·৭	
১৯০৯	৮৬·৫	৭৯·১	১০৯·৪	
১৯১০	৯০·২	৮৩·৬	১০৭·৯	
১৯১১	৯১·৮	৮১·৫	১১২·৬	
১৯১২	৯৩·৪	৮৩·০	১১২·৫	
১৯১৩	৯৬·৯	৮৩·৪	১১৬·২	১০০
১৯২০				১২৬
১৯২১				১৪১
১৯২২				১৩২
১৯২৩				১২৯
১৯২৪				১২৩
১৯২৫				১১৯
১৯২৬				১২২
১৯২৭				১২১
১৯২৮				১১৮
১৯২৯				১১৯
১৯৩০				১২৯
১৯৩১				১৪৩

বর্ষ	(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৩২				১৪২
১৯৩৩				১৪৯
১৯৩৪				১৪২
১৯৩৫				১৪০
১৯৩৬				১৩৮
১৯৩৭				১৩১
১৯৩৮				১৪৩

* প্রথম সারি ভাগ দ্বিতীয় সারি।

উৎস: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি: A. H. Imlah, Unpublished revised series. চতুর্থ সারি: C.P. kindleberger, The Terms of Trade, John Wiley & Sons, New York, 1956, 13, 322-326.

সাহেব বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা হিসাব দিয়েছেন। হিসাবটি ১৮৮০-১৮৮৪ থেকে ১৮৯৫-১৮৯৯ সময়কার জন্য। তিনি অঙ্ক কষে বের করেছেন যে নির্দিষ্ট আমদানী পেতে বৃটেনকে কতটুকু পরিমাণ রপ্তানি দিতে হয়েছিল। তাঁর এই হিসাবের আলোতে দেখা যায় যে বাণিজ্য-শর্ত বৃটেনের জন্য অনুকূল না হলে তাকে সেই পরিমাণ আমদানী পেতে শতকরা অন্ততঃ আরো ১৪ ভাগ দ্রব্য রপ্তানি বেশী করতে হত। তার অর্থ, বৃটেনকে আরো ৩৫০ থেকে ৪০০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী রপ্তানি করতে হত।[১০] টাকার হিসাবে এইটুকু হচ্ছে বৃটেনের জন্য উন্নত বাণিজ্য-শর্তের লাভ। অবশ্য প্রকৃত হিসাবে লাভ কতটুকু দাঁড়াবে তা বলা মুস্কিল। কেননা, প্রকৃত ব্যয়মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ও জাতিভেদে পছন্দ-অপছন্দের মাত্রাধিক্য তথা কাম্যতা চিত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব এই হিসাব মিলিয়ে নেয়া দুরূহ করে তোলে।

অবশ্য একথা সত্য যে, বৃটেনের বাণিজ্য-শর্তের আলোচনায় এই সব ছুতোনাতা তেমন একটা ধর্তব্য বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সকল সীমা-বদ্ধতার ঊর্ধ্বে যেয়ে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বৃটিশ বাণিজ্য-অনুপাত উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে ধাবিত হয়েছে সময়ের দীর্ঘ পরিসরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বৃটেনেরই জয়-জয়কার। তদ্দিনে বৃটেন তার এদ্দিনকার বিদেশী লগ্নীর মুনাফা পুরোদমে পেতে শুরু করেছে। ফলে বিপুল হারে প্রাথমিক শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানী সম্প্রসারিত হয়েছে। তাতে আমদানী-দর নিম্নগামী

১০. দেখুন Bertil Ohlin, Interregional and International Trade, Harveard University Press, Cambridge, 1935, পৃ: ৪৭০।

মোড় নিয়েছে। আমদানী দরের অনুক্রমনী সংখ্যা তথা সূচক ১৮৭২ সালের ১০০ থেকে ১৯০০ সালে ৭৭-এ নেমে এসেছে। এই হিসাবটি মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া আমদানী দ্রব্যের 'সাম্প্রতিককালে অধ্যুষিত এলাকাসমূহে', এই সংখ্যা ১৮৭২-এর ১০০ থেকে ১৯০০ সালে ৬৯-এ নেমে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত 'কাঁচামাল'-এর আমদানী দর-মাত্রার সূচক ১৮৭২ সালে ছিল ১০০ যা হ্রাস পেয়ে ১৯০০ সালে ৫৫তে এসে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, 'নব অধ্যুষিত এলাকাসমূহে' এই সূচক ১৮৭২ সালের ১০০ থেকে ১৯০০ সালে ৭১-এ নেমে আসে।[১১]

১৮৮০ ও ১৯০০ সালের মধ্যকার সময়ে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের আমদানী-দর বিশেষভাবে হ্রাস পায়। আমদানী-দরে এই পড়তির জন্য দায়ী রেলপথ। বৃটিশ মূলধন পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ভারত, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রচুর রেলপথ নির্মাণ করে নেয়। রেলপথের এই ব্যাপক অগ্রগতির ফলে আমদানী সহজ হয় ও পরিণামে দাম হ্রাস পায়। এই সকল দেশে ১৮৭০ সালে মাত্র ৬২,০০০ মাইল রেলপথ ছিল। ১৯০০ সালে তা বেড়ে প্রায় ২,৬২,০০০ মাইল হয়ে দাঁড়ায়।[১২]

সে তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। বৃটেন কৃষিপণ্য আমদানীতে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তার এই নির্ভরশীলতা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। এদিকে অব্যাহত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে, তার প্রকৃত মজুরী হার বাণিজ্য-শর্ত দিয়ে অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে উঠেছে। বৃটিশ বিদেশী বিনিয়োগের ফলে সস্তাদরে খাদ্যসামগ্রী আমদানী সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে বৃটেনের জীবনযাত্রার মান উন্মার্গগামী হতে পেরেছিল।

সুতরাং, বৃটেনের বাণিজ্য-অনুপাত অনুকূলস্রোতে প্রবাহিত হয়েছে অনেককাল ধরে। তার এই সুখকর অবস্থা একটা বড় রকমের প্রশ্ন তুলে ধরে। তাহলে কি কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহের বাণিজ্য-শর্ত সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে ক্রমাবনতির পথে ধাবিত হয়েছিল? এই কারণে কি এই সকল দেশের সার্বিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল?

১১. Kindleberger-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৩৪।

১২. দেখুন A. K. Cairncross-এর Home and Foreign Investment, 1870-1918, Cambridge University Press, Cambridge, 1953, 233.

কতক লেখক মত প্রকাশ করেছেন যে, হঁা, কাঁচামাল উৎপাদনকারী অনুন্নত দেশসমূহের বাণিজ্য-শত দীর্ঘকালীন পরিসরে নিম্নগামী হয়ে পড়েছিল। জাতিপুঞ্জের কয়েকটা রিপোর্টের এই মত তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, দীর্ঘসূত্রী বিবেচনায় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের তারতম্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই তারতম্য শিল্পে উন্নত দেশসমূহের অনুকূলে এবং অনুন্নত দেশগুলোর প্রতিকূলে বয়ে চলেছিল। ফলে অনুন্নত দেশের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুতহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের অগ্রগতির ধারা ব্যহত হয়েছিল।[১৩]

এই প্রসঙ্গে প্রেবিস্কের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৭০ দশক থেকে ১৯৩০ দশক অবধি সময়কালের আমদানী ও রপ্তানি দরমাত্রা বিবেচনা করে মন্তব্য করেছেন যে, প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে অবশ্যই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাঁদের প্রযুক্তির অগ্রগতির সব সুবিধা নিজেরা লুটেছে। অন্যদিকে, অনুন্নত কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহ তাদের কারিগরি অগ্রগতির বিরাট একটা অংশ কেন্দ্রে অবস্থিত উন্নত দেশগুলোর ভোগের নিমিত্তে প্রদান করেছে। তিনি বলেন, শিল্পভিত্তিক দেশসমূহে মুদ্রা-আয় তথা দরমাত্রা উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় অধিকহারে সম্প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষি ভিত্তিক দেশগুলোতে যদিও উৎপাদিকা-শক্তি ন্যূনহারে বেড়েছে, তবু তা বণ্টিত হয়েছে দরমাত্রা অবনতির আকারে অথবা নামমাত্র মুদ্রা-আয় বৃদ্ধির প্রকারে। দরমাত্রার এই বিপরীতধর্মী আচরণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রেবিস্ক যুক্তি দিয়েছেন যে, বাণিজ্য-চক্রের অনুক্রমিক অগ্রগমনে কাঁচামালের দাম ও শিল্পজাত-দ্রব্যের দাম ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছে। তার সাথে শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাজার-ব্যবস্থায় জোরালো মনোপলি

১৩. দেখুন যথা United Nations, Department of Economic Affairs (Raul Prebisch). The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Lake Success, 1950 ; H.W. Singer-এর "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries", American Economic Review, Papers and proceedings, May, 1950, 473-485 ; United Nations, Department of Economic Affairs, Relative Prices of Exports and Imports of Under-Developed Countries, New York, 1949 ; Lewis-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২৮১-২৮৩।

পরিবেশ অবস্থা আরও গাঢ় করে তুলেছে। তিনি বলেন যে, বাণিজ্য-চক্রের প্রাচুর্যপর্বে কাঁচামালের দাম হঠাৎ করে সরাসরি উঠে গিয়েছে। আবার পড়বার সময় ধপাস করে নেমে গিয়েছে। তার তুলনায় বাণিজ্যচক্রের উর্ধ্বমুখী মোড়ে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম তেমনটা চড়েনি বটে। কিন্তু, মন্দাপর্বে তারা আবার তেমন মারাত্মকভাবে নেমেও আসেনি। তার জন্য শিল্প-মজুরীর ঋজুবদ্ধতা ও শিল্প-বাজারে মনোপলি অবস্থায় দর-অনমনীয়তা দায়ী। সুতরাং, পারস্পরিকধর্মী বাণিজ্য-চক্রের আঘাতে এই উভয়জাত দ্রব্যের দরমাত্রার মধ্যকার বিভেদ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। পরিণামে, কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহের বাণিজ্য-শর্তে ক্রমান্বয়িক হারে প্রতিকূলস্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

প্রেবিস্কের এই যুক্তিতর্ক অবশ্যই বেশ জোরালো ও অর্থবহ। তবে তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। নানাভাবে তাঁর যুক্তিতর্কে আঘাত হানা যায়। সম্বলিত তথ্যাদির ভিত্তিতে যেমন তেমনি বিশ্লেষণের দিক থেকেও তার সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করা চলে। অনুন্নত কৃষি-প্রধান দেশের আমদানী-রপ্তানির সঠিক উপাত্ত পাওয়া মোটেই সহজ নয়। নির্ভরযোগ্য খবরাদির অভাবে প্রেবিস্কের মন্তব্যের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, কেবল বৃটেনের বাণিজ্য-অনুপাতের শ্রী লক্ষ্য করেই অন্যান্য দেশের দুর্দশার কথা বলা সমীচীন নয়। তাতে একতরফা যুক্তির ভয় নিহিত থাকে। তদুপরি, অন্যান্য দেশগুলো কেবল বৃটেনের সাথেই বাণিজ্য করেনি, অন্য আরো বহু দেশের সাথে করেছে। তেমনি অন্যান্য বহুদেশ থেকে জিনিসপত্তর আমদানীও করেছে।[১৪] কাজেই, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি পাওয়া দুরূহ। পরোক্ষ তথ্যাদির ভিত্তিতে হয়ত মন্তব্য করা চলে। কাঁচমাল সামগ্রীর দরমাত্রার একটা সাধারণ হিসাব কষে নিয়ে তৈরীকৃত দ্রব্যাদির সাধারণ দর-সূচকের সাথে মিলিয়ে বিশ্ব-বাণিজ্যের একটা আপেক্ষিক চিত্র হয়ত তুলে ধরা যেতে পারে। তা তেমন নির্ভরযোগ্য হবে এমন কোন কথা নেই।

১১.৪ সারণী সঙ্কেত দেয় যে কাঁচামাল ও তৈরীকৃত দ্রব্যাদির বাণিজ্য-শর্তে ১৮৭০ দশক থেকে ১৯৩০ দশকের মধ্যে অবনতি ঘটেছে। এই সময়ে সঙ্কেত সূচক ১৮৭০ সালের ১১১ থেকে নেমে নেমে ১৯৩৮

---

১৪. উদাহরণতঃ কিণ্ডেলবার্জারের যুক্তিতর্কের কথা চিন্তা করুন। তিনি বলেন ১৮৭২-১৯০০ সালে বৃটেনের বাণিজ্য-শর্তে উন্নতি ঘটেছে বটে, তবে শিল্পোন্নত ইউরোপের অবস্থা কাহিল হয়েছিল বৈকি। দেখুন তাঁর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ২৩৩।

সারণী ১১·৪ বাণিজ্য-শর্ত প্রাথমিক দ্রব্য-সামগ্রী ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি, ১৮৭০-১৯৫০ (১৯১৩=১০০)

বর্ষ	(১) দর-সূচক প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রী	(২) দর-সূচক শিল্পজাত দ্রব্যাদি	(৩) বাণিজ্য-শর্ত সূচক; (১)/(২)
১৮৭০	১১৮	১০৬	১১১
১৮৮০	১০২	১০২	১০০
১৮৯০	৮৬	৯০	৯৫
১৯০০	৮৬	৮৮	৯৮
১৯১৩	১০০	১০০	১০০
১৯২১	১৩১	১৮৬	৭০
১৯৩৮	৫৩	৭২	৭৫
১৯৫০	১২৪	১২২	১০২

উৎস: Lewis: "World Production, Prices and Trade, 1870-1960," Manchester School of Economic and Social Studies, XX No. 2, 118 (May, 1952)

সালে ৭৫-এ এসে উপস্থিত হয়েছে (১৯১৩=১০০)। জাতিপুঞ্জের একটি আলোচনায়ও এমন মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। এই আলোচনার মতে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় কাঁচামাল ইত্যাদির দামে পড়তি শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কাঁচামাল দ্রব্যাদির রপ্তানি ঘটিয়ে উপরোক্ত সময়ের সূচনাকালের মাত্র ৬০ শতাংশ শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করা যেত।[১৫]

পরিসাংখ্যিক এই-সব হিসাব-নিকাশ অবশ্য তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি নিহিত থাকা তেমন বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই, এইসব তথ্যাদির ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একটু কষ্টকর বৈকি। তাছাড়া, কাঁচামাল সামগ্রী ও শিল্পজাত তৈরীকৃত দ্রব্যের দ্রব্য-বাণিজ্য-শর্ত আর ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যকার বাণিজ্যশর্ত ঠিক এক কথা নয়। তদুপরি, যে দর-শ্রেণীর (Prioe Series) ভিত্তিতে

---

১৫. জাতিপুঞ্জের প্রাগুক্ত পুস্তিকা পৃঃ ৭,২৩।

ধারাপর্বের সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয় সেইসব দর-শ্রেণী প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট তথ্য-গাণিতিক সমস্যা বড্ড জটিল আকৃতির। জটিলাকার এই পরিসাংখ্যিক জটাজালের কুয়াশা ভেদ করে নির্ভরযোগ্য হিসাব-নিকাশ কষে নেয়া মুখের চাট্টিখানি কথা নয়। যেমন ধরুন, হিসাবে যেসব নমুনা ব্যবহৃত হয় তাদের সংখ্যার অপ্রতুলতা মন্তব্যে সীমারেখা টেনে দেয়। তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্রব্যাদির সামান্যকরণ তথা তাদেরকে একসূত্রে গ্রথিত করে এক মানে যাচাই করা সহজ নয়। গুণগত পরিবর্তনহেতু যে বৈষম্য দেখা দেয় তা অন্তরিত করার মত সুযোগের অভাব হিসাবে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। সময়ের কপোলতলে বহু জিনিস বৈদেশিক বাণিজ্যের আওতা থেকে হারিয়ে যায়। আবার নব নব বহু দ্রব্য তার বিস্তৃত জালে আটকা পড়ে। পরিসাংখ্যিক হিসাব এই সব পরিবর্তন সহজে বিধৃত করে নিতে পারে না। এদিকে, পরিবহন ব্যয়ে তারতম্যও বেশ বেকায়দার জন্ম দেয়।

গুণগত পরিবর্তন সংখ্যার হিসাব দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি আন্দাজ করা চলে। অধিকাংশ লেখক এই সম্পর্কে একমত যে প্রাথমিক দ্রব্যাদির তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যে গুণগত অগ্রগতি অধিক সাধিত হয়েছে। একথা সত্য বলে মেনে নেয়া হলে বলতে হয় যে তথ্য-গণিতের হিসাবে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এইসব হিসাব-নিকাশে সব কিছু একই মানে পরিমাপ করা হয়েছে। সুতরাং, কাঁচামাল উৎপাদন-কারী দেশসমূহের যে দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা হয়ত তেমন চরম না-ও হতে পারে।

গত শতাব্দীতে জাহাজ-ভাড়া বেশ হ্রাস পেয়েছে। জাহাজে চালান দেয়া দ্রব্যসামগ্রীর দরের তুলনায় এই হ্রাস বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। বৃটেন তার রপ্তানিদ্রব্যের মূল্যায়ন করে বহির্গমন-বন্দরে। কাজেই, তার রপ্তানী দ্রব্যের যে দর-চিত্র পাওয়া যায় তাতে জাহাজ-ভাড়া অন্তর্ভুক্ত নয়। আমদানী দরে তা অন্তরিত। কেননা, আমদানী দর নির্ণীত হয় আমদানী বন্দরে। কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ আমদানী ও রপ্তানি এই উভয়বিধ ক্রিয়ার পরিবহন ব্যয় বহন করে; কেননা, তাকে বিদেশী জাহাজে করে মাল আনা-নেওয়া করতে হয়। সুতরাং, অনুন্নত দেশের বাণিজ্য-চিত্র বৃটিশ উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্ফুটিত করতে হলে তা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে যদি না জাহাজ-ভাড়ার ব্যয়টুকু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে না নেওয়া হয়। বৃটেনের আমদানী-দর থেকে এই ব্যয় বাদ দিয়ে নিতে

হবে এবং রপ্তানি-দরে সংযোজন ঘটিয়ে নিতে হবে। তখন হয়ত সঠিক হিসাব পাওয়া যেতে পারে। এবং এমতাবস্থায়, এটা পরিলক্ষিত হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, বৃটিশ আমদানী-দরে যে পড়তি লক্ষিত হয় তা পরিবহন-ব্যয় হ্রাসজনিত।[১৬] শুধু তাই নয়, হয়ত তখন পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে রপ্তানি-দরে যে ন্যূনতা লক্ষ করা যায় তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী জাহাজ-ভাড়ায় ব্যাপক পড়তি। যদি তাই হয়, তাহলে ১১·৩ সারণীতে বৃটিশ বাণিজ্য-শর্তে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

সুতরাং, পরিসাংখ্যিক অপূর্ণাঙ্গতা ও দোষ-ত্রুটি হিসাবের নির্ভরশীলতায় সন্দেহ জাগিয়ে দেয়। কাজেই, দরিদ্র দেশের বাণিজ্য-শর্ত বহুকাল ধরে অবনতির পথে এগিয়ে গিয়েছে বলা কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার বিষয় বৈকি। সত্যিই যে তাদের অধঃপতন ঘটেছে-একথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে? হাতের কাছে এমন প্রমাণ যে দেখতে পাইনে। বরং কেউ কেউ হয়ত যুক্তি দেখাতে পারেন যে, অবনতি হওয়া ত দূরের কথা, আসলে তাদের উন্নতি ঘটেছে। গুণগত পরিবর্তন ও পরিবহন-ব্যয়ে ন্যূনতা হিসাবে নিলে হয়ত দেখা যাবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের বাণিজ্য-শর্তে মেদ বৃদ্ধি ঘটেছে।

রাউল প্রেবিস্ক যে থিসিস উপস্থাপিত করেছেন তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে আরো বহু বিস্তৃত পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রয়োজন বাণিজ্য-শর্ত সম্পর্কিত পর্যাপ্ত উপাত্ত। দরকার মনোপলি পরিস্থিতি সম্পর্কে আপেক্ষিক জ্ঞান। তেমনি প্রযুক্তিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র। এই সকল খবরাদি শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে যেমন তেমনি কাঁচামাল ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয়। তৈরীকৃত দ্রব্যের রপ্তানিতে কি মনোপলি অধিক হারে দানা বাধতে পেরেছিল? কাঁচামাল রপ্তানিতে কি তেমনটা হয়নি? শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কি প্রযুক্তিক অগ্রগতি অধিক হারে নিষ্পন্ন হয়েছিল? দরিদ্র দেশ কি সেই তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল? মনোপলির কারণে কি উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস দর-মাত্রায় প্রতিফলিত হতে পারেনি? এই জাতীয় হাজারো প্রশ্নের হ্যাঁ বোধক উত্তরেই কেবল প্রেবিস্কের মতে সায় দেয়া চলে। অন্যথায়

১৬. এই সম্পর্কে পরিসাংখ্যিক প্রমাণাদি পেতে পারেন C. M. Wright-এর Convertibility and Triangular Trade as Safeguards against Economic Depression," Economic Journal, LXV, No. 259, 424 (Sept, 1955).

নয়। কিন্তু ধনাত্মকধর্মী উত্তর পেতে হলে বিস্তৃত ও ব্যাপক বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট বহু প্রবণতা যেমন ভোগ-চিত্র, প্রযুক্তিক-অগ্রগতি, উপকরণ সরবরাহে পরিবর্তন, বাজার-ব্যবস্থা ইত্যাদি যে সব শক্তি বাণিজ্য-শর্তকে প্রভাবিত করে, সেই সব সম্পর্কে সঠিক অভিজ্ঞাননামা রচনা করে নিতে হবে। তবেই, কেবল প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করা চলবে। তাছাড়া ধরুন, না হয় একমত হওয়া গেল যে এই কারণহেতু দেশের বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু, পরিবর্তনের ফল হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধায় কি অবস্থার সৃষ্টি হল সে সম্পর্কে একমত হওয়াত সহজ নয়। কারণ, এই ফলাফল এক-দুয়ের হিসাব দিয়ে যে মিলানো সম্ভব নয়। তাছাড়া, বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তন ঘটে অর্থনৈতিক মঙ্গলচিত্রে কি প্রতিক্রিয়া জন্ম দিল সেই সম্পর্কে শেষ কথা বলার উপায় নেই।

বাণিজ্য-শর্তের নক্সা অপেক্ষা আয় মাত্রার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার পরিমাপ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আয় সম্পর্কে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান জ্ঞানের আলোতে লক্ষ্য করা যায় যে, শিল্পোন্নত ও অ-শিল্পভিত্তিক এই উভয় প্রকার দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিয়ে লাভবান হয়েছে। কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহ প্রাথমিক দ্রব্য-সামগ্রী যুগিয়েছে। সেই সব দ্রব্য শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত করে শিল্পভিত্তিক দেশ পুঁজি-সামগ্রী ও ভোগসামগ্রী উৎপন্ন করেছে। প্রথমোক্ত দেশ বিনিময়ে এই সব সামগ্রী পেয়েছে। শিল্প অঞ্চলগুলো একদিকে পুঁজি-সামগ্রী রপ্তানি করেছে, অন্যদিকে প্রযুক্তিবিদ্যা যুগিয়েছে। অ-শিল্প অঞ্চল-এই সব পেয়ে শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পেরেছে। আমদানীকৃত পুঁজি-সামগ্রী ও প্রযুক্তিক অভিজ্ঞান প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল-সমূহে শিল্প-অগ্রগতির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করে দিয়েছে। অন্যদিকে নিগূঢ় অগ্রগতি ও বিস্তৃত অগ্রগতির আন্তঃসম্পর্ক ব্যাপক প্রেক্ষাপট হিসাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাস রচনায় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তার অবদান পরিমাপ করায় এই সকল কথাগুলো স্মরণে রেখে এগুনো উচিত।

৩. দেনা-পাওনার ভারসাম্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যকার সম্পর্কের বাকী খবর জানতে পাঠকবর্গকে এবার বাণিজ্যিক দেনা-পাওনার জগতে

হাজির হতে আহ্বান জানাচ্ছি। তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছে যে দেশের লেন-দেন পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার চিত্র তুলে ধরে। তার বিভিন্ন পর্যায় প্রতিফলিত করে। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও দেশী লগ্নীর কতক সম্পর্ক দেনা-পাওনার প্রকৃতিগত নক্সা প্রস্ফুটিত করে তুলে। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ অনুসারে রপ্তানী ও দেশী বিনিয়োগ একত্রিত হয়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আমদানীর সমান হয়। এটা ভারসাম্য পরিস্থিতির কথা। (এই হিসাবে সরকারী-ব্যয় বহির্ভূত রাখা হয়েছে)।

দেশ যখন সবে ঋণ নিতে শুরু করে তখন আমদানী-রপ্তানি অপেক্ষা অধিক হয় এবং দেশী লগ্নী দেশী সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হয়। কতকক্ষেত্রে, দেশী বিনিয়োগ বিদেশী পুঁজির অপেক্ষায় থাকে। এমতাবস্থায় বিদেশী পুঁজির আগমন ঘটে তবে আমদানী-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। অন্যক্ষেত্রে, দেশী লগ্নী সঞ্চয় পরিমাণ ছাড়িয়ে যায় এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী ঋণ আগমনের পূর্বেই আমদানী উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। চলতি খাতে বিকলন-স্থিতি (debit balance) অনুসরণ করে অতঃপর, বিদেশী পুঁজি এগিয়ে আসে। পরিশেষে দেশ যখন পরিপক্ক অধমর্ণ অথবা নাবালক উত্তমর্ণ হয়ে উঠে, তখন রপ্তানি আমদানীকে ছাড়িয়ে যায় ও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দেশী লগ্নী অপেক্ষা অধিক হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ দরিদ্রদেশ স্বভাবতঃ দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি ধার করে থাকে। তাদের আভ্যন্তরীণ লগ্নী স্বীয় সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হয়; পার্থক্যটুকু আসে বিদেশী ঋণ থেকে অথবা আমদানী উদ্বৃত্ত থেকে। অন্যদিকে ধনীদেশগুলো তাদের সঞ্চয়ের তুলনায় দেশে লগ্নী ঘটাতে পারে কম। উদ্বৃত্তটুকু বিদেশে নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়।

পুঁজির এই আন্তর্জাতিক প্রবাহধারা 'স্থানান্তর' সমস্যার জন্ম দেয়। অর্থাৎ পুঁজি-স্থানান্তর নিষ্পন্ন করার 'উপায়' বের করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই 'উপায়' মানে পুঁজি সরবরাহের আন্তর্জাতিক প্রবাহধারা দেনা-পাওনার সাম্যচিত্রে সাঙ্গীকরণ করে নেয়া। নাবালক অধমর্ণ দেশে আমদানী উদ্বৃত্ত দেখা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই উদ্বৃত্ত বিদেশী পুঁজি আগমনের সীমা ছাড়িয়ে না যায়। পরিপক্ক অধমর্ণ দেশে সুদ-আসল আদায়ের পরিমাণ আমদানী পুঁজি অপেক্ষা অধিক হয়। কাজেই, তাকে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

নয়া-ক্লাসিক্যালবাদী তত্ত্ব এই সমস্যায় বেশ মাথা ঘামিয়ে ছিল।[১৭] বিরাট মহাজন দেশ বৃটেন তার বাণিজ্য লেন-দেন পরিস্থিতি বেশ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তেমনি ঋণগ্রহণকারী দেশগুলোও তাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায়ে সমর্থ ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক হিসাব-নিকাশ সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন করার মত পদ্ধতি বিরাজমান ছিল এবং তা নির্বিঘ্নে তড়িৎ-গতিতে হিসাব মিটিয়ে দিতে সক্ষম ছিল।[১৮]

নবীন খাতক দেশগুলোতে অগ্রগতি-প্রক্রিয়া সপুষ্ট হয়ে লেন-দেন ভারসাম্য যথাযথ করায় সাহায্য যোগাত। বৃটেন থেকে ঋণ গ্রহণ করে বৃটিশ দ্রব্যাদি ক্রয়ে যেটুকু ব্যয় করা হত সেটুকুর হিসাব-নিকাশে তেমন কোন জটিলতা ছিল না। তবে, এই জাতীয় বন্দী-ঋণের পরিমাণ খুব বেশী একটা ছিল না।[১৯] বাকী সবটুকু নিষ্কাশিত করতে হত আমদানী উদ্বৃত্তের আকারে এবং তা নিষ্পন্ন হত বেশ সার্থকতার সাথে।

প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলো ছিল খাতক। তাদের আমদানী পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণগুলো ক্লাশিক্যাল চিন্তাধারায় খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। ক্লাশিক্যালবাদীর মতে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদি এবং রপ্তানী ও আমদানী প্রতিরোধকারী দ্রব্যসামগ্রীর দরমাত্রায় তারতম্য হেতু আমদানীতে সম্প্রসারণ ঘটে। এই ব্যাখ্যা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোর আমদানী-চিত্র বর্ণনা মোটেই সহজসাধ্য নয়। মালয়, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা, সিংহল কি ভারতের মত দেশে তৎকালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতিমালায় পরিবর্তন বলে তেমন তেমন কিছু বিদ্যমান ছিল না। তারা

---

১৭. দেখুন তৃতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ।

১৮. 'লেন-দেন ভারসাম্যে'র সাধারণ সংজ্ঞা প্রদান করা দুরূহ কাজ। অবস্থাভেদে প্রথম পৃথক সংজ্ঞা হয়ত দেয়া যেতে পারে। তবে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেয়া মোটেই সহজ নয়। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে লেন-দেন পরিস্থিতিকে এভাবে বোঝানো হবে: লেন-দেন সাম্য তখনি ঘটবে যখন নীট স্বর্ণ চলাচল, অথবা 'সামঞ্জস্যধর্মী' (প্রবোচিত) পুঁজি সঞ্চালন থেমে যাবে।

১৯. বৃটিশ কলোনীগুলোতে অবশ্য এর পরিমাণ বেশ উঁচুতে ছিল। কাজেই, সাঙ্গীকরণ বেশ সহজ হয়েছিল। দেখুন, যথা - H. J. Habakkuk-এর "Free Trade and Commercial Expansion" in Cambridge History of the British Empire, II, Cambridge University Press, Cambridge, 1940, 800.

যা অমদানী-রপ্তানি করত তার দাম, কি শর্তাবলী তাদের ক্রিয়াকর্ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হত না। এসব নির্ধারিত হত বিশ্ব-পরিস্থিতির বৃহত্তর আঙ্গিনায়। সেখানে তাদের প্রভাব ছিল নেহায়েত নগণ্য। "ধনী দেশের সেই বৈচিত্র্য ও প্রাণ-উচ্ছলতা, সরবরাহ চিত্রে উদ্দামতা...." তাদের ছিল না।[২০]

অনুন্নত দেশগুলোতে আমদানী উদ্বৃত্ত দেখা দেয়ার কারণ বর্ণনা করায় বরং বিদেশী ঋণ গ্রহণজনিত কারণে মুদ্রা সম্প্রসারণ অধিক হয়ে মুদ্রাস্ফীতি তীব্রতর হওয়া অধিক দায়ী বলে প্রকাশ করা যায়। এই সকল দেশগুলোতে মুদ্রা ব্যবস্থা গঠনগত দিক থেকে ভিন্নতর ছিল বটে, তবে বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি পরিবর্তনে এবা ছিল বড্ড স্পর্শকাতর। মুদ্রা সরবরাহের প্রায় সবটাই ছিল নগদ আকারে আর সংরক্ষিত মুদ্রা রাখা হত হয় স্বর্ণে নয়ত ষ্টার্লিং জামানতে। কাজেই মুদ্রা সরবরাহ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি প্রতিফলিত করত। বহির্সূত্রে এই যে নির্ভরশীলতা তা পূর্ণরূপে প্রতিভাত হত স্বর্ণ বিনিময়-মান অথবা ষ্টার্লিং বিনিময়-মান বিদ্যমান দেশগুলোর বেলায়। ইংল্যাণ্ড থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হত, ব্যাঙ্কগুলো তার উদ্বৃত্ত টাকা লণ্ডনে রেখে দিত। এই উদ্বৃত্ত টাকার ভিত্তিতে দেশে ক্রেডিট-সম্প্রসারণ ঘটত। জন্ম নিত তীব্রতর মুদ্রাস্ফীতি প্রবণতা। এমতবস্থায় আমদানী বাড়ত। এদিকে আমদানীর প্রান্তিক স্পৃহা প্রবলতা। আমদানী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার আয়-নমনীয়তা বেশ উঁচু। অথচ সঞ্চয়-স্পৃহা নগণ্য। কাজেই আমদানী মাত্রা বেড়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি! বাস্তবে ঘটতও তা।

কতকগুলো দেশে অবশ্য অবস্থা একটু ভিন্নরূপ ছিল। খাতক হিসাবে নবীন হলেও ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া, কিছুটা সুবিধায় ছিল। এই সকল দেশে কিছু কিছু দরমাত্রায় পরিবর্তন কার্যকরী হওয়ার মত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, কেবল এই দর পরিবর্তন দিয়ে পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। একথা অবশ্য স্মরণে রাখতে হবে যে মূলধনী সামগ্রী ঋণ হিসাবে নেয়ার ফলে উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রদমিত হয়ে উঠেছিল। ফলে, উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল,

২০. দেখুন Alfred Marshall-এর Money, Credit and Commerce, Macmillan and Co. Ltd., London, 1923, পৃ: ১৭২।

চাকুরী-বাকুরীক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং পরিণামে, প্রকৃত আয় বেড়ে গিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতিও মাথা উঁচিয়ে উঠেছিল। যদিও তা অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় প্রকট আকার ধারণ করতে পারেনি। সে যাই হউক, মুদ্রাস্ফীতি-প্রক্রিয়া উৎসারিত দর ও আয় প্রভাব আমদানী পরিমাণে সাহায্য করেছিল। মৌলিক বিবেচনায় তা ঘটেছিল বিদেশী ঋণ সমৃদ্ধ উন্নয়ন অগ্রগতি প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ঋণ পরিশোধের কাহিনী বেশ সন্তোষজনক। অধিকাংশ পরিপক্ক খাতক তাদের ঋণ আদায় করে দিয়েছিল। বাকী বকেয়া যে ছিল না তা নয়। তবে মোট পরিমাণের তুলনায় এমন একটা বেশী কিছু ছিল না। সরকারী বণ্ডের বকেয়া নামমাত্র ছিল। ১৮৮২ থেকে ১৯১১ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, বার্ষিক মোট ১০০ ডলারের মধ্যে মাত্র ০·৩৯ ডলারের মত বাকী পড়েছিল।[২১] আর সবটাই আদায় হয়ে গিয়েছিল এবং আদায় না হওয়ার জন্য দায়ী ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থ পরিচালন ব্যবস্থায় অরাজকতা বিশেষ করে ১৮৭০ দশক থেকে ১৮৯০ দশক সময়ে। অন-উৎপাদনশীল ব্যয়, কি, লেন-দেন সাম্যে দুর্দশার জন্য নয়।

এবারে রপ্তানি উদ্বৃত্ত নিয়ে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। অধিকাংশ পক্ক খাতক কোন্ উপায়ে রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার। এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয়। রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছিল রপ্তানি ও আমদানী দুই-ই বেড়ে যেয়ে। এমন নয় যে রপ্তানি এগিয়ে গিয়েছিল আর আমদানী ঠায় দাঁড়িয়েছিল। উভয়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তবে আমদানীর তুলনায় রপ্তানি অধিকহারে এগিয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ পুরানো খাতক দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সময়ের দীর্ঘকালীন পরিসরে, উন্মার্গগামী ছিল। তাদের রপ্তানি শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে চলেছিল। অধিকাংশ বিদেশী ঋণ রপ্তানি শিল্পসমূহে নিয়োজিত হয়েছিল। রপ্তানি শিল্পগুলোকে উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে চলেছিল। তাদের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশে পর্যাপ্ত বাজার বিদ্যমান ছিল। কাজেই সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বৃটেন ১৯১৪ সাল নাগাদ তার খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচামালের চাহিদা

---

২১. দেখুন যথা—**Council of the Corporation of Foreign Bondholders, Annual Report, London, anumally.**

বাড়িয়ে চলেছিল।[২২] কাজেই রপ্তানি শিল্পে ব্যাপকহারে অগ্রগতি সাধিন হয়েছিল। রপ্তানি শিল্পে ঘনীভূত পুঁজি-নিয়োগের ফলে হয়ত অর্থনীতির অন্যান্য শাখা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, এতে ঋণ-পরিশোধ সহজ হয়েছিল। এদিকে বহুমুখী নিষ্কাশন পন্থা চালু ছিল বলে অধিকাংশ খাতক অনায়াসে বৃটেনের সাথে তাদের পানা-দেনার হিসাব মিটিয়ে নিতে পেরেছিল। তজ্জন্য দ্বিমুখী পরিশোধ পন্থার মত সঙ্কীর্ণ ও অধিক ঝামেলাযুক্ত পথে এগুতে হয়নি বলে তেমন কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়নি।

আমদানী সম্পর্কে কি বলা যায়? আমদানী বেশ শ্লথগতিতে এগিয়েছিল। তার এই শ্লথগতি ব্যাখ্যা করা বরং বেশ কষ্টদায়ক। 'প্রদর্শনী প্রভাব'[২৩] অর্থাৎ কিনা ধনী দেশের ভোগচিত্র দেখে দরিদ্র দেশের লোভলালসা বাড়া, স্নুতরাং. অধিক হারে ভোগদ্রব্য আমদানী করা, নীতি অনুসারে আমদানী মাত্রা দ্রুতহারে বেড়ে যাওয়ার কথা। অথচ তা না হয়ে অবস্থা হয়েছে ভিন্ন রূপ। তার কারণ হয়ত এই যে প্রাগ--১৯১৪ কালে প্রদর্শনী প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবে তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। কেননা, তখন দেশে দেশে এত ভেদাভেদ বিদ্যমান ছিল না। জীবনযাত্রার মানে পার্থক্য তেমন প্রকট ছিল না যেমনটা এখন দেখা যায়। জ্ঞানের মাত্রার সীমাবদ্ধতা ত অবশ্যই ছিল সেই তুলনায় আজকে আর কোন জিনিস রাখা-ঢাকা নেই। এদিকে আবার প্রতিটি দেশেই ধীরে ধীরে ভোগদ্রব্যাদি উৎপাদনযোগ্য শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। কাজেই মোট আমদানীর তুলনায় ভোগদ্রব্যের আমদানী হ্রাস পেয়ে চলেছিল। যেমন ধরুন নিউজিল্যাণ্ডের কথা। নিউজিল্যাণ্ড ১৮৮০ সালে তার মোট আমদানীর শতকরা ৫৪ ভাগ আমদানী ভোগ দ্রব্য। ১৮৯২ সালে তা নেমে এসে দাঁড়ায় ৩৯ ভাগে। ১৯০৬ সালে আরো হ্রাস পেয়ে ৩২ শতাংশে উপনীত হয়।[২৪]

---

২২. W. Schlote-এর British Overseas Trade, Basil Blackwell, Oxford, 1952, পৃঃ ৪২, ১৩৯-১৪৩-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান তথ্যাদি দেখুন। আরও দেখতে পারেন C. T. Saunders-এর "Consumption of Raw Materials in the United Kingdom, 1851-1950", Journal of the Royal Statistical Society, CXV, Part III. পৃঃ ৩১৩-৩৪৬ (১৯৫২)

২৩. পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ তৃতীয় ভাগে 'প্রদর্শনী প্রভাব' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেয়া হল।

২৪. দেখুন, C.G.F. Simkin-এর The Instability of a Dependent Economy, Oxfort University Press, Oxford, 1951, পৃঃ ৬১, ৬৪

সুতরাং, আমদানী সঙ্কুচিত করার দোনলা বন্দুকটির উভয় নলই ক্রিয়াশীল ছিল বেশ শক্তপোক্তভাবে। একদিকে প্রদর্শনী প্রভাব বেশ দুর্বল ছিল, অন্যদিকে, স্বদেশী উৎপাদন বেড়ে চলেছিল। এই উভয়বিধ কারণে আমদানী সম্প্রসারণ তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কতকগুলো দেশে আভ্যন্তরীণ সাঙ্গীকরণ ঝামেলা প্রকটাকার ধারণ করেছিল। যেমন, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা তাদের মুদ্রায় ব্যাপকহারে মূল্যাবনতি ঘটায়। তার ফলে হয়ত তাদের আমদানী ন্যূন হয়েছিল, অথচ রপ্তানি অধিক হওয়ার উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু, এমন কোন নির্ভরশীল প্রমাণাদি পাওয়া যায় না যে খাতকদেশে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার নিমিত্তে তাদের বাণিজ্য-শর্ত অধঃপাতে নেওয়ার ইচ্ছাকৃত কুঞ্চন-প্রথা তথা দুষ্ট-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

পরিশেষে বৃটেন সম্পর্কে দুটো কথা বলে নেয়া যাক। সে তার লেনদেন ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের ক্রম-প্রসারমাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও সে হোচট্ খেয়ে পড়ে যায়নি। বরং, তাল সামলে রেখে সমানে আগে বেড়ে গিয়েছিল। তার এই অসামান্য স্বার্থকতার হদিস পেতে হলে প্রাগ-প্রথম মহাযুদ্ধে হিসাব-নিষ্কাশন পন্থা খতিয়ে দেখতে হবে। বহুমুখী নিষ্কাশন প্রণালী ব্যাপকতর হয়ে বৃটেনের জন্য অবস্থা সহনীয় করে তুলেছিল। ক্রম-প্রসারমাণ বিশ্ব-অর্থনীতির আঙ্গিনা ভারসাম্য বজায় রাখায় অধিকতর সহায়ক ছিল। সঙ্কোচনধর্মী, কি স্থবির বিশ্ব-অর্থনীতি তেমনটা করতে পারত না। বিশ্ব-অর্থনীতির বিস্তৃত প্রেক্ষাপুট বৃটেনকে তার প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম করে তুলেছিল। কাজেই, তার আপেক্ষিক প্রাধান্যে একটু নড়চড়, হলেও বড় একটা আসে-যায়নি। কেননা, সে অবস্থা বুঝে ছাতা গুটিয়ে চলার মত সুযোগ পেয়েছিল। ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার মত বাণিজ্যের গঠনগত আঙ্গিক বদলিয়ে নেয়ার সুবিধা পেয়েছিল।

জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান শিল্প অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেলেও কিন্তু এইসব দেশে বৃটেনের রপ্তানি কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছিল।[২৫] এইটা ঘটেছিল এই কারণে যে অধিক হারে তৈরীকৃত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানি হচ্ছিল এবং সার্বিক বাণিজ্যে অদৃশ্যমান আইটেমগুলো অধিক গুরুত্ব লাভ করে চলেছিল। তবে একথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

২৫. দেখুন, যথা Schlote-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৮৪।

জার্মানীতে বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের মোট আমদানী বেড়ে গেলেও আনুপাতিক হিসাবে তা হ্রাস পেয়েছিল। সাকুল্য রপ্তানির অনুপাত হিসাবে তৈরীকৃত দ্রব্যাদির পরিমাণ নেমে এসেছিল। অবশ্য এই পড়তি পুষিয়ে গিয়েছিল কাঁচামালের (প্রধানতঃ কয়লা, পশম ও ধাতু) রপ্তানি বেড়ে গিয়ে। এদিকে বৃটেনের 'অদৃশ্যমান' রপ্তানি বেড়ে চলেছিল একাধারে। দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি সঙ্কুচিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু, জাহাজ ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদি খাতে বৃটেনের রপ্তানি সম্প্রসারিত হচ্ছিল।

সুতবাং, উন্নয়ন-অগ্রগতির 'রাজস্ব সৃষ্টিকারী' প্রভাব বৃটেনের লেন-দেন ভারসাম্য বজার-রাখায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল, এছাড়াও আরো দুইটি বিষয় বৃটেনের অনুকূলে ছিল। এগুলো হচ্ছে: তার বাণিজ্য-শর্তে উন্নতি এবং বহুমুখী বাণিজ্য-প্রথা চালু হওয়া। বৃটেনকে আর আগের মত অতটা ত্যাগ করে সমপরিমাণ আমদানী পেতে হত না। বিশেষ করে ১৮৮০ দশক ও ১৯৯০ দশকে বৃটেন এই খাতে বিশেষ লাভবান হয়েছিল। ফলে, প্রতিযোগিতার অনেকটা অসুবিধা সে এই দিয়ে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এদিকে, বহুমুখী বাণিজ্য-প্রথা প্রবর্তিত হয়ে বৃটেনের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে এনেছিল। বিশ্ব-ব্যাপী নমনীয় নিষ্কাশন প্রণালী চালু হওয়ার ফলে বৃটেন অতি সহজে তার লেন-দেনে সাঙ্গীকরণ ঘটিযে নিতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিমুখী পন্থার ভিত্তিতে এমনটা সম্ভব ছিল না। এমনকি এই পদ্ধতি এলাকাভিত্তিক হলেও অতটা সুযোগ পাওয়া যেত না।[২৬]

অগ্রগতি হারে বিভিন্নতা বৈদেশিক বাণিজ্যের আকৃতি-প্রকৃতিতে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নেয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় করে তুলে। বৃটেনকে এই দুর্গতি পোহাতে হয়েছে বৈকি! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত ৪।৫ দশককালে বৃটেন শিল্পপ্রধান দেশসমূহে তার রপ্তানি তেমন বাড়াতে পারেনি। তার রপ্তানির অধিকাংশটাই তখন যেত প্রাথমিক সামগ্রী উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে। ১৮৭৭-১৮৭৯ সময়কালে সেখানে বৃটেনের মোট রপ্তানির শতকরা ৪৮ ভাগ শিল্প-প্রধান দেশসমূহে যেত, সেখানে ১৯০৯-১৯১৩ পর্যায়ে তা ৩৮ শতাংশের উর্ধ্বে ছিল না। কৃষিপ্রধান দেশসমূহে এই পরিমাণ ছিল ১৮৭৭-১৮৭৯ সালে শতকরা

২৬. প্রাগ ১৯১৪ সময়কার বিশ্ব-বাণিজ্য-চিত্র নিষ্কাশনের বিস্তৃত জানতে হলে দেখুন S. B. Saul-এর "Britain and World Trade, 1870-1914". Economic History Review, VII, No. I, 49-66 (Aug, 1954)

৫৫ ভাগ, তা বেড়ে বেড়ে ১৯০৯-১৯১৩ সময়কালে ৬২ ভাগে উন্নীত হয়।[২৭] জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা করার অধিক ক্ষমতা শিল্প-প্রধান দেশসমূহে বৃটেনের রপ্তানি সীমিত করে দিয়েছিল। কিন্তু, প্রাগ-১৯১৪ সালের অর্ধ শতাব্দীতে বহুমুখী ব্যবস্থা চালু হয়ে তাদের এই ক্ষমতা অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছিল। ত্রিমুখী বাণিজ্য-স্রোত বৃটেনকে সুবিধা করে দিয়েছিল। বৃটেন থেকে আনীত রপ্তানি বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের ক্রমবর্ধমান আয়ও কম দায়ী নয়। এই সমস্ত অঞ্চল তদ্দিনে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সামগ্রী জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করতে শুরু করে দিয়েছে। বৃটেনকে বাদ দিয়ে শিল্প-প্রধান প্রায় বাকী সবগুলো দেশ প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর সাথে আমদানী উদ্বৃত্ত নিয়ে চলেছিল। তাদের এই আমদানী উদ্বৃত্ত মেটানো হত বৃটেনের সাথে রপ্তানি উদ্বৃত্ত দিয়ে। বৃটেনের কিন্তু, রপ্তানি উদ্বৃত্ত ছিল অনুন্নত দেশগুলোর সাথে। ১৯০০ সাল নাগাদ বৃটেন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে তার রপ্তানি উদ্বৃত্ত বিস্তৃত করায় উঠে-পড়ে লাগে। ইউরোপ, আমেরিকা, আর্জেন্টিনা ও ক্যানাডায় তার যে আমদানী-উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তার শোধবোধ ঘটিয়ে নেয়ার জন্য সে তখন হন্যে হয়ে ছুটে আফ্রিকা ও এশিয়ার নব আবিষ্কৃত দেশগুলোর পানে। তার বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলকেন্দ্রে বসেছিল ভারত। ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত থেকে যে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত পায় কেবল তা দিয়েই সে তার ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়।[২৮]

ত্রিমুখী বাণিজ্য-ধারা উন্নয়ন-প্রক্রিয়া ও মূলধন-স্থানান্তরে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদিকে পুঁজি বহির্সরণ ঘটছিল, অন্যদিকে বিদেশে নিয়োজিত লগ্নীপ্রসূত লাভের-ভাগ ফিরে আসছিল। এই উভয়ে হয়ত কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, তা বাণিজ্য-পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে নয়। সাধারণতঃ বৃটেন থেকে পুঁজি বহির্গমন ঘটছিল দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে। কিন্তু, সুদ ও লভ্যাংশ ফিরে আসছিল বহুমুখী

২৭. দেখুন Schlote-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৮২।

২৮. Saul-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৬৪।

বাণিজ্যের ভিত্তিতে। এটা ঘটছিল প্রধান প্রধান অধমর্ণ দেশগুলোর বহির্ভূত দেশগুলোর আমদানী উদ্বৃত্ত মাধ্যমে।[২৯]

১৮৮০ দশক নাগাদ জার্মানী বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠে। একটি স্বতন্ত্র স্বতা লাভে সক্ষম হয়। বৃটেনের সাথে তার লেন-দেন একটা পৃথক কাঠামোর রূপ নেয়। শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ফলে তার কাঁচামালের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। তজ্জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় ইউরোপ বাদে অন্যান্য মহাদেশসমূহে। আর এই আমদানীর ব্যয় পোষাতে হয় বৃটেনের সাথে তার রপ্তানি উদ্বৃত্ত দিয়ে। ১৮৯০ দশকের শেষপাদ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরীকৃত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে বসে। সে নীট রপ্তানিকারক হয়ে দাঁড়ায় এবং কাঁচামাল সামগ্রীর নীট আমদানীকারক হয়ে উঠে। এই সময় "নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত নব অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো" মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গা ঝাড়া দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে কন্টিনেন্টাল ইউরোপ। মাঝখানে এসে দাঁড়ায় তৃতীয় এই দলটি। এই তিন গ্রুপের সমন্বয়ে নিষ্পন্ন হয় বহুমুখী বাণিজ্য-ধারা। তৃতীয় এই অঞ্চল বিশেষ করে, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ক্যানাডা তড়িৎ গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমদানী উদ্বৃত্ত অর্জন করে নেয়। ইউরোপের সাথে প্রাপ্য রপ্তানি উদ্বৃত্ত দিয়ে এই ঘাটতি পুষিয়ে নেয়। তাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত স্বষ্টি হয় তা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলো যথা—ভারত, বৃটিশ, মালয় প্রভৃতি দেশে অর্জিত আমদানী উদ্বৃত্তের সাথে কাটাকাটি হয়ে যায়।

স্বতরাং, স্বনির্দিষ্ট বহুমুখী নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার ফলে লেন-দেন ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তুলনামূলক ব্যয়বিধির সূত্র ধরে এই ব্যবস্থা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষীকরণে সহায়তা করেছিল। এদিকে তুলনামূলক ব্যয়বিধি চিত্র স্বষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করে সাঙ্গীকরণের পরিবর্তনসূচক সমস্যাবলী দ্রবীভূত করে তুলতে সহায়তা করেছিল। তার ফলে বিনিময়ে স্থিতিশীলতা এসেছিল এবং বিভিন্ন বাজারে বিদ্যমান

২৯. দেখুন, যথা-League of Nations-এর Network of World Trade Geneva, 1942, 82-87 : Folke Hilgerdt-এর "The Case for Multilateral Trade," American Economic Review Papers and Proceedings, XXXIII, No. 1, 397-401 (March, 1943).

ভিন্নতর বিনিময় হারে একতা আনয়ন সহজ করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়— এর ফলে বিদেশী ঋণ পরিশোধের জটগুলোও কিছুটা লাঘব হয়েছিল। দ্বিমুখী আদায়নীতি বিরাজমান হলে যে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হত, ত্রিমুখী প্রথা চালু হওয়ার ফলে এই বেকায়দার সম্মুখীন হতে হয়নি। তার ফলে সমগ্র প্রক্রিয়ায় একটা সংহতি ও সুসমঞ্জস অর্জন সম্ভব হয়েছিল। শিল্প-প্রধান দেশগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে তাদের কাঁচামাল চাহিদাও বেড়ে চলেছিল সেই হারে। অনগ্রসর প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশগুলো ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মিটিয়েছিল। কিন্তু, বৃটিশ ঋণ না পেলে তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। কিন্তু, বহুমুখী নিষ্কাশন-প্রথা চালু না হলে বৃটেনের পাওনা সুদ লভ্যাংশ পরিশোধ অত সহজে সম্ভব হত না। স্বাভাবিক কারণে তা হয়ে দাঁড়াত সীমিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটেনে উন্নতি-অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছিল প্রাসংগিক ঘটনাবলীর মধু-সংযোগে আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুকূল প্রবাহস্রোত সমন্বয়িত হয়ে বহুমুখী-চক্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুষ্ঠু শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব করে দিয়েছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উন্নয়ন-অগ্রগতির ব্যাপক প্রসার

বৃটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর বহু দেশ শিল্প-উন্নয়ন পথে অগ্রসর হয়। বিশ্ব-অর্থনীতির রূপ-কাঠামো পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চিত্রও নূতন আকার গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এসে বিশ্ব-অর্থনীতি খোল-নলচে বদলে ফেলে। উনবিংশ শতাব্দীর রূপ-কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে যায়। বৃটেনের স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য করায়ত্ত করে নেয়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক আঙ্গিক কাঠামো ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সময়ে এসে নূতন প্রয়াস জন্ম নেয়। প্রতিষ্ঠানিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনার উদ্যম দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশে স্থিরতা আনয়নে সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা চালানো হয়। দরিদ্র দেশগুলো সজাগ হয়ে উঠে। সুপ্ত মগ্ন অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। স্বতঃপ্রবৃত্ত পথে উন্নয়ন হাসিলে অগ্রসর হয়। ধনী দেশগুলো নিজেদের অর্জিত উন্নয়ন পর্যায় বজায় রাখায় সচেতন হয়ে উঠে ও সবল প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে-উন্নয়ন–অগ্রগতির এই ব্যাপক-প্রসার খতিয়ে দেখা হবে।

১. অগ্রগতি-হারে ভিন্নতা

উন্নয়ন-অগ্রগতির ব্যাপক প্রসারের পূর্ণ চিত্র ধরা সম্ভব নয়। গত শতাব্দীতে বিশ্ব-অর্থনীতিতে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। সম্প্রসারণের এই রূপ-কাঠামো দুটো সাধারণ কথা দিয়ে বোঝাবার জো নেই। বিচিত্র সব দেশ। অপরিমেয় তাদের রূপ-বৈচিত্র্য। অসম তাদের অগ্রগতি। উন্নয়ন-পর্যায় তাদের ভিন্নতর। জগাখিচুড়ি এই পরিবেশ এক সূত্রে করে গ্রথিত করে তোলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, দেশওয়ারী বিশ্লেষণও সম্ভব নয়। কারণ, কাজটা যেমনি জটিল তেমনি দীর্ঘতর। তাছাড়া, দেশভিত্তিক আলোচনা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু হয়ে গিয়েছে।[১]

---

১. দেখুন পরিশিষ্ট—গ।

উন্নয়ন-অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র অঙ্কনে দেশভিত্তিক এই সব বিশ্লেষণ সবিশেষ গুরুত্ববহ। তুলনামূলক এই চিত্র অগ্রগতির সার্বিক চেহারা-সুরত উদ্ভাষিত করে। জটাজালের সুরঙ্গপথে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-আঙ্গিক খুঁজে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ তাদের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন গতিপথ অবলোকন সম্ভব হয়। আদর্শ তথা উন্নয়ন-অগ্রগতির ভিন্নতর 'জীবনীশক্তি' পরিলক্ষ্য করা চলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা হাতিয়ে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে সরকারী-সক্রিয়তার স্বরূপটি উদঘাটিত করা চলে। কৃষি ও শিল্পে অগ্রাধিকারের নক্সা তথা ভিন্নতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নধারাকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তা ধরা পড়ে।

আমাদের প্রয়োজনে অবশ্য অতকিছু দরকার নেই। পৃথিবীটাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করে নিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমে অধিকতর দ্রুতবেগে অগ্রসরমান দেশগুলোকে একদিকে দাঁড় করানো যাক। অতঃপর, অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেগে ধাবমান দেশগুলোকে অপর শ্রেণীভুক্ত করে নেয়া যাক। প্রথম দলটিকে 'প্রগতিশীল অর্থনীতি' বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় দলটি 'অর্ধ-স্থবির অর্থনীতি' হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। প্রথম ভাগে পড়ে আজকের ধনী দেশ-গুলো। এদের অনেকে ১৮৫০ সালে অনুন্নত ছিল। পরে অগ্রগতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে আজ ধনী দেশের সম্মানে ভূষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধাস্থবির দেশগুলো উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে যেই তিমিরে ছিল আজো সেই তিমিরে। বিশ্ব-অগ্রগতি সমস্যার মূল কেন্দ্রে আজ তারা সমাসীন।

প্রগতিশীল দেশগুলোর কথা আলোচনা করা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধি উন্নয়নপথে বৃটেন একচেটিয়া ছিল। সে অবলীলাক্রমে উন্নয়নের সিঁড়িগুলো ডিঙ্গিয়ে চলেছিল। শেষভাগে এসে অন্যান্য কতক দেশও অগ্রগতি-রজ্জু আঁকড়ে ধরে। অগ্রগতি-পথে এগিয়ে চলে। তাদের কতক আবার অচিরে বৃটেনকে ছাড়িয়ে যায়। অনেকে বৃটেনের জুতা জোড়া পায়ে দিয়েই এগিয়ে চলে। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো বৃটেনের ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেই ১৮৭০

দশক অবধি শিল্পায়নপথে এগিয়ে যায়।[২] বৃটেনের যন্ত্রপাতি, তার প্রথা-পদ্ধতি ও চিন্তা ধারা হুবহু নকল করে অগ্রসর হয়। বৃটেন থেকে পাওয়া এই প্রযুক্তিক জ্ঞান তাদের অগ্রগমনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তেমনি বৃটেনের কলাকৌশলী, উদ্যোক্তা, কার্যনির্বাহী ও দক্ষ কারিগর ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্প প্রকৌশলী ও পরিবহন শিল্প উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃটিশ পুঁজি-শিল্প-সংস্থাপনে সহায়ত করে। গুরুত্বের দিক থেকে এই বিষয়টিও কম ছিল না। বাকী সব দেশে, যেমন সুইডেন ও রাশিয়ায় বৃটিশ প্রভাব তেমন সুবিধা করতে পারেনি অথবা তারা তা গ্রহণে উদ্যোগী হয়নি। এই সব দেশে উন্নয়ন অগ্রগতি ঘটেছে অনেকটা স্বচেষ্টায়। শিল্পোন্নত সবগুলো দেশেই কিন্তু, মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিরাজমান ছিল। লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। পুঁজি-সংগঠন তীব্রতা লাভ করেছিল। স্বদেশী বাজার-সীমা ছাড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশী-বাজার সম্প্রসারিত হয়েছিল।

১৮৯০ সালের পরে এসে জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের প্রাধান্যে ব্যাপক আঘাত হানে। শিল্পজগতে তার একাধিপত্য বিনষ্ট করে দেয়ার প্রয়াস পায়। শতাব্দীর ক্রান্তিকালে জাপান মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অচিরে সে নিজকে শিল্প-শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলে। রাশিয়াও বসে নেই। সেও গত কয়েক দশকে নিজকে শক্ত-সামর্থ্য করে তুলে বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্প দেশগুলোর একটা হয়ে উঠেছে। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও নিউজিল্যাণ্ডকেও প্রগতিশীল অর্থনীতির তালিকাভুক্ত করতে হয়। তাদের অগ্রগতি অবশ্য তেমন একটা চমকপ্রদ হারে এগোয়নি। তাছাড়া, তারা শিল্পক্ষেত্রেও অত বেশী জোর দেয়নি।

বিশ্ব অর্থনীতির বিস্তৃত পটে ভিন্ন ভিন্ন দেশ অগ্রগতির পথে ভিন্ন ভিন্ন হারে এগিয়েছে। কেউ একটু জোরে, কেউবা একটু ধীরে। কেউবা আবার মাঝারি গতিতে। অগ্রগতিতে তাদের এই ভিন্নতা

---

২. দেখুন W. O. Henderson-এর Britain and Industrial Europe, 1750-1879, University Press of Liverpool, Liverpool, 1954 ; Henderson রচিত "The Genesis of the Industrial Revolution in France and Germany in the Eighteenth Century." Kyklos, IX, No. 2, 190-207 (1956).

বিশ্ব-প্রেক্ষাপুটে জাতীয় আয়ের পরিবর্তিত চেহারা খতিয়ে দেখে প্রস্ফুটিত করে তুলা যেতে পারে। অবশ্য তার জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খবরাদি প্রয়োজন তা বিদ্যমান নেই। আর যেটুকুবা আছে তাও তেমন বিশ্বাস-যোগ্য নয়। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। হয়ত মোটামুটি একটা ধারণা অবশ্যই তাতে পাওয়া যাবে। এক হিসাবে বলা হয়েছে যে ১৯৩৭ সালে বিশ্বের প্রকৃত আয়ের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তার তুলনায় ১৮৫০ সালে তা ছিল এক-সোয়া পঞ্চমাংশের মত। বিশ্ব-জোড়া অগ্রগতি-প্রক্রিয়ার চিত্র মেলে ধরলে দেখা যায় যে বিশ্বে বিদ্যমান প্রকৃত আয়ের বন্টনেও প্রচুর বিষমতা বিরাজমান ছিল। বিষম এই নক্সায় লক্ষ্য করা যায় যে, ১৮৫০ সালে বিশ্বের মোট আয়ের প্রায় ৪০ ভাগ ছিল দূর-প্রাচ্যের করায়ত্তে। উত্তর আমেরিকার ভাগে ছিল আজকের আফ্রিকার সমান। পশ্চিম ইউরোপ অবশ্য আজকের মত অবস্থায়ই ছিল। নাম-মাত্র কিছুটা হয়ত কম ছিল ২৯ ভাগের মত। পূর্ব ইউরোপের ভাগে ছিল ১৪ ভাগের মত, মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা অবশ্য তথৈবচই ছিল। আজকে যা তার ললাট-লিখন সেকালেও তাই ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা কোন রকমে নিজকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মাত্র। ১৯৩৭ সালে এসে ললাটলিপি প্রচুর বদলিয়েছে। উত্তর আমেরিকার দেশগুলো প্রায় ২৯ শতাংশ করায়ত্ত করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো ভোগ করছে ৪ ভাগের মত। পশ্চিম ইউরোপের দখলে আছে ৩১ ভাগ। পূর্ব ইউরোপ ১১ ভাগ নিয়ে সুখে আছে। দূর-প্রাচ্য মনের আনন্দে ২০ ভাগে নেমে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বাকী সবাই ভোগ করছে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ।[৩]

সারণী ১২.১ প্রগতিশীল দেশগুলোর অগ্রগতির বিস্তৃত চেহারা তুলে ধরছে। তাদের অগ্রগতি-হারে বিভিন্নতার নির্দেশ প্রদান করছে। সারণী ১২.২ ও ১২.৩ শিল্পক্ষেত্রে বৃটেনের প্রাধান্যতা হারিয়ে যাওয়ার হুমকির স্বরূপ প্রদর্শন করছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল অবধি বৃটেন তার প্রাধান্য ঠিকই বজায় রেখে চলেছিল। কিন্তু, তারপর অন্যান্য দেশে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়ে তার এই আধিপত্য বানচাল করে দিতে উদ্যত হয়। শতাব্দীর

৩. দেখুন E. A. G. Robinson-এর "The Changing Structure of the British Economy," Economic Journal, LXIV, No. 255, 447-448 (Sept. 1954).

সারণী ১২.১ "প্রগতিশীল" দেশগুলোতে প্রকৃত জাতীয় উৎপন্নের অগ্রগতির হার, ১৮৮০-১৯৫০

(বর্ষ-প্রতি শতকরা হিসাবে)

		মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ক্যানাডা	অষ্ট্রেলিয়া	নিউ-জিল্যাণ্ড	বৃটিশ যুক্তরাজ্য	ফরাসী	জার্মানী	ন্যাদারল্যাণ্ডস	বেলজিয়াম	সুইজারল্যাণ্ড	সুইডেন	নরওয়ে	ডেনমার্ক
	সাকুল্য প্রকৃত জাতীয় উৎপন্ন													
১.	১৮৬০-১৯১৩*	৪.৩	—	৩.৭	—	২.৪	১.১	৩.০	২.৩	২.২	২.৬	২.০	২.৩	২.৮
২.	১৯১৩-১৯৩৮	২.০	১.৭†	২.১	—	১.০	১.১	১.৩	২.১	১.০	১.৬	১.৯	১.৯	২.১
৩.	১৯৩৮-১৯৫০	৫.৭	৫.৯	২.৬	৩.৩√	১.৬	০.২	২.৩§	১.৮	০.৬	২.১	২.৫	৩.০	২.২
৪.	১৮৬০-১৯৫০	৩.৮	—	৩.২	—	১.৮	১.১	২.৪	২.২	১.৭	২.১	২.০	২.৩	২.৫
৫.	১৯১৩-১৯৫০	৩.০	২.৮	২.৩	—	১.২	০.৯	১.৭	১.৭	০.৯	১.৮	২.১	২.৩	২.১
	মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় উৎপন্ন													
৬.	১৮৬০-১৯১৩	২.৩	—	১.৭	—	১.৫	০.৯	২.০	০.৮	১.৪	১.৪	১.৩	১.৬	১.৮
৭.	১৯১৩-১৯৩৮	০.৯	০.২	০.৪	—	০.৮	০.৯	০.৭	০.৬	০.৬	১.২	১.৪	১.২	০.৮
৮.	১৯৩৮-১৯৫০	৪.২	৪.০	১.১	২.৪	১.২	০.০	০.৭§	০.৬	০.৩	১.১	১.৭	২.১	১.২
৯.	১৮৬০-১৯৫০	২.২	—	১.৩	—	১.২	০.৯	১.৪	০.৭	১.১	১.৩	১.৪	১.৬	১.৪
১০.	১৯১৩-১৯৫০	২.০	১.৪	০.৬	—	০.৯	০.৭	০.৭	০.৬	০.৫	১.২	১.৫	১.৫	০.৯

* ১৮৬০ সাল বাদ দিয়ে প্রথম সময়টা শুরু হয় এই বৎসরগুলো নিয়ে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৬৯।৭৮; অষ্ট্রেলিয়া, ১৮৮৬; বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ১৮৭০; ন্যাদারল্যাণ্ডস, ১৯০০; বেলজিয়াম, ১৮৪৬; সুইজারল্যাণ্ড, ১৮৯০; সুইডেন, ১৮৭০; নরওয়ে ১৮৯১ এবং ডেনমার্ক, ১৮৭০।

† ১৯১৩ এর স্থলে ১৯১১। √ ১৯৩৮।৩৯ থেকে ১৯৪৭।৪৮। § ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত।

উৎস : R. W. Golsmith, "Financial Structure and Economic Growth in Advanced Countries" in Capital Formation and Economic Growth, National Bureau of Economic Research Special Conferences series, Princeton University Press, Princeton, 1955, 115.

শেষপাদে এসে বৃটেন খেই হারিয়ে ফেলে। তার অগ্রগতির-রজ্জু ঢিলে হয়ে যায়। তার পক্ষে আর সেই পুরণো বর্ধন-হার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ফরাসী দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় সে তাল হারিয়ে ফেলে। তার কয়লা উত্তোলন, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন তাদের হারের সাথে তাল রেখে এগুতে সক্ষম হয় না। ১২.২ সারণী লক্ষ্য করুন। ১৮৮১-১৮৮৫ সালে এসে শিল্পজাত

সারণী ১২.২ বিশ্ব শিল্পজাত উৎপাদনের শতকরা হিসাবে দেশওয়ারী বণ্টন, ১৮৭০-১৯৩৮

সময়	বিশ্ব	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বৃটিশ যুক্তরাজ্য	জার্মানী	ফরাসী	রাশিয়া	অন্যান্য
১৮৭০	১০০.০	২৩.৩	৩১.৮	১৩.২	১০.৩	৩.৭	১৭.৭
১৮৮১-১৮৮৫	১০০.০	২৮.৬	২৬.৬	১৩.৯	৮.৬	৩.৪	১৮.৯
১৮৯৬-১৯০০	১০০.০	৩০.১	১৯.৫	১৬.৬	৭.১	৫.০	২১.৭
১৯০৬-১৯১০	১০০.০	৩৫.৩	১৪.৭	১৫.৯	৬.৪	৫.০	২২.৭
১৯১৩	১০০.০	৩৫.৮	১৪.১	১৫.৭	৬.৪	৫.৫	২২.৬
১৯২৬-১৯২৯	১০০.০	৪২.২	৯.৪	১১.৬	৬.৬	৪.৩	২৫.৯
১৯৩৬-১৯৩৮	১০০.০	৩২.২	৯.২	১০.৭	৪.৫	১৮.৫	২৪.৯

সূত্র : League of Nations, Industrialization and Foreign Trade, Geneva, 1945, 13.

সারণী ১২.৩ অর্থনৈতিক নির্দেশক : বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৯৩—১৯১৩

	শতকরা বর্ধন		
	বৃটিশ যুক্তরাজ্য	জার্মানী	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
লোকসংখ্যা	২০	৩২	৪৬
কয়লা উত্তোলন	৭৫	১৫৯	২১০
লৌহদণ্ড	৫০	২৮৭	৩৩৭
অপরিশোধিত ইস্পাত	১৩৬	৫২২	৭১৫
কাঁচামাল রপ্তানি	২৩৮	১৪৩	১৯৬
তৈরী দ্রব্য রপ্তানি	১২১	২৩৯	৫৬৩

উৎস : R. C. K. Ensor, England, 1870-1914, Garendon Press, Oxford, 1936, 503.

উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯০০ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে যায়। ১৯০৮-১৯১০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় ৩৫ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে থাকে। বৃটেনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। তার উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগেরও নিম্নে চলে আসে। এমন কি জার্মানী তাকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯০৬-১৯১০ সাল নাগাদ জার্মানীর উৎপাদন বৃটেন অপেক্ষা অধিক হয়। ১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর শিল্পজাত দ্রব্যের বর্ধন হার বৃটেন অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হয়। যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়কালে রাশিয়া প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করে। যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়ের শেষধাপে এসে বৃটেন বিশ্বের মোট শিল্প দ্রব্যের ১০ ভাগেরও কম উৎপাদন করছিল। অথচ ১৮৭০ সালে সে কিনা উৎপাদন করত প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মত।

প্রগতিশীল দেশগুলোর মধ্যে আজকের পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বাগ্রে। তার শ্রেষ্ঠতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেন সর্বজনবিধিত যে প্রাধান্য দখল করেছিল আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ন-অগ্রগতিতে সে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। কাজেই, তার প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ১৮৭০ দশক থেকে শুরু হয় যুক্ত-রাষ্ট্রের পদযাত্রা। এই যাত্রায় সে কোথায়ও থমকে দাঁড়ায়নি। প্রতি মুহূর্তে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়ে সে আজকের প্রাধান্য করায়ত্ত করে নিয়েছে। ১২.৪ সারণী তার অগ্রগতির একটা সুস্পষ্ট আভাস দেয়। ১৮৬৯-১৮৭৮ দশক ও ১৯৪৪-১৯৫৩ দশকে তার জাতীয় উৎপাদন প্রায় ১৩ গুণের অধিক সম্প্রসারিত হয়। হিসাবটি স্থায়ী দামে প্রদত্ত। এই অগ্রগতির হিসাবে দেখা যায় যে বার্ষিক গড় অগ্রগতির হার ছিল ৩.৫ শতাংশ। এই একই সময়ে লোকসংখ্যা তিনগুণ অপেক্ষা অধিক হয়ে যায়। কাজেই, মাথাপিছু উৎপন্নের ভাগ প্রায় ৪ গুণের মত বেড়ে যায়। তার অর্থ, মাথাপিছু উৎপন্নের বর্ধন ঘটে গড়ে বার্ষিক শতকরা ১.৯ ভাগ।[৪] এই হিসাবটার গুরুত্ব একটু পরিমাণ করা যাক। ১৯৫৩ সালে আমেরিকান সাধারণ পরিবারের আয় ছিল ৫,০০০ ডলারের মত।

---

৪. দেখুন **M. Abramovitz-এর "Resource and output Trends in the United States since 1870", American Economic Review, Papers and Proceedings, XLVI, No. 2, 7 (May, 1956).**

যদি আগামী আট দশক ধরে উন্নয়ন অগ্রগতি উবরোক্ত হারে সম্প্রসারিত হয় তাহলে প্রতিটি পরিবারের আয় হয়ে দাঁড়াবে ১৯৫৩ সালের দরমাত্রার হিসাবে, প্রায় ২৫,000 ডলারের মত। অর্থাৎ কিনা আজকের বিশ্বের সর্বোচচ এক ভাগ পরিবারের আয়ের সমান।[৫]

সারণী ১২.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ ১৮৬৯-১৮৭৮ থেকে ১৯৪৪-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত

		১৯৪৪-১৯৫৩ এর জন্য আপেক্ষিক (১৮৬৯-১৮৭৮=১00)
(১)	নীট জাতীয় উৎপন্ন	১,৩২৫
(২)	লোকসংখ্যা	৩৩৪
(৩)	মাথাপিছু নীট জাতীয় উৎপন্ন	৩৯৭
(৪)	শ্রম-শক্তি	৪২৩
(৫)	লোকসংখ্যার তুলনায় শ্রমের অনুপাত ..	১২৭
(৬)	চাকুরী-বাকুরী ..	৪২৭
(৭)	লোকসংখ্যার হিসাবে চাকুরীর অনুপাত ..	১২৮
(৮)	মূলধন ..	৯৯৩
(৯)	মাথাপিছু মূলধন ..	২৯৭
(১০)	মোট উৎপাদক-সম্পদের অনুক্রমণী সংখ্যা ..	৩৮১
(১১)	উৎপাদকের মাথাপিছু সূচক ..	১১৪
(১২)	কর্মে নিরত শ্রমিক পিছু নীট জাতীয় উৎপন্ন ..	৩১০
(১৩)	মানুষ-ঘন্টা প্রতি নীট জাতীয় উৎপন্ন ..	৪২৬
(১৪)	মূলধনের ইউনিট প্রতি নীট জাতীয় উৎপন্ন ..	১৩৪
(১৫)	মোট উৎপাদকের ইউনিট পিছু নীট জাতীয় উৎপন্নের অনুক্রমণী সংখ্যা ..	৩৪৮

সূত্র : M. Abramovitz "Resource and output Trends in the United States since 1870", American Economic Review, Papers and Proceedings, XLVI, No. 2, 8, (May, 1961).

---

৫. দেখুন S. Fabricant-এর Economic Progress and Economic change, National Bureau of Economic Research, New York, 1954, 5.

উন্নয়ন-অগ্রগতির এই চমকপ্রদ সম্প্রসারণের জন্য উপকরণ সরবরাহের অবদান যথেষ্ট। উপাদান সরবরাহ বিশেষ করে মূলধন সংগঠন বেগবান হয়ে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে তেজীভাব এনে দেয়। শতকরা হিসাবে মূলধন-গঠনের মাত্রা হ্রাস পেলেও মোট লগ্নীর পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। নীট জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে মূলধন সঞ্চিত হচ্ছিল ১৮৮০ দশক ও ১৮৯০ দশকে যথাক্রমে ১৪ ভাগ ও ১৬ ভাগ। এই হার হ্রাস পেয়ে ১৯২০ দশকে ১১ ভাগে এসে দাঁড়ায়।[৬] কিন্তু, লগ্নীর মোট পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। ১৮৭০ দশক ও ১৯২০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ে মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ গড়ে ৫ শতাংশ হারে বর্ধিত হয়। ১৯৩০ দশকের সেই মহা সঙ্কটকালে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য এই বর্ধন বাধাপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধোত্তরকালে আবার মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। কিন্তু, পূর্ববর্তী ১৫ বৎসরে যে ঘাটতি তা পুষিয়ে উঠা দুষ্কর বৈকি। তাই দেখতে পাই যে ১৯৫২ সালে মাথাপিছু পুঁজির পরিমাণ প্রাগ সঙ্কটকালে অপেক্ষা তেমন একটা উর্ধ্বে নয়।[৭]

অন্য আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত। কার্য-সময় হ্রাস পায়। অথচ প্রচুর পরিমাণে লোক শ্রম-জগতে হাজির হয়। দিন দিন এই অনুপাত বেড়ে যায়। এই দুয়ে কাটাকাটি হয়ে ফল যা দাঁড়ায় তাতে ১৮৭০ ও ১৯০০ দশক পর্যায়কালে মোট লোক সংখ্যার মাথাপিছু বার্ষিক কার্যঘন্টা শতকরা মাত্র ১০ ভাগের মত বর্ধিত হয়। পরবর্তী চার দশকে এই বর্ধনটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়। কাজেই, গত আট দশকে শ্রম পরিমাণে তেমন একটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে লোক সংখ্যার তুলনায় মোট উৎপাদক, তথা শ্রমও পুঁজির মোট পরিমাণ তেমন একটা বাড়েনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে এই পরিমাণ বরং কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। হিসাব কষে দেখা যায় যে এই আট দশকে উৎপাদনে নিয়োজিত মাথাপিছু উপকরণ এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-ষষ্টাংশের ন্যায় বর্ধিত হয়েছে। অথচ মাথাপিছু জাতীয় আয় কিন্তু চতুর্গুণ হয়ে গিয়েছে। কাজেই, আয়ের এই বর্ধন উৎপাদিকা-

---

৬. দেখুন, S. Kuznets-এর National Income : A Summary of Findings, National Bureau of Economic Research, New York, 1946, 32.

৭. Fabricant-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৭

শক্তিতে বর্ধন-প্রসূত বললে ভুল হবে না।[৮] সমপরিমাণ পুঁজি ও শ্রম পূর্বাপেক্ষা অধিক ফলাতে সক্ষম হয়। বস্তুত ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ দশকের অন্তবর্তী সময়ে ঘণ্টা হিসাবে জনপ্রতি উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়।[৯] অন্যদিকে, উৎপাদকের ইউনিটপ্রতি ফলন বার্ষিক গড়ে ১·৭ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়।

উৎপাদিকা-শক্তির এই আশাব্যঞ্জক সম্প্রসারণ সম্ভব হয় প্রযুক্তিক ও প্রতিষ্ঠানিক অগ্রগমনের ফলে।[১০] প্রকৌশলী-জ্ঞান দ্রুতহারে সম্প্রসারিত হয়। প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্ত খুঁটিতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এদিকে, বাণিজ্য জগতে অনুসন্ধান, অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা তীব্রতর হয়ে উঠে। গবেষণা কাজে সরকারও সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সর্বত্র একটা 'বৈজ্ঞানিক চেতনা' জন্ম নেয়। শিল্পজগতে তা ক্ষুরধার হয়ে উঠে। গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা ও শিল্প খাতে প্রচুর লগ্নী সাধিত হয়। ফলিত জ্ঞানের আলোতে শিল্পজগতে ঢালাই করে নেয়ার প্রবণতা জোরদার হয়। তাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন অধিকতর নিপুণতার সাথে নিষ্পন্ন হয়। অর্থনীতির মূল শাখাগুলো খতিয়ে দেখলেও উৎপাদিকা-শক্তির সম্প্রসারণের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। প্রধান প্রধান শাখাসমূহের মাথাপিছু ফলন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উৎপাদিকা-শক্তির সার্বিক রূপটি ক্রম-গতিতে ঊর্ধ্বপানে এগিয়ে গিয়েছে। ধারা-পর্ব অনুসরণ করে সঙ্কেত পাওয়া যায় যে কৃষি, শিল্প, খনিজ, পরিবহন ও যানবাহন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে 'উৎপাদিকা-শক্তির ইতিহাস' ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিরই ইতিহাস।

শ্রম-শক্তির চলতি-পথ এইরূপ: আস্তে আস্তে কৃষিক্ষেত্র থেকে শ্রম উঠে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাজাত কর্মক্ষেত্রে ভিড় লাগিয়েছে। অবশ্যই ইহা আপেক্ষিক অর্থে। ধরুন, ১৯০০ সালে প্রধান প্রধান শিল্পগুলোতে মাথা-পিছু আয় যা ছিল তা যদি সারাটা সময় অপরিবর্তিত থেকে ১৯৩০ সালেও তাই হত তাহলে কেবল শ্রম-শক্তির বিচরণ হেতু মাথাপিছু

---

৮. বিদেশী লগ্নী-উৎসারিত আয় নামমাত্র ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও তেমন বড় একটি ছিল না। কাজেই, বাণিজ্য-শর্তে পরিবর্তন তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারেনি।

৯. F. C. Mill-এর Productivity and Economic Progress, National Bureau of Economic Research, New York, 1952, 2.

১০. দেখুন. যথা-W. Fellner-এর Trends and Cycles in Economic Activity, Henry Holt & Co., New York, 1956, 62, 66-67.

আয় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেড়ে যেত।[১১] সুতরাং, শ্রম-কাঠামোর রূপান্তর হেতু মাথাপিছু আয়ে বেশ কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। তবে উৎপাদিকা-শক্তির বর্ধনহেতু যে বৃদ্ধি ঘটে তবে তুলনায় তা তেমন বড় কিছু নয়। আমেরিকান উন্নয়ন-অগ্রগতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদিকা-শক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি।

অগ্রগতির চিত্র-বিচিত্র নক্সা রূপ পরিগ্রহ করে আঙ্গিকগত উন্নতির ছাচ্ অনুযায়ী। আকার-প্রকারের দিক থেকে তা মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ডের মতই ছিল। প্রযুক্তিক অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন চিত্র বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। হ্যাঁ, তবে অসম্পৃক্ত ও অসংলগ্ন কিছু কিছু উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও উদ্দীপনা নিরন্তর প্রবাহী ধারায় এগিয়েছিল। কিন্তু, সে যাই হউক, বড় বড় শিল্পগুলোতে উদ্যোগ-উদ্দীপনা তথা উদ্ভাবন-আবিষ্কার বিষম পথেই এগিয়ে যায়। ১৮৭০-১৮৮২ সময়কালে বাষ্পীয় শক্তি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। শিল্প ও পরিবহন জগতে তার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ইঞ্জিন সংযোজিত হয়ে পশ্চিম দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। ফলে অসীম সম্পদ করায়ত্ত হয়ে উঠে। ১৮৯৪-১৯০৭ পর্যায়কালে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। বাষ্পীয়-শক্তি সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। ইস্পাত শিল্পক্ষেত্রে পথ করে নেয়। নব নব সম্পদ-সামগ্রী আবিষ্কৃত হয় ও বাস্তবক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে থাকে। এই সব একত্রিত হয়ে অগ্রগতি-ধারায় উস্কানি প্রভাব সৃষ্টি করে ও তা দ্রুতবেগে ধাবমান করায় বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। ১৯২০ দশকে অগ্রগতির আরেক ঢল নামে। বিদ্যুৎ-শক্তি তাতে জোয়ার এনে দেয়। অন্তর্দহন ইঞ্জিন তাতে জলোচ্ছ্বাস-প্রভাব জন্ম দেয়। শিল্প-রসায়ন প্রচুর রস ঢেলে উন্নয়ন-পথ পিচ্ছিল করে দেয়। মধ্যবর্তী সময়কালে অগ্রগতি হার তেমন তীব্রতর হয়নি বটে। তবে এগুলো প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে প্রচুর অবদান রেখে যায়। কিছুকাল প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে যেন কতককাল আস্তে-ধীরে জিরিয়ে নিয়ে নব সঞ্জীবনী শক্তি অর্জন করে আবার নূতন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করে অগ্রগতি রূপ নৌকাটিকে ঝটিকাসঙ্কুল পথ কাটিয়ে শান্ত জলের সমাহিত অথচ তীব্রতর ঢলে এনে ছেড়ে দেয়।

---

১১. দেখুন **B. Weber ও S. J. Handfield-Jones-এর "Variation in the Rate of Economic Growth in the U.S.A. 1869-1939", Oxford Economic Papers, VI, No. 2, 104 (June, 1954).**

আমেরিকান উন্নয়ন-অগ্রগতির ইতিহাস মানে উদ্ভাবন-আবিষ্কারের ইতিহাস, পুঁজি-সংগঠনের কাহিনী ও ক্রম-প্রসারমান উৎপাদিকা-শক্তির কেচ্ছা। এই তিনের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আমেরিকান অগ্রগমনের প্রতিচ্ছায়া প্রস্ফুটিত করে তোলা যায়। মনে রাখা দরকার যে, এরা বিচ্ছিন্নভাবে আপন আপন পথে অগ্রসর হয়ে অগ্রগতি এনে দেয়নি, বরং, সুসমঞ্জস সমন্বয়িত রূপ পরিগ্রহ করে চলিষ্ণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধন করে। সাধারণভাবে এই সমন্বয়িত রূপকে আয়বর্ধক ও বিনিয়োগবর্ধক শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা যায়। উদ্ভূত এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পূর্বাঞ্চল ও নব অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলে যোগসাজসে সক্রিয় থাকে। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাঞ্চল বিস্তৃত ও ক্রমাগত অধিক হারে জনগণ তথায় বসতি স্থাপন শুরু করে। তাতে বিনিয়োগ-সুবিধা বাড়ে। কৃষিকাজ জোরদার হয়। আয় বাড়ে। চাহিদা মাত্রা বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়। তৈরীকৃত দ্রব্য বাজার করে নেয়। পূর্বাঞ্চল তার শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণ করতে থাকে। ফলে তার শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।[১২]

সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। প্রগতিশীল এলাকার অন্যান্য দেশও কম-বেশী উন্নতি-অগ্রগতি হাসিল করে। কিন্তু, বিশ্ব-গোলকের তথা বিশ্ব-অর্থনীতির প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলো উন্নতি-অগ্রগতির মুখ বড় একটি দেখেনি। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো বন্ধ্যাত্বের পর্যায়ে আটকে রয়েছিল বললে মোটেও অত্যুক্তি করা হয় না। উৎপাদন-প্রথা-পদ্ধতি সেই মান্ধাতার আমলেরই রয়ে যায়। অর্থনীতির গঠন-গত আঙ্গিক পূর্বরূপে সমাসীন থাকে। জীবনযাত্রার মান ন্যূনতম পর্যায়ের ধারেকাছে বিরাজমান থাকে। যুক্তিতর্কের বেড়াজাল সৃষ্টি করে যে যতই চিৎকার করুক না কেন যে এইসব অর্থনীতি ক্লাসিক্যাল সে 'বন্ধ্যাত্ব-পর্যায়ে' মোটেই নয়। তবু আসল কথা ঢাকা দেয়ার উপায় নেই। হয়ত ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারার সেই আটঘাট বাধা 'স্থবির পর্যায়ে' নয়। কিন্তু, তার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এই সব অর্থনীতিতে অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় এবং সেই পরিপেক্ষিতে বন্ধ্যা না বললেও অবশ্যই 'আধা-বন্ধ্যা' বলতে হয়।

---

১২. এই প্রক্রিয়ার পুরা চিত্রের জন্য দেখুন J. S. Duesenberry-এর "Some Aspects of the Theory of Development", Explorations in Entrepreneminal History, III, No. 2, Dec, 15, 1950, 96-102.

অনুন্নত এই সব এলাকার লোক প্রধানতঃ আহার-বাসস্থানের সংস্থান করেই সন্তুষ্ট ছিল। নিজেদের যা প্রয়োজন তা ফুরিয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত মনে দিন গুজরান করে দিত। উৎপাদন ছিল নামমাত্র। খাওয়া-পরা পুষিয়ে তেমন একটা আর থাকত না। কাজেই, পুঁজি-সংগঠন বলে তেমন কিছু হত না। ১৮৫০ সাল নাগাদ এইসব কোন দেশই উন্নতি পথে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এমনকি এশিয়া-আফ্রিকার বহুদেশ তখনো বিশ্ব-বাজার-স্রোতে নিজকে মিলিয়ে নিতে পারেনি।

গ্রীষ্মমণ্ডলীর দেশগুলো বিদেশী ঋণ তেমন পায়নি। বৃটিশ রপ্তানিও এই সকল দেশে তেমন বড় একটা সুবিধা করতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ বিলাতি ঋণ গিয়েছিল ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া ও 'নব আবিষ্কৃত' অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল-গুলোতে। গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলো বড় একটা ভাগ পায়নি। উপরোক্ত দেশগুলোতে যে মূলধন গিয়েছিল তা বিদ্যমান অগ্রগতির টানে পড়ে নয়। বরং ভবিষ্যৎ রপ্তানি বাজার উন্মুক্ত করার মোহে। কি বিদেশী লগ্নী বা উদ্যোগ অথবা পরিচালন ব্যবস্থা এইসব দেশে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এই প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল কেবল রপ্তানি ক্ষেত্রে, অন্যত্র নয়। রপ্তানি শিল্পের সম্প্রসারণ, তথায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, সুষম সম্পদ-বন্টন ইত্যাদি সব কিছু প্রবর্তিত হয়। ফলে কালে রপ্তানিযোগ্য প্রাথমিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যাপকহারে বেড়ে যায়।

কিন্তু, পেট ফাঁপা রোগীর মত অনুন্নত দেশগুলোর রপ্তানি শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও তার প্রভাব অর্থনীতির অন্যত্র বিধৃত হতে পারেনি। ফলে, বহুদেশ সেকালে যেমন ছিল আজও সেই তিমিরে। অন্যদিকে, সেদিনের বহু দরিদ্রদেশ প্রগতির সবুজ তকমা ললাটে ধারণ করে আজ উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে সমাসীন। অর্ধ-স্থবির অর্থনীতিগুলোর সীমাবদ্ধ সম্প্রসারণের কারণসমূহ তৃতীয় ভাগে তালিকাবদ্ধ করা হবে।

প্রগতিশীল ও অর্ধ-স্থবির দেশগুলোর তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত করার মত প্রচুর তথ্যাদি বিরাজমান রয়েছে। তাদের মধ্যকার ফাঁক নির্দেশ করার জন্য প্রচুর সূচক-সঙ্কেত তুলে ধরা যেতে পারে। ১২.৫ সারণী মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে এই উভয়বিধ দেশের চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে। অনুন্নত দেশগুলো তালিকার সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত। এই হিসাব-নিকাশে প্রচুর ভুল-ত্রুটি রয়েছে সত্য। হয়ত নির্ভরতার দিক থেকেও

পরিসাংখ্যিক তথ্যগুলো তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু তবু একটা কথা, পরিষ্কার যে ধনী-দরিদ্র এই দুই দেশের মধ্যে যে চরম ব্যবধান বিরাজমান তা যেমন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মানে উৎকৃষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান।[১৩]

সারণী ১২.৫ মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশসমূহের শ্রেণী-বিভাগ, ১৯৪৯ সাল

(১৯৪৯ সালের মার্কিন ডলারের ক্রয়-ক্ষমতা অনুসারে)

মাথাপিছু আয় (ডলার)	দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার)	দেশ
১৪৪০	আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র	২০০–৩০০	অষ্ট্রিয়া
			কিউবা
			হাঙ্গেরী
			ইতালী
৬০০–৯০০	অষ্ট্রেলিয়া		পোর্যেটোরিকো
	ক্যানাডা		দক্ষিণ আফ্রিকা
	ডেনমার্ক	১০০–২০০	ব্রাজিল
	নিউজিল্যাণ্ড		বুলগেরিয়া
	সুইডেন		চিলি
	সুইজারল্যাণ্ড		কলাম্বিয়া
	বৃটিশ যুক্তরাজ্য		মিশর
			গ্রীস
			জাপান
			মেক্সিকো
			পেরু
৪৫০–৫০০	বেলজিয়াম		দক্ষিণ রোডেশিয়া
	ফ্রান্স		স্পেন
	আইস্‌ল্যাণ্ড		সিরিয়া

১৩. ১২.৫ সারণীর উৎসে প্রদত্ত জাতিপুঞ্জের পুস্তিকাটিতে দুর্বলতাগুলো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

	লুক্সেমবার্গ		তুরস্ক
	ন্যাদারল্যাণ্ডস		যুগোশ্লাভিয়া
	নরওয়ে	নিম্ন ১০০	বার্মা
	ভেনেজুয়েলা		সিংহল
			চীন
৩০০–৪৫০	আর্জেন্টিনা		ডমিনিকান রিপাবলিক
	চেকোশ্লোভাকিয়া		ইকুয়েডর
	ফিনল্যাণ্ড		ভারত
	পশ্চিম জার্মানী		ইন্দোনেশিয়া
	আয়ারল্যাণ্ড		ইরান
	ইসরাইল		কেনিয়া
	পোল্যাণ্ড		মালয়
	উরুগুয়ে		উত্তর রোডেশিয়া
	রাশিয়া		পাকিস্তান
			প্যারাগুয়ে
			ফিলিপাইনস্
			থাইল্যাণ্ড

উৎস : United Nations, Economic and Social Council "Volume and Distribution of National Income in Under-Developed Countries", June 28, 1951, E/2041 Tables, 1, 2.

আরো সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে। ১২·৬ সারণী লক্ষ্য করুন। এই নক্সায় একদিকে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও মালয় এবং অন্যদিকে বিলাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি ও শক্তি এবং শিল্পক্ষেত্রের তুলনামূলক চিত্র উদ্ভাসিত করা হয়েছে।

সারণী ১২'৬ ১৯৪৯ সালের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির পর্যায়-মাত্রা : তুলনামূলক নির্দেশক

	হাজার প্রতি লোকের হিসাবে ইউনিট	ভারত	পাকিস্তান	সিংহল	মালয়	বিলাত	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১,০০০ কিঃ ঘন্টা	১৩	১'৯	৯'৬	১১৭	১,০৩৩	২.২৯৬
কয়লা-ব্যবহার	টন	৮০	১৮	২৮	৮৫	৩,৮৮৪	৩,৪৭৩
পেট্রোলিয়াম-ব্যবহার	টন	৭'৮	১১	২৩	৯৯	৩২৭	১,৬৩৮
ইস্পাত-ব্যবহার	টন	৩'৮	১'৩	৬	১৬	১৭৪	৩৬৪
সিমেন্ট-ব্যবহার	টন	৭'২	৩'৬	১৯	২৫	১৪৮	২২৯
রেল-ইঞ্জিন	নম্বর*	২২	১৬	৩২	৩১	৪১০	৩০৯
রেল-ভাড়া	১,০০০ টন মাইল	৬৫	—	—	৩২	৪৪৬	৪,৫৬৮
মালবাহী গাড়ী	নম্বর	০'১৮	০'১৭	১'৪১	৩	১৬	৪৩
সর্ব-সময় ব্যবহারযোগ্য রাস্তা	মাইল	০'৩২	০'৯	০'৮৭	০'৯৩	৩'৭	২'২
টেলিফোন	নম্বর	০'৩৭	০'২১	২'২	৭'৭	৯৮	২৬১

* মিলিয়ন প্রতি লোকসংখ্যায়।

উৎস : Report by the Commonwealth Consultative Committee, The Colombo Plan, H.M. S.O., London, Cmd. 8080, Nov. 1950, 10.

এবারে শেষ একটা চিত্র দেয়া যাক। চিত্রটি বেশ ব্যাপক। অর্থাৎ অনেক কিছু মিলিয়ে তুলনামূলক নক্সাটি খাড়া করা হয়েছে। ১২'৭ এই সারণীতে ১৯৩৪-১৯৩৮ পর্যায়কালের জাতীয় ভোগমাত্রার রূপটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিচিত্র ধরনের বহু পরিসাংখ্যিক সারি (Series) একত্রিত করে তবে তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে।

সারণী ১২.৭ ৩১টি দেশের আপেক্ষিক ভোগ-মাত্রার মুদ্রা-বহির্ভূত নির্দেশক, প্রতিনিধি-স্থানীয় সময়কাল ১৯৩৪-১৯৩৮

দেশ		সম্পূর্ণ (Absolute) মুদ্রা-বহির্ভূত উপাত্ত	আপেক্ষিক উপাত্ত নির্দেশক (আমেরিকা = ১০০)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	....	১৭০৭	১০০.০
ক্যানাডা	....	১৩৭৫	৮০.৬
অষ্ট্রেলিয়া	....	১৩৬৫	৮০.০
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	....	১২৯০	৭৫.৬
জার্মানী	....	১০৫৮	৬২.০
ফরাসী	....	৯৮৪	৫৭.৬
আর্জেন্টিনা	....	৯১৬	৫৩.৭
চেকোশ্লোভাকিয়া	....	৮০৩	৪৭.০
কিউবা	....	৭০৮	৪১.৫
জাপান	....	৬৮৫	৪০.১
ইতালী	....	৬৭৬	৩৯.৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	....	৬৬০	৩৮.৭
স্পেন	....	৬২৮	৩৬.৮
ইউ. এস. এস. আর.	....	৫৭৩	৩৩.৬
ব্রাজিল	....	৫৪০	৩১.৬
মেক্সিকো	....	৪৯৫	২৯.০
পোল্যাণ্ড	....	৪৯২	২৮.৮
যুগোশ্লাভিয়া	....	৪৬৮	২৭.৪
ফিলিপাইনস	....	৪৩৯	২৫.৭
রুমানিয়া	....	৪৩৪	২৫.৪
তুরস্ক	....	৪১৩	২৪.২
মিশর	....	৩৭৮	২২.২
থাইল্যাণ্ড	....	৩৬৫	২১.৪
ভারত	....	৩৫৫	২০.৮

কোরিয়া	....	৩৩১	১৯.৪
পারস্য	....	৩১০	১৮.২
চীন	....	৩০৭	১৮.০
নাইজিরিয়া	....	৩০৬	১৭.৯
ফরাসী-ইন্দো-চীন	....	৩০২	১৭.৭
ন্যাদারল্যাণ্ড-ইণ্ডিস	....	২৯১	১৭.০
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	....	২৬৯	১৫.৮

উৎস : M. K. Bennett "International Disparities in Consumption levels," American Economic Review, XLI, No. 4, 648 (Sept. 1951)

চারিত্রিক দিক থেকে প্রতিটি সারি মুদ্রা-বহির্ভূত (non-monetary) হিসাবে প্রদত্ত। সুতরাং, মুদ্রা-সারি অপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল বলে সন্মান পাওয়ার যোগ্য। পরিশেষে যে সূচক ফল হিসাবে পাওয়া গিয়েছে তাতে মোট ঊনিশটি সারি প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় ভোগমাত্রার এই প্রতিবিম্ব-টিতে খাদ্যসামগ্রী, তামাক, চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা, শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে।[১৪] সর্বোচচ শিখরে অবস্থিত দেশ প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ১০০-এর সম্মান পায়। সুতরাং, সবগুলো নির্দেশকে সর্বোপরি সম্মানপ্রাপ্ত দেশ সর্বমোট ১৯০০ পয়েন্টের দাবীদাব হতে পারে। সারণীটি একদিকে প্রতিটি দেশের পূর্ণ পয়েন্ট তালিকাভুক্ত করে, অন্যদিকে আপেক্ষিক সাফল্যাঙ্ক ও নির্দেশ করে। প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ে আমেরিকার অপ্রতিদ্বন্দি প্রাধান্য। তার ধারেকাছেও কেউ যেতে পারেনি। মাত্র ৬টি দেশ আমেরিকার অর্ধেক অপেক্ষা অধিক পয়েন্টের দাবীদার। ১৩টি দেশ তার এক-চতুর্থাংশে থেকে অর্ধেকের মত দাবী করতে পারে। আব ১১টি দেশ এক-চতুর্থাংশেরও নিম্নে অবস্থিত।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত রূপ-কাঠামো

প্রগতিশীল দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে লক্ষ্য করা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারা যে অগ্রগতি লাভ করে তা মূলতঃ বাহ্যিক

১৪. বিস্তৃত খবরাদির জন্য দেখুন M.k. Bennet-এর "International Disparitis in Consumption Levels," American Economic Review, XLI, No. 4, 638-640 (Sept. 1951).

সূত্র থেকে সূচিত হয়। বৃটিশ পুঁজি ও শ্রম অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতি-ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। বাকী সব দেশে বিদেশী পুঁজি অবশ্য তেমন শক্তিশালী ছিল না। যেমন ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান মোটামুটি স্ব স্ব পায়ে ভর করেই অগ্রগতি-পথে এগিয়ে যায়। তবে প্রগতিশীল সবগুলো দেশই বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপক প্রেক্ষাপটে অগ্রসর হয়। কাজেই, সেই অনুপাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তাদের উন্নতি-অগ্রগতিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। বস্তুত, বৈদেশীক বাণিজ্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের স্থান দখল করে। দ্রব্য-সামগ্রীর ছদ্মবেশে উপকরণ ইত্যাদি আসতে থাকে এবং আমদানী পরোক্ষ উৎপাদনের সামিল হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা-পর্ব নাগাদ এই ধারা অব্যাহত থাকে। বিশ্ব-অর্থনীতি ক্রমিক হারে আন্তর্জাতিক বিশেষী করণের রূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশী বাজার বিস্তৃত হয়। উৎপাদন-মাত্রা সম্প্রসারিত হয়।

বৃটিশ অর্থনীতির অগ্রগতিতে তার রপ্তানী-বাণিজ্যের অবদান অপরিসীম। রপ্তানী-বাণিজ্য একদিকে উন্নয়ন সূচিত অন্যদিকে প্রগতিপ্রক্রিয়া তীব্রতর করে তুলে। এদিকে, অন্যান্য দেশেও অগ্রগতির রূপ-আঙ্গিক বদলাতে থাকে। এই উভয়বিধ শক্তি নিয়ে কার্যকরী হয়ে বৃটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের আকৃতি বদলে দেয়। তার এই পরিবর্তিত রূপকাঠামোর চেহারা কিছুটা সারণী ১২. ৮, ১২.৯ ও ১২.১০ এ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। ১৮৫০ ও ১৮৭০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বৃটেন তড়িৎ গতিতে তার অর্থনীতিকে বিশ্ববাণিজ্যের আঙ্গিকে খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। তাই এই প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয় সূক্ষ্ম বিশেষী করণে, জাতীয় আয়ের অনুপাতে আমদানী

সারণী ১২.৮ আমদানী বাণিজ্যের উপর বৃটিশ অর্থনীতির নির্ভরশীলতা

বর্ষ		নীট জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে আমদানীর মোটামুটি পরিমাণ উপাদান-দরে (শতকরা হিসাবে)
১৮২০	....	১২
১৮৫০	....	১৮

১৮৭০	....	২৮
১৮৮০	....	৩৩
১৯০০	....	২৬
১৯১৩	....	২৮
১৯৩৭	....	২১
১৯৫৩	....	২৬

উৎস : E.A.G. Robinson, "The Changing Structure of The British Economy." Economic Journal, Lxiv, No. 255,458 (Sept. 1954).

পরিমাণ বর্ধনে, তৈরীকৃত দ্রব্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতায় এবং আভ্যন্তরীণ কাঁচামাল ও খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহের ন্যূনতায়। ১৮৫০ সালে এসে আমদানী পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ১৮ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়। মোট রপ্তানির ৯০ ভাগেরও অধিক হয়ে উঠে শিল্পজাত দ্রব্য। কাঁচামালের আমদানী তখনো বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মিটাবার নিমিত্তেই সীমাবদ্ধ। তার পরিমাণ ছিল মোট আমদানীর প্রায় ৩৪ শতাংশের মত।[১৫] এদিকে খাদ্যসামগ্রী আমদানীও বেড়ে চলেছিল। ১৮৭০ ও ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তীকালে জাতীয় আয়ের তুলনায় আমদানী পরিমাণ মোটামুটি স্থায়ী থাকে। বর্তমান শতাব্দীর সূচনালগ্নে কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের আমদানী প্রচুর বেড়ে যায়। তা প্রায় মোট আমদানীর ৪২ শতাংশ হয়ে উঠে। প্রথমবারের মত কাঁচামাল আমদানীর পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধ তদ্দিনে শুরু হয়ে গিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে বৃটেনের তখন জয়জয়কার নানা উদ্ভাবন-আবিষ্কার সাধন করে ব্যাপক বিশেষী-করণ অর্জন করে গিয়েছে। তবে বিদেশী কাঁচামালের উপর তার নির্ভরশীলতাও কিন্তু অধিক হয়ে উঠেছে। খাদ্যসামগ্রীর জন্যও তাকে বিদেশপানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়।

১৫. দেখুন E.A.G. Robinson-এর "The Changing Struct ureof British Economy," Economic Journal. LXIV, No, 255,448 (Sept, 1954),

সারণী ১২.৯ বৃটেনের রপ্তানি-বাণিজ্যের গঠনগত আকৃতি

বর্ষ	মোট রপ্তানির শতাংশ হিসাবে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি	মোট রপ্তানির শতকরা হিসাবে বস্ত্রশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি	মোট রপ্তানির শতকরা হিসাবে ধাতব ও প্রকৌশলী দ্রব্যাদির রপ্তানি
১৮৩০	.... ৯১	৬৭	১১
১৮৫০	.... ৯৩	৬৩	১৮
১৮৭০	.... ৯১	৫৬	২১
১৮৯০	.... ৮৬	৪৩	২৫
১৯১৩	.... ৭৯	৩৪	২৭
১৯৩৭	.... ৭৮	২৪	৩৫
১৯৫১	.... ৮৮	১৯	৪৯

উৎস: E.A.G. Robinson "The Changing Structure of the British Economy," Economic Journal, LXIV, No. 255,460 (Sept. 1954.)

সারণী ১২.১০. বৃটেনের আমদানী-বাণিজ্যের রূপগত কাঠামো

	১৮২০	১৮৫০	১৮৭০	১৯০০	১৯১৩	১৯২৯	১৯৫৩
খাদ্যসামগ্রী ও গবাদি পশু....	৩১	৩৪	৩৫	৪২	৩৭	৪০.৫	৪৬
কাঁচামাল	৬০	৫৯	৫০	৩৯	৪৩	৩৯.৫	৪১
তৈরী শিল্প-পণ্য	৯	৭	১৫	১৯	২০	২০.০	১৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: E.A.G. Robinson "The Changing Structure of the British Economy," Economic Journal, LXIV, No. 255,460 (Sept. 1954).

১৯১৩ সালে এসেও বৃটেন বিশ্ব-বাণিজ্যে অগ্রগণ্য ছিল। কি আমদানী, কি রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই তখনো সে সর্বাগ্রে; কিন্তু, ১৮৯০ সাল থেকে তার আপেক্ষিক প্রাধান্যে অবনতি শুরু হয়ে যায়। তার শিল্পজাত উৎপন্ন যেমন সঙ্কোচিত হয়, তেমনি বিশ্ব-বাণিজ্যে তার অংশ

হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৭০ সালে যেখানে তার শিল্পপণ্য রপ্তানি ছিল ৪০ শতাংশ তা ১৯৪৩ সালে হ্রাস পেয়ে ২৭ ভাগে উপনীত হয়। তার এই মহা-অধঃপতনের জন্য দায়ী প্রথমতঃ, বিশ্ব-বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমানশীল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে প্রাধান্য বজায় রাখায় তাব অপারগতা এবং দ্বিতীয়তঃ, স্থিতিশীল শিল্পসমূহে আপন আধিপত্য বজায় রাখায় অক্ষমতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষীয়মান গুরুত্বশীল শিল্পক্ষেত্রেও আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখায় বৃটেন অক্ষম হয়। বহির্বিশ্বের ক্রম-প্রসারমান শিল্প-অগ্রগতির সাথে তাল রেখে সে এগুতে সক্ষম হযনি। প্রগতিশীল বহুদেশ তাকে ছাড়িয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে সে পিছিয়ে পড়ে। বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিবর্তিত রূপ-কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে অগ্রসর হতে না পেরে সে প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। বৃটেন যে সকল শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল সেগুলো বর্তমান শতাব্দীর সূচনালগ্নে শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে বসে। বৃটেনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানি-পণ্য তাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।[১৬] বিশ্বের চাহিদা মাত্রা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। পূর্বেকার চাহিদা অগৌণ হয়ে উঠে। নূতন নূতন চাহিদা জন্ম নেয়। অথচ বৃটেন নিজকে ঘুটিয়ে নিতে পারেনি। তখনো সে পুরনো শিল্প নিয়ে বসে। ফলে, চাহিদার রূপ পরিবর্তনের সাথে সে তাল মিলিয়ে হাটতে পারেনি। কাজেই, তার শিল্পজাত রপ্তানি পণ্যে সঙ্কোচন ঘটে। এদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও সে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। পরিণামে তার আপেক্ষিক আধিপত্য হ্রাস পায়।

বৃটিশ বহির্বাণিজ্যের গঠনগত আঙ্গিকে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতির চেহারা-সুরতেও প্রতিফলিত হয়। নূতন নূতন শিল্প-শক্তি গজিয়ে উঠতে থাকে। বৃটেন তার একচ্ছত্র আধিপত্য হারাতে থাকে। তার এই চেহারাটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে ১২.১১ সারণীতে। ১৮৭৩ সালে নাগাদ বৃটিশ বাণিজ্যের যে কাঠামো পাওয়া যায় তা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাণিজ্য-নক্সারই নামান্তর। তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে এবং কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী আমদানীতে সীমিত ছিল। কিন্তু, শতাব্দীর শেষ-প্রান্তে এসে তা এক-তৃতীয়াংশ হয়ে

১৬. দেখুন J.M. Letiche-এর "Differential Rates of Productivity Growth and International Imbalance," Quarterly Journal of Economics, LXIX, No. 3, 389 (Aug. 1955)

উঠে। জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পশক্তি হিসাবে মাথা চাড়াদিয়ে উঠে। ফলে বৃটেনের বাণিজ্য যেমন সঙ্কুচিত হয় তেমনি শিল্পজাত দ্রব্যের বদলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানিতে রূপান্তরিত হয়।

সারণী ১২.১১ বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা হারে বণ্টন, আদান-প্রদানের জাতিভেদে, ১৮৫৪-১৯২৯

সময়কাল	অদৃশ্যমান বাণিজ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী	কাঁচামাল ও খাদ্য-পণ্যের বদলে প্রাপ্ত কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী	শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে প্রাপ্ত শিল্প-দ্রব্য	শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য
১৮৫৪-১৮৬৩	১৪.২	১১.১	৮.৮	৬৫.৯
১৮৬৪-১৮৭৩	১২.১	১০.৯	১৩.২	৬৩.৮
১৮৭৪-১৮৮৩	২০.১	১২.১	১৭.২	৫০.৪
১৮৮৪-১৮৯৩	১৮.২	১৪.৩	২০.১	৪৭.৪
১৮৯৪-১৯০৩	২৩.৯	১৬.৩	২৫.৩	৩৪.৫
১৯০৪-১৯১৩	১৫.১	২০.০	২২.৭	৪২.২
১৯২৫-১৯২৯	২৩.১	১৫.৮	২৫.৭	৩৫.৪

উৎস: A. O. Hirschman, National Power and the Structure of Foreign Trade, Univesity of California Press, Berkeley, 1945, 145.

বিশ্ব-বাণিজ্যের আকৃতি-প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। সেদিনের একদিকে শিল্পপণ্য ও অন্যদিকে কৃষিপণ্যে আদান-প্রদানের স্থলে এখন উভয় দিকে শিল্পজাত দ্রব্যের আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। বাণিজ্য-প্রক্রিয়ার এই পরিবর্তিত নবরূপ এবং তার পরিবর্ধন একটা উল্লেখযোগ্য স্বতঃসিদ্ধি তুলে ধরে: শিল্পে অগ্রগামী দেশের অন্যত্র শিল্প-অগ্রগতি দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কারণ, অন্যান্য দেশ শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে তার ক্রেতা হয়ে উঠে। তেমনি সেও তাদের কাছে সুবিধামত দরে কেনাকাটা করতে পারে। এইভাবে একে-অন্যের খরিদ্দার হয়ে উভয়ের শিল্প-অগ্রগতি তীব্রতর করে তুলতে পারে। অন্যদিকে

ক্রম-বর্ধমান বিশ্ব বাণিজ্য-পরিসরে সূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়। তাই দেখতে পাই যে শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে এসে জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনে সবচেয়ে বড় খরিদ্দার হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ এরা উভয়ে শিল্পোন্নয়ন পথে দ্রুত ধাবমান ছিল।

পৃথিবীব্যাপী হিসাব নিয়ে দেখা যায় যে ১৮৭০ থেকে ১৯১৩ সালের অন্তবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্যে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১২.১২ চিত্র দেখুন। টিন্‌বার্জেনের মতে এই সময়ে মূল্য প্রায় চতুর্গুণ অপেক্ষা অধিক বেড়ে গিয়েছিল। বাণিজ্যে লিপ্ত প্রধান প্রধান দেশগুলোর দিকে তাকালেও একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

সারণী ১২.১২ বিশ্ব-বাণিজ্যের মূল্য, ১৮৭০-১৯১৩

বর্ষ	(১) ১৯০৭=১০০	(২) (চলতি বিনিময়-হারে, মিলিয়ন পাউণ্ডের) হিসাবে	(৩) (১৯২৯ সালের দরে, মিলিয়ন পাউণ্ডের হিসাবে)
১৮৭০	৩১	২,২৯৭	২,৭৯৫
১৮৭৬	৩৯	৩,০০০	৩,৯২৫
১৮৮০	৪৪	৩,০২৪	৪,২৩০
১৮৮৫	৪৪	৩,০৫৬	৪,৯৮০
১৮৯০	৫৩	—	—
১৮৯৫	৫২	—	—
১৯০০	৬৮	৪,০২৫	৬,৬১০
১৯০৫	৮৬	৪,৯৫৫	৭,৯৬০
১৯১০	১১১	৬,৪৩০	৯,০৫০
১৯১৩	১৩৭	৭,৮৪০	১০,৭১০

উৎস : (১) J. Tinbergen, Business Cycles in the United Kingdom, 1870-1914, North-Holland Publishing Co. Amsterdam, 1951,141.

(২) ও (৩) Clark-এর The Conditions of Economic Progress, London, 1940, 461.

সুতরাং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। অচিরে তার রূপ-কাঠামো বদলে নূতন রূপরেখার উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু, তা ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে? অর্থাৎ বিশ্ব-বাণিজ্যের এই যে অগ্রগমন তা বিশ্লেষিত হতে পারে কি প্রকারে? উত্তর খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। অথবা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন পড়ে না। জন-নির্গম ঘটছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিদেশী লগ্নী বেড়ে চলেছিল। এই সবের মিলিত প্রভাবে দেশে দেশে বিদ্যমান সম্পদ-সরবরাহ-বৈষম্য দূরীভূত হতে থাকে। এদিকে, প্রযুক্তিক-জ্ঞান, নৈপুণ্য ও দক্ষতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নীট পরিণতি হিসাবে উৎপাদনের তুলনামূলক ব্যয়ে বিরাজমান ফাঁক সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। অন্যদিকে, চাহিদা মাত্রাও বসে নেই। শিল্প-অগ্রগতি সাধিত হয়ে চলেছে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ পদ্ধতি আধুনিক কায়দা ধারণ করছে। আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞাপন প্রথা প্রবর্তিত হয়ে উঠেছে। ফলে খরচ-পত্তরের ধরন-ধারণ তথা নক্সা মোটামুটি সমরূপ ধারণ করে উঠেছে। এদিকে, বাণিজ্যক্ষেত্রে নানারকম বাধানিষেধের ঘেরাজাল বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। ভিন্নমুখী এই হাজারো প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বস্তুত বাণিজ্য-পরিমাণে সঙ্কোচন ঘটা স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু তা না হয়ে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার বৈ কি!

কিন্তু, না আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই সম্প্রসারণের পেছনে বহু শক্তিশালী প্রভাব ক্রিয়া করেছিল। নব নব দ্রব্যসামগ্রী প্রবর্তিত হয়ে চলেছিল। উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ছিল। উৎপাদন বিস্তৃত হচ্ছিল। চাহিদামাত্রায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। পরিবহন-ব্যয় হ্রাস পাচ্ছিল। এই সবকিছু মিলে বাণিজ্য-পরিসর সম্প্রসারিত করে দেয়। শুধু যে নব নব দ্রব্যসামগ্রী নিত্য-নূতন বাজারে আসছিল তা নয়। একই রকম দ্রব্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উন্নতি সাধিত হচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে দ্রব্যমান নবরূপ লাভ করছিল। আসলে একই সামগ্রী হলেও দেখতে-শুনতে একটু বেশকম ছিল। উদ্ভাবনী আবিষ্কার তীব্রতর হচ্ছিল। তা আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন আভ্যন্তরীণ পরিবেশেও তেমন। ক্রমে ক্রমে বহু দেশ নব নব উদ্ভাবনী আবিষ্কার নিয়ে বিশ্ব-বাজারে উপস্থিত হয়। দ্রব্যসামগ্রী পরিসরে বিস্তৃতি, অন্যদিকে দ্রব্যমানে ক্রম-বর্ধমান পার্থক্য আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সূত্র সম্প্রসারিত করে দেয়। বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্যের আদান-প্রদান আওতা বর্ধিত হয়।

দেশে দেশে শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ছিল। বহু সামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাচ্ছিল। আঙ্গিকগত তথা প্রযুক্তিক অগ্রগতি তীব্রতর হচ্ছিল। ফলে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ আকার ধারণে সক্ষম হয়। তার ফলে বাড়তি উৎপাদন হতে থাকে। এই বাড়তি উৎপাদনের জন্য ক্রম-বর্ধমান বাজার পরিসর চাই। কাজেই, বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়াবার নিমিত্তে সবায় আগ্রহী হয়ে উঠে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তৃত হয়।

এদিকে আয়মাত্রা বেড়ে চলেছিল। তাতে করে নিত্য নূতন চাহিদা বাড়ছিল। বহির্বাণিজ্য প্রসারলাভ করছিল। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলো অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছিল। ফলে বহুতর দ্রব্যাদির আমদানী চাহিদা সম্প্রসারিত হচ্ছিল। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা জিনিসপত্তরের চলাচল সুবিধা করে দিয়েছিল। এমনকি বাধানিষেধের প্রাচীর দিয়েও এই বিস্তৃতি ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। কেননা, ব্যয় করার মত প্রচুর টাকা জনসাধারণের হাতে জমা হচ্ছিল। কাজেই, কোন বাধাই তেমন বাঁধ সাধতে পারেনি। তাছাড়া, শিল্প-অগ্রগতির পরিমাণ অনুসারে কাঁচামালের চাহিদা বেড়ে চলেছিল। এদিকে আবার লোকসংখ্যা বেড়ে খাদ্য দ্রব্যের-চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এইসব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে বিশ্ব-বাণিজ্য পরিসর আরও প্রসারিত হয়ে পড়ে।

কাজেই, বহুজনের ভয়-ভীতির নিরসন ঘটিয়ে অন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে স্বীয় বপু স্ফীতকায় করে। গোড়ার দিকে বহু লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে দেশে দেশে শিল্প-অগ্রগতি জোরদার হওয়ার পরে বৈদেশিক বাণিজ্য কমে যেতে বাধ্য। তাঁদের হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্যের পেছনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধ্রুপদী চিন্তাধারা ক্রিয়া করেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে একদিকে শিল্পজাত দ্রব্য ও অপরদিকে কাঁচামাল সামগ্রী। কাজেই বিশ্বে শিল্প-অগ্রগতি সাধিত হয়ে গেলে বাণিজ্য পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য। কেননা, তখন আর তৈরীকৃত দ্রব্য বিনিময়ে তেমন আর আগ্রহ থাকে না। কিন্তু, তাঁদের এই স্থির বিশ্বাসে পাথর ঠুকে শিল্প-অগ্রগতি বাণিজ্য-পরিসর ব্যাপৃত করে তুলেছিল। কথা সত্য বটে, উন্নয়ন-অগ্রগতি ব্যাপকতর হওয়ার ফলে পূর্বেকার শিল্পোন্নত দেশগুলো কিছুটা বাজার হারিয়েছিল। কিন্তু আয় পরিমাণ বর্ধিত হয়ে আমদানী চাহিদা

বাড়িয়ে দিয়েছিল আরও অধিকতর হারে। মাথাপিছু আয় বেড়ে গিয়ে আমদানী-বহর কি পরিমাণে, কি বৈচিত্র্যে বর্ধিত করে তুলেছিল। শিল্পোন্নত দেশ একে অন্যের রপ্তানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশগুলোতেও শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সম্প্রসারিত হয়েছিল। কাজেই শিল্পায়নপ্রথা জোরদার হয়ে শিল্পপণ্যের আমদানী হ্রাস করার স্থলে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাধানিষেধ বহির্ভূত বিশ্বে, বাণিজ্যিক অবরোধ ও মুদ্রা অচলতার অবর্তমানে বরং অনুন্নত দেশগুলোতে শিল্পপণ্য আমদানী শিল্পায়ন প্রথাকে সবল করে তোলে। কথাটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ১২·১৩ সারণী লক্ষ্য করুন।[১৭]

অবশ্য উন্নয়ন অগ্রগতিব সার্বিক প্রভাব প্রকৃত আয়ে বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং সূক্ষ্ম বিশেষীকরণ সম্ভব করে তুলে বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যাপকতর করে তুললেও শিল্পে উন্নয়নশীল বিশেষ কোন দেশের উন্নয়ন নক্সা হয়ত তা সীমিত করে তুলতে পারে। ধরুন কোন একটি উন্নয়নশীল দেশ অস্বাভাবিক রকম সংরক্ষণ নীতির প্রশ্রয় নেয়। অথবা স্বীয় শিল্প-উন্নয়নে সরকারী সাহায্যের ছত্রচ্ছায়া মেলে ধরে এবং এই করে সম্পদ সামগ্রী রপ্তানি-শিল্প থেকে অধিক হারে সরিয়ে নেয়। ফলে সেই পরিমাণে রপ্তানি বাণিজ্য সঙ্কোচিত হয়। অথবা মনে করুন, উন্নয়ন-অগ্রগতি খরচ ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়ে ব্যয়-মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেয়। ফলে, রপ্তানি-শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। ফলে আমদানী-ক্ষমতা হ্রাস পায়। পরিণামে বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ নেমে আসে।

---

১৭. সমস্যাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে দেখুন A. O. Hirschman-এর "Effects of Industrialization on the Markets of Industrial Countries", in B. F. Hoselitz (ed), the Progress of Underdeveloped Areas, University of Chicago Press, Chicago, 1952, 270-283; N. S. Buchanon ও F. R. Lutz-এর Rebuilding the World Economy, Twentieth Century Fund, New York, 1947, 49-56. A. G. B, Fisher-এর "Some Essential Factors in the Evolution of International Trade", Manchester School of Economic and Social Studies, XIII, No. 1, 1-23 (Oct. 1943), A. J. Brown-এর "Economic Development and world Trade", Journal of International Affairs, Spring, 1950.

সারণী ১২.১৩ উৎপন্ন দ্রব্যের গতায়াত এবং তৈরীকৃত দ্রব্যের বাণিজ্য

(১৮৯১-১৮৯৫ সময়কালের শতকরা হিসাবে ১৯২৬-১৯২৯ পর্যায়কাল)

দেশ		উৎপন্ন-দ্রব্য	তৈরীকৃত দ্রব্যের আমদানী
জাপান	....	১৯৩২	৬২৮
ফিনল্যাণ্ড	....	৫৮৩	৪৭৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	....	৪৩৬	২৩০
সুইডেন	....	৪০৫	৪৮০
ইতালী	....	৩৯৪	১৮৯
জার্মানী	....	২৭৯	১৮৫
ফ্রান্স	....	২৬০	১২৭
বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যাণ্ড	....	১৪৩	১৯৫

সূত্র : League of Nations, Industrialization and Foreign Trade Geneva, 1945-93.

তাছাড়া, শিল্পায়নের বাজার-সৃষ্টিকারী প্রভাব বাজার-ধ্বংসীকারী প্রভাব অপেক্ষা অধিক হয় বটে এবং তার ফলে শিল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য সার্বিকভাবে বেড়ে যায় সত্য, কিন্তু তাই বলে আপেক্ষিকভাবেও তা সম্প্রসারিত হবে এমন কোন কথা নেই। বরং, তার উল্টোটা হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তাই দেখা যায় যে অতি সাম্প্রতিক কালে উন্নতির উচচ শিখরে আরোহণকারী দেশ যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ক্যানাডা বিশ্ববাণিজ্যে শতকরা হিসাবে তাদের অংশ বাড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৪ ভাগ, ৫.৭ ভাগ ও ৪.৭ ভাগ। ১৮৯৯ সন থেকে ১৯৩৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। অথচ উক্ত সময়ে বৃটিশ বাণিজ্যে সঙ্কোচন ঘটেছে ১০.১ শতাংশ।[১৮] এই পড়তির নামমাত্র একটা অংশ হয়ত ক্রম-অবনতিশীল বৃটিশ শিল্পসামগ্রীর কারণে ঘটেছে। আর বাকী সবটাই ঘটেছে লৌহ, ইস্পাত ও প্রকৌশলিক

১৮. H. Tyszynski-এর "World Trade in Manufactured commodities, 1899-1950, Manchester School of Economic and Social Studies. XIX. No. 3, 286 (Sept. 1951)

দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসায় বৃটেনের পিছিয়ে পড়ার কারণে। অথচ এই সকল ব্যবসা বিশ্ব-বাণিজ্যে অধিক গুরুত্বশীল হয়ে উঠছিল।

বিস্তৃত উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার ফলাফল খতিয়ে দেখা গেল। তা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করে, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাণিজ্যে লিপ্ত দেশ-গুলোর পারস্পরিক অংশীদারিত্বে ওলট-পালট সৃষ্টি করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের গঠনগত আঙ্গিক বদলে দেয়। উন্নয়ন পথে ধাবমান দেশগুলোর বাণিজ্য-আকৃতিতে ব্যাপক ও দ্রুতশীল পরিবর্তন এনে দেয়। এই পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। উৎপাদন নক্সা ভেদে, উদ্যোগ-উদ্দীপনার চরিত্রানুসারে, রুচিগত তারতম্যের কারণে এবং সরকারী নীতির বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্নতর পরিবর্তন সূচিত হয়। কাজেই, আটঘাট বাধা সাধারণ 'নীতিমালা' প্রণয়ন অবশ্যই দুরূহ ব্যাপার। সর্বজনগ্রাহ্য তথা সর্বদেশে সমভাবে প্রযোজ্য নিয়ম-কানুন বেধে দেয়া সম্ভব নয়। এমন কথা বলা সহজ নয় যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি ধারা অব্যাহত থাকাকালে বৈদেশিক বাণি-জ্যের চেহারা এমনতর হবে এবং তা সব দেশের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি একটা সমধর্মী চিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে। অন্তত, আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য পরিস্থিতির পরিসাংখ্যিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এমনতর প্রবণতার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

অনুন্নত দেশ শিল্পপথে এগুতে যেয়ে নিদারুণ পুঁজি স্বল্পতার সম্মুখীন হয়। তাই তাকে বিদেশী পুঁজি আমদানী করতে হয়। আমদানীকৃত পুঁজি খাটিয়ে স্বীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে শিল্পায়ন পথে এগিয়ে যায়। অতঃপর তার আমদানী পরিসর বিস্তৃত হয়। সে নানা জাতের দ্রব্য আমদানী করতে শুরু করে। কাঁচামাল আমদানী করে। আধা-নির্মিত দ্রব্য আনে। জ্বালানি আনতে শুরু করে। এই সবের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সেই পরিমাণে তৈরীকৃত ভোগদ্রব্যের আমদানী কমতে থাকে। আয়মাত্রা বর্ধনের সাথে তাল রেখে অবশ্য মোট আমদানী বাড়তে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানী চড়তে থাকে। প্রাথমিক শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তদস্থলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানের শিল্পসমূহ সম্প্রসারিত হয়। পরিণামে প্রাথমিক উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পায়।

আমেরিকার বাণিজ্য কাঠামো উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম পর্যায়ে আমেরিকা কাঁচামাল ইত্যাদির রপ্তানিকারক ছিল। অতঃপর সে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক দ্রব্যাদির রপ্তানি কমতে শুরু করে।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাড়তে থাকে। পরিশেষে সে প্রাথমিক দ্রব্য-সামগ্রীর নীট আমদানীকারক হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমেরিকা ছিল কার্পাস ও তামাক রপ্তানিকারক। আর ইউরোপ থেকে আমদানী করত তৈরীকৃত দ্রব্য। ১৮৭০ দশক ও ১৮৮০ দশকে আমেরিকায় ব্যাপক উন্নতি-অগ্রগতি ঘটে। কৃষিক্ষেত্রে সে অনেকদূর এগিয়ে যায়। ফলে খাদ্যসামগ্রী হয়ে উঠে তার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। ১৮৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তার শিল্পজাত দ্রব্য প্রাধান্যলাভ করে। তৈরীকৃত দ্রব্যর রপ্তানি দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে থাকে। অচিরে তার শিল্পপণ্যের রপ্তানি সৃষ্টি হয়। পূর্বেকার আমদানী উদ্বৃত্ত অপসারিত হয়ে রপ্তানি উদ্বৃত্ত জোরদার হয়ে উঠে এবং সে প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রীর নীট আমদানীকারক হয়ে উঠে। এদিকে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে এবং আয় সম্প্রসারিত হয়ে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। ফলে খাদ্যসামগ্রীর রপ্তানি আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। পুঁজি-সংগঠন জোরদার হয়। প্রযুক্তিক অগ্রগতি ব্যাপক হারে সাধিত হয়। ফলে তুলনামূলক ব্যয়-নক্সায় রূপান্তর ঘটে। গোড়াতে শিল্পজাত উৎপন্নে যে অসুবিধা বিদ্যমান ছিল তা দূরীভূত হয়ে অনুকূল হয়ে উঠে।

বিশ্ব-বাণিজ্যের গঠনপ্রণালীতে পরিবর্তন সূচিত হয়। তার আঙ্গিকে সুস্পষ্ট নূতন ধারা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে যেমন তৈরী-কৃত দ্রব্যের তেমনি প্রাথমিক পণ্যের আদান-প্রদান বার্ষিক শতকরা ২ ভাগেরও অধিক হারে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু, ১৮৭৬-১৮৮০ সন থেকে ১৮৯৬-১৯০০ সাল সময়কালে তৈরীকৃত পণ্যাদির তুলনায় প্রাথমিক দ্রব্যাদির বাণিজ্য-পরিসর বর্ধিত হয় প্রায় ২৫ শতাংশেরও অধিক।[১৯] কাঁচামাল ইত্যাদির ব্যবসায় এই আপেক্ষিক পরিবর্ধন তার বাণিজ্য-শর্তে অবনতি এনে দেয়। তৈরীকৃত পণ্যে শুল্কহার প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়াও তার জন্য কতকাংশে দায়ী। ১৮৯০ সালের পরবর্তী সময়ে তৈরীকৃত পণ্যে আরো-পিত শুল্ক সরাসরি হারে বেড়ে যায়। ১৯০০-১৯১৩ সময়কালে কিন্তু, বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাথমিক পণ্যাদির গুরুত্ব হ্রাস পায়। তার অনুপাত ১১২ থেকে ১০০ তে নেমে আসে। এই সময়ে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ-সমূহের বাণিজ্য অনুপাতে কিছুটা উন্নতি ঘটে। তৈরীকৃত পণ্যে মূল্যানুসারে

---

১৯. League of Nations-এর Industrialization and Foreign Trade, Geneva, 1945 থেকে হিসেব কষে নেয়। পৃষ্ঠা ১৫৭।

আরোপিত শুল্কহার হ্রাস পায়। শিল্পজাত দ্রব্যের দাম চড়ে যায়। দাম চড়ার ফলে শুল্কহারের বোঝা একটু অবনমিত হয়। তৈরীকৃত পণ্যে বাণিজ্যিক বাধা-নিষেধ কিছুটা শিথিল হয়।

এদিকে ১৮৭০-১৯১৩ পর্যায়কালে "খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্যের" ব্যবসায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে। বিশ্ববাণিজ্যের আনপাতিক হিসাবে তা অপেক্ষাকৃতভাবে গৌণ হয়ে উঠে। তৎস্থলে "পণ্যের বিনিময়ে অদৃশ্যমান আইটেম এবং "পণ্যের বদলে পণ্য"-এর ব্যবসা বিস্তৃত হয়। ১৯১৩ সাল নাগাদ উভয়তর ব্যবসার পরিমাণ প্রায় সমান সমান হয়ে উঠে। অর্থাৎ শেষোক্ত দুই জাতীয় বিনিময় প্রথমোক্ত বিনিময় তথা "খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের বিনিময়ে শিল্পপণ্য"-এর ব্যবসার সমানুপাতিক হয়ে উঠে।[২০]

অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই চেহারা পরিবর্তনে অস্বাভাবিক কিছু নেই অথবা আশ্চর্য হওয়ার মতও কিছু নেই, বরং একটু মনোনিবেশ করলেই তা সহজ বোধগম্য হয়ে উঠে। কারণ উপরোক্ত সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানস্থ শিল্পসমূহে প্রচুর অগ্রগতি ঘটে। আয়মাত্রার সম্প্রসারণের অনুপাতে এই সব দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে চলে। এদিকে, শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসরমান নূতন নূতন দেশগুলো পুরানো শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় না নেমে বরং সম্পূরক ও পরিপূরকধর্মী শিল্পসমূহ উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন প্রকৃতি ও বৈষম্যধর্মী গুণসম্পন্ন শিল্পপন্য উৎপাদিত হতে থাকে। দেশে দেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদির এই তারতম্যহেতু শিল্পপণ্যের বিনিময়-ভিত্তি বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়। দেখা যায় যে, একই দেশ ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে যে পণ্য আমদানী করে আসলে তা মোটামুটি একই বস্তু। কিন্তু, তবু একটু গুণগত, কি দৃশ্যতঃ, কি বস্তুতঃ তারতম্য বিরাজমান—যার ফলে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আগত জিনিসটার প্রতি আগ্রহ দেখায়।[২১] চলিষ্ণু গতিধারা ও নব নব উদ্ভাবন-আবিষ্কার যেমন

২০. দেখুন A. O. Hirschman-এর National Power and Structure of Foreign Trade, University of California Press, Berkeley, 1945, 151.

২১. দেখুন A. H. Frankel-এর "Industrialization of Agricultural Countries and the Possibitity of a New International Division of Labour," Economic Journal, LIII, No. 210-211 (June—Sept., 1943).

আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ধারা বহুমুখী করে তোলে তেমনি আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য চিত্র-বিচিত্র করে দেয়।[২২]

পরিশেষে, শিল্পজাত পণ্যাদির শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে একটু বলা যাক। তৈরীকৃত পণ্যাদির মোটামুটি শ্রেণী-বিভক্তি বিবেচনা করে বিশ্ব-বাণিজ্যে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের মাত্রা চিহ্নিত করা যেতে পারে। আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন-ধারা তুলে ধরা যেতে পারে। এই সম্পর্কে একটা পরিসাংখ্যিক পর্যালোচনার খবর পাওয়া যায়। উক্ত আলোচনা নিম্নোক্ত প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করে :

(১) শিল্পোন্নত প্রধান প্রধান দেশগুলোর সাকুল্য তৈরীকৃত পণ্য-রপ্তানি সামনে রেখে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১৯৫০ সাল অবধি সময়কালে প্রধান প্রধান বাণিজ্য সামগ্রী ছিল লৌহ ও ইস্পাত, যান-বাহন, শিল্পজগতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি;

(২) রাসায়নিক ও লৌহ নয় এমন সব ধাতব দ্রব্যাদি মোটামুটি ধ্রুব হার বজায় রাখে;

(৩) বস্ত্র ইত্যাদি ও পোশাক-পরিচ্ছদের আদান-প্রদান ঋজুহারে হ্রাস পায়।

এই সমস্ত ধারাপ্রবাহ মোটামুটিভাবে দৃঢ়তা বজায় রেখে চলেছে এবং কোন সময়েই তেমন একটা উঠানামার প্রবণতার জন্ম দেয়নি।

সুতরাং, আলোচনা শেষ করার আগে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, সময়ের কপোলতলে বিশ্ব-বাণিজ্যের চেহারা ও আঙ্গিক রূপান্তরিত হয়েছে। রূপরেখার এই পরিবর্তন-স্রোত মূলতঃ অর্থনৈতিক জীবনী প্রবাহের রূপান্তর ধারার সাথে সমন্বিত হয়েই অগ্রসর হয়েছে। দিন গিয়ে বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। দশক অতিক্রান্ত হয়ে যুগ অনন্ত প্রবাহে মিশে গিয়েছে। তার সাথে তাল রেখে তুলনামূলক ব্যয়-নক্সা আন্দোলিত হয়েছে, নব-রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেশে দেশে বিস্তৃত উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়-মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং দেখা দিয়েছে বিশ্ব-বাণিজ্যের চেহারা সুরতে নব নব রূপ। কাজেই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন-অগ্রগতির পর্যালোচনায় নিরন্তর-প্রবাহী তুলনামূলক ব্যয়বিধি চিত্র সংযোজিত

২২. দেখুন A. H. Tysznski-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৮৩।

করে নিতে হবে। বিধৃত করে নিতে হবে এই উপপাদ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজার-স্রোত দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে অনুকূল উস্কানী যোগায়। জোরদার করে তুলতে হবে এই ধারণা যে, এক দেশের ব্যাপক অগ্রগতি সারা বিশ্বে সাড়া জাগায়, বিশ্ব-অর্থনীতিতে আন্দোলন সৃষ্টি করে। 'কতটুকু' এবং 'কিভাবে' তা পরিমাপ করে সন্নিবেশিত করে তুলতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির নবরূপ-নক্সা

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে এসে অর্থনীতির আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। বিশ্ব-অর্থনীতির রূপ-কাঠামো তার স্থিতিশীল চরিত্র হারায়। সাধারণ উন্নয়ন-অগ্রগতি ব্যাহত হয়। দেশে দেশে অর্থনৈতিক সংহতির শান্ত-শ্রী পরিবেশ অস্থিরতায় রূপ নেয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থ-নীতির আগেকার সেই বৈশিষ্ট্যাবলী অন্তর্হিত হয়ে যায়। যুদ্ধকালীন সময়ে গঠনগত আঙ্গিকে প্রচুর পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃটিশ অর্থনীতির সেই জম্‌জম্‌ রমরমা ভাব কেটে গিয়ে স্তিমিত হয়ে যায়। তার প্রাধান্যে আপেক্ষিক অবনতি ঘটে। স্বর্ণ-মান পরিত্যক্ত হয়। ১৯৩০ দশকের সেই মহা মন্দা পর্ব বিপুল হারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ-চেহারা বিঘ্নিত হয়। তৎস্থলে বাধা-নিষেধের পাহাড় জমে উঠে। দেশে দেশে পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠে। এই সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে দুই যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময় কালের বিশ্ব-চিত্রে অসংহতির দানা কঠিন করে তুলে। অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য ও স্থিতিশীলতার পাষাণ-প্রাচীরে বহি-বিশ্বের প্রাচুর্য ও স্থিতিশীলতা মাথাকুটে মরে। জন্ম নেয় স্বল্পস্থায়ী অথচ ব্যাপক বিধ্বংসী অসংখ্য সঙ্কট-পর্ব। তাদের সম্মিলিত প্রভাবে প্রাগ ১৯১৪ সালের পৃথিবীর উৎপাদন জগতে বিদ্যমান দীর্ঘকালীন শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ উৎসর্গীত হয়। বলিপ্রাপ্ত ঝটিকা সঙ্কুল তপ্ত এই আবহাওয়ায় উন্নয়ন-অগ্রগতির বাহ্যিক ঝর্ণাধারা শুকিয়ে কাঠফাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। "প্রতি-বেশী উচ্ছন্নে যাক" বাণিজ্য-নীতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে উপাদান-সামগ্রীর সীমিত সঞ্চালন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রতিহত করে তোলে ও তাকে অগ্রগতির শক্তিমান পরিবর্ধক হতে বিরত করে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালে এসে পুরানো চেতনা আবার জাগ্রত হয়ে উঠে। যুদ্ধ মধ্যবর্তীকালের শূন্যতা নিরসনে আগ্রহ পুনরায় জন্ম

নেয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগত কাঠামো জোরদার করে প্রতিষ্ঠানিক পথে প্রাগ ১৯১৪ সালের সুস্থ পরিবেশ পুনর্জীবিত করার প্রয়াস দানা বেঁধে উঠে। যুদ্ধকালীন ধ্বংস স্তূপের উপর ১৯৪৫ সালে জাতিপুঞ্জ জন্ম নেয়। স্বীকৃত হয় যে বিশ্ব মানব-মঙ্গল সাধন কারো একার কাজ নয়। ইহা বিশ্ববাসীর সম্মিলিত কর্তব্য। বিশ্ব-সংস্থার অভীষ্ট লক্ষ্যে সংযোজিত হয় "সামজিক কল্যাণ সাধন ও মুক্তাঙ্গনে উন্নত জীবনমান অর্জন"-এর উচ্চ আশা-আকাঙক্ষা। "বিশ্ব-মানবতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা" জরুরী হিসাবে বিবেচিত হয়।[২৩] সাধারণ পরিষদের অধীনস্থ ও জাতীপুঞ্জের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা কর্তৃক সমর্থিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলকে "উন্নততর জীবনযাত্রা, পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান অবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনের" কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রগতি-প্রক্রিয়া সবলতর করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-সংস্থার অধীনস্থ অনেকগুলো বিশেষজ্ঞ সংস্থা জন্ম নেয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সাধনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-কাণ্ড এবং পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক-ব্যাঙ্ক তথা বিশ্ব-ব্যাঙ্কের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

দরিদ্র দেশগুলোর উন্নতি-অগ্রগতিতে সহায়তা করার প্রচেষ্টাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সপুষ্ট সমর্থন জানাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তার চার দফা কার্যক্রম প্রদান করেন। প্রযুক্তিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে দেয় এই কার্যসূচী "অনুন্নত অঞ্চলসমূহের অগ্রগতি সবল করায় আমাদের বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক অগ্রগতির সুবিধাসমূহ তাদের দ্বারে উপনীত করার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা" হিসাবে চিহ্নিত হয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন কার্যসূচী শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে বৃটিশ কমনওয়েলথ ১৯৫০ সালে কলম্বো প্ল্যান গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, "দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের কল্যাণ সাধন এক মহা-মানবিক সমস্যা। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে স্বাধীন বিশ্ব বিশেষভাবে লাভবান হতে পারে। .. .. কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলো এই সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করে তা দূরীকরণে এগুতে চায় এবং প্রকাশ করে যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনে টাটকা ও সতেজ

২৩. জাতিপুঞ্জ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৫৫।

জীবনীশক্তি অন্তরীত করা প্রয়োজন যাতে তাদের উৎপাদন বাড়তে পারে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে এবং সেই পরিমাণে বিশ্ব-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে পারে। এবং তাহলে বিশ্ববাসী সবাই লাভবান হবে।"[২৪]

সুতরাং, বিশ্বের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী আজ সচেতন হয়ে উঠে যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি কেবল হাতে গোণা কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তার মঙ্গল পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে! তবেই বিশ্ব-মানবতা লাভবান হবে। আন্তর্জাতিক কল্যাণ সাধনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-সংস্থা ও তার অধীনস্থ সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চার দফা কার্যক্রম ও কলম্বো-প্ল্যান এই বৃহত্তর বোধশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রগতি-প্রক্রিয়া এগিয়েছে আপন বেগে। স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুটনোম্মুখ লালসায় সে ধাবিত হয়েছে। তার জন্য কারো প্রচেষ্টা তথা পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু, আজকের জগৎ ভিন্ন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশ আজ সজাগ হয়ে উঠেছে। উন্নতি তাদের হাসিল করতেই হবে। তাই দেখা যায় দেশে দেশে পরিকল্পনার হিড়িক। সজ্ঞানে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত যাচাই করে সবায় আজ ফলপ্রসূ উন্নয়ন কার্যসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আগুয়ান।

দরিদ্র দেশগুলো আর ঘুমিয়ে থাকতে রাজী নয়। তাদের সেই মান্ধাতার আমলের আধা-স্থবির পরিবেশ নিয়ে তারা আর বসে থাকতে প্রস্তুত নয়। এক উজ্জীবনী-জ্বালায় তারা আজ উদ্দীপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীর বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে তারা আর শান্ত নয়। কাজেই নির্জীব ভূমিকা ছেড়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী। আর তার জন্য যে কোন মূল্য প্রদানেই তারা প্রস্তুত নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টায় তাই তারা আজ অগ্রসর হতে তৈরী। উন্নয়ন অগ্রগতি বেগবান করায় তাই তারা উন্মুখ। তাই তাদের বহু নেতার মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সরকারী প্রচেষ্টা তথা যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনে কেবল অত্যাবশ্যকীয়ই নয়, সম্ভবও বটে। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে এই প্রচেষ্টা অবশ্যই অর্জন করা যেতে পারে। অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আজ তাদেরকে মরিয়া

---

২৪. দেখুন Report by the Commonwealth Consultative Committee, The Colombo Plan, H. M. S. O., London, Cmd. 8080, Nov., 1953, 3.

করে তুলেছে। সেদিনের সেই বঞ্চনা ও ফাঁকিবাজীর অবসান ঘটিয়ে তাই সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও আপন শক্তিতে আস্থাশীল অধুনালুপ্ত কলোনিয়েল দেশগুলো নিজেদের জীবন-মান উন্নত করায় বদ্ধপরিকর। অগ্রগতি সাধনে আজ তারা পাগল হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নাগপাশের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে তাই তারা আজ মুক্ত আবহাওয়ায় অবগাহন করতে হন্যে হয়ে ছুটেছে। তাদের এই দুর্বার গতি রোধ করা কারো সাধ্য নয়। কাজেই কোন পথে এবং কত তাড়াতাড়ি এই আপাত অসাধ্য কাজ সাধন করা যেতে পারে তার পথ খুঁজে বের করা আজ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ধনী দেশগুলোও কিন্তু বসে নেই। তারাও নিজেদের আধিপত্য তথা উন্নয়ন-মাত্রা বজায় রাখার সদা-সচেতন। তাই ঘুলি-ঘুপচি, ফাঁক-ফোঁক দূরে ঠেলে রাখায় সচেষ্ট। স্বল্প-সূত্রী পূর্ণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি অর্জন করে নাকে সরষের তেল ঢেলে আরামে ঘুমাতে তারাও আর রাজী নয়। মহা-মন্দাকালের বাত্যা-বিধ্বস্ত মানসিক উদ্বেগ তাদেরকেও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তাই তারা সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরীর সংস্থান বজায় রাখায় উন্মুখ। সঙ্কটজনক মুদ্রাসংকোচন কি মুদ্রাস্ফীতি এড়িয়ে স্থিতিশীল অগ্রগতি নিশ্চিত করায় তারাও সদা-চঞ্চল। তিরিশের সেই হতাশা-বিভ্রান্তির বেড়াজাল যুদ্ধোত্তর কালে কিছু নিরসন হলেও গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়ত্বের ভয়াবহতা আজও পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাই তারা উন্নয়ন-হারে নিম্নগতি লক্ষ্য করলেই অস্থির হয়ে উঠে। ভেবে নেয় এই যে, এই বুঝি বিপদ ঘনিয়ে এল।

সুতরাং, উন্নয়ন-অগ্রগতির ব্যথা আজ বিশ্বব্যাপী। প্রগতি-প্রক্রিয়ার সমস্যা আজ সবারই মাথাব্যথা। দরিদ্রদেশ এগিয়ে যেতে চায়। ধনী দেশ তার প্রাধান্য বজায় রাখতে উদগ্রীব। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই সমস্যার বিস্তৃত রূপ তুলে ধরা হবে এবং বিভিন্ন নীতিমালার কার্যকারিতা যাচাই করা হবে।

বর্তমান পর্বের আলোচনা তৃতীয় পর্বের বিশ্লেষণের সাথে তুলনা করে দেখলে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে উন্নয়ন-অগ্রগতির যে সমস্যা তা উনবিংশ শতাব্দীর সমস্যাবলী থেকে কয়েকগুণ স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রগতি-প্রক্রিয়ার যে ছক্ বিরাজমান ছিল তা আজকে বহুলাংশে ভিন্নতর। সুতরাং, এই দুইকালে

দুই ভিন্নতর প্রেক্ষাপট বিরাজমান। স্বাতন্ত্র্যধর্মী এই পরিপ্রেক্ষিত খতিয়ে দেখলে হয়ত প্রতীয়মান হবে যে, তার কিছুটা বর্তমান অগ্রগতির অনুকূলে আর বাকীটা তার প্রতিকূলে। উদাহরণ হিসাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনা এখানে টেনে এনে দেখানো যেতে পারে যে, আজকের অনুন্নত দেশগুলো সেদিনের ইংল্যাণ্ড অথবা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় তাদের সম্পদ-পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নিয়ে বিরাট ঝক্কিমারী অবস্থায় বর্তমান। তেমনি অনগ্রসর দেশগুলো ইংল্যাণ্ডের ন্যায় আজো কৃষি অথবা বাণিজ্যিক-বিপ্লব সাধন করতে পারেনি। বৃটেন তার শিল্প-বিপ্লব সাধনের পূর্বেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষি-বিপ্লব বাণিজ্যিক-বিপ্লব অর্জন করে বসেছিল। এই দুই বিপ্লবের জড়ো করা সুবিধার উপর সে তার শিল্প-বিপ্লবের জটাজাল বিস্তৃত করে নিয়েছিল। ফলে তার পক্ষে সমস্যা সমাধান বেশ অনেকটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু, অনগ্রসর দেশগুলো আজো সেই তিমিরে। 'পশ্চাপদতার' সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ও আগামী অধ্যায় সমূহে চিত্রিত করা হবে। তাদের প্রতি নজর দিলেও একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, তাদের ধরণ-ধারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং অধিকতর জটিলাকৃতির। কাজেই, আজকের দিনের উন্নয়ন-সমস্যা সেদিনের সমস্যা অপেক্ষা অধিকতর প্রকট বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। এদিকে, আজকের প্রগতিশীল দেশগুলো সেদিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে যে সুবিধাদি পেয়েছিল তা আজ আর বিদ্যমান নেই। সেদিনের সেই আন্তর্জাতিক মুক্ত পরিবেশ অন্তর্হিত। তদস্থলে বাধা-নিষেধের বহু প্রাচীর মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নক্সা জটিল চেহারা ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে উপাদান সামগ্রীর গতায়াত সীমিত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য তাই বলে সবটাই কাটাযুক্ত নয়। কিছুটা কমলও রয়েছে বৈকি। প্রতিকূল আবহাওয়া অবশ্যই ঝটিকা-সঙ্কুল সন্দেহ সেই। তবে অনুকূল স্রোতও তার তুলনায় কম নয়। ষোড়শ অধ্যায়ে উন্নয়ন-অগ্রগতির সাধারণ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হবে। সপ্তদশ থেকে বিংশ পরিচ্ছদ পর্যন্ত আলোচনায় নীতিমালা প্রণয়নের বিশ্লেষণ দেয়া হবে। এই সকল আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়ে উঠবে যে, আজকের পরিবেশ ভিন্ন হলেও সেদিনের তুলনায় তার মধ্যে অনেকগুলো সুবিধাজনক হিসাব প্রতিপন্ন হতে পারে। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি এগিয়ে দোষ-ত্রুটির জটাজাল পাশ কাটিয়ে আজকের অনুন্নত দেশ সত্ত্ব তাড়াতাড়ি উন্নয়ন পথে

এগিয়ে যেতে পারবে। গত শতাব্দী জুড়ে অভিজ্ঞতার যে পাহাড় পুঞ্জীভূত হয়েছে তা বিনা আয়াসে কাজে লাগিয়ে আজকের গরীব দেশ অগ্রগতি-পথে ধাবিত হতে পারবে। তার জন্য তাকে খেসারত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আজকের অনুন্নত দেশের জন্য অন্য এক সুবিধা এই যে দেশবাসী আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উন্নয়ন হাসিলে তাদের মনোভাব আজ অটুট। অতীতের অনীহাশীল সরকারের তুলনায় আজকের অনুন্নত দেশের সরকার উন্নয়ন-অগ্রগতি অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও মুষ্টিবদ্ধ। সুতরাং তাদের সমস্ত চিন্তাধারা ও কর্ম-প্রণালী উন্নয়ন-খাতে আবর্তিত। কিন্তু অতীতে তেমনটা ছিল না। সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো দূরে থাক, সেদিনের সরকার উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করার গুরুত্ব সম্পর্কেই জ্ঞাত তথা সজাগ ছিল না। অথচ আজকের দিনের সরকারের জন্য প্রথম ও প্রধান হুমকি হচ্ছে: প্রগতি-প্রক্রিয়া বেগবান করা। এই হুমকির সার্থক মোকাবেলায় তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কাজেই, যত দ্বিধা-দ্বন্দ্বই থাক না কেন, অনুন্নত অথচ উন্নয়নমনা দেশের সরকার বিদেশী অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে প্রয়োজন মত তাদের দেয়া সাহায্য গ্রহণ করে, উন্নয়ন-অগ্রগতির সার্থক রূপায়ণে অগ্রসর হবে তা খুবই স্বাভাবিক। আর যদি তাই হয় তাহলে উন্নয়ন সমস্যা অনুধাবনে এবং তা নিরসনে আজকের গরীব দেশগুলো যে অচিরাত সাফল্যের জয়-মন্দিরে হাজির হবে তা অনেকটা নিশ্চিত বৈকি!

তৃতীয় পর্ব

"সারা বিশ্ব যা চায়, সেই 'শক্তি' আমি
হেথায় বেচাকেনা করি"।

—জেমস ওয়াট

দরিদ্র দেশে উন্নয়ন-গতি বেগবান করার সমস্যা

প্রারম্ভিক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কীয় মুখ্য তত্ত্বসমূহ উপরে আলোচিত হল। উন্নয়নক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রভাবাবলীর ঐতিহাসিক ধারা উন্মোচন করে দেখা হল। এবারে সেই প্রেক্ষাপটে দরিদ্র দেশের উন্নয়ন-গতি বেগবান করার সমস্যাগুলো তুলে ধরা যাক।
এই সমস্যার উদ্ভাবনে পাঁচটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মুখ্য এই প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

(১) দরিদ্র দেশের বৈশিষ্ট্য কি কি?
(২) দরিদ্র দেশের উন্নয়ন পথে কি কি অন্তরায় বিদ্যমান?
(৩) উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনের নিমিত্তে সাধারণতঃ কি কি করা প্রয়োজন?
(৪) আভ্যন্তরীণ নীতিমালা উপকারে আসতে পারে কি?
(৫) আন্তর্জাতিক নীতি-প্রণালী দরিদ্র দেশের উন্নয়ন-গতি ত্বরান্বিত করায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে কি?

বর্তমান পর্বে পর্যায়ক্রমে উপরোক্ত প্রশ্নমালার মোকাবিলা করা হবে। মুখ্য এই সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে পাওয়া বড্ড জরুরী। কেন না, উন্নয়ন-অগ্রগতির সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা। তার সমাধান অবশ্যই চাই। অগ্রগতি দেশের জন্য বয়ে আনে মঙ্গল-ডালি। কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও বটে।

বক্ষমান পর্বে সমস্যাবলী নিরসনের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু, এই সমাধান যেন চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত না হয়। সব দেশ সম্পর্কে শেষ কথা বলে দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। আমাদের বিশ্লেষণকে খুব বেশী করে হলেও, ইঙ্গিতধর্মী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ইচ্ছে মোটামুটি একটা কাঠামো প্রদান করা। বিস্তৃত এই কাঠামোর আবর্তে বিশেষ বিশেষ উন্নয়ন-সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিশ্লেষণ সাধারণ্যে সীমাবদ্ধ।

এর উর্ধ্বে যাওয়া কি দেশভিত্তিক কোন সমাধান দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে দেশে পট ও পরিবেশ ভিন্নতর। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত বৈচিত্র্যময়। মানুষ আলাদা, চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। কাজেই, এক ব্যবস্থাপত্রে সবার ব্যারাম সারার নয়। এক ঔষধ সবার জন্য কার্যকরী হতে পারে না। অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা ও কাম্যতার আঙ্গিকে প্রতি দেশের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতে হবে। তবে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তথা কাঠামো এক হতে আপত্তি নেই। আমরা এই বৃহত্তর নক্সাকে চিত্রিত করায় সচেষ্ট হব। অঙ্কিত এই চিত্রে হেরফের ঘটিয়ে দেশওয়ারী সমাধান ঠিক করে নিতে হবে। সমস্যার তারতম্য ভেদে প্রাপ্ত এই ব্যবস্থাপত্র হয়ত সাধারণ কাঠামোতে বিদ্যমান দুর্বলতাকেও সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দরিদ্র দেশের মূল বৈশিষ্ট্য

(১)

প্রথমে 'দরিদ্র দেশ' বলতে কি বুঝায় এই সম্পর্কে একটু ধারণা নিলে মন্দ হয় না। গরীব দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট কি কি ? এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বই-পত্তরও লেখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাহলে আর এনিয়ে মাথা-ব্যথার দরকার কি? উত্তরে বলব, এমন কোন বিশেষ দেশ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবেন না যাকে নাকি গরীব দেশের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করা যায়। তাদের মধ্যে পার্থক্য বহুতর, মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। তবু সাধারণভাবে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে বৈকি! দরিদ্র দেশে মোটামুটিভাবে ৬টি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে উল্লেখ করা যায়। গরীব দেশ (ক) কাঁচামাল উৎপাদক (Primery Producing), (খ) জন-সংখ্যার চাপে জর্জরিত, (গ) এতে অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান, (ঘ) অর্থনৈতিক বিবেচনায় তার জনসাধারণ পশ্চাৎপদ (economically backward Population), (ঙ) তার মূলধন অপর্যাপ্ত এবং (চ) সে মাত্রাতিরিক্ত বহির্বাণিজ্য-প্রভাবে ভোগে।

এই সকল বৈশিষ্ট্য সব দেশে সমানভাবে বিদ্যমান এমন নয়, বা এগুলোই একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাও নয়। তবে সাধারণভাবে এগুলোকে 'প্রতিরূপ' হিসাবে চিহ্নিত করা চলে এবং এরা সবাই একত্রে মিলে একটা 'ধারণা' প্রদান করে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কিনা, কাঁচামাল উৎপাদন ও জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। পরবর্তী অধ্যায়ে বাকীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) কাঁচামাল-উৎপাদন

গরীব দেশে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম। অধিকাংশ শ্রম কৃষিকাজে নিয়োজিত। জাতীয় 'আয়ের

অধিকাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। তার থেকে কাঁচামাল উৎপাদনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৩'১ ও ১৩'২ নম্বর সারণী (table) গরীব দেশে কৃষি কাজের আপেক্ষিক গুরুত্বের সাধারণ ছাঁচ নির্দেশ করে। এশিয়া, আফ্রিকা, ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ থেকে চার-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে,

সারণী ১৩'১ কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত লোক-সংখ্যা

দেশ	অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে নিয়োজিত মোট পুরুষ-লোক সংখ্যা	কৃষি	শিল্প
উন্নত দেশসমূহ:	(হাজার হিসাবে)	(হাজার হিসাবে)	(হাজার হিসাবে)
অষ্ট্রেলিয়া (১৯৪৭)	২,৪৭৮	৪৭৪	৬১৭
কানাডা (১৯৫১)	৪.১৩১	৯৭০	১,০৮৬
ডেনমার্ক (১৯৫৩)	১,৩৮৯	৩৮১	৩৯১
নেদারল্যাণ্ডস্ (১৯৪৭)	২,৯২৩	৫৭৮	৫,৮২৩
নিউজিল্যাণ্ড (১৯৫১)	৫৬৯	১২৬	১৩৬
যুক্তরাজ্য (১৯৫১)	১৫,৬৬২	৯৯৮	৫,৮১৩
যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫০)	৪৩,৫৪২	৬,৭২০	১২,২১৫
অনুন্নত দেশসমূহ:			
বলিভিয়া (১৯৫০)	৫১২	২৭৫	৬৫
সিংহল (১৯৪৬))	২,০৪২	১,০৩২	২০১
চিলি (১৯৫২)	১.৫৫১	৫৯৫	২৪৭
কষ্টারিকা (১৯৫০)	২৩০	১৪৪	২৩
মিশর (১৯৪৭)	৭,০৫৮	৩,৬৫৬	৬০৯
এলসালভাডর (১৯৫০)	৫৪৫	৩৯৯	৫০
হাইতি (১৯৫১)	৮৭৩	৭৭১	৩৭
ভারত (১৯৫১)	৮৫,৪৬১	৫৯,৩১৩	৮,০৭৮
মালয় (১৯৪৭)	১,৪৬৩	৮৮৯	১২৫
মেক্সিকো (১৯৫০)	৭,২০৮	৪,৮২৪	৯৭৩

নিকারাগোয়া (১৯৫০)	২৮৪	২১৮	২৭
পাকিস্তান (১৯৫১)	২১,১০০	১৬,০৯৬	১,৩০৬
পোয়েরটোরিকো (১৯৫০)	৪৫৯	২১৬	৪৯
থাইল্যাণ্ড (১৯৪৭)	১,৪৬৩	৮৮৯	১২৫
ভেনেজুয়েলা (১৯৫০)	১,৪০৩	৬৬৯	১২৪

উৎস: জাতিসংঘ, বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা ১৯৫৫, নিউইয়র্ক, ১৯৫৫ সারণী-৬

লাতিন-আমেরিকান দেশসমূহে তা দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ লোক নিয়োজিত রাখে। পৃথিবীর মোট, লোক-সংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ অর্থাৎ কিনা, আনুমানিক ১৩০ কোটি লোক জীবিকার জন্য কৃষিকাজে নির্ভরশীল। তার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে। মাত্র ১৬ কোটি কেবল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসী।

সারণী ১৩.২ শতকরা হারে শিল্প-উদ্ভূত নীট দেশীয় উৎপাদন
Industrial Origin of Net Domestic Product, Percentage Distribution

দেশ	কৃষি বন ও মৎস্য	শিল্প
উন্নত দেশসমূহ :		
কানাডা (১৯৫৪)	৯	২৯
ডেনমার্ক (১৯৫৪)	১৯	২৯
পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪)	১১	৪৯
ন্যাদারল্যাণ্ডস (১৯৫৪)	১৩	৩৬
যুক্তরাজ্য (১৯৫৪)	৫	৩৮
যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৪)	৬	৩০
অনুন্নত দেশসমূহ :		
বেলজিয়ান কঙ্গো (১৯৫৩)	৩৪	৬
বার্মা (১৯৫৪)	৪৪	১০
চীন (১৯৫৩)	৩৮	১৬
চিলি (১৯৫২)	১৭	২১

কলাম্বিয়া (১৯৫৩)	৪০	১৭
ইকুয়েডর (১৯৫০)	৩৯	১৬
এলসালভাডর (১৯৫০)	৫৩	৮
মিশর (১৯৫৩)	৩২	৮
গ্রীস (১৯৫৩)	৩৮	১৯
গোয়াতেমালা (১৯৪৯)	৪৬	২০
হণ্ডুরাস (১৯৫২)	৫৪	১০
ইন্দোনেশিয়া (১৯৫২)	৫৬	৮
কেনিয়া (১৯৫৩)	৪১	১২
নিকারাগোয়া (১৯৫০)	৪০	১৪
নাইজেরিয়া (১৯৫২-৫৩)	৬৬	২
পাকিস্তান (১৯৫৩)	৫৯	৮
প্যারাগুয়ে (১৯৫৩)	৫০	১৯
থাইল্যাণ্ড (১৯৫২)	৪৯	১১
তুরস্ক (১৯৫৩)	৫২	১০

উৎস : জাতিসংঘ, বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা, ১৯৫৫, নিউইয়র্ক ১৯৫৫, সারণী ১৫৮, জাতিসংঘ মাসিক পরিসংখ্যান জ্ঞাপনপত্র (বুলেটিন), মার্চ, ১৯৫৬ XVII-XXI

কতকগুলো দরিদ্র দেশ আবার অকৃষিজাত কাঁচামাল অর্থাৎ খনিজ্য-দ্রব্য উৎপাদনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পৃথিবীর অধিকাংশ টিন এলুমিনিয়াম, তামা, ক্ষার, ম্যাংগানীজ, হীরা, ক্রোমিয়াম, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি এইসকল দেশে উৎপাদিত হয়। তবে মজার ব্যাপার হল এই যে, ছোট-খাটো খনিগুলো হয়ত দেশীয় মালিকানায় আছে, কিন্তু বৃহৎ খনিসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা শিল্পোন্নত দেশসমূহেরই আয়ত্তাধীন। অত টাকা খাটানো গরীব দেশের কাজ নয়। তেমনি বৃহত্তর ঝুঁকি নেওয়ার মত লোকেরও যথেষ্ট অভাব। এদিকে খনিজ-কারখানা চালাবার মত প্রযুক্তিক ও প্রশাসনিক বিদ্যা সম্পন্ন লোকই বা কোথায় পাওয়া যায়। অন্যদিকে, খনিজদ্রব্য সমূহের প্রধানতম ভোক্তা হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশসমূহ। শিল্পকারখানার স্বল্পতার জন্য এই সকল খনিজদ্রব্য নিজেদের কাজে লাগাবার ক্ষমতা দরিদ্র দেশের নেই। সুতরাং অকৃষিজাত কাঁচামাল দরিদ্র দেশসমূহে উৎপাদিত হলেও তার অধিকাংশই উন্নত দেশ সমূহের ভোগে লাগে। ফলে খনিজশিল্প উন্নতির

'প্রদর্শন প্রভাব' (spread effect) তেমন সরাসরিভাবে অন্যকোন শিল্পক্ষেত্রে পড়ে না। অর্থাৎ খনিজশিল্প উন্নতির সাথে পা মিলিয়ে দেশের অন্যান্য শিল্প যেমন এগিয়ে যেতে পারে না, তেমনি খনিজশিল্প ও নিজের উন্নতির দ্বারা অন্যান্য শিল্পকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। অবশ্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তার জুড়ি নেই।

দরিদ্র দেশগুলোতে কাঁচামাল উৎপাদনের অবশ্য যথেষ্ট কারণও রয়েছে। অবস্থা যেমন তাতে শ্রম-প্রাধান্য অথবা ভূমি-প্রাধান্য (labour or land intensive) শিল্পে উন্নতি না ঘটিয়ে গত্যন্তরও নাই। উপকরণ সরবরাহ পরিস্থিতি যা তাতে কাঁচামাল উৎপাদন ক্ষেত্রে যেমন বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়; তেমন তাদের উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত সহজ বলে প্রমাণিত হয়। ফলে কাঁচামাল উৎপাদনেই সবাকার সমাবেশ ঘটে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমাবেশ দুটো কি তিনটি জিনিস উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন সিংহলের কথা ধরুন। সেখানে চা, রবার ও নারকেল উৎপাদনেই সবার দৃষ্টি। তেমনি ইন্দোনেশিয়ার রবার, টিন ও তেল উৎপাদনের প্রাধান্য। মালয়ে রবার ও টিন উৎপাদনের ছড়াছড়ি। পাকিস্তান তুলা উৎপাদনে বিখ্যাত। এমন কতকগুলো দেশও রয়েছে যেখানে কেবল একটা মাত্র দ্রব্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

দরিদ্র দেশসমূহে কিছু কিছু শিল্প-সংস্থাও রয়েছে বটে। তবে তাদের অধিকাংশই কৃষি-দ্রব্য সঞ্জাত শিল্প। সাধারণ উৎপাদন-প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কৃষিজাত-দ্রব্যকে পরিবর্তিত করাতেই অধিকাংশ শিল্প সংস্থা নিয়োজিত থাকে। কিছু কিছু আবার কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ অবশ্য কাপড় তৈরী ইত্যাদি সহজ ও পরিচিত ছোটখাট শিল্প সংস্থাও গড়ে তোলে বৈকি! তবে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে তাদের গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই সাধারণ ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পে চাকুরীরত। দুই-চারটা দরিদ্র দেশ হয়ত শিল্পক্ষেত্রে বেশ উন্নত। কিন্তু, সাধারণভাবে তারা সবাই শিল্পে অনুন্নত। কর্মোপযোগী মোট লোকসংখ্যার একটা নাম মাত্র অংশ শিল্পকাজেই নিয়োজিত থাকে। বাকী সবাই কৃষি বা কৃষিজাত কাজে নিয়োজিত। ১৩·১ নম্বর সারণী বিশ্লেষণ করে দেখলে এই সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এক ব্যাপারে দরিদ্র দেশগুলোয় বেশ একটা মিল রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে ভূমির গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে

গিয়েছে। দরিদ্র দেশসমূহে কিন্তু তা ঘটেনি। ভূমির আপেক্ষিক গুরুত্ব ঐ সকল দেশে মোটামুটিভাবে বজায় রয়েছে।

সুতরাং ভূমি-ব্যবস্থার দিকটা খতিয়ে দেখা যাক। দরিদ্র দেশসমূহের সমস্যা অনুধাবনে তা হয়ত বিশেষ সহায়ক হতে পারে। ভূমি-ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপ। মালিকানা কোথায়ওবা গোত্রের হাতে, কোথায়ওবা তা গ্রামভিত্তিক, অন্যত্র হয়ত তা পরিবারে সমর্পিত। আবার অন্য কোথাও হয়ত তা ব্যক্তিতে বর্তিত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কোন দেশে হয়ত এই সব পদ্ধতিরই জগাখিচুড়ি একটা কিছু বিদ্যমান, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে। অন্যদিকে গ্রীস, তুরস্ক ও সাইপ্রাসের কথা ধরুন। এই সকল দেশে হল—যোগ্য জমি (arable land) সাধারণতঃ ব্যক্তির মালি-কানায়, কিন্তু চারণক্ষেত্রগুলো সমাজের মালিকানায়। এদিকে বহুদেশে জমির মালিক মাত্র কয়েকজন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল ভূ-স্বামী কৃষিকাজ থেকে দূরে থাকে। কোন কোন দেশে অবশ্য কৃষিজীবীরাই জমির মালিক। তবে অধিকাংশ দেশে ভূমি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রায়তি-স্বত্ব। উদাহরণ হিসাবে সিরিয়ার কথা ধরা যাক। সিরিয়ায় অর্ধেকেরও বেশী জমি বড় বড় ভূ-স্বামীদের হাতে। তাদের থেকে বর্গা নিয়ে কৃষকরা চাষ-বাস করে। ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত প্রায় সব জমি জমিদারদের করায়ত্তে। কৃষককুল তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষাবাদ করে। কিন্তু এই জমি সরাসরি পাওয়ার জো নেই। যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে মধ্যবর্তী বহুলোক। বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বিরাজমান এবং সবায় লাভাংশের ভাগীদার।[১] বর্গাপদ্ধতি বিদ্যমান দেশে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত এবং এক খণ্ড থেকে অন্য খণ্ড দূরে দূরে অবস্থিত। উত্তরাধিকার আইন আবার এই প্রথাকে আরো তীব্রতর করে দেয়। কোন কোন দেশে দেখা যায় যে, উত্তরাধিকার আইন-পদ্ধতি পুত্রদেরকে জমি বণ্টন করে দেয় এবং মেয়েদেরকে যৌতুক প্রদান করে। ফলে জমিবণ্টন প্রথা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং খণ্ড-বিখণ্ড ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। অনেক জায়গায় আবার বণ্টন-প্রণালী দেশাচার তথা প্রথামাফিক হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক ধরনের। ফলে ভূ-স্বামী

---

১. দেখুন United Nations Department of Economic Affairs, Land Reform. New York, 1951,14.

ও প্রজার মধ্যকার অধিকার ও দায় কোন রীতিসিদ্ধ নিয়ম মেনে চলে না। ন্যায়-নীতি বহির্ভূত যার যার ইচ্ছামাফিক গতিতে এগোয়।

দরিদ্র দেশসমূহে কৃষি-ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একদিকে বেশ কিছুসংখ্যক বড় বড় খামার বিদ্যমান, অন্যদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ইউনিট অবস্থিত। এই চরম পরিস্থিতি চাষাবাদ ব্যবস্থায় ভিন্নতর অবস্থা সৃষ্টি করে। অন্যকথায়, চাষাবাদ পদ্ধতিতেও এই বৈপরীত্য প্রতিফলিত হয়। এই সকল দেশসমূহে বড় আকারের চাষাবাদ (Plantation farming) যেমন দেখা যায়, তেমনি ক্ষুদ্র আকারের চাষ-বাসেরও (Peasant farming) ছড়াছড়ি, ছোট্ট ছোট্ট খামার। দরিদ্র কৃষক এই সকল ছোট্ট খামারে চাষবাস করে কোন রকমে জীবনধারণ করে। প্রায় অধিকাংশ দরিদ্র দেশে কৃষি-ব্যবস্থার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ (The Carribbean) ও মিসরে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান।

কতকগুলো বিশেষক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আকারের চাষবাসের প্রাধান্য দেখা যায়। যে সমস্ত জিনিস উৎপাদনে ঘোরপ্যাচ নেই, তেমনি বাজারী-করণে তেমন কোন অদল-বদল (Processing) প্রয়োজন হয় না অথবা উৎপাদনে বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, সে-সকল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার চাষ-বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের পক্ষে তেমন মূলধন যোগানো সম্ভব নয়। তেমনি প্রযুক্তিক বা প্রকৌশলিক কোন বিদ্যাও তার আয়ত্তে নেই। সুতরাং, ছোটখাটভাবে সাদামাটা চাষবাস করাই তার পক্ষে সহজ; সুতরাং সে এই ব্যবস্থায় সুখী থাকে এবং তার পরিবর্ধন ও পরিপুষণে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, খাওয়া-পরার উর্ধ্বে তার যেমন কোন চাহিদা নেই, তেমনি তার উর্ধ্বে কিছু যোগার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, জীবিকা নির্বাহে প্রয়োজন (subsistence farming) চাষবাস করতে পারলেই গ্রাম্য সাধারণ কৃষক খুশী। কাজেই এই জাতীয় চাষবাস ক্ষুদ্রাকার চাষাবাস পদ্ধতির ছত্রচ্ছায়ায় গড়িয়ে উঠে। গ্রাম্য সরল চাষী। নামমাত্র তার চাহিদা। গ্রাম্য পরিমণ্ডলের বাইরে তার দৃষ্টি বিস্তৃত নয়। এই সীমাবদ্ধ পরিবেশে তার আদান-প্রদান। তার মধ্যেই তার চাহিদার যেমন যোগান হয়, তেমনি সেও অন্যের চাহিদা মিটাতে সাহায্য করে। এই ক্ষুদ্র পরিবৃত্তে যা উৎপাদিত হয় তার সবই পরিবার অথবা গ্রামবাসীর ভোগে লাগে। বাইরে পাঠাবার যেমন

প্রয়োজন পড়ে না, তেমনি বাইরে থেকে কিছু আনারও প্রেরণা বিদ্যমান নয়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ ছোটখাট, চাষবাসই পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে। ফলে, দরিদ্র দেশসমূহে অধিকাংশ চাষবাসই এই ব্যাবস্থাধীন।

অর্থকরী-ফসলের (Cash-crops) বেলায় অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরূপ। এক্ষেত্রে দুই-তিন রকম ব্যবস্থাই বিদ্যমান। বড় বড় মহাল (Plantation farming) যেমন রয়েছে, তেমনি উপরোক্ত পদ্ধতিতেও কিছু কিছু চাষবাস হয়। আবার এই উভয়ের সংমিশ্রণও কোথাও কোথায়ও দেখা যায়।

রপ্তানিযোগ্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে রবার, শিশাল, তুলা, চা, কফি, কোকো, চিনি, নারকেল, চাল, চীনাবাদাম, পাট ও কলা প্রধান। তন্মধ্যে চা, কফি, চিনি ও শিশাল সাধারণতঃ বড় বড় খামারে উৎপাদিত হয়। চীনাবাদাম, চাল ও পাট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারে উৎপাদিত হয়। অবশ্য সাধারণভাবে বলতে গেলে সব কৃষিজাত দ্রব্যই মোটামুটিভাবে মিশ্রচাষবাস পদ্ধতিতেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। বড় আকারের চাষবাস আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের চাষবাসের জগাখিচুড়ি সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। কৃষকরা সাধারণতঃ ছোট আকারের চাষবাসই করে থাকে। তার মূলধন নেহায়েত নগণ্য। জমির পরিমাণ সামান্য। নগদ টাকা-পয়সার অভাব। গুদাম বলতে তেমন কিছু নেই। তাছাড়া তার জন্য বাজারও সীমিত। ফলে, সাধারণ ছোট-খাট চাষবাসেই সে অধিক উৎসাহী। অবশ্য তার পক্ষে হয়ত উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনও সম্ভব হয় না।

বড় আকারে চাষবাস করায় ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। বৃহদাকার পরিচালন-ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। তা আবার কেন্দ্রীয় পরিচালন রীতি-নীতি মাফিক হওয়া দরকার হয়। উৎপাদন মাত্রা বড়সড় হতে হয়। প্রচুর লোক নিয়োগ করতে হয়। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে একটা ফসল চাষবাস করা যায়—এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকলে এই জাতীয় চাষাবাদ সম্ভব হয়। একটা ফসল ফলাতে হবে। অথচ তার চাহিদা প্রচুর পরিমাণ। বিরাট সম্ভাবনাময় বাজার বিদ্যমান রয়েছে। বড় আকারে চাষাবাদ করলে পরে বেশ ফায়দা উঠানো যেতে পারে। কেবল এই অবস্থায় খামারী চাষাবাস সম্ভব। ফসলটা ফলাতে বেশ সময় লাগে, তার জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা খাটানো প্রয়োজন। তাছাড়া, ফসলটা বাজারীকরণে

বেশ কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। মোদ্দা কথায়, যে ফসল ফলাতে উঁচু দরের চাষাবাদ প্রয়োজন হয়, উৎপাদন আঙ্গিক উন্নত হতে হয়, বাজার-পরিস্থিতি বেশ সম্ভাবনাময় এবং ফসলটা চাহিদা ক্ষেত্রে পাঠাবার উপযুক্ত বণ্টন-পদ্ধতি একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই মহালী চাষবাস সম্ভব হয়ে থাকে।

বড় আবাদী চলবে কি ছোট্ট আবাদী চলবে তা কতকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে লোকসংখ্যার ঘনত্ব, বড় ও ছোট সংস্থায় উৎপাদন-খরচার আপেক্ষিক ন্যূনতা, মূলধন চাহনী (capital requirement) ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার (Processing) খরচের মাত্রা প্রধান। তাদের উপর নির্ভর করে আবাদীর ধরন-ধারণ ও আকার-প্রকার নির্ণীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামী (Plantation owner) কৃষককে জমি বর্গা (Sublet) দিয়ে দেয়, কৃষক ক্ষেত্রস্বামীর তত্ত্বাবধানে থেকে জমি চাষবাস করে ও বন্দোবস্ত অনুযায়ী ফসলাদি তার হাতে উঠিয়ে দেয়।

ভূমি ফসল অনুযায়ী যেমন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি একই ফসলের জন্য হয়ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্নতরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন মালয় ও সুমাত্রায় ক্ষেত্রস্বামী তেল তৈরীর পাম্ (Palm) গাছের চাষাবাদ করে অথচ নাইজিরিয়ায় ছোট ছোট কৃষকরা তার চাষাবাদ করে। পশ্চিম আফ্রিকায় ছোট ছোট কৃষকের হাতে কোকো তৈরী হয়। অথচ সিংহল ও একুয়েডর পাম্‌কর (Palm-Planter) তার চাষাবাদ করে আর ত্রিনিদাদে এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। অবশ্য এই সব বৈসাদৃশ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জলবায়ুর তারতম্য, আঙ্গিকগত প্রভেদ, শ্রমসরবরাহ পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি সরকারী নীতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পন্থার জন্ম দেয় এবং এই সবের সাথে খাপ খাইয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া রূপলাভ করে। সুতরাং দেশে দেশে ভেদাভেদ হওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অবশ্য খামারী আবাদের মাত্রা কমে এসেছে। তবে গ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে (Sub-tropical) এখনো তা বেশ জাঁকিয়ে আছে। কিউবা, পোর্টেরিকো, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, বৃটিশ ও পর্তুগীজ আফ্রিকায় আঁখ বড় আবাদী খামারে উৎপাদিত হয়। তেমনি তামাক মেক্সিকো এবং বৃটিশ ও পর্তুগীজ আফ্রিকায় 'তামাককর'দের (tobacco-planter) হাতে উৎপন্ন হয়। একইভাবে কলা উৎপন্ন

হয় মধ্য সেন্ট্রাল আমেরিকায়। ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া ও টাঙ্গানিকা উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে কফি উৎপন্ন করে। ভারতে আনারস ও রবার বড় আবাদী খামারে উৎপাদিত হয়।

কাঁচামাল উৎপাদন সম্পর্কে সর্বশেষ কথা, বস্তুতঃ প্রধান কথা এবারে বলা দরকার। সে হচ্ছে দরিদ্র দেশসমূহে কৃষিকার্যে উৎপাদন ক্ষমতার নিম্নমান। এই সকল দেশে কৃষির প্রজননক্ষমতা বেশ নীচের দিকে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তা নেহায়েতই নগণ্য। একর হিসাবে যেমন উৎপাদন কম, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ তাবও যথেষ্ট নীচে। এমনিতেই কৃষিক্ষেত্রে লোকের চাপ বেশী। অথচ ফসল ফলে কম। স্বাভাবিকভাবে মাথাপিছু আয় ধনীদেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে একজন কৃষক দূরপ্রাচ্য, নিকট-প্রাচ্য বা লাতিন আমেরিকান একজন কৃষকের তুলনায় প্রায় ১০ থেকে ২০ গুণ বেশী ফসল উৎপন্ন করতে পারে।[২] উত্তর আমেরিকায় কৃষক প্রতি উৎপাদন প্রায় ২½ টন। অথচ এশিয়ায় তা ¼ টনেরও কম এবং আফ্রিকায় মাত্র ½ টন[৩]। যদি এই উৎপাদন আমেরিকার পর্যায়ে তোলা যায় তাহলে কৃষিজীবীদের জীবন ধারণের মান অনেক উন্নত হতে পারে।

দরিদ্রদেশে কৃষিক্ষেত্রে এই স্বল্প-ফলনের জন্য অনেক কারণ দায়ী বটে। জমি-শ্রমের অনুপাতে নিম্ন, অনুর্বর মাটি, ভূমি ব্যবহারে অপটুতা, অদক্ষ শ্রমিক, মূলধন-অপর্যাপ্ততা, মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-প্রক্রিয়া, উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অপরিমিত জ্ঞান ও উৎপাদন-প্রথা উদ্ভাবনে অপক্কতা তন্মধ্যে প্রধান।

ফলন কম হওয়ার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মাথাপিছু জমির-পরিমাণে ন্যূনতা।[৪] মাথাপিছু বৃহদাকার কৃষি-খামার ও শ্রম-উৎপাদন বেশী হওয়ায় একটা সহ-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অথচ দরিদ্র দেশসমূহে মাথাপিছু জমির পরিমাণ নেহায়েতই নগণ্য। ১৩.৩ সারণী থেকে এই উক্তির সারমর্ম পাওয়া যায়। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া

---

২. জাতিপুঞ্জ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগ, বিশ্ব-জনসংখ্যা সভায় আলোচ্য বিষয়াবলী, ১৯৫৪ সাল, নিউইয়র্ক, ১৯৫৫ ; ১০৭ পৃষ্ঠা।

৩. জাতিপুঞ্জ, মাসিক খাদ্য ও কৃষি পরিসংখ্যান বুলেটিন, II, সংখ্যা ৯.

৪. অবশ্য 'মাথাপিছু জমির পরিমাণ' কথাটা তেমন স্বচ্ছ নয়। উর্বরতার দিক থেকে জমিতে জমিতে পার্থক্য রয়েছে। জমির পরিমাণ দিয়ে এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয় না।

প্রভৃতি পাতলা বসতিসম্পন্ন দেশে মাথাপিছু কর্ষিত ভূমির পরিমাণ অনেক অথচ, মিসর, হাইতি, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, সিংহল ও ভারত প্রভৃতি দেশে তা এক একরেরও কম।

সারণী ১৩.৩ ভূমি-জনসংখ্যা সম্পর্ক
(Relation of Land To Population)

দেশ	বর্ষ	মাথা পিছু কর্ষিত জমি (নীট একর হিসাবে)
আফগানিস্তান	১৯৪৭	০.১০
ব্রাজিল	১৯৪৭	০.৩৭
বার্মা	১৯৪৭	০.৪৭
সিংহল	১৯৫০	০.১৭
চিলি	১৯৪৬	১.০১
কলম্বিয়া	১৯৪৬	০.১৯
কিউবা	১৯৪৬	০.৩৭
মিসর	১৯৪৮	০.১২
এলসালভাডর	১৯৪৭	০.২০
হাইতি	১৯৪৭	০.১২
ভারত	১৯৪৭	০.২৯
ইন্দোনেশিয়া	১৯৪৭	০.১৫
কেনিয়া	১৯৪৮	০.২৯
কোরিয়া	১৯৪৮	০.১৫
লেবানন	১৯৪৯	০.১৭
মালয়	১৯৪৮	০.৪২
নাইজেরিয়া	১৯৪৭	০.২১
পাকিস্তান	১৯৪৮	০.২৮
পেরু	১৯৪৮	০.১৯

সূত্র : জাতিপুঞ্জ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগ, ভূমি-সংস্কার, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন।

মাথাপিছু জমির নিম্ন-অনুপাত হয়ত কতকটা সারিয়ে তোলা যেত যদি তাতে প্রচুর পরিমাণে পুঁজি খাটানো সম্ভব হত, উৎপাদন-প্রণালী উন্নততর করা যেত, কি উৎপাদন-ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন সম্ভব হত। কিন্তু, দুঃখের ব্যাপার এই যে, এই সকল ক্ষেত্রেও দরিদ্র দেশ পিছিয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেকটি দেশ পুঁজি-স্বল্পতায় ভোগে। ফলে, দরিদ্র কৃষককে মূলধন পাওয়ার নিমিত্তে অর্থনীতির অন্যান্য শাখার সাথে রীতিমত প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এবং প্রায়শঃ প্রতিযোগিতায় তার পরাজয় ঘটে। কেননা, অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় যেমন শিল্প কি ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি অপেক্ষা অধিক ফলনশীল। ফলে, দরিদ্র দেশে নামমাত্র যে মূলধন পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই এই সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে যায়। কৃষির ভাগ্যে তেমন একটা পড়ে না। অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্রে শ্রম-প্রাচুর্য বিদ্যমান অথচ মজুরীব পরিমাণ নামমাত্র। কাজেই, শ্রম কম খাটিয়ে অধিক পুঁজি নিযোগের স্পৃহাও তেমন বিদ্যমান নয়।

কৃষিক্ষেত্রে ফলন-স্বল্পতার অন্যতম প্রধান কারণ মান্ধাতার আমলের চাষবাস-পদ্ধতি ও উৎপাদন-আঙ্গিক। দরিদ্র দেশ যুগ যুগ ধরে পিতৃ-পিতামহের সেই সনাতনী চাষবাস প্রণালী আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। লক্ষণীয়, তেমন কোন উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ক্ষুদ্রাকার চাষাবাদ বিদ্যমান দেশসমূহে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটেনি। সেই পুরানো আমলের উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিরন্তর চলে আসছে। অধিকাংশ কৃষক অজ্ঞ, উদ্ভিদ-পুষ্টি সম্পর্কে তার ধারণা সীমিত। শস্য-আবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব। রাসায়নিক সার ব্যবহারে পরান্মুখতা বিরাজমান। ফলে নামমাত্র হারে সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ধরুন ১৯৫৪-৫৫ সালের কথা। এই বৎসর পৃথিবীর সর্বমোট সার ব্যহারের ৪৫ ভাগ ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় ৩২ ভাগ। লাতিন আমেরিকায় ৪ ভাগ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে ৩ ভাগ। দূরপ্রাচ্য ব্যবহার করে ১৬ ভাগ। আব আফ্রিকায় ব্যবহৃত হয় এক ভাগেরও কম।[৫]

---

৫. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Yearbook of Food and Agricultural Statistics, Rome, 1956, 213.

কৃষিক্ষেত্রে শ্রম ও পশু-প্রাধান্য বিদ্যমান। চাষ-বাস চলে জনমজুর ও পশুশক্তি নিয়োগ করে। সেই কবে শুরু হয়ে আজও তা অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যাক। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীতে ব্যবহৃত মোট ট্রাক্টর সংখ্যার প্রায় ৬৮ ভাগ উত্তর আমেরিকায় বিদ্যমান ছিল। ইউরোপে ছিল ২৩ ভাগ। লাতিন আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় ৩ ভাগ। নিকট ও দূরপ্রাচ্য কাজে লাগায় ১ ভাগ মাত্র আর আফ্রিকায় ব্যবহৃত হয় ২ ভাগ।[৬] অথচ ট্রাক্টর প্রতি জমির হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাক্টর পিছু মাত্র ১১৯ একর জমি ছিল। ক্যানাডায় ছিল তা ২৪৭ একর। অন্যদিকে গুয়াতেমালায় এর পরিমাণ ২৪,৭১০ একর, ভারতে ২০,৩৯৮ একর আর ইন্দোনেশিয়ায় তা ছিল সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ কিনা ট্রাক্টর প্রতি ২৭১,৮১০ একর।[৭]

ভূমি-ব্যাবস্থা উৎপাদন-পদ্ধতির পরিপন্থী হতে পারে। বহুদেশে ভূমি-ব্যবস্থা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহায়ক না হয়ে বরং বাধা হিসাবে দেখা দেয়। দুইভাবে তা ঘটতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, কৃষি জমি খণ্ড-বিখণ্ড ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পরে। তা মাত্রা ছাড়িয়ে মাত্রাহীন পর্যায়ে চলে যেতে দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাবার উদ্যম বিনষ্ট হয়ে যায়।

কৃষিজমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। তা আবার গ্রামের অথবা মাঠের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত। তাব ফলে কৃষির ফলন ব্যাহত হয়, শ্রম নষ্ট হয় এবং পরিণামে কৃষককে দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। কৃষি জমির এই অবস্থার জন্য বিশেষ কতকগুলো কারণ বিদ্যমান রয়েছে। জমি বন্টনে বৈষম্য, উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ও কৃষিক্ষেত্রে জন-সংখ্যাধিক্য তন্মধ্যে অন্যতম। এই বেখাপ্পা পরিস্থিতির জন্য জমির উন্নতি সাধন অসম্ভব হয়ে উঠে। শ্রম ও পশু শক্তির সর্বোচ্চ ব্যাবহার সম্ভব হয় না। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলে না। শস্য-আবর্তন ঘটানো কষ্টদায়ক হয়। এক জমি থেকে অন্য জমিতে টানাহেচড়ায় অযথা সময় নষ্ট হয়, অথচ খরচ বাড়ে।

---

৬. পূর্বে উল্লেখিত খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কীয় বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা দেখুন, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২২।

৭. W. S. Woytinsky ও E. S. Woytinsky প্রণীত এবং Twentieth Century Fund, নিউইয়র্ক কর্তৃক ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত বিশ্ব-সংখ্যা ও উৎপাদন নামক বইখানা দেখুন, পৃষ্ঠা ৫১৫-৫১৭।

অন্যদিকে কিছু দিন পর পর ভাগ-বাটোয়ারা হয় বলে জমিতে তেমন কোন স্থায়ী উন্নতি সাধনে কেউ মনোযোগী হয় না। তার উপর রয়েছে মড়ার উপর খাড়ার গা—মালিকানা সম্পর্কে স্থিরতা নেই, স্বল্পকালীন বর্গা-পত্তনি, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে কৃষককে উঠিয়ে দেয়া, শহরে বাসকারী জমিদার অথচ খাজনা-বাজনায় যথেষ্ট দাবী এবং সর্বোপরি কৃষকের জীবনব্যাপী দেনা। এই সবের ধাক্কায় ও ধান্ধায় পড়ে কৃষকের পক্ষে জমিতে উন্নতি সাধনের চিন্তা প্রগাঢ়তা লাভ করতে পারে না।

(খ) জনসংখ্যাধিক্য :

কাঁচামাল উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবারে তার দোসর জনসংখ্যাধিক্যের দিকে নজর দেয়া যাক। জনসংখ্যার চাপ তিন আকারে প্রকাশ পায়। (১) বহু দরিদ্রদেশে গ্রামাঞ্চলে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান; (২) জন্মহার উচ্চ বলে সাবালেগ লোকদের মাথাপিছু নির্ভরশীল সন্তান সংখ্যা অনেক বেশী এবং (৩) জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কম বলে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়।

এবারে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে খতিয়ে দেখা যাক। আদর্শ লোকসংখ্যা (optimum population) বলে যে কথাটা ধনবিজ্ঞান তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যায় তার সাথে বিশেষ কোন দারিদ্র্য দেশের লোকসংখ্যাকে জড়িয়ে দেখতে যাওয়া হয়ত ঠিক হবে না। কেননা উৎপাদন-উপকরণ সরবরাহ প্রযুক্তিক বিদ্যা ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল, তার ফলে 'সর্বোচ্চ লোকসংখ্যা' ধারণা পরিস্থিতি বোঝাতে তেমন সক্ষম নয়।[৮]

উন্নয়নক্ষেত্রে লোকসংখ্যা ও তার অবয়ব (structure) আলোচনা করা যাক। উন্নয়নক্ষেত্রে লোকসংখ্যা একটা সহায়কারী উপকরণ। অবশ্য

---

৮. 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা' (over population) কথাটা আদর্শ বা কাম্য লোকসংখ্যা কথাটা থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণত অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলতে কাম্য লোকসংখ্যা থেকে অনেক বেশী বুঝায়। কাম্য বা আদর্শ লোকসংখ্যা মানে লোকসংখ্যার এমন একটা আদর্শ পরিমাণ যাতে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। অবশ্য অন্যান্য উপকরণ ও প্রযুক্তিক বিদ্যা স্থিতিশীল বলে ধরে নেয়া হয়। অবশ্য 'কাম্য লোকসংখ্যা' কথাটা তেমন স্বচ্ছ নয়। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে এই কথাটার তাৎপর্য নেহায়েত নগণ্য।

দেখুন এইচ. লিবেনষ্টাইন রচিত Theory of Economic Demofraphic Development এবং ই এফ. পেনরোজ প্রণীত Population theories and their Application দেখুন।

লোকসংখ্যার অবয়ব উন্নয়নে গতি-প্রকৃতি অনেকটা নির্ধারণ করে। সে যাই হউক, অনুন্নত দেশে জনসংখ্যার কাঠামোটা অনেকটা এইরূপঃ উপকরণ হিসাবে শ্রম সরবরাহ আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশী ; মাথাপিছু উৎপাদন নেহায়েত নগণ্য এবং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ পর্যাপ্ত। উন্নন দেশে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন অবশ্যই ধনাত্মক এবং বেশ ভালভাবে। অথচ দরিদ্র দেশে তা নেহায়েত নগণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তবা শূন্যের কোঠায় এমনকি কোথায়ও হয়ত তা ঋণাত্মক। অর্থনীতির কোন একটা অংশ (যেমন ধরুন রপ্তানিক্ষেত্র) উন্নতির রেখা ধরে এগোতে সক্ষম হলে বেশ সহজে অন্যান্য অংশ থেকে শ্রম সরবরাহ পেতে পারে এবং তজ্জন্য তেমন কোন বর্ধিত হারে মজুরী দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।[৯]

কৃষি ও কর্মক্ষেত্রে (services)[১০] ছদ্মবেশী বা লুক্কায়িত বেকারত্ব প্রায়ই দেখা যায়। ছদ্মবেশী বেকারত্ব কথাটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করে তোলা যাক। মনে করুন কোন এক খণ্ড জমি তিনজন লোক চাষ করে। এবারে একজনকে দূরে সরিয়ে বাকী দুইজনকে তা চাষ করতে দিন। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে তা চাষ করে ফেলল এবং ফলনও তথৈবচ রইল। সুতরাং বলা চলে যে, এই জমিটা চাষে মাত্র দুইজন লোক দরকার পড়ে। তারা বেশ সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে। কাজে কাজেই তারা পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত বলে বলা চলে। ঐ যে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে সরিয়ে নেয়া হল সে ছদ্মবেশী বেকারত্বের প্রতিভূ। কেননা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত, অথচ খতিয়ে দেখলে অর্থাৎ কিনা তার প্রান্তিক উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মোট উৎপাদন নেহায়েত নগণ্য এবং তাকে ছাড়াও পূর্ণভাবে কাজটা সম্পন্ন হতে পারে। এই ছদ্মবেশী বা লুক্কায়িত

---

৯. আলোচনা করুন ডাব্লিউ. এ. লিউইস রচিত এবং Manchester School of Economic and Social Studies, XXII, No. 2-এ প্রকাশিত "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪১-১৪৪।

১০. দেখুন P. T. Baner ও B. S. Yamey রচিত Economic Progress and Occupational Distribution, 1951 (পৃষ্ঠাসংখ্যা-২৪৪,৭৪২-৭৪৪); জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগ প্রকাশিত Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries, পৃষ্ঠা ৭-৮।

বেকারত্ব পারিবারিক কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। কথাটা গুছিয়ে বলা যাক। যৌথ মালিকানায় পরিবারে যেটুকু জমি রয়েছে তা পরিবারের লোকেরাই চাষবাস করে ফসল ফলাবার জন্য, মজুরীর জন্য নয়। এদিয়ে নিজেদের আহার সংস্থান হয়ে থাকে। জমির পরিমাণ মোটামুটি ঠিকই থাকে। কিন্তু পরিবারে সন্তানাদি বেড়ে যেতে থাকে। তারা সবায় কালে কালে মাঠের কাজে এসে যোগ দেয়। ফলে ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনাতিরিক্ত হাত একই জমি চাষাবাদে নিয়োজিত হয়। বিশেষ করে এই অবস্থাটুকু দেখা দেয় এইজন্য যে, খামারের আকার ছোট, তা ক্রমবর্ধমান পরিবারের লোকসংখ্যাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে, বিকল্প কাজের কোন সুবিধা নেই যে কয়েকজনকে ঐ সকল ক্ষেত্রে খাটতে দেবে। ফলে সবাই এসে মাঠের কাজে হাত লাগায়। পল্লী অঞ্চলে বিকল্প কর্ম-সংস্থান সুবিধা দিতে পারলে তারা অনায়াসে কৃষি থেকে সরে এসে এই সকল কাজে লাগতে পারে। ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূর হয়। উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে অথচ কৃষিক্ষেত্রে ফলন কমার কোন সম্ভাবনা নেই। তেমনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও তেমন কোন নড়চড় করার প্রয়োজন পড়ে না।

লুক্কায়িত বেকারত্বের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশ করা সহজ নয়। তাছাড়া এই সম্পর্কে নানা মুনীর নানা মত। কোন দুইজনকে এ ব্যাপারে একমত হতে দেখা যায় না। তার পরিমাণ নিয়ে মতৈক্যের চেয়ে মতানৈক্যই বেশী। জাতিপুঞ্জের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে এবং ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার কোন কোন অংশে এই বেকারত্বের পরিমাণ প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ।[১১] কেবল ভারতে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বের (under employment) ফলে শ্রমের যে বার্ষিক অপচয় ঘটে তা প্রায় যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত মোট শ্রমের সমান।[১২] সাধারণ একটা হিসাবে বলা হয় যে, ঘনবসতিসম্পন্ন দেশসমূহের কৃষিখাত থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ শ্রম অনায়াসে উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে। তাতে কৃষিক্ষেত্রে ফলন হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা

---

১১. United Nations, Measures for the Economic Development of Under-Developed Countries.

১২. দেখুন C. Wolf ও S. C. Sufrin রচিত Capital Formation and Foreign Investment in Underdeveloped Areas, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩-১৪।

নাই।[১৩] অন্যদিকে কিছুসংখ্যক ধনবিজ্ঞানী কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[১৪] একথা অবশ্য সত্য যে, সঠিক করে কিছু বলতে হলে আরো অধিক গবেষণা আবশ্যক এবং সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে একথা বোধ হয় বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, লুক্কায়িত বেকারত্ব বিদ্যমান নেই। কেননা মোটামুটিভাবে প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন যে, অনুন্নত দেশে শ্রমের যথেষ্ট অপচয় ঘটে চলেছে।

প্রকৃতিগত দিক থেকে ধনী-দরিদ্র দেশের জনসংখ্যায় অন্যদিক থেকেও একটা বৈসাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। দরিদ্রদেশসমূহে অধিকাংশ লোক যৌবনের কোঠায় পড়ে অর্থাৎ কিনা মোট লোকসংখ্যার বৃহত্তম অংশ এই পর্যায়ে পড়ে। তার মানে এই সকল দেশে লোকসংখ্যার প্রগাঢ় ঘনত্ব বয়সন্ধিক্ষণে বিদ্যমান। অন্যদিকে জীবনকাল (life-expectancy) কম। ধনী দেশের তুলনায় তা নেহায়েত নগণ্য। পরিসংখ্যান তথ্য দিয়ে উপরোক্ত বক্তব্যদ্বয় পরিষ্কার করা যাক। ১৫ বৎসর বয়োঃনিম্ন লোকের সংখ্যা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় প্রায় ৪০ ভাগেরও অধিক। অথচ আমেরিকায় তা মাত্র ২৫ শতাংশ। বিলাতে তার চেয়েও কম, মাত্র ২৩ শতাংশ। আমেরিকা ও ক্যানাডায় প্রতিটি শিশুর জীবনকাল-সম্ভাবনা ৬৬ বৎসরের উপরেও বিস্তৃত। নরওয়েতে তা ৬৯ বৎসর এবং বিলাতে ৬৭ বৎসর। অথচ দূরপ্রাচ্য, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকায় তা ৪০ বৎসরেরও নীচে। মিসরে তা মাত্র ৩৫ বৎসর আর ভারতে কুল্লে ৩২ বৎসরে ব্যাপ্ত।[১৫]

মৃত্যুহারের বেলায়ও দরিদ্র দেশ পিছিয়ে নেই। এদিকেও ধনী দেশের তুলনায় তা বেশ। বিশেষ করে যৌবনপ্রাপ্ত লোকের মৃত্যুহার

---

১৩. আলোচনা করুন N. S. Buchanon ও H. S. Ellis রচিত Approaches to Economic Development, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ৫৫।

১৪. T. W. Schuttz উপরে উল্লিখিত জাতিপুঞ্জ রিপোর্টের সদস্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি ছদ্মবেশী বেকারত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তাঁর প্রবন্ধ "The Role of Government in Promoting Economic Growth." দেখুন, প্রবন্ধটি L. D. White সম্পাদিত The State of the Social Sciences নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৫. আলোচনা করুন, জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Demographic Year Book, ১৯৫৫ সাল, সারণী-৩২।

ধনী দেশের তুলনায় অনেক বেশী। অন্যদিকে কর্মক্ষম বয়স-সীমা তেমন বিস্তৃত নয়। উন্নত দেশের তুলনায় বেশ নগণ্য। তার অর্থ শিশুকালে যারা বা মৃত্যুর কবল থেকে কোন রকমে হাড় জিরজিরে অবস্থায় রক্ষা পেয়ে গেল, তারা যৌবনকালে এসে কিছুদিন ক্রিয়াকর্ম করতে না করতে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে বসে। ফলে, কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে থাকে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায় কর্মক্ষম বয়ঃসীমা বিস্তৃতিতে ঋজুতা। কথাটা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো যাক। মনে করুন, কর্মক্ষম-বয়ঃসীমা ১৫ থেকে ৬৪ বৎসরে বিস্তৃত। এই হিসাব মতে দরিদ্র দেশে এই কোঠায় পড়ে এমন লোকের সংখ্যা ধনীদেশের অনেক কম।[১৬] "তলদেশ ভারী" আকৃতিসম্পন্ন লোকসংখ্যা নিয়ে দরিদ্র দেশের আর ভোগান্তির অন্ত নেই। আশ্রিত বা নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায় অথচ কর্মক্ষম যুবকের সংখ্যা তেমন নয়। তার ফলে উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি তেমন জোরদার হতে পারে না। অন্যদিকে "খাওনের বেলায় আছে মানুষ, কামের বেলায় নাই।" যত মুখ ততবেশী খাদ্য দরকার। কাজ করার লোক কম অথচ নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। ফলে, প্রতিটি উৎপাদনশীল লোকের উৎপাদনে বহু জন ভাগ বসায়। লোকসংখ্যার এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ে দায়ী। ফলে, প্রতিটি দরিদ্র দেশকে তার সংখ্যা শিশু বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট তেল-নুন খরচ করতে হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জাতীয় আয় তথা দেশী সম্পদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় আয় সর্বসাধারণে বণ্টিত হয়। তাব থেকে মাথা পিছু আয় পাওয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে সম্পদ সে হারে বাড়ে না, কারণ উৎপাদনক্ষেত্রে অকাট্য 'ক্রমিক হ্রাসের নিয়ম' অনিবার্য। এই সাধারণ সত্যকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে টমাস ম্যালথাস যে 'তত্ত্ব' প্রচার করেন তা যুগের আবর্তে ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতায় কিছুটা অসাড় হয়ে পড়লেও দরিদ্র দেশের বেলায় 'মৌলিক সত্যতায়' তা এখনও অম্লান। উৎপাদনে 'ক্রমিক হ্রাসের নিয়ম' অধিকাংশ দরিদ্র দেশের মস্তকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে আছে। বিশেষ করে মিসর, ভারত, জাভা ইত্যাদি ঘনবসতিসম্পন্ন দেশের বেলায় তা খুবই সত্যি।

১৬. ১৯৪৭ সালে ১৫-৬৪ বৎসর কোঠায় পড়ে এমন লোকের সংখ্যা আফ্রিকায় ৫৬ ভাগ, এশিয়ায় ৫৭ ভাগ ও লাতিন আমেরিকায় ৫৫ ভাগের মত ছিল।

সংখ্যা দেখে তা বুঝে নিন--১৯৫৪ সালে ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বাস করত ১১৫ জন, সিংহলে ১২৮ জন, পোর্টোরিকোতে ২৫১ ও ত্রিনিদাদে ১৩৬ জন। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, দরিদ্র দেশ মানেই ঘনবসতি সম্পন্ন। এমন নাও হতে পারে। যেমন ধরুন চিলির কথা। তা একেবারেই পাতলা বসতিসম্পন্ন দেশ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৯ জন লোক বাস করে। কিন্তু তাই বলে দরিদ্রতার দিক থেকে সে কারো থেকে পিছিয়ে নেই। তেমনি কেনিয়া (১০ জন); থাইল্যাণ্ড (৩৯ জন); নাই-জিরিয়া (৩৪ জন); গুয়াতেমালা (২৯ জন): কিউবা (৫১ জন); ম্যাক্সিকো (১৫ জন): কলম্বিয়া (১১ জন); ইরাক (১১ জন); তুরস্ক (৩০ জন) ও গোল্ড কোষ্ট (২০ জন)।[১৭]

অবশ্য এইটুকু মানতে হবে যে, অনেক দরিদ্র দেশে লোকসংখ্যা তেমন ভারী না হলেও হাবভাব মোটেই সুবিধাজনক নয়। অচিরেই তা ভয়াবহ হয়ে দেখা দিতে পারে। কেননা, অধিকাংশ দরিদ্র দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সব রকম প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা বেশ কার্যকরীভাবে। এই প্রবণতা সাধারণতঃ তিনভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায় (১) মৃত্যুহার বেশ উচ্চতর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে উঠছে। অথচ জন্মহার তথৈবচ অর্থাৎ যথেষ্ট উর্ধ্বে এবং তা সহসা কমে আসার কোন সম্ভাবনা নেই; (২) 'পরিবৃত্তি-কাল' (Transitional) অর্থাৎ কিনা জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে উঠছে; (৩) জন্মহার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ কিনা নিম্নতর ও নিম্নমুখী জন্মহার ও মৃত্যুহার।[১৮]

কতকগুলো দরিদ্র দেশে জন্মহার যেমন অধিক তেমনি মৃত্যুহারও বেশী। জন্মহার ও মৃত্যুহার মিলিয়ে বেশ একটা ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ

১৭, United Nations-এর প্রাগুক্ত পুস্তিকা, সারণী ১। ধনী দেশেও লোকসংখ্যার ঘনত্বে বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তা ২১ জন, ক্যানাডায় ২ জন, ডেনমার্কে ১০৩ জন, ন্যাদারল্যাণ্ডে ৩২৮ জন ও বিলাতে ২৪৫ জন।

১৮. দেখুন F. W. Notestein প্রণীত এবং Journal of the American Statistical Association XLV, No. ২৫১-এ প্রকাশিত "The Population of the World in the year 2000" এবং W. S. Thompson রচিত ও American Journal of Sociology, XXXIV, No. ৬-এ প্রকাশিত "Population" প্রবন্ধদ্বয়।

করে। ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তেমন বেশী কিছু নয়। এই সকল দেশের মধ্যে আফগানিস্তান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, কতকগুলো আফ্রিকান ও দক্ষিণ আমেরিকান দেশ অন্যতম, কতকগুলো দেশে কিন্তু জন্মহারের তুলনায় মৃত্যু-হার নেহায়েত নগণ্য এবং জন্মহারে অধোগতি হওয়ার কোন লক্ষণও নেই। ফলে এই সকল দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রবণতা বেশ প্রবলতর। মিসর, মধ্য আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য, এশিয়ার প্রায় সবগুলো দেশ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ এই পর্যায়ে পড়ে।[১৯] ধনী ও দরিদ্র দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের এই বৈসাদৃশ্য ১৩.৪ সারণী থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে

সারণী ১৩.৪ জন্ম ও মৃত্যুহার: মোটামুটি হিসাব নির্বাচিত দেশসমূহে, ১৯৫৫ সাল

ধনী দেশসমূহ	জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)
বেলজিয়াম	১৬.৭	১২.৬
কানাডা	২৮.৩	৮.১
ডেনমার্ক	১৭.৩	৮.৮
ফরাসী	১৮.৪	১২.০
নরওয়ে	১৮.৭	৮.৩
সুয়েডেন	১৪.৮	৯.৪
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	১৫.৪	১১.৭
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র	২৪.৬	৯.৩
দরিদ্র দেশসমূহ		
সিংহল	৩৭.৯	১১.০
চিলি	৩৫.০	১২.৮
কোষ্টারিকা	৫১.৪	১০.৫
ডমিনিকান রিপাবলিক	৪৩.৬	৯.৫
ইকুয়েডর	৪৪.০	১৬.১

১৯. দেখুন T. W. Schultz সম্পাদিত Food for the World পুস্তকে প্রকাশিত F. W. Notestein লিখিত "Population the long view." নামক প্রবন্ধ, ১৯৪৫ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮।

এলসালভাডর	....	৪৭˙০	....	১৩˙৯
গুয়াতেমালা	....	৫১˙৭	....	১৮˙৫
হণ্ডুরাস	....	৪১˙৯	....	১১˙২
ভারত	....	৩০˙৫	....	১২˙৭
মালয়	....	৪৩˙৮	....	১২˙২
মেক্সিকো	....	৪৬˙৪	....	১৩˙১
পেরু	....	৩০˙০	....	৯˙১

উৎস :- জাতিপুঞ্জ পরিসংখ্যান দফতর, মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন X, নম্বর ৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ ১০, জুলাই ১৯৫৬ সাল।

অনেকগুলো দেশে অবশ্য এখনো "ম্যালথুশীয় সমস্যা" প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। তবে তা কোন কোন দেশে বিরাজ করছে না এমন নয়, তবে এখনো তেমন তীব্রতর হয়ে উঠেনি। আর যে সকল দেশ এই পর্যন্ত এই সমস্যার কবলে পতিত হয়নি তাদেরও শান্ত হয়ে ঘুমোবার কিছু নেই। কারণ, স্রোত যে ভাবে বইতে শুরু করেছে তা রোধতে না পারলে অচিরেই ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী এই সকল দেশে আপন পক্ষ বিস্তার করে নেবে। ১৩˙৫ সারণী থেকে এই উক্তি যাচাই করে নেওয়া যায়। কেননা এর প্রত্যেকটি দেশ উচ্চতর জন্ম-সম্ভাবনায় সম্ভাবিত।

১৩˙৫ সারণী বিশ্ব জনসংখ্যা : বর্ধন-হার, জন্ম-হার ও মৃত্যু-হার

অঞ্চল	বার্ষিক বর্ধন ১৯২০-১৯৫০ (প্রতি ১০০০)	বার্ষিক হার ১৯৪৬-১৯৪৮ (প্রতি ১০০০)		
		জন্ম	মৃত্যু	স্বাঃ বর্ধন
বিশ্ব	৯	৩৫-৩৭	২২-২৫	১১-১৪
নিম্ন-বর্ধন-সম্ভবা এলাকা [Low Growth Potential type]				
উত্তর-পশ্চিম মধ্য ইউরোপ	৬	১৯	১২	৭
উত্তর আমেরিকা	১৩	২৫	১০	১৫

দক্ষিণ আমেরিকা*	৯	২৩	১২	১১
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ [Oceania]	১৪	২৮	১২	১৬
উচ্চবর্ধন সম্ভবা এলাকা				
দূরপ্রাচ্য	৫	৪০-৪৫	৩০-৩৮	৭-১৩
দক্ষিণ মধ্য-এশিয়া	১১	৪০-৪৫	২৫-৩০	১২-১৮
আফ্রিকা	১৩	৪০-৪৫	২৫-৩০	১২-১৮
নিকট প্রাচ্য	১০	৪০-৪৫	৩০-৩৫	৭-১৩
পরিবৃত্তি কাল † [Transitional]				
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ	৭	২৮	১৮	১০
লাতিন আমেরিকা*	১৯	৪০	১৭	২৩
জাপান	১৪	৩১	১৫	১৬

* বর্তমানকালে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে আরও অনেক উপাত্ত (data) পাওয়া গিয়েছে। সেই আলোতে এদেরকে 'উচ্চ-বর্ধন-সম্ভবা এলাকায়' অবস্থিত বলে চিহ্নিত করা যায়।

† পরিবর্তনশীল লোকসংখ্যা বলতে বুঝায় উচ্চ-বর্ধন সম্ভবা পর্যায় থেকে নিম্ন-বর্ধন পর্যায়ের দিকে ধাবিত হওয়া।

উৎস : J. J. Spengler রচিত 'Demographic Patterns' নামক প্রবন্ধ। তা H. F. Williamson ও J. A. Buttrick সম্পাদিত 'Economic Development' নামক পুস্তকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়েই অধিক এবং এদের নিম্নগামী হওয়ার কোন প্রবণতা আজও দেখা যায়নি। এই সকল দেশের সরকারও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে উঠতে সক্ষম হয়নি। এদিকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দ্রুত প্রসারলাভ করছে। ফলে, মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রচুর। সমতালে জন্মহার কমে না এলে লোকসংখ্যা-সমস্যা দেখা দিতে ও তীব্রতর হতে বাধ্য। তাছাড়া, এটা

ঊনবিংশ শতাব্দী নয়। সুতরাং বৃহত্তর আকারে জন-নির্গম সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও হাজারো কারণ এই সম্ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন দিন ছিল যখন অসুখ-বিসুখ নিয়ন্ত্রণে রাখা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। এই ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতিকালের কথাই ধরুন না। কত ব্যাধি আর কত তাদের ব্যাপ্তি! আর সেকি মারাত্মক আকারে প্রকাশ! মানুষ ছিল সম্পূর্ণরূপে অসহায়। দলে দলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু সেদিন হয়েছে বাসী। রোগ বীজানু বহনকারী কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও ধ্বংস করে দেয়া আজকাল আর তেমন একটা কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তেমনি সেকালের তুলনায় খরচও তেমন কিছু নয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার ফলে অনায়াসে ও দ্রুততার সাথে যে-কোন ভয়াবহ রোগকেও মোকাবেলা করা যায়। তার ফলে মৃত্যুহারে যথেষ্ট হ্রাস ঘটেছে। বিষয়টি এবারে তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাক।

১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে বৃটিশ গিয়ানা, চিলি ও মালয়ে মৃত্যুহারে যে পরিবর্তন ঘটে তা স্কেণ্ডেনেভিয়ায় ঘটতে সময় লাগে ১৮৫০ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এবং বেলজিয়ামে ১৮৭০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। পোয়েরটো রিকোতে ১৯০০ সালে মৃত্যুহার প্রতি ১০০০-এ ৪০ জন ছিল। তা কমে ১৯৪০ সালে ১৮তে দাঁড়ায় এবং ১৯৫৫ সালে মাত্র ৭.৬-এ এসে পৌঁছায়। মেক্সিকোতে মৃত্যুহার ১৯৩০-এ ২৭ থেকে কমে ১৯৫৪-এ ১৩তে পৌঁছায়। সিংহলে ঘটেছে সবচেয়ে অভাবনীয় ঘটনা। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ডি.ডি.টি-এর ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়া হয়। তার ফলে ১৯৪৬ সালে মৃত্যুহার যেখানে ছিল প্রতি হাজারে ২০.২ তা কমে ১৯৪৭ সালে ১৪.৩-এ এসে দাঁড়ায় এবং ১৯৫৪ সাল নাগাদ তা অর্ধেকেরও নীচে চলে আসে। ১৩.৬ সারণীতে ১৫টি দেশের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ১৯২০-১৯২৪ থেকে ১৯৫০-১৯৫৪ এই ৩০ বৎসরে মৃত্যুহার মোটামুটিভাবে প্রায় ৫৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এই সারণী থেকে আরও অনুধাবন করা যায় যে মৃত্যুহার ক্রমাগত নিম্নমুখে ধেয়ে চলেছে।

সারণী ১৩.৬ দরিদ্র দেশে শতকরা হিসাবে স্থূল মৃত্যুহারে হ্রাস

কাল	তুলনাকৃত দেশসমূহ*	পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় গড়পরতা শতকড়া হ্রাস
অর্ধ-দশকী পরিবর্তন		
১৯২০-১৯২৪	--	—
১৯২৫-১৯২৯	১৫	৬.০
১৯৩০-১৯৩৪	১৬	৪.৬
১৯৩৫-১৯৩৯	১৮	৬.৩
১৯৪০-১৯৪৪	১৬	৮.৫
১৯৪৫-১৯৪৯	১৬	১৫.২
১৯৫০-১৯৫৪	১৮	২০.১
ত্রিশ-বর্ষী পরিবর্তন		
১৯২০-১৯২৪	—	—
১৯৫০-১৯৫৪	১৫	৫৩.১

* ১৮টি দেশ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কতকক্ষেত্রে ঠিকমত উপাত্ত পাওয়া যায়নি। যে সকল দেশ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তারা হল: বারবাডোস, কষ্টারিকা, সিংহল, সাইপ্রাস, মিশর, এলসালভাডর, ফিজি, ফরমোজা, জামাইকা, মালয়, মরিশাস, মেক্সিকো, পানামা, ফিলিপাইনস্, পোয়ের্টো রিকো, সুরিনাম, থাইল্যাণ্ড এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।

উৎস: K. Davis প্রণীত "The Unpredicted Pattern of Population Change." জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Demographic Yearbook, ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং Population and Vital Statistics-এ উদ্ধৃত মৃত্যুহার হিসাব থেকে পরিগণনা করা হয়েছে।

সুতরাং মৃত্যুহার কমে আসছে। তদনুপাত জন্মহারও কমে আসা দরকার। তার অর্থ প্রজনন-ক্রিয়া ঋজুভাবে নিম্নগামী হয়ে উঠা উচিত। অন্যথায় দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই গরীব দেশগুলোর পক্ষে ঠাঁই দেয়ার জায়গা থাকবে না। এমনকি বর্ধনহার উনিশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। উদাহরণ দেয়া যাক, লাতিন আমেরিকা এখনও হালকা বসতি এলাকা। কিন্তু জন্মহার সবার উর্ধ্বে। অপ্রতিহত গতিতে তা চলতে থাকলে প্রতি ৪০ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ১৯২৬ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারী খতিয়ে দেখা যায় যে, দক্ষিণ রোডেশিয়ায়

আফ্রিকান বাসিন্দারা প্রায় দিগুণ হয়ে গিয়েছে। এখন নাকি তা প্রতি ২০ বৎসরে দ্বিগুণ হওয়ার হারে বেড়ে চলেছে। মিশরে কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমি যথেষ্ট। আবাদী জমি হয়ত দ্বিগুণ করে তোলা যাবে। কিন্তু লোকসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তা প্রতিরোধ করা না হলে প্রতি ৫০ বৎসরে লোকসংখ্যা একবার করে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফলে, অবস্থা ঘোরতর হয়ে উঠতে বাধ্য। লোকসংখ্যা জমির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে অর্থাৎ পুনরায় লোকসংখ্যা বর্ধনজনিত সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। মালয়ে বার্ষিক লোকসংখ্যা বর্ধন হার ৪ ভাগ। এতে প্রতি ১৮ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এদিকে ভারতে প্রতি বৎসরে প্রায় ৪৫,০০,০০০ থেকে ৫০,০০,০০০ লোক জন্মগ্রহণ করে চলেছে এবং ২০,০০,০০০ শ্রমিক শ্রমবাজারে অন্তরীণ হচ্ছে। ১৩.৭ চিত্রে ৩৮টি দেশের লোকসংখ্যা বর্ধনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। সময়-কাল হল ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। সাথে সাথে ধনী দেশের নিম্ন জন্মহারের ছবিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জন্মহারের যে গতি ও প্রবণতা এই ৩৮ দেশে বর্তমানে প্রবাহিত তা বিনাবাধায় চলতে দিলে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী দেশে প্রতি ৪০ বৎসরে একবার করে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে সবগুলো দেশ একত্রে বিবেচনা করলে প্রতি ৫০ বৎসরেরও কমে তা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।

ধনী-দরিদ্র দেশের ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল। এবারে দরিদ্র দেশের অবস্থা আজকের দিনের ধনী দেশগুলোর ঐ সময়কার সাথে তুলনা করে দেখা যাক, যখন তারাও ছিল যথেষ্ট দরিদ্র এবং সবে উন্নয়নক্ষেত্রে পদার্পণ করতে শুরু করেছে। ১৩.৮ সারণী পরিষ্কার করে তুলে ধরছে যে, দরিদ্র দেশে বর্ধনহার যা তখনকার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে তা অর্ধেকেরও কম ছিল। তাছাড়া তখনকার দিনে মৃত্যুহার কমে এসেছিল উন্নয়নের সরাসরি ফল হিসাবে। উন্নততর খাওয়া-পরা, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উন্নয়নের প্রত্যক্ষ ফল এবং এই সকল কারণে মৃত্যুহারে দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু আজকে অবস্থা তেমন নয়। আজকের দিনের গরীব দেশও সহজেই উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারে। ব্যাপক মহামারী নিয়ন্ত্রণ আজকে আর তেমন একটা বৃহৎ সমস্যা নয়। বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করে সহজেই তা আয়ত্তে আনা যায়। সুতরাং আজকের ধনী দেশ যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে

সারণী ১৩ ৭ ধনী ও দরিদ্র দেশের লোকসংখ্যা বর্ধন ১৯৩৫-১৯৫৫ সাল

শতকড়া বর্ধন, ১৯৩৫-১৯৫৫

দেশের-প্রকার [Types of Countries]	দেশের-সংখ্যা	তুলনাপূর্ব গড় [Unweighted Average]	ভিত্তি-তুলিত গড় [Weighted* Average
দরিদ্র †	৩৮	৫১·২	৩৭·৪
ধনী :-			
ইউরোপীয় ‡	১০	১৫·৬	১১·৬
নয়াবিশ্ব §	৬	৩৮·৮	৩২·৬

* স্ব স্ব দেশের লোকসংখ্যার সাথে ওজনকৃত।

† এঙ্গোলা, ব্রাজিল, বার্মা, সিংহল, চিলি, কলাম্বিয়া, কষ্টারিকা, কিউবা, সাইপ্রাস, মিশর, এলসালভাডর, ফিজি, ফরমোজা, গোল্ডকোষ্ট, গ্রীস, গুয়েতেমালা, হণ্ডুরাস, ভারত, জামাইকা, মালয় ও সিঙ্গাপুর, মরিশাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, উত্তর বোর্নিও, উত্তর রোডেশিয়া, নিয়াশাল্যাণ্ড, পানামা, ফিলিপাইনস্, পোর্যের্টোরিকো, রোয়াণ্ডা-উরুন্দী, উগাণ্ডা, ভেনেজুয়েলা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, টাঙ্গানিকা, থাইল্যাণ্ড, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, তুরস্ক, এবং যুগোশ্লাভিয়া।

‡ বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফরাসী, ইতালী, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটিশ যুক্তরাজ্য।

§ আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকান যুক্তরাজ্য।

উৎস : Davis লিখিত উপরোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪।

আজকের দরিদ্র দেশ সহজেই তা ধার করে নিতে পারে এবং স্বদেশে কাজে খাটাতে পারে। সুতরাং, সেদিনের দরিদ্র দেশে যা এসেছিল উন্নয়নের সরাসরি ফল হিসাবে, আজকের দরিদ্র দেশ শিল্পায়িত না হয়েও সেই সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুহারে হ্রাস ঘটা আজকে আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতির ফলে মৃত্যুহার স্বাভাবিক-ভাবে পড়ে আসছে এবং তা উন্নয়ন থেকে স্বতন্ত্র হয়েও ঘটতে পারে। অন্যদিকে শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশসমূহ যেখানে মৃত্যুহার অস্বাভাবিকভাবে

নেমে আসার আগেই জন্মহার সচেষ্টায় কমিয়ে নিয়েছিল, সেখানে দরিদ্র দেশে মৃত্যুহার মাত্রাহীন নীচু পর্যায়ে নেমে না আসা পর্যন্ত তারা জন্মহার কমাতে স্বচেষ্ট হবে বলে মনে হয় না।[২০]

সারণী ১৩.৮ ধনীদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ১৮০০-১৯৪০

পূর্ববর্তী ২০ বৎসরে শতকরা বর্ধন

১৮২০	১৮৪০	১৮৬০	১৮৮০	১৯০০	১৯২০	১৯৪০
২৩.১	১৭.২	১৯.৭	১৮.১	১৯.৯	১৮.০	১৪.১

উৎস : Davis প্রণীত উপরোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৫।
যে-সব দেশ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে : ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফরাসী, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড।

'উচ্চ', 'মধ্যম' ও 'নিম্ন' বর্ধনহার অনুপাতে ১৯৮০ সাল নাগাদ বিভিন্ন এলাকায় লোকসংখ্যা কেমন হবে তার একটা মোটামুটি হিসাব ১৩.৯ চিত্রে

সারণী ১৩.৯ সম্ভাব্য বর্ধনহার সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ,

মহাদেশ	সাল ১৯৫০	মোট লোকসংখ্যা (লাখ হিসাবে) ১৯৮০ সাল 'উচ্চ' হিসাব	'মধ্যম' হিসাব	'নিম্ন' হিসাব
বিশ্ব	২৪৫৪০	৩৯৯০০	৩৬২৮০	৩২৯৫০
আফ্রিকা	১৯৮০	৩২৭০	২৮৯০	২৫৫০
আমেরিকা	৩৩০০	৫৭৭০	৫৩৫০	৪৮৭০
উত্তর আমেরিকা	১৬৮০	২৪০০	২২৩০	২০৭০
লাতিন আমেরিকা	১৬২০	৩৩৭০	৩১২০	২৪০০
এশিয়া	১৩২০০	২২২৭০	২০১১০	১৪১৬০
ইউরোপ	৫৯৩০	৮৪০০	৭৭৬০	৭২১০
ওসানিয়া	১৩০	১৯২	১৭৫	১৬১

উৎস : জাতিপুঞ্জ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দফতর ; বিশ্ব লোকসংখ্যা সভার কার্যক্রম, ১৯৫৪ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭।

২০. দেখুন Davis প্রণীত "The Unpredicted Pattern of Population Change" নামক পুস্তিকা।

প্রদত্ত হল। এই হিসাব মতে ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই ৩০ বৎসরে লোকসংখ্যা বেড়ে যাবে, আফ্রিকায় প্রায় ৪৬ ভাগ। এশিয়ায় ৫২ ভাগ ও লাতিন আমেরিকায় ৯২ ভাগ, অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার মত উন্নত দেশে তা বাড়ছে মাত্র ৩১ ভাগ আব বৃটিশ যুক্তরাজ্যে কেবল-মাত্র ৩১ ভাগ।

অবশ্য লোক সংখ্যার হিসাব তেমন নির্ভরযোগ্য কিছু নয়। তবে প্রায় সবাই এই সম্পর্কে একমত যে, দবিদ্র দেশগুলোতে লোকসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যেতে বাধ্য। সুতরাং, লোকসংখ্যা বর্ধনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাদেরকে উন্নয়ন গতি অবশ্যই বেগবান করে তুলতে হবে। তা না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে এবং অধিকাংশ লোক জিয়ে থাকার মত অবস্থায় বাস করবে। অধিকাংশ দরিদ্র দেশ ইতিমধ্যেই লোকসংখ্যা বর্ধনজনিত সমস্যার কুক্ষিগত হয়ে আছে। বাকী যারা এখনো কিছুটা আরামদায়ক অবস্থায় আছে তাদেরকেও অচিরেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এব হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় উন্নয়নগতি ত্বরান্বিত করা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ক্লাসি-ক্যাল বিশ্লেষণ কিছুটা প্রাসংগিক বলে মনে হয়। কেননা, এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, লোকসংখ্যার সম্ভাব্য বর্ধন উৎপাদন বর্ধনকে গ্রাস করে ফেলতে পারে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দরিদ্র দেশের মূল বৈশিষ্ট্য—(২)

(গ) অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ

দরিদ্র দেশের অর্থনীতি অনুন্নত—এ ত সোজা কথা। কারণ, অর্থনীতি অনুন্নত বলেইত দেশটা দরিদ্র। তবে মজার কথা হল যে, তার প্রাকৃতিক সম্পদও অনুন্নত। কথাটা খোলাসা হয়নি বুঝি? তাহলে শুনুন, দেশ দরিদ্র, সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ যে পর্যাপ্ত নয় তা বোধগম্য। তবে যে সমস্ত সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোও অর্থনৈতিক বিবেচনায় পুরোপুরি কার্যকরী হয়ে উঠেনি। অর্থাৎ এগুলোও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এরাও যথেষ্ট অনুন্নত রয়েছে। অন্যান্য সম্পদের সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রম ও মূলধন তেমন সুবিধা করে উঠতে পারে না। ফলে, দরিদ্র দেশের জাতীয় আয়ে তাদের অবদান তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

দরিদ্র দেশ মূলধন স্বল্পতায় ভোগে। তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকেও সে তেমন কোন একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। এক্ষেত্রেও অপর্যাপ্ততা বিদ্যমান। তবে তা চরম অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না। কারণ চরম অর্থে কোন দেশই পর্যাপ্ততার অধিকারী নয়। সুতরাং ব্যাপারটা আপেক্ষিক অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ সম্পদ-প্রাচুর্যতা কোন দেশেই মাত্রাতিরিক্ত নয়। কোন দেশে তা কিছুটা বেশী পরিমাণে বিদ্যমান অন্যত্র তার পরিমাণ তার চেয়ে কম; অন্য কোথাও হয়ত তা তেমন ধর্তব্য কিছু নয়।

তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের উপকারিতার মাপঝোঁক নির্ণীত হয় প্রযুক্তি-বিদ্যা, চাহিদা-পরিস্থিতি ও নব্য নব্য আবিষ্কারের ধারা-প্রবাহের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এই সকল বিষয়াবলী প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত উপযোগিতা প্রদান করে। শিল্প বিপ্লবের আলোচনা থেকে আমরা একটু প্রত্যক্ষ করেছি যে, অর্থনৈতিক সম্পদের ধারণা প্রযুক্তিক বিদ্যার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে দেশে প্রযুক্তিক বিদ্যা যেমন সে দেশে একটা

অর্থনৈতিক সম্পদের প্রত্যয়ও তেমনি। এটুকুও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, আপেক্ষিক অর্থে অপ্রতুলতা বিদ্যমান এমন সম্পদ সমস্যা প্রযুক্তিক বিদ্যায় সামান্য হেরফের ঘটিয়ে কাটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় প্রকৌশলিক জ্ঞানের সামান্য উন্নতি ঘটিয়ে অপর্যাপ্ত সম্পদের স্থলে অন্য সম্পদ কাজে খাটিয়ে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। আজকে যে দেশ সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র, কালকে হয়ত তা ধনী হয়ে উঠতে পারে। দুদিক থেকে তা ঘটিতে পারে নূতন সম্পদ আবিষ্কারের ফলে অথবা বিদ্যমান সম্পদের নব নব কার্যকারিতা উদ্ভাবনের ফলে।

সুতরাং কোন দেশকে সম্পদে গরীব না বলাই ভাল। তারচেয়ে বরং এই বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, গরীব দেশ এইজন্য গরীব যে সে তার অর্থনৈতিক সম্পদ-অপর্যাপ্ততা প্রযুক্তিক বিদ্যার যথাযোগ্য উন্নতি ঘটিয়ে কাটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তেমনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়নি।

দরিদ্র দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই।[১] তবে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে এবং তার থেকে এটুকু মেনে নিতে অসুবিধা হবে না যে, কোন দরিদ্র দেশেই চরম অর্থে সম্পদ অপর্যাপ্ততার ভোগে না। যেমন জমি-সম্পদের কথা ধরুন। আজও অধিকাংশ অনুন্নত জমি লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিদ্যমান। ভারতে এখনো প্রায় ৮০০ লক্ষ একর অনাবাদী জমি বর্তমান রয়েছে। তাছাড়া গত ৫/৬ দশক ধরে ভারতে বড় বড় সেচ প্রকল্প কার্যকরী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই সকল প্রকল্প কার্যে পরিণত হয়ে উঠলে কত লক্ষ লক্ষ একর জমি চাষাবাদে আনা যাবে তা ভেবে অবাক হতে হয়। তেমনি বার্মাতে নাকি প্রায় ১৯০ লক্ষ একর জমি অনাবাদী রয়েছে। তা প্রায় তার বর্তমান কর্ষিত জমির সমান। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে

---

১. আলোচনা করুন I.B.R.D. প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টসমূহ। তাছাড়া L. Dudley Stamp প্রণীত Land for Tommorrow : The Underdeveloped world ; W.S. Woytinsky এবং E. S. Woytinsky রচিত World Population and Production; E. W. Zimmerman লিখিত World Resources and Industries ; জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত দফতর কর্তৃক প্রকাশিত Non-ferrous Metals in Under-developed Countries এবং Oxford Economic Atlas of the World দেখতে পারেন।

ইরাকে চাষযোগ্য জমি ৬০ লক্ষ থেকে ২০০ লক্ষ একরে তোলা যায়। তেমনি সিরিয়ায় ৪০ লক্ষ থেকে ১০০ লক্ষে পৌঁছানো যায়। তুরস্ক তার আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫০ লক্ষ একর থেকে ৪০০ লক্ষ একরে তুলতে পারে।[২] সুতরাং দেখা যায় দরিদ্র দেশসমূহ তাদের কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে পারে। কাজেই বলা চলে "আসল সমস্যা জমির পরিমাণে নয়। পৃথিবী সহজেই তার প্রাণীদের মুখে খাবার যোগাতে পারে। আবাদী-জমির স্বল্পতা প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে না। আসল সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে মানুষের অক্ষমতায়। মানুষ আজও পুরোপুরি-ভাবে বিদ্যমান সম্পদ কাজে খাটাতে সক্ষম হয়নি।"[৩]

দরিদ্র দেশে খনিজ-সম্পদও বেশ পাওয়া যায়। তামা, বক্সাইট ও টিন আফ্রিকায় পাওয়া যায়। এশিয়ায় পেট্রোলিয়াম, লৌহ, বক্সাইট ও টিন যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর দক্ষিণ আমেরিকায় পেট্রোলিয়াম, লৌহ, তামা ও দস্তা পাওয়া যায়। দরিদ্র পৃথিবীতে কয়লা তেমন পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তা অনেকাংশে পুষিয়ে নেয়া যায় তৈল ও গ্যাসের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়ে। তাছাড়া, প্রায় অধিকাংশ দরিদ্র দেশে জল-সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান, অথচ তার ব্যবহার আজও নেহায়েত নগণ্য। ইউরোপ তার প্রাপ্ত জল-সম্পদের ৬০ ভাগ ব্যবহার করে। অথচ দক্ষিণ আমেরিকায় মাত্র ৩ ভাগ, মধ্য-আমেরিকায় ৫ ভাগ ও এশিয়ায় ১৩ ভাগ ব্যবহৃত হয়। আর আফ্রিকা সবে ০.১ ভাগ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।[৪] অথচ একমাত্র আফ্রিকাতেই বিদ্যমান রয়েছে পৃথিবীর সর্বমোট জল-বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় ৪৪ শতাংশ।[৫]

কাজেকাজেই বলা যায় যে, দরিদ্র দেশগুলো তেমন দরিদ্র নয় যেমনটা ভাবা যায়। অন্ততঃ সম্পদ ক্ষেত্রে তারা মোটেই গরীব নয়। ভূমি, জল, খনিজ দ্রব্য, বনজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা অবশ্যই নেহায়েত অবলা, আর সে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সকল সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে এগুলো তারা আজও পুরোপুরি কাজে খাটাতে

---

২. Woytinsky and Woytinsky প্রণীত উপরোক্ত পুস্তক দেখুন, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪।

৩. Woytinsky & Woytinsky প্রণীত পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃঃ ৩২৪।

৪. উপরোক্ত পুস্তক।

৫. দেখুন A. L. Banks সম্পাদিত The Development of Tropical & Sub-Tropical Countnries.

পারেনি। ব্যবহারের দিক থেকে এই সকল সম্পদ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, বহু সম্পদ অব্যবহৃত পড়ে আছে। কিছুটা বা অর্ধ-ব্যবহৃত হচ্ছে, আর কিছু কিছু সম্পদ অপব্যবহৃত হচ্ছে।

সুতরাং নির্বিবাদে বলা চলে যে, অর্থনৈতিক বিবেচনায় দরিদ্র দেশসমূহে বিদ্যমান সম্পদ বেশ অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। এই সকল সম্পদ পুরোপুরি কাজে খাটানো কতকগুলো অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে সরবরাহ স্থানে যাতায়াতের সুবিধা, প্রযুক্তিক বিদ্যা যথোপযুক্ত হওয়া, মূলধন-সংগঠন ও বাজার-বিস্তৃতি প্রধান। এই পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। ফলে সম্পদসমূহও যথেষ্ট অনুন্নত অবস্থায় পড়ে আছে।

(ঘ) পশ্চাৎপদ অধিবাসী

উপরে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবারে মনুষ্য-সম্পদের দিকে নজর ফেরানো যাক। প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায় মনুষ্য-সম্পদও অর্থনৈতিক বিবেচনায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। কারণ, উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে অধিবাসীদের ক্ষমতা একান্তভাবে সীমিত।[৬] অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণ হিসাবে মনুষ্য-শক্তি তেমন গুণসম্পন্ন নয়। নিজের ক্ষমতা পূর্ণ প্রস্ফুটিত করায় তাকে তেমন সচেতন দেখা যায় না। প্রকৃতির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারে সে আজো সক্ষম হয়নি। বরং প্রকৃতির সাথে কোনরকমে একটা মিলঝিল দিয়ে কাজ চালিয়ে চলেছে। তাতে তার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে। ফলে, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান তারপক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। নিজের পরিবেশের হাতে দাসখত লিখে দিয়ে সে পঙ্গু হয়ে বসে আছে। অথচ তাকে সাপটে ধরে আয়ত্তে আনতে পারেনি। এই পরিস্থিতির প্রকাশ পেতে চান তবে দেখুন: চারিদিকে শ্রমের কি অপচয় ঘটে চলেছে। শ্রমদক্ষতার অভাব, উপকরণ-অসচ্ছলতা, (factor immobility) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের সীমাবদ্ধ সুযোগ, উদ্যোগের অভাব, অর্থনৈতিক অজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনে প্রতিকূল মূল্যবোধ ও সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান এই পরিস্থিতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

---

৬. H. Myint তাঁর "An Interpretation of Economic Backwardness" নামক প্রবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শ্রমশক্তির এই পশ্চাৎপদতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয় নিম্ন শ্রম দক্ষতায়। অবশ্য এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তেমন কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাছাড়া ধনী-দরিদ্র দেশের শ্রমের আপেক্ষিক দক্ষতা নিয়ে জোর দিয়ে কথা বলার মত নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু উপাত্ত জড়ো করা আজও সম্ভব হয়নি। তবে যে সামান্য ছিটেফোটা তথ্য যোগাড় করা গিয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, দরিদ্র দেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় প্রায় ২০ ভাগেরও কম। কোন কোন দেশে তা আরো নিম্নে হতে দেখা যায়।[৭] বিশেষ কোন দেশ বিবেচনা করলে হয়ত দেখা যাবে আমেরিকায় একজন শ্রমিক যা উৎপাদন করে তা তৈরী করতে সে দেশে প্রায় ৫ থেকে ১০জন পর্যন্ত দরকার পড়ে।

শ্রমদক্ষতা নিম্ন হওয়ার জন্য বেশ কতকগুলো কারণ দায়ী। তন্মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, ভগ্নস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, হাতেকলমে শিক্ষার অভাব, কর্ম পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা এবং শ্রম-মর্যাদার অভাব প্রধান। ১৪'১ সারণী থেকে ধনী-দরিদ্র দেশের পুষ্টি-পর্যায়ের ধারণা পাওয়া যেতে

সারণী ১৪'১ মাথাপিছু কেলোরী ভক্ষণ নির্বাচিত কয়টি দেশে*

১৯৫৪—১৯৫৫

দেশ	প্রতিদিন কেলোরী	মোট প্রোটিন (প্রতিদিন গ্রামস ভক্ষণ)
ধনী দেশঃ		
অষ্ট্রেলিয়া*	৩০৪০	৯১
কানাডা	৩১২০	৯৮
ডেনমার্ক	৩৩৩০	৮৯
ফরাসী	২৭৮৫	৯৬
পশ্চিম জার্মানী	২৯৪৫	৭৭
নিউজিল্যাণ্ড*	৩২৯০	৯৯

৭. দেখুন W. Galenson ও H. Leibenstein প্রণীত এবং Quarterly Journal of Economics, LXIX সংখ্যা ৩-এ প্রকাশিত "Investment Coiteria, Productivity and Economic Development" নামক প্রবন্ধ।

নরওয়ে	৩১৪০	৯১
সুইডেন	২৯৭৫	৮৭
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	৩২৩০	৮৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩০৯০	৯২
দরিদ্র দেশ :		
ব্রাজিল†	২৩৪০	৫৭
চিলি†	২৪৯০	৭৭
মিশর*	২৩৯০	৬৯
গ্রীস	২৫৪০	৮০
ভারত*	১৮৪০	৫০
পাকিস্তান*	২০২৫	৫০
পেরু†	২০৮০	৫৪
রোডেশিয়া ও নিয়াশাল্যাণ্ড*	২৬৩০	৮১
তুরস্ক*	২৬৭০	৮৬
ভেনেজুয়েলা‡	২২৮০	৫৯

* ১৯৫৩-১৯৫৪

† ১৯৫২

‡ ১৯৫১

উৎস : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা, ১৯৫৫ চিত্র সংখ্যা ৮০।

পারে। প্রত্যেকটি দরিদ্র দেশে অখাদ্য-কুখাদ্যের ছড়াছড়ি দেখা যায়। ফলে মাথাপিছু পুষ্টিকর খাদ্যের মাত্রা নেহায়েত নগণ্য হয়। তা গুণের দিক থেকে যেমন পরিমাণের দিক থেকেও তেমনি। দরিদ্র দেশের খাদ্যে কেলোরী-মূল্য নগণ্য। তেমনি খাদ্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নামমাত্র প্রোটিন সংযুক্ত।

শ্রম দক্ষতা দুর্বল হওয়ার অপর একটি কারণ আঞ্চলিক রোগ (endenic disease) ও চিকিৎসাক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা। হাসপাতালের সংখ্যা নগণ্য। হাসপাতালে চিকিৎসার তেমন সুব্যবস্থা নেই। এগুলো শ্রম দক্ষতার পরিপন্থী হিসাবে কাজ করে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, দক্ষিণ রোডেশিয়ায়

মোট শ্রমিক-সাংখ্যার প্রায় ৫-১০ ভাগ ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে নিঃশেষ হয়ে যায়। বিলহারজিয়াসিস (Bilherziasis) রোগের ফলে মিশরে শ্রম-উৎপাদিকা প্রায় ৩৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে যায়।[৮] অন্যদিকে নিরক্ষরতার জন্য শ্রমিকের পক্ষে সূক্ষ্ম কিছু শিখা সম্ভব হয় না। ফলে বহু কাজ তার নাগালের উর্ধ্বে থেকে যায়। ১৪·২ সারণী থেকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য লক্ষ্য করতে পারেন।

শ্রম-সঞ্চরণ (Mobility of labour) নেহায়েত নগণ্য। পেশা পরিবর্তন নামমাত্র হয়। বর্ণপ্রথা পেশাগত সঞ্চরণে বাধাস্বরূপ। বিশেষ করে উল্লম্ব-চলাচলক্ষেত্রে (vertical mobility)। ফলে পেশা বেছে নেয়ার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়। বর্ণাশ্রমের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, পেশা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ণীত হয়। পিতৃ-পিতামহ যে পেশায় নিয়োজিত সন্তান যেন অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মে উক্ত পেশায় ব্রতী হয়ে উঠে। বর্ণপ্রথা হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। তাদের বহু জনকে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হতে নেই। তজ্জন্য ধর্মীয় বাধা-নিষেধ রয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা লোককে তেমন সুনজরে দেখা হয় না। উপর দিককার লোকেরা সাধারণভাবে কায়িক ও যান্ত্রিক কাজকে অপছন্দ করে। ফলে শ্রেণীভেদ প্রথা বিদ্যমান সমাজে শ্রম-সঞ্চরণ বা শ্রম-চলাচল তেমন তাৎপর্যপূর্ণ বলে পরিগণিত হতে পারে না। তাছাড়া উৎপাদন পারিবারিক ভিত্তিতে হয়। তেমনি পেশাও হয় পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত মান-সম্মান ভিত্তিক। তার ফলে, শ্রম-স্থানান্তর বা শ্রম-সঞ্চলন তাদের চোখে মূল্যবান কিছু নয়।

শ্রম-সঞ্চরণ কম হওয়ার পেছনে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। অনুপ্রেরণা ও যুক্তি দিয়ে পেশা নির্ণীত হয় না। পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে শ্রেণীপ্রথা ও পিতৃ-পিতামহের ক্রিয়াকর্মের রজ্জু ধরে। ফলে, আয়ের তারতম্য তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং, চিরাচরিত নিয়মে যে কাজ করে আসছে এবং যুগ যুগ ধরে যা ভক্ষণ করে আসছে সেই নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে পা ফেলতে তারা নারাজ। নূতন কিছু গ্রহণে যেমন তারা নাজুক তেমনি নির্দিষ্ট চিন্তাস্রোতের বাইরে মাথা ঘামাতেও অস্বীকৃত। W. E. Moore সুন্দর করে কথাটা তুলে ধরেছেন। শ্রমিক

---

৮. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এবং C.E.A. Winslow প্রণীত The Cost of Sickness and the Price of Health আলোচনা করুন।

নির্বাচনে বাধাবিপত্তি এবং শিল্প কারখানা গড়ে তোলায় পর্বতপ্রমাণ অসুবিধা আলোচনা করতে যেযে তিনি বলেছেন: "সেকেলে চিরাচরিত সমাজে ক্রিয়াকর্ম বাধাধরা নিয়ম অনুযায়ী পুরস্কৃত হয়। উৎপাদন ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচিত গণ্ডী ধরে এগোয়। শ্রম-বিভাজন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট গণ্ডী মেনে চলে। মুক্ত-পরিবেশ দানা বেধে উঠতে পারে না। বিকল্প পন্থাও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা বিরাজমান। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামাজিক পদমর্যাদা সবার উপরে বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক পদ্ধতি স্বাভাবিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সবাই তৎপ্রতি মোহাবিষ্ট থাকে।"[৯]

মজুরী বেড়ে যাওয়া মানে কাজেকর্মে শ্লথগতি দেখা দেওয়া। চিরা-চরিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রায়শ: তা ঘটতে দেখা যায়! পরিবর্তে শ্রমিক অধিক বিশ্রামে লিপ্ত হয়। তেমনি কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মজুরী বেড়ে গেলেই যে শ্রমিক তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন না-ও ঘটতে পারে। তার পুরানো পরিচিত ক্ষেত্র ছেড়ে সহজে সে নড়তে চায় না। বর্ধিত মজুরী মনে হয় তার কাছে তেমন লোভনীয় কিছু নয়। উদাহরণ দেয়া যাক: পশ্চিম ভারতীয় শ্রমিক সম্পর্কে জ্ঞাত একজন দর্শক মন্তব্য করেছেন, "বহু শ্রমিক সারা বৎসর ধরে নিয়মিত সপ্তাহে ৫।৬ দিন কাজ করতে রাজী নয়....। সাদামাঠা ডালভাত খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু, বিশ্রামের পরিমাণ একটু বেশী চাই। জীবন-ধারণ মান বাড়াবার স্পৃহা যেমন নেই, তেমনি তার তাৎপর্য অনুধাবন করার মত শিক্ষারও অভাব। ঘসেমেজে জীবন কাটিয়ে দেবে, তবু অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হবে না।"[১০]

---

৯. W. E. Moore প্রণীত Industrialization & Labour নামক পুস্তক দেখুন।

১০. দেখুন T. S. Simey প্রণীত Welfare and Planning in the West Indies, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৩-১৩৪।

সারণী ১৪.২ নির্বাচিত দেশসমূহে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নির্দেশক

দেশ	(১) যক্ষ্মা	(২) শতকরা লোক সংখ্যা বয়স : দশ ও তদূর্ধ্ব নিরক্ষর ১৯৪৫-১৯৫৪	(৩) চিকিৎসাবিদ প্রতি মোট লোকসংখ্যা	(৪) হাজার প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা
ধনীদেশ :				
অষ্ট্রেলিয়া	৪০	৫-এর নীচে	১,০০০	৩.৭৮
কানাডা	৫৩	৫-এর নীচে	৯৫০	৫.৪৩
নিউজিল্যাণ্ড	৬০	৫-এর নীচে	১,২৫০	৪.৫৮
নরওয়ে	৮৬	৫-এর নীচে	৯২০	৩.৮০
সুইডেন	৭৫	৫-এর নীচে	১,৪০০	৪.০৩
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	৬২	৫-এর নীচে	১,২০০	৪.১১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৭	৫-এর নীচে	৭৭০	৪.২৯
দরিদ্র দেশ :				
বলিভিয়া	মধ্যম	৬৯	৪,৭০০	১.৬২
ব্রাজিল	২৫০	৫১	৩,০০০	১.৯৭
সিংহল	৬২	৩৬	৫,৩০০	—
চিলি	২৬৪	২৪	১,৮০০	২.৫৪
চীন	৪০০-৫০০	৮৫	২,৮০০	১.৭৩
কলম্বিয়া	১০২	৪৪	২,৮০০	১.৪১
কষ্টারিকা	১৭২	২১	২,৮০০	৪.৭৪
ইকুয়েডর	উচ্চ	৪৪	৩,৭০০	১.০৩
মিশর	৫২	৭৫	৩,৬০০	১.৫৮
এলসালভাডর	উচ্চ	৫৮	৬,০০০	১.৮১
গ্রীস	১২৮	৪১	১,০০০	২.১৭
গুয়াতেমালা	মধ্যম	৭০	৫,৮০০	১.২৪
হাইতি	উচ্চ	৮৯	১০,০০০	০.৬৩

ভারত	২৮৩	৮২	৫,৭০০	১·২৭
ইন্দোনেশিয়া	উচ্চ	৯২	৭১,০০০	—
মেক্সিকো	৫৬	৬২	২,৪০০	২·৪০
পেরু	উচ্চ	৯০	৪,৫০০	১·৯৩
ভেনেজুয়েলা	২৩৩	৫১	১,৯০০	০·৯৪

উৎস : (১) এবং (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রকাশিত Point Four, Publication ৩৭১৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫-১১৬, ১২২-১২৩, (২) জাতিপুঞ্জ Demographic yearbook, ১৯৫৫, সারণী ১৩, (৩) জাতিপুঞ্জ Statistical yearbook, ১৯৫৫ সারণী ১৩·২।

প্রশ্ন উঠতে পারে কয়েকদিন কাজ না করা অথবা অধিক মাইনের তোয়াক্কা না করা মানে কি অধিক বিশ্রাম অভিলাষী হয়ে উঠা? অথবা নিজের মঙ্গলে অবহেলা করা? তাত্ত্বিক দিক থেকে বলতে গেলে তার অর্থ দাঁড়ায় শ্রম-সরবরাহ নির্দেশক রেখা (Supply curve of labour) তার সমগ্র পথ জুড়ে ডানদিকে উর্ধ্বমুখী অগ্রসর না হয়ে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে বাঁদিকে ঢালু হয়ে নিম্নগামী হয়ে উঠে। অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে পেঁৗছাবধি উপযোগিতা উর্ধ্বমুখী থাকে। অতঃপর তা নিম্নমুখী হয়ে উঠে। অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে এসে মনের আশ 'সর্বোচ্চ'ভাবে মিটে যায়। অতঃপর মাইনের সামান্য বাড়তি তেমন কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে শ্রম-সরবরাহ নিম্নগামী হয়ে উঠে। কিন্তু এই "পশ্চাৎমুখী সরবরাহ রেখা" সম্পর্কে নানা মুনীর নানা মত। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী দরিদ্রদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলাও কঠিন। কেননা ঐ সকল দেশে শ্রম-সরবরাহ কেবল ধনবিজ্ঞানের আইন মেনে চলে না। সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা বিশেষভাবে তার নিয়ামক। সুতরাং পশ্চাদমুখী শ্রমসরবরাহ রেখা লক্ষ্য করেই কেউ যদি বলতে চান যে সেখানে শ্রম-স্পৃহা তেমন সবল নয়, বরং বিশ্রাম-অভিলাষ অধিক আকাঙ্ক্ষিত তাহলে বোধ হয় ঠিক হবে না।

রটেনবার্গের আলোচনায় আমরা এই উক্তির সমর্থন পাই। তিনি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শ্রমিকদের আলোচনা করতে যেয়ে মন্তব্য করেছেন: কোন কোন কাজে শ্রমিকরা যে উৎসাহী নয় তার অর্থ এই-ভাবে নেয়া ঠিক হবে না যে তারা তাদের উন্নতিতে মনোযোগী নয়, বরং সামান্য ডাল-ভাত খাওয়ার মত যা রোজগার করে তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি

আরও বলেছেন যে, এর থেকে ইহাও প্রমাণিত হয় না যে তারা অধিক বিশ্রামবিলাসী। বরং বিষয়টিকে পেশা সঞ্চালন সুযোগ-সুবিধার অভাব বলে চিহ্নিত করলে অন্যায় হবে না এবং এই পরিস্থিতি শ্রমিককে নির্দিষ্ট কোঠায় গণ্ডিবদ্ধ করে রাখে। এই গণ্ডিবদ্ধতা প্রথা, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ উত্থিত।[১১]

উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে এবারে বিস্তৃত করা যাক। সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলী দরিদ্রদেশে বেশ প্রবলভাবে বিরাজমান। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে তাদের প্রভাব বেশ সবল। মজুরীর সামান্য বর্ধন তা খণ্ডাতে সক্ষম নয়। সুতরাং শ্রম-সরবরাহ ঐ সকল বিষযাবলীর উপরই অধিক নির্ভরশীল। কাজেকাজেই মাইনের সামান্য বর্ধন দেখে অধিক হারে শ্রমিক কোন বিশেষ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এমন মনে করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। তেমনি কাজের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে এই আশা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। যৌথ পরিবার, বর্ণপ্রথা ও গোষ্ঠীপ্রথা বেশ প্রভাবশীল সংস্থা। তাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠা মুখের চাট্টিখানি কথা নয়। সুতরাং, যে সকল ঐতিহ্য পেশা-সঞ্চালন সহজ করার পরিপন্থী তারা বেশ জোরের সাথে শ্রম-সরবরাহ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অন্যদিকে "ধনবিজ্ঞানের যুক্তিতর্কে মজুরী বর্ধন হেতু শ্রমের সাড়া না দেওয়াকে হয়ত অযৌক্তিক বলা যেতে পারে। কিন্তু, এই অযৌক্তিকতাই হয়ত অন্য পরিস্থিতিতে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। দ্রব্য যেথায় পারিবারিকভিত্তিতে উৎপাদিত হয় এবং দ্রব্য-বিনিময় প্রথা ও পরস্পর চুক্তি প্রথা মেনে বন্টিত হয়, সেথায় শ্রমের এই অযৌক্তিকতাই অধিক যুক্তিগত বলে বিবেচিত হতে পারে। তেমনি, যে স্থলে সাধারণ বাজার সীমাবদ্ধ সেখানে শ্রম-সরবরাহের এই নীতিই হয়ত অধিকতর যুক্তিসংগত। টাকা দিয়ে কি হবে, যদি শ্রমের জ্ঞানের চৌহদ্দিতে কেনার মত তেমন কিছু না পাওয়া যায়।"[১২]

অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা পশ্চাৎপদতার অপর অন্যতম লক্ষণ। লেখাপড়ার চর্চা নেই। জ্ঞানের অভাব বিরাজমান। বিদ্যমান

---

১১. দেখুন S. Rottenberg প্রণীত এবং Journal of Political Economy LX নম্ব-2-এ প্রকাশিত "Income & Leisure in an Underdeveloped Economy" নামক প্রবন্ধ।

১২. Moore প্রণীত উপরোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৬।

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কেউ তেমন জ্ঞাত নয়। বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না অথবা মাথা ঘামাতে পারে না। প্রয়োজনীয় পটুতা সম্পর্কে অবজ্ঞাত নয়। তেমনি বাজার পরিস্থিতি বিষয়ে জানাশুনার অভাব। প্রযুক্তিক অর্থে উৎপাদন-প্রণালী যেমন উন্নতি লাভ করেনি তেমনি সামাজিক-সম্পর্কেও ব্যাপক কিছু দৃঢ়তা গড়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক সম্পর্ক ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়াবলী নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কেও জ্ঞানের পরিমাণ নেহায়েত সীমাবদ্ধ। অথচ উৎপাদন বর্ধনে ও সার্বিক উন্নতি সাধনে সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য কোন অংশে কম নয়। উন্নয়নে প্রযুক্তিক-বিদ্যা যেমন জরুরী তেমনি সামাজিক বিষয়াবলীও অত্যাবশ্যকীয়। উৎপাদন বাড়াতে কল-কারখানা গড়ে তুলতে হয়। বড় বড় শিল্প-সংস্থা স্থাপন করতে হয়। তাদের সুস্থ চালনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়—শিল্প কারখানা অর্থনৈতিক যুক্তিভিত্তিক করে তুলতে হয় এবং তা করা সহজ হয়, যদি সমাজ-ব্যবস্থায় যুগপৎ পরিবর্তন ও পরিশোধন ঘটানো সম্ভব হয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের অনুসারী হয়ে উঠা প্রয়োজনীয়। দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ হয়ে উঠলে তবেই উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠতে পারে।[১৩]

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা দরিদ্রদেশের সামাজিক অবয়ব এবং মূল্য-বোধেও বিধৃত হয়ে রয়েছে। অনেক দেশে সমাজ ব্যবস্থা **পুরোহিত-তন্ত্র** (heirarchical) ভিত্তিক। সামাজিক সম্ভেদ (social cleavages) বেশ জোরেসোরে বিরাজমান। ব্যক্তিতে পরোয়া নেই। বরং পরিবার বা গোষ্ঠীতে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সামাজিক বিবেচনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, পরিবার বা গোষ্ঠীগত। সামাজিক-বিন্যাস ঋজুভাবে স্তরীভূত (stratified) এবং স্তরান্তর অনেকটা অসম্ভব। ব্যক্তিকে বিচার করা হয় তার জন্ম দিয়ে, কর্ম দিয়ে নয়। পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত মর্যাদায় সে মর্যাদাসম্পন্ন, স্ব-স্বার্থকতায় নয়। আরোপিত মর্যাদায় তার জন্মগত অধিকার। কৃতিত্বে মর্যাদা নিরূপিত হয় না। সুতরাং ব্যক্তির মূল্যায়ন তার কর্মে নয়। তার মূল্যায়ন হয় সমাজ ব্যবস্থার কোন্ স্তরে তার জন্ম, তা দিয়ে।

মূল্যবোধ অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণায় পরিপন্থী হিসাবে ক্রিয়া করে। পার্থিব প্রচেষ্টায় তেমন গুরুত্ব দেয় না। উদ্যোগজনিত ক্রিয়াকর্মে প্রেরণা

১৩. দেখুন ডব্লিউ. এ. লিউইস প্রণীত Theory of Economic Growth, পৃষ্ঠা-১৬৪।

যোগায় না। অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক যুক্তিতর্কে ও সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এই মূল্যবোধ পশ্চাৎমুখী বলে চিহ্নিত হতে বাধ্য। অন্যান্য বিবেচনায় হয়ত তা তেমন বলে গরিগণিত না-ও হতে পারে। উন্নয়নক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ অবশ্যই নিন্দনীয়। কেননা, তা উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে তেমন পাত্তা দেয় না। নব নব ধ্যান-ধারণা গ্রহণে ও উদ্দেশ্য হাসিলে উৎসাহ যোগায় না। লক্ষ্য অর্জনে বিকল্প পন্থা অবলম্বনে তা প্রতিকূল হিসাবে কাজ করে। মানুষের ক্ষমতাকে খর্ব করে। প্রকৃতিকে অজেয় বলে মনে করে।

বহু দরিদ্রদেশে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত নয়। তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগতি নেই। তেমনি বাজার-পদ্ধতি নামমাত্র প্রচলিত। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় ব্যক্তির উপস্থিতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা দেশাচার মাফিক। কোন নূতনত্ব নেই। নেই পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পৃহা। ধরাবাধা পথ ধরে নমো: নমো: করে দিন কাটিয়ে দিতে সবায় অভ্যস্ত।

এদিকে ধর্মীয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তেমন উদার নয়। পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ে ভেদাভেদ নেই। ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক ব্যক্তিগত জীবন তেমন স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করতে পারে না। বৈষয়িক মনোভাব ধর্মীয় মনোভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই উভয় ধর্মে চাওয়া-পাওয়া দোষণীয় বলে গণ্য হয়। আর সরল-সহজ জীবন কাম্য বলে বিবেচিত হয়। পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে পারত্রিক জীবনে সবায়কে উৎসাহী করে। পবজন্মে সুখী হওয়ার পথ নির্দেশ করে। এই জন্যে ভোগবিলাসী জীবন হতে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করে। ভাগ্যে বিশ্বাসী পরিবেশ ও চিন্তাস্রোত কর্মস্পৃহাকে অবনত করে তোলে। ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে সবায় স্রোতে গা ভেসে বেড়ায়। কোন কোন দেশে আবার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন সাধন অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং পরিবর্তন আনয়নে কেউ উৎসাহী হয় না। অত্যুৎসাহী কেউ নূতন কিছু করতে চাইলে তার ভাগ্যে জোটে ভৎর্সনা।

সামাজিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের ঋণাত্মক ও পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক পরিবর্তন, পরিশোধন ও পরিযোজন ব্যর্থ করে দেয়। মানুষ তার প্রকৃত ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয় না। প্রকৃতির

হাতে ক্রীড়নক হয়ে কোন রকমে পরিচিত পথে জীবন কাটিয়ে দেয়। উদ্যোগ গ্রহণে কেউ উৎসাহী হতে পারে না। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সমাজ জীবনে ধনাত্মক কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। যুগ যুগের ভারসাম্য পরিস্থিতি বজায় রাখায় সবায় আগ্রহী। ফলে, প্রতিটি মানুষ পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত আনুগত্য মেনে চলতে থাকে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দরিদ্রদেশ দরিদ্রই থেকে যায়। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যে গতানুগতিক জীবনধারা প্রদান করে, তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে না।

উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা সাধনার ফল। মানুষ ধনসম্পদ কাজে খাটিয়ে অর্থনীতির নানাক্ষেত্রে সংযোজন ঘটিয়ে যাবে তবেই উন্নয়ন সম্ভব হয়। এই সংযোজন ঘটে উদ্যোক্তাদের হাতে। সুতরাং উদ্যোক্তার অভাব বিদ্যমান দেশে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা সেই দেশে হয়ত প্রচুর সম্পদ রয়েছে, প্রয়োজনীয় শ্রম-সরবরাহ প্রযুক্তি বিদ্যা এবং মূল-ধনও হযত বিদ্যমান। কিন্তু এগুলো কাজে খাটাবার লোকের অভাব বলে সম্পদ দিয়ে কি হবে? তাতেও উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই? তজ্জন্য চাই উপযুক্ত হোতাব্যক্তি, কর্মক্ষম ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন কার্য নির্বাহক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আগাছার মত গজিয়ে উঠে না। তাকে উপযুক্ত বপন ও নিড়ানী দিয়ে গজিয়ে তুলতে হয়। কেবল উৎপাদন উপকরণ থাকলেই হয় না। এগুলো কাজে খাটাবার পরিবেশ চাই। চাই এগুলো চালু করার মত ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি। সোজা কথায় অনুঘটক (catalyst) চাই। তজ্জন্য দরকার অত্যুৎসাহী কর্মীদল।

কিন্তু অত্যুৎসাহী ও উদ্যোগী কর্মী পাওয়া যাবে কোথায়? সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসন এমন তাতে উদ্যোক্তা জন্ম নেওযার সুযোগ কোথায়? টাকা-পযসা রোজগার করে স্বার্থক বলে পরিচিত ও সম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে বিদ্যমান নয় সেখানে কর্মস্পৃহা ও উদ্ভাবনী মনোভাব আসবে কোত্থেকে? জন্ম দিয়ে হয় মান নির্ণয়। সম্মান আসে পদমর্যাদা বলে। গুণের জন্য নয়। স্বার্থকতার জন্য নয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে করা হয় অবহেলা, কোথায় বা ঘৃণা। উদ্যোগ হেথায় অপমানিত হয় বিনা কারণে। বিনষ্ট হয় মূল্যবোধের বেদীমূলে। উদ্যোক্তা পায়না স্বীকৃতি, উদ্ভাবনী প্রতিভা ও স্বার্থকতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই। সুতরাং উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য।

ব্যক্তিগত মালিকানা সুস্পষ্ট নয়। ইচ্ছামত কাজ-কারবার করার সুযোগের অভাব। বাজার পরিস্থিতি সীমাবদ্ধ। জ্ঞানের অভাব, এই অবস্থায় উদ্যোক্তাশ্রেণী গজিয়ে উঠতে পারে না। অন্যদেশের মত এই সকল দেশেও হয়ত অনেকের মনে একটা কিছু করার মত স্পৃহা বিদ্যমান রয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণের মত আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারে না। নানাদিকে বাধাবিপত্তি বর্তমান। নানারকম অসুবিধা বিদ্যমান। সুতরাং উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ণয় করে ক্রিয়াকর্ম শুরু করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠে না। কোথায় যে সুযোগ অপেক্ষা করে আছে সেই হয়ত অনেকের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। আবার অনেকে হয়ত উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে পায়। কিন্তু কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সব সুযোগ কাজে পরিণত করার মত ক্ষমতাবান নয়। ফলে যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। এই সকল কারণে যথেষ্ট সংখ্যায় উদ্যোক্তাশ্রেণী জন্ম নেয় না। সবেধন নীলমণি যেই কয়জন সুযোগ করে নিতে পারে তারা আবার দূরকল্পী শিল্প-সংস্থাপনে তেমন উৎসাহী হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটখাট্ট ব্যবসা করে বেড়ায়। সাধারণ মালামাল নিয়ে কায়কারবার করে। বিশেষ করে তাদেরকে বন্টন-জনিত কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। তেমনি জমির ব্যবসা ও টাকা-পয়সার লগ্নী কারবারে তাদের উৎসাহ বেশী। অনেকক্ষেত্রে এইসব ব্যবসায়ী আবার বিদেশী হতে দেখা যায়, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় চীনারা কি বার্মায় হিন্দুস্থানীরা। অন্যদিকে এই সবে কিছুদিন হল বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে, এমন সব লোকদেরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

ধনীদেশে নিত্য-নিরন্তর উদ্যোক্তা জন্ম নিয়ে চলেছে। নিত্যনূতন কাজে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। কত রকম কাজ আর কত রকম পথে তারা এগিয়ে ছুটেছে। একের দেখাদেখি দশ ছুটে আসছে। এদিকে একক্ষেত্রে ক্রিয়া বেড়ে দশক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতেও নূতন নূতন উদ্যোক্তা দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে দরিদ্র দেশে উদ্যোক্তা তেমন বাড়ছে না। বিদ্যমান যারা তারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্ম করে চলেছে। ফলে, নিত্য-নূতন ক্ষেত্রে কাজকারবার সম্প্রসারিত হতে পারছে না। তার ফলে উদ্যোগ গ্রহণকারী লোকের সংখ্যাও বর্ধিত হতে পারছে না। ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম অধিক লোকের মধ্যে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে

পারছে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা দিচ্ছে একাধিপত্য। নামমাত্র যে কয়জন উদ্যোক্তা বিদ্যমান থাকে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য বিরাজ করতে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণকারী লোক গজিয়ে উঠতে পারে না।

শিল্প-সংস্থা স্থাপনে সরকারী উদ্যোগও নামেমাত্র বিদ্যমান। সরকার আজও তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং একদিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নগণ্য, অন্যদিকে সরকারী সক্রিয়তাও নামমাত্র। রাজনীতি তেমন শিকড় গেড়ে উঠতে পারেনি। সুষ্ঠু ও সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অভাব। আশা-আকাঙক্ষা পূরণে সক্ষম কর্মসূচী গ্রহণের মত রাজনৈতিক দল নেই বললেও চলে। কাজেই, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যধিক দুর্বল ও স্পর্শকাতর। এককথায়, রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থ নয়। চারিদিকে অস্থিরতা বিরাজমান। অর্থনৈতিক নীতি-প্রণালী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মত দক্ষ লোকের অভাব। সরকারী রাজস্বনীতি ভোতা প্রকৃতির। ক্ষুরধার ও সুষ্ঠু রাজস্বনীতি গড়ে তোলার মত বিশেষজ্ঞ নেই। আর থাকলেই বা কি? তা কাজে পরিণত করবে কে? অন্যান্য নীতিমালার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।[১৪] পরিসংখ্যান তথ্যাদির অভাব। নামমাত্র কিছুটা যাও বিদ্যমান আছে তা আবাব বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই, কাজে লাগাবার অনুপযুক্ত। সুতরাং, এইসব কাঁচা মালমশলার ভিত্তিতে কার্যকরী বাজেট নিয়ন্ত্রণ পন্থা গড়ে তোলা যায় না। এদিকে আবার প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল। শাসন প্রণালী সুষ্ঠু নয়। দক্ষ কর্মচারীর অভাব। সৎ, সাধু কর্মচারীর অপ্রতুলতা। সরকারী চাকুরী তেমন আকর্ষণীয়ও নয়। মাইনে-পত্তর কম। সুযোগ-সুবিধার অভাব। তায় আবার উচচাসনে অধিষ্ঠিত স্বল্প-সংখ্যক আমলাগোষ্ঠীর কায়েমী দৃষ্টিভঙ্গি। অধিকাংশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিয়ে চেপে বসে থাকে। এদিকে প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। মন্ত্রীকুল ও স্বার্থান্বেষী উচচ রাজকর্মচারী গোষ্ঠী প্রথা-প্রণালী প্রণয়নেই মশগুল থাকে। খুঁটিনাটি তলিয়ে দেখার সুযোগ পায় না। বহু সরকার উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগে উৎসাহ দেখায় না। ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত

১৪. ভারত সরকার অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তার স্থান বেশ উর্ধ্বে। সে প্রায় উন্নত ১০।১২ টা দেশের সমকক্ষ। আলোচনা করুন Paul H. Appelby প্রণীত Public Administration in India, Report of a Survey, Cabinet Secretariat, New Delhi, 1953, 8.

নেই, যেমন-তেমন করে কাজ চালিয়ে নিতে চায়। ফলে সুষ্ঠু প্রকল্প প্রণয়নযোগ্য কর্মীর যেমন অভাব তেমনি সুসংবদ্ধ ও সুসংহত কর্ম-প্রণালী গড়ে তোলার মত কর্মী-শ্রেণীর সংখ্যাও নগণ্য। ফলে সরকার নামমাত্র যা ক্রিয়াসম্পন্ন করে তাও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না।

দরিদ্র দেশে সরকারী রাজস্ব প্রণালী স্বতন্ত্র হতে দেখা যায়। প্রায় সব দেশে পরোক্ষ কর ও বাণিজ্য শুল্ক সরকারী রাজস্বের অধিকাংশ যোগান দেয়। প্রত্যক্ষ কর তেমন ধর্তব্য নয়। পরোক্ষ কর ও বাণিজ্য শুল্ক অবনতি-শীল (regressive) কর। ভূমি-রাজস্ব নেহায়েত নগণ্য। প্রগতিশীল আয়কর নামমাত্র বিদ্যমান এবং তার থেকে পাওয়া আয় সামান্য মাত্র। উদাহরণ হতে কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। কলম্বো পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এশিয়ান দেশ-সমূহে শতকরা মাত্র ১ ভাগ বয়স্ক লোক আয়কর প্রদান করে এবং তাদের মধ্যে বড় করে দেয়ার মত লোক নেহায়েত নগণ্য।[১৫] ১৪.৩ নম্বর সারণী থেকে দরিদ্র দেশের রাজস্ব পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য পাঠ করা যায়। একদিকে করপ্রথা মাথামুণ্ডহীন ও অবনতিশীল, অন্যদিকে দেদার কর ফাঁকি চলেছে। দক্ষ ও সাধু কর-কর্মচারীর একান্ত অভাব। সুতরাং রাজস্ব-প্রথা কার্যকরী করে তোলার মত পরিবেশ বিদ্যমান নয়।

মুদ্রা বাজার অনুন্নত। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়। ফলে মুদ্রানীতি (monetary policy) তেমন কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হয়ত বিদ্যমান নেই। আর থাকলেও হয়ত সবেমাত্র শুরু হয়েছে,। ফলে তার ক্রিয়াকর্ম তেমন বিস্তৃত নয়। তেমনি কার্যকরীও নয়। মুদ্রাবাজার সুষ্ঠু নয়। তার কর্মপ্রণালী সংযত নয়। ক্ষমতা আরও সীমাবদ্ধ। ছোট ছোট মুদ্রাবাজার নেই বললেই চলে। ফলে উন্নত মুদ্রাবাজারের একটা কার্যকরী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই।

দরিদ্র দেশগুলোতে আমানতি ব্যাঙ্কিং উন্নত নয়। কোথায় বা হয়ত একে-বারে নেই। কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে চলতি আমানত মোট মুদ্রার প্রায় ৩/৪ গুণের সমান, আর নাইজিরিয়ায় তা মোট মুদ্রার অর্ধেকেরও কম। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ বিনিময়ে নগদ লেনদেন করছে চলতি আমানতের প্রায় ১০ গুণ। এদিকে

---

১৫. দেখুন F. Benham প্রণীত "The Colombo Plan," Economica, XXI, No. 82, 95 (May, 1954).

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে মোট আমানতের প্রায় ৭০ ভাগ ছিল নগদ টাকা এবং তা ছিল প্রায় চলতি আমানতের সমান।[১৬]

সারণী ১৪ ৩ নির্বাচিত দেশে সরকারী রাজস্বের মুখ্য অঙ্গসমূহ

স্ব স্ব মুদ্রায় প্রাপ্ত সরকারী রাজস্ব (লাখ টাকায়)

দেশ	মোট প্রাপ্তি (লাখ টাকায়)	সূত্র: প্রত্যক্ষ কর	সূত্র: বাণিজ্য শুল্ক	সূত্র: অন্যান্য পরোক্ষ কর
ধনী দেশ :				
কানাডা (১৯৫৪)	৪২,৮৫০	২৪,৭২০	৪,০৭০	১১,২৪০
নিউজিল্যাণ্ড (১৯৫৪)	২,২৪০	১,৪০০	৩২০	১৩০
নরওয়ে (১৯৫৫)	৪১,৮৮০	১৩,৪০০	৩,১০০	২২,০৮০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৫)	৬,৯৩,৬৯০	৫,৭০,৭০০	৬,০৬০	৯১,৯৪০
দরিদ্র দেশ :				
ব্রাজিল (১৯৫৪)	৪,৬৫,৩৯০	১,৭৭,৯৮০	২৭,৩৮০	২,২৪,৫৫০
বার্মা (১৯৫৪)	৯,৭৯০	৩,৩২০	২,৫৫০	১,১২০
সিংহল (১৯৫৪)	৯,০৯০	২,৩৮০	৫,০৩০	৮২০
কষ্টারিকা (১৯৫৪)	২,১৬০	৪১০	১,০৪০	৪২০
মিশর (১৯৫৩)	১,৭৭০	৩৮০	১৫০	৭৮০
এলসালভাডর(১৯৫৩)	১,৪০০	১৭০	৮৪০	২৬০
হাইতি (১৯৫৪)	১,৬১০	১২০	১,২১০	১১০
হণ্ডুরাস (১৯৫৩)	৫১০	৭০	২৩০	৫০
ভারত (১৯৫৪)	৫৫,৬৮০	১২,২৮০	১৫,৮৭০	৯,৭৪০
ইরান (১৯৫০)	৭৭,৮৫০	১১,৬০০	১৬,৭৯০	২৬,৬৭০
লেবানন (১৯৫২)	১,২৫০	১৮০	৩৭০	৪৩০

১৬. দেখুন I.B.R.D. প্রকাশিত "The Economic Development of Nigeria," ১৯৫৫ সাল।

মালয় (১৯৫৩)	৬,৬০০	১,৬৪০	৩,১১০	৬৮০
ম্যাক্সিকো (১৯৫৩)	৫০,২৩০	১১,৪৫০	১৩,১১০	১৫,৮১০
পাকিস্তান (১৯৫৪)	১৩,১৮০	১,৪৬০	৪,৪১০	১,৭০০
সিরিয়া (১৯৫৪)	২,৭২০	৮০০	৬৪০	৬০০
থাইল্যাণ্ড (১৯৫২)	৩০,৫৫০	১,৭৪০	১১,১৮০	৫,৯৬০
তুরস্ক (১৯৫৩)	১,৬৫,৩৪০	৩,৯৭০	১,৯২০	৬,২২০

উৎস : জাতিপুঞ্জ, বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা ১৯৫৫, সারণী ১৬৬।

হাতে নগদ টাকা নিয়ে বসে থাকা ও বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা দরিদ্র দেশের লোকের একটা কৌলীন্যবোধক অভ্যাস। তার ফলে টাকা-পয়সার লগ্নী ব্যবসা (loans and advances) তেমন দৃঢ় হয় না। যাও বা হয় তাও অনেকটা মৌসুমী (seasonal) এবং প্রায় সবটা আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত। কৃষিপ্রধান দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা এমনিতেই নামমাত্র। কৃষিবা ব্যাঙ্কের আওতায় সাধারণতঃ আসে না। আর যেদেশে জীবন ধারণোপযোগী কৃষি বিদ্যমান সে দেশে অধিকাংশ লোক বিনিময় প্রথার সাথে পরিচিত নয়। মুদ্রা বিনিময় প্রথা তেমন জোরদার নয়। ব্যাঙ্কের সংখ্যা নগণ্য। তার মধ্যে অধিকাংশ আবার বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে লিপ্ত।[১৭]

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রাবাজার তেমন তেজী নয়। তাতে নানারকম দুর্বলতা বিদ্যমান। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তেমন সফলতার সাথে ক্রিয়া করতে পারে না। কেননা তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি বিধান সম্ভব হয় না। বিল-বাজার ও ষ্টক-মার্কেট দৃঢ় নয়। তেমনি এরা অপর্যাপ্ত এবং অগোছালোও। ফলে তপসিলি ব্যাঙ্কগুলোর উপরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়ে উঠেনি। তাতে টাকার সাবলীল গতি ও নমনীয়তা প্রতিহত হয়। তারফলে মুদ্রানীতি পুরোপুরি কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হয় না।

বর্তমান আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। সুতরাং এবারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধিকাংশ অনুন্নত দেশের সরকার বড় বড় জমিদারদেরকে নিয়ে গঠিত অথবা তারা সরকারকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাভাবিকভাবে এই সকল ভূ-স্বামী ভূমি সংস্কারে যেমন উৎসাহী নয় তেমনি বড় আকারে শিল্প সংস্থা গড়ে উঠুক তাও চায় না। কায়েমী স্বার্থ বানচাল হতে পারে ভেবে তারা বরং পরিবর্তনে বিরোধিতা প্রদান করে। দেশের

১৭ দেখুন এস. এন. সেন প্রণীত Central Banking in Underdeveloped Countries, ১৯৫২ সাল, পৃষ্ঠা ২৮।

উন্নতি ঘটলে এদের মাতবরী ও মুরুব্বীয়ানা হাল্কা হয়ে যেতে পারে এই হল তাদের মনোভাব। সুতরাং, ঠেকাও উন্নতির যত পথ। উন্নয়ন মানেই ভূমি সংস্কার, কৃষিকে অধিক মূল্য দেওয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করা এবং ফলে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দর্প খর্ব হওয়া। তাহলেই যে দফারফা। সুতরাং, আপামর জনসাধারণ যত ভোগে ভুগুক। কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ও ঠাট্ বজায় রাখতে হবে। তজ্জন্য যে মূল্যই দিতে হউক না কেন। নানারকম কারসাজী অনবরত চলতে থাকে। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন লোকদেরকে শত্রু বলে আখ্যায়িত করতে এরা দ্বিধা করে না এবং সম্ভাব্য সব রকম হয়রানি পন্থা গ্রহণ করে চলে। সুতরাং দেশ যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যেতে বাধ্য যতক্ষণ না এই সব কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। বরং বিদ্যমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে অবস্থার অবনতি ঘটা বৈ উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

(ঙ) পুঁজি-স্বল্পতা :

দরিদ্রদেশের অপর বৈশিষ্ট্য পুঁজিস্বল্পতা। মাথাপিছু নামমাত্র পুঁজি বিদ্যমান। তাও আবার বহুমুখী নয়। এ বিষয়ে অবশ্য নির্ভরশীল তেমন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সামান্য যে সব উপাত্ত পাওয়া গিয়াছে তার থেকে জানা যায় যে বৃটিশ অধ্যুষিত কলোনীগুলোতে মাথাপিছু মূলধন বৃটেনের তুলনায় শতকড়া ১০ ভাগেরও নীচে আর আফ্রিকায় তা শতকরা ২ ভাগের উর্ধ্বে নয়।[১৮] অপর এক হিসাব থেকে পাওয়া যায় যে, ১৯৩৯ সালে জাপানকে বাদ দিয়ে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনপ্রতি প্রকৃত মূলধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় শতকরা মাত্র ১০ ভাগের মত ছিল।[১৯] বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ভক্ষণ থেকে আরেকটি হিসাব পাওয়া যায়। অবশ্য তা ধনী-দরিদ্র দেশে বিদ্যমান বৈষম্য পরোক্ষভাবে প্রদর্শন করে। ১৯৫৪ সালে আমেরিকায় মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছে ৭.৬২ মেট্রিক টন; ক্যানাডায় ৬.৮৮ টন; নরওয়েতে ৫.০২ টন এবং বৃটিশ যুক্তরাজ্যে ৪.৭৮ টন।[২০] তার তুলনায়

---

১৮. Colonial Development Corporation প্রদত্ত ১৯৪৮ সালের রিপোর্ট দেখুন।

১৯. জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত দফতর প্রকাশিত Economic Survey of Asia and the Far East in 1949 দেখুন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬।

২০. জাতিপুঞ্জ বার্ষিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা, ১৯৫৫ সাল, সারণী ১২৪।

এশিয়ায় গড়ে মাত্র ০·২০ টন; আফ্রিকায় ০·২৪ টন ও দক্ষিণ আমেরিকায় ০·৫২ টন। অন্যদিকে, ১৯৫৩ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী অধিষ্ঠিত ক্ষমতা ছিল নাইজেরিয়ায় ৫১,০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা; ম্যাক্সিকোতে ১৭,০১,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা; ব্রাজিলে ২১,০৪,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা; সিংহলে ৪১,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা; ভারতে ৩০,৯৭,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা; ইন্দোনেশিয়া ২,০৯,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা এবং তুরস্কে ৫,০৫,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা; আর ব্রিটেনে তা ছিল ১৯৮,৩৭,০০০ কেলো-ওয়াট-ঘণ্টা ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে ১০৭৩,৫৪,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।[২১]

শুধু মূলধন পরিমাণ কম এই নয়, বর্তমান সঞ্চয়ও খুব কম। নাম-মাত্র পুঁজিগঠন হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগ মাত্রা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। যেমন পাকিস্তান কি ভারতের কথা ধরুন। এই উভয় দেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬/৭ ভাগের অধিক বিনিয়োগ ঘটছে না। ইন্দোনেশিয়ায় তা আরো নীচে। মাত্র ৫ ভাগের মত।[২২] অথচ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ইত্যাদি দেশে তা ১৫ থেকে ১৮ ভাগেরও উর্ধ্বে। এশিয়া ও আফ্রিকার তুলনায় লাতিন আমেরিকায় বিনিয়োগ কিছুটা বেশী হচ্ছে। শতকরা প্রায় ১৪ ভাগের মত। তবে তার একটা বিরাট অংশ বিদেশী পুঁজি, তাছাড়া, লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে খুব উচচ-হারে। কাজেই বিনিয়োগের বিরাট অংশ তা গ্রাস করে চলেছে। তাতে করে নীট বিনিয়োগ তেমন কিছু একটা বড় রকমের ঘটছে না।

১৪·৪ চিত্র থেকে দরিদ্রদেশে সঞ্চয়ের একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। হিসাবটা জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে এবং ১৯৪৯ সাল সম্পর্কিত। গড়ে তা মাত্র শতকরা ৫ ভাগের মত। সুতরাং, এই যৎকিঞ্চিত সঞ্চয় দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে তেমন কি আর যোগ করা যেতে পারে। বহুদেশে যে হারে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে বাড়তি পুঁজি মাথাপিছু মূলধনী সম্পত্তির বর্তমান পর্যায় বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। মনে করুন পুঁজি-ফল অনুপাত (Capital-output ratio) ৪:১। লোকসংখ্যা এক শতাংশ বেড়ে গেলে তাদেরকে বর্তমান পর্যায়ে রাখার জন্য জাতীয় আয়ের ৪ ভাগ

---

২১. উপরোক্ত পরিসংখ্যান পুস্তিকা, সারণী ১১৯।

২২. ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্টো প্রণীত **"The Take-off into Self-Sustained Growth"** দেখুন।

বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ ধ্রুব পর্যায়ে রাখার জন্য প্রতি এক ভাগ লোকসংখ্যা বর্ধনে জাতীয় আয়ের ৪ শতাংশ লগ্নী করা প্রয়োজন। এই হিসাবে লোকসংখ্যা ২ শতাংশ বেড়ে গেলে জাতীয় আয়ের ৮ শতাংশ বিনিয়োগ ঘটানো দরকার। ৩ শতাংশ হলে ১২ শতাংশ প্রয়োজন। অধিকাংশ দরিদ্রদেশে লোকসংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ ধ্রুব পরিস্থিতি বজায় রাখতে হলে কম করে ১২ ভাগ বিনিয়োগ ঘটানো একান্ত বাঞ্ছনীয়। অথচ এদের অধিকাংশ দেশে মূলধন-সংগঠন হার তার অনেক নিম্নে। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পুঁজি-সংগঠন পুঁজি-অবক্ষয়ের মাত্রা বজায় রাখতে সম্ভব কিনা তাই সন্দেহের বিষয়। বর্ধনের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল।

সারণী ১৪.৪ জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে নীট সঞ্চয়

সাল ১৯৪৯

এলাকা	শতকরা হার
লাতিন আমেরিকা	৮
মিশর সহ মধ্য-এশিয়া	৬
মিশরকে বাদ দিয়ে আফ্রিকা	৫
দক্ষিণ-মধ্য এশিয়া	৫
জাপান ছাড়া দূরপ্রাচ্য	৩

উৎস : জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত দফতর প্রকাশিত **Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries** থেকে হিসাবকৃত।

এদিকে আয় কম। সুতরাং চাহিদা বলশালী নয়। বিশেষ করে শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত জিনিসের চাহিদা নেহায়েত নগণ্য। তেমনি জনস্বার্থে নিয়োজিত জিনিসপত্তরের চাহিদাও তেমন জোরদার কিছু নয়। অথচ এই সকল উৎপাদনে শ্রম অপেক্ষা পুঁজি অনেক বেশী খাটাতে হয়। কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য বাদ দিলে সবচেয়ে বেশী চাহিদা হচ্ছে হালকা ধরনের ভোগ-দ্রব্যের। সুতরাং, সবায় এগুলো উৎপাদনে ব্রতী হয়। এই সব উৎপাদন-প্রণালী মোটামুটি পরিচিত। নামমাত্র মূলধন খাটাতে হয়। তেমন ঝুঁকি

নেই, মোটামুটি শক্তপোক্ত একটা ফলপ্রসূ চাহিদা বিদ্যমান। কাজেই যার খাওয়ার সম্ভাবনা নগণ্য। এই কারণে দরিদ্র দেশে হাল্কা ভোগদ্রব্য উৎপাদনে প্রাধান্য দেখা যায়। এতে শ্রমিক অধিক খাটানো যায় অথচ মূলধন বেশী লাগে না। ভারী আকারের মূলধন-প্রাধান্য শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় তেমন উৎসাহী কেউ নেই। মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন শিল্প নামমাত্র গড়ে উঠতে দেখা যায়। অথচ মৌলিক শিল্প-কারখানা গড়ে না উঠলে উন্নয়ন বেগবানশীল হয়ে উঠতে পারে না।

মূলধন আলোচনায় অন্য একটা বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কেননা, বিস্তৃত অর্থে এটাও পুঁজি-স্বল্পতার অপর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পুঁজি-সংগঠন কথাটার সাধারণ অর্থ সম্পদে সংযোজন সাধন করা। তাহলে ভবিষ্যৎ উৎপাদন বর্ধিত হারে ঘটবে। এই বিবেচনায় পুঁজি বলতে কেবল বিভিন্ন সম্পদ বোঝালেই চলবে না, জনসাধারণের জ্ঞানের বহরকেও তার অন্তরীণ করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে খাটাবার মত যোগ্যতাও তার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। এই অর্থে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-খাতে বরাদ্দকৃত খরচকে পুঁজি সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায়। তাহলে মূলধনের পরিমাণও কিছুটা বেশী বলে প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য দরিদ্র দেশ তেমন কি আর শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে। অন্যদিকে ধনীদেশে এইসব খরচ বিবেচনায় নিলে তাদের মূলধন পরিমাণ অনেক বেশী হতে বাধ্য। তাইত কুজনেটস বলেন, ধনী-দরিদ্র দেশে আসল পার্থক্য হয়ত ৩০:১-এর ঊর্ধ্বে। অথচ বর্তমানে তা মনে করা হয় ১০:১-এর মত।[২৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটুকু পরিষ্কার হয়ে উঠা উচিত যে, দরিদ্র দেশে মাথাপিছু পুঁজি-সামগ্রী তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ট্রেনিং ও বৈজ্ঞানিক পরিচর্যায় নিয়োজিত খরচ একত্র করলেও তা তেমন ধর্তব্য কিছু হয়ে উঠে না। পুঁজি-ফল অনুপাত না হাতিয়ে এদিক থেকে বরং দরিদ্র দেশকে পুঁজি-স্বল্পতার ভোগে বলে চিহ্নিত করা উচিত। কেননা, পুঁজি-ফল অনুপাত হয়ত ধনীদেশের তুলনায় দরিদ্র দেশে অধিক হতে পারে। কেননা, উৎপাদন শম্বুকগতিসম্পন্ন হলে নামমাত্র পুঁজি-সংগঠন ও বেশ পুঁজি-ফল অনুপাত প্রদান করতে পারে। উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন একটা দরিদ্র দেশে বার্ষিক ০·৫ ভাগ হারে উৎপাদন বেড়ে চলেছে। নীট পুঁজি

---

২৩. এস. কুজনেটস্ প্রণীত "Toward a Theory of Economic Growth" দেখুন। প্রবন্ধটি আর. লেকাকম্যান সম্পাদিত National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সংগঠন হচ্ছে বর্তমান উৎপাদন পরিমাণের ৩ ভাগ হারে। তাতে করে, পুঁজি-ফল অনুপাত দাঁড়াবে ৬:১।[২৪] সুতরাং, পুঁজি-ফল অনুপাত বেশ উচ্চ দাঁড়াচ্ছে। অথচ উৎপাদন তেমন কিছু নয়। ফলে এই অনুপাত খতিয়ে পুঁজি-স্বল্পতা নির্ণয় করতে গেলে হয়ত ঝামেলা-ঝক্কি পোহাতে হতে পারে। দরিদ্র দেশ পুঁজি-স্বল্পতায় ভোগে বলা হয় এই জন্য যে, তার মোট পুঁজি-সামগ্রী বেশী নয়; তার জনসাধারণ উপযুক্ত শিক্ষিত ও দক্ষ নয় এবং সে নামমাত্র বিনিয়োগ ঘটিয়ে থাকে। আর এইসব কিছুর মূলে রয়েছে সামান্য সঞ্চয়। সঞ্চয় নামমাত্র হয় বলেই উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগঠিত হতে পারে না। পরিণামে বিনিয়োগ কম হয়। এদিকে বিনিয়োগ যা ঘটে তাও আবার সেই চিরাচরিত সাধারণ ভোগ দ্রব্যের ক্ষেত্রে এবং স্বল্পমেয়াদী কল্পনাশ্রিত বিনিয়োগক্ষেত্রে। দূরকল্পী প্রকল্পে তেমন বিনিয়োগ নেই। তেমনি পুঁজি-সামগ্রী উৎপাদনক্ষেত্রে সংযোজন ঘটে না। এদিকে আয়-বৈষম্য ঘোরালো আকার ধারণা করে। অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে উঠে। আয়-বৈষম্য চরম আকারে বিদ্যমান। ভারত, সিংহল ও পোর্টোরিকোর অবস্থা বিশ্লেষণ করে কুজনটস্ বলেছেন যে, এই সকল দেশে আয়-বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য থেকেও তীব্র। ধনীরা অধিক ধনী আর গরীবরা ক্ষুদকুড়া পায় না। অথচ ধনী দেশে অবস্থা এত তীব্র নয়। ভারতে নীচের দিকের ৬০ ভাগ লোক মোট আয়ের মাত্র ২৮ ভাগ পায়। সিংহলে পায় ৩০ ভাগ ও পোর্টোরিকোতে ২৪ ভাগ, সেই তুলনায় আমেরিকায় এই লোকগুলো জাতীয় আয়ের ৩৪ ভাগ আর বৃটেনে ৩৬ ভাগ পায়। অন্যদিকে উপর দিককার ২০ ভাগ লোক ভারতে পায় জাতীয় আয়ের ৫৫ ভাগ, সিংহলে ৫০ ভাগ ও পোর্টোরিকোতে ৫৬ শতাংশ। সেই তুলনায় বৃটেনে ও আমেরিকায় তারা পায় যথাক্রমে ৪৫ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ।[২৫]

কিন্তু, সবচেয়ে মজার ঘটনা হল এই যে, দরিদ্র দেশগুলোতে এই আকাশ-পাতাল বৈষম্য বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও সঞ্চয় বাড়ছে না। অথচ স্বাভাবিক চিন্তায় তাই হওয়া উচিত। কেননা আয় বেড়ে গেলে বৈষম্যের ফলে সঞ্চয়

২৪. উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে পুঁজি-ফল অনুপাত নিয়ে আলোচনা করব।

২৫. আলোচনা করুন, Ameircan Economic Review XLV, ১ নম্বরে প্রকাশিত এস. কুজনেটস প্রণীত "Economic Growth and Income Inequality" এবং এইচ. টি. ওসীমা প্রণীত "A Note on Income Distribution in Developed and Underdeveloped Countries."

অধিক পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাতে পুঁজিসংগঠন জোরদার হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না এবং তার কারণ প্রথমতঃ, বৈষম্য বড় আকারে হলে কি হবে, আসলে যে আয়ের মাত্রা তেমন বেশী নয়। ধনীদেশের তুলনায় তা কিছুই নয়। ফলে সঞ্চয় হওয়ার মত আয় আর কয়জনের হাতেই বা আছে। তাছাড়া, অভ্যাসগত দোষাবলী বেশ জোরেসোরে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই, একেবারে উঁচুতলার ৩।৪ ভাগ ছাড়া কেউ তেমন সঞ্চয় করতে পারে না।[২৬] এরা কয়েকজন যা কিছুটা সঞ্চয় করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যারা সঞ্চয় করে তাদের অধিকাংশ হয় জমিদার, না হয় ব্যবসায়ী, নতুবা ফটকাবাজারী। তারা জমি ইত্যাদিতেই কায়কারবার করে। কেউ কেউ হয়ত ফটকাবাজারীতে রত। অন্য কেউ হয়ত সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। শিল্প কারখানা গড়ে তোলায় কেউ উদ্যোগী নয়। তেমনি দূরকল্পী বিনিয়োগ ঘটাতেও কেউ রাজী নয়। অভ্যস্ত ত নয়ই।

এই অবস্থার জন্য অবশ্য কতকগুলো কারণ রয়েছে; ফকটে পয়সা রোজগারের স্পৃহা, দুদিনে রাজার স্বর্গ গড়ে তোলার বাসনা, মহাজনী কারবারে প্রচুর মুনাফা, কৃষককে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে তড়িঘড়ি সুদ পাওয়া, দক্ষ শ্রমিক খুঁজে পেতে অসুবিধা, যন্ত্রপাতি হাতের কাছে নেই, চলতি মূলধনের অভাব, মুদ্রাস্ফীতির ভয়, সরকারী নীতির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া, দরিদ্রদেশে জমির মালিকানা মানে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। তার উপর রয়েছে গোধের উপর বিষফোড়া; প্রতিকূল সামাজিক, আইনিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান। এই পরিবেশ প্রেরণাকে চিবিয়ে খায়, সুযোগকে তাড়িয়ে বেড়ায়, সঞ্চয়কে নড়চড় হতে দেয় না এবং আকাঙ্ক্ষিত খাতে বিনিয়োগকে প্রবাহিত হতে উস্কানি যোগায় না। উদ্যোক্তাশ্রেণী তেমন বলবান নয়। সংখ্যাও নগণ্য। ফলে জাতীয় আয়ে তাদের অবদান নামমাত্র। পুঁজিপতি ও তাদের সংখ্যা বৃহত্তর না হওয়া অবধি এই পরিস্থিতি বিরাজ করতে বাধ্য এবং তাদের থেকে পুনর্বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য আশা করা যেতে পারে না। অথচ দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিবেচনা করলে বৃটেন ও আমেরিকায় পুঁজি সংগঠনের

---

২৬. কুজ্‌নেটস্ প্রণীত Economic Growth and Income Inequality, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।

অধিকাংশটা এসেছে লাভের পুনর্বিনিয়োগ থেকে। অথচ দরিদ্র দেশে তা হবার জো নেই। তাই বলে মন্দির-মসজিদ নির্মাণে কিন্তু কেউ পিছপা নয়। দরিদ্র দেশের অধিকাংশ সঞ্চয় যুগ যুগ ধরে মন্দির-মসজিদ-স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছে এবং এখনো দেদার হয়ে চলেছে। তা থেকে লাভ পাওয়ারও আর কোন জো নেই। অথচ বাড়তি টাকাটা বেশ গ্রাস করে চলেছে।

এতক্ষণ স্বল্পমেয়াদী বিষয়াবলী উন্মোচন করে দেখা গেল। এবাবে গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলো হাতিয়ে দেখা যাক। অর্থাৎ আয় বর্ধন ও তা থেকে সঞ্চয় বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী স্পৃহাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রেও আশাপ্রদ কিছু পাওয়ার মত নেই, দীর্ঘকালের বিবেচনাও সঞ্চয় মাত্রা আশানুযায়ী হয়ে উঠতে পারেনি। আয়ের সাথে তা তেমন সামঞ্জস্য বজায় রেখে পা ফেলে এগুতে পারেনি। মার্কস ডুসেনবেরী থেকে শব্দটা ধার নিয়ে এ পরিস্থিতিটাকে 'প্রদর্শন-প্রতিক্রিয়া' হিসাবে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন।[২৭]

কথাটার অর্থ এই : সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির বেলায় যেমন পরিবারের বেলায়ও কথাটা তেমনি সত্য। দরিদ্র পরিবার তেমন কিছু বাঁচাতে পারে না। ধনী পরিবার বেশ কিছুটা সঞ্চয় করে। এবাবে মনে করুন প্রত্যেকটি পরিবারের আয় বেশ বেড়ে যায়, সময়ের ব্যপ্তিতে। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, এই অবস্থায় সঞ্চয় ঠিক প্রত্যেকটি পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে না এগিয়ে আয় নির্দেশক রেখার সাথে তাল মিলিয়ে আপেক্ষিক অর্থে বেড়ে যায়। দৃষ্টান্ত দেখে কথাটা বুঝুন, নীচের দিককার ১০ ভাগ পরিবার এদ্দিন ৬,০০০ টাকা করে বৎসরে রোজগার করছিল। তাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না। তাদের উপরকার ১০ ভাগ ১২,০০০ টাকা রোজগার করছিল ও ৫ শতাংশ সঞ্চয় করে চলেছিল। এক্ষণে নীচের দিককার ১০ ভাগের আয় বেড়ে ১২,০০০ টাকায় দাঁড়াল। আনুপাতিকভাবে অন্যান্য ভাগের আয়ও বেড়ে গেল। নীচের দিককার ১০ ভাগ যাদের বর্তমান আয় বৎসরে ১২,০০০ টাকা তারা এখনও সঞ্চয় করতে পারছে না। অর্থাৎ মোট আয় যাই হউক না কেন, আপেক্ষিক অর্থে আয় নির্দেশক রেখার নীচে অবস্থিত লোকদের

২৭. দেখুন R. Nuskse প্রণীত Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries.

পক্ষে তেমন সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না এবং তজ্জন্য প্রদর্শন প্রতিক্রিয়া (Demonstration effect) দায়ী। কারণ উপরে অবস্থিত লোকদের দেখা-দেখি খরচ বাড়িয়ে তোলা নীচের লোকদের স্বাভাবিক প্রবণতা।

ব্যক্তি বা পরিবারের বেলায় যেমন, প্রদর্শন প্রতিক্রিয়া কথাটা দেশের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। মোট হিসাবে দরিদ্র দেশের আয় হয়ত বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু আপেক্ষিক অর্থে তারা এখনো তলদেশে অবস্থিত এবং সঞ্চয় পরিমাণও মোটামুটি তথৈবচ। উন্নত দেশে লোভনীয় বহু দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়ে চলেছে। দরিদ্র দেশের লোক এই সবের সংস্পর্শে এসে বেশ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছে এবং তা পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ছুটেছে। সামান্য আয় যা বাড়ে তা মোহনীয় জিনিস সব কিনে উড়িয়ে দেয়। জাতে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সব কিনে চলে। লক্ষ্য করে দেখা যায় যে, লোক বহুমূত্র রোগে ভোগে। একফোটা বরফ-পানি খাওয়াব পর্যন্ত উপায় নেই। অথচ কেবল খাওয়ার ঘরের শোভা বাড়াবার জন্য এবং প্রদর্শনী মনোভাব বশতঃ শীতকযন্ত্র (Refrigerator) কিনে বসে। তেমনি অন্যান্য জিনিসেব বেলায়ও।

এই আলোচনাটা অবশ্য এখনো পাকাপাকি হয়ে উঠেনি। এখনো তা ইঙ্গিতবহ পর্যায়। সুতরাং, নানাজনে নানা প্রশ্ন তুলতে পারে। সত্যি কথা, এখনো তা অপরিক্ষিত উপসিদ্ধান্ত মাত্র। বাস্তবদুনিয়ার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অধিকাংশ দরিদ্র দেশ আমদানী করে খাদ্যদ্রব্য, না হয় কাঁচামাল। তাদের প্রদর্শনী প্রতিক্রিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তাছাড়া, বিনিময় প্রথা এখনো প্রচলিত হয়ে উঠেনি। কাজেই প্রদর্শনী প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া করতে সক্ষম হলে হয়ত তা আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করতে পারে। কেননা তা হয়ত অধিক ফসল ফলাবার প্রেরণা ও উস্কানি যোগাতে পারে। তাতে উদ্বৃত্ত বেড়ে যাবে এবং তা বিক্রি করে নব নব ভোগদ্রব্য অর্জনের স্পৃহা বাড়তে পারে। ফলে বিনিময় প্রথা বিস্তৃত হতে পারে। বিনিময়-প্রথা বিস্তৃত হলে বিশেষীকরণ (specilization) বেড়ে যায়, উৎপাদন বর্ধিত হয় এবং তারফলে আয় বেড়ে যেতে বাধ্য এবং পরিণামে সঞ্চয়ে সংযোজন ঘটে। তারচেয়েও বড় কথা, প্রদর্শনী-প্রতিক্রিয়া 'ভোগলিপ্সা' (Aspiration to consume) ও 'ভোগ-প্রবণতা' (Propensity to consume) বাড়িয়ে দেয়। ভোগলিপ্সা বেড়ে যাওয়া মানে কর্মস্পৃহা

বাড়ানো আর কর্মস্পৃহা বেড়ে গেলে উৎপাদন বাড়তে বাধ্য, আর তাহলে পরিণামে সঞ্চয় বর্ধিত আকারে ঘটতে পারে।[২৮] তাছাড়া অধিক লোক বিনিময় প্রথায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে দ্রব্যবিনিময় প্রথার গুরুত্ব লোপ-পেতে থাকে। বৃটেনে তাই ঘটেছিল। উন্নতির সেই প্রাক্কালে শিল্প-শহর-গুলোতে বিদ্যমান উচচতর জীবনমান গ্রহণ করতে যেয়ে কৃষককে কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল এবং কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক শিল্প শহরে চলে যাওয়ার উস্কানি পেয়েছিল।[২৯]

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাধান্য

দরিদ্র দেশের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্যালোচনায় শেষ পর্যায়ে এসে পেঁ ৗছেছি। বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি আলোচনা দিয়ে এই পর্যালোচনায় ইতি টানব।

দরিদ্র দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাধান্য বিদ্যমান। অর্থাৎ দেশ গরীব বটে। তবে কিছু কিছু চমৎকৃত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বৈকি: তন্মধ্যে বহির্বাণিজ্যে পুষ্টতা অন্যতম। এই প্রাধান্য নানাভাবে প্রকাশ পায়:

প্রথমতঃ অর্থনীতির যেই অংশটুকুতে বিনিময় প্রথা বিরাজমান সেই অংশটি এমনসব কয়টি কাঁচামাল উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল—যার প্রায় সবটা বিদেশে রপ্তানি হয়। শুধু তাই নয়, এই রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় দেশে বিনিয়োগ উৎসারিত আয়, এমনকি সরকারী খরচ থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে বেশ হতে দেখা যায়। তার অর্থ দরিদ্র দেশে জাতীয় আয় রপ্তানি আয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বেশ একটা অংশ রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আসে। ১৪.৫ ও ১৪.৬ সারণীদ্বয় থেকে এই উক্তির যথার্থতা খুঁজে পেতে পারেন। সমগ্র দরিদ্র দেশ

---

২৮. "প্রদর্শনী-প্রতিক্রিয়া" ও "পশ্চাৎমুখী শ্রম-সরবরাহ নির্দেশক রেখা" কথা দুইটি পরস্পর বিরোধী। কেননা, চাহিদা নব নব ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হতে থাকলে দীর্ঘকালীন বিবেচনায় শ্রম-সরবরাহ-নির্দেশক রেখা পশ্চাৎমুখী হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। এই বিষয়ে না. মিণ্ট প্রণীত ও Review of Economic Studies, XVII (২), নম্বর ৫৮-এ প্রকাশিত "The Gains from International Trade and the Backward Countries" প্রবন্ধটি আলোচনা করতে পারেন।

২৯. দেখুন সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম ভাগের আলোচনা।

একত্র করে কথা বলতে গেলে দেখা যাবে যে, জাতীয় আয়ে রপ্তানি বাণিজ্যের অবদান প্রায় ২০ শতাংশের মত।[৩০] কতকগুলো দেশ একটা, বড়জোর দুইটা দ্রব্য মাত্র রপ্তানি করে থাকে। যেমন ভেনেজুয়েলার কথা চিন্তা করুন। ১৯৫০ সালে তার রপ্তানি আয়ের ৯৭ ভাগ এসেছিল পেট্রোলিয়াম রপ্তানি থেকে। তেমনি চিলি তার রপ্তানি আয়ের ৫০ ভাগ তাম্র থেকে এবং ২৫ ভাগ নাইট্রেট থেকে পায়। মেশরী তুলা তার বৈদেশিক আয়ের ৯০ ভাগ প্রদান করে। চিনি ও চিনিজাত দ্রব্য কিউবার ৯০ ভাগ রপ্তানি আয় আনয়ন করে।[৩১]

সারণী ১৪·৫ নির্বাচিত দেশসমূহে রপ্তানি-বাণিজ্যের গুরুত্ব

দেশ	মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা হিসাবে রপ্তানি
নিকারাগুয়া	২৭
গুয়াতেমালা	১৫
কিউবা	৩৪
মেক্সিকো	১৭
কলাম্বিয়া	১২
জ্যামাইকা	১৭*
সুরিনাম	৩৬
ইরাক	১৩†
তুরস্ক	১০*
সিংহল	৪২

* জাতীয় আয়ের হিসাবে নেওয়া, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) থেকে নয়।

† তেল-রপ্তানি বাদ দিয়ে।

উৎস: American Economic Review, Papers and Proceedings, XLIV, সংখ্যা ২, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ও জে. জে. স্পেংলার প্রণীত "I. B. R.D Mission Growth Theory". উপাত্ত নেওয়া হয়েছে ১৯৫০ দশকের গোড়ার দিককার I.B.R.D. রিপোর্টগুলো থেকে।

---

৩০. জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Measures For Economic Development of Underdeveloped Countries দেখুন।

৩১. জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার প্রকাশিত International Financial Statistics, ১৯৫২ সাল দেখুন।

সুতরাং, দরিদ্র দেশ তার রপ্তানি বাণিজ্য একটা কি দুটা দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। তদুপরি জাতীয় আয়ের বিরাট একটা অংশ বহির্বাণিজ্য থেকে আসে। কাজেই জাতীয় আয়ের পরিপুষ্টিতে বৈদেশিক বাণিজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় আয়ে বহির্বাণিজ্যের এই প্রধান্যহেতু দেশের অর্থনীতি বেশ একটা বড় রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমস্যাটি বাণিজ্য-চক্র উদ্ভূত। বিদেশী বাণিজ্য-চক্রে হ্রাস-বৃদ্ধি অতি সহজে দেশীয় অর্থনীতিতে অন্তরিত হয়ে পড়ে। বিদেশে মন্দাগতি দরিদ্রদেশের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে দেয়। ফলে, দরিদ্র দেশ বিরাট ক্ষতিব সম্মুখীন হয়। কারণ তাব দ্রব্যসামগ্রী কাঁচামাল। কাজেই দব পড়ে গেলে মূল্যমানে বিরাট হ্রাস দেখা দেয়। অপরপক্ষে বিদেশে প্রাচুর্য মানে চাহিদার পালে জোরে হাওয়া লাগা। ফলে চাহিদা মাত্রা অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। ফলে রপ্তানি আয় বেশ জোরদার হয়ে উঠে। বাণিজ্য চক্রেব এই উঠতি-নামতি দরিদ্রদেশের জন্য সত্যি দুঃখজনক ঘটনা। জাতিপুঞ্জেব এক হিসাবে দেখা যায় যে দরিদ্রদেশ থেকে রপ্তানিকৃত ১৮টা

সারণী ১৪.৬ নির্বাচিত দেশে মোট রপ্তানির শতকরা হিসাবে মুখ্য রপ্তানি-দ্রব্য

দেশ	রপ্তানি দ্রব্য	মোট রপ্তানিব শতকরা হাব
বেলজিয়াম কঙ্গো	তাম্র	২৫
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	চিনা বাদামজাত দ্রব্য	৪২
ফরাসী ইকুয়েটরিয়েল আফ্রিকা	তুলা	৩৫
পোর্টোরিকো	চিনি ও গুড়	৬০
গোল্ডকোষ্ট	কোকো	৭৩
জ্যামাইকা	চিনি	৩১
কেনিয়া	শিশাল	২৬
মালয়	রবার	৫০
	টিন	২৫
নাইজিরিয়া	পামতেল	৩৩
	কোকো	২২

উত্তর রোডেশিয়া	তাম্র	৮১
উগাণ্ডা	তামা	৭৪
এলসালভাডর(১৯৫০)*	কফি	৮৯
ইরান†	তেল	৯০
সিংহল‡	চা	৪২
	রবার	৩১
ইন্দোনেশিয়া (১৯৫১)§	রবার	৪২
	তেল	২০
থাইল্যাণ্ড ‖	চাউল	৬৩

* আই. এম. এফ. International Financial Statistics, ১৯৫২ সাল। পৃষ্ঠা ৪৬

† ঐ, পৃষ্ঠা ৬৬। ‡ ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৯। § ঐ, পৃষ্ঠা-১৫১।

‖ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬১।

উৎস: জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Special Study on Economic Conditions and Development, ১৯৫২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬-৩৭।

মুখ্য দ্রব্য হতে পাওয়া দাম বাণিজ্য-চক্রের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ১৯০১-১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ৩৭ শতাংশের মত উঠা-নামা করে। অর্থাৎ রপ্তানি আয় ১০০ থেকে ৬৩ তে নেমে আসে এবং পুনরায় ১০০ তে উঠে। গড়ে প্রতিটি চক্রের কাল ছিল প্রায় ৪ বৎসরের মত।[৩২] উক্ত সংস্থার অপর এক আলোচনায় খণিজ দ্রব্য রপ্তানি বিবেচনা করা হয়। তাতে বাৎসরিক উঠানামার গড় হিসাব করে দেখা যায় যে তা প্রায় ২৭ ভাগের মত ছিল। এই হিসাবের সময়কাল ছিল ১৯২৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত।[৩৩] বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়মিত এই উঠানামার ফলে দেশী অর্থনীতিতে বিরাট ভাঙন দেখা দেয়। অর্থাৎ উন্নয়ন গতিমন্থন হতে পারে না। তাতে বাঁধা সৃষ্টি হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধান্য অর্থনীতিতে অপর একটি বৈশিষ্ট্যও আমদানী করেছে এবং তাহচ্ছে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করা। অন্য কথায়, বিদেশী ঋণ পর্যালোচনা করে ও বহির্বাণিজ্য প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ

---

৩২. জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত দফতর প্রকাশিত Instability in Export Markets of Underdeveloped Countries, ১৯৫২ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬।

৩৩. ঐ, প্রকাশিত Non-Ferrous Metals in Underdeveloped Countries.

যে সকল ক্ষেত্রগুলো বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত তারা বহুকাল থেকে বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। আর দীর্ঘমেয়াদী এই প্রসারণ সম্ভব হয়েছে বিদেশী-বিনি-য়োগের সরাসরি অংশ গ্রহণ করার ফলে। অর্থাৎ বিদেশী-বিনিয়োগ রপ্তানি ক্ষেত্রগুলোকে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে তাদের ক্রিয়াকর্ম রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল উৎপাদন ও ঐ জাতীয় আনুসঙ্গিক কাজে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করেনি। বিদেশী বিনিয়োগের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ইহা বিদেশী চাহিদা পূরণের নিমিত্তে সরবরাহ বাড়িয়ে চলেছে। দেশীয় চাহিদা মিটাবার মাথাব্যথা কোনদিনই লক্ষ্য করা যায়নি। যুক্তি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে দেশী চাহিদা সীমাবদ্ধতা বর্তমান বিদেশী চাহিদা বেশী, তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের উৎসাহ অধিক। সুতরাং রপ্তানিক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

সে যাই হউক, দরিদ্রদেশে পুঁজি-প্রবাহ কিন্তু নিয়মিত নয় মোটেই। পুঁজি-আগমন বরং রপ্তানি-আয় থেকে বেশী হারে উঠানামা করে।[৩৪] তার অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রপ্তানির সাথে তাল রেখে উঠানামা করে। অর্থাৎ যে সালে রপ্তানি ভাল সেই সালে পুঁজি-প্রবাহও মোটামুটি ভাল। আর যেই রপ্তানি-বাণিজ্য মন্দাগতি সম্পন্ন অমনি তার আগমন নিম্নমুখে অবধাবন, এই কথাটা বিশেষভাবে সত্য। বিদেশী বিনিয়োগের এই স্থিতিহীনতা দেশীয় অর্থনীতিতে বেশ অচল অবস্থা সৃষ্টি করে।

বিদেশী পুঁজির সহগ হিসাবে আসে বিদেশী মালিকানা। এই মালি-কানা কৃষিজ দ্রব্যের বেলায় যেমন খনিজ দ্রব্যের বেলায়ও তেমনি। শুধু তাই নয়, তার সাথে আসে বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও। আর সবায় মিলে বেশ লুটে চলে। অনেক দেশে প্রায় পুরোপুরি মালিকানা বিদেশীদের হাতে। এই যেমন উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ বিদেশীদের হাতে। কেনিয়ায় তা ৭৫ শতাংশ এবং বেলজিয়ান কঙ্গোতে শতকরা ৮০ ভাগ।[৩৫] সিংহলে চা-শিল্পের প্রায় ৮০ ভাগ বিদেশীর হাতে আর রবারের ৪০ ভাগ। আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৮০ ভাগ বিদেশী তেমনি পোতবহর (shipping) ক্ষেত্রেও।

৩৪. জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দফতর প্রকাশিত Instability in Export Markets of Underdeveloped Countries, পৃষ্ঠা-৭।

৩৫. জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী সম্বন্ধীয় দফতর প্রকাশিত Scope and Structure of Money Economics in Tropical Africa, ১৯৫৫ সাল।

বিদেশী এই সব শিল্প সংস্থা প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করে বসে আছে। অর্থনৈতিক হালচাল অনেকটা তাদের নিয়ন্ত্রাধীনে। কোন কোন দেশে হয়ত জিনিসটা তৈরী করে কৃষককুল। কিন্তু, তার ব্যবসা বিদেশী কোম্পানীর হাতে। নাইজিরিয়ার কথা বিবেচনা করুন। সরকারী বাজার করণীয় বোর্ডগুলোর ক্রেতা-নিযুক্তক (buying agents) হিসাবে কাজ করে দেশী ও বিদেশী অনেকগুলো কোম্পানী। ১৯৪৯ সালে কেবল একটা বিদেশী কোম্পানী খনিজদ্রব্য নয় এমন সব রপ্তানি দ্রব্যের প্রায় ৪৫ ভাগ কিনে নেয়।[৩৬] আমদানী ক্ষেত্রেও অবস্থা মোটামুটি একই রকম। রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত ফার্মগুলোই এক্ষেত্রেও একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে থাকে। সুতরাং, নাইজিরীয় বহির্বাণিজ্যে 'অলিগোপলি' (oligopoly) অবস্থা বেশ ঝেঁকে বসে আছে। স্বল্পসংখ্যক কতকগুলো বিদেশী ফার্ম আমদানী ও রপ্তানি উভয়ক্ষেত্র দখল করে রয়েছে।[৩৭]

বিদেশী ফার্মের সহগামী হিসাবে জন্ম নিয়েছে দালালী প্রথা (middle-men system)।[৩৮] উৎপন্ন ফসল সরাসরি বাজারজাত হতে পারে না। ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার প্রভৃতি বহুজাতের মধ্যবর্তী লোকগণ কেনা-কাটার বিদেশী ফার্মগুলোকে সাহায্য করে বেশ দু'পয়সা করে নেয়। অথচ প্রকৃত উৎপাদকরা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। একমাত্র নাইজি-রিয়াতে নাকি ১৪,০০০ মধ্যবর্তী লোক বড় বড় তিনটি বিদেশী বাণিজ্য ফার্মের সাথে জড়িত রয়েছে।[৩৯] আমদানীক্ষেত্রেও অবস্থা তথৈবচ। প্রকৃত ভোক্তার হাতে আমদানীকৃত মাল পৌঁছার আগে বহু হাত ঘুরে যায় এবং সবায় দু'পয়সা হাতিয়ে নেয়। ফলে খাজনা ও বাজনা মিলে দামটা স্বভাবতই চড়া হয়ে উঠে।

বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলোর বৈশিষ্ট্য হল যে এরা বেশ দক্ষতার সাথে ক্রিয়াকর্ম সাধন করে। তাদের কার্যনির্বাহনী ব্যবস্থা সুষ্ঠু। উৎপাদন-প্রক্রিয়া অত্যাধুনিক। তারা বাজার সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত এবং যথেষ্ট পুঁজির মালিক। অন্যদিকে দেশীয় ফার্মগুলো অকর্মণ্যের ডিপো। বাজার

---

৩৬. Economic, XX সংখ্যা ৭৯-এ প্রকাশিত এবং পি. টি. বাওয়ার প্রণীত "Concentration in Tropical Trade" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

৩৭. পি. টি. বাওয়ার প্রণীত West African Trade নামক পুস্তক দেখুন।

৩৮. ঐ।

৩৯. Nowell কমিশন প্রণীত, "Report of the Commission on the Marketing of West African Cocoa." আলোচনা করুন।

সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই। পুজি-স্বল্পতার ভাগে আর মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-প্রণালী আকড়ে পড়ে থাকে। সুতরাং, বিদেশী ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতা করার তেমন কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

দরিদ্রদেশে সরকারী রাজস্বের বিরাট একটা অংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে আসে। ১৪.৩ সারণীতে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। কোন কোন দেশে একা বাণিজ্য শুল্কই সরকারী বাজস্বের প্রায় ৮০ ভাগ প্রদান করে থাকে, যেমন মালয়ে। আমেরিকাতে প্রতি পাউণ্ড তামার দামে ৫ পয়সা উঠানামা করলে চিলি সরকার প্রায় ২০০ লক্ষ টাকা লাভ বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৪০]

পরিশেষে এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দরিদ্রদেশগুলো আমদানীর উপরও বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তারা সাধারণতঃ শিল্প-উৎপন্ন-দ্রব্য খরিদ করে থাকে। আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়-চোপড়, হাল্কা ভোগ-দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। কোন কোন দেশকে ফলজ-দ্রব্য আমদানী করতেও দেখা যায়। সবচেয়ে মজার কথা হল যে, এই সব দেশে প্রান্তিক আমদানী প্রবণতা বেশ প্রবল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকালীন পরিসরে গড় আমদানী-প্রবণতা (average propensity to import) ও উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠে এবং তার মাত্রা বেশ প্রগাঢ় হয়। তার ফলে প্রদর্শনী-প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তিতে ক্রীয়াশীল হতে পারে।

দরিদ্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করে দেখা গেল। তাদের বিস্তৃত আলোচনা থেকে ঘোলাটে অনেক কথা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে সব কিছু মিলিয়ে যে কথাটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা হল দরিদ্র দেশে সংগুপ্ত উৎপাদন (prtential output) ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে বিরাট ফাঁক বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃত উৎপাদন সংগুপ্ত উৎপাদনের তুলনায় অনেক নিম্নে। এই ব্যবস্থাটুকু এবারে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। কি কারণে এই ফাঁকটুকু বিদ্যমান? কেনইবা তা যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান রয়েছে? কি এমন কারণ যার জন্য দরিদ্রদেশ দরিদ্র রয়ে গেল?

৪০. দেখুন Bauer-এর West African Trade. 29.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দরিদ্র দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোতেই তাদের অনগ্রসরতার কারণ নিহিত রয়েছে। যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেই সংগুপ্ত রয়েছে উন্নয়নের পথে অধিকাংশ প্রতিবন্ধক। দরিদ্র দেশের সংখ্যা অনেক। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, একজাতীয় কারণের জন্য সবায় দরিদ্র রয়েছে একথা হয়ত ঠিক নয়। তবে সাধারণ-ভাবে প্রতিটি দরিদ্র দেশই মোটামুটি একটা চিত্র প্রদান করে। এই চিত্র হয়ত সবার বেলায় সমভাবে প্রযুজ্য নয়, তবে তা সবদেশে মোটামুটিভাবে বিদ্যমান একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দরিদ্র দেশ মানে গরীব দেশ— একথা সবায় বুঝে। কিন্তু এতগুলো দেশ পিছনে পড়ে থাকার কারণ কি-তা খুঁজে বের করা সোজা নয়। আমাদের আলোচনা সাধারণ পর্যায়ে সীমিত। বিশেষ বিশেষ দেশের বেলায় তা হেরফের ঘটিয়ে নিতে হবে এবং অবস্থাভেদে গুরুত্বের তারতম্য ও তজ্জনিত সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে নিতে হবে।

কাঁচামাল উৎপাদন ও লোকসংখ্যার চাপ অভাব-অনটনের সহগামী। দরিদ্র বিদ্যমান বলেই হয়ত দরিদ্রদেশকে কাঁচামাল উৎপাদনে লিপ্ত থাকতে হয়। তেমনি একই কারণে হয়ত লোকসংখ্যার চাপে ভোগে। কিন্তু, অন্যান্য কারণগুলো নিঃসন্দেহে কারণসূচক (causative), তাদের জন্য উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং তারা উন্নয়নপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কাঁচামাল উৎপাদন অভাব-অনটনের হেতু হচ্ছে কৃষির নিম্ন উৎ-পাদিকা-শক্তি। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন নিম্ন বলেই দরিদ্রতা বিদ্যমান। তেমনি লোকসংখ্যার বৃহত্তর অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত-হয়ত তা অভাব-অনটনের পরিণাম, তার কারণ নয়। কৃষক দরিদ্র। সুতরাং, তাকে সাহায্য করার জন্য বাইরের যারা নিয়োজিত তাদের সংখ্যা নগণ্য হতে বাধ্য। তেমনি তারা দরিদ্র হওয়াও স্বাভাবিক। অন্যত্র কৃষক অবস্থাসম্পন্ন।

তাদের কাজে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা যেমন বেশী হয় তেমনি তাদের অবস্থাও ভাল হতে বাধ্য।[১]

দরিদ্র দেশে লোকসংখ্যার চাপ প্রবল। তার মানে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থিত। লোকসংখ্যার এই আধিক্য হয়ত দরিদ্রতার কারণ না হয়ে বরং সে নিজেই সমস্যা। অর্থাৎ লোকসংখ্যার চাপকে অভাব-অনটনের কারণ হিসাবে বিবেচনা না করে একটা স্বতন্ত্র সমস্যা হিসাবে গণ্য করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত যার সমাধানে উন্নয়নপ্রবাহ বেগবান করে তোলা একান্ত বাঞ্ছনীয়। লোকসংখ্যা ভারে ভারাক্রান্ত আজকের বহুদেশ হয়ত সবসময় তেমন ছিল না। যেমন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা ধরুন। আজকে তার যা লোকসংখ্যা তার অর্ধেকও হয়ত ছিল না আজ থেকে মাত্র ৫০/৬০ বৎসর আগে। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে সংখ্যাধিক্য বললেও চলে। অথচ এই অঞ্চলের দেশগুলো উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। সম্পদও যথেষ্ট ছিল। সেই তুলনায় জাপানের কথা চিন্তা করুন। লোকসংখ্যার বিরাট বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে কেমন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

অন্যান্য কারণগুলো উন্নতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণসূচক। কথাটা পরিস্ফুট করে তোলা প্রয়োজন। তজ্জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনভাগে শ্রেণীভেদ করে নেয়া যাক : (১) "বাজার অসম্পূর্ণতা" (market imperfections), (২) "দুষ্ট-চক্র" (Vicious circle) এবং (৩) "আন্তর্জাতিক প্রভাব" (International forces)। এগুলো নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এককভাবে এবং পারস্পরিক কিভাবে তারা উন্নয়ন গতি ব্যাহত করে তা উন্মোচন করে দেখানো হবে।

১. বাজার অপূর্ণাঙ্গতা

অনুন্নত ও পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে বাজার-অপূর্ণাঙ্গতা। এই বাজার-দুর্বলতা সর্বত্র বিদ্যমান। ফলে উপাদান-সঞ্চারহীনতা প্রভাব তীব্রতর হতে দেখা বায়। মূল্যে অনমনীয়তা জন্য নেয় ও বেশ শক্ত ঘেরো হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। বাজার পরিস্থিতি জ্ঞানের বাইরে থেকে যায়।

---

১. দেখুন জে. ভাইনার রচিত International Trade and Economic Development ও এস. কুজনেটস প্রণীত Economic Change নামক পুস্তকদ্বয়।

অনড় সমাজ-কাঠামো নমনীয় হওয়ার সুযোগ পায়না। সূক্ষ্ম-জ্ঞান-প্রজ্ঞা জন্ম নিতে পারে না। হাজারো প্রকৃতির এই ঋণাত্মক শক্তিনিচয়ের মিথ-স্ক্রিয়ার (interaction) ফলে ও তাদের পারস্পরিক ঠেলাঠেলির প্রভাবে সর্বোত্তম সম্পদ-বন্টন সম্ভব হয় না। পরিণতি হিসাবে উৎপাদন-দক্ষতা নিম্ন-পর্যায়ে রয়ে যায়। সম্পদ ব্যবহার আদর্শ রূপ গ্রহণ করতে পারে না এবং সম্পদের বিতরণ বিষম হয়।

নিখুঁত উপকরণ-সঞ্চরণ-পরিস্থিতির কথা চিন্তা করুন। এই অব-স্থায় উপাদান সামগ্রী ফলনশীলতার রেখা ধরে অবাধ গতিতে বিভিন্ন শিল্পে বিচরণ করতে থাকে। শিল্পে শিল্পে ফলন-বিভেদ নিম্ন পর্যায়ে না আসাবধি এই বিচরণ অব্যাহত থাকে। দরিদ্র দেশে তার বিপরীত ঘটতে দেখা যায়। বহু শ্রমিকের উৎপাদন শূন্য-সীমার ধারে-কাছে বিরাজ করে অথচ কেউ লাভজনক অন্যশিল্পে নড়ে যেতে প্রস্তুত নয়। এদিকে মূলধনও তেমন একটা সুসমহারে বন্টিত নয়। ধরাবাধা, চেনা-জানা খাতে অধিকাংশ পুঁজি আটকে থাকে। অন্যত্র অধিক লাভ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, তাতে কিছু আসে-যায়না। চলতি প্রথা, অভ্যাস ও অনড় দৃষ্টিভঙ্গি এখানেও পুরাপুরি ক্রিয়া করে।

শ্রমিক অত্যধিক গরীব। তার এই অবর্ণনীয় দরিদ্রতাও হয়ত তার চলাচল সীমিত করে। সঞ্চরণ ব্যয়সাপেক্ষ প্রয়াস। অন্যত্র যেতে হলে খরচ প্রয়োজন। নিজকে সেস্থানে প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট ঝক্কিমারী কাজ। তবু না হয় টাকা-পয়সা থাকলে কথা ছিল। কিন্তু, তাও যে নেই। কাজেই, ইচ্ছা থাকলেও সে নড়তে পারে না। ফলে যেথায় আছে সেথায়ই দুঃখকষ্টে আঁকড়ে পড়ে থাকে। দরিদ্র দেশের লোক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও তেমন অবগত নয়, কোথায় কি বিরাজমান তা অধিকাংশক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানের বাইরে। কোথায় গেলে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যায় এই খবর সাধারণতঃ তার নেই। তেমনি উৎপাদনকারীও। সেও অন্যান্যের তুলনায় তেমন কোন একটা খোঁজ-খবরওয়ালা লোক নয়। এমনকি স্বদেশী বাজার সম্পর্কেও তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বিদেশী বাজারের কথা না হয় ছেড়েই দেয়া গেল। অথচ আজকের দিনে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রত্যেকটি দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাজার অসম্পূর্ণতার অপর লক্ষ্মণ হিসাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা

যায়। অধিকাংশ দরিদ্র দেশ ব্যবসায়ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিরাজমান। ফলে সুষম সম্পদ-বন্টন ঘটেনা। সর্বত্র অপ-বন্টন দেখা যায়।

সুতরাং নির্বিবাদে বলা যায় যে, দরিদ্রদেশে সম্পদের পবিপূর্ণ ব্যবহার আজও হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধা-ব্যবহার ও অপব্যবহার চলছে। এই আধা-ব্যবহার ও অপব্যবহার সারিয়ে পূর্ণ-ব্যবহার ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হলে অবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য। তেমনি দক্ষহাতে সম্পদ-বন্টন করা গেলে বাস্তব উৎপাদন সম্ভাব্য উৎপাদন-ক্ষমতার (Potential Production) ধারে-কাছে পেঁাছে যেতে পাবে। উপাদান-সংমিশ্রণে সামান্য হেরফের প্রকৃত আয়ও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

উপরোক্ত কথাটা রেখা টেনে প্রকাশ করা যায়। তজ্জন্য উৎপাদন-সম্ভাবনা-সঙ্কেতকারী রেখা (Production Posibility curve) বা "উৎপাদন সীমান্ত" (Production frontier) প্রত্যয়ের সাহায্য নেয়া যাক (১৫·১ নক্সা দেখুন)। মনে করুন একটা দেশে ক ও খ নামক দুইটি দ্রব্য উৎপাদিত
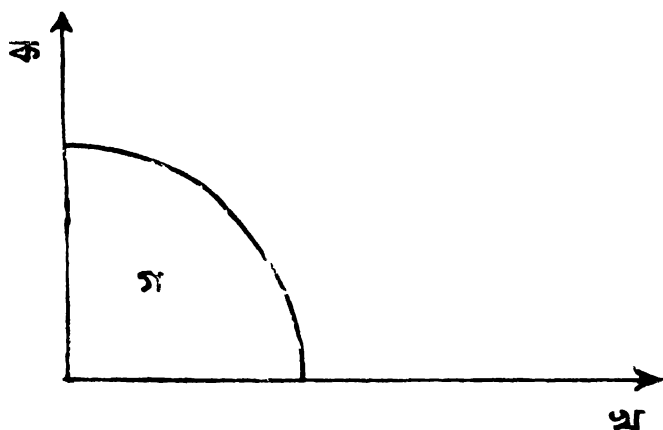
১৫·১ উৎপাদন সীমান্ত সূচক রেখা

হয়। এবারে ধরে নিন যে সম্পদ পরিমাণ ও উৎপাদন-আঙ্গিকে অপরিবর্তিত অবস্থায়। 'তাহলে উৎপাদন' সীমান্ত মানে ক ও খ নামক দ্রব্যদ্বয় সর্বোচ্চ কি পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ দেয় সম্পদ ও উৎপাদন আঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের সুষম বন্টন ঘটিয়ে ক ও খ জোড়া দ্রব্য-উৎপাদন কোন কোন বিন্দুতে সর্বোচ্চ হতে পারে। উৎপাদন সম্ভাবনা সূচক রেখা বা

উৎপাদন-সীমান্ত একথা নির্দেশ করে। ১৫.১ নক্সায় উক্ত সীমান্তকে ক খ রেখা দিয়ে 'চিহ্নিত' করা হয়েছে। দরিদ্রদেশে এই রেখা অনেক নিম্নে হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্পদ সংমিশ্রণ নিখুঁত হয় না। বাজার অসম্পূর্ণতা ও ঋজুবদ্ধতা (rigidities) উপাদান ও দর সঞ্চরণ ব্যহত করে। সর্বোচ্চ সংমিশ্রণ অর্জন সম্ভব হয় না। সম্পদ বন্টন অসম রয়ে যায়। ফলে, উৎপাদন-পরিমাণ সম্ভাব্য-সীমার অনেক নীচে রয়ে যায়। উপরোক্ত সারণীতে তা 'গ' বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। অবশ্য উৎপাদন-সীমান্ত আদর্শ-পরিস্থিতি বটে। কোন দেশই হয়ত তা পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয় না। কিন্তু, দরিদ্রদেশ তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। অনেক নিম্নে রয়ে যায়।[২] এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হলে বিদ্যমান সম্পদ দিয়েই দরিদ্রদেশ অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে।

শুধু তাই নয়। একদিকে যেমন উৎপাদন-সীমান্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিম্নে অন্যদিকে তেমনি অনুন্নতাব সর্ব সহযোগ দুর্বল দেশে বিবাজমান। ফলে অর্থনীতি অনমনীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠে। সাকুল্য উপাদান গঠন-প্রণালী (composition of total output) ও উৎপাদী-নক্সা (Productive Structure) দীর্ঘদিন স্থিতাবস্থায় বিরাজ করে। ধনীদেশে কিন্তু অবস্থা তেমন নয়। সেখানে অর্থনীতি ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। দরিদ্রদেশে নানারকম স্থবিরতা (immobility) বিদ্যমান। সামাজিক, ভৌগোলিক, ও পেশাগত এই সকল স্থবিরতা সরবরাহ-স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of supply) নিম্ন করে তোলে। মূল্য ও আয় অনুপ্রেরণা ফলনে তেমন চেতনা সৃষ্টি করতে পারে না। সম্পদ সঞ্চরণ তেমন গতিশীল হতে পারে না। ফলে সম্পদ বন্টন আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে ঘটতে পারে না। উৎপাদ-পরিমাণ ও পর্যায় অপরিবর্তিত থাকে। উদ্যোক্তার অভাবহেতু তাতে তেমন নড়চড় ঘটে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ নব্য ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, তাঁরা উপাদান-সরবরাহ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। তাঁদের আলোচনায় মূল বিষয়বস্তু ছিল একটা আদর্শ সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি অর্জনে শর্তসমূহ নিরূপণ করা। তজ্জন্য

---

২. American Economic Review XLV সংখ্যা ৪-এ প্রকাশিত R.S. Eckans প্রণীত "The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Areas" দেখুন।

সম্পদ পরিমাণ স্থিতিশীল বলে ধরে নেন। তাঁদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু এইটুকু প্রদর্শন করায় যে অবাধ অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতার ঠেলায় একটা দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সর্বোচ্চ উৎপাদন সীমান্ত খুঁজে পায়। 'প্রান্তিক শর্তাবলী' পূরণের মাধ্যমে এই সর্বোচ্চ সম্পদ বন্টন সম্ভব হয়ে উঠে। নব্যবাদীরা তাঁদের এই যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে সম্পদ সঞ্চরণ ও বাজার সম্পূর্ণতায় বাঁধাদানকারী নষ্টমূলক একচেটিয়া অভ্যাসবলী রোধের পন্থা নির্দেশ করেন।

নব্য-ক্লাসিকদের এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন দরিদ্রদেশে সম্ভব হয়নি। তজ্জন্য দায়ী বিরাট আকারে বিরাজমান বাজার অসম্পূর্ণতা। ফলে উৎপাদন-সীমান্ত নিরন্তর নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং সুষম সম্পদ-বন্টন অর্জন সম্ভব হয়নি। সুতরাং বাজার অসম্পূর্ণতাকে দরিদ্র দেশের অনগ্রসরতার একটা বিরাট কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়।

(২) দুষ্ট-চক্র

'দুষ্ট-চক্র' বলে চিহ্নিত করা যায় এমন সব বাধাসমূহ দরিদ্র দেশকে দরিদ্র রাখায় বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। উন্নয়ন পথে বাধাদানকারী বহু প্রতিবন্ধক একদিকে যেমন অভাব-অনটনের কারণ তেমনি তার ফলও বটে। ফলে তাদের মধ্যে চক্রাকার সম্পর্ক বিরাজ রয়েছে এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে উন্নয়ন নিম্ন পর্যায়ে বিরাজ করে চলেছে।

মূলধন-স্বল্পতা ও বাজার অসম্পূর্ণতা বৈশিষ্ট্যদ্বয় অন্তরীণ করে নিয়ে বিবেচনা করলে মূল দুষ্ট-চক্রটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়:
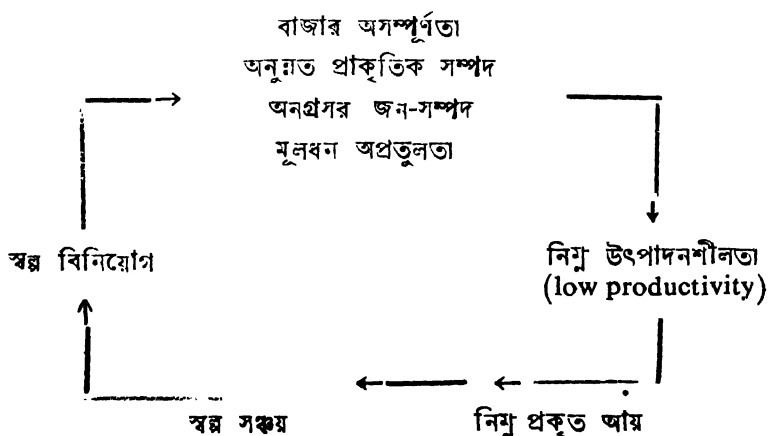
এবারে নষ্ট-চক্রটি খতিয়ে দেখা যাক। লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, মোট ফলন (total output) কম। খাওয়া-পরা মিটিয়ে সামান্য মাত্র বাঁচে। ফলে সঞ্চয় যা হয় তা নেহায়েত নগণ্য। তাতে মূলধন-সংগঠন তেমন হতে পারে না। এদিকে দরিদ্র দেশের প্রকৃত আয় নিম্ন বলে সঞ্চয় পরিমাণ ধর্তব্য কিছু নয়। প্রকৃত আয় নিম্ন হওয়ারও অবশ্য কারণ রয়েছে। তজ্জন্য দায়ী মূলধন-সম্পদ-স্বল্পতা (shortage of capital stock) ও বাজার অসম্পূর্ণতা। প্রকৃত সম্পদ পরিমাণ নগণ্যহেতু এবং উৎপাদনশীলতা নিম্ন বলে বলা হয়ে থাকে যে "গরীব দেশ গরীব, কারণ তা দরিদ্র"।

মৌলিক এই দুষ্ট-চক্রটির সাথে যুক্ত হয় আরও বহু নষ্ট-চক্র। প্রকৃত আয় কম বলে চাহিদা কম হয়। এদিকে আবার চাহিদা নিম্ন পর্যায়ে বলে প্রকৃত আয়ে সম্প্রসারণ ঘটতে পারে না। সুতরাং নিম্ন চাহিদা স্বল্প প্রকৃত আয়ের কারণ ও ফলাফল হিসাবে ক্রিয়া করে। অন্যদিকে চাহিদা জোরদার নয় বলে বিনিয়োগ স্বল্প হয়। পরিণামে মূলধন অপ্রতুলতা বিরাজ করে। সুতরাং, প্রকৃত আয় কম হওয়ার দরুন সঞ্চয় আশানুরূপ হয় না এবং বড় আকারে বিনিয়োগ ঘটাবার মত অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় না। চাহিদা ও সরবরাহ এই উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান দুষ্টচক্রে স্বল্প প্রকৃত আয় সাধারণ উপাদান হিসাবে ক্রিয়া করে।[৩]

অনুন্নত সম্পদ ও পশ্চাৎপদ জনবলকে ঘিরে রয়েছে অপর একটি নষ্ট-চক্র। প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন জনবলের উপর নির্ভরশীল। মনুষ্য সম্পদ অগ্রসরের পথ ধরে, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন এগোয়। জনসম্পদ যত উন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ তত উন্নত হয়। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, প্রযুক্তিক বিদ্যার অভাব, অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও উপাদান-স্থবিরতা বিরাজমান দেশে সম্পদ অব্যবহৃত, আধা-ব্যবহৃত এমনকি অপ-ব্যবহৃত হতে বাধ্য। সুতরাং, অনুন্নত সম্পদ পশ্চাৎপদ জনবলের পরিণাম ও কারণ উভয় হিসাবে ক্রিয়া করে।

উপরে তিনটি নষ্ট-চক্র উন্মোচন করা গেল। এবারে তাদের সংযুক্তি ঘটানো যাক। এতে তাদের চেহারা অনেকটা নিম্নরূপ হয়ে দেখা দেবে:

এবারে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। অর্থাৎ উপরোক্ত তিনটি নষ্ট-চক্র খতিয়ে দেখা যাক। প্রথমেই দরিদ্রদেশের ততোধিক দরিদ্র কৃষি-জীবীর অর্থনৈতিক জীবন বিবেচনা করা যাক। তারা অশিক্ষিত। তেমনি

৩. দেখুন R. Nurkse প্রণীত Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, নামক পুস্তক, ১৯৫৩ সাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫।

বাজার অসম্পূর্ণতা :
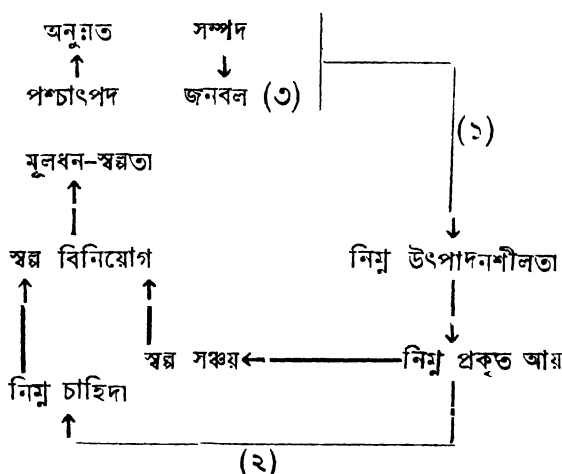
অদক্ষ। নানা রকম অভ্যাস ও প্রথার দাস। তাদের অর্থনৈতিক জীবন ধরাবাঁধার নিগড়ে বাঁধা। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো মান্ধাতার আমলের। চাষ-বাস পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষিপণ্য যা জন্মায় তার সবই প্রায় খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। বাজার থেকে কেনা-কাটা করার অভ্যাস ও সামর্থ্য দুটোরই অভ্যাস। খেয়ে-জিয়ে বেচে থাকার জীবন (Subsistence-economy) নিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটিয়ে যায়। শ্রম-বিভাজন নেই বললেও চলে। তাদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যের কোঠা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। স্বাভাবিকভাবে নামমাত্র সঞ্চয় ঘটে। ভোগ্যদ্রব্যের কার্যকরী বাজার চাহিদা তেমন জোরদার কিছু নয়। হাড় জিরজিরে জীবন কাটিয়ে দেবে, তবু কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও নড়বে না। শত সুযোগ-সুবিধা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বাপ-দাদার জায়গা কামড়ে পড়ে থাকবে। কতকক্ষেত্রে হয়ত নির্গম-খরচ বহন করার মত ক্ষমতার অভাব রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশের বেলায় একথা সাত্যি যে তারা নির্গমনে পক্ষপাতি নয়। সহজ কথায়, অনুন্নত দেশের কৃষক তার জীবন-মান উন্নয়নে আগ্রহী নয়, তেমন তার মধ্যে চেতনারও যথেষ্ট অভাব।

এবারে উঁচু তলার লোকের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তারা মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় অর্থাৎ কিনা আয় মানের (Income Scale) অপর প্রান্তে বিরাজমান। তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় যে তাদের ভোগের বিরাট অংশটা টেকসই ভোগদ্রব্যে (durable consumer goods) ব্যয়িত হয়। এই সকল ভোগদ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন হওয়ার জো নেই। কারণ বাজার নেহায়েত সীমিত। ধনীলোকের সংখ্যা ত আর বেশী নয় কাজেই তাদের পক্ষে যানবাহন শিল্প (automobile industry) বা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্পের ন্যায় শিল্পসংস্থা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এই সকল সূক্ষ্ম শিল্প চালাবার মত দক্ষ শ্রমিক দরিদ্র দেশ পাবে কোথায়? এবং সবার উপরে বড় কথা দরিদ্রদেশের ধনী লোক ঠাট্ দেখানো ভোগে (Conspicuous Consumption) আসক্ত। তারা ঠাট্ বজায় রাখার জন্য বিদেশী জিনিস কিনবে। অথচ সমগুণের দেশী জিনিস উপেক্ষা করবে। ফলে দেশী শিল্পের পক্ষে বেঁচে থাকা কষ্টদায়ক। অথচ ধনী লোকগুলো একটু কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও সচেতন হলে দেশে বহু শিল্প গজিয়ে উঠতে পারে। এই যেমন লাতিন আমেরিকার কথা ধরুন না। বড় বড় ভূ-স্বামী দেশে যেমন তাদের বাড়ীঘর রয়েছে তেমনি শহরাঞ্চলেও তাদের বিরাট বিরাট প্রাসাদ বিদ্যমান। এরা সবায় একত্র হলে বেশ সুন্দরভাবে তাদের মর্যাদা উপযোগী দোকান-পাট ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা গজিয়ে উঠতে পারে। অথচ তাদের আডডা, কপটতা ও ভুয়া মর্যাদাবোধ তা হতে দেবে না।

অবশ্য দরিদ্র দেশের যা সঞ্চয় তা এই দলটাই করে থাকে। তবে কথা থেকে যায় এই সঞ্চন কার্যকরী ও মূলধনী প্রকল্পে বিনিয়োজিত হয়ে জাতীয় আয় বর্ধনে সাহায্যকারী হয় না কেন? উত্তর সহজ-মূলধন সংগঠন কেবল সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। তজ্জন্য বিনিয়োগ-ফাণ্ডের যথেষ্ট চাহিদারও প্রয়োজন। কিন্তু বাজার যেখানে সঙ্কীর্ণ সেখানে বিনিয়োগ ঘটাবাব মত উদ্দীপনা কোথায়?

এদিকে ভোগ দ্রব্যের দেশীয় চাহিদা মেটাবার মত শিল্প-কারখানা গড়ে তোলায়ও ঝক্কি-ঝামেলা কম নয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। বাজার-পদ্ধতি সেকেলে ধরনের। কাজেই, ভীরু উদ্যোক্তা তেমন অগ্রণী হতে সাহস পায় না। তাছাড়া, ভোক্তার সংখ্যা যাই হউক, তাদের পকেট পরিস্থিতি মোটেই সুবিধাজনক নয়। অধিকন্তু, শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক পাওয়া ভার। কৃষিক্ষেত্রে হয়ত শ্রমিকের ছড়াছড়ি বিদ্যমান। তাদের

অনেকের প্রান্তিক উৎপাদন হয়ত শূন্যের কোঠার এপাশ-ওপাশে, কিন্তু তাই বলে তারা শিল্পকাজে সরে আসবে এমন নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে কৃষিক্ষেত্র আঁকড়ে থাকতেই প্রেরণা দেয়। এই বাঁধা ডিঙিয়ে তাদেরকে শিল্পক্ষেত্রে টেনে আনতে হলে তাদের পেছনে যথেষ্ট খরচ প্রয়োজন। তদুপরি রয়েছে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া। তজ্জন্যও যথেষ্ট খরচ করতে হয়।

স্নুতরাং, প্রশ্ন উঠে এইসব দেশের সঞ্চয় দিয়ে কি হয়? কোথায় তাদের বিনিয়োগ ঘটে? উত্তরে বলা যায় যে, সঞ্চয়ের বিরাট একটা অংশ ঘরবাড়ী ও বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণে নিয়োজিত হয়। ধনীরা এই সব প্রাসাদ নির্মাণ করে থাকেন। ফলে, নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শিল্পসমূহের বেশ প্রসার ঘটে। সাধারণ মানুষের ভোগে তা আসে না। এতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য। তাছাড়া নির্মাণ-কাজে নিয়োজিত শিল্প-সমূহকে বিনিয়োগ বর্ধক-শিল্প না ভেবে ভোগ-শিল্প (consumption) হিসাবে গণ্য করাই হয়ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ এই সব শিল্পের সম্প্রসারণ-প্রভাব (spread effect) তেমন ধর্তব্য কিছু নয়। তেমনি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনেও তার ভূমিকা নেহায়েত নগণ্য।

সঞ্চয়ের অপর একটা অংশ রপ্তানি শিল্প ও তৎসংলগ্ন উৎপাদন ও বণ্টন শিল্পে এবং বাজার সুবিধা প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকে। এই শিল্পের চাহিদা বিদেশে। স্নুতরাং, বিনিয়োগকারীদের সহজ বিশ্বাস যে এক্ষেত্রে মার নেই। দেশী ভোক্তার চাহিদা মিটাতে যেয়ে ঝাড়-ঝাপটা পোহাতে হয়। রপ্তানি শিল্পে তেমনটি নয়। স্নুতরাং অন্যত্র নয়, হেথায়, হেথায়। তাছাড়া, এক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানের বাঁধা তেমন সঙ্কটজনক নয় এবং শ্রমিক সংগ্রহ ও তাদের ট্রেনিং অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ।

সঞ্চয়ের বাকীটুকু বিদেশী কোম্পানীর কাগজ (foreign securities) খরিদে নিয়োজিত হয়। যেমন ধরুন লাতিন অমেরিকার কথা। লাতিন আমেরিকান দেশগুলো ১৯৫১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র খরিদে প্রায় ৯০ লক্ষ ডলার নিয়োগ করে। ১৯৫২ সালে তার পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ ডলার। এক্ষেত্রেও একই মনোবৃত্তি ক্রিয়া করে। ঝুঁকি কম অথচ লাভের মাত্রা নিশ্চিত। একেবারে ভরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রপ্তানি বাণিজ্য সব সময় তেমন ফলপ্রসূ নয়। বাণিজ্য চক্রের চক্কর তাকে পোহাতে হয়। ফলে তার থেকে পাওয়া লাভ বাণিজ্য

চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম হয়। মন্দাবস্থায় লাভালাভ পড়ে যায়। আবার তেজী মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে। দেশী শিল্পে এই উঠা-নামার আঘাত বেশ জোরেসোরে লাগে। কেননা, দেশী শিল্পে রপ্তানি বাণিজ্য প্রাধান্য বিদ্যমান। সুতরাং, এই তারে ধ্বনী উঠা মানে অন্যত্র দ্যোতনা সৃষ্টি হওয়া। ফলে কেউ যদি তার সব ডিম দেশী শিল্প নামক বাক্সে রেখে দেয় তাহলে ধনেমানে ডুবার সম্ভাবনা থেকে যায়। অন্যদিকে বিদেশী শেয়ারে টাকা খাটালে তার লগ্নীব্যবসায় একটা ভারসাম্য আসে। যাহোক, বাবা দুর্দিনের বন্ধু কিছু লাভ তার থেকে পাওয়া যাবেই। তদুপরি, এইসব দেশের রাজনৈতিক আকাশ বেশ ঘোলাটে, কখন যে ঘোর বরিষণ শুরু হবে তা নিশ্চিত নয়। সুতরাং, সঞ্চয়িতার সবটাই মারা যেতে পারে, তার থেকে অল্প লাভে হলেও কিছুটা অন্ততঃ নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেওয়া বিচক্ষণতার পরিচয় নয় কি? সুতরাং, মোদ্দা কথা হল, দরিদ্র দেশে যাদের টাকা আছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উৎসাহী নয়। উদ্যোগজনক প্রচেষ্টা চালাবার মত স্পৃহা তাঁদের নেই। ঝক্কি-ঝামেলা পোহাবার মত মানসিক প্রবৃত্তি তাঁদের মধ্যে অবর্তমান। দেশের মঙ্গলে প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু তাঁদের কি? তাঁদের দু'পয়সা ঘরে এলেই হল, তা বিদেশী বিনিয়োগ থেকে হউক তাতে কিছু আসে-যায় না। সুতরাং, সাধারণ সুযোগ বিবর্জিত নিজ দেশে উৎপাদনশীল ক্রিয়া-কর্মে ব্যাপৃত হওয়ার মত বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা হতে তারা তেমন উৎসাহী নয়।

স্বদেশী বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। তা করতে হলে অবশ্য প্রথমে উদোক্তা শ্রেণীকে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দরিদ্রদেশে উদ্যোগ নেওয়ার যথেষ্ট সমস্যা বিদ্যমান। খড়কুটা প্রচুর পোহাতে হয়। ঝক্কি-ঝামেলা প্রচুর পোহাতে হয়। সেই তুলনায় অবশ্য মুনাফাও বেশ মোটা পাওয়া যায়। তবে তা হাসিলে দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। সুযোগ-সুবিধা কাজে খাটিয়ে নানা রকম বাঁধা উতরিয়ে তবেই লাভ পাওয়া যেতে পারে। সেই বাঁধা অতিক্রমে দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন উদ্যোক্তা শ্রেণীর প্রয়োজন। ভূ-স্বামীরা এই ঝুঁকি নেওয়ার মত নয়। এদের টাকা-পয়সা আছে সত্য; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি নেই। বরং উল্টোটা আছে। পদমর্যাদা বোধ ও সামাজিক পরিবেশ বরং তাদেরকে শিল্প ক্রিয়াকর্মকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়।

ভূ-স্বামীর সন্তান কৃষিক্ষেত্রেই পড়ে থাকবে। অন্যত্র যেতে চাইবে না। তা অন্যত্র যত লাভজনকই হউক না কেন। অথচ এঁরা সচেতন হলে বেশ শক্তপোক্ত উদ্যোক্তা হতে পারে।

মাঝারি আয়সম্পন্ন শ্রেণী থেকে উদ্যোক্তা শ্রেণী জন্ম নিতে পারে বটে। তবে অধিকাংশ দরিদ্রদেশে এই গ্রুপটি তেমন বলশালী নয়। আর যেটুকুবা আছে তার কিছুটা যদিওবা শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত, তবে তাদেরকে পরিচিত কতকগুলো ক্ষেত্রেই ক্রিয়া করতে দেখা যায়। যেমন বাজার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি। কারণ, এই সকলক্ষেত্র যেমন পরিচিত তেমনি চাহিদা সম্পর্কেও একটা ধ্যান-ধারণা আছে। কাজেই চেনা পথেই সবায় নৌকা চালায়। তাব অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মাঝারি আয়ের লোক এরা। প্রচুর পয়সাকড়ি নেই। কাজেই বড় আকারে বিনিয়োগ ঘটাবার সুযোগ কই? জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ব্যবসা এখনো তেমন পরিচিত হয়ে উঠেনি। এদিকে শিল্পকাজে নিয়োগ করার মত ঋণ পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। তাদের সামান্য যা সঞ্চয় তা'দিয়ে ছোট-খাট ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারে। অথচ বড় আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করা গেলে আধুনিক বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে হয়। দক্ষ উৎপাদন পর্যায়ে অর্জন সম্ভব হয় না। তেমনি বড় আকারে উৎপাদনেব অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আয়ত্তের বাহিরে থেকে যায়। ছোট-খাট শিল্প কারখানা গড়ে বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। প্রযুক্তিক ও কার্যনির্বাহক বিদ্যা অনেক উঁচু দরের হওয়া প্রয়োজন। অথচ দরিদ্র দেশ তা পাবে কোথায়? সুতরাং এই সব দেশের ভাবী উদ্যোক্তা চোখে সর্ষে ফুল দেখে। ধনীদেশের উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত প্রচুর সুযোগ-সুবিধা পায়। তেমনি প্রযুক্তিক বিদ্যায় পারদর্শী লোক মেলানো তার জন্য তেমন কষ্টকর কিছু নয়। বাজারজাত করার সুযোগ-সুবিধা তার আয়ত্তে। ফলে তার পক্ষে ক্রিয়াকর্ম করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। কিন্তু, দরিদ্রদেশে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে, বেচারা উদ্যোক্তা কোন ব্যাপারে তেমন সাহস পায় না। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য টাকাওয়ালারা তার সাহায্যে তেমন এগিয়ে আ.স না। ফলে দুঃসাহসিক ও বিপদকে মোকাবেলা করার মত যে দুই-চাবজন রয়েছে তারাও ক্রমে ক্রমে পিছপা হটে যায়।

এতক্ষণকার আলোচনা বেসরকারী খাতে নিবদ্ধ ছিল। দরিদ্র দেশে সরকারের কি ভূমিকা তা একটু আলোচনা করা দরকার। বহুকাল পেরিয়ে

এল, অথচ সরকার এখনো নীরব কেন? দেশ যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। অথচ সরকার কেন তার প্রচেষ্টা জোরদার করছে না? বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে তাব ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে না কেন? তা হলেত উন্নয়ন-গতি কিছুটা বেগবান হতে পারে। উন্নয়ন-পথ সহজ হতে পারে। বিদেশী সরকার বিদ্যমান দেশে হয়ত সরকার তেমন উদ্যোগী নাও হতে পারে। স্বদেশী শিল্প-উন্নয়নে তাদের মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? (তারা রপ্তানি বাণিজ্যে আগ্রহশীল। তাও আবার কাঁচামালের। স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রয়োজন রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল উৎপাদনে সম্প্রসারণ ঘটানো। শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে তাদের আগ্রহ দেখবার অবকাশ কোথায়, গরজইবা কি)? যুক্তিটা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু, যে সব দেশ বহুকাল ধরে স্বাধীন হয়ে আছে তাদের পক্ষে কি বলার আছে? তারাও যে চমৎকৃত কিছু করতে পেরেছে এমনত নয়? সুতরাং সমস্যা অন্যত্র। খোঁজ করলে দেখা যাবে, দরিদ্র দেশে বেসরকারীখাত যেমন দুর্বল তেমনি সরকারী খাতও অকমর্ণ্যের হাঁড়ি। রাজনৈতিক কোন্দল, তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক ফ্যাসাদ, পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থপর মনোভাব সমাজদেহে দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় বিরাজ করছে। স্থায়িত্বহীন সরকার সুষ্ঠু নীতি যেমন প্রণয়ন করতে পারে না তেমনি তা কার্যে পরিণত করায় ব্যর্থ হয়। সোজা কথায় নষ্ট-চক্র কেবল বেসরকারী খাতে নয়, সরকারী খাতেও বেশ আড্ডা গেড়ে বসে আছে। তার কুচক্রে পড়ে সরকারী খাতও পঙ্গু হয়ে দিনমান কালাতিপাত করছে।

বাজার অপূর্ণাঙ্গতার ফলে অর্থনীতিকে সুষ্ঠু করে তোলা সুকঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে দুষ্ট-চক্র বিরাজমান অর্থনীতিতে সম্প্রসারণ ঘটানো দুষ্কর হয়ে উঠে। সম্প্রসারণ ঘটাতে হলে নব নব ধ্যান-ধারণা অন্তরীণ করা প্রয়োজন। নূতন উপাদান কাজে লাগানো বাঞ্ছনীয়। উৎপন্ন দ্রব্যে পরিবর্তন ও পরিশোধন দরকার। উৎপাদন-আঙ্গিকে উন্নতি সাধন বাঞ্ছনীয়। কার্যনির্বাহক সংস্থায় পরিবর্তন আনয়ন ও সার্বিক গঠন প্রণালীতে (অর্থনীতির) ক্রম উন্নয়ন সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাহলে উৎপাদন-সীমান্ত ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়। কিন্তু, দুষ্টচক্রগুলো পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তার যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে আছে। সে উপযুক্ত পরিমাণে সম্প্রসারিত হতে পারছে না। এদিকে দুষ্ট-চক্রগুলো বিনষ্ট করাও সোজা নয়। এরা পরস্পর পরিপূরক (Complementary) ও অনুপূরক (Supplementary) হিসাবে কাজ করে চলেছে। ফলে অবস্থা দিনে দিনে আরও জটিল আকার ধারণ করছে। এই

জটিলাবর্ত ডিঙিয়ে অর্থনীতিকে নষ্ট চক্রের বেড়াজাল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তবেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়ে উঠতে পারবে।

আন্তর্জাতিক প্রভাব

দরিদ্র দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাধান্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রাধান্যের সাথে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী 'আন্তর্জাতিক শক্তিনিচয়'। এই শক্তিনিচয় বা প্রভাবসমূহের উন্মোচনে বিশ্ব-অর্থনীতিতে দরিদ্র বিশ্বের ভূমিকা উদঘাটিত হবে।[৪]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের আলোতে দরিদ্র দেশে বহির্বাণিজ্যের এই প্রাধান্যকে তুলনামূলক ব্যয়বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। ব্যয়বিধির এই তুলনামূলক নিক্তিতে বলা হয়েছে যে, বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে সব দেশ লাভবান হয়; বিশ্ব-আয় সর্বোচ্চ হয় আর দরিদ্র দেশগুলো হয় অধিকতর লাভবান। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের উদগাতারা এমন ইঙ্গিত করেছেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ লাভ বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলোর ভাগে পড়ে।[৫]

বহু ধন-বিজ্ঞানী ক্লাসিক্যাল বাণিজ্য তত্ত্বের সারবত্তার প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে দরিদ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রাসংগিকতা ও কার্য-কারিতা নিয়ে প্রায় সবায় সোচ্চার। তেমনি গতিশীল পরিস্থিতি বর্ণনে ধ্রুপদী তত্ত্বের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ রয়েছে।[৬] এই তত্ত্বের

৪. এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাবেন ঊনবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছদে।

৫. দেখুন, যথা- F.D Graham-এর The Theory of International Values, Princeton University Press, Princeton, 1938, 236-237.

৬. আলোচনা করুন, যথা- T. Balogh-এর "Welfare and freer Trade- A Reply", Economic journal, LXI, No 241 (March 1951); W.A, Lewis-এর Theory of Economic Growth ; H. Myint-এর "The Gains from International Trade and the Backword Countries" Review of Economic Studies, XVII (2), No. 58 (1954-55) ; G. Myrdal-এর An International Economy ; Joan Robinson-এর "The Pure Theory of International Trade", Review of Economic Studies XIV, No. 36 (1946-1947) এবং J. Viner-এর "International Trade Theory and its Present Day Relevance", in Economics and Public Policy.

ভিত্তি হিসাবে বহু বিষয়ে স্থায়ী হিসাবে ধরা হয়েছে। উপাদান-উপকরণ দেশাভ্যন্তরে সচল অথচ আন্তর্জাতিকভাবে অনড়—এই প্রতিজ্ঞা তত্ত্বটির যাত্রা শুরু হয়েছে। উৎপাদন-বিচিত্রা (Production function) পরিচিত বলে ধরা হয়েছে। একান্ত প্রান্তিক উৎপাদন (Private marginal product) ও সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন সমান বলে স্বীকার করা হয়েছে। বাণিজ্যে সূত্রপাত ঘটার পূর্বে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সুসম সম্পদ বিরাজিত বলে মেনে নেয়া হয়েছে এবং দেনা-পাওনার ভারসাম্য বিদ্যমান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

অনেকে মত ব্যক্ত করছেন যে, দরিদ্র দেশে এই 'আদর্শ পরিস্থিতি' বিদ্যমান নয়। যুক্তি প্রদান করছেন যে তুলনামূলক ব্যয়বিধি মূলতঃ একটা স্থৈতিক (static) তত্ত্ব বৈ কিছু নয়। কেননা, এই তত্ত্ব গোড়াতেই বলে নিচ্ছে যে, মানুষের রুচি-অভিজ্ঞান স্থিতিশীল, সম্পদ পরিমাণ ও প্রযুক্তিক-জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। শৃঙ্খবদ্ধ এই ছকে উক্ত তত্ত্ব কেবল একবারের মত একটা সর্বোচ্চ সুষম সম্পদ বিতরণ পরিস্থিতি বর্ণনা করছে। এই সকল অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের ফলে তত্ত্বটি তাত্ত্বিক পর্ব কাটিয়ে বাস্তব-পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তার পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘকালীন গতিবিধি বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তারপক্ষে উন্নয়নের প্রকৃত তাৎপর্য অন্তরীণ করা সহজ হতে পারেনি। উন্নয়ন আদর্শ স্থৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন সঠিক গঠন প্রণালীতে পরিবর্তন সাধন করে সম্পদ-সরবরাহ সমপ্রসারিত করা এবং গতিশীল অবস্থায় সেই সমপদ বিতরণ করা।

তদ্রূপ, বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মত হচ্ছে এই যে, মূলধন যেথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান এবং ফলে প্রান্তিক উৎপাদন কম সেখান থেকে যেথায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ও প্রান্তিক উৎপাদন উচ্চ সেখানে গমন করে। তাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে সুষম বণ্টন সংগঠিত হয় এবং সব দেশে আয় বর্ধিত হয়। কিন্তু এই মন্তব্য কতকগুলো অবস্থায় নির্ভরশীল। যেমন বিশ্বের সর্বত্র একটা সার্বজনীন পরিস্থিতি বিরাজ করতে হবে যার অর্থ দাঁড়ায় একান্ত-প্রান্তিক উৎপাদন ও সামাজিক-প্রান্তিক উৎপাদন সমানুপাতিক হতে হবে। তেমনি বাণিজ্যক ভারসাম্য (Balance of trade) অপরিবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সকল শর্তের ব্যতিক্রম হলে ক্লাশিক্যাল সিদ্ধান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে না।

ক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণে এই সকল দুর্বলতাহেতু তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সব সময় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং মতবিরোধ দেখা

দিয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্রদেশের বেলায় ক্লাশিক্যাল আলোচনার উপকারিতা সর্বকালে প্রশ্নবোধক প্রজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। একথা অবশ্যই সত্য যে, দরিদ্রদেশের উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোতে ক্লাসিক্যাল বাণিজ্যিক তত্ত্বে সংশোধন ঘটিয়ে নেয়ার অবকাশ রয়েছে। তা আজও তেমন স্পষ্টভাবে করা হয়ে উঠেনি। তবে এই সকল মতবিরোধ থেকে একথা বলা হয়ত উচিত হবে না যে, দীর্ঘমেয়াদী সচল সমস্যা বিশ্লেষণে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব একেবারে অপারগ। তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব ও বাণিজ্যিক মুনাফা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল মত হয়ত এই অবস্থাতেও সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষ। অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে সাঙ্গীকরণ (adjustment) ঘটিয়ে না নেয়া অবধি তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতেই হবে। হয়তবা এই দোষেও দোষী হতে হবে যে, ক্লাসিক্যাল মতবাদীদের সেই মুক্ত বাণিজ্য ধারণা দরিদ্র দেশের জন্য মঙ্গলকর হয়নি। বরং তার সৃষ্ট আন্তর্জাতিক ঘটনাবর্ত অতীতে দরিদ্র দেশের উন্নতি-প্রবাহকে শ্লথগতিসম্পন্ন করে তুলেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত এই সমস্ত সমালোচকদের অনেকে আবার সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের কথা তুলেছেন। তাঁরা আপত্তি তুলেছেন যে, "বাণিজ্য থেকে পাওয়া পরস্পর লাভ"-রিকার্ডোর এই মত আসলে মার্ক্স বর্ণিত শোষণেরই নামান্তর। দরিদ্রদেশ কোন সুবিধাই আসলে পায়নি। তাঁদের এই বক্তব্য যে ঠিক নয় তার বড় প্রমাণ ইতিহাস। কোন দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নেমে পূর্বাপেক্ষা গরীব হয়ে যায়নি। ববং কম-বেশী কিছুটা লাভবান হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বেশ কিছুসংখ্যক ধনবিজ্ঞানী শোষণ তত্ত্ব নিয়ে একটা গুরুগম্ভীর মত প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে প্রেবিস্ক (Prebisch), সিঙ্গার, মিন্ট, লিউইস্ ও মিয়রডাল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলছেন যে, পরিকল্পিত শোষণ নয় বটে, তবে শোষণ যে হয়েছে এবং দরিদ্রদেশ যে ভুগেছে এই সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তজ্জন্য দায়ী বিশ্ব-অর্থনীতিতে প্রবহমান 'অসমধর্মী শক্তিনিচয়' (disequalizing forces)। এই অসমধর্মী শক্তিনিচয়ের ক্রিয়া-কর্মের ফলে বাণিজ্য থেকে পাওয়া লাভের বড় ভাগটা অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলোতে চলে যায়। তাঁদের এই মন্তব্য এখনো যুক্তি-তর্কের পর্যায়ে। এ-নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখনো হয়নি। তবে একটু লক্ষ্য করলে তিনটি ধারা বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

প্রথমতঃ, বলা হয়েছে যে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার পর বহু দরিদ্র-দেশের অর্থনীতি 'দ্বিধা-বিভক্ত' (dual economics) হয়ে গিয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত শিল্পসমূহ তরতরিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। অথচ বাকী অংশটুকু পেছনে পড়ে রয়েছে। ফলে অসম অবস্থা দেখা দিয়েছে। একদিকে রপ্তানি ক্ষেত্রটুকু বেশ ঝক্‌মকিয়ে ফেঁপেফুলে উঠেছে। তার উৎপাদন-প্রক্রিয়া উন্নততর হয়েছে। দক্ষতা বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, অর্থনীতির বাকী অংশটুকু বেশ পেছনে পড়ে রয়েছে। কোন রকমে হাড়-জিরজিরে অবস্থায় নিজকে টিকিয়ে রেখেছে সেই মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-প্রক্রিয়া আঁকড়ে ধরে। এই বৈষম্য বোয়েকের ভাষায় 'দ্বৈত সমাজ' (dual society) ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। "পুঁজিবাদ-পূর্ব কৃষি-প্রাধান্য সমাজ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমদানীকৃত পশ্চিমা ধনীকতন্ত্র তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অথচ আদি সমাজ-ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিতে পারেনি। সেও পুঁজিবাদের রীতিনীতি অন্তরীণ বা হজম করে নিতে পারেনি। ফলে একটা দ্ব্যর্থক (ambiguous) অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই অবস্থাই হচ্ছে সামাজিক দ্বৈত্যতার প্রকৃষ্ট আবাসভূমি। এইভাবে বিবেচনা করলে সামাজিক এই দ্বৈত অবস্থা অনেক বিস্তৃত বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।"[৭]

দরিদ্রদেশ কর্তৃক বিদেশী ঋণ গ্রহণ করার একটা উল্লেখযোগ্য প্রতি-ক্রিয়া হল তার রপ্তানি বাণিজ্য বেশ পরিমাণে বেড়ে যাওয়া। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বেশ বর্ধিত হারে বেড়ে যায়। এমনকি তা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণ পেতে চান? তবে লক্ষ্য করুন। মালয়ে রবার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯০৫ সালে যেখানে ছিল মাত্র ২০০টন সেখানে ১৯২০ সাল নাগাদ তার রপ্তানিই দাঁড়িয়েছিল ১,৯৬,০০০ টনে। ১৯০৫-১৯৩৯ সালের মধ্যে গোল্ডকোস্ট ও নাইজেরিয়ায় কোকো উৎপাদন প্রায় ৪০ গুণ বেড়ে যায়। ১৮৭০ থেকে ১৯৩০ সাল নাগাদ হিসাব কষলে দেখা যায় যে, বার্মার রপ্তানি বাণিজ্য বার্ষিক গড়ে ৫ ভাগ হারে বেড়েছে। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় কফি-রপ্তানি ছিল ১৯৩৬ সালে ৬,৩০০ টন। ১৯৪৮ সালে তা ৪০,০০০ টনে উন্নতী হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আখ, সিংহলের চা ইত্যাদি সবার বেলায় একই কাহিনী।[৮]

---

৭. দেখুন জে. এইচ. বোয়েক প্রণীত Economics and Economic Policy in Dual Societies, নামক পুস্তক, ১৯৫৩ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪, Institute of Pacific Relations.

৮. উপরোল্লিখিত মিন্টের বইখানা দেখুন পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৯।

সুতরাং, রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু এই সম্প্রসারণ বাকী অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারেনি। রপ্তানি বাণিজ্যক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে। অন্যত্র অবহেলা বিরাজ করেছে। রপ্তানি-শাখা যেন (export sector) অর্থনীতির বাকী অংশটুকুকে অক্টো-পাশের ন্যায় সাপটে ধরে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের উচ্চতর প্রাধান্য সহায়ক না হয়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসাবে ক্রিয়া করেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেকে। তাঁরা বলছেন, তার ফলে দরিদ্রদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের মজা লুটা সম্ভব হয়নি। বরং দরিদ্রদেশ যে অনুন্নত ও বিশ্বগোষ্ঠীর তুলনায় হেয় তা প্রমাণিত হয়েছে।[৯] উৎপাদিত কাঁচামালের নামমাত্র অংশ দেশের ভোগে যায়। বাকী সবটাই রপ্তানি হয়। রপ্তানিক্ষেত্রে ব্যবহৃত উন্নত প্রকৌশলিক ও কারিগরি প্রণালী অন্যত্র অনু-করণ করা হয়নি। সোজা কথায়, রপ্তানি-বাণিজ্যে-স্বাচ্ছল্য শিক্ষাগত তেমন কোন প্রভাব অন্যত্র বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। তেমনি ক্রিয়াশীল একদল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও তা ব্যর্থ হয়েছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন যে, রপ্তানি বাণিজ্য উপকরণ-মূল্যে ভারসাম্য পরিস্থিতি থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়ে নেয়ার ক্রমবর্ধিষ্ণু এক দুষ্ট প্রভাবের জন্ম দিয়েছে। রপ্তানিক্ষেত্রে নিয়োজিত উপকরণ অনুপাত যে প্রান্তিক ফলন দেয় তা জীবিকাসর্বস্ব ক্ষেত্র-সমূহ (subsistence sectors) নিয়োজিত ফলন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলে বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত উপাদানের ফলন বিভিন্নরূপ হয় এবং এই ভেদা-ভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে থাকে এবং উপাদান কাজে খাটাবার মাত্রা নিম্ন-গামী হয়ে উঠে।[১০]

দরিদ্র দেশের অর্থনীতি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে স্বল্পকালীন বিবেচনায় তা আন্তর্জাতিক চাহিদা ও দরের উঠানামার বশীভূত হয়ে পড়ে। চাহিদা ও দরে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার ফলে অর্থনীতিতে স্থিতিহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য-চক্রের ঝড়-ঝাপটা অতি সহজে অর্থনীতিতে অন্তরীত হয়ে দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি করে। বাণিজ্য-সূত্র বা বাণিজ্যিক ভারসাম্য মন্দাকালে দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং বিদেশী মূলধনের আগমন হ্রাস পায়। ফলে লেন-দেন ভারসাম্যে (balance of payment) অস্থিরতা দেখা দেয়।

---

৯. দেখুন, G. Myrdal-এর An International Economy, Harper and Brothers, New York, 1956, Chapters VIII, XIII.

১০. ই. ডেসপ্রেস ও সি. পি. কিণ্ডেল বার্জার প্রণীত "The Mechanism for Adjustment in International Payments" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

উপরোক্ত ধনবিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপাদান-সঞ্চালনের (factor movement) ফলাফল তেমন সুখপ্রদ হয়নি। বিদেশী পুঁজি-রপ্তানি শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করেছে বটে, কিন্তু সার্বিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করতে পারেনি। তেমনি জনাগম (immigration) 'সস্তা শ্রম-নীতি' জন্ম দিয়েছে। সত্যিকার উপকার ঘটাতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত ও চীন থেকে প্রচুর জনাগম ঘটে। কিন্তু তা মজুরীর হার না বাড়িয়ে বরং নিম্নমুখী করে তুলে।[১১]

ধনবিজ্ঞানীদের তৃতীয় বক্তব্য দরিদ্রদেশের বাণিজ্য শর্ত (Terms of Trade) গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী অবনতি ঘটেছে। অর্থাৎ সময়ের ব্যাপ্তিতে দরিদ্রদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক উর্ধ্বমুখী গতিসম্পন্ন হতে পারেনি। বরং ক্রমাগত নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। সিঙ্গার ও প্রেবিস্ক-এর ভাষায় কথাটা পরিষ্কার করা যাক। তাঁরা বলেন, প্রযুক্তিক বিদ্যায় যে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মজা প্রায় সবটাই লুটেছে শিল্পোন্নত দেশসমূহ। দরিদ্র দেশের ভোগে তেমন কিছু আসেনি। অপরদিকে লিউইসের মত হচ্ছে এই যে, জীবন ধারণোপযোগী মজুরীতে শ্রমের অসীম সরবরাহ বিদ্যমান বলে নাতিশীতোষ্ণ দেশের বাণিজ্য পণ্যের দাম সর্বদাই নিম্নে থেকেছে। অর্থাৎ কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করার মত মজুরী নিয়ে সন্তুষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা অসংখ্য হওয়ায় বাণিজ্যোপযোগী পণ্যের মূল্য উর্ধ্বগতিসম্পন্ন হতে পারেনি।

উপরোক্ত উক্তিগুলো অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ এবং যুক্তিতর্ক ও বাস্তব পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করার মত বিষয়বস্তু। তা এখনো হয়ে উঠেনি। কাজেই তাদের সত্য-অসত্য নিয়ে মাতামাতি করার মত কিছু নেই, আমাদের পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া, আমাদের প্রয়োজনে তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুও নয়। আমাদের জন্য এই যথেষ্ট যে, দরিদ্র দেশ দরিদ্র রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক উদ্যোগ তেমন কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তজ্জন্য সাম্রাজ্যবাদ দায়ী না উপরোক্ত বিষয়াবলী দায়ী, কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে অসংশ্লিষ্ট অন্য কোন ঘটনা দায়ী তা সঠিক করে বলার জো নেই।[১২] তবে আন্তর্জাতিক এমন কতকগুলো শক্তিনিচয়

---

১১. Myint-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৯৫ ; Myrdal-এর পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ২২৫, ৩৪০।

১২. সমস্যাটি উনবিংশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো সহজে চিহ্নিত করা যায়, এবারে এগুলো উন্মুক্ত করা যাক্।

রপ্তানি প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু, তার প্রভাব তেমন সুখপ্রদ হয়নি। বিনিয়োগে সম্প্রসারণ ঘটেনি। তেমনি নূতন নূতন শিল্প-ক্ষেত্রে পুঁজি-বিনিযোগ দেখা দেয়নি। ফলে, আয়বর্ধক ও বিনিয়োগ বর্ধক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কর্মঠ হয়ে উঠতে পারেনি। পরিণতি হিসাবে আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্য দরিদ্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেনি। অথচ ব্রিটেনের মত উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং, প্রশ্ন উঠে: কেন এমন হল? কেন রপ্তানি-বাণিজ্য-শাখা তেমন শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম হল যার ফলে তারপক্ষে দুষ্ট-চক্রসমূহকে ঘায়েল করা সম্ভব হল না? এই সবের উত্তর প্রদান সহজ নয়। তবে দরিদ্রদেশের বাণিজ্য শর্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া (production function) ইত্যাদি খতিয়ে দেখলে হয়ত কিছুটা খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এদের আকৃতি-প্রকৃতি ও চলাচল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়া উদঘাটন করা সম্ভব হলে সত্যিকার কারণ খুঁজে বের করা অনেকটা সহজ হবে।

বাণিজ্য শর্তে অবনতি নিয়ে একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই উক্তি বিশেষভাবে তর্কসাপেক্ষ এবং নানারকম প্রশ্নবোধক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, বাণিজ্য শর্তে গতায়াত মানেই আয়ে বৈষম্য নয় অর্থাৎ কিনা বাণিজ্য শর্তের চলাচল দিয়ে আসল আয়ে তারতম্য বোঝা যায় না। যে সকল পরিসংখ্যান তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে প্রতিপাদ্যটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো প্রশ্নাতীত নয়। নানারকম ভুল-ভ্রান্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে। তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাঁচামালে ভিন্ন ভিন্ন রকম দরমাত্রা পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি একই রকম কাঁচামালের রকম-ভেদে দর-তারতম্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। সুতরাং, বাণিজ্য শর্তের গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী চলাচল সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট দেশের বেলায় হয়ত তা করা যেতে পারে এবং হয়তবা তা প্রাসংগিকও হতে পারে।[১৩] তবে সাধারণভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা

১৩. দেখুন Kindleberger প্রণীত 'The Terms of Trade,' New York, ১৯৫৬ সাল, পৃঃ ২৫৩-২৫৭।

সহজ নয়। তাছাড়া, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুঝা যায় যে, বাণিজ্য শর্ত নিয়ে যে যুক্তিজাল দাঁড় করানো হয়েছে তা তেমন গ্রহণযোগ্য কিছু নয়। বরং, দরিদ্র দেশের বাণিজ্য শর্ত কোনরকম অবনতি ঘটেছে এটা মেনে নেওয়ারও তেমন কোন শক্তিশালী যুক্তিলক্ষ্য করা যায় না। আর যদিবা যাকে তার জন্য একথা বলা যায় না যে, এইসব দেশ সত্যিকারভাবে ঘটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তাছাড়া অতীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। লক্ষ্য করতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যৎ বাণিজ্য শর্তে কি আকার নেবে তা অধিক বিবেচনার বিষয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, কাঁচামাল উৎপাদনে সম্প্রসারণ ঘটাবার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে একাধারে শ্রমিক উঠে আসছে। অন্যদিকে অধিক পরিমাণে শিল্পায়ন ঘটে চলেছে। ফলে, সময়ে কাঁচামাল সরবরাহে স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। যদি তাই হয় তবে দরিদ্র দেশের বাণিজ্য শর্ত মন্দের দিকে না যেয়ে বরং ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

বাণিজ্য শর্তে চক্রাকার ঘূর্ণন অবশ্য দরিদ্র দেশের জন্য বিশেষ ক্ষতি-কারক। বিশ্ব অর্থনীতির প্রাচুর্য-পর্বে অথবা মুদ্রাস্ফীতিকালে কাঁচামালের দাম তড়িৎগতিতে বেড়ে যায় এবং তা সাধারণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে দরিদ্র দেশের বাণিজ্য শর্তে উন্নতি ঘটে। দেশ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক-মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আক্কেলের অভাব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই। সবায় সাময়িক প্রাচুর্য নিয়ে মেতে থাকে। দেশে বেশ মৌজ চলতে থাকে। অধিকাংশ বৈদেশিক-মুদ্রা সৌখীন বিদেশী দ্রব্য আমদানীতে ব্যয়িত হয়।

শুধু তাই নয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন যথেষ্ট হয় বলে দেশেও একটু চড়াভাব দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে দেশী বিনিয়োগে অসমভাব দেখা দেয়। সম্পদে অসম বণ্টন ঘটে। বাণিজ্যিক লেন-দেনে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। রপ্তানি উৎপাদন সহসা বাড়ানো যায় না। অথচ রপ্তানি আয় অধিক বলে এবং ব্যাঙ্কসমূহে জামানত পরিমাণ বেশী থাকার পরিণতি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি তেজীভাব ধারণ করে।

আর মুদ্রাস্ফীতি একবার দেখা দিলে চারদিকে ওলট-পালট ঘটে যায়। ফটকা কারবার (speculative venture) মাথা উঁচিয়ে উঠে। শুরু হয় ব্যবসা-বাণিজ্যে নানারকম বায়নাক্কা ও দূরকল্পী দরকল্পনা। ফটকাবাজারী বিনিয়োগক্ষেত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ফলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যহত হয়।

অন্যদিকে, দরিদ্রদেশের মানুষ জমি ও ঘরবাড়ী তৈরীতে বেশী মনোযোগী এবং এদিকে তাদের ঝোঁক বেশী হওয়ার কারণ এই যে, মুদ্রা মানে অবনতি ঘটে ধনেমানে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিজেদেরকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সবায় সচেষ্ট হয়। কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিদেশে মূলধন পাঠিয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এই প্রবণতা আরও তীব্রতর হয়।

বৈদেশিক দরমাত্রার তুলনায় দেশীয় দরমাত্রায় বর্ধন দেখা দেয় বলে আমদানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনী শিল্পসংস্থাগুলো হতাশাবোধ করে। অন্যদিকে, দেশীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় বলে এবং দেশীয় আয় উর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয়ে উঠার পরিণাম হিসাবে অধিকাংশ আয় আমদানীক্ষেত্রে ধাবমান হয়। সৌখীন বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। পরিণতি হিসাবে কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হাওয়া হয়ে যেতে থাকে।

মন্দাপর্বে, কাঁচামালের দাম সরাসরি পড়ে যায়। সেই তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্যের দাম তেমন নেমে আসে না। ফলে দরিদ্রদেশের বাণিজ্য-শর্তে বা বাণিজ্য সম্পর্কে (Terms of Trade) অবনতি ঘটে। বাণিজ্য-চক্রের সাথে তা সমানুপাতিক হয়ে উঠে বলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য-চক্রের কুফল আরও তীব্রতর হয়। রপ্তানি পণ্যের দামে অবনতি ঘটার ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। পরিণামে অত্যাবশ্যকীয় মূলধনী-সম্পদ আমদানী করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কাঁচামাল উৎপাদনকারী দরিদ্রদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অপর বাধা হিসাবে সেই সব দেশের রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন-বিচিত্রার (Production function) কথা উল্লেখ করা যায়।[১৪] উৎপাদন-বিচিত্রায় প্রতিকূল প্রযুক্তিক কৌশল বিদ্যমান। প্রকৌশলিক সীমাবদ্ধতার জন্য আদর্শ উপাদান-সংযোগ সম্ভব হয় না। তার ফলে উন্নয়ন ধারা ব্যহত হয়। প্রথমতঃ, শ্রম-বণ্টন অসম হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট থাকে। কোন বিশেষক্ষেত্রে হয়ত বিশেষ রকম শ্রমের সমাবেশ ঘটতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয় বণ্টন প্রভাবিত হওয়ার ফলে উন্নয়ন প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ

---

১৪. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, R. E. Baldwin-এর "Patterns of Development in Newly Settled Regions", Manchester School of Economic and Social Studies, XXIV, No-2, 161-179 (May, 1956).

দিয়ে কথাটা বোঝানো যাক। ধরুন কোন দেশে চিনি, চা, তুলা ইত্যাদি কৃষিদ্রব্য উৎপাদন উন্নয়নের পক্ষে তেমন সহায়ক নয়। কেননা বৃহদাকারে এইসব দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে অনেক অদক্ষ শ্রমিক বিদেশ থেকে আনাতে হয়। পরে এই সমস্ত শ্রমিক অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। এই সমস্যা সমাধান সহজ হয় না। মালয় ও সিংহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বলে আন্দাজ করা যায়। মালয়ে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় ও চীনাদের আগমন ঘটেছিল। তেমনি সিংহলে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণ ভারতীয়ের আগমন ঘটেছিল। অন্যপক্ষে গম জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক বলে ধরা যায়। যে দেশ প্রথম দিকে গম উৎপাদনে মনোনিবেশ করে তার জন্য পরবর্তীকালে উন্নয়ন-অগ্রগতি হাসিল সহজ হয়। এইক্ষেত্রে প্রচুর শ্রমিকের আগমন ঘটে এবং সাধারণতঃ এই সকল শ্রমিক বেশ পাকাপোক্ত হয়। উৎপাদন-বিচিত্রায় সম্প্রসারণ তেমন কষ্টসাধ্য নয়। ফলে, সর্বোচ্চ উৎপাদন-মাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। তাছাড়া, জাতীয় আয় বণ্টন সহসা সুষম হয়ে উঠে না। এই সকল বিষয়াবলী পরবর্তী উন্নয়ন ধারা ত্বরান্বিত করতে পারে। অপরপক্ষে, মনে করুন কাঁচামাল উৎপাদনে লিপ্ত কোন একটা দেশে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, কিন্তু বাজার তেমন সম্প্রসারিত নয়। উদ্যোগ-প্রচেষ্টাও জোরদার নয়। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বণ্টনে সুষম নীতি খাটাতে গেলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাছাড়া, অশিক্ষিত ও অদক্ষ শ্রমিককে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাকা করে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এটা করতে গেলে উল্টো ফল ফলতে পারে। কেননা অধিকাংশ সম্পদ রপ্তানি শিল্পে কেন্দ্রীভূত হয়ে যেতে পারে এবং সাধারণতঃ এইসব সম্পদ কাঁচা বা অর্ধ-কাঁচা আকারে বিদেশী বাজারে বিক্রিত হতে থাকবে। এদিকে, আহরণকারী শিল্পে (extractive industries) প্রচুর পুঁজি দরকার। সেই তুলনায় শ্রম তেমন প্রয়োজনীয় নয়। কেবল অল্প সংখ্যক বিশেষ দক্ষ শ্রমের প্রয়োজন। তৈল ও লৌহ শিল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ দরিদ্র দেশে এই দুটোরই অভাব। ফলে, বিদেশ থেকে উভয়ের আগমনের সম্ভাবনা বেশী। তাহলে দেশে চাকরি-বাকরী ও আয়ের পরিমাণে তেমন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সীমিত হতে বাধ্য।

চাষাবাদ তেমন বিদ্যমান নয়—দেশে অবশ্য অবস্থা ভিন্ন রকম। অ-কৃষি প্রধান দেশে বরং আয় বণ্টন মোটামুটি সুষম হওয়া উচিত।

তাতে দেশীয় সম্পদ পুরোপুরি কাজে লাগানো সহজ হয়। তার সাথে উদ্যোগজনিত কর্মস্পৃহা তীব্রতর হলে এবং শ্রম-সমস্যা তেমন প্রকট না হলে সোনায় সোহাগা হয়। দেশে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন যেমন সহজ হয় তেমনি রপ্তানিপণ্য উৎপাদনও সহজতর হয়। বিভিন্ন রকম শিল্প সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং উদ্যোক্তারা ক্রমে ক্রমে কঠিনতর শিল্পসংস্থা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। তাতে করে মাথাপিছু আয় অধিক বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা জন্ম নেয়।

উন্নয়ন-পথে আন্তর্জাতিক বাধার সর্বশেষ উদাহরণ হিসাবে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। সাধারণতঃ রপ্তানি-বাণিজ্যে বিদেশী পুঁজি নিয়োজিত হয়। প্রায় সব দেশের বেলায় একথা সত্য। ফলে, রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রচুর সম্প্রসারণ ঘটে। উন্নতিও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা পেট মোটা হাতীর ন্যায়। যত উন্নতি কেবল রপ্তানি ক্ষেত্রে, অন্যত্র তার প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ফলে, সার্বিক উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় তার কিছুই ঘটে না। অবশ্য তজ্জন্য বাজার অসম্পূর্ণতা অনেকাংশে দায়ী। তা এমনকি রপ্তানি শিল্প ক্ষেত্রেও অবস্থা তেমন সুখপ্রদ নয়। বিদেশীদের মোট মুনাফা, মাইনে, সম্পদ-অবক্ষয় ইত্যাদি পুষিয়ে সামান্যই বাকী থাকে, যার ভাগ মাথাপিছু তেমন কিছু একটা পড়ে না। তাছাড়া, রপ্তানি-শিল্পে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে যে, মজুরী দেওয়া হয় তা প্রকৃত মজুরী বর্ধনে তেমন একটা কিছু নয়।

এদিকে বিদেশীরা মজা লুটে নিয়ে যায়। তারপরে সঞ্চয় হওয়ার মত দেশে তেমন কিছু একটা থাকে না। যেমন্ লাতিন আমেরিকার কথা ধরুন। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা যায় যে, বিদেশী পুঁজিপতিরা গড়ে প্রতি বৎসর ৬৬,০০০ লক্ষ ডলার কামিয়েছেন। অথচ এই সময়ে গড়ে প্রতি বৎসর মাত্র ২৩,০০০ লক্ষ ডলার মূলধনের আমদানী ঘটেছে। ১৯৫০ সালে মূলধন বহিরাগমন ঘটে ৭৫,৫০০ লক্ষ ডলার আর আগমন ঘটে মাত্র ৩,৩০০ লক্ষ ডলার। সুতরাং ব্যাপারটি ভেবে দেখার বিষয় বটে। অবশ্য এই বহিরাগমন বন্ধ করে দিলে হয়ত অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। কেননা, তাহলে বিদেশী পুঁজি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সময়ে হয়ত রপ্তানিও সঙ্কোচিত হয়ে যেতে পারে। সে যাই হউক, কথা থেকে যায় যে, দেশ হতে লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে

সরাসরি চলে গেলে প্রকৃত সঞ্চয় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হতে পারবে না। অথচ তা আমদানী আকারে বিদেশে গেলে দেশে কি লাভই না হতে পারত।

চাষাবাদ পদ্ধতি (Plantation System) বিদ্যমান নয় দেশেও বিদেশী পুঁজি ও উদ্যোগ উন্নয়নগতি সীমিত করতে পারে। এই সব দেশে কৃষক ছোট ছোট খামার চাষবাস করে। তারা হয়ত কিছুটা বাণিজ্যদ্রব্যও উৎপন্ন করে। এই বাণিজ্য দ্রব্য কেনাকাটা করা ও সাধারণ শিল্পকাজে লাগাবার মত লোকের সংখ্যা তেমন বেশী নয়। স্বল্পসংখ্যক একটা ব্যবসায়ী দল সাধারণতঃ তা করে থাকে। রপ্তানি করার কাজেও তারা লিপ্ত। তেমনি যেসব দ্রব্য দেশে আমদানী হয়ে থাকে তাও এই বিশেষ দলটি কর্তৃক আনীত হয়। অর্থাৎ কি বেচাকেনা, কি আমদানী-দ্রব্য কেনাকাটায় কৃষককুলকে একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন একটা ব্যবসায়ী সংঘের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এই পরিস্থিতি দেশের সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গলজনক নয়। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে কেনাকাটার যে সুযোগ পাওয়া যায় তা থেকে দরিদ্র দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়।

বিদেশী বিনিয়োগের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবারে বিষয়টির অন্য পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। দরিদ্র দেশের উন্নয়নে বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলোর ভূমিকা নেহায়েত নগণ্য নয়। আমদানী দ্রব্য দেশে নিয়ে আশা ও দেশাভ্যন্তরে তা পৌঁছে দেওয়া সাধারণতঃ বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলোর কাজ। এতে দেশের লোকের উপর প্রদর্শনী প্রভাব পড়ে। সাধারণ মানুষ দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও বিদেশ থেকে আনা দ্রব্যের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে দেখার সুযোগ পায়। তাছাড়া, বহু বিদেশী বাণিজ্য-সংস্থা তাদের অর্জিত আয় সেই দেশেই পুনর্বিনিয়োগ ঘটায়। তাতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার হয়। সুতরাং বলা যায়, বিদেশী পুঁজিতে দোষ-গুণ দুটোই রয়েছে। কোন্‌টা বেশী আর কোন্‌টা কম তা হয়ত ঠিক করে বলা মুশকিল। তবে সবকিছু বিবেচনা করে হয়ত দেখা যাবে ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ কম নয়, বরং মঙ্গল অধিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আয়বর্ধক ও বিনিয়োগবর্ধক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ দিলেও আরও কথা থেকে যায়। আয়বর্ধনজনিত প্রভাবসমূহও কতকগুলো কারণে সীমিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে বিদেশে বিদ্যমান ছিদ্র বা ক্ষরণ (leakage)

উল্লেখযোগ্য। একদিকে, বিদেশে মুদ্রাপাচার হয়ে যায়। সাথে সাথে মূলধনের সুদও যায়। অন্যদিকে বিনিয়োগকারী দেশের যন্ত্রপাতিও আমদানী করে আনতে হয়। কথাটা প্ররোচিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। রপ্তানি-বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্ররোচিত বিনিয়োগ (**induced investment**) বেড়ে যায়। ফলে, সেই সব দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানীও বাড়াতে হয়। এদিকে আবার আমদানী দ্রব্যের জন্য উচ্চতর প্রান্তিক প্রবণতা বিদ্যমান। তেমনি, 'উচ্চ আয় অধিক আমদানী শক্তি' প্রবণতাও দরিদ্র দেশে বেশ প্রবল। এই দুয়ে মিলে আয়ের মাত্রা সবসময় নিম্নদিকে রাখতে সাহায্য করে। ফলে, এক ইউনিট বিনিয়োগে উন্নত দেশে যে পরিমাণ আয়বর্ধন ঘটে দরিদ্র দেশে তার চেয়ে অনেক কম ঘটে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দরিদ্র দেশগুলো মোটামুটিভাবে তুলনামূলক ব্যয়বিধি নীতিমালা মেনে চললেও বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভের ভাগ তেমন একটা পায়নি। বিদেশী পুঁজি কিছুটা এসেছে বটে; কিন্তু তা থেকে তেমন একটা লাভবান হতে পারেনি। এই কারণেও তাদের উন্নয়ন-অগ্রগতি বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বৈকি।

সাধারণভাবে উপরোক্ত মন্তব্য মেনে নিয়ে অবশ্য সবিনয়ে নিবেদন করা যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভের ভাগ পুরোপুরি না পাওয়ার জন্য কেবল বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগধারা ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রথাই দায়ী নয়। এই ব্যাপারে বাজার-অসম্পূর্ণতার অবদানও কম নয়। তেমনি দরিদ্র দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান হাজারো রকম অনমনীয়তা, ঋজুতা ও জট লাভ ভোগের অন্তরায় হিসাবে ক্রিয়া করেছে। ফলে, যে সামান্য সুযোগ-সুবিধা রপ্তানি বাণিজ্যক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে তাও সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে অন্তরিত হতে পারেনি। ফলে বিদ্যমান নষ্ট-চক্র ভাঙ্গনে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি।

এবারে শেষ কথায় আসা যাক। উন্নয়ন অগ্রগতির অন্তরায়গুলো উন্মোচন করে দেখা গেল। বাজার অসম্পূর্ণতা, দুষ্ট-চক্র এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব দরিদ্র দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এককভাবে যেমন ক্ষতিসাধন করে চলেছে তেমনি যৌথভাবে এবং একে অন্যের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়ে বাধাসমূহকে জোরদার ও বিস্তৃত করে চলেছে। মূলতঃ বাজার অসম্পূর্ণতা সম্পদ বিতরণ সুষম হতে দেয়নি। দুষ্ট-চক্রগুলো সাংগঠনিক

পরিবর্তনে বাধা হিসাবে ক্রিয়া করেছে এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব দরিদ্র দেশকে বৈদেশিক বাণিজ্যের পুরোপুরি লাভ ভোগ করতে দেয়নি। এদের ক্রিয়া-কর্ম, কারসাজি ও ষড়যন্ত্রের ফলে দরিদ্র দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেইসব দেশের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যতা আজও বিদ্যমান।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আবশ্যকীয় বিষয়াবলী
(General Requirements For Development)

দরিদ্র দেশের একটা রেখাচিত্র টানা হয়েছে। তার দরিদ্র থাকার কারণ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হয়েছে। এবারে তার উন্নয়ন-অগ্রগতিতে আবশ্যকীয় বিষয়াবলী আলোচনা করা দরকার। কথাটা সহজভাবে প্রস্তাব করা গেল বটে; কিন্তু উত্তরটা তত সহজ নয়। সাদামাটা কথা দিয়ে তার সমাধান দেওয়া যাবে না। যেন-তেন রকমে যেমন 'অন্তরায়গুলো দূর করে দাও', কি 'বাধাসমূহ ঝেড়ে ফেল', তাহলেই উন্নয়ন 'দ্রুতগতিতে চলে আসবে', উত্তর দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে না। গৎ-বাধা কথা প্রচুর শুনা গিয়েছে, তাতে বইয়ের পাতা ভরেছে বটে। ক্ষেত্রবিশেষে শ্রুতিমধুরও হয়ত হয়েছে; কিন্তু ফলতঃ কোন কাজে আসেনি। তেমনি 'উদ্যোগ জোরদার কর,' 'মূলধন জোগাড় কর' ও 'মূল্যবোধে পরিবর্তন সাধন কর,' তাহলে উন্নয়ন পেয়ে যাবে'— জাতীয় কথাগুলো প্রচুর শুনা হয়েছে। যন্ত্রবৎ এইসব বাধা বুলি সমস্যার ধারে-কাছেও ঘেষতে পারেনি, বরং এইসব সমাধানের কথা শুনে মনে হয়েছে যেন সমস্যাটা তেমন ঘোরালো নয়; কিন্তু আসলে যে তা হাজার গ্রন্থযুক্ত ঘোরপ্যাঁচালো জট তা যেন আজও অনেকের মনে আসেনি। কাজে কাজেই, সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। সাধারণভাবে উন্নয়নের জন্য কি কি দরকার তাদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন এবং এদের মধ্যকার সম্পর্কইবা কি ইত্যাদি বহু জিনিস খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অবশ্য সব কিছু মিলিয়ে আলোচনা করাটা বেশ জটিল কাজ। তজ্জন্য বহু বিষয়ের উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরিচিত বহু জ্ঞানের সীমায় পরিভ্রমণ একান্ত আবশ্যকীয়, বিশেষ করে ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন একান্ত বাঞ্ছনীয়। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করার সাধারণ বিষয়াবলী মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে বিস্তৃত বিবৃতি প্রদান করা হবে। আলোচনায় স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা স্থান দেওয়া হবে।

১. স্বদেশজাত শক্তিনিচয় (Indigenous Forces)

উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে প্রথম ও গোড়ার কথা এই যে, তা স্বদেশভিত্তিক হতে হবে। প্রত্যেকটি দেশের স্বীয় পরিবেশে তা গজিয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের ভিত্তিমূল স্বদেশজাত হতে হবে। অর্থাৎ কিনা দরিদ্র দেশের সমাজ ব্যবস্থা থেকে উন্নয়নের ধারাপ্রবাহ উৎসারিত হতে হবে। দরিদ্র দেশকে একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সত্যিকারভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায় এবং তজ্জন্য যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। সমাজকে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই এবং তা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে সবায় উৎসুক ও সর্বতোভাবে আগ্রাহান্বিত। অনু-প্রেরণা ও প্রচেষ্টা স্বদেশজাত হতে হবে। তা না হলে বাইরে থেকে যত সাহায্যই আসুকনা কেন তা তেমন ফলবতী বলে প্রতিপন্ন হতে পারবে না। কেননা, বাইবের কোন শক্তি জনসাধারণ্যে উন্নয়ন-স্পৃহা জাগিয়ে দিতে পারে না। স্বদেশজাত শক্তিকে তা উস্কিয়ে দিতে পারে এবং জোরদার করতে পারে কেবল। কিন্তু স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত উন্নয়ন ধারাকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে পারে বটে; কিন্তু তা উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারাব সূত্রপাত ঘটাতে পারে না।

উন্নয়ন ক্রিয়া-কর্ম সূচনা করা এক কথা, আর তা বজায় রাখা অন্য কথা। উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়ে উঠলে তবেই তা বজায় রাখার প্রশ্ন উঠে। সুতরাং প্রথমে উন্নয়ন ধারায় সূত্রপাত ঘটাতে হবে। 'বরফ ভাঙা' পর্ব সমাধা করা সম্ভব হলে পরে তবে উন্নয়ন পর্বে ধাবমান হওয়া যায়। আর উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয়ে গেলে পর তা রক্ষার প্রশ্ন জাগে। সুতরাং 'সূচনা' ও 'বজায় রাখা' কথা দুটোর পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব হলে তবে স্বদেশজাত শক্তিনিচয়ের গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে। বিদেশী সাহায্য নিয়ে হয়ত বাছাই করা কতকগুলো প্রকল্প শুরু করা যায়; কিন্তু এতে উন্নয়ন বজায় রাখা সম্ভব নয়। বিদেশী সাহায্য পেয়ে চমকপ্রদ অনেক কিছু হয়ত করা যায়। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আর এই স্থিতিহীন চমৎকারিত্ব উন্নয়ন নয়; বরং উন্নয়নের বাহার, যার ভিত্তিমূল শক্ত নয়। কারণ একটা কাজ শুরু করলেইত চলবে না। সাথে সাথে আরও শত কাজ করতে হবে এবং চলতি কাজ চালু রাখতে হবে ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাতে পরিশোধন, পরিমার্জন ও পরিযোজন ঘটিয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, নব নব প্রচেষ্টা উৎসারিত হতে থাকতে হবে।

পথ-প্রদর্শকের পথ অনুসরণ করে অনুগামীর দল ছুটে আসতে হবে ও কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং সমস্যাকে সাপ্‌টে ধরে আয়ত্তে রাখতে হবে। তবেই না উন্নয়নগতি বেগবান হয়ে উঠবে। নিজস্ব পরিবেশে খুঁটি গেড়ে স্বদেশের বীজে সঞ্জীবিত হয়ে যে উন্নয়নধারা অঙ্কুরিত হয়, তাহাই পরিণামে ফুল-ফল-পল্লবে কুসুমিত হয়ে দিগ-দিগন্তে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে। বিদেশী মাটিতে শিকড় গেড়ে উন্নয়ন প্রবাহ বাত্যাতাড়িত না হয়ে পারে না। তার জীবন স্বল্পকালীন ও কৃত্রিম হতে বাধ্য।

বিদেশী পুঁজিতে উন্নয়ন করতে যাওয়ার অপর প্রধান দুর্বলতা এই যে, বিদেশী পুঁজিপতি আসে দু'হাতে মজা লুটতে। তার দৃষ্টি দেশীয় সম্পদ কাজে লাগাতে সীমাবদ্ধ। দেশের মঙ্গল কি দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলাব দায়িত্ব তার নয়। তেমন তার ইচ্ছাও নয়। সে তার পুঁজি খাটিয়েছে মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত। এটুকু পেলেই সে খুশী এবং এটুকু পাওয়ার সহজ ও নিরাপদ উপায় প্রাকৃতিক সম্পদগুলো লুটেপুটে কাজে লাগানো। দেশের মানুষের মঙ্গলে তার কি আসে-যায়। উড়ন্ত পাখী সে। দু'দিন পরে মজা লুটে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। সুতরাং তার কাছে দেশের আপামর জনসাধারণ বড় কথা নয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে উন্নয়ন ধারা ও প্রতিষ্ঠানগুলো স্বদেশজাত হওয়ার যুক্তি আরও তীব্রতর বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ কেবল স্বদেশজাত প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণ্যে মঙ্গল বিলিয়ে দিতে পারে। বিদেশী কেউ নয় এবং এই খাতিরে সহসা চমৎকার ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন সব-শিল্প-সংস্থাও গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়, যদি দূর ভবিষ্যতে তা দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলে সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। কারণ প্রয়োজন অক্ষুণ্ন, অবাধ ও দীর্ঘকালীন বিবেচনায় স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। 'নয় দিবসের হুলুস্থূলে' প্রয়োজন নেই, স্বল্পস্থায়ী চমকানো ফল দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরিপন্থি হলে তা বাধ দিতে হবে। উচ্ছ্বাস ও ভাব-প্রবণতা ছাড়তে হবে। নিকষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের মাটিতে উন্নয়ন ভিত গাঁথতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। তবেই 'উন্নয়ন-দ্বীপ' সর্বব্যাপী হয়ে উঠতে পারবে। তা না হলে এক শাখায় উন্নয়ন ঘটেত দশ শাখা পেছনে হঠতে থাকবে এবং উন্নয়ন-জনিত যে অনুকূল স্রোত তা প্রতিকূলে বইতে শুরু করবে।

২. বাজার পুর্ণাঙ্গতা

বাজার অপূর্ণাঙ্গতা সারিয়ে তোলা প্রয়োজন। বাজার অপূর্ণাঙ্গতা উৎপাদন-পদ্ধতিতে তছ্‌নছ্‌ সৃষ্টি করে দেয়। উপাদান চলাচল সীমিত করে দেয়, ফলে অধিক ফলনশীল শিল্প অধিক উপাদান পায় না। বাজার বিস্তৃতিও উন্নয়ন-গতি ব্যাহত হয়। উন্নত শাখার প্রভাব অনুন্নত শাখায় সহজে অন্তরিত হতে পারে না।

বাজার অসম্পূর্ণতা সারিয়ে তোলার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্প সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।[১] বিদ্যমান সম্পদ ও জ্ঞানের বহর সর্বোত্তমভাবে কাজে খাটাবার পথ বেছে নিতে হবে। বাজার সম্প্রসারণে অন্তরায়গুলো কাটিয়ে তুলতে হবে। উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে যে সব অপূর্ণ প্রতিযোগিতা স্পৃহা বিদ্যমান সেগুলো দমিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মূলধনী বাজারে সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। ঋণদান সংস্থাগুলো জোরদার করতে হবে এবং ঋণপ্রদান পদ্ধতি সহজ করে নিতে হবে। সাধারণ চাষী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও অন্যান্যের জন্য ঋণের পথ অবারিত করে তুলতে হবে।

বাজার-পদ্ধতি সুস্থ করে তোলা উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে একটা সোপান মাত্র।[২] এতে করে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার সম্পদ বিতরণ সুসম হওয়ার পথ প্রশস্ততর হয়। আসল সমস্যা অবশ্য আরও ঘোরালো। বিদ্যমান সম্পদে কেবল আদর্শ বণ্টন পন্থা অর্জন করেই সমস্যার সমাধান দেয়া যায় না। তার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সম্পদ-ব্যবহারে নব নব উন্মেষণী বুদ্ধি প্রয়োগ করা ও সাংগঠনিক পরিবর্তন

---

১. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Economic Organization) নিয়ে T. W. Schultz তাঁর Economic Organization of Agriculture নামক পুস্তকে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

২. Sol Tax তাঁর Penny Capitalism : A Guatemalan Indian Economy, (U.S. Govt. Printing Office, 1953) নামক গ্রন্থে এর একটা সুন্দর উপমা উপস্থাপন করেছেন। তিনি গুয়েতেমালার একটা গ্রামের অর্থনীতি বর্ণনায় বলেছেন, "শক্তপোক্ত বিপণীকরণ অর্থনীতি (Market economy) বিদ্যমান .... তা বেশ প্রতিযোগিতামূলকও বটে।" কিন্তু তবু তা অচল ভাবাপন্ন এবং উন্নয়ন-মাত্রা বেশ নিম্ন পর্যায়ে। পুরোপুরি সম্পদ আহরণ ও দক্ষভাবে তা কাজে লাগানো অক্ষুণ্ন উন্নয়ন পর্যায় অর্জনে যথেষ্ট নয়।

সাধন করা। অর্থাৎ কিনা উৎপাদন-সীমান্ত (Production frontier) বিস্তৃত করা। নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রান্ত বিরাজ করলে চলবে না। অনবরত তা সম্প্রসারিত করে যেতে হবে। এই সম্পর্কে Schultz বলেন, "দরিদ্র দেশে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারে ফাঁক-ঝোক ও ঢিলেমী রয়েছে বটে; কিন্তু কেবল তা সারিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার ও বেগবান করতে তাদেরকে প্রচেষ্টা ও মূলধন খাটিয়ে তিনটি জিনিস হাসিল করতে হবে: পুনরোৎপাদনযোগ্য দ্রব্যের (reproducible goods) উৎপাদন বাড়াতে হবে; দেশবাসীর উৎপাদন-ক্ষমতা উন্নত করতে হবে এবং উৎপাদন-পদ্ধতি (Productive arts) উচ্চতর করতে হবে।"[৩]

উন্নয়ন সম্পর্কে নব্য-ক্লাসিক্যালদের মতবাদ দরিদ্র দেশে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাঁদের মতে প্রান্তিক সংশোধন ও সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে উৎপাদন মাত্রা ও পরিণামে উন্নয়ন পর্যায় বেশ উপরে তোলা যায়। বিদ্যমান সম্পদ যথাযোগ্য কাজে খাটিয়ে দেয় উৎপাদন-সীমান্তের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করা যায়। এই মতবাদ দরিদ্র দেশের বেলায় তেমন উপকারী বলে মনে হয় না। কেননা, এই সকল দেশে বড় ধরনের ওলট-পালট করে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সামান্য নড়চড় ঘটিয়ে আশানুপাতিক ফল লাভের সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য। কারণ ফোড়া যে অনেক বড়। তার জন্য চাই নাপিতের খসখসে অথচ ধারালো ছুরি। সূক্ষ্ম হাতে টুনটুনে আওয়াজে তা সারবে না। উৎপাদন-সীমান্ত বিস্তৃত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন উৎপাদন সামগ্রী বাড়ানো, উৎপাদন-পদ্ধতি আধুনিক করে তোলা ও প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক বিদ্যায় উন্নতি সাধন। নব নব দ্রব্যের উৎপাদন ঘটাতে হবে। রেললাইন বসাতে হবে। করতে হবে আরও হাজারো রকম বড় বড় কাজ। তবেই জটবাধা গিট খোলা সম্ভব হবে। উৎপাদন-নক্সা পরিবর্তিত হবে। প্রান্তিক সমাধান দিয়ে তা অর্জন সম্ভব নয়। তজ্জন্য চাই সার্বিক পরিস্থিতির মোটারকম পরিশোধন, পরিমার্জন ও পরিযোজন।

বাজার অপূর্ণাঙ্গতা দূরীভূত হলে অবশ্য উৎপাদন-প্রান্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। তেমনি অর্থনীতিও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের

৩. দেখুন যথা: L. D. White সম্পাদিত The State of Social Sciences, University of Chicago Press, Chicago, 1956-এ প্রকাশিত T.W. Schultz প্রণীত প্রবন্ধ "The Role of Government in Promoting Economic Growth", পৃষ্ঠা-৩৭২।

ধারাপর্যায়ে চলমান চিত্র সামনে নিয়ে ভাবা যায় যে, দেয় সম্পদ ও তার ব্যবহার এবং উভয়ের পরিবর্তন পরস্পর পরিপূরক সম্বন্ধযুক্ত। একের কথা বাদ দিয়ে অপরকে বিবেচনা করা যায় না। সুতরাং সম্পদ বিতরণ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তার সরবরাহের কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। বিদ্যমান সম্পদের উৎপাদন-প্রান্ত বাড়াতে চেষ্টিত হলে তাদের সরবরাহের পুরোপুরি বিবেচনা ও স্বাভাবিকভাবে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তেমনি তাদের বিকল্প ব্যবহারের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হয়।

মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করার জন্য বাজার-পূর্ণাঙ্গতা অর্জন একান্ত আবশ্যকীয়। তেমনি অর্থনীতির এক শাখায় লব্ধ উন্নতির ফলাফল চলকাইয়া (spill-over) অন্য শাখায় বিধৃত হওয়ার জন্যও বাজার অপূর্ণাঙ্গতা সারিয়ে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে অনমনীয়তা ও ঋজুবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে তোলা দরকার। দরিদ্র দেশের অর্থনীতির ঘাটে ঘাটে নানারকম জট ছড়িয়ে আছে। এগুলো সারিয়ে তোলা যেমনি আয়াসলব্ধ তেমনি লাভজনকও বটে। এগুলো তিরোহিত হয়ে গেলে বৈদেশিক বাণিজ্য শাখার সুফলটা বেশ ফলতে শুরু করতে পারে। শুধু চুইয়ে চুইয়ে নয়, এই শাখায় বিদ্যমান উন্নত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রণালী বেশ জোরেসোরে অন্যান্য শাখায় অন্তরীত হতে পারে। তাছাড়া এই শাখায় প্রাপ্ত অস্বাভাবিক মুনাফা অন্যান্য শাখায় বিধৃত হয়ে সাকুল্য ফলাফল সর্বোচ্চ করে তুলতে সাহায্য করতে পারে। বাজার-অসুস্থতা কেটে গেলে বিনিয়োগ পরিবেশ সবল হয়ে উঠে। অধিক লাভজনক শাখায় সঞ্চয় তার পথ খুঁজে নিতে পারে। পূর্বের ন্যায় অল্প লাভজনক শাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে না। উন্নয়ন মানে ক্রিয়া-কর্ম ও বাজার সম্প্রসারণ। সুতরাং বাজার সম্প্রসারণে কৃত্রিম বাধা অবশ্যই উন্নয়ন পথে অন্তবায়স্বরূপ। তা কার্যকরী চাহিদার অনুপস্থিতি অপেক্ষা কম শক্তিশালী নয়। বাজার প্রথা যত সুষ্ঠু হবে, সম্পদ বিতরণ তত সুগম হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা ও জ্ঞান তত সহজভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দুষ্ট চক্রগুলোকে ঘায়েল করতে সহায়তা করবে।

৩. মূলধন গঠন (Capital Accumulation)

উন্নয়ন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সবায় একমত যে আসল সমস্যা মূলধন সংগঠন নিয়ে। প্রকৃত মূলধন পর্যাপ্ত না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূলধন গঠন বলতে পরস্পর নির্ভরশীল তিনটি বিষয় বোঝায়। তারা হচ্ছে (১)প্রকৃত সঞ্চয় পরিমাণ

বাড়ানো যাতে কিছুটা সম্পদ ভোগে না লেগে উন্নয়ন কাজে লাগতে পারে; (২) অর্থ ও ঋণ সংস্থা—বিনিয়োগকারী যাতে সহজে অর্থ সাহায্য ও ঋণ পেতে পারে এবং (৩) বিনিয়োগ কার্যক্রিয়া—যার ফলে মূলধনী সম্পদ উৎপাদন সহজ হয়।

অবশ্য কেবল আর্থিক সংস্থা গঠন করে এবং মুদ্রা পরিমাণ বাড়িয়ে মূলধন গঠন সম্ভব নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন বেশ শক্তপোক্ত আর্থিক কাঠামো (financial structure) যাতে করে মূলধন সঞ্চালন ও বণ্টন সহজ হতে পারে এবং যার ফলে সঞ্চয় যথাযথ স্থানে বিনিয়োজিত হতে পারে। এটা অবশ্য বুঝতে হবে যে মূলধন কাজে খাটাবার উপযোগী পথ বিদ্যমান থাকলেই মূলধন সংগঠন নিশ্চিত হবে না।[৪] তেমনি কেবল মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থা সুগম করে নিলেও চলবে না। আসল প্রয়োজন প্রকৃত সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলা, মুদ্রা সরবরাহ প্রয়োজনাধিক করে তুললে তা হয়ত মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দিয়ে বসবে।

মূল কথা হচ্ছে উন্নয়ন ব্যয় সম্পদের বাস্তব বা প্রকৃত দামে হিসাব করতে হবে। মুদ্রামানে যাচাই করলে চলবে না। সম্পদের বাস্তব বা প্রকৃত দাম মানে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি পরিমাণ সম্পদ কাজে খাটাতে হবে, এই সম্পদ দেশী কিংবা বিদেশী হতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় উৎপাদন উপাদান, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই সম্পদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালে আরো বহু রকম প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। এগুলো উৎপাদন করাও বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মূলধন সংগঠন মানে মুদ্রা চাহিদা বাড়ানো নয়। তার অর্থ প্রকৃত উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা। সহজাত দুর্বলতা ও প্রযুক্তিক বিদ্যার অভাব মুদ্রা-সরবরাহ বাড়িয়ে কাটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন সত্যিকার মূলধন সংগঠন এবং সম্ভব কেবল সঞ্চয় বাড়িয়ে ও উৎপাদন বিনিয়োগে বর্ধন ঘটিয়ে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে হিমশিম খাওয়া দরিদ্র দেশগুলো যেটুকু সঞ্চয়

---

৪. বেগবান উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কি জাতীয় আর্থিক কাঠামো প্রয়োজন তা সঠিক করে বলা মুশকিল। বরং এক আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আর্থিক কাঠামোর সাথে উন্নয়ন পর্যায়ের তেমন কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। অন্তত: পশ্চিম পুঁজিবাদী দেশগুলোতে গত একশত বৎসরে এমন কোন সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়নি। সেই সব দেশের উন্নয়ন মাত্রায় বিভেদের জন্য আর্থিক কাঠামো দায়ী—এমন কথা বলা সম্ভব নয়। দেখুন R. W. Goldsmith প্রণীত A Study of Savings in the United States, Princeton, 1955, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫—১১৭।

ঘটিয়ে চলেছে তা দিয়ে কেবল মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ হয়ত নির্দিষ্ট সীমায় রাখা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু তা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এই পরিমাণ যদি বাড়াতে হয়, তাহলে সঞ্চয় যেমন যথেষ্ট বাড়াতে হবে তেমনি মূলধন সংগঠনের অন্যান্য শাখাও ক্রিয়াশীল করে তুলতে হবে। তা না হলে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ সম্ভব হবে না; শিল্পোন্নয়ন পরিবেশ যথাযথ করে তোলা যাবে না এবং শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা যাবে না।

দরিদ্র দেশের উন্নয়নে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়ের উপায় মোটামুটি এইরূপ: প্রথমে জনসংখ্যার বর্ধন হার ঠিক করে নিতে হবে। অতঃপর আকাঙ্ক্ষিত মাথাপিছু বর্ধন হার স্থির করতে হবে। সর্বশেষে প্রান্তিক মূলধন উৎপাদন অনুপাত (merginal capital output ratio) অর্থাৎ কিনা, বিনিয়োগ ও তজ্জনিত কারণে উৎপাদন বর্ধন অনুপাত হিসাব কষে নিতে হবে।

মাথাপিছু আয় এক ভাগ বাড়াতে কতটুকু সঞ্চয় প্রয়োজন এ-নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। লোকসংখ্যা এক ভাগ বেড়ে গেলে কতটুকু সঞ্চয় দিয়ে পুরানো আয়সীমা বজায় রাখা যায় তা নিয়েও যথেষ্ট মতদ্বৈত বিদ্যমান। কেউ বলেন জাতীয় আয়ের ২ ভাগ প্রয়োজন। কারো মতে তা ৫ ভাগ। আবার অনেকে এই দুই সীমার মাঝামাঝি একটা সংখ্যার নির্দেশ দেন। ধরা যাক, এক ভাগ লোক-সংখ্যা বর্ধনের জন্য ৪ ভাগ জাতীয় আয় সঞ্চয় প্রয়োজন। আরও মনে করুন লোকসংখ্যা বর্ধন হার শতকরা ২ ভাগ (অধিকাংশ দরিদ্র দেশের জন্য নিখাদ সত্য)। সুতরাং, এই হিসাবে কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় ধ্রুব সীমায় রাখার জন্য জাতীয় আয়ের ৮ ভাগ সঞ্চয় একান্ত প্রয়োজনীয়। এবারে ধরা যাক লোকসংখ্যা বাড়ছে না, কিন্তু দেশ জাতীয় আয় দুই শতাংশ করে বাড়াতে ইচ্ছুক। তার জন্যও ৮ ভাগ সঞ্চয় প্রয়োজন। যদি লোকসংখ্যা ২ ভাগ করে বাড়ে এবং দেশ ২ শতাংশ উন্নয়ন কামনা করে তাহলে জাতীয় আয়ের ১৬ শতাংশ বিনিয়োগক্ষেত্রে অন্তরিত হওয়া প্রয়োজন।[৫] এবারে বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেননা, অধিকাংশ দরিদ্র দেশ জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। অথচ তাদের সঞ্চয় পরিমাণ অনেক নিম্নে, গড়ে মাত্র ৫ ভাগ।

মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে হিসাব উপরে প্রদত্ত হল, স্বাভাবিকভাবেই তা মোটা হিসাব। বিদ্যমান উপাত্ত (data) তেমন কিছু নেই।

---

৫. মূলধন প্রয়োজনীয়তার এই হিসাবটি হেরড্-ডোমার হিসাবের বিকল্পস্বরূপ। পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নে বর্তমান নিকাশটি অধিকতর প্রাসংগিক।

অতীত অভিজ্ঞতাও আলো বিচ্ছুরণে অপারগ। ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপজ্জনক। পূর্বাভাস দেয়াও সহজ নয়। কেননা, প্রান্তিক মূলধন উৎপাদন অনুপাত জানা নেই। তেমনি প্রচ্ছন্ন বা লুক্কায়িত বেকারীর হিসাব-নিকাশ অনুপস্থিত। অকৃষি কাজে নিযুক্ত শ্রমের কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তা জানা সম্ভব নয়। তদুপরি, উৎপাদিকা ও আঙ্গিকগত পরিসর কি দাঁড়াবে-তাইবা কে জানে !

প্রান্তিক মূলধন-উৎপাদন অনুপাত হিসেব করার চেষ্টা-চরিত্র করা হয়েছে বটে। কিন্তু, তা পথ-প্রদর্শক না হয়ে বরং অবস্থা আরও ঘোর-প্যাচালো করে তোলার মত পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। কারো কারো মতে এই অনুপাত বেশ উঁচু। তাঁদের যুক্তি এই যে, দরিদ্র দেশে প্রচুর মূলধন অপচয় ঘটে: প্রযুক্তিক বিদ্যা শম্বুক গতিতে অগ্রসর হয়। উন্নয়ন পরিবেশ অনুকূল করার জন্য প্রচুর মূলধন ব্যয় করা প্রয়োজন ; গোড়ার দিকে বেশ কিছুটা বিনিয়োগ অপচয় হতে বাধ্য ; প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত নয় বলে মূলধন বেশী খাটানো দরকার। তাছাড়া, উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শিল্পায়ন পুঁজি ভিত্তিক হয়ে উঠতে বাধ্য। সুতরাং, এই সকল কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রান্তিক মূলধন উৎপাদন অনুপাত উঁচু হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যপক্ষের মত কিন্তু ভিন্নরূপ। তাঁরা বলছেন, না উক্ত অনুপাত উঁচু না হয়ে বরং নীচু হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক। এই হিসাবকারীদের মত এই যে, মূলধন বিনিয়োগ ঘটার ফলে নব নব সম্পদ আবিষ্কৃত হবে। ফলে উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে যাবে। এই সকল দেশে উন্নয়ন ধারা এমন যে শ্রম-ভিত্তিক শিল্পগুলোই বরং উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। যেমন কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প। অল্প মূলধন প্রয়োজনীয় পন্থা প্রবর্তন সহজ হবে। এদ্দিন পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি এমন সব সম্পদ পূর্ণ কাজে খাটানো সম্ভব হবে। উন্নয়ন-অন্তরায় বিনিয়োগের সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেতে থাকবে। তাছাড়া, মূলধন বিনিয়োগের ফলে শ্রম-উৎপাদন বিশেষভাবে বেড়ে যেতে পারে। কাজেকাজেই, মূলধন-উৎপাদন অনুপাত নিম্ন না হওয়ার কোন কারণ নেই।

এবারে সংখ্যাভিত্তিক হিসাব দেয়া যাক। বেশ অনেকগুলো হিসাব-নিকাশ ইতিমধ্যে বেরিয়েছে। জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত একদল বিশারদের মতে এই অনুপাত ২ : ১ থেকে ৫ : ১ সীমায় বিচরণ করে। বিশ্বব্যাঙ্কের দুইটি রিপোর্টে (সিংহল ও সুরিনাম-এর উপর) তা ৩·৫—৪·০ : ১ হতে দেখা

যায়। ভারতীয় প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় তা ৩ : ১ ধরা হয়েছে। **Kurihara**-এর মতে তা ৫ : ১। সিঙ্গার তাঁর আলোচনায় অকৃষিজাত শাখায় ৬ : ১ এবং কৃষি শাখায় ৪ : ১ ধরেছেন। Rosentein-Rodan-এর মতে এই অনুপাত ৩ : ১ অথবা ৪ : ১।[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত নিয়ে নানা মুনীর নানা মত। একের সাথে অন্যের মিলের চেয়ে অমিল বেশী। কাজেকাজেই এগুলো সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কথা থেকে যায়। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত হলেও একটা কথা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বাড়াতে হলে মূলধন সংগঠন যথোপযুক্ত হতে হবে। বর্তমানে যেটুকু হচ্ছে তা দিয়ে কাজ চলবে না। তার চেয়ে আরও অধিক সঞ্চয় করতে হবে। তবেই উন্নয়ন-অগ্রগতির বিষয় বিবেচনা করা যাবে। তার আগে নয়। অনুন্নত দেশগুলোতে আপাততঃ জাতীয় আয়ের ৫ ভাগের মত সঞ্চয় ঘটে চলেছে। এই পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ থেকে ১৫ ভাগে উন্নীত করতে হবে।[৭] তবেই শিল্পায়ন সম্ভব হবে এবং পরিণামে উন্নয়ন-অগ্রগতি হাসিল করা সহজ হবে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে কিভাবে তা সম্ভব করে তোলা যেতে পারে? বহু রকম সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, দেশীয় ভোগের পরিমাণ কমিয়ে তা পাওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য হাসিলে নানা রকম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন করের বোঝা বাড়িয়ে, বিদ্যমান করের হার বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। তেমনি নূতন নূতন কর বসানো যেতে পারে। এতে ভোগের পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য। সুতরাং, সঞ্চয় বেড়ে যাবে নিশ্চিতভাবে। কিন্তু এতে বেশ বড়সড় একটা বিপদ রয়েছে। সরকারী

---

৬. দেখুন, জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Measures for the Economic Development of Underdeveloped Areas, New York, 1951, পৃ: ৪৭; Kurihara প্রণীত "Growth Analysis and the Problem of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries"; Singer লিখিত Mechanics of Economic Development : A Quantitative Model Approach (Indian Economic Review, I, No 2, 1952, August); Rosentein Rodan প্রণীত "Capital needs in underdeveloped countries."

৭. আলোচনা করুন, W.A. Lewis প্রণীত Theory of Economic Growth, London, 1955, পৃ: ২০৮, ২২৬। W.W. Rostow লিখিত The "Take-off into Self-Sustained Growth" ও দেখতে পারেন।

আইন দিয়ে জোর করে সঞ্চয় বাড়ানোর ফল হিসাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয়ের হার কমে যেতে পারে। কারণ ভোগমাত্রা পূর্ব পর্যায়ে রাখার জন্য মানুষ স্বাভাবিকভাবে চেষ্টিত হয়। কাজেই, পরিণামে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং' হতে পারে।

কর বাড়াবার আরও বিপদ আছে। কর্মস্পৃহাকে তা ব্যাহত করতে পারে। শ্রমিক করের বোঝা বইতে যেয়ে কঠোর পরিশ্রম বাদ দিয়ে বসতে পারে। মহাজন ও পুঁজিপতি নব নব বিনিয়োগে ইস্তফা দিয়ে হাত গুটিয়ে বসতে পারে। চাষী করের ভয়ে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণে বেঁকে বসতে পারে। সুতরাং, কর বর্ধন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। কাজেই, এমন কর পদ্ধতি বেছে নিতে হবে যা দুধ দেবে প্রচুর অথচ গাই ও বাছুরকেও তাজা রাখবে; তা হতে হবে দরিদ্র দেশের ক্ষমতামাফিক। আবার উন্নয়ন ব্যয় উৎসারিত মুদ্রাস্ফীতি প্রবণতার প্রতিরোধক। অপরদিকে ন্যায়-নীতিকেও তেমন অবজ্ঞা করবে না।

দ্বিতীয় পন্থাটি কর-পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে অথবা তার সম্পূরক হিসাবে কার্যসিদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। সরকার জনসাধারণের জন্য সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করতে পারে। তজ্জন্য সে সরকারকে ঋণ দেয়ার বাধ্যতামূলক নীতি প্রবর্তন করতে পারে। দেশে পয়সাওয়ালা লোকের সংখ্যা বেশী থাকলে সরকার তাদের কাছে ঋণপত্র বিক্রি করে সঞ্চয় বাড়াতে পারে। এই পন্থা গ্রহণ করতে হলে নজর রাখতে হবে যেন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধক বিষয়াবলী কার্যকরী থাকে। কেননা, জমানো টাকায় সরকারী ঋণপত্র কিনা হলে তা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে না। সুতরাং, সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। তাহলে ভোগের মাত্রা কমিয়েও জনসাধারণ ঋণপত্র কিনতে উৎসাহিত হবে।

মূলধন সংগঠনের তৃতীয় উপায় হিসাবে আমদানী দ্রব্য ভক্ষণ পরিমাণ সীমিত করার কথা উল্লেখ করা যায়। তা করা সম্ভব হলে সঞ্চয় যেমন বাড়তে পারে তেমনি উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনী-দ্রব্যও আমদানী করা যেতে পারে। এখানেও খেয়াল রাখতে হবে যেন আমদানী দ্রব্য কমিয়ে দেওয়ার ফল হিসাবে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হ্রাস না পায়।

মূলধন সংগঠনের চতুর্থ পথ হিসাবে (Schumpeter) বর্ণিত উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি পন্থা অবলম্বন করেও মূলধনে বর্ধন ঘটানো যেতে পারে। এই পন্থা জোর করে সঞ্চয় বাড়াবার মত

একটা উপায় সমাজের কতকগুলো গোষ্ঠীর জন্য জিনিস-পত্তরের দাম অধিক হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ কিনা যেই হারে তাদের আয় বর্ধিত হয় তদপেক্ষা অধিক হারে দাম চড়িয়ে দিতে হবে। ফলে তাদের ভক্ষণ পরিমাণ কমে যাবে। অবশ্য এতে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা দরিদ্র-দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রবণতা এমনিতেই বেশ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। যদি একটু হাতছাড়া পায় তাহলে তা বেশ জাঁকিয়ে বসতে পারে। তাতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। মুদ্রা বাজারে তছনছ ঘটে যেতে পারে। ফটকাবাজারী মাথা উঁচিয়ে উঠতে পারে এবং বাণিজ্যিক ভার-সাম্যে দোদুল্যমান অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।[৮]

পঞ্চমত মূলধন সংগঠন ক্ষেত্রে লুক্কায়িত বা প্রচ্ছন্ন বেকারী সমস্যাটি সাহায্য প্রদান করতে পারে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়া সম্ভব হলে তা মূলধন বর্ধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সাধারণতঃ কৃষি ও যানবাহন-জনিত শিল্পে এই জাতীয় বেকারী বিদ্যমান। কৃষির উৎপাদনে হ্রাস না ঘটিয়ে কৃষি থেকে 'উদ্বৃত্ত' শ্রমিক উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে। তাদেরকে অন্যত্র কাজে খাটানো যেতে পারে। উদ্দেশ্য হবে এই সব ফালতু শ্রমিক থেকে কাজ আদায় করা। তাদেরকে রাস্তার কাজে, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজে কি অন্যান্য গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এই সকল কাজে মূলধন বেশী লাগে না। অথচ তারা মূলধন সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে এই সকল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তি শূন্যের ঊর্ধ্বে হবে বলে উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার ও বেগবান হতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় এদেরকে বাছাই করবে কে? আর খাওয়াবেই বা কে? এদ্দিন উৎপাদনশীল চাষীরা তাদের খাওয়া যোগান দিয়ে আসছিল। এখন তারা দেবে কিনা? হ্যাঁ দিতে হবে। পুরানো পন্থা চালিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে গড় উৎপাদন বেড়ে যাবে, কিন্তু উৎপাদনশীল শ্রমের ভোগমাত্রা পূর্ব পর্যায়ে রাখতে হবে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত খাবার উঠিয়ে নিয়ে শ্রমিককে দিতে হবে। এই করা সম্ভব হলে বিনিয়োগ বেড়ে যেতে পারে অথচ কোন খরচ করতে হবে না।

লুক্কায়িত বেকারী দূর করা মানে সম্পদ বিতরণ সুষম করে তোলা মাত্র। এর অধিক কিছু নয়। অর্থাৎ উৎপাদন-প্রান্ত বর্ধিত করে দেওয়া। কথাটা শুনতে যত সহজ মনে হল, করা কিন্তু মোটেই সহজ

৮. পঞ্চম ভাগে এই সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নয়। উৎপাদনশীল শ্রমিক স্বাভাবিকভাবে অধিক ভোগ করতে চাইবে। গরীব মানুষ এরা। কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে। একটু আয় বেড়ে গেলে স্বভাবতঃ একটু হাত খুলে চলতে চাইবে। অন্যদিকে, কৃষিক্ষেত্র থেকে কাউকে উঠিয়ে আনাও সহজ হবে না। এটা তাদের পরিচিত জগত। বাপ-দাদার চারণভূমি। অতসব বড় বড় হিসাব তারা বোঝে না। প্রান্তিক আয় গড় হিসাব নিয়ে কাজ করে না। দু'মুঠো মোটা ভাত হলেই জীবন চলে যায়। এই অবস্থায় তাদেরকে খামার ছেড়ে আসতে রাজী করাতে যথেষ্ট মোহ প্রদান করতে হবে। তা না হলে নৈবচ নৈবচ। কাস্তে আর লাঙ্গল তাদের হাতিয়ার। এর বাইরে কিছু জানা নেই। নূতন কাজে লাগাতে হলে তাদেরকে তা শিখাতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি প্রদান করতে হবে। থাকার জায়গা দিতে হবে। আনুসঙ্গিক আরও কিছু খরচ করতে হবে। এগুলো করা কি সহজ? সুতরাং, ব্যাপারটা কাজে লাগানো বেশ কষ্টকর প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

মূলধন গঠনের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে ঋণ নেয়া যেতে পারে। সুতরাং, বিনিয়োগ বর্ধনের ষষ্ঠ উপায় হিসাবে বিদেশী ঋণের কথা বলা যায়। সরাসরি আমদানী করে তা পাওয়া যেতে পারে। তেমনি আমদানীযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে অথবা রপ্তানির মাধ্যমে তা অর্জন করা যেতে পারে।

এবারে সর্বশেষ পন্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মূলধন সংগঠনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা বেশ সহায়তা করতে পারে। আয় বাণিজ্য-শর্তে (Income Terms of Trade) উন্নতি ঘটিয়ে তা হাসিল করা যেতে পারে। মনে করুন রপ্তানি মূল্য বেড়ে গেল, রপ্তানি থেকে পাওয়া আয়ের পরিমাণ বেড়ে গেল। কাজেই, আমদানী করার ক্ষমতা বেড়ে যেতে বাধ্য। এই বর্ধিত ক্ষমতা সৌখিন আমদানীতে ব্যয় করা যাবে না। তেমনি দেশীয় দ্রব্যের ভক্ষণ বাড়িয়ে তা নষ্ট করা যাবে না। এই বর্ধিত আমদানী ক্ষমতা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে লাগাতে হবে। তাহলে মূলধন সংগঠন জোরদার হবে।

অবশ্য এইটুকু স্মরণে রাখতে হবে যে মূলধন সংগঠনই সমস্যার সমাধান নয়। মূলধন গঠন যেমন বাড়াতে হবে তেমনি তা কাজে খাটাবার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হবে। তেমনি প্রযুক্তিক ও সংস্থাগত ব্যবস্থাও যথাযথ করে তুলতে হবে। ব্রিটিশ

যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সঞ্চয় পরিমাণ ও উন্নয়ন মাত্রা সমতালে চলেনি।[১] তার কারণও রয়েছে বটে। বর্ধন হার দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: প্রতি ইউনিট উৎপাদনে কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন (অর্থাৎ মূলধন-উৎপাদন অনুপাত) এবং মোট মূলধন কতটুকু দরকার। সুতরাং, মূলধন সংগঠন যেমন অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি নিম্ন মানের অনুপাতও একান্ত বাঞ্ছনীয়; আর নিম্ন অনুপাত পেতে হলে প্রযুক্তিক ও সংস্থাগত উন্নয়ন ও সাঙ্গীকরণ দরকার। তাহলে কেবল মূলধন অধিক ফলনশীল হয়ে উঠতে পারে।

৪. বিনিয়োগ নির্ণায়ক (Investment Criteria)

দেশের সার্বিক উন্নয়নে হাজারো রকম শিল্প-সংস্থা গড়ে তুলতে হয়। এক সাথে সর্বত্র বিনিয়োগ ঘটানো সম্ভব নয়, স্বাভাবিক কারণে। কাজেই বাছাই-নীতি ধরে এগুতে হয়। প্রথমে কতকগুলো শিল্পক্ষেত্রে বেশ জোর দিতে হয়। এগুলো উন্নত হয়ে গেলে প্রাধান্য অনুসারে পরবর্তীগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এভাবে উন্নয়ন পথে এগিয়ে যেতে হয়।

এই পর্যন্ত যা বলা হল তা থেকে বোঝা উচিত যে বিনিয়োগ কাজটা তেমন সোজা নয়। নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী বিনিয়োগকৃত সম্পদ অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ছড়িয়ে দেয়ায় প্রাধান্য ঠিক করে নিতে হবে। অগ্রাধিকার বাছাই করতে হবে এমনকি প্রত্যেকটি শাখাতেও কোথায় কতটুকু বিনিয়োগ ঘটাতে হবে তা যাচাই করে স্থির করে নিতে হবে। সোজা কথায় বিনিয়োগ নির্ণায়ক স্থির করে নিতে হবে। বিনিয়োগ মাপকাঠি স্থির করে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। তাহলে কোন্ কোন্ শিল্পে জোর দেয়া প্রয়োজন তা বেছে নেয়া যায়। তেমনি উৎপাদন-আঙ্গিক নির্ণয় করা সহজ হয়। সবচেয়ে বড় কথা বিনিয়োগ কতটুকু অবদান প্রদান করবে তা জানা যায়।

অবশ্য বিনিয়োগ নির্ণায়ক স্থির করাটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। বিচারের মান ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভিন্ন ভিন্ন মান ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়। মোট

---

১. দেখুন যথা উপরে বর্ণিত অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ; W. Felluer প্রণীত "Treuds & Cycles in Economic Activity," Newyork, 1956; A. K. Cairncross প্রণীত "The Place of Capital in Economic Progress," 1955.

উৎপাদন ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। কোন বিশেষ একটা মান হয়ত নির্দিষ্ট সময়ান্তে বেশ সুফল দিতে পারে। অপর একটা মান হয়ত বেশ কতককাল পরে যেয়ে ফলপ্রদ হয়ে উঠে। বিনিয়োগ বণ্টন আরও বহু বিষয়কে প্রভাবিত করে। যেমন তা শ্রম সরবরাহ ও তার বণ্টনকে নির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে। তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনায় নব রূপায়ণ দেয়। মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায় ও বিচার-বুদ্ধিতে তদনুরূপ করে তুলতে উস্কানি দেয়। প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলীক অগ্রগতিকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং, বিনিয়োগ নির্ণায়ক নির্ধারণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, স্থিতাবস্থা[১০] ও গতিশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বিনিয়োগ-নির্ণায়ক নির্ণয়ে গোড়ার কথা উৎপাদনশীলতা (Productivity) খতিয়ে দেখা। সুতরাং, বিচারের মানদণ্ড হিসাবে উৎপাদিকা-শক্তিকে সাধারণ গুণ বলে ধরে নিতে হবে। বিনিয়োগ যে ক্ষেত্রেই হউক না কেন তা অবশ্যই ফলনশীল হতে হবে তবেই না উন্নয়নধারা বেগবান হয়ে উঠবে। অবশ্য কথা দাঁড়ায় মানদণ্ড নির্ণয়ে উৎপাদিকা শক্তি বলতে কি বুঝায় ? দেখা যাক আলোচনা করে।

উৎপাদিকা শক্তি বা উৎপাদনশীলতা বলতে যা বুঝায় তা অবশ্য পরিষ্কার। সেই সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ ঘটাতে হবে যেখানে সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Social marginal productivity) সর্বোচ্চ। এই বক্তব্যের হোতারা আরও তিনটি অনুসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তাদের মতে এই অনুসিদ্ধান্তগুলো মেনে এগুলো অতি সহজে বিনিয়োগ-নির্ণায়ক ঠিক করে নেয়া যায়। এই সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, (১) বিনিয়োগ এমন হতে হবে যেন তা সাম্প্রতিক উৎপাদন ও বিনিয়োগের মধ্যকার অনুপাত সর্বাধিক করতে পারে; (২) এমন সব উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘটাতে হবে যারা শ্রম-বিনিয়োগ অনুপাত সর্বোচ্চ করতে পারে এবং (৩) লগ্নী এমন হতে হবে যেন তা লেন-দেন ভারসাম্যে উপশম হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে, অর্থাৎ রপ্তানি-দ্রব্য-বিনিয়োগ অনুপাত সর্বাধিক হতে হবে।[১১]

---

১০. Galenson ও Leibenstein এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেখুন, যথা W. Galenson ও H. Leibenstein প্রণীত "Investment Criteria, Productivity and Economic Development," Quarterly Journal of Economics, LXIX, No. 3 পৃ: ৩৪৩-৩৪৫ ও ৩৬৩-৩৬৭।

১১. Galenson ও Leibenstein-এর প্রাগুক্ত পুস্তক দেখুন, পৃ: ৩৪৬। A. E. Kahn "Investment Criteria in Development", Quarterly

কথাগুলো শুনে বেশ আশ্বস্থ হওয়া গেল। বুঝি সমস্যার সহজ সমাধান দূরে নয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা যথেষ্ট খটমটে। বিশেষ ক্ষেত্রে এই নীতি মেনে নিয়ে চলা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া উন্নয়ন ক্রিয়া-কর্ম গতিশীল। অনবরত তা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, জনসংখ্যা বাড়ছে। দক্ষতা বাড়ছে। চাওয়া-পাওয়ার মাত্রায় তারতম্য ঘটছে। প্রযুক্তিক বিদ্যা এগিয়ে চলেছে। সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই গতিশীল পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন খাপ খাইয়ে নেয়া আয়াসসাধ্য ব্যাপার বৈকি! অসম্ভব না হলেও বেশ বড় রকমের কঠিন কাজ অবশ্যই।

দেখা যাক তা সাধন করতে যেয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মূল্যবোধ যাচাই করে দেখতে হবে। সামাজিক উদ্দেশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ বিচার করে নিতে হবে। অনেকক্ষেত্রে হয়ত তা পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। মনে করা যাক, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক। কৃষিকাজে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন। কৃষিকাজে আয় বেড়ে গেল। এবারে চিন্তা করুন যে কৃষিশাখায় জনসংখ্যার বর্ধন হার বেশ দ্রুতশীল। তা অধিক আয় বাড়ার পরিণাম হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে লাভ যে পিঁপড়ায় খেয়ে ফেলবে। ভাবা যাক দ্বিতীয় পরিস্থিতি, এইক্ষেত্রে বিনিয়োগ কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা কম লাভজনক। কিন্তু আয় বাড়াব পরিণতি হিসাবে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা তেমন নয়। ফলে, জাতীয় আয় এখানে বেশী না বাড়লেও মাথাপিছু আয় কিন্তু প্রথম পরিস্থিতি অপেক্ষা অনেক বেশী হতে পারে। সুতরাং, প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কোন্‌টা কাম্য—অধিক জাতীয় আয়, না অধিক মাথাপিছু আয়? বিষয়টা ঠিক করে নিতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে আয় বণ্টন ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। একটা প্রকল্পে মাথাপিছু আয় বেশী হতে পারে। কিন্তু তা অসম আয় বণ্টন সমস্যার জন্ম দিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি তেমন নয়। কোন্‌টা গ্রহণ করতে হবে? উত্তরটা মূল্যবোধে নিহিত। যে যেইভাবে চিন্তা করে সে সেইভাবে সমাধান দেবে। নানা মুনীর নানা মত। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। এদিকে আবার সব প্রকল্পের

Journal of Economics, LXV. No. 1. পৃ: সংখ্যা ৩৮-৬১। H. B. Chenery, "The Application of Investment Criteria", (১৯৫৩) প্রাগুক্ত LXVII No. I পৃ: সংখ্যা ৭৬-৯৬।

সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন জানা নেই। আর জানা থাকলেইবা কি? জাতীয় আয় আর মাথাপিছু আয়ের এই বিভেদ সারিয়ে তোলাই যে যথেষ্ট শঙ্কাবহুল।

সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নীতিও সুষ্ঠু নয়। একদিকে, তা অস্পষ্ট অন্যদিকে আবার দ্ব্যর্থকতা দোষে দুষ্ট। কাজেই সিদ্ধান্তের সহায়ক হিসাবে কতটুকু কার্যকরী তা অবশ্যই ভাবার বিষয়। বিশেষ করে, সময়ের দীর্ঘ পরিসরে তা তেমন উপকারী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে না। কেননা, প্রকল্পের শ্রেষ্ঠতা বাছাই করতে হলে মূলধনী সম্পদের ভবিষ্যৎ উৎপাদন (yield) তার বর্তমান উৎপাদন থেকে বাদ দিয়ে নিতে হবে এবং বাদ দেওয়া উৎপাদন বর্তমান ব্যয়ের সাথে তুলনা করতে হবে। আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ আয়ধারা (Income stream) অনুযায়ী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত পৃথক হতে বাধ্য। উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করুন ৫ বৎসরের বিবেচনায় চিনি উৎপাদনে বিনিয়োগ ঘটানো শ্রেয়। এতে জাতীয় উৎপাদন সর্বাধিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু, ১৫ বৎসরের বিবেচনায় তা নয়। ১৫ বৎসরের বিবেচনায় বরং অন্য কোন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটানো শ্রেষ্ঠতর। সুতরাং, সহজ-সরল সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন নীতি গ্রহণ করাও তেমন লাভজনক নয়।

তেমনি মাথাপিছু ভোগমাত্রার কথা ধরা যাক। নির্ণায়ক হিসাবে তাও তেমন সন্তোষজনক নয়। তার মধ্যেও শত বাধা নিহিত। আজকে যে ভোগমাত্রা কাম্য ভবিষ্যতের বিবেচনায় হয়ত তেমন আকাঙ্ক্ষিত নয়। স্বল্পমেয়াদী ভোগমাত্রা বিবেচনায় হয়ত প্রকল্প 'ক' অধিক কাম্য হতে পারে। কিন্তু, দীর্ঘমেয়াদী বিবেচনায় তা নয়। এই বিবেচনায় বরং প্রকল্প 'খ' শ্রেয়। সুতরাং, 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয়?

এই জাতীয় হাজারো প্রশ্ন বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে জড়িত রয়েছে। এ-সবের উত্তর প্রদান সোজা নয়। কাজেই লগ্নীধারা নির্ণয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছা বেশ জটিল কাজ। তজ্জন্য প্রয়োজন প্রথমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষা স্থির করে নেওয়া। অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী বিধিবদ্ধ করে নিয়ে তবে লগ্নীধারা নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা যাক।

বিনিয়োগে প্রথম কথা : তা উৎপাদনশীল হতে হবে। এই উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে বিনিয়োগক্ষেত্র যাচাই করে নিতে হবে। অথচ উৎপাদনশীলতা কথাটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। ইহা একটা প্রত্যয় (concept) মাত্র। তাও আবার মূল্যবোধ-প্রত্যয় (value concept)। টাকা-আনা-পাই এর হিসাবের

উর্ধ্বে। যেমন ধরুন, সামান্য বিনিয়োগ ঘটিয়ে প্রচুর জুতা উৎপাদন করা যায়। সুতরাং, জুতা উৎপাদনে লগ্নী করা উচিত। কিন্তু জুতার তেমন বাজার নেই। সুতরাং, দেশ তার থেকে কি করে লাভবান হতে পারে? কাজেই, অতিরিক্ত বাজার খুঁজে নেওয়া দরকার। 'সরবরাহ আপন চাহিদা সৃষ্টি করে নেবে'—এই কথা ধরে নেওয়ার পেছনে কোন যুক্তি নেই। কাজেই, উপযুক্ত বাজার ছাড়া উৎপাদন ঘটিয়ে কি লাভ?

সুতরাং, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার চাই। দরিদ্র দেশ সেই বাজার পাবে কোথায়? দেশ কেবল ভোগে লাগা জিনিস-পত্তর তৈরী করে। তাও আবার তেমন দক্ষতার সাথে নয়। সুতরাং, এদিক থেকে হয়ত বাজারের কিছুটা বিস্তৃতি ঘটতে পারে। দরিদ্র দেশে ঘরবাড়ী ইত্যাদির চাহিদা বেশ উঁচু। তেমনি নানারকম নির্মাণ কাজের চাহিদাও বেশী। কেননা রাস্তা-ঘাট, রেল লাইন ও অন্যান্য সামাজিক উপযোগিতা (Public utilities) তেমন উন্নত নয়। এদিকেও বাজারের বেশ সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। বিদেশে চাহিদা বিদ্যমান এমন সব রপ্তানি-বাণিজ্য শিল্পে বিনিয়োগ ঘটানো সম্ভব হলে বাজার বিস্তৃতি ঘটতে পারে। তেমনি আমদানী দ্রব্য দেশে উৎপাদন ঘটাতে পারলে বাজার সম্প্রসারণ কিছুটা বাড়তে পারে।

সরবরাহ দিক বিবেচনায়, বিনিয়োগ এমন হতে হবে যেন তা অধিক বাহ্যিক মিতব্যয়িতা (external economics) সৃষ্টি করতে পারে। লগ্নী এমন খাতে পরিচালিত করতে হবে যেন তা উৎপাদন ধারায় উর্দ্ধাহ ও আনুভৌমিক সংহতি (Vertical and horizontal integration of the process of production) সাধন করতে পারে। তেমনি শ্রম বিভাজন সহজ করতে পারে এবং বহু রকম শিল্পে নিয়োগ করা যায় এমন একদল দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। একই সূত্র থেকে কাঁচামাল পেয়ে চলতে পারে এমন সব শিল্পে বিনিয়োগ ঘটালে যথেষ্ট লাভ পাওয়া যেতে পারে। তেমনি সামাজিক স্থায়ী খরচা (Social overhead) পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে এমন সব ক্ষেত্রে লগ্নী অধিক লাভবান হতে বাধ্য। এই সকল শর্ত মেনে লগ্নী ঘটালে বাহ্যিক মিতব্যয়িতা অধিক হতে পারে।[১২] পরিণামে দেশ উন্নতির আদর্শ ধামের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

---

১২. দেখুন, যথা J. H. Adler রচিত "The Fiscal and Monetary Implementation of Development Programs," American Economic Review, Papers and Proceedings, XLII, নম্বর ২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৮৬-৫৮৮ (মে, ১৯৫২)।

'বাজার বিস্তৃতি' ও 'বাহ্যিক মিতব্যয়িতা' নিয়ে যে আলোচনা উপরে করা গেল তা এক কথায় প্রকাশ করে বলা যায় যে, বিনিয়োগ অর্থনীতির "বর্ধমান শাখাসমূহে" (growing points) সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ উন্নয়ন-ক্রিয়া অধিক ফলদায়ক শাখাসমূহে কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সোজা করে বলতে গেলে বলা যায় বিনিয়োগ এমন সব শিল্পক্ষেত্রে সন্নিবেশ করতে হবে যারা অল্প পুঁজিতে অধিক ফল প্রদানে সক্ষম অথচ তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজার বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু, অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে অধিক বাহ্যিক সাহায্য দিতে পারে অর্থাৎ কিনা সম্পূরক ও পরিপূরক চাহিদা ও উৎপাদন সৃষ্টিতে সক্ষম। উপরোক্ত উপায়ে বিনিয়োগ ঘটিয়ে নেয়া সম্ভব হলে একটা অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) জন্ম নেবে যা অতি সহজে সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।[১৩]

বিনিয়োগ ব্যাপারে আরও দুইটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত প্রতিপাদ্য মেনে নিয়ে লগ্নী এমনভাবে ঘটাতে হবে যেন তা বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উৎপাদনশীল নীতি বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ বর্ধমান শাখাসমূহে অবশ্যই বিনিয়োগ ঘটাতে হবে। তবে তা যেন বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি ও উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্রে ওলট-পালট সৃষ্টি না করে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম না দেয়। সাধারণতঃ দরিদ্র দেশ বাণিজ্যিক লেন-দেন সমস্যায় ভোগে লগ্নী যেন এই সমস্যাকে তীব্রতর না করে। বরং তা যেন এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিকে কিছুটা হাল্কা করতে পারে।

বিনিয়োগক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে অর্থনীতি একটা একক ইউনিট বটে। তবে তা বেশ কয়েকটা শাখায় বিভক্ত এবং তারা পরস্পর নির্ভরশীল। একেকে বাদ দিয়ে অন্য চলতে

---

১৩. অধ্যাপক Rostow-ও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি অবশ্য তা 'প্রাথমিক' (Primary) বা 'মুখ্য' (Leading) শাখা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি উন্নয়নমুখী দেশের অর্থনীতিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা "প্রাথমিক শাখা" "অনুপূরক শাখা" (Supplementary Sector) ও "উদ্ভূত শাখা" (Derived Sector) প্রাথমিক শাখা উন্নয়ন পর্বের সূচনা করে। অনুপূরক ও উদ্ভূত শাখা লোকসংখ্যা বর্ধন, জাতীয় আয় সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় দিয়ে প্ররোচিত হয় অর্থাৎ তাদের উন্নয়নে এই সমস্ত বিষয়াবলী উস্কানি যোগায়। দেখুন, Rostow প্রণীত "Trends in the Allocation of Resources in Secular Growth," Center for International Studies, M.I.T. 1953.

পারে না বা বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না। সুতরাং, একটা সার্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নেওয়াও প্রয়োজন বৈকি। অধিকতর ফলনশীল শাখায় মনোনিবেশ করতে হবে। তবে সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্যান্য শাখাও মোটামুটি এগিয়ে এসে অর্থনীতিতে একটা ভারসাম্য উন্নয়ন পরিস্থিতি জন্ম দিতে পারে। এক শাখা অন্য শাখায় প্রভাব বিস্তার করে। একে অপরের উৎপন্ন দ্রব্য কাজে খাটায়। ফলে বাজার বিস্তৃতি ঘটে ও লগ্নী সুযোগ বর্ধিত হয়। পরিণামে বিনিয়োগ-ক্রিয়া একটা তাল-লয় সম্পন্ন হয়ে উঠে যেন ঢেউয়ের দোলা একের পরে ছুটে আসছে।[১৪] তাতে বাজার সম্প্রসারণ আরও অধিক হয়। শিল্প-পরিসর বিস্তৃত হলে বিপদের ঝুঁকি কমে যায়। একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে ক্রিয়া করে বলে মাল বিক্রয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্ভার নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন পড়ে না। কাজে কাজেই, বিনিয়োগ-ক্রেম যত সম্প্রসারিত করা যায় তত লাভ।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ 'ভারসাম্য উন্নয়নে' জোর প্রদান করেছে। এই ভারসাম্য উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে অকৃষিজাত উৎপাদন বর্ধনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোও প্রয়োজন। তা না হলে ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া, শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি-উন্নয়ন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীধর্মী। তারা বরং একে অন্যের পরিপূরক। শিল্পোন্নয়ন হার অনেকাংশে কৃষি উন্নয়ন হারে নির্ভরশীল। শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে অথচ কৃষিক্ষেত্রে বন্ধ্যা অবস্থা বিরাজমান—তা হতে পারে না। তাহলে দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে চাকরি-বাকরি বাড়ছে। শ্রমিক অধিক মাইনে পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে তার খাওয়ার জিনিসের চাহিদা বেড়ে যাবে। কৃষিকে তা যোগান দিতে হবে। এদিকে কৃষি-শ্রমিক একটু বেশী চাইবে। কাজেই উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়াতে হবে।

নাগরিক জীবন গ্রাম্য সরবরাহে নির্ভরশীল। গ্রাম থেকে তাকে কাঁচামাল ইত্যাদি পেতে হবে। শিল্প প্রচেষ্টার শুরুতে শ্রম আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট-খাট টুকি-টাকী জিনিস তৈরী হয়। এই সব দ্রব্যের প্রধান ভোক্তা

---

১৪. আলোচনা করুন R. Nurkse প্রণীত "Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries," Oxford, 1953, P. N. Rozenteir Rodan রচিত "Problems of Industrialization of Eastern and South Eastern Europe", Economic Journal, LIII, No 210-211, (June-Sept. 1943).

কৃষিজীবী। সুতরাং, তার আয় না বাড়লে শিল্পজাত আয় বাড়তে পারে না ; সর্বোপরি, শিল্পের সাথে সাথে কৃষিক্ষেত্রে সাড়া না জাগলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ার ভয় রয়েছে। সুতরাং, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে একটা সমঝোতা সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

তেমনি দেশীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যেও একটা বোঝাপড়া করে নেয়া প্রয়োজন। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বৈদেশিক মুদ্রা একান্ত আবশ্যকীয়। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ার সাথে আমদানী দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। দেশীয় বাণিজ্য বিস্তৃতিতেও যথেষ্ট আমদানী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই অধিক আমদানী ব্যয় বইতে হবে। আবার উন্নয়ন কার্য চালু রাখার জন্য রপ্তানি যথেষ্ট বাড়াতে হবে। দেশীয় বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তরায় হতে গেলে তা সম্ভব নয়। সুতরাং, দেশীয় বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে তাল রেখে সম্প্রসারিত হতে হবে : তাকে ছাড়িয়ে নয় বা তার পথের কাঁটা হয়ে নয়।

অর্থনীতিতে বিরাজমান পরস্পর নির্ভরশীলতার আরও সূক্ষ্ম হিসাব কষে নিতে হবে। উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নিতে হবে। ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে চাই। অথচ তার উপাদান পুরোপুরি যোগান দিতে পারছিনে। তাহলে চলবে কেন? সুতরাং, উৎপাদন উপাদান নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে নিতে হবে। সরবরাহ সহজ, সুগম ও পর্যাপ্ত করতে হবে। বিশেষ করে ভারী শিল্পগুলো, (যেমন ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ প্রকল্প, রেল লাইন ইত্যাদি,) স্থাপনে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। তাদের ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করতে না পারলে বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না। তার জন্য পরিপূরক শিল্পগুলো যথাযথ উন্নত করতে হবে যেন উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে মাথা ঘামাতে না হয়। সুতরাং, শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার আগে যোগসূত্র বিবেচনা করে পরিপূরক ও সম্পূরক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিতে হবে।

বিনিয়োগ-নির্ণায়ক নিয়ে যথেষ্ট সময় কাটানো গেল। এবারে ইতি টানতে হয়। কিন্তু, তার আগে সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয় খতিয়ে নেয়া প্রয়োজন। 'উৎপাদন-আঙ্গিক' (Production technique) কেমন হবে? মনে করা যাক, বিনিয়োগ-উৎসারিত উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিদ্যমান রয়েছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: দরিদ্রদেশ কোন্ জাতীয়

উৎপাদন-আঙ্গিক গ্রহণ করবে? বিনিয়োগ কি পুঁজিভিত্তিক (Capital-intensive) না শ্রম-ভিত্তিক হবে? এই প্রশ্নে মতভেদের অভাব নেই। এক্ষেত্রেও নানা মুনীর নানা মত। একদল বলছেন অধিক মূলধন খাটানো দরকার। অন্যদল ভিন্ন মত তুলে ধরছেন। তৃতীয় দল বলছেন এটা বিবেচ্য বিষয়ই নয়। আমরা বলব সবায় ঠিক কথা বলছেন, কেননা, যে যেদিক থেকে সমস্যাটি বিবেচনা করছেন, সেদিক থেকে তিনি অবশ্যই সঠিক কথা বলছেন। তবে তাঁরা কেউ সমস্যার পুরোপুরি সমাধান দিতে পারছেন না।

কোন দ্রব্যের উৎপাদন-বিচিত্রা এমন যে তাতে অধিক পুঁজি খাটানো প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রযুক্তিক কারণেও এতে অধিক শ্রম খাটাবার সুযোগ সীমিত। এমন শিল্পে অধিক শ্রম খাটাতে যাওয়া বোকামির নামান্তর। শ্রম বেশী দিয়ে পুঁজি কমাবার জো যেখানে নেই, সেখানে তা করতে যাওয়া অবশ্যই অনুচিত, এতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং, বলতে পারি উৎপাদন আঙ্গিক নিয়ে ধরাবাধা কোন আইন প্রণয়ন করা ঠিক হবে না। একটা সাধারণ কাঠামো মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য খতিয়ে তা কাজে লাগাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে নিতে হবে।

এবারে কথা উঠে: যে-ক্ষেত্রে শ্রম ও পুঁজি পরস্পর স্থানান্তরিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সে-ক্ষেত্রে কি অবস্থা দাঁড়াবে? অর্থাৎ কোন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠায় শ্রম ও পুঁজি ইচ্ছামত বাড়িয়ে-কমিয়ে খাটানো যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কোন্ আঙ্গিক শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন হবে? উত্তর সহজ—সামাজিক বিবেচনায় যা লাভবান বলে মনে হবে সেই আঙ্গিক গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র দেশে সাধারণতঃ শ্রমের পরিমাণ অনেক বেশী। সুতরাং, এই জাতীয় শিল্প শ্রমভিত্তিক হতে আপত্তি নেই। কাজেই দরিদ্র দেশের বেলায় একটা সাধারণ নীতি বেধে দেয়া যেতে পারে। যেক্ষেত্রে দ্রব্যের বাজার বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রযুক্তিক কোন বাধা নেই সে-ক্ষেত্রে শ্রমভিত্তিক বিনিয়োগ অধিক কাম্য বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবশ্য একটা বিষয় ভাবতে হবে। শ্রম সস্তা অথচ পুঁজি বেশ মহার্ঘ। শ্রম অধিক খাটাবার ফলে তাদের মজুরী বেড়ে যায়। তাতে আর বণ্টনজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তেমনি মাথাপিছু আয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। কোন বৃহৎ সমস্যার জন্য না

দিলে শ্রমভিত্তিক আঙ্গিক গ্রহণে আপত্তির কিছু থাকা উচিত নয়। কেননা অন্যসব বিবেচনা মোটামুটি একইরূপ হলে শ্রমভিত্তিক উৎপাদন নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য একটু হাসির ছটা বয়ে আনতে পারে।

শ্রমভিত্তিক উৎপাদনের প্রাধান্য সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রেই বেশী হবে। কেননা, প্রযুক্তিক কারণে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের সুযোগ সীমিত। এদিকে, শিল্পক্ষেত্রে প্রসারণ নাগরিক জীবনের জন্ম দেয়। আর নাগরিক জীবন জন্মহার হ্রাস করার অনুকূলে।[১৫] সুতরাং মাথাপিছু আয়ের বিবেচনায় হয়ত শ্রমভিত্তিক কৃষি-প্রকল্প অপেক্ষা পুঁজি-ভিত্তিক শিল্প-প্রকল্প অধিক কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা, কৃষি-প্রকল্প জন্মহার বাড়াতে বরং উস্কানি দেয়। তাতে মাথাপিছু আয় বাড়ার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে।

সর্বশেষ পর্যায়ে বাণিজ্যিক লেন-দেন ও তার ভারসাম্য নিয়ে দুটো কথা বলতে হয়। বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি জোরদার করা প্রয়োজন। তজ্জন্য কিছুটা বিনিয়োগ রপ্তানি-শিল্পে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। রপ্তানি-শিল্প অনেকক্ষেত্রে পুঁজিভিত্তিক হতে হয়। যেমন খনিজ দ্রব্য কি তৈল শোধনাগার স্থাপন। কাজেই, শ্রম সস্তা পাওয়া গেলেও এই সকল শিল্পে পুঁজি না খাটিয়ে গত্যন্তর নেই।

সুতরাং, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রকল্প পুঁজিভিত্তিক কি শ্রমভিত্তিক হবে তা নির্ণয়ের সহজ সূত্র কিছু নেই। সব কিছু নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ও পরিবেশের উপর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী তার প্রধান নিয়ামক। কেবল উপাদান পরিস্থিতি বিবেচনা করলেই চলবে না। আনুষঙ্গিক বহু জিনিস বিচারে নিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে খতিয়ে নিতে হবে। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে জাতীয় আয় কিভাবে আন্দোলিত হবে দেখতে হবে। ফলপ্রসূ চাহিদা ও বড় আকারে উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই বিবেচ্য। ফলপ্রসূ হয়ে উঠা কালও (gestation period) সিদ্ধান্তে পৌঁছার একটা বিশিষ্ট উপাদান। জাতীয় আয় বণ্টন ও মাথাপিছু আয়ে প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে এবং সর্বোপরি বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্যে কি প্রতিক্রিয়া জন্ম দেয় তা হিসাবে নিতে হবে।

১৫. পশ্চিমা দেশগুলোতে কথাটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। দরিদ্র দেশে তা হবে এমন কথা নেই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে।

৫. মূলধন পরিশোষণ ও স্থায়িত্ব (Capital Absorption and stability)

উপরে মূলধন সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ও তার বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব উদ্ভাসিত করা হয়েছে। তেমনি বিনিয়োগ নির্ণায়ক সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বভাবতঃ বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, প্রচুর পরিমাণে মূলধন পাওয়া গেলেও বিনিয়োগ-নির্ণায়ক নির্ধারিত করে নেয়া সম্ভব হলে দরিদ্রদেশের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি আর ঠেকায় কে! ব্যাপারটা কিন্তু আসলে তত সহজ নয়। কারণ দরিদ্র দেশের ব্যাথা কেবল এক জায়গায় নয়, সর্বত্র। কাজেই, সব কিছু যথাযথ হয়ে এলেও দেখা যাবে কোন এক জায়গায় এসে ঠেকা পড়েছে। এই যেমন মূলধন পরিশোষণের কথাই ধরুন না। প্রতিটি দেশেরই মূলধন পরিশোষণ বা অন্তরিত করে নেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; কাজেই, বেশী করে মূলধন গুঁজে দিলেই চলবে না। যেন পেট ফেঁপে অতিসার অবস্থার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মূলধন-পরিশোষণ ক্ষমতা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ মূলধন অন্য যে সব উপাদানের সাথে মিশে উৎপাদন সম্ভব করে তুলে তাদের সুপ্রাপ্যতা এই ক্ষমতার সীমা নির্ধারিত করে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য-জনিত সমস্যা এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা এই ক্ষমতার সীমানা বেধে দেয়।

সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয় মূলধন অন্তরণে বিশেষ বাধাস্বরূপ। তন্মধ্যে, প্রযুক্তিক বিদ্যার অভাব। দক্ষ কারিগরের স্বল্পতা ও শ্রমিক সঞ্চালন ন্যূনতা সবচেয়ে প্রধান। দরিদ্র দেশ, কার্যনির্বাহক, প্রযুক্তিক বিদ্যায় পারদর্শী, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শ্রমিকের অভাবে বিশেষভাবে ভোগে। এই সকল অপর্যাপ্ততার ফলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বিশেষভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। এমনিতে হয়ত দরিদ্র দেশে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ধনীদেশ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু, যখন অধিক হারে বিনিয়োগ ঘটে যেতে থাকে তখন বিভিন্ন বাধার ঘাত-প্রতিঘাতে তা বিশেষভাবে কমে যেতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত ঋণাত্মক বোধকও হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, মূলধন সংগঠনের সাথে সাথে অন্যান্য উপাদানে সম্প্রসারণ ঘটানোও একান্ত প্রয়োজন। কাজেই, অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন মূলধন বাড়ার সাথে সাথে অন্যান্য উপাদানও সংগতি রেখে এগিয়ে যেতে পারে এবং যদ্দিন পর্যন্ত এই উভয়ে একটা সমঝোতা টানা না যায় তদ্দিন পর্যন্ত বাছাই করা শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘটানো একান্ত প্রয়োজনীয়।

উন্নয়ন গতিশীল হয়ে উঠার সাথে পরিশোষণ ক্ষমতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উভয়ের চলন সমধর্মী। কাজেই, উন্নয়ন স্পৃহা বেগবান করে তোলা সম্ভব হলে পরিশোষণ ক্ষমতায়ও সম্প্রসারণ ঘটতে বাধ্য। কাজেই, দরিদ্র দেশে বিদ্যমান হাজারো জটের গিট্ ঢিলা করে দেয়া সম্ভব হলে উৎপাদনশীলতা বেড়ে যেতে বাধ্য।

মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যজনিত সমস্যা দরিদ্র দেশের জন্য বেশ জটপাকানো সমস্যা। এদের হাত এড়িয়ে চলা সহজ নয়। কাজেই, এমন কিছু করা অনুচিত যাতে এদের হাত শক্ত হতে পারে। তার জন্য দরকার হলে উন্নয়ন গতি সীমিত করে নেয়া অনুচিত হবে না।

এক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র দেশে মুদ্রাস্ফীতির আকার-প্রকার নিয়ে একটু আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে না। সাধারণতঃ দরিদ্র দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা অধিক বিদ্যমান। ধনী দেশে তত নয়। ধনী বা উন্নত দেশে ব্যয়-দর চাপাচাপি (Cost price push type) জনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু, অনুন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতির পয়লা নম্বর বন্ধু মুদ্রা-সম্প্রসারণ। মুদ্রা-সম্প্রসারণ বেশ জোরেসোরে এবং সর্বত্র গতিবিধি চালিয়ে ক্রিয়া করে। কারণ অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ আসে সাধারণতঃ মুদ্রা সম্প্রসারণ থেকে। অন্যদিকে, উন্নত দেশ তার বিনিয়োগের বেশ কিছুটা মিটায় আপন সঞ্চয় থেকে। তাছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে লগ্নী করবার লোকের সংখ্যা দরিদ্র দেশ অপেক্ষা ধনী দেশে অনেক বেশী। দরিদ্র দেশে ফটকাবাজারীও দুদিনে লাট-বেলাট বনে যাওয়ার প্রবণতা অধিক। কাজেই, সবায় স্বল্পমেয়াদী অথচ অধিক মুনাফাদায়ী প্রকল্পে বিনিয়োগ ঘটাতে উৎসুক। তাতে মুদ্রাস্ফীতি বেশ জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পায়। অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার মত অস্ত্রশস্ত্র দরিদ্র দেশের সরকারের তেমন বেশী নেই। বিশেষ করে অর্থ ও রাজস্বনীতি তেমন কার্যকরী নয়। এদিকে বাজার অপূর্ণাঙ্গতা মুদ্রাস্ফীতিতে যথেষ্ট ইন্ধন যোগায়।

দরমাত্রার উর্ধ্বগতি উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত করে। অনেকে অবশ্য তর্ক তুলতে পারেন যে, তাতে অপর্যাপ্ত সম্পদের মূল্য বেড়ে যায় বলে জোর-সঞ্চয় (forced saving) অধিক হারে ঘটতে পারে।[১৬] অনেকে এই যুক্তি হয়ত প্রদর্শন করতে পারেন যে, উন্নয়নের খাতিরে কিছুটা স্ফীতি হয়ত

১৬. টাকা-পয়সা ব্যবহারে নাজুক ও দেশবাসী এমন স্বল্প খেয়ে জীবন বাঁচিয়ে চলেছে যে যতই কচলানো থাকনা কেন জোর সঞ্চয় তেমন একটা হবার জো নেই এমন অর্থনীতিতে এটা তেমন কার্যকরী কিছু নয়।

ক্ষতিকারক নয়। বরং অনেকটা লাভজনক। কেননা, বড় "আকারে শ্রমিক সঞ্চালন সোজা কথা নয়। তজ্জন্য কিছুটা লোভ প্রদান করা প্রয়োজন বৈকি। তাছাড়া, ক্রমবর্ধমান খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দরমাত্রায় কিছুটা উর্ধ্বগতি প্রয়োজন। তা না হলে গ্রামবাসীরা কেন শহরকে অধিক দ্রব্য যোগান দেবে।"[১৭]

উপরোক্ত যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়ে নিবেদন করা যায় যে, তাতেও হয়ত আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা, বিপণীকরণ প্রথায় এত বেশী ফাঁক বিরাজমান যে, এই সকল প্রলোভন হয়ত তুচ্ছ বলেই প্রতিপন্ন হতে পারে এবং কিছুতেই হয়ত পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বাজার ব্যবস্থায় এগিয়ে না আসতে পারে। যদিও বা আসে তাহলেও মুদ্রাস্ফীতি তার যা ক্ষতি করার তা করেই যাবে। কেননা, বিনিয়োগ প্রথায় ওলট-পালট দেখা দেয়। হয়ত আকাঙ্ক্ষিত খাতে তা প্রবাহিত হয় না। কেন বলি কেন ধারাপ্রবাহ অবশ্যই দিক হারিয়ে ফেলবে। তদুপরি দরমাত্রা একবার উর্ধ্বগামী হয়ে উঠলে তা রোধ করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সরকারী উন্নয়ন ব্যয় বেড়ে যায় অন্যদিকে হয়ত উদাসীনভাবে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার চেষ্টা চলতে থাকে। এদিকে, কায়েমী-স্বার্থ বাসা বেঁধে উঠে। কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা মুদ্রাস্ফীতি বজায় রাখার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কারণ, এতে তাদের দু'পয়সা হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ হয়। চিলি ও ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে বেশ শিক্ষাপ্রদ। এই দুইটি দেশ কিছুতেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারেনি।

মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক হচ্ছে যে তার ক্রিয়াকর্মের ফলে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ অপচয়ের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। জোর-সঞ্চয় ঘটিয়ে যেটুকু বিনিয়োগ করা যায় ভক্ষণ তার তুলনায় সামান্যমাত্র নেমে যায়।[১৮] আর জোর সঞ্চয়ের যে পথ তার প্রভাব প্রায় সবার উপরে পড়ে। বিশেষ করে যাদের সঞ্চয় করার ক্ষমতা ন্যূনতম, তাদের উপর তার হাত বেশ খড়্গ হয়ে পড়ে। পরিণামে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয় দ্রুত শূন্যের দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে জোর-সঞ্চয় নীতি কিছুকালের জন্য হয়ত বেশ জোরেসোরে চালানো

---

১৭. Maurice Dobb প্রণীত "Some Aspects of Economic Development," Ranjit Publishers, Delhi, 1951, দেখুন পৃঃ ৪৮।

১৮. দেখুন, যথা-E. M. Bernstein ও I. G. Patel প্রণীত "Inflation in Relation to Economic Development", I.M.F. Staff Papers II, No. 3, পৃঃ ৩৬৩-৩৮২ (১৯৫২ সাল)।

যায়। কিন্তু, দীর্ঘকাল ধরে তা চালু রাখা সোজা নয়। অন্যদিকে, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ প্রদান ব্যাহত হয়। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় মুনাফা উবে যায় বলে লম্বা সময়ের জন্য ঋণ প্রদানে কেউ তেমন আগ্রহী হয় না। এদিকে সঞ্চয়ক্ষেত্রে বেশ তাল-বেতাল ঘটে যায়। সবায় ফটকাবাজারে দু'পয়সা লুটে নেওয়ার তালে থাকে। দূরকল্পী (speculative) প্রকল্পে উৎসাহী হয়। লম্বা গর্ভাবস্থাসম্পন্ন (gestation period) প্রকল্প গ্রহণ করে কে বাবা-মা'র খেতে যায় এই মনোভঙ্গি উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে। 'দক্ষতা' ও 'সূক্ষ্মতা' অহরহ মার খেতে থাকে। সম্পদ বরাদ্দকরণে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়। হিসাব করে দেখা গিয়াছে যে মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম হিসাবে চিলি তার স্বাভাবিক উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত গচ্চা দিয়ে চলেছে।[১৯]

মূলধন পরিশোষণে সংকট বাণিজ্যক ভারসাম্য ক্ষেত্রে দোলায়মান অবস্থার জন্ম দিতে পারে। মূলধন সংগঠন তার অন্তরীণ হওয়ার ক্ষমতার অধিক হলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে বেশ কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বৈদেশিক মুদ্রা অপরিহার্য। উন্নয়নধারা এগিয়ে যাওয়ার সাথে আমদানীকে অধিক ভূমিকা পালনে অগ্রণী হতে হয়। সুতরাং, উন্নয়নপ্রবাহ মোটামুটিভাবে আমদানী ও রপ্তানি ক্ষমতার সাথে তাল রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই উভয়ের মধ্যে অসাম্য বিষম অবস্থার জন্ম দিতে পারে। আমদানীক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সৌখিন দ্রব্যে বিনষ্ট হতে পারে। অথচ উন্নয়ন প্রক্রিয়া দুর্দশাগ্রস্থ হতে পারে। অন্যদিকে, অধিক উন্নয়ন কার্য-ক্রম মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক হলে রপ্তানি-বাণিজ্যে ওলট-পালট সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে, রপ্তানি-শিল্প অধিক ব্যয়জনিত দুর্ভোগে পড়তে বাধ্য। ফলে বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। বৈদেশিক পুঁজি আগমন নিরুৎসাহিত হতে পারে ও মূলধন পাচার উৎসাহিত হতে পারে। পরিণামে, উন্নয়ন ক্রিয়াকলাপ শ্লথগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। কেননা, আবশ্যকীয় মূলধনী-সম্পদ আমদানী কঠিন হয়ে উঠবে যে।

---

১৯. T.W. Schultz, "Latin American Economic, Policy Lessons", American Economic Review, Papers and Proceedings, XLVI, No 2, পৃ: ৪২৮ (মে, ১৯৫৬)।

যে দেশের বিদেশী ঋণের বোঝা আগে থেকেই ভারী তার জন্য অবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে উঠাও অস্বাভাবিক নয়। কেননা, ঋণের বোঝা হাল্কা করায় তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। হয়ত তাকে ভোগের মাত্রা ও বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। সুতরাং, বিদেশী ঋণ গ্রহণে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিদেশী ঋণ যেন বোঝার তুলনায় অধিক ফলপ্রদ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদী হিসাব অন্তরীণ থাকতে হবে এবং হিসাব কষায় ঋণ আদায়ের বিষয়টি যেমন ধরতে হবে তেমনি ঋণ গ্রহণ করার ফলে দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য-শর্তে কি জাতীয় সাঙ্গীকরণ প্রয়োজন হতে পারে তাও খতিয়ে দেখতে হবে।[২১]

উন্নয়ন গতি নির্ধারণ সুতরাং, দুই জাতীয় কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। একদিকে, রপ্তানি বাণিজ্যে সম্প্রসারণ ও বিদেশী পুঁজির আগমন সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং অন্যদিকে, আমদানী দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ও বিদেশী পুঁজির বোঝা বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটু সামঞ্জস্য টেনে তবে উন্নয়ন হার ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নিম্নোল্লিখিত কারণ-সমূহের জন্য বাণিজ্যিক লেন-দেনে টানাপোড়েন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

১) উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে রপ্তানি শিল্পক্ষেত্র থেকে সম্পদ উঠিয়ে নিতে হলে;
২) উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিক আমদানী প্রয়োজন হলে;
৩) বাণিজ্য-শর্ত দেশের প্রতিকূলে মোড় নিলে;
৪) অধিক আমদানী-স্পৃহা-সম্পন্ন গোষ্ঠীর আয় বেড়ে গেলে:
৫) প্রদর্শনী প্রভাব (demonstration effect) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিক প্রতাপশালী হলে, এবং
৬) সঞ্চয়-স্পৃহা ন্যূন হলে।

দরিদ্রদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য লাঘবে ধনীদেশ বেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই সব দেশ থেকে উন্নত দেশ অধিক হারে আমদানী করতে পারে। তজ্জন্য অবশ্য তাদেরকে তাদের আমদানী নীতি

২১. দেখুন যথা—D. Finch রচিত "Investment Service in Under-developed Countries", I.M.F. Staff Papers, II, No. I পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০-৮৫ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)

অনেকটা সহজ করতে হবে এবং বাণিজ্যিক বাধা কিয়দংশে অপসারিত করে নিতে হবে। তদুপরি, উন্নত দেশ তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি দরিদ্র দেশে অধিক হারে বিনিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করে সেইসব দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায়ে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। উন্নত দেশ পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হলে এবং নিজেদের উন্নয়ন হার উচ্চ পর্যায়ে রাখতে পারলে দরিদ্রদেশের অবস্থা অধিক ভাল হতে পারে। কাঁচামালের দামে হ্রাস-বৃদ্ধি কমিয়ে নিতে পারলেও দরিদ্রদেশ বেশ লাভবান হতে পারে।

যুক্তিজাল বিস্তৃত করে বলা চলে যে, দরিদ্রদেশ হয়ত তার কার্যক্রম মুদ্রাস্ফীতিজনক নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাতে পারে। তজ্জন্য কার্যক্রমের অধিকাংশ অংশ সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে আসতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং কিছুতেই মুদ্রাস্ফীতি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেয়া যাবে না। তাহলে হয়ত তার পক্ষে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের দোদুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে যদি সে,

আমদানী বাণিজ্য সরাসরি নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে,
বৈদেশিক বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি মেনে চলে,
ভোগ-বিচিত্রা (consumption function) কর প্রথার মাধ্যমে নিম্নগামী করে তোলার প্রয়াসী হয়,
অর্থনীতির অন্য কিছুক্ষেত্রে বিনিয়োগ সঙ্কোচন নীতি মেনে চলে, এবং
মজুরী ও দরমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

তবে মনে রাখতে হবে যে বৈদেশিক বাণিজ্য শাখায় নিয়ন্ত্রণ সাধন সোজা কথা নয়। (এ-নিয়ে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে)। দরিদ্রদেশের ঢাল-তলোয়ার নিধিরাম সর্দারের মত। ঋণ-প্রথা সেকেলে। অনুন্নত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। কর প্রথা ও তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা অকেজো অথবা অপক্ক। এমতাবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট কঠিন বৈকি। অথচ মুদ্রাস্ফীতির ভয়াবহ আক্রমণ থেকে দেশকে যে করেই হউক রোখতে হবে। বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখা দরিদ্র-দেশের জন্য বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কাজেই, যে কোন মূল্যেই হোক উন্মুক্ত ও সর্বগ্রাসী মুদ্রাস্ফীতির পথ রোখতে হবে। অন্যথায়, হরহামেশা

মুদ্রামানে হ্রাস ঘটিয়ে ঠাঁই পাওয়া মুশকিল হবে। অতীতে বহু দরিদ্র-দেশকে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। সুতরাং, সাধু সাবধান!

৬. মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান (Values and Institutions)

উপরে অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন ক্রিয়াকর্মে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীই সংশ্লিষ্ট বটে। তবে সামাজিক ব্যবস্থার অন্যান্য দিকও হেলা-ফেলার বস্তু নয়। বস্তুত, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সামাজিক পদ্ধতির সার্বিক কাঠামোর সাথে মিলে-মিশে তবে উন্নয়ন কর্মধারা প্রভাবিত করে। যেমন ধরুন বিনিয়োগ ব্যাপারটা, অর্থনৈতিক বিষযাবলী তার গতিধারা নির্ণয় করে বটে, তবে তা এককভাবে নয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিনিয়োগ ধারার আসল রূপ প্রদান করে। সোজা কথায়, বিনিয়োগ লক্ষ্য নির্ণিত হয় সামাজিক সমগ্র বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে। কাজেই বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলী সমাজের সার্বিক চেহারায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুতরাং, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে অন্যত্রও পরিবর্তন আনতে হবে। উন্নয়নে অর্থনৈতিক বিষয়াবলী যেমন প্রয়োজন তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়াবলীও অত্যাবশ্যকীয় বটে। তাদের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই হেয় নয়। কাজেই, এই সব বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমানে তা করার সুযোগ নেই। তবে সাধারণভাবে কিছুটা আলোচনা করা হবে।[২২]

দরিদ্রদেশ অনুন্নত রয়েছে। সাদামাটা কথায়, বিদ্যমান সাংস্কৃতিক কাঠামো উন্নয়ন গতিধারা বেগবান করতে পারেনি। উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করার খাতিরে অর্থনৈতিক নয় এমনসব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে পরিবর্তন আনতে হবে। নব নব চাহিদা, নব্য চিন্তাধারা আধুনিক উৎপাদন-আঙ্গিকেও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে। তবেই জাতীয় আয় উর্ধ্বমুখী মোড় নিতে সক্ষম হবে। ধর্মীয় মতবাদ ও চিন্তাধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী হতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মকে নমনীয় করে নিতে হবে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিথিল করে তুলতে

২২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন। পরিশিষ্ট 'ক'-এ এই বিষয়েব উপরে লিখিত পুস্তকাবলীর নাম প্রদান করা হয়েছে।

হবে। এক কথায়, দরিদ্র দেশের মানুষকে একথা বুঝতে হবে যে, কিছুই অজেয় নয়। কিন্তু, তজ্জন্য সর্বাগ্রে চাই মানষিক প্রস্তুতি। মনকে আগে বেধে নিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই; এই জিগির সবার মধ্যে জাগতে হবে এবং তা অর্জনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও পন্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী সামাজিক মূল্যধারায় বিধৃত হয়ে যেতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমা নীতিবাগীশকে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তাঁরা যেন একথা মনে করে না বসেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পশ্চিমা দেশের অনুসারী হতে হবে। পশ্চিমা দেশ যেহেতু উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছে সেহেতু তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা অবশ্যই উন্নয়নের অনুকূলে, কাজেই দরিদ্রদেশ উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষী হলে তাদেরকে পাইকারী হারে উন্নত দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করতে হবে। এমন একটা ধারণা গজানো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, তাহলে বিরাট ভুল করা হবে। তা হবে আত্মকেন্দ্রিক বিবেচনার সামিল।

পশ্চিমা দেশ উন্নত, সত্য কথা। কিন্তু, খতিয়ে দেখলে হয়ত দেখা যাবে যে, অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠান আংশিকভাবে মাত্র উন্নয়ন ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে বিচাব-বিশ্লেষণ সূক্ষ্মতম পর্যায়ে নিয়ে গেলে হয়ত দরিদ্র দেশের বহু মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে তেমন পরিপন্থী নয় বলে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই, অতি সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। বহু ধ্যান-ধারণা হয়ত আমদানী করে নিতে হবে। তবে তা বিদ্যমান পরিবেশকে বাদ দিয়ে নয়। এই উভয়ের মধ্যে একটা সুখপ্রদ সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে হবে। এই সামঞ্জস্য সাধনে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হবে। এই দুই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ভালমন্দ যাচাই করে 'কিভাবে' ও 'কোথায়' কাটছাট ঘটাতে হবে এবং বিদেশী ভাবধারা 'কতটুকু' ও কোন্ পর্যায়ে অন্তরিত করতে হবে তার সঠিক নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

নিজের জিনিসের প্রতি মানুষের দরদ স্বাভাবিক। ভালমন্দ যাই হউক, সাধারণ মানুষ তা আকড়ে ধরে পড়ে থাকে। কাজেই, তার পরিচিত মূল্যবোধে পরিবর্তন তারকাছে বেশ বেদনাদায়ক। সুতরাং, পরিবর্তন ও পরিশোধন এমনভাবে ঘটাতে হবে যেন বিদ্যমান মূল্যধারায় বিষম

অবস্থার সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বাছাই করা হতে হবে।[২৩] ঢালাই করা বর্জন করতে গেলে প্রচণ্ড রোষের সম্মুখীন হতে হবে। হয়ত আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যাবে। সুতরাং, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ক্ষেত্র ঠিক করে নিয়ে পরিবর্তন ধারা ও পন্থা বাছাই করে নিতে হবে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মাত্রা যাচাই করে নিতে হবে। শিক্ষা প্রদর্শনী ইত্যাদি সরাসরি পন্থার মাধ্যমে যেমন পরিবর্তন আনতে হবে তেমনি অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও প্রতিকূল পরিবেশ অনুকূল করে তুলতে হবে।

পরিবর্তন প্রণালী বিধিবদ্ধ করায় তাড়াহুড়া নীতি কি সার্বিক চেহারায় আমূল পরিবর্তন মোটেই কাম্য নয়। বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও হতাশা যেন দানা বাঁধতে না পারে। মানুষ যেন অসন্তোষের দাবানলে না জ্বলে। বরং আমরা বলব বিদ্যমান পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান যেন বেশী কচলানো না হয়। উন্নয়ন গতিবেগ তাতে জোরদার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ওলট-পালট ঘটিয়ে আর যাই হউক, বেশী লাভ পাওয়া যায় না। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক নাইজিরিয়ার উপরে তাব রিপোর্টে এই নীতির প্রতি সমর্থন দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে উন্নয়ন কর্মধারা ব্যহত করার মত হাজারো ভাবধারা নাইজিরিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। আবার তা বলশালী করার মত বহু ভাবভঙ্গি ও চিন্তাধারাও প্রচলিত আছে। নাইজিরিয়াবাসীরা আঞ্চলিক শাসনের অনুগত এবং তাদের আনুগত্য বেশ প্রবল। পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত বন্ধন তাদের সুদৃঢ়। স্থানীয় সঙ্ঘ (সমিতি) তাদের ঘনিষ্ঠ সমর্থন পায়। স্থানীয় কৃতিত্বে তারা গর্ববোধ করে। এই সমস্ত অনুভূতি সমবায়ভিত্তিক কর্মস্পৃহা জন্ম দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রাম গ্রথিত করে সমবায় উৎপাদনী সংস্থা গড়ে তোলা যায়। তেমনি সঞ্চয় মাধ্যম সৃষ্টি করা যায়। ......সুতরাং, নাইজিরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় নীতি গ্রহণ করার জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি। আমরা মনে করি নাইজিরিয়ার ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এই পন্থা বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ।[২৪]

---

২৩. B. F. Hoselitz সম্পাদিত The Propress of Underdeveloped Areas (University of Chicago Press, Chicago, 1952) নামক পুস্তকে প্রকাশিত M. E. Opher প্রণীত "The Problem of Selective Cultural Change" নামক প্রবন্ধ দেখুন। পৃঃ সংখ্যা ১২৬-১৩৪

২৪. I. B. R. D. পুস্তিকা Report on the Economic Development of Nigeria, john Hopkins University Press, Baltimore, 1955, পৃঃ ২১।

মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনধারা মোটামোটিভাবে বর্ণনা করা হয় বটে।[২৫] তবে বিশেষ নীতি গ্রহণ করা যায় না এমন নয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিটি নীতি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিশেষ নীতির অনুসারী করে তুলতে হবে। যেমন বিনিয়োগ-নির্ণায়কের কথা ধরুন। এই নির্ণায়ক স্থিরিকরণে অর্থনৈতিক বাছ্-বিচার অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণে অন-অর্থনৈতিক বিষয়াবলীও বিবেচনায় নিতে হবে।[২৬] বিনিয়োগ প্রথা নির্ণয়ে অন-অর্থনৈতিক নিয়ামকগুলোর কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। এমন শিল্পে লগ্নী করতে হবে যার জন্য প্রয়োজন বেশ দক্ষ ও পাকাপোক্ত কারিগর। পাকাপোক্ত কারিগর পাওয়া যাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রগাঢ় ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং, ছেলেমেয়েদেরকে বেশ বাচ্চা বয়সে ট্রেনিং স্কুলে পাঠাতে হবে। সেখানে তারা যেমন শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হবে তেমনি নতুন ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হবে। এবারে পুঁজিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ ঘটাতে হবে মনে করা যাক। পুঁজিভিত্তিক শিল্প-সংস্থায় বেশ জটিল ও উচ্চ কারিগরিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি চালানো ও কর্মোপযোগী রাখায় বেশ উঁচু পর্যায়ের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। এই চর্চার ফলে উন্নত ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয়। আবেগ নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্ব ও উন্নত কলাকৌশল তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গ্রাম্যজীবনে ভাঙ্গনশীল প্রকল্পে লগ্নী করতে হবে। শত শত গ্রামবাসীকে কাজে খাটাতে হবে। অথচ চিরাচরিত জীবন-যাত্রায় পরিচিত গ্রামবাসী পরিবর্তন দেখে যেমন ভড়কে যায়, তেমনি বিরাট বাধারও সৃষ্টি করে. এই সকল বাধা জয় করতে হবে। তবেই প্রকল্পে স্বার্থকতা অর্জন সম্ভব হবে। অথচ উপরোক্ত ঘটনাবলীর কোনটাই সাধারণ অর্থে অর্থনৈতিক বলে চিহ্নিত করা যায় না। এরা বরং অন-অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর পর্যায়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক বিবেচনার পথে অফুরন্ত বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই এদেরকে বাদ দিয়ে এগোবার জো নেই। তেমনি এড়িয়ে যাবার পথও প্রশস্থ নয়। কাজে-কাজেই, উন্নয়ন কার্যক্রমে এদেরকে অন্তরিত করে নিয়ে কর্মপ্রণালী প্রণীত করতে হবে।

---

২৫. দেখুন, যথা—Margaret Mead সম্পাদিত UNESCO পুস্তিকা Cultural Patterns and Technical Change, Paris, 1953, পৃঃ ২৮৮-২৮৯।

২৬. এই বিষয়ের উত্তাষণে David McGelland বিশেষ উপকারী বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রচুর করতে হবে। অথচ উদ্যোক্তা সরবরাহ সুগম করায় মৌলিক অন্তরায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ। কিসের উপর উদ্যোক্তা সরবরাহ নির্ভরশীল? কি জাতীয় মূল্যবোধ ও অনুপ্রেরণা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সাহায্য করে? এই জাতীয় হাজারো প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সামাজিক ব্যবস্থার গোড়ায় যেতে হবে এবং বিভিন্ন মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

বহু রকম ঘটনা উদ্যোক্তাকে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। বস্তুগত স্বার্থকতা উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ মোহনীয় হতে পারে। নিজকে সার্থক বলে পরিচিত করে তোলার তা একটা উপযুক্ত উপায়। সামাজিক পদ-মর্যাদায় বলীয়ান হওয়ার তা প্রকৃষ্ট পন্থা। স্বীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনও উদ্যোক্তার মধ্যে বিশেষভাবে ক্রিয়া করতে পারে। এই জাতীয় হাজারো বিবেচনা ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোক্তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রিয়া করতে পারে।

উদ্যোক্তার জন্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাকে তা বাস্তবে রূপ দিতে হবে। উদ্যোগজনিত কাজ সোজা নয়। উদ্যোক্তাকে বাজার পরিস্থিতি ও সুযোগ-সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ আকার-প্রকার গণনায় নিতে হবে। বিকল্প কর্ম-প্রণালী জানতে হবে। সাহসী হতে হবে। ঝুঁকি নিতে হবে। তন্মধ্যে অনেক ঝুঁকি হয়ত বেয়াড়া রকম জটিল ধরনের। সোজা কথায়, উদ্যোক্তাকে স্বাধীনচেতা মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে। পরিবর্তনের বাঁধা অতিক্রম করতে হবে। স্বীয় কর্মের প্রতিফল নিজের কাঁধে বইবার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে, বাধাও হতে পারে। বিভিন্ন দেশে তার মাত্রায় বিভিন্নতা থাকতে পারে। স্বার্থকতা পদমর্যাদাদানে সমর্থ হলে তা উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করবে। সামাজিক সৃষ্টিতে বাণিজ্যকর্ম হেয় না হলে তা উদ্যোক্তার জন্য প্রেরণা হিসাবে কাজ করছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও আইনিক বৈধতা উদ্যোক্তা সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থা গঠনে প্রয়োজনীয় সামাজিক স্থায়ী খরচা (Public overhead Capital) বিদ্যমান হলে শিল্প উদ্যোক্তা অনুকূল পরিবেশ পাবে। তেমনি সহজ ও প্রেরণাদায়ক মুদ্রা ও রাজস্বনীতি তার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ক্রিয়াকর্মে তার পূর্ণ অধিকার উদ্যোক্তাকে অধিক উদ্যোগশীল

করে তোলে। প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক অগ্রগতি অধিক হারে উদ্ভাবনার জন্ম দিতে পারে। তার সাথে টাকা-পয়সা ঋণ পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত হলে সোনায় সোহাগা হয়। সহজ সম্পদ সঞ্চালন ও বিস্তৃত বাজার উদ্যোক্তার কাছে বেশ আকর্ষণীয় বিষয়। সুতরাং, উপযুক্ত পরিবেশ ও সুচিন্তিত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী উদ্যোক্তা জন্ম দিতে বিশেষভাবে সহায়ক। শুধু তাই নয়—উদ্যোক্তা অধিক ঝুঁকি গ্রহণে উদ্যোগী হয়। নব নব উদ্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়। নব নব চেতনার জন্ম নেয়। উৎপাদনী ধারাব প্রতি পদে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা অবারিত হয়।

সুতরাং, আশা-আকাঙখা, কামনা-বাসনা, দক্ষতা ও উপযুক্ত পরিবেশ উদ্যোক্তা সরবরাহ সহজ করে। আশা-আকাঙক্ষা ও দক্ষতা অধিক হলে অনুকূল পরিবেশ তেমনটা না হলেও চলে। বিপরীতটাও সত্য বটে। অধিকাংশ দরিদ্রদেশে প্রথমটা তেমন বিদ্যমান নয়। কাজেই, অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। উদ্যোগজনিত প্রেরণা (Interprevencial Motivations) ও কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তোলায় অধিক নজর দিতে হবে। সমস্যাটা বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ এবং সামাজিক প্রকৃতির। স্বল্পকালীন সমাধানে সরাসরি নীতি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুকূল করে তুলতে হবে।

এবারে সহজ কথায় আসা যাক। অর্থনৈতিক উন্নয়নটা তেমন কঠিন কাজ নয়। সেই তুলনায় বিস্তৃত ও প্রগাঢ় সামাজিক সমস্যা সমাধান অধিক কঠিন। সাংস্কৃতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিক উন্নয়নধর্মী করে গড়ে তোলা বেশ জটপাকানো কাজ। তাদেরকে এমন সুষ্ঠু ও আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন নিত্য-নূতন চাহিদা নিরন্তর জন্ম দিতে পারে এবং সেই সব অর্জনের সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারে। অর্থনৈতিক সংগঠন যথোপযুক্ত করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। সামাজিক কাঠামো ও নক্সা (যেমন বর্ণপ্রথা, যৌথ পরিবার, গ্রাম্য জীবন, উপাসনা কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি) উন্নয়ন অনুসারী করে সাজিয়ে নিতে হবে এবং তৎউৎসারিত মূল্যবোধ ও প্রেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম সফল করায় সক্ষম হতে হবে।

সুতরাং, আলোচনায় ইতি টানতে পারি এই বলে যে উন্নয়ন কার্যক্রমে একদিকে, অর্থনৈতিক বিষয়াবলীতে নিরন্তর পরিবর্তন সংযোজন ঘটিয়ে যেতে হয় অন্যদিকে, সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ধারায় পরিশোধন,

পরিমার্জন ও পরিযোজন করে যেতে হয়। এই উভয় পরিবর্তনই একান্ত প্রয়োজনীয়। বরং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তন কতটুকু অন্তরিত করতে হবে তা হয়ত তেমন শক্ত বাধা নয়। কিন্তু কতটুকু সামাজিক পরিবর্তন দরিদ্রদেশ সহ্য করতে পারে এবং কত দ্রুত তা ঘটিয়ে নিতে পারে তা মৌলিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আভ্যন্তরীণ নীতিমালা (১) [Domestic Policy Issues (1)]

এবারে সুনির্দিষ্ট নীতি-পদ্ধতি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। উন্নয়ন কার্যক্রমের সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়াবলী পূর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ভাষিত করা হয়েছে। সেই সব বিষয়াবলী বাস্তবায়িত করা দরকার। তাদের বাস্তবায়নে নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজনীয়। প্রথম ভাগের আলোচনায় উন্নয়ন তত্ত্বাবলীতে নিহিত নীতিমালার সঙ্কেত দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিভেদে সেই সব নীতিমালায় তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতাদর্শী। মতাদর্শের বিভেদে নীতিমালা বিভিন্ন হতে বাধ্য। তাছাড়া, নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণে বিকল্প চিন্তাধারা অন্তরিত। বিকল্প পন্থা থেকে সঠিক পথ বাছাই করে নিতে হবে। এদিকে আবার এইসব বিকল্প পন্থা থেকে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। কাজেই এমন কোন কার্যসূচী প্রদান সম্ভব নয় যা সর্ব দেশে সমভাবে প্রযোজ্য। এক দেশে যা উপকারী, অন্য দেশে তা তেমন না-ও হতে পারে। আপন বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও উদ্দেশ্যভিত্তিক ভিন্ন দেশে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। কাজেই, কোন একটা দেশকে আদর্শ ধরে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন উচিত হবে না। বরং সাধারণভাবে সব দেশে প্রযুজ্য এমন একটা কর্মসূচী প্রদান অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। সেই অনুসারে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কর্ম-প্রণালীর বিভিন্ন ধারা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হবে এবং তাদের মধ্যকার তুলনামূলক গুনাগুণ উদ্ভাষিত করার চেষ্টা করা হবে।

(১) সরকারের ভূমিকা

উন্নয়ন কার্যাবলীতে সরকারী ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপ হতে দেখা যায়। উন্নয়ন-ক্রিয়া সূচনায় ও উন্নয়ন ধারায় আঙ্গিক প্রদানে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। আজকের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে সরকারী সহযোগিতার মাত্রা-তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কোথায়ও সে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, কোথায়ও বা উন্নয়ন প্রক্রিয়া সবল করে তোলায় সহযোগিতা প্রদান করেছে। অন্যত্র হয়ত

উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তার পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হবে। বর্তমানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পরে জাপানে, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীতে ও প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্প বাছাই থেকে তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত উন্নয়ন কর্ম-প্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়ে সেই সব দেশের সরকার কোথায়ও বা সক্রিয়ভাবে, অন্যত্র পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। অন্যদিকে, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকারী ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। বরং উল্টোটা ঘটতে দেখা গিয়েছে। বৃটেনে, শিল্পপতি ও বণিকদল উন্নয়ন কার্যক্রিয়া বলিষ্ঠ ও বেগবান করে তুলেছে। বিদ্যমান সরকারী বিধিনিষেধের আওতা থেকে উদ্যোগ-ক্রিয়া মুক্ত করে নিয়েছে। এক কথায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগ-নীতি সফল করে তুলেছে। অবাধ-নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়শীল বলে প্রমাণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কতকগুলো বিশেষক্ষেত্রে মাত্র ক্রিয়া করেছে। বহিরাগতদের পুনর্বাসন, রেলপথ স্থাপনে জমি প্রদান, ভূ-দান সংস্থা (Land-grant Colleges) গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তেমনি সংরক্ষিত শুল্কনীতি গ্রহণ করে এবং সাহায্য (Subsidies) প্রদান করে বিশেষ কিছু শিল্পোন্নয়নে সরকার কিছুটা ভূমিকা পালন করেছে।

দরিদ্রদেশের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন রূপ। এই সব দেশে বন্ধ্যা অবস্থা বিরাজ করছে অনেক কাল ধরে। তাদের সমস্যাবলী ভীষণ বিদঘুটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ যুক্তরাজ্য সেই পরিবেশে তাদের উন্নয়ন সম্ভব করে তুলেছে সেই পরিবেশ দরিদ্রদেশে বিদ্যমান নয়। তাদের উন্নয়ন অন্তরায়গুলো যেমন জটিল তেমনি ব্যাপক। কাজেই উনিশ শতকের স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ এইসব দেশে সম্ভব নয়। বরং যে বন্ধ্যাত্ব অবস্থায় দেশগুলো পড়ে আছে এবং যে সমস্যা নিয়ে দিন কালাতিপাত করছে তার থেকে দেশগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে উঠাতে হবে। এই কর্ম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হওয়ার নয়। ব্যাপক হারে সরকারী প্রচেষ্টা চালিয়ে তবে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে বলে সবায় মত পোষণ করেন।

সরকারী ভূমিকার ক্ষেত্র নিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে মতৈক্য দেখা যায়:

সংস্থাগত বন্দোবস্ত ঘটিয়ে বাজার সম্প্রসারণে সরকারী ভূমিকা বলিষ্ঠ হতে হবে; মুনাফা ন্যূনতম অথবা ঝুঁকি বেশী এমন সব শিল্প স্থাপনে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে;

ব্যক্তিগত মালিকানা অপেক্ষা সরকারী মালিকানা শ্রেয় এমন সব ক্ষেত্রে সরকারী পদক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজনীয়; এবং

বাহ্যিক মিতব্যয়িতা অর্জনে ও 'ভারসাম্য উন্নয়ন' নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা সরাসরি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সব ক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও বিশেষ দেশে বিশেষ নীতি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বনের অবকাশ অবশ্যই রয়েছে এবং এই সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেওয়াও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়। একটা নির্দিষ্ট দেশের কথা ধরুন। কেউ বলবেন, সরকার পরিকল্পনার সাধারণ রূপরেখা প্রদান করবে এবং তার কর্ম-পরিসর সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবল সীমাবদ্ধ রাখবে। ভিন্ন মতাবলম্বী বলবেন, না তেমন হলে চলবে না। সরকারী ভূমিকা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ হতে হবে। বাজার পদ্ধতি সুষ্ঠু করে তোলায় অবশ্যই সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানার বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়। অপর পক্ষ যুক্তিজাল সংক্ষিপ্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হবেন যে অবাধ-নীতিকে বিদায় দিতে হবে। বাজার-পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ চল'বে না। সুতরাং, সরাসরি নীতি গ্রহণ করা হউক। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা গড়ে তোলা হউক, ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গায় সরকারী মালিকানা স্থাপন করা হউক।

এই মতভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উন্নয়ন-ক্রম ও গতি প্রবাহ নিয়ে মতদ্বৈত প্রত্যক্ষ করা যায়। উক্ত মতদ্বৈতের ধারাপ্রবাহ লক্ষ্য করে দুই জাতীয় চিন্তাধারা চিহ্নিত করা যায়। এক দলের মতে সরকারী ভূমিকা অবশ্যই সরাসরি হতে হবে। তাঁরা বলেন, উন্নয়ন পথে অন্তরায় এত বেশী এবং এমন সর্বগ্রাসী যে সরকারী ভূমিকা সবল ও সপুষ্ট না হলে ত্বরান্বিত উন্নয়ন পাওয়া সম্ভব নয়। শিল্পোন্নয়নে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। ব্যাপক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তেমনি উঁচু হারে মূলধন সংগঠনে সহায়তা করতে হবে। অর্থনীতির প্রত্যেক অঙ্গে সরকারী পরিকল্পনা ব্যপ্ত হতে হবে। এই সার্বিক পরিকল্পনায়

অন্তত চারিটি বিষয় বিবৃত থাকতে হবে। প্রথমতঃ আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য উৎপাদনে নির্দিষ্ট 'লক্ষ্য' স্থির করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিনিয়োগ কার্যক্রম অর্থাৎ মূলধন আয়-ব্যয়ক (capital budget) প্রণীত করে নিতে হবে। তৃতীয়তঃ, বিনিয়োগ সহায়কারী জনকল্যাণ আয়-ব্যয়ক (humen investment budget) অঙ্গীভূত করে নিতে হবে। এই ব্যয়-হিসাব জনশিক্ষায় সরকারী খরচের মাত্রা প্রদান করবে। শিক্ষা, ট্রেনিং, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এই প্রকল্পের অংশীভূত হবে। সর্বশেষে সার্বিক পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণের কার্য-প্রণালী সন্নিবেশিত থাকবে। বেসরকারী প্রচেষ্টা শিল্প-বিনিয়োগ ও সংস্থার কর্মধারা সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করতে হবে এবং সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের অনুসারী করে তুলতে হবে।[১]

দ্বিতীয় দলের অভিমত প্রথম দলের অভিমত থেকে পৃথক। তাঁরা চরমপন্থী নন। এটা করলে সব হবে, না করলে রসাতলে যাবে দ্বিতীয় দল এই মতে বিশ্বাসী নয়। তাঁরা বলেন, সরকারের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কেবল সাধারণভাবে কর্ম-প্রণালী তদারক করলেই যথেষ্ট। শিল্প স্থাপনে সরকারকে এগিয়ে আসার দরকার নেই। তেমনি পরিকল্পনায় সীমা-পরিসীমা বেধে দেওয়ারও কোন যুক্তিকতা নেই। তজ্জন্য বাজার ব্যবস্থাই যথেষ্ট। বেসরকারী প্রচেষ্টা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। কাজেই, উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে সহনশীল নীতি গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই।

উন্নয়নক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলের ক্রমিক নীতি অনেকের কাছে গ্রহণীয় নয়। কারণ হিসাবে তাঁরা বহু যুক্তি প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে এই নীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন যথেষ্ট জটিল কাজ। কাজেই, বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত ও ভরবেগ সম্পন্ন (momentum) করে তুলতে হলে তা সর্বপ্রসারী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হতে হবে। মিনমিনিয়ে কাজ আদায়ের উপায় নেই। কাজেই, "শ্লথগতিসম্পন্ন বিবর্তনধর্মী নীতি" গ্রহণ অত্যন্ত ক্ষতিজনক বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। তা হবে "পরাজয় মনোভাবসম্পন্ন আচরণ।

১, দেখুন B. Higgins প্রণীত Development Planning and Economic Calculus Social Research, XXIII. No. 1. পৃঃ ৩৬ ও ৪৭ (spring, 1956).

হয়ত বা আত্মঘাতিমূলক। কেননা, সমস্যার পরিধি ও আকৃতি-প্রকৃতি এত ব্যাপক ও বিটকেলে যে বিবর্তনধর্মী নীতি দিয়ে তার সমাধান করা যাবে না।[২] তজ্জন্য চাই বড় আকারের পরিবর্তন। তড়িতগতিতে তা সাধন করতে হবে। তা না হলে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল হয়ে উঠতে পারবে না। তেমনি তা স্বয়ম্ভর (self-supporting ; self-generating) ও ক্রমবর্ধিষ্ণু (cumulative) হয়ে উঠার সুযোগ পাবে না। উন্নয়ন হাসিল করতে হলে একটু বেগে চলতে হবে বৈ কি? এই মতবাদকে উন্নয়নের 'ক্রান্তি বিদূরণ প্রচেষ্টা' (critical minimum effort) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৩]

এই তত্ত্ব অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম একটা ন্যূনতম আকারের হতে হবে। তার নীচে হলে চলবে না। অর্থনীতিতে বিদ্যমান অবিভাজ্যতা ও বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে তোলার জন্য একটা ন্যূনতম প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তাতে আকারের ব্যয়বহুলতা (discconomies of scale) হ্রাস পায়। মূল্যবোধ সহানুভূতীশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে। তেমনি উন্নয়ন পথে কাঁটাস্বরূপ আরও বহু বিঘ্ন অপসারিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। মূলধন সংগঠনের কথা দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। উন্নয়ন কার্যক্রিয়া বন্ধ্যা অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে হলে একটু বড়সড় আকারে লগ্নী ঘটাতে হয়। কাজেই, প্রান্তিক বর্ধন মাধ্যমে কার্য হাসিলের উপায় নেই। তজ্জন্য প্রয়োজন একটা ন্যূনতম লগ্নী ঘটানো। এই ন্যূনতম পরিমাণ নির্ণয় কেবলমাত্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব। সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দিয়ে তা হবার জো নেই। জাতীয় বিনিয়োগ দরকার এবং কোথায় কিভাবে তা ঘটাতে হবে ও তার আকার প্রকৃতি কি হবে ইত্যাদি প্রাসংগিক বিষয়াবলী কেবলমাত্র সরকারের পক্ষেই জানা ও বাস্তবায়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে উন্নত দেশের সাহায্য পাওয়াও একান্ত কাম্য।[৪] তেমনি প্রযুক্তিক সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করা যায়। প্রযুক্তিক বিদ্যা তেমন উন্নত নয়। সত্য কথা, তবে আসল সমস্যা প্রযুক্তিক বিদ্যার

২. B. Higgins রচিত "The Dualistic Theory of Underdeveloped Areas", 1956 দেখুন। এখন থেকে তা Higgins-এর Dualistic Theory বলে উল্লেখ করা হবে।

৩. H. Leibenstein প্রণীত A Theory of Economic-Demographic Development, Princeton University Press, Princeton, 1954, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৪. Higgins-এর "The Dualistic Theory". পৃ: ১১৩

দোষ-ত্রুটির জন্য নয়, বরং তা নেহায়েত নগণ্য বলেই যত গোলমাল।[৫] সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও এই নীতির হোতাবা বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা বলেন, ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হলে অর্থনৈতিক বিষয়াবলীতে যেমন পরিবর্তন দেখা দেবে, তেমনি সামাজিক পরিবেশেও সাড়া পড়ে যাবে এবং আশা করা যায় এই সমস্ত বাধা স্বাভাবিকভাবে শিথিল হয়ে যেতে থাকবে। সত্যিকার বড় কার্যসূচী গ্রহণ করা হলে এবং দরিদ্রদেশগুলোর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করতে থাকলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুকূল হয়ে উঠার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। তজ্জন্য হয়ত সরাসরি নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। অবশ্য কথাটা কেবলমাত্র একটা প্রতিপাদ্য-তার সারবত্তা হয়ত অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে কার্যক্রমের আকার প্রকৃতি ও নিমজ্জিত বা লুক্কায়িত বেকারত্ব বিষয়দ্বয়। কার্যসূচী পরিমাণ মত হলে এবং বিদ্যমান লুক্কায়িত বেকারত্বের কর্ম-সংস্থান সম্ভব হলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া তেমন অসুবিধাজনক হওয়ার কথা নয়।

উন্নয়নকামী বেশ কিছু দেশ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পক্ষপাতি। তাদের উন্নয়নের খাতিরে হয়ত তা অপরিহার্যও বটে। মান্ধাতার আমলের কৃষি-ব্যবস্থা বিদ্যমান অর্থনীতিকে টেনে-হিচড়ে শিল্পোন্নত করে তোলাও আর মুখের চাট্টিখানি কথা নয়। কাজেই, সরাসরি বন্দোবস্ত ছাড়া গত্যন্তর নাই। আবার এমন বহু দেশ আছে যারা ক্রমিক ও বিকেন্দ্রীকৃত নীতিতে বিশ্বাসী। সাম্প্রতিক কালে এই নীতি বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। সেই সব দেশের সরকার শিল্পোন্নয়নে সরাসরি মাঠে নামতে রাজী নয়। তারা বরং শিল্পোন্নয়নে সহায়ক অথচ বেসরকারী প্রচেষ্টা নাজুক এমন সব ক্ষেত্রে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যেমন কৃষি সম্প্রসারণে সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম সাধনে। সামাজিক স্থায়ী খরচা বহনে (**Public overhead Capital**) কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তবা ছোট-খাট অথচ বিক্ষিপ্ত এমন সব হালকা ধরনের শিল্প সংস্থাপনে।

পরিমিত এই নীতি গ্রহণের পেছনে অনেক শক্তিশালী যুক্তিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে। একে একে তা উন্মুক্ত করা যাক। প্রথমে কৃষিক্ষেত্রের কথা ধরা যাক। অনুন্নত প্রায় সব দেশ কৃষি-প্রধান অথচ তা উন্নত নয়। সেকেলে মরচে-পরা নীতি ও কার্যপ্রণালী দিব্বি আসন গেড়ে বসে আছে। লোকগুলো সব

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

খেয়ে-না-খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। অথচ সামান্য প্রচেষ্টাতে হয়ত প্রচুর ফল পাওয়া যেতে পারে। দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। এদিকে. কৃষি দ্রব্যের মারফতেই বিশ্ব-বাজারের সাথে এই সব দেশের যেটুকু সম্পর্ক। সমাজ-কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন বেশ লাভজনক হতে পারে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে দেশ অনেক ফায়দা উঠাতে পারে। অথচ এই সব সংস্থাপনে তেমন একটা খরচ নয়। তেমনি রোগ-শোক নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বৃহত্তর মানবতা জরা-গ্রস্ততার হাত থেকে বাঁচতে পারে।

উন্নয়নে অতীব প্রয়োজনীয় অথচ আকৃতিতে সামাজিক-ধর্মী এমন সব স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারী প্রচেষ্টা উৎসাহী নয়। কেননা এখানে লাভের মাত্রা তেমন লোভনীয় নয়। অথচ উৎপাদন সম্প্রসারণের পথে এগুলো বেশ বড় কাঁটা, কাজেই, এক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাড়াতাড়ি ভারী শিল্প সংস্থাপনে তেমন উৎসাহী হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেন্দ্রীভূত এই সব শিল্প স্থাপনে প্রচুর বাধা বিদ্যমান। তন্মধ্যে সঙ্কীর্ণ বাজার সুবিধা, মূলধন-অপ্রতুলতা, নিপুণ কর্মীর অভাব, প্রশাসনিক সীমা-বদ্ধতা ও উদ্যোক্তার নাজুকতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই সকল বাঁধা ডিঙ্গিয়ে বৃহৎ শিল্প-সংস্থা গড়ে তোলা সহজ-নয়। তাছাড়া, অনেকগুলো দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল বিদ্যমান নেই; তেমনি, উৎপাদনে প্রযোজনীয় বিচিত্র ধরনের সবরকম কাঁচামাল হয়ত এখনো আবিষ্কৃতই হয়নি। কাজেই, উন্নয়ন কর্ম-ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী শিল্প স্থাপনে উৎসাহী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার তুলনায় হালকা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অধিক সহজ। কুটির-শিল্প সংজাত ছোট্ট-খাট্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান অতি সহজে গড়ে তোলা যেতে পারে। এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে সংস্থাপনেও তেমন কোন বাধা নেই। বরং তাতে নাগরিক জীবনের ঘেষাঘেষি অনেকাংশে লাঘব হতে পারে।[৬] কৃষি-দ্রব্য সংজাত শিল্প সংস্থাপনের কথাও এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। চেষ্টা করলে এক্ষেত্রেও অতি সহজ সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। চিনির কল গড়ে তোলা, চাউলের কারখানা স্থাপন,, বনস্পতি জাতীয় শিল্প স্থাপন এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কাজেই, সহজলভ্য উপাদানে নির্ভর করে

---

৬. আলোচনা করে দেখুন, It Aubrey প্রণীত "Small Industry in Economic Development" Social Research, XVIII, সংখ্যা ৩, পৃ: ২৯৭ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)।

ছোট্ট-খাট্ট মাঝারি ধরনের শিল্প স্থাপন অধিক লাভজনক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। এতে ফাউ হিসাবে হয়ত শ্রম-সঞ্চালনজনিত সমস্যারও সমাধান ঘটতে পারে। কেননা, নড়চড় নেই এমন ধর্মী শ্রম কৃষিক্ষেত্রে ও গ্রামাঞ্চলে অধিক বিদ্যমান। কাজেই, তাদের ধারে-কাছে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবে এদের মধ্যে একটু নড়াচড়ার ভাব দেখা দেবে।[৭]

ক্রমিক-নীতি (gradual approach) গ্রহণের আসল যুক্তি অবশ্য অন্যত্র নিহিত। এই নীতির প্রবক্তারা বলেন যে, শিল্পোন্নয়ন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে না। অর্থনীতির অন্যান্য শাখা প্ররোচিত হয়ে তবে তাকে গড়ে তুলে। সুতরাং, অন্যত্র সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তবে শিল্পক্ষেত্রে বর্ধনের প্রশ্ন উঠে। তার আগে নয়। কাজেই, শিল্পোন্নয়নে সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টার কি প্রয়োজন? বরং, প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটানো হউক। তার জন্য প্রয়োজন মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-পদ্ধতি বর্জন করে কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সুসম্পন্ন করে তোলা। তৎউদ্দেশ্যে বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তেমনি সেচ প্রণালী গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া, কৃষিদ্রব্য বিপণীকরণে রাস্তাঘাট নির্মাণ জোরদার করাও দরকার বটে। তাতে উৎপাদন ক্রিয়া যেমন সবল হতে পারে তেমনি গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যে যাতায়াত সহজ হবে।

প্রথম দিকে শিল্প প্রচেষ্টা কৃষিজাতের সম্পূরক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের এক জরিপ দল (Survey mission) ইরাকের জন্য প্রণীত তাঁদের রিপোর্টে এই ধরনের প্রস্তাব করেছেন। তাঁরা প্রথমে রাসায়নিক শিল্প (Chemical Plant) গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের মতে তাহলে সার উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে এবং তার সরবরাহ পর্যাপ্ত হতে পারবে। তাতে কৃষির ফলন অধিক বেড়ে যাবে। তেমনি উক্ত যন্ত্রপাতি-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার জন্যও বুদ্ধি দিয়েছেন। তাহলে সেচকাজে প্রয়োজনীয় পাইপ অতি সহজে পাওয়া যাবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই দল তুলাজাত বস্ত্রশিল্প ও বনস্পতি শিল্প সম্পর্কেও মত ব্যক্ত করেছেন।

কৃষির সম্পূরক হিসাবে সূচিত হয়ে ধীরে ধীরে শিল্পোন্নয়ন অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। কৃষি আয় বাড়ছে, সুতরাং কৃষিজীবী অধিক ব্যয়

---

৭. কাঁচামাল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন Charlotte Lebuscher প্রণীত The Processing of Colonial Raw Materials, H. M. S. O., লণ্ডন, ১৯৫১।

করার সুযোগ পাবে। প্রবণতাও জন্মাবে। স্বাভাবিকভাবে সে উৎপন্ন দ্রব্য পাইতে চাইবে। তাতে শিল্প উৎসারিত দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাবে। পরিণামে মূলধনী সম্পদ উৎপাদন-স্পৃহা উদ্ভুত চাহিদার মাধ্যমে আরও তীব্রতর হবে।

পরিশিষ্ট 'খ'তে কার্যক্রম ও পদ্ধতি সম্পর্কীয় বিস্তৃত প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রস্তাব থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, দরিদ্র দেশে কত বিচিত্র রকম কার্যপ্রণালী সক্রিয় রয়েছে। লাতিন আমেরিকা, নিকট-প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ, আফ্রিকার অংশ বিশেষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতকাংশ ক্রমিক-নীতির অনুসারী। এই সব দেশের সরকারী বিনিয়োগ-প্রকল্প সাকুল্য প্রকল্পের সামান্য অংশমাত্র। উদাহরণ দেয়া যাক, সিংহল তার ষষ্ঠ বার্ষিকী (১৯৫১ থেকে ১৯৫৭) পরিকল্পনায় মাত্র ৬ শতাংশ মাধ্যমিক শিল্পোন্নয়নে বরাদ্দ করেছিল। অগ্রাধিকার দিয়েছিল কাঁচামাল পাওয়া যায় এমন সব শিল্প গড়ে তুলতে এবং কৃষি-ফলন বাড়াবার মত শিল্প স্থাপনে। ভারতের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫১ থেকে ১৯৫৬) মাত্র ৮ ভাগ দেয়া হয়েছিল শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে আর তার অর্ধেকটা ছিল একটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য বরাদ্দকৃত। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য তা বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। খণিজ শিল্পকে তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়। পাকিস্তান এদিক থেকে অবশ্য একটু সাহসের মনোভাব দেখিয়েছে। সে তার ষষ্ঠ-বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে (১৯৫১ থেকে ১৯৫৭) শিল্পখাতে প্রায় ২০ ভাগ খরচ বরাদ্দ করেছিল। স্ব-শাসিত নয় আফ্রিকার এমন সব দেশগুলোতে বেসরকারী প্রচেষ্টায় অধিক জোর দেওয়া হয়। শিল্পোন্নয়ন সরকারী কাজ নয় এই মতবাদের তারা বিশ্বাসী। আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলোতেও চিন্তাধারা মোটামুটি অনুরূপ। তুরস্ক বেসরকারী খাতকে অধিক অনুপ্রেরণা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। সেথায়, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কৃষির অবদান ছিল ৫৭ শতাংশ আর শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ৯ শতাংশ।[৮] সুতরাং বলা যায়, ঐ সকল দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে কৃষি, যানবাহন, বিদ্যুৎ ও সমাজসেবা খাতে অধিক জোর প্রদান করেছে। সেই তুলনায় শিল্প খাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

৮. দেখুন, জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগ প্রকাশিত **Process and Problems of Industrialization in Under-Developed Countries, New York,** ১৯৫৫ সাল, পৃঃ সংখ্যা ৭১-৭২।

এই সকল পরিকল্পনার সার্থকতা নিয়ে এক্ষণে তেমন উচ্চ-বাচ্য করার সুযোগ নেই। সময়ের ব্যবধানে তাদের গুনাগুণ জানা যাবে। তবে ধীরে-সুস্থে, রয়ে-সয়ে, দেখে-শুনে এগিয়ে যাওয়া নীতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম নীতি অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে হয়। কৃষিক্ষেত্রে অধিক মনোনিবেশ করার ফলে জাতীয় আয় যেমন বেড়ে যাবে তেমনি বণ্টন পন্থাও অধিক সুষম হবে। কেননা বর্ধনজনিত আয় তাদের হাতে যাবে যাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। অন্যদিকে ক্রমিক নীতি তেমন মুদ্রাস্ফীতিজনক নয়। শিল্পোন্নয়নে মূলধন-পরিশোষণ জনিত সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। হয়তবা কাঁচামালে স্বল্পতা দেখা দেবে। ক্ষেত্র বিশেষ হয়ত খাদ্যদ্রব্য-সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা সার্বিক না হয়ে ছোট-খাট আকারে হলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তেমন বিষম অবস্থার সৃষ্টি হবে না। সর্বত্র ওলট-পালট ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে না।

শ্লথগতি-সম্পন্ন উন্নয়ন নীতি গ্রহণে অপর সুবিধা এই যে, অগত্যা তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে অবস্থা তেমন অসহনীয় পর্যায়ে উঠবে না। কৃষি-খাতে হয়ত বর্ধন হল। শিল্পখাতে তেমনটা হল না। এদিকে লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেল। ফলে হয়ত মাথাপিছু আয় 'যথা পূর্বং তথা পরং' রইল। কিন্তু, বড় আকারের শিল্পোন্নয়ন কর্ম-সূচী ব্যর্থ হয়ে গেলে অবস্থা কাহিল হয়ে উঠতে বাধ্য। কেননা, মানুষের জীবনযাত্রায় বড় রকমের ওলট-পালট দেখা দেবে। তেমনি কষ্টের মাত্রা অপরীসীম হয়ে উঠবে। সাধারণ মানুষ তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবে। এই তিক্ততার পরিণাম হয়ত ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। মন্থরগতিসম্পন্ন উন্নয়ন প্রকল্প "অপচয়মূলক উৎপাদন" (**Conspicuous Production**) রহিত করতে পারে। অন্যদিকে, ব্যাপক-ভিত্তিক কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা হয়ত প্রচারধর্মী ও প্রদর্শনী মনোভাবসম্পন্ন উৎপাদন জোরদার করতে পারে। ফলে, অপচয় মাত্রা অধিক হতে বাধ্য। কেননা জাঁকজমকপূর্ণ প্রকল্পে কাজের চেয়ে প্রচারণা বেশী হয়। তাছাড়া এই জাতীয় পরিকল্পনা একটা কৃত্রিম চরিত্রের হয়। ছোট ছোট শিল্প সংস্থার বিনিময়ে গড়ে উঠে বিশালাকার চমকপ্রদ প্রকল্পসমূহ। এগুলো পরে বজায় রাখা এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সর্বশেষ কথা, কৃষিক্ষেত্রে জোর প্রদান-কারী কার্যক্রম আপেক্ষিক উৎপাদন খরচা তত্ত্বের সমধর্মী। এই তত্ত্বের অনুসারী হয়ে উঠার ফলে ধীরগতিতে অথচ নিশ্চিতভাবে শিল্পক্ষেত্রে প্রেরণা

যুগিয়ে চলা যেতে পারে। ফলে শিল্পোন্নয়ন আন্তর্জাতিক খায়-খরচার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাভাবিক গতিতে এগুতে সক্ষম হয়।

'ধীরে চল নীতি' গ্রহণে সরকারের উপরও তেমন চাপ পড়ে না। সর্বক্ষেত্র জুড়ে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না। অথচ ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন নীতি গৃহিত হলে সরকারকে সর্বত্র নজর দিতে হয়। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। বাজার-পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে চলে না। বেসরকারী প্রচেষ্টায় তেমন আস্থা রাখা যায় না। ফলে, সরকারী হাত সর্বত্র বিস্তৃত করতে হয়। বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করতে হয়। শিল্প-সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনায় সরাসরি অংশ নিতে হয়। হয়ত রাশিয়ায় প্রচলিত নীতির দ্বারস্থ হতে হয় অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থার সৃষ্টি করতে হয়। কর্মসূচীর সর্বত্র রব তুলতে হয় "জাতীয়করণ কর, আধুনিক করে তোল, রক্ষা কর ও বাড়িয়ে চল।"

'ধীরে চল নীতি'তে তেমনটা করা প্রয়োজন হয় না। সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে গেলেই চলে। উপদেশ, নির্দেশ, অনুপ্রেরণা ও ক্ষেত্রবিশেষে একটু শক্তভাব, বাস্—কর্মসিদ্ধির জন্য হয়ত ইহাই যথেষ্ট। পরিকল্পনার আকার-প্রকার ও আঙ্গিক নির্ণয় করে দেওয়া। সীমারেখা টেনে দেওয়া, বিনিয়োগ পরিবেশ অনুকূল করে তোলা ইত্যাদি কাজে সরকারী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখলেই চলে। তাতে প্রশাসনিক ঝামেলায় পড়তে হয় না। কষ্টকর ও বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয় না। মারাত্মক রকম ভুলের মাসুল যোগাতে হয় না। অগণতান্ত্রিক নীতির কুক্ষিগত হতে হয় না। অথচ কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় এই সবের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। দেশ দরিদ্র, সরকারী ভুলের মাসুল যোগাবার ক্ষমতা তার নেই। ধনী দেশ হয়ত সামাল দিতে পারে। কিন্তু, দরিদ্রদেশে তা ঘটলে আর রক্ষে নেই। তাতে উন্নয়ন সমস্যা আরও তীব্রতর আকার ধারণ করতে পারে।

অবশ্য এইটুকু মনে রাখতে হবে যে, উন্নয়ন কার্য ক্রিয়ার সূচনা ঘটানো বেশ শক্ত কাজ। মিন্‌মিনিয়ে আর রয়ে-সয়ে এগিয়ে তা সূত্রপাত ঘটানো হয়ত সহজ নয়। কাজেই, গোড়ার দিকে কিছুটা জোরাজুরি ও চাপাচাপি অবস্থা হয়ত মেনে নিতে হবে। কিন্তু, আস্তে আস্তে রজ্জু হাল্কা করে নিতে হবে। রাশ কষে অথচ যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এগুতে হবে। তাতে সময়ের ব্যস্ত-পরিসরে উন্নয়ন-ক্রিয়া বলশালীও হওয়ার

সুযোগ পাবে। তেমনি উন্নয়ন স্বয়ম্ভর ও পুনরাবৃত্তিধর্মী হয়ে উঠার সুবিধা পাবে।

উপরোক্ত আলোচনাকে সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কোন বিশেষ দেশের বেলায় কোথায় রেখা টানতে হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী খাতের সীমারেখা টানায় প্রত্যেকটি দেশকে নিজের বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এগুতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে নিতে হবে। উদ্দেশ্য সামনে রাখতে হবে। উন্নয়ন-ধাবা ও গতি বিবেচনায় নিতে হবে। দেশে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা নীতি গ্রহণের অনুসারী হতে হবে। অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী খাতের সীমা নির্দেশ করায় এই সমস্ত বিষয়াবলী অন্তরীত হতে হবে। ভারত-পাকিস্তানের কাহিণী দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যায়। ভারত তার উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নে আস্তে আস্তে "সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থায়" এগিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। তদনুসারে সে সরকারী প্রচেষ্টায় ১৭টি মৌলিক শিল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান তার সাম্প্রতিক পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগে অধিক জোর প্রদান করেছে আর নিজের জন্য বেছে নিয়েছে ঐ সমস্ত শিল্পক্ষেত্র যেথায় বেসরকারী প্রচেষ্টা কার্যকরী বা উদ্যমশীল নয় এবং এই নীতি গ্রহণেও পরিষ্কার করে নিয়েছে যে, যত শীগ্গির সম্ভব এই সমস্ত শিল্প সংস্থা ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরিত করে দেওয়া হবে।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সমাজসেবামূলক কাজগুলো (Social Services) সরকারকে অবশ্যই সাধন করতে হয়। দরিদ্রদেশে তা বরং আরও তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ও জনস্বাস্থ্য সবল করে তোলা উন্নয়ন অন্তরায় দূরীকরণে সহায়ক হিসাবে কাজ করে। জনসাধারণের দুর্বলতা কাটিয়ে তোলে। ভৌগোলিক ও পেশাগত সঞ্চরণ সহজ করে তোলে। উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। উদ্যোগ প্রচেষ্টা সবল ও সপুষ্ট করে দেয়। এক কথায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ জনসম্পদ উন্নয়নের নামান্তর! এই উভয় খাতে উন্নতির ফলে উৎপাদন-উপকরণ হিসাবে জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায়।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে শিক্ষা এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এই সম্পর্কে সবায় একমত। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইরাকের উপর প্রণীত তার রিপোর্টে শিক্ষার উপর বিশেষ জোর প্রদান করেছে। ১৫ বৎসরের মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে তোলার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষা কর্মসূচী জোরদার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। তেমনি নাইজিরিয়া সম্পর্কে ব্যাঙ্ক বলেছে শিক্ষা কর্মসূচী যেন আরও বেগবান-বিস্তৃত ও প্রযুক্তিক-ধর্মী করে তোলা হয়। ব্যাঙ্কের মতে প্রকৌশলীক ও প্রযুক্তিক শিক্ষার পরিবর্তিত চিন্তাধারা গড়ে তোলা প্রয়োজন। গবেষণা কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যও ব্যাঙ্ক অভিমত প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কৃষি, পশুপালন ও বর্ণ-শিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজে অধিক দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

জনশিক্ষা নিয়ে দ্বিমত দেখা দেওয়ার কারণ নেই। তবে পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে বটে। শিক্ষা বলতে কেবল অক্ষর জ্ঞান বোঝালে চলবে না। তারাও অনেক বেশী হতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম অনুধাবন ও বাস্তবায়ন সোজা কথা নয়। বিদ্যা দিয়ে তা বুঝতে হবে। সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উন্নয়ন-ধর্মী মতবাদ পরিচিত করে তুলতে হবে। দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কারিগরি বিদ্যা শিখাতে হবে। নব নব পন্থা ও উন্মোষণী বুদ্ধি গ্রহণ করে যেতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দরিদ্রদেশের জ্বালা কম নয়। ঘাটে ঘাটে তার হাজারো জট। জট হটানো মুখের চাট্টিখানি কথা নয়। প্রাথমিক পর্ব থেকে আদি পর্ব নাগাদ শিক্ষার সর্বস্তরে বাধা-বিপত্তি ছড়িয়ে আছে। অগ্রাধিকার বেছে নিয়ে এগুতে হবে। সর্বব্যাপী নির্ণায়ক ঠিক করে নিয়ে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। কোথায় টাকা খরচ করলে অধিক ফলন দেবে সেই মানদণ্ড যাচাই করে নিয়ে উপযুক্তক্ষেত্রে শিক্ষা সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করতে হবে। শিক্ষা-জনশক্তিকে জোরদার করে বটে। কিন্তু, তাতে শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম কিছুটা ব্যহত হয়। অর্থাৎ বস্তুগত উন্নয়ন ক্রিয়া-কর্ম কিছুটা বিঘ্নিত হয়। কাজেই বিনিয়োগ প্রচেষ্টা এক ক্ষেত্রে ঘটালে অন্যক্ষেত্রে কিছুটা দুর্ভোগের ভাগী হয়। কাজেই তাদের মধ্যে বিনিয়োগে উৎপাদনশীলতা লক্ষ্য রেখে তবে এগুতে হয়। জাতি-পুঞ্জের মতের সাথে অনেকে হয়ত সাড়া দিতে পারে। জাতিপুঞ্জ বলে,

"প্রায় প্রত্যেকটি দরিদ্রদেশে জন-শক্তিতে বিনিয়োগ বেশ লাভজনক। সম্পদ উন্নয়ন অপেক্ষা তা ন্যূন হওয়ার কোন রীতিসিদ্ধ কারণ দেখি না। অনেকক্ষেত্রে হয়ত জন-শক্তিতে বিনিয়োগ সম্পদে বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক লাভজনক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। জনশক্তিতে খরচ বাড়াবার ফলে হয়ত দ্রব্য ও কর্মাবলীর গতিধারা তীব্রতর ও বলশালী হতে পারে। সম্পদে বিনিয়োগ হয়ত তেমনটা নাও হতে পারে।[৯]

শিক্ষাখাতে বিনিয়োগে তিনটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, কৃষি সম্প্রসারণ কাজ বলশালী করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প কাজে নিপুণতা ও দক্ষতা লাভের ট্রেনিং প্রদানে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় এবং তৃতীয়তঃ, প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানীয় দক্ষতা অর্জনে অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। অধিকাংশ দরিদ্রদেশ কৃষি-প্রধান। কৃষি কাজের উন্নতি মানে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য বর্ধন সাধন করা। কাজেই ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত কৃষি-গবেষণা ও কৃষি-সম্প্রসারণ কাজে অধিক মনোনিবেশ করা গেলে অচিরে আশাতীত ফললাভ সম্ভব হতে পারে। জাতিপুঞ্জ কৃষি-সম্প্রসারণ কাজে ব্যয়ের মাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছে, জাতীয় আয়ের প্রায় এক শতাংশ প্রতি বৎসর এ কাজে ব্যয় করা উচিত।"[১০]

দক্ষ শ্রমিকদল গঠন করে তোলা শিল্প সম্প্রসারণের এক প্রধান সোপান। শিল্পোন্নয়নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়। গোড়ার দিকে নানা আকৃতি-প্রকৃতি নিপুণতার প্রয়োজন তেমনটা বোধ হয় না বটে। কিন্তু শিল্প-নক্সা বিস্তৃত ও চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠার সাথে সাথে এই প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়। প্রতিধাপে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করতে হয়। কায়িক পরিশ্রমী থেকে প্রকৌশলিক অবধি সবায়কে কর্মোপযোগী ট্রেনিং দিতে হয়। জাতীয় আয়ে শিল্প আয় বেড়ে যাওয়ার ফলে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম দেখা দেয়। এই উদ্বৃত্ত শিল্পকে শিল্পখাতে ঢুকিয়ে নিতে হয়। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে তদনুরূপ করে গড়ে তুলতে হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রমকে শিল্পক্ষেত্রে টেনে

---

৯. জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Measure for the Economic Development of Under-Developed Countries, New York, ১৯৫১ সাল. পৃ: ৫২।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

আনতে হয়। তা না হলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এবং গ্রামাঞ্চলে বেকারী বেড়ে যেতে পারে। কাজেই উর্বাহ্ গতিশীলতা (vertical mobility) ত্বরান্বিত করা একান্ত আবশ্যকীয়।

অবশ্য কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রম উঠিয়ে আনা মুখের চাট্টিখানি কথা নয়। কেবল প্রশিক্ষণক্ষেত্র প্রসারিত করেই তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। পরিচিত পরিবেশ ও কর্মপন্থা বেড়ে অপরিচিত ও অধিকতর শক্ত কাজে শ্রমিক পা বাড়াতে চাইবে না। তজ্জন্য তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। তার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। সামাজিক মনোভাব ও সাংস্কৃতিক ছাঁচ নূতন করে ঢালাই করতে হবে।[১১] তবে সে পরিচিত গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াতে উৎসাহ বোধ করবে। M. Nash তাঁর বইতে এই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা বাতলেছেন। তিনি বলেছেন :

কৃষি সমাজ-ব্যবস্থা থেকে শ্রমিক উঠিয়ে আনা বেশ শক্ত কাজ। নিয়মিত, দক্ষ অথচ নূতন কাজ শিখতে উৎসাহী মজুরীভিত্তিক শ্রম পেতে হলে এবং কাজে বহাল রাখতে হলে,

(১) মজুরী অধিক হতে হবে, তা গ্রামাঞ্চলে পাওয়া মজুরী অপেক্ষা অনেক বেশী হতে হবে।

(২) এই অধিক মজুরী খরচ করার উপযুক্ত সুযোগ থাকতে হবে এবং পরিচিত হলে ভাল হয়;

(৩) কর্মপ্রণালী ও ট্রেনিং ব্যবস্থা তার কাছে গ্রহণীয় হতে হবে। তার উপরে মাতবরী তার কাছে সহনশীল হতে হবে এবং উৎপাদন প্রথা ও মান তার কাছে পেশাগত পরিবর্তনে যেন বিষম না হয়, অর্থাৎ তার পেশাগত পরিবর্তন যেন সহজ হয় :

(৪) নূতন সম্পর্ক সংস্থাপন যেন সহজ হয় এবং তা যেন বন্ধুত্বের বাধন হয় ;

(৫) শ্রম-সংস্থা যেন গড়ে উঠতে পারে এবং তা যেন কর্ম-প্রথায় কিছুটা কর্তৃত্ব পায় ;

(৬) কাজ-কর্মের বাইরে যেন শ্রমিক হাঁক ছেড়ে বাঁচার সুযোগ পায়। যেন প্রতিষ্ঠানগত-নক্সা স্থিতিশীল হয় যাতে শ্রমিক মোটামুটি শান্ত

---

১১. দেখুন **M. Nash** প্রণীত **"The Recruitment of Wage Labour and Development of New Skills" The Annals, May, 1956.** পৃ: ২৩ ; **W. E. Moore** রচিত **Industrialization and Labour, Cornell University Press, Ilnaca,** ১৯৫১।

পরিবেশে বসবাস করতে পারে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে পারে। তাতে করে তারমধ্যে সন্তুষ্টি বিরাজ করতে পারবে এবং সে কাজের মধ্যে অর্থ খুঁজে পাবে ও স্বকীয়-সত্ত্বা বিকাশের সুযোগ পাবে।

(৭) সমাজের অন্য সবার সাথে যেন তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। সে যেন সবাকার মধ্যে একজন হয়ে বাঁচতে পারে;

(৮) অধিক মজুরী পাওয়ায় তা খরচ করার যেন নব নব পথ পায়। তার মধ্যে যেন নব্যচাহিদার স্ফুরণ ঘটে এবং মুদ্রা-ভিত্তিক লেনদেনের সুযোগ পায়। কর্মে টিকে থাকার অনুপ্রেরণা হিসাবে তাকে যেন সামাজিক ও চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান করা হয়।[১২]

শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়া দরকার। সাধারণ শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া উচিত। তাতে দক্ষ শ্রমিক-দল গড়ে তোলা সহজ হয় এবং ট্রেনিং প্রদান তেমন কঠিন বলে প্রতিপন্ন হয় না। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন সহজ ব্যাপার নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ বেশ সময়সাপেক্ষ সমস্যা। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলায় বেশ সময়ের প্রয়োজন। উন্নয়ন-কার্য তার জন্য বসিয়ে রাখা যায় না। কাজেই, কার্যসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিসরে বৃত্তি-শিক্ষা দান ত্বরান্বিত করতে হবে। তেমনি সময়োপযোগী ও কার্যানুগ প্রশিক্ষণ-প্রণালী প্রণয়ন করে হাতে-কলমে শিক্ষার জোর দিতে হবে। বর্তমান সমস্যার সমাধান দিতে হবে। তবেই উন্নয়ন-কার্যক্রম এগিয়ে যেতে পারবে। অত্যাবশ্যকীয় দক্ষ কারিগরি দল তাড়াতাড়ি সৃষ্টি করে নিতে হবে। অতঃপর দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করতে হবে। শিক্ষার পরিসর ব্যপ্ত করতে হবে। সাধারণ-শিক্ষা ও কারিগরি-শিক্ষায় যোগসূত্র টানতে হবে। পেশাগত বিদ্যা ও ট্রেনিং-প্রণালী বিস্তৃত ও জোরদার করতে হবে।

দরিদ্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক মজার ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। সাধারণ শিক্ষার একটা পর্যায় অতিক্রম করে সবায় "শ্বেত-কলার" পেশা গ্রহণে আগ্রহী হয়। সবায় চায় "সম্মানাই পেশা" (Prestige occup. ation)। ফলে এই সকল ক্ষেত্রে অচিরে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। বাধ্য

১২. M. Nash-এর প্রাগুপ্ত বই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯-৩০।

হয়ে এই সকল বুদ্ধিজীবীদেরকে নানারকম উলটা-পালটা, ছোট-খাট কাজে ব্যাপৃত হতে হয়। ফলে, তারা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ। নানারকম বিদঘুটে জটলা পাকিয়ে তোলে। সুতরাং, মসিজীবী সৃষ্টিতে যেন বেশী জোর না দেওয়া হয়। কাজেই কারিগরি ক্ষেত্রেও সমান দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বরং উভয়-ক্ষেত্রে একটা সন্তোষজনক সমঝোতা সাধনের চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষাখাতে জোর দেওয়ার তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশাসনিক সংক্রান্ত শিক্ষা বলশালী করা। প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন একান্ত আবশ্যকীয়। সুতরাং, দক্ষ প্রশাসকদল গড়ে তোলায় দৃষ্টি দিতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন বেশ জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ। তা বাস্তবায়ন আরও কঠিন। কাজেই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সুষ্ঠু হতে হলে চাই শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদল। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব চাই। চাই সমস্যা অনুধাবন-ক্ষম প্রশাসক। চাই শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাপন ও পরিচালনার জন্য দক্ষ কার্য-নির্বাহক। উন্নয়ন ক্রিয়া-কর্মে সূচনা ঘটাতে হবে। এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নব নব উন্মোষণী বুদ্ধি অন্তরিত করতে হবে। কর্ম-প্রণালী জটিল আকার ধারণ করতে থাকবে। প্রয়োজন পড়বে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন কার্যনির্বাহক, সমণ্বয়-সাধক ও সংযোগ রক্ষাকারী কর্মচারীবৃন্দ।[১৩] যথাসময়ে ও যথা পরিমাণে উপযুক্ত কর্মীদল সরবরাহ না করা গেলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে। বাধা সৃষ্টি হবে। চলৎশক্তি রহিত হয়ে উঠবে। নির্বাহী কর্মীদল সৃষ্টি অধিক কষ্টকর। তেমনি ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ অথচ কার্যনির্বাহে সক্ষম কর্মীশ্রেণী গড়ে তোলা বেশ শক্ত কাজ। সুতরাং, শিক্ষা পদ্ধতি এমনি হতে হবে যেন উপরোক্ত বিষয়াবলী বিধৃত করে নিয়ে এগুতে পারে। শিক্ষা যেন মানুষকে ব্যক্তিত্বশীল ও স্বকীয় সত্ত্বায় বিশ্বাসী করে তুলতে পারে। শিক্ষা যেন কার্যনির্বাহকে নব নব উন্মোষণী শক্তি পরিচালিত হতে প্রেরণা যোগাতে পারে। শিক্ষা যেন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম করে তুলতে পারে। প্রশাসনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত

---

১৩. দেখুন, যথা F. Harbison প্রণীত Entreprusieal Organization as a Factor in Economic Development, Quarterly journal of Economics Lxx, No. ৩, পৃঃ ৩৬৪-৩৭৯ (May, 1956)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কর্মীকে মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

এবারে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কিছু বলা যাক। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন সরকারী দৃষ্টি প্রয়োজন, তেমনি জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও সরকারকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। শ্রমিক-দক্ষতা বর্ধনে জন-স্বাস্থের অবদান বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজেই রোগ-শোকের প্রকোপ কাটিয়ে তোলায় যত্নবান হতে হবে। খাওয়া-পরা উন্নত করায় দৃষ্টি দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ধাইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা-সম্প্রসারণ কর্মীদল গড়ে তুলতে হবে। জলাবদ্ধতা ও মশকবর্ধনকারী দুষিত আবহাওয়া সারিয়ে নিতে হবে। শুদ্ধ পানীয় জলের সুগম ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থান ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে নিতে হবে। বস্তি যেন গড়ে উঠতে না পারে। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা যথাযোগ্য করে তুলতে হবে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রথা সুষ্ঠু হলে শ্রম উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায়। শ্রমিক দক্ষ ও কর্মঠ হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বটে। গণ-স্বাস্থ্যে উন্নতির ফলে মৃত্যুহার বিশেষভাবে কমে যেতে পারে। কাজেই লোকসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় মাথাপিছু আয়ে বর্ধন প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। অবশ্য জন্ম হারে পর্যাপ্ত পরিমাণ হ্রাস ঘটানো সম্ভব হলে লোকসংখ্যা বর্ধনজনিত সমস্যা হয়ত তেমন তীব্র নাও হতে পারে। অন্যথায় তা বেশ প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে।

জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করতে হলে উন্নয়ন কর্মক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। কেননা, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান এই শিক্ষা দেয় যে উন্নয়ন শিল্প ও নগরভিত্তিক হয়ে উঠলে জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ, শিল্প ও নাগরিক পরিবেশ জন্মহারে রোধনী-শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে।[১৪]

---

১৪. Notestein এই মত পোষণ করেন। Kingsley Davis তা তেমন মানতে রাজী নন। পরিশিষ্ট "ক" আলোচনা করুন।

অবশ্য তা বেশ শ্লথ-গতিসম্পন্ন প্রভাব। তা দিয়ে দরিদ্রদেশে তেমন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য। কেননা, ইতিমধ্যেই ঐসব দেশ জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। এদিকে সন্তানোৎপাদী গ্রুপে ঘনত্ব অধিক। ফলে জমি একেবারে উন্মুক্ত। শনৈঃ শনৈঃ বর্ধন-সেত ডাল-ভাত গরীব দেশে। কাজেই জন্মহার বেশ ঊর্ধ্বে। সুতরাং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে পবিবর্তনজনিত হ্রাস-মাত্রা তেমন উল্লেখযোগ্য হওয়ার সুযোগ কই। ইতিহাস এই কথাও বলে যে, উন্নতির প্রথম দিকে লোকসংখ্যা বরং বেড়েই যেতে থাকে। অর্থাৎ উন্নয়ন অগ্রসরের গোড়ার দিকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য লোকসংখ্যা বর্ধনের প্রবণতাই অধিক পরিলক্ষিত হয়। জন-নির্গম অধিক হওয়ার সম্ভাবনাও আজ আর বিদ্যমান নেই। কোন দেশই জনাগম চায় না। তাছাড়া, জন-নির্গম বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তদুপবি প্রবাসনে যেতে চায় কেবল তাঁরাই যাঁরা অধিক উদ্যোগী। অথচ দরিদ্র দেশে এদের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। কাজেই, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পন্থা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে জন্ম ও মৃত্যুহারে সামঞ্জস্য টানতে হবে এবং "জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ"-এর কবল হতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

উর্বরা শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্যে উন্নয়ন সাধিত করতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা মাধ্যমে প্রজনন-শক্তি রহিত করতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের সারকথা মেনে নিয়ে দেশ ও কাল ভেদে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে এবং পরামর্শালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সোজা কথায়, জন্মনিয়ন্ত্রণ সবাকার দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে।

এতক্ষণ কিন্তু কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণের আঙ্গিকগত দিক নিয়ে আলোচনা হল। আঙ্গিকগত সমস্যা জটিল বটে। সন্দেহ নেই, কিন্তু, তার তুলনায়, বৈধ (legal) নৈতিক ও সামাজিক দিক আরও জটিল। জন্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যার আসলে এইসব দিকই অধিকতর কুটিল। চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা ও প্রচলিত মূল্যবোধ জন্মনিয়ন্ত্রণের নাম শুনে আতকে উঠে; 'তৌবা, আস্তাগফেরুল্লাহ' বলে লাফিয়ে উঠে। এই অবস্থায় সমাজে তা গ্রহণীয় করে তোলা মুখের কথা নয়। গবেষণা চালিয়ে, বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে, বাইবের পাণ্ডিত্য সাহায্য নিয়ে হয়ত উপযুক্ত পন্থা খুঁজ করে

বের করা গেল। কিন্তু, তাই কি সব? বরং বলব তা আসল কাজের এক তৃতীয়াংশেরও কম। 'নাহার দিচ্ছে আল্লায়, আহারও দিব আল্লায়'; বিশ্বাসী সমাজকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনানো আর অরণ্যে রোদন করা ও উলুবনে মুক্তা ছড়ানোতে তফাৎ কোথায়? দৃষ্টিভঙ্গি ঋজুভাবে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সরাসরি সামাজিক মূল্যবোধে আঘাত হানতে হবে। পরিবার-পরিকল্পনা শিক্ষাপদ্ধতির অনুসারী করে নিতে হবে। শিক্ষা-মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা সরকারী নীতির অঙ্গীভূত হতে হবে। সরকারী বক্তব্যে তা পরিষ্কার ফুটে উঠতে হবে যে উন্নয়ন-অগ্রসরতা ত্বরান্বিত করার জন্য পরিবার-পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যকীয়।

এই দিক থেকে ভারত হয়ত পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে পারে। চিরায়িত কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ যে সম্ভব তার দিকদিশারী হিসাবে ভারত পথ নির্দেশ করতে পারে।[১৫] ভারত সরকার ইতিমধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য মেনে নিয়েছে। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থাকে তার সাহায্য-হস্ত সম্প্রসারিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। সাধারণ নীতি হিসাবে ভারত সরকার তার প্রথম পঞ্চ-বর্ষীয় পরিকল্পনায় বলেছে :—

সুতরাং, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণে পরিবার-পরিকল্পনা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ... বন্ধ্যাত্বকরণ সরকারী দায়িত্ব হওয়া উচিত। তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা ও পদ্ধতি নির্বাচন সরকারী কর্তব্য বলে পরিগণিত হওয়া বাঞ্চনীয়। .... গবেষণা ও তথ্য-কেন্দ্র সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কাম্য। এই সকল কেন্দ্র বিধিবদ্ধ কর্তব্য সম্পন্ন করতে দায়ী থাকবে। তন্মধ্যে জোর দিতে হবে। (১) জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা ও পদ্ধতি বিষয়ে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সূত্র থেকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সংগ্রহ করে তা জনসাধারণ্যে প্রচার করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সঠিক খবর পরিবেশিত হয়। ভুয়া খবর ও ভ্রান্ত ধারণার বিষ যেন ছড়িয়ে না পড়ে। অগত্যা কোথায়ও ছড়িয়ে গেলে তা রোধ করার উপযুক্ত ও কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে হবে; (২) দেশের সর্বশ্রেণীর সার্বিক মঙ্গলে আসে এমন কার্যকরী

---

১৫. দেখুন, যথা—kingsley Davis প্রণীত "Social and Demographic Aspects of Economic Development in India" in Economic Growth, Brazil, India, Japan, Duke University Press, 1955, পৃঃ ২৯১।

নিরাপদ অথচ সুলভ জন্মনিয়ন্ত্রণ-পন্থা গবেষণা মাধ্যমে বের করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নির্ধারিত পন্থা কাজে লাগাবার মত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী যেন স্বদেশের কাঁচামালে তৈয়ার করা যায় তার পথ বাতলাতে হবে।[১৬]

৩. জনকাম্য (Public Utilities)

জনকল্যাণমূলক কাজ সরকারী দায়িত্ব হওয়া উচিত। উন্নয়ন অগ্রসরে প্রথম সোপান অথচ বিশেষ কারো মাথাব্যথা নয়, সুতরাং সেই সব ক্ষেত্র পর্যটনেও কেউ উৎসাহী নয়, এমন সব জনকাম্য সরকারী ক্রিয়াকর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই পর্যায়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন জল সরবরাহ, সংরক্ষণ কার্যাবলী ইত্যাদি। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, রেলপথ স্থাপন, টেলিযোগাযোগ স্থাপন মাধ্যমে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থ্য সুষ্ঠু করে নিতে হয় এবং কেবল তা হওয়ার পরই উন্নয়ন কার্যক্রমের পাকা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা সম্ভব হয়। স্থায়ী-খরচাজনিত মূলধনী সম্পদ (Publik overhead capital)-এর অভাবে অনেক জন-কাম্য কাজ এগিয়ে যাওয়া যায় না। তজ্জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। Colonial Development Corproation-এর উক্তিতে কথাটার প্রতিপাদ্য যাচাই করা যাক। এই করপোরেশন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলোর উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত। করপোরেশনের মতে “উপনিবেশ কেবল ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির করলেই চলে না। অনেকক্ষেত্রে এগুলো নীচে নামাবার জন্য জেটি তৈরী করে নিতে হয়। গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হয়ত রাস্তা তৈরী করতে হয়। এইসব যন্ত্রপাতি বজায় কর্মোপযোগী রাখার জন্য হয়ত কারখানা পর্যন্ত স্থাপন করতে হয়। শুধু তাই নয়, কর্মচারীদের জন্য ঘর-বাড়ী বানিয়ে দিতে হয়। .... তর্কের ঝুঁকি না নিয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজে যা খরচ করতে হয় পরিণামে দেখা যায় যে, তা প্রায় প্রকল্প বাস্তবায়নের খরচের সমান। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষ এই জাতীয় উপসর্গ মিটিয়ে প্রকল্প খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়।”[১৭]

---

১৬. প্রথম পঞ্চ-বর্ষীয় পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা, ভারত সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, দিল্লী, ১৯৫১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৬-২০৭।

১৭. Colonial Development Corporation Report and Accounts for 1948, H. M. S. O. লণ্ডন, ২১শে জুন, ১৯৪৯ সাল, পৃ: ১০।

সে যাই হউক, ভিত্তি ছাড়া যে এগুবার জো নেই। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভিত্তিমূল হচ্ছে জনকাম্য প্রকল্পসমূহ। এগুলো কার্যে পরিণত করে তবে আসল উন্নয়ন-অগ্রগতির কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। তার আগে নয়। অথচ এগুলোর ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগ তেমন উৎসাহী নয়। বেশ বড়-সড় প্রকল্প এগুলো। প্রচুর লগ্নি করতে হয়। সাত-তাড়াতাড়ি মুনাফা পাওয়ার জো নেই। অথচ ঝুঁকি আছে যথেষ্ট। তাছাড়া, সরাসরি ফায়দা উঠাবার জো নেই। অন্য আরও কিছু বিনিয়োগ ঘটিয়ে তবে লাভালাভের ভাগ পাওয়া যায়। সর্বোপরি লাভের ভাগ পাওয়ার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়। এই সকল কারণে বেসরকারী প্রচেষ্টা বেশ নাজুক হতে দেখা যায়। কাজেই, সরকারকে অনেকটা বাধ্য হয়ে জনকাম্য প্রকল্পে মাথা ঘামাতে হয়।

তাই বলে সরকার কিন্তু অবিবেচক হলে চলবে না। এমন কাজ করা ঠিক হবে না যার ফলে উৎপাদন-ধর্মী ক্রিয়া-কর্ম ব্যহত হয়। জনকল্যাণ-মূলক কাজ যেন বোঝা না হয়। তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তার খরচা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়। প্রদর্শনী ধর্ম উল্টা-পাল্টা প্রকল্পে মনোনিবেশ করা বাঞ্চনীয় নয়। তেমন বিরাট একটা প্রকল্প হাতে নিয়ে বাকী সব কাজ ঘুটিয়ে ঝিমুনো অবস্থা স্থষ্টি করার কোন মানে হয় না।

সরকার এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে বটে। তবে এসব সরকারী মালিকানায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। অথবা চালাবার দায়িত্ব নিজে নেওয়ারও তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাত্ত্বিক অর্থে বলতে গেলে, সরকার নানাভাবে একাজ সম্পন্ন করতে পারে। যেমন, টাকাটা সরকারী খাত থেকে এল, তৈরীর কাজও সম্পন্ন করল বেসরকারী নির্মাতা। অথবা সরকার তৈরীর কাজও সম্পন্ন করল। অতঃপর সম্পন্ন স্কীম ব্যক্তিগত মালিকানায় বিক্রি বা ভাড়া দিয়ে দিল। অন্যভাবেও সরকার কাজটা সম্পন্ন করতে পারে। টাকা দিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাব হাতে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগে স্কীম বাস্তবায়িত হল। অতঃপর তারাই তা পরিচালনা করল স্বীয় মালিকানায়। সরকার দূর থেকে সমস্ত কাজটা তদারক করল। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য যা ঘটতে দেখা যায়, তাহচ্ছে সরকারই সব কিছু করে, টাকা যোগায়, প্রকল্প বানায়, বাস্তবায়িত করে এবং পরে চালনাও করে।

এই জাতীয় প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রমের বিরাট অংশ জুড়ে থাকে। বিভিন্ন রিপোর্ট ও পরিকল্পনা খতিয়ে দেখলেই তা বোঝা যায়। আন্তর্জাতিক

ব্যাঙ্ক গোয়াতেমালার উপর রচিত তার রিপোর্টে বলেছে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলেই উন্নয়ন-অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যহত হচ্ছে। সুতরাং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার খাতিরে সারা দেশব্যাপী সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অচিরে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বন্দোবস্ত করা দরকার। তেমনি আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ত্বরান্বিত ও বিচ্ছিন্ন এলাকার সাথে তড়িৎগতিতে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য বিমান-সংস্থা গঠনও আবশ্যকীও। ব্যাঙ্ক তার রিপোর্টে রাজনৈতিক ধর্মী নয় এমন একটা জনকাম্য প্রকল্প কমিশন (**Public Utilities Commission**) গড়ে তোলার জন্যও সুপারিশ করেছে। কমিশন, শুল্ক অভিকর (**rates**) ইত্যাদি তদারক করবে এবং কার্যাবলীর সুষ্ঠুতার প্রতি নজর রাখবে। কলম্বো পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৭) যানবাহন ও যোগাযোগ খাতে মোট খরচের ৩৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তাই ছিল সবচেয়ে বেশী। তার পরবর্তী কৃষিখাত পেয়েছিল ৩২ ভাগ, সমাজসেবা খাতে এসেছিল ১৮ শতাংশ, শিল্প ও খনিজখাতে গিয়েছিল ১০ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শাখায় বরাদ্দ হয়েছিল ৬ শতাংশ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আভ্যন্তরীণ নীতিমালা (২)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জন-কাম্য কর্মক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা নিয়ে মোটামুটি মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্বও দেয়া হয়। কিন্তু, অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় সরকারী ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে মতানৈক্যের অন্ত নেই। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকার সীমারেখা টানায় নানা মুনীর নানা মত। তেমনি রাজস্ব ও মুদ্রানীতি নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রথাগত ঐকমত্য তেমন একটা দেখা যায় না। নানাজন নানা মত প্রকাশ করে থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা গেল। গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী ও প্রথাসমূহ উন্মোচিত করা হল।

(১) কৃষি-উন্নয়ন

কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য বহু পথ অবলম্বন করা যায়। অবশ্য বিশেষ নীতি প্রণয়ন ও গ্রহণে প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণ-সমূহ লিপিবদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো দরকার। তেমনি কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন। উৎপাদন-শীলতা বাড়াবার জন্য আধুনিক চাষবাস পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক চাষবাস প্রথা গ্রহণ করতে হবে। তেমনি শ্রম-দক্ষতা বাড়াতে হবে। তজ্জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন। মান্ধাতার আমলের চাষবাস নীতি ছেড়ে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ প্রথা গ্রহণ। ভূমিসংস্কার করে নেওয়া। কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়াবার জন্য জমির উর্বরা শক্তি যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি অনাবাদী জমি আবাদে আনতে হবে।

প্রযুক্তিক বিদ্যা প্রবর্তন করে প্রথমে চাষীকে সজাগ করে নিতে হবে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে কতটুকু সে লাভবান হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিককে দক্ষ করে তুলে আধুনিক চাষবাস নীতি বাস্তবায়ন উপযোগী

করে তুলতে হবে। এক কথায়, চাষীর মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস করে সে তার বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, শ্রমিক শিক্ষা পেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষবাস করার প্রয়োজনীয় নিপুণতা অর্জন করবে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় কৃষি-সংশ্লিষ্ট সব বিষয় বিধৃত করে নিতে হবে। গবেষণা করে উৎকৃষ্ট বীজ যাচাই করে নিতে হবে। উৎকৃষ্ট মানের গবাদিপশুর প্রচলন করতে হবে। কৃষিশিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। ভূমিক্ষয় রোধ করতে হবে ও ভূমিসংরক্ষণের ব্যবস্থা করে তুলতে হবে। বনসংরক্ষণ নীতি গড়ে তুলতে হবে। কীট-পতঙ্গের উৎপাত বন্ধ করতে হবে। কৃষি-যন্ত্রপাতি চালনাকারীদের শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সোজা কথায়, প্রযুক্তিক বিদ্যার মাধ্যমে বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের বিশেষ প্রতিবন্ধকগুলো চিহ্নিত করে নিতে হবে। চাষীকে তা জানার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রতিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত করে তুলতে হবে।

কৃষির ফলন বাড়াতে হবে। তজ্জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষিকে আধুনিকীকরণ বা যুগোপযোগীকরণ। একজোড়া বলদ, কাঁধে জোয়াল, পিছনে লাঙ্গল এবং তারও পেছনে একটি শীর্ণকায় মানুষ—দরিদ্র দেশে কৃষিপদ্ধতির এই প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ চলে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই। এই অবস্থা কাটিয়ে তুলতে হবে। অধিক হারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত বিনিয়োগ-নির্ণায়ক আলোচনা অবশ্য স্মর্তব্য। বৈজ্ঞানিক চাষবাস শ্রমিকের মাথাপিছু ফলন বাড়ায় বটে; কিন্তু, যে দেশে শ্রমিক প্রচুর অথচ সেই পরিমাণে মূলধন নেই, সেই দেশে শ্রমিকের মাথাপিছু আয় বাড়ানো অপেক্ষা একর-প্রতি ফলন বাড়ানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তার অর্থ নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি (Intensive cultivation) এক্ষেত্রে গ্রহণীয় এবং আধুনিক চাষাবাদ অপেক্ষা শ্রমভিত্তিক চাষাবাদ অধিক কাম্য। কারণটা সোজা। দেশে এমনিতেই নিমজ্জিত বেকারী বিদ্যমান। তার উপর যান্ত্রিক চাষাবাদ গ্রহণ করা হলে আরও বহু শ্রমিক উৎখাত হয়ে যাবে। তাতে বেকারের মাত্রা আরও তীব্রতর হতে বাধ্য।

সুতরাং, শ্রম যেথায় পর্যাপ্ত, সেথায় চাষবাস পদ্ধতি আধুনিকীকরণ বেশ গোলমেলে। একদিকে শ্রমভিত্তিক চাষাবাদ বজায় রাখা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানো দরকার। যাকে বলে ত্রিশঙ্কু অবস্থা ; উন্নত উপায়ে চাষবাস করা প্রয়োজন, না হলে ফলন বাড়ে না। এদিকে, যন্ত্র খাটাতে গেলে বিদ্যমান বেকারী প্রকট আকার ধারণ করে, অন্যদিকে আবার মজুরী বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কাজে অগ্রসর হওয়া বেশ কষ্টকর বৈকি : বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে তবে অগ্রসর হতে হবে। উদ্বৃত্ত শ্রম অন্যত্র নিয়োগের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে কর্ম-সংস্থান বাড়াতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করে শ্রমের ভৌগোলিক ও পেশাগত সঞ্চারণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। অন্য কথায়, কৃষি-উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়ন পাশাপাশি ঘটিয়ে যেতে হবে। উভয় ক্ষেত্রকে একে অন্যের সম্পূরক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সোজা কথায়, সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও গতিশীল করে তুলতে হবে।

বিপরীত দিকে, ভূমির তুলনায় শ্রম-অপ্রাচুর্যতা বিদ্যমান দেশে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ শ্রমেব মাথাপিছু ফলন বাড়াবাব প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করে তা সুসম্পন্ন করা যায়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বিদেশী রীতিনীতি গড়ে তুলতে হবে। কৃষককুল অতি দরিদ্র। দামী যন্ত্রপাতি খরিদ করা তাদের সাধ্যের অতীত। এদিকে, ছোট্ট ছোট্ট খামার বিরাজমান। হয়ত-বা ভূ-সংস্থান (topography) আদর্শ নয়। এমতাবস্থায় দামী ও ভারী যন্ত্রপাতির জন্য আগ্রহী হওয়ার কোন অর্থ হয় না। বরং, চলতি চাষবাস পদ্ধতিতে সামান্য হেরফের, কি লাঙ্গল-জোয়ালে একটি পরিবর্তন সাধিয়ে প্রচুর ফললাভ পাওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন কাঠের লাঙ্গলে চাষবাস হয়। তার জায়গায় লোহার ফাল লাগিয়ে নেওয়া যায়। তেমনি, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি একটু উন্নত করে নেওয়া যায়। তাতেই হয়ত ফলন প্রচুর বেড়ে যেতে পারে। তারপর যখন উন্নয়ন-অগ্রগতি কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়, পেট্রোল ইত্যাদি সহজলভ্য হয়, খুচরা যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, উপযুক্ত কারিগরি বিদ্যা গড়ে উঠে, তখন স্বচ্ছন্দে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভূ-সংস্কার দ্বারাও প্রচুর লাভ পাওয়া যেতে পারে। ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি-সংস্কার ফলন বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। ন্যায্য বিলিব্যবস্থা ও

উপযুক্ত প্রতিদান ফলন বাড়াবার উস্কানি-শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। কাজেই, কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি-সংস্কার সাধন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিষয়। তাই ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়, "জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনে ভূ-স্বত্ব প্রথা ও চাষাবাদ পদ্ধতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ভূমি-সংস্কারজনিত সমস্যার সমাধানে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আকার-প্রকার।"[১]

ভূমিসংস্কারের কাজ ভূমির সুষম বণ্টন সামনে রেখে এগিয়ে যাবে। আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠায় তা প্রয়াসী হবে। ভূ-স্বত্ব নীতি প্রেরণাদায়ী হবে। কৃষককুল জমিতে স্থায়ী উন্নতি সাধনে যেন ব্রতী হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কৃষির স্বার্থ যেন অব্যাহত থাকে এই উদ্দেশ্য সাধনে হয়ত বহুদেশে ভূমি-ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে জাতিপুঞ্জের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। জাতিপুঞ্জ তিনটি কারণে ভূ-স্বত্ব প্রথাকে দোষী সাব্যস্থ করেছে। তার মতে, (১) জমিতে প্রজার স্বার্থ সীমিত। জমিদারের স্বার্থ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। কেননা, জমির মালিকানা জমিদারের হাতে এবং লাভের বড় ভাগ পায় সে। কাজেই কৃষি ফলন বাড়াতে উৎসাহ বোধ করে না ; (২) প্রজা যা সামান্য ভাগ পায় তা দিয়ে দুমুঠো ডাল-ভাত যোগাতে তার নাভিশ্বাস দেখা দেয়। ফলে, বিনিয়োগ ঘটাবার মত তার হাতে অবশিষ্ট কিছু থাকে না ; (৩) তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে মূলধন-সংগঠন কিছু হয় না। কৃষির যা সম্পদ তা জমিতে নিহিত। সুতরাং, উৎপাদনধর্মী বিনিয়োগ তাকে দিয়ে হয় না।[২]

অবশ্য সব দেশে প্রজাস্বত্ব প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[৩] আসল উদ্দেশ্য জমিতে প্রজার মালিকানা-স্বত্ব সমর্পণ করা। ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে নিয়ে জমিতে প্রজার নিরঙ্কুশ মালিকানা স্থাপন করতে হবে। তবে সে জমির উন্নতিতে মনোযোগী হবে। ভূমিক্ষয় রোধ করতে সচেষ্ট হবে। ফলন বাড়াতে প্রয়াসী হবে। তার আগে নয়। লাভের 'সিংহ-ভাগ' যেন জমিদারের হাতে না যায়, জমিদার দূরে বসে যেন মজা

১. ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন, প্রথম পঞ্চ-বর্ষীয় পরিকল্পনা, People's Edition, দিল্লী, ১৯৫৩ সাল, পৃঃ ৮৮।

২. জাতিপুঞ্জ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগ, নিউইয়র্ক, ১৯৫১, পৃঃ ১৮।

৩. দেখুন যথা—N.S. Buchanon ও H. S. Ellis প্রণীত Approaches to Economic Development.

লুটার সুযোগ না পায়। গ্রাম্য-চাষী-যেন জমিদারের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে, ভোগ করতে পারে স্বপার্জিত কাজের ফল। তবে কৃষি-জীবনে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে পারবে এবং কৃষি-উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়ন হাত ধরাধরি করে সামনে বেড়ে যেতে পারবে।

দেশে দেশে ভূমি-সংস্কারের ধারা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায় অনেক কয়টা দেশে মোটামুটি একই প্রকৃতির সংস্কার জোর পেয়েছে। ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সরকারী করায়ত্ত হয়। সরকার অধিকাংশ জমি স্বীয় আওতায় নিয়ে আসে। করায়ত্ত জমি ভূমিহীন ও স্বল্প জমিওয়ালা কৃষকের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫২ সালের মিশরীয় ভূমি সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সংস্কার অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া হয়। সরকার জমি স্বীয় আয়ত্তা-ভুক্ত করে নিয়ে পুনর্বণ্টনের অধিকার লাভ করে। প্রজাকে ন্যায্য খাজনা আদায় করতে বাধ্য করা হয়। তেমনি ভারতের বহু রাষ্ট্রেও সরকারী উদ্যোগে বাস্তবধর্মী ভূমিস্বত্ব নীতি যা একদিকে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধায় সাম্য আনতে সক্ষম ও অন্যদিকে, কৃষিজাত উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক, গ্রহণ করার আইন প্রণীত হয়েছে।

ভূমিসংস্কারে অবশ্য আরও বহু জট্ জড়িত আছে এবং এইসব সম্পর্কে নানাজন নানামত ব্যক্ত করে থাকেন। কেউ বলেন, প্রজাকে মালিকানা দিয়ে লাভ নেই। জমি জমিদারের হাতে থাকাই শ্রেয়। কেননা, এক্ষেত্রে জমিদার প্রজা বদলাতে পারে। জমির আকারে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। প্রজা সাধারণতঃ আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। তাদের কাছ থেকে তেমন ফলন আশা করা যেতে পারে না। অন্যদিকে বাজারজাত পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পেতে পাবে। কেননা, কৃষি তখন অধিক ভোগ করতে প্রয়াসী হবে। তাছাড়া, জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।[৪]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমির বিলিবণ্টন নানারূপ হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বিঘ্নে একথা বলা যেতে পারে যে, জমি পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করা তেমন প্রয়োজন নয়। বরং ব্যক্তিগত মালিকানা নিরঙ্কুশ রেখে যতদূর সম্ভব সংস্কার করে নেওয়া

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৪-১২৫ ; Sir Alan Pim রচিত Colonial Agricultural Production, Oxford University Press, London, 1946. পৃ: ১৭৪।

বাঞ্ছনীয় এবং সমবায় প্রথা জোরদার করা আবশ্যকীয়। অবশ্য একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের নিমিত্তে জমিতে কৃষকের দাবী অগ্রাধিকার পেতে হবে। সরকার অবশ্য নজর রাখবে যেন ব্যক্তিগত মালিকানা আদর্শ সীমা ছাড়িয়ে উর্ধ্বমুখী না হয়ে উঠে। সরকারকে অবশ্যই জমিদার ও প্রজার মধ্যকার সম্পর্ক, পত্তনি প্রথা, ঋণ দান প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।[৫]

চাষবাস বড় আকারে করা যেতে পারে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মিতব্যয়িতা লাভ সম্ভব হলে বরং বাণিজ্যভিত্তিক বড় খামার গড়ে তোলা অধিক শ্রেয়। সমমানের পণ্য উৎপাদনে বড় খামার অধিক সক্ষম। কৃষিজাত শিল্প স্থাপনে বড় খামার সহায়ক। পুঁজিভিত্তিক আবাদী আদর্শ বা বড় খামারে হওয়া কাম্য। বড় খামারে জলসেচ সহজ হয়। তেমনি উন্নত বীজ ব্যবহার সুগম হয়। কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়, বাজারজাতকরণ সুবিধাজনক হয়।

সুতরাং, বলা যায় বড় আকারে চাষবাস করা গেলে সুবিধা অনেক। এই কারণে অনেক দেশে ছোট ছোট খামার একত্রীভূত করে বড় খামার গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। বড় খামারে ফলন অধিক পাওয়া যায়। একর প্রতি ফলন বেশী হয়। উৎপাদন ইউনিট হিসাবে তা অধিক শ্রেয়। অবশ্য ছোট ছোট খামার একত্রীভূত করায় অর্থনৈতিক বিবেচনা অপেক্ষা সামাজিক বিবেচনা অধিক বিবেচ্য। সহযোগিতা, সহানুভূতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তা গড়ে তুলতে হবে। এটা নৈতিক আন্দোলন। এর উৎপত্তি মানুষের মনে, উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। এর লক্ষ্য হওয়া উচিত সুষ্ঠু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবন গড়ে তোলা।[৬]

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, খণ্ডবিখণ্ড শত শত কৃষকের জমি একত্রীকরণ সোজা ব্যাপার নয়। উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন, দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বর্ধন উৎসারিত খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিক্ষিপ্ততা কাটিয়ে কৃষিজমির অখণ্ডতা বজায় রাখা এক দুরূহ কাজ। এই অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করে একত্রীভূত করণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনোপযোগী

---

৫. দেখুন, যথা—R. Barlowe প্রণীত "Land Reforms and Economic Development", Journal of Farm Economic, XXXV, No. 2, 177 (May 1953).

৬. জাতিপুঞ্জের উপরোক্ত পুস্তিকা, পৃঃ সংখ্যা ২১-২৩।

প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে তোলা চাই। সংস্থাকে টাকা-পয়সা ও ব্যবস্থাপনার দিক হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তার পেছনে আইনিক-শক্তি (legal sanction) প্রদত্ত হতে হবে। তেমনি রাজনৈতিক সমর্থন পরিপুষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে, জমি থেকে উৎখাত শ্রমের বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

কোন কোন দেশে আবার ছোট আকারের চাষাবাদ পদ্ধতি অধিক শ্রেয় হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। অবস্থাভেদে শতধাবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন ইউনিটই হয়ত অধিক ফলন দিতে পারে। এই জাতীয় ইউনিটের মালিক গা লাগিয়ে চাষবাস করে। জমিতে অধিক যত্ন নেয়। নিবিড় আবাদ (Intensive Cultivation) করে। ফলে, একর প্রতি ফলন বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, বড় খামারের মালিক একটু গা ঢেলে কাজ করে। একটু হয়ত বেশী আয়াসী হওয়ার সুযোগ পায়। ক্ষেত-মজুর খাটায়। স্বভাবতঃ, ভাড়াটে মজুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র ফার্মের মালিক অধিক কষ্ট স্বীকাব করে। ফলে, তার জমিতে অধিক ফসল ফলা আশ্চর্য কিছু নয়। ছোট খামারে কার্যনির্বাহক ও তত্ত্বাবধায়ক দরকার পড়ে না। অথচ বড় খামারে তাদেরকে ছাড়া কাজ চলে না। উপযুক্ত কার্য-নির্বাহক ও তত্ত্বাবধায়ক দল দরিদ্র দেশে তেমন বেশী নেই। কাজেই, একত্রীভূত বড় খামার গড়ে তোলায় অসুবিধার মাত্রাও কম নয়। এদিকে আবার, পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব পরিবার-ভিত্তিক ছোট খামার অধিক পছন্দ করে। বড় খামার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আঁধার হয়ে উঠে বলেও তা তেমন পছন্দনীয় নয়। এই সকল কারণে লাতিন আমেরিকা ও এশিয়াব বহুদেশ একত্রীকরণ প্রথায় তেমন উৎসাহবোধ করে না।[৭]

কাজেই, আমাদের পক্ষে ভূমি সংস্কার নিয়ে তেমন কোন ধরাবাঁধা নীতি লিপিবদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। দেশে দেশে তা ভিন্নরূপ হতে বাধ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ তার ধরন-ধারণের নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়া করবে। দেশ কি চায়, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী কি ইত্যাদি হাজারো শক্তিনিচয় নির্দিষ্ট আঙ্গিকের জন্ম দেবে। সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কৃষির ভূমিকা পরিস্থিতি সহজ

---

৭. দেখুন, যথা W.A. Lewis প্রণীত Theory of Economic Growth, Allen & Unwin Ltd ; London, 1955, পৃঃ সংখ্যা ১৩৩-১৩৪।

করায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো নীতি বিধিবদ্ধ করে দেওয়া যায়। ভূ-স্বত্ব ও ভূমিসংস্কারে এগুলো সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। নীতিগুলো নিম্নরূপ :

(১) ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড-বিখণ্ড কৃষি-জমি একত্রীকরণে প্রয়াসী হওয়া কাম্য। আইনের মূলধারা ঠিক রেখে এগুলো অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত করায় প্রয়াসী হওয়া বাঞ্ছনীয়;

(২) জমির খাজনা হ্রাস করা কাম্য। খাজনা সম্পর্কিত অনুশাসনাবলী সুসংবদ্ধ হওয়া উচিত। পত্তনী-প্রথা ন্যায়ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য উপযুক্ত আইন প্রণীত হলে ভাল হয়;

(৩) অসংবদ্ধ ও অদক্ষভাবে পরিচালিত বড় খামার ভেঙ্গে ছোট করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য অর্থনৈতিক দিক সামনে রেখে তবে তা করা উচিত;

(৪) অধিক মাত্রায় বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন উত্তরাধিকার আইন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। তেমনি ক্ষতিকারক বড় বড় জোতদার-শ্রেণী গড়ে উঠার স্পৃহাসমূহ আয়ত্তে রাখা বাঞ্ছনীয়;

(৫) জমি-জরিপ সুষ্ঠু হওয়া উচিত। মালিকানা সম্পর্কিত দলিল দস্তাবেজ যথারীতি প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং

(৬) জমির উপর কৃষকের আধিপত্য পূর্ণ হওয়া উচিত। জমি থেকে বহুদূরে শহরে বসবাসকারী জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ একান্তভাবে আবশ্যকীয়।[৮]

জমির ন্যূন উৎপাদক-শক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য উপরে নানাবিধ আলোচনা করা গেল। এবার আবাদী জমির পরিমাণ সম্প্রসারণের দিকে নজর দেয়া যাক। সেচ-ব্যবস্থা ও জল নিষ্কাশন প্রণালী গ্রহণ করে জমি পুনরুদ্ধারকরণের কর্মসূচী প্রণীত হওয়া দরকার। কৃষিকার্যে জল অপরিহার্য। ক্ষেত্রবিশেষে জল-নিষ্কাশন প্রয়োজনীয়। কাজেই, দেশের অবস্থাভেদে উপযুক্ত প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। জলসেচ ও জল-নিষ্কাশন প্রকল্প একদিকে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে অন্যদিকে উৎখাত

---

৮. দেখুন, যথা—P.M. Raup প্রণীত "Agricultural Taxation and Land Temere Reform in Under-Developed Countries" in Conference on Agricultural Taxation and Economic Development, Harvard Law School, 1954. পৃঃ ২৪৬

শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান দেয়। কোন কোন দেশে যেমন বাংলাদেশ জল প্রকল্প বহুমুখী হয়। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বন্ধ, জলসেচ ও নিষ্কাশন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি বহুবিধ কার্যাবলী বহুমুখী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই সকল প্রকল্প জমি পুনরুদ্ধারেও বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কোন কোন দেশে এগুলো সত্যিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। উদাহরণতঃ ভারত ও বাংলাদেশের কথা বলা যায়। ভারতে তিনটি বহুমুখী জল-প্রকল্প প্রায় ৬০ লক্ষ একর অনাবাদী জমি আবাদে আনার কথা। পাকিস্তানে ২টি প্রকল্প প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমি আবাদে আনবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই, বলা চলে বহু উদ্দেশ্যমূলক জল-প্রবন্ধ কৃষি জমি সম্প্রসারণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রচুর বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া, কৃষি ফলন বাড়াতে অন্যান্য পন্থার চেয়ে এই পন্থাই হয়ত অধিক শ্রেয় এবং অতি সহজে প্রবর্তনীয় বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

এমন বহু দরিদ্রদেশ রয়েছে যেখানে প্রচুর জমি আজও অনাবাদী। এই সকল জমি আবাদে আনা দরকার। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় এই জাতীয় দেশ প্রচুর বিদ্যমান রয়েছে। সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ভূমি-ক্ষয় রোধ করে বহু বিশাল প্রান্তর চাষবাসের উপযোগী করে তোলা যায়।[১] মালয়ে নাকি জলাভূমি ও সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ৫ লক্ষ জমি ইতিমধ্যেই চাষোপযোগী করে তোলা হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কও তার রিপোর্টে মালয়কে অনাবাদী জমি আবাদে আনার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। সংস্কার সম্পন্ন হলে নাকি তার বর্তমান কর্ষণযোগ্য জমির প্রায় অর্ধেকের সমান জমি ফসল ফলানোর যোগ্য হয়ে উঠবে। এই সকল নব আবিষ্কৃত জমিতে ঘনবসতি এলাকার লোক যেয়ে বসতি স্থাপন করতে পারবে। ফলে এক-দিকে, জমির উপর চাপ হ্রাস পাবে এবং অন্যদিকে, শ্রম-বণ্টন সুষম হয়ে উঠবে।

এবারে কৃষিজাত দ্রব্য বিপণীকরণের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। উৎপাদন যেখানে শেষ, বিপণীকরণ সেখানে শুরু। দরিদ্র দেশের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্তমান, তন্মধ্যে, দালালি প্রথা, ওজনের তারতম্যতা, দাদন প্রথা, কৃষিমূল্যের স্থিতিহীনতা ইত্যাদি প্রধান।

---

১. চতুর্দশ অধ্যায়, প্রথম পর্ব দেখুন।

কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। বেপারী, ফড়িয়া, ফটকাবাজারী, আড়তদার প্রভৃতি হাজারো রকম মধ্যবর্তী লোক বাজার প্রথায় ছেয়ে আছে। কৃষিফসল উৎসারিত আয়ের সিংহভাগ তারা আত্মসাত করে। বাজারপ্রথা ঘোরালো এবং দীর্ঘতর বলে ও বণ্টনপ্রথা অসন্তোষজনক বিধায় এই সমস্ত মধ্যবর্তী লোকেরা মজা লুটার সুযোগ পায়। মধ্যবর্তী এই দালালপ্রথার আশু অপসারণ প্রয়োজন। গুদামজাত করার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা দরকার। পণ্যদ্রব্যাদি হস্তান্তরে আধুনিক রীতিসিদ্ধ নিয়ম চালু করা একান্ত আবশ্যক। সোজা কথায় বিপণীকরণ প্রথা বিধিসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং-প্রথা চালু করা যেতে পারে। বিপণীকরণে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। সরকার শস্য-বণ্টন কতকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[১০] অনিশ্চিত কৃষিবাজার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শস্য–বীমা পদ্ধতি ইত্যাদি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সময়োচিত কিনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সরকার ও বাজারপ্রথা গতিশীল ও বল-শালী করায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বাজারপদ্ধতি সুষ্ঠু করায় কতকগুলো মৌলিক কার্য সরকার সমাধা করতে পারে। যেমন ধরুন, বাজার ও দর সম্পর্কিত তথ্যাবলী। সরকার কৃষি-তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করে এই সকল তথ্যাবলী জনসাধারণের গোচরীভূত করতে পারে। তেমনি, উৎপাদিত দ্রব্যের 'মান' বজায় রাখায় সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করে জিনিস-পত্তরের চলাচল সুগম করতে পারে।[১১]

কৃষিতত্ত্ব ও তথ্যের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা থেকে কৃষি উন্নয়নে সরকারী ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। সরকারী ভূমিকা সর্বপ্রসারী হওয়া উচিত। কৃষিতথ্য সম্প্রসারণ থেকে ভূমি সংস্কার অবধি সর্বক্ষেত্রে সরকারী কার্যক্রম বলিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিনীতি প্রণীত হওয়া উচিত। বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে অভীষ্ট ফললাভ সম্ভব নয়। কৃষককে

---

১০. দেখুন, R. H. Holton রচিত "Marketing Structure and Economic Development, Quarterly Journal of Economics, LXVII. No. 3. পৃ: ৩৪৪-৩৬১ (Aug, 1953).

১১. W. H. Nicholls প্রণীত "Domestic Trade in an Underdeveloped Country Turkey", Journal of Political Economy, LIX. No. 6, পৃ: ৪৭৯ (Dec. 1951).

ঋণমুক্ত করতে হলে মুদ্রা ও ঋণদান প্রথা সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্য বাজারকরণে যানবাহন পদ্ধতি ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলী উন্নত করে নিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও অধিক ঝুঁকি জোরদার করতে হলে খাজনা ও কর অনুপ্রেরণা প্রদান করতে হবে। কৃষিপ্রথা আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টায় উদ্বৃত্ত শ্রমের বিকল্প কর্ম-সংস্থান বন্দোবস্ত করতে হবে। সেই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যহত না হয়।

কৃষি-উন্নয়ন নিয়ে সর্বশেষ কথা : উন্নয়ন কার্যসূচীতে কৃষির স্থান তার অবদান অনুযায়ী হতে হবে। উন্নয়ন-অগ্রগতির আকৃতি-প্রকৃতি ও ধারা সুনির্দিষ্ট হতে হবে। ভারতীয় প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চ-বর্ষীয় পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালের শেষাশেষি নাগাদ খাদ্য-উৎপাদন প্রায় ১৫ শতাংশ, তুলা উৎপাদন ৩৪ শতাংশ ও চিনি উৎপাদন ২১ শতাংশ বেড়ে যাবে। প্রায় ২১০ লক্ষ একর পতিত জমি আবাদীযোগ্য করে তোলা হবে। পাকিস্তান তার ষষ্ঠ-বর্ষী উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ব্যয়ের প্রায় ৩২ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছিল এবং লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়েছিল যে, ১৯৫৬-৫৭ সাল নাগাদ কৃষিক্ষেত্রে সাকুল্যে ৩১ ভাগ সম্প্রসারণ সাধিত হবে।

পাকিস্তান ও ভারত কৃষিউন্নয়নের খাতিরে গ্রাম্য উন্নয়ন-প্রকল্প প্রণীত করেছে। ভারতে তা যৌথ সমাজকল্যাণ কর্মসূচী (Community Development Program) নামে অভিহিত। পাকিস্তানে তার নামকরণ করা হয়েছে গ্রাম্য কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম (Village Agricultural and Industrial Development Program)। এই সকল কার্যসূচীর উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম নিষ্পন্ন করা। কৃষিতথ্য সরবরাহ থেকে পল্লীঋণ প্রদান পর্যন্ত সর্ববিধ কার্যকলাপ এই সকল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত এই কার্যক্রম প্রায় ৫৫টি অঞ্চলে চালু করেছে যার দ্বারা প্রায় ১১০ লক্ষ লোক লাভবান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সিংহল তার ১৯৫৪-১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯-৬০ ব্যাপী কার্যক্রমে ৩৭ শতাংশ সম্পদ কৃষিখাতে বরাদ্দ করেছিল। এই কার্যক্রমের অধীনে গৃহীত প্রকল্পের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও উত্তর মধ্যবর্তী শুষ্ক অঞ্চলসমূহে কর্ষণযোগ্য ভূমির সংস্কার সাধন করা, যাতে ঘনবসতিসম্পন্ন পশ্চিমাঞ্চল থেকে কৃষকরা সরে এসে এই সকল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে পারে। সিংহল আশা করে তার বর্তমান আবাদী জমির পরিমাণ সে দ্বিগুণ করে তুলতে পারবে।

তার বর্তমান আবাদী জমির দুই-তৃতীয়াংশ চা, রবার ও নারকেল উৎপাদনে নিযুক্ত। ১৯৫৭ সাল নাগাদ খাদ্য উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশ বাড়িয়ে তোলার আশা প্রকাশ করে। এই বর্ধন পুনরুদ্ধারকৃত জমি উৎসারিত হবে বলে লক্ষ্যে বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মালয়ের জন্য ১৯৫৫-১৯৫৯ সাল ব্যাপী সরকারী বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নের সুপারিশ করেছিল। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় মালয়ী মুদ্রায় ৭৭৫০ লক্ষ ডলার হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই মোট ব্যয়ের ২৫ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ডাচ গিয়ানা'র উপর প্রণীত রিপোর্টে ব্যাঙ্ক তিনটি উন্নয়নধর্মী ক্ষেত্রে জোর প্রদান করার কথা বলেছিল। ক্ষেত্রগুলো হলো : আবাদী জমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল ও খনিজদ্রব্য উত্তোলন। ছোটখাট আকারের কৃষি খামারগুলোতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করে কৃষি-শ্রম উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য উপদেশ দিয়েছিল। জ্যামাই-কাকে দশ-বর্ষীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলেছিল। ব্যাঙ্কের মতে এতে জ্যামাইকার কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাবে ও অর্ধ-কর্মসংস্থানজনিত সমস্যার অবসান ঘটবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষির উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে ভূমি-সংরক্ষণ, জলসেচ, জলাভূমি-সংস্কার, গবাদী পশুর উন্নতি সাধন, ভূমি-জরিপ ও ভূমি-ব্যবহার প্রথা এবং কৃষি কর প্রথার পরিশোধন সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। গুয়াতেমালাকেও মোটামুটি একই ধরনের উপদেশ প্রদত্ত হয়েছিল। উরুগুয়েকে বলেছিল তার কৃষি ও গবাদি পশুর উন্নতি সাধন করতে এবং বিপণীকরণ প্রথা আধুনিকীকরণ করে নিতে। বনীকরণ (afforestation) বাড়িয়ে কৃষি ও গোচারণভূমি সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ইরাকের উপর প্রণীত রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ১৯৫২-৫৭ সালের জন্য প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৪০ শতাংশ ব্যয় বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, জল নিষ্কাশন, ফসল গুদামজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং কৃষি-ব্যাঙ্ক উন্নয়নে নিয়োজিত করা হউক। নাইজিরিয়াকে সমস্যার মোকাবেলায় অন্যভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। গবেষণা, জরিপ, সম্প্রসারণ ও প্রদর্শনী কৃষি উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মাটি সম্পর্কিত গবেষণা, চারাগাছ ও তার ভক্ষণীয় এবং তার আকার-প্রকার ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তবে কৃষি-উন্নয়নের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন বলে অভিমত

ব্যক্ত করেছিল। তেমনি কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব রোধ করার সুষ্ঠু পন্থা গড়ে তোলার উপদেশ বর্ষিত হয়েছিল।

(২) রাজস্ব-নীতি

উন্নয়ন-অগ্রগতি দ্রুতগামী করায় সরকারী রাজস্ব-নীতির অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্রদেশকে এই হাতিয়ার বেশ কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে হবে। সরকারী আয়-ব্যয় নীতি অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিভিন্নভাবে আন্দোলিত করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করায় তা চারক্ষেত্রে বিশেষ ক্রিয়াশীল হতে পারে। এই নীতি (১) সম্পদ বরাদ্দকরণ প্রভাবিত করতে পারে, (২) আয়-বণ্টন প্রথা যথারীতি করায় সাহায্য করতে পারে, (৩) মূলধন-সংগঠন জোরদার করতে পারে এবং (৪) মুদ্রাস্ফীতি রোধে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সরকারী ব্যয় যে ক্ষেত্রে বেশী সে ক্ষেত্রে সম্পদ আগমন অধিক হতে দেখা যায়। আবার করের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে সে শাখায় সম্পদ গমন হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং, ব্যয় ও করমাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ-বণ্টন সাধিয়ে নেওয়া যায়। কাজেই, উন্নয়ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় যথাযোগ্য জোর প্রদান সহজ হয়। ভূমি ও সম্পত্তি কর মাধ্যমে ভূমি সংস্কার প্রথা প্রভাবিত করা যায়। করভার চাপিয়ে ও করভার হাল্কা করে বিনিয়োগ ধারা কাম্য শাখায় পরিচালিত করা যায়। সামাজিক বিবেচনায় লাভজনক নয় এমন শিল্পে করের বোঝা বাড়িয়ে তার সম্প্রসারণ রোধ করা যায়। বিপরীতদিকে, লাভজনক শিল্পে অনুদান (Subsidy) নীতি প্রবর্তিত করে তা জোরদার ও বলশালী করা চলে।

জাতীয় আয় বণ্টন প্রথায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে বণ্টন প্রণালী সুষম করায় রাজস্বনীতির অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য। বণ্টন প্রথায় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবর্তন সাধন করে এই উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সাধিত হতে পারে। যেমন ধরুন, সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করে। ফলে, পেশাগত স্থানান্তর সুগম হয়। শ্রমিক দক্ষ হওয়ার সুযোগ পায়। জমির উপর খাজনা ভূ-স্বত্ব প্রথায় বেশ পরিবর্তন আনতে পারে। চিন্তা-ভাবনা করে গড়ে তোলা কর ও অনুদান নক্সা

অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় আকাঙ্ক্ষিত প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। প্রগতিশীল করপদ্ধতি চালু করে আয়-বন্টন অধিক ন্যায়নীতি-মাফিক করে তোলা যায় এবং সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা চলে।

মূলধন সংগঠন ও মুদ্রাস্ফীতি দমনে রাজস্বনীতির তাৎপর্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের ভূমিকা অপরিসীম। সেই মূলধন গঠনে আয়-ব্যয় নীতি সরাসরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য মূলধন সংগঠনের জন্য বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। বেসরকারী প্রচেষ্টা মূলধন যোগাতে পারে। তা সঞ্চয়-প্রসূত হতে পারে। অথবা অধিক মুদ্রা ছাপিয়ে হতে পারে। বিদেশী ঋণ গ্রহণ করেও মূলধন পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা যায়। বেসরকারী মূলধন গঠন তেমন বলশালী নয়—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তড়িঘড়ি ব্যক্তিগত সঞ্চয় তেমন বাড়তে পারে না। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে হয়ত তা সম্প্রসারিত হতে পারে। বিদেশী ঋণও তেমন বড়সড় ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। কাজেই, সরকারী প্রচেষ্টা জোরদার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই উদ্দেশ্য সাধনে কর প্রথা অধিক গতিশীল করে তুলতে হবে। হয়ত ঘাটতি বাজেটনীতি গ্রহণ করতে হবে।

উন্নয়ন-ব্যয় সঙ্কুলান হয় সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে; যথা-আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে। বৈদেশিক সাহায্যের কথা বাদ দিলে বলা চলে যে ব্যয় সঙ্কুলিত হয় আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে। সরকারী ব্যয় মিটাবার জন্য কর ইত্যাদি ধরনের সরকারী আয় আছে। কর ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয়-ব্যয় মিটাবার জন্য যথেষ্ট না হলে সরকারকে ঘাটতি-নীতি (deficit financing) গ্রহণ করতে হয়। অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন করে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হয়। ভারত সরকার তার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী-বেসকারী এই উভয় খাতে মিলে মোট ৪,৫৭৫,000,000 ডলারের বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করে। তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মোট ১,৭২৫,000,000 ডলার বেসরকারী খাতের সঞ্চয় বলে ধরা হয়। কর ইত্যাদি মোট ৩৩৭,৫00,000 ডলার দেওয়ার কথা। বাকীটুকু বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে মিটাবার কথা। এই হিসাবে দেখা যায় সরকার ঘাটতি-নীতি গ্রহণ করে মোট ৯00,000,000 ডলার ব্যয় মিটাতে প্রয়াসী হয়। অর্থাৎ

ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে সরকারী বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক মিটাতে কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন বেশ জটিল কাজ। ঘাটতি-নীতি মাধ্যমে মূলধন-সংগঠন ভয়াবহ বলে পরিগণিত হতে পারে। তা অতি সহজে মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দিতে পারে। দরিদ্র দেশে ভোগস্পৃহা (Propensity to consume) অধিক। এদিকে বিপণীকরণ প্রথা ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ উৎপাদন সাজসরঞ্জামে (Plant and equipment) তেমন বাড়তি সুযোগ (excess capacity) নেই। অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে নমনীয়তা বেশ ন্যূন। ফলে, দরিদ্র দেশ অতি সহজে মুদ্রাস্ফীতির কুক্ষিগত হয়ে পড়তে পারে। কাজেই, ঘাটতি-নীতির মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে চেষ্টিত হলে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সঞ্চয় বাড়াবার জন্য জোরজবরদস্তিমূলক পন্থা হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি-নীতির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তা গ্রহণ করার আগে অবশ্যই সুবিধা-অসুবিধাগুলো খতিয়ে নিতে হবে।[১২]

মুদ্রাস্ফীতি নীতির ক্ষতিকারক প্রভাব অসংখ্য। কাজেই উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় সঞ্চয় দ্বারা সঙ্কুলান করা প্রয়োজন। করপ্রথায় যথাযোগ্য বিস্তৃতি ঘটিয়ে ব্যয় মিটাবার চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং 'আয় বুঝে ব্যয় করা নীতি' মেনে চলা অধিক বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উন্নয়ন-প্রকল্প কর ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয় অনুসারে গড়ে তোলা অধিক যুক্তিযুক্ত। করপ্রথা সবায়কে ছুঁয়ে যায়। সমাজের সার্বিক সঞ্চয় বাড়ায়। ফলে সম্পদ বিতরণ আকাঙ্ক্ষিত ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পায়। কাজেই, মূলধন সংগঠন উদ্দেশ্যে অনুসারেও কর প্রথাকে চালিত করা যায়। কর বাড়িয়ে দিলে ভক্ষণ সীমিত হয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে কর প্রথা সমগ্র বর্ধন হজম করে ফেলার সুযোগ দেয় না। তাতে সম্প্রসারিত উৎপাদনের বেশ কিছুটা উৎপাদনী ধারায় পথ খুঁজে পায়। সরকারী ভূমিকার মাত্রা অনুসারে বিনিয়োগ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সরকার স্বয়ং নিজে লগ্নী ঘটাতে পারে। আবার তা না করে ব্যক্তির হাতে সঞ্চয় প্রদান করতে পারে। সঞ্চয় পেয়ে ব্যক্তি বিনিয়োগ কাজে এগিয়ে যেতে পারে। করপ্রথা মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা সরকার বিশেষ সংস্থাসূত্রে বেসরকারী খাতে পৌঁছে

---

১২. দেখুন, ষোড়শ অধ্যায়, পঞ্চম পর্ব।

দিতে পারে। বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলাম্বিয়া, ভারত, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ তাই করে চলেছে।

কর প্রথার যথাযোগ্য ব্যবহারে সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করা হলে সরকার নিজে সঞ্চয় কাজে সংযুক্ত হয়। আর এই সঞ্চয় নানাভাবে সঞ্চয় প্রবাহে ঢেলে দেয়া যায়। সরকার নিজে তা করতে পারে। বেসরকারী সূত্রে তা করিয়ে নিতে পারে। অথবা মিশ্র পন্থা অর্থাৎ সরকারী বেসরকারী জগা-খিচুড়ি পন্থা গড়ে তোলেও সাধন করা যায়। Nurkse বলছেন, "মূলধন গঠনের দুই উপাংশ হচ্ছে সঞ্চয় ও লগ্নী। সঞ্চয় ও লগ্নী নির্ভর করে ব্যয়সঙ্কোচ ও উদ্যোগের উপর। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা তাতে সংযোজিত হওয়ায় কোন ক্ষতি নাই।"[১৩] এক কথায় আমরা বলতে পারি সরকারী আয়-ব্যয় নীতিতে সঞ্চয় বাড়বার শক্তিনিচয় সংযুক্ত থাকতে হবে। উৎপাদনী ধারায় তা পরিচালিত করার মত শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। সুষম উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তা গতিশীল হতে হবে।

সুষম বাজেট (balanced budget) গ্রহণ করা হলেও কিন্তু দেশ মুদ্রাস্ফীতির খপ্পরে পড়তে পারে। বেসরকারী বিনিয়োগ ও রপ্তানি মিলে বেসরকারী সঞ্চয় ও আমদানীর সমানুপাতিক হয়। কিন্তু, সেই অনুযায়ী উৎপাদনে সম্প্রসারণ ঘটেনি। এমতাবস্থায় অর্থনীতির দরমাত্রার ঊর্ধ্বমুখি মোড় নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। তা রোধ করার জন্য রাজস্ব-নীতি ও মুদ্রানীতি একযোগে ব্যবহার করতে হবে। উদ্বৃত্ত বাজেট গ্রহণ করে কার্যসিদ্ধিতে প্রয়াসী হতে হবে।

সরকারী আয়-ব্যয় নীতি উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত ও জোরদার করায় বেশ সহায়শীল বটে। তবে তজ্জন্য সুষ্ঠু কর প্রথা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়। তেমনি সরকারী মুদ্রা বাজার (security market) সম্প্রসারিত করে নিতে হবে। করমাত্রা ও পরিধি বাড়ানো অবশ্যই দরকার। তবে তা প্রশাসনিক ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেন করা হয়। লাভের ভাগ যেন গলার কাঁটা না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বৈ কি। তাছাড়া, মাত্রা ও পরিধি বিস্তৃত করায় দেশের কর প্রদান ক্ষমতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

---

১৩. দেখুন—R. Nurkse প্রণীত Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Basil Blackwell, Oxford, 1953, পৃ: ১৫১।

দেশের করপ্রদান ক্ষমতা বিশেষ কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অবাঞ্ছনীয় সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে যেতে হবে। তেমনি কর আদায়কারী প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা ও করপ্রদান ক্ষমতার সীমারেখা টানায় বিশেষ ক্রিয়াশীল শক্তি। প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিপুণতা লাভে প্রয়াসী হওয়া কাম্য। সর্বাধিক কর আদায় লক্ষ্য হওয়া উচিত। অথচ যেন করের বোঝা অসহনীয় না হয়। কর পরিমাণ সর্বাধিক করায় কতকগুলি বিষয়ে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে: (১) করমাত্রা বাড়িয়ে দিলে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে কি জাতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে? (২) কে বা কারা করপ্রথা বিস্তৃত অথবা নিবিড় করবে? (৩) নূতন কর কিভাবে 'সমতা' দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলিত করবে এবং (৪) প্রশাসনযন্ত্র বাড়তি কর আদায় করতে পারবে ত?[১৪]

সুতরাং, করপ্রথা চালু করায় এবং তা গাঢ় করে তোলায় প্রতিটি দেশকে বেশ সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। নানা হিসাব কষে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে তবে করমাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের আইন-প্রণালী যাচাই করে দেখতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি হিসাবে নিতে হবে। সুষ্ঠু, সংগত ও ন্যায়নিষ্ঠ নীতিমাফিক করপ্রথা চালানো যাবে কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। করপ্রথায় যেন প্রেরণা ধ্বংসাত্মক বীজ নিহিত না থাকে। সময়ের স্বল্প ও দীর্ঘ পরিসরে যেন করপ্রণালী সুসংযত ও উন্নয়ন অনুসারী হিসাবে পরিগণিত হয়।[১৫]

করপ্রথা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সঠিক করে বিশেষ দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনার সুবিধে এখানে নেই। হয়ত প্রয়োজনও নয়। তবে দরিদ্র দেশসমূহের করপ্রথা পর্যালোচনা করলে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, তা তেমন সুষ্ঠু বা সংহত নয়। নানারকম দোষ-ক্রটিতে ভরপুর। সমতা, নিশ্চয়তা, স্পষ্টতা, ন্যূনতম দুষ্ট প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনায় করপ্রথা বিশেষ নিম্নমানের হতে দেখা যায়। অবশ্য দরিদ্র দেশের অর্থনীতির স্বভাবই এমন যে এই সকল মানদণ্ডে টিকবার মত কর খুঁজে বের করাই মুশকিল। কাজেই ধোপে টিকিয়ে হিসাব-নিকাশ করে আয় নীতি নির্ধারণ অবশ্যই জটিল কাজ। তবে হতাশ হওয়ার

---

১৪. দেখুন, Conference on Agricultural Taxation and Economic Development, Harvard Law School, Cambridge, 1954, পৃ: ১৭।

১৫. উপরোল্লিখিত পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

কিছু নেই। কেননা সম্ভাবনার দিক থেকে বিবেচনা করলে আশাপ্রদ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জাতীয় আয়ের বেশ কিছুটা কর হিসাবে উঠিয়ে আনা যাবে না সত্য। তবে এখন পর্যন্ত তেমন একটা ভাগ আদায় করা হয়নি। কাজেই সঠিক চেহারা বিশ্লেষণ করে এগুলো সম্ভব হলে করমাত্রায় ৩।৪ ভাগ সমপ্রসারণ ঘটানো তেমন জটিল বলে মনে নাও হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ করের মাত্রা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং করমাত্রায় বিন্যাস ঘটিয়ে তা অধিক সমতাধর্মী করে নেওয়া হলে আয় যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে। তাতে হয়ত অপ্রত্যক্ষ করের বোঝাও অনেকটা হ্রাস করা যাবে। প্রগতিশীল করনীতি গ্রহণ করা হলে বুনিয়াদ (base) সমপ্রসারিত করা সম্ভব হতে পারে।

পূর্বেই বলেছি বিশেষ কোন দেশের করপ্রথা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ এখানে সীমিত। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো নীতি উন্মোচিত করা যেতে পারে। আমরা আশা করি এই সকল নীতি মেনে চললে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে। একদিকে সঞ্চয় বেড়ে যেতে পারে এবং অন্যদিকে বিনিয়োগ ধারা আকাঙ্ক্ষিত খাতে প্রবাহিত হতে পারে। পরিণামে সুষম উন্নয়ন প্রচেষ্টা তেজীভাব লাভ করতে পারে।

আয়কর বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তবে দরিদ্র দেশে তা তেমন বলশালী হওয়ার সুযোগ নগণ্য। আয়কর দেওয়ার মত লোকের সংখ্যা তেমন বেশী একটা নয়। অধিকাংশ দেশবাসী কোনরকমে খেয়ে-পিয়ে বেঁচে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার নয়। সবাই যার যার তৈরী জিনিস খেয়ে বর্তে চলে। শিক্ষার হার নগণ্য। হিসাব-পত্তরের ধার তেমনি কেউ ধারে না। ফলে, মূল্যায়ন হিসাব-নিকাশ সহজ নয়। তেমনি আদায় প্রণালীও সুষ্ঠু নয়। কর আদায়কারী সংস্থা সুসংগঠিত নয়। অবশ্য আয়করমাত্রা বাড়িয়ে নিতে পারলে সমতার সূত্র অধিক কার্যকরী হয়। দরিদ্র দেশে আয়-বৈষম্য অধিক। এদিকে জাগ্রত চিন্তাধারা অধিক সমতাপ্রয়াসী। ন্যায়নীতি মাফিক বিলি-বণ্টন প্রথা অধিক কাম্য। কাজেই, আয়করমাত্রা বাড়িয়ে তেমন রাজস্ব না পাওয়া গেলেও ন্যায়পরায়ণতা-নীতি পালন করা সম্ভব হয়।

তবে আয়কর বিন্যাসে তার ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে সঞ্চয়ক্ষেত্রে তার দুষ্ট-প্রভাব এড়িয়ে চলার নীতি

গ্রহণ করতে হবে। সমাজের উপরতলার লোক ভোগ-বিলাসে অধিক খরচ করে। গুপ্ত-সম্পদ জমিয়ে রাখে। মূলধন পাচার করে বেড়ায়। অনুৎপাদী দরকল্পী প্রকল্পে (unproductive speculative investment) অধিক উৎসাহী হয়। কাজেই এই শ্রেণীকে ট্যাক্স করায় তেমন ভয়ের কিছু নেই। তবে তাদের চিন্তাপ্রণালী ও কার্যক্রিয়া প্রগতিশীলধর্মী হলে তা তেমন ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত সঞ্চয় যেন আঘাত না পায়। কাজেই, চুলচেরা পর্যালোচনা করে তবে করপ্রথা ও মাত্রা ঠিক করতে হবে। সমতা ও সঞ্চয় স্পৃহা যেন বিপরীতমুখী হয়ে না দেখা দেয়। উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করে নিতে হবে। অনেকে আবার অনুপ্রেরণায় আঘাত দেয় বলে আয়কর বাদ দিয়ে শুল্ক ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ করপ্রথা গ্রহণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[১৬]

কাজেই, দেখা যায় আয়কর বিস্তৃত করায় বাধা অনেক। তবে বিশেষধর্মী আয়ে কর বসানোতে আপত্তি করার কিছু নেই। যেমন ধরুন, জমির খাজনা কি সুদ উৎসারিত আয়। জমির খাজনা অনেকের জন্য বেশ লাভের সূত্র হতে পারে। আলসে জমিদার মনের আনন্দে খাজনার ভাগ ভোগে যায়। উন্নয়নধর্মী কোন ক্রিয়াকর্ম তার মজ্জায় নেই। তাকে অধিক মাত্রায় ট্যাক্স করায় আপত্তিজনক কিছু নেই। এতে বরং উন্নয়ন ব্যয় বহন সহজ হবে। মূলধনসংগঠন ত্বরান্বিত হবে। জমিদারশ্রেণী সজাগ হবে। অধিক মাত্রায় জমি কুক্ষিগত করায় উৎসাহ বোধ করবে না। এদিকে, কর প্রথায় সংস্কার সাধন করে নিলে হয়ত ছোট চাষীর বোঝা একটু কমতে পারে। এমনিতে সে তার ক্ষমতার তুলনায় করের বোঝা অধিক বহন করে। অন্যদিকে ছোট-খাট ব্যবসায়ী কি উৎপাদককে কর রেহাই দেয়া যেতে পারে। মহাজনী ব্যবসায় লিপ্ত লোককেও অধিক মাত্রায় কর ধার্য করায় অন্যায়ের কিছু নেই। রক্তচোষা কাবুলীওয়ালাকে বরং তীব্র হারে ট্যাক্স করা বাঞ্ছনীয়। তাতে হয়ত তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সে উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত হতে পারে।

উত্তরাধিকার কর (Inheritance tax) হয়ত তীব্র করা যেতে পারে। এই কর অধিক মাত্রার প্রগতিশীল করা হলে একদিকে যেমন রাজস্ব বেড়ে যায় অন্যদিকে, আয়-বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার সুযোগ হয়। অন্যথায়, বিপুল সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়ে যেতে থাকে। এই কর

১৬. Nurkse-এর প্রাগুক্ত বই, পৃষ্ঠা ১৪৬।

বাড়াবার ফলে অ-প্রত্যক্ষ লাভ বেশ হতে পারে। সম্পত্তি বণ্টন অধিক সুষম হতে পারে। কেননা, করের বোঝা হাল্কা করার জন্য উত্তরাধিকারীরা হয়ত সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। তদুপরি এই কর আদায়ে তেমন একটা ঝঞ্ঝাট নেই। অবশ্য সামাজিক বাধা দেখা দিতে পারে। কায়েমী স্বার্থ উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারে। কাজেই, সাবধানে এগুতে হবে।

উত্তরাধিকার কর ও আয়করে একটু তুলনা করে দেখা যাক। উভয় প্রকার করই উন্নয়ন ব্যয় মিটাতে ব্যয়িত হবে। ব্যবসালব্ধ মুনাফার উপর করের বোঝা ভারী করা তেমন যুক্তিযুক্ত নয়। তার তুলনায় বরং সম্পত্তি-কর অধিক শ্রেয়। কেননা, ব্যবসা অর্জিত মুনাফায় করমাত্রা অধিক হলে সঞ্চয়-স্পৃহা দমিত হতে পারে। অন্যদিকে নব নব বিনিয়োগক্ষেত্রে লগ্নী করার মত তেমন উদ্বৃত্ত হয়ত আর ব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে না। কাজেই, আয়কর তেমন ভারী হওয়া উচিত নয়। অন্ততঃ বেসরকারী সঞ্চয়ে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী করভার ঠিক হবে না। তার স্থলে বরং উত্তরাধিকার-কর চড়া হারে আরোপ করা যেতে পারে।

অবশ্য বিদেশী কোম্পানীর অর্জিত আয়ে করভার অধিক হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। প্রায়শঃ বিদেশী কোম্পানীর আয় মাত্রাতিরিক্ত হতে দেখা যায়। তারা হয়ত কোন প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের পুরোপুরি অধিকার পায়। হয়ত বা, জনকাম্য (Public utility) কোন প্রকল্পে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। ফলে তাদের লাভের মাত্রা হয় অসীম। সরকার তার বিরাট একটা অংশ অবশ্যই পেতে পারে। কাজেই তাদের উপর কর বসাবার বেলায় কার্পণ্য করার কিছু কারণ নেই। বিদেশী ঋণ প্রয়োজন বটে। উপযুক্ত অনুপ্রেরণা প্রদানও বাঞ্ছনীয়। তবে লাভের সিংহভাগ বিদেশী কোম্পানীকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেয়া যায় না। কাজেই, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিয়ে যথাযোগ্য নীতি গড়ে তোলা আবশ্যকীয়।

সম্পত্তি-কর (Property tax) হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক শ্রেয় হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে।[১৭] দরিদ্র দেশে সাধারণতঃ সম্পত্তি

---

১৭. দেখুন, J. H. Adler প্রণীত "The Fiscal and Monetary Implementation of Development Programs." American Economic Review, Papers and Proceedings XLII, No. 2, পৃ: ৫৯৪ (May, 1952).

বণ্টন অধিক অসম হয়। এমনকি আয় অপেক্ষাও। কাজেই আনু-পাতিক হারে সম্পত্তি-কর আরোপ করা যেতে পারে। হয়ত ন্যূনতম করসীমা (minimum limit) বেশ উঁচুতে করা যেতে পারে। এই কর হয়ত আয়কর অপেক্ষা শ্রেয় বলে প্রমাণিত হতে পারে। প্রশাসনিক দিক থেকেও এই কর পরিচালনা বেশ সহজ। তাছাড়া, করমাত্রা ভারী হলে তা খাঁটি সম্পত্তিতে (real property) বিনিয়োগ রহিত করতে পারে। ফলে, সঞ্চয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগক্ষেত্রে পথ খুঁজে পেতে উৎসাহী হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মূলধন-মুনাফা করের কথাও উল্লেখ করা যায়। প্রয়োজনবোধে এই জাতীয় করকে সম্পত্তি করের সম্পূরক হিসাবে আরোপ করা যেতে পারে। তাতে দূবকল্পী (Speculative) জাতীয় বিনিয়োগ নিরুৎসাহ বোধ করবে। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতিজনক সমস্যা সমাধানেও এই কর বেশ কার্যকরী।[১৮]

আয়কর ও ব্যবসা উৎসারিত আয়ের উপর কর নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে গেল। এবার অপ্রত্যক্ষ কর নিয়ে কিছু বলা যাক। দরিদ্রদেশের যা অবস্থা তাতে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য। রাজস্ব আয়ের বিরাট অংশ অপ্রত্যক্ষ করপ্রসূতই হতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভূমিকরের কথাও আলোচনা করা দরকার। ভূমিকর অনেকটা সম্পত্তি করের মত হতে পারে। যদি তা ভূমির মূল্যের উপর আরোপ করা হয় অথবা তা বার্ষিক উৎপাদনের উপর হতে পারে। অথবা ভূমির খাজনা আদায় করা যেতে পারে। এই বিষয়ে জাপানী অভিজ্ঞতা বেশ শিক্ষাপ্রদ। জাপান উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভূমির উপর কর বেশ চড়িয়ে দেয়। ফলে, উৎপাদনের এ বিরাট একটা অংশ সরকারী কোষাগারে জমা হয়। তাতে মূলধন সংগঠন বেশ জোরদার হয়। প্রগতিশীল নীতি অনুসারে কৃষিকর ধার্য করা যেতে পারে। বহুদেশে হয়ত তা রাজনৈতিক বাধা হিসাবে দেখা দিতে পারে। তবে উন্নয়নের খাতিরে এইসব বাধা ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, কৃষি উন্নয়নকে অগ্রগতির দিশারী করতে হলে জমির পূর্ণ সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। সেই খাতিরে ভূমিকর বাড়িয়ে ভূমির

১৮. জাতিপুঞ্জ, Technical Assistance Administration-এ প্রকাশিত Taxes and Fiscal Policy in Underdeveloped Countries, Newyork, 1954, পৃঃ ৩৬ দেখুন।

অপব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভূমি যেন প্রতিপত্তির প্রতীক না হয়ে দাঁড়ায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে ভূমির হস্তান্তরের উপর কড়া হাতে মূলধনী মুনাফা কর আরোপ করতে হবে। এদিকে উন্নয়ন-অগ্রগতি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভূমির মূল্য উর্ধ্বমুখী মোড় নেয়। ফলে, জমিতে অভাবনীয় লাভ (windfall gain) দেখা দেয়। তার একটা অংশ অবশ্যই সরকারের প্রাপ্য হতে পারে।[১৯] কাজেই বড়-বড় জোতদার ও কৃষিজীবীকে অধিক হারে ভূমিকর দিতে বাধ্য করায় অন্যায়ের কিছু নেই। অবশ্য ক্ষুদ্র কৃষিজীবীকে রেহাই দিতে হবে।

আবগারী ও বিক্রয় কর জাতীয় পরোক্ষ কর ভোগস্পৃহাকে দমিত করে। সঞ্চয়ে তেমন বাধা দেয় না। অবশ্য দরমাত্রা ও জীবন-যাত্রার খরচ বাড়িয়ে দেয়। ক্ষেত্রবিশেষ বিক্রয় কর আবার পশ্চাৎমুখী মূর্তি ধারণ করে বসে। কাজেই, আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর বিশেষ সাবধানতার সাথে বাছাই করে তবে আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর এই করের আপতন (incidence) যেন অধিক না হয়।. বিলাস দ্রব্যাদির উপর অধিক হওয়ার আপত্তি নেই। করপ্রথাকে অধিক ভারী ও জটিল করে তোলা যুক্তিযুক্ত নয়। সহজ-সরল অথচ বেশ দক্ষ এমন করপ্রণালী লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি। সঞ্চয় অধিক হওয়ার দরকার। তা বিনিয়োগ খাতে প্রবাহিত করা আরও দরকার। সেই উদ্দেশ্য সাধনে সরকারী জামানত বাজার (Securities market) সুষ্ঠু হওয়া বাঞ্ছনীয়। ট্যাক্স থেকে পাওয়া সরকারী আয় ব্যয় অপেক্ষা কম হলেও হয়ত মুদ্রাস্ফীতি বর্জন করা যেতে পারে। তজ্জন্য সরকারকে আভ্যন্তরীণ ঋণের মাত্রা বাড়িয়ে বেসরকারী খাতে জমাকৃত সঞ্চয় হাতে নিয়ে নিতে হবে। নতুবা এই সঞ্চয় খরচ খাতে পথ খুঁজে নিবে। তাতে মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হওয়ার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে সরকার ঋণপত্র মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করলে তা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ গরীব দেশে জামানত বাজার নাই বললেও চলে। আর যেখানেও বা আছে তাও নামমাত্র, কাজেই জামানত বাজার সম্প্রসারিত করে নেওয়া দরকার। তাতে জনসাধারণের সঞ্চয় কাজে লাগাবার সুবিধা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজার নীতি

১৯. প্রাগুক্ত পুস্তিকা, পৃঃ ৩৭।

(open market operations) কার্যকরীভাবে চালু করার সুবিধা পায়। জামানত বাজার জোরদার করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। অবস্থা বুঝে এবং পরিস্থিতি অনুসারে এক বা একাধিক পন্থা অবলম্বন করে অথবা বিভিন্ন নীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জামানত বাজার বলশালী ও স্থিতিশীল করে নেয়া যেতে পারে।[২০] তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা সরকারী স্থায়িত্ব। স্থিতিশীল সরকার বজায় থাকলে এবং সাধারণ মূল্য-স্তরে হ্রাস-বৃদ্ধি তীব্রতর না হলে মুদ্রাবাজার সবল ও সপুষ্ট হয়ে উঠে।

৩. মুদ্রানীতি

উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করায় মুদ্রানীতি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মুদ্রার পরিমাণ সরবরাহ ও তার ব্যবহারে তারতম্য ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নধারা প্রভাবিত করা যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি রোধে তা উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তেমনি বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায়ে সহায়তা করতে পারে। উন্নয়ন গতিধারা তেজী হয়ে উঠার পর মুদ্রানীতি আরও সচল ও সবল ভূমিকায় নামতে পারে। বরং বলা যায় শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রসারণের সাথে মুদ্রাপরিমাণকে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

অবশ্য মুদ্রানীতিকে উন্নয়নের সহায়ক করে তুলতে হলে দরিদ্র দেশকে প্রথমে তার মুদ্রা-প্রথা ও ঋণপ্রণালী সুষ্ঠু করে নিতে হবে। দরিদ্র দেশের মুদ্রা-প্রথা ও ঋণদান পদ্ধতি এখনো সেকেলে ধরনের। ব্যাঙ্কিং ও অর্থসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তেমন উন্নত ও সংযত নয়। কার্যকরী মুদ্রানীতি প্রচলনে তারা তেমন সক্ষম নয়। কাজেই, এইসব প্রতিষ্ঠানকে সবল ও সুষ্ঠু করে নিতে হবে। তবেই ঋণদান প্রণালী সংহত করা যাবে। সঞ্চয় যথাখাতে পরিচালিত করা যাবে। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে ঋণ ব্যবস্থার পরিসর বিশেষ সঙ্কীর্ণ। পরিচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবল তার কার্যধারা সীমাবদ্ধ। কৃষক ঋণ পায় না। ছোট-খাট ব্যবসায়ী ও কুটির শিল্প তার আওতায় পড়ে না। কাজেই ঋণদান প্রথার পরিসর ব্যাপ্ত করে

---

২০. B. Higgins ও W. Malenbaum রচিত "Financing Economic Development", International Conciliation, No. 502, পৃ: ৩৩৪; (March, 1955) আলোচনা করুন।

নিতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অধিক হারে গড়ে তুলতে হবে। সঞ্চয় আহরণকারী ব্যাঙ্ক ও সমবায়ভিত্তিক সঞ্চয়ী সমিতি স্থাপন করতে হবে। তাতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠা যাবে। নমনীয় ও তারল্য মুদ্রা ও ঋণ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সোজা কথায়, মুদ্রা ও ঋণ বাজারের দুর্বলতা সারিয়ে তুলতে হবে।

মুদ্রাসরবরাহ ও ঋণ ব্যবহার যথাযোগ্য করে নেওয়ার খাতিরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। প্রায় সব দেশেই আজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদ্যমান রয়েছে। নামেমাত্র হলেও এই ব্যাঙ্ককে সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নিতে হবে। পুঁজি সংগঠন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদি কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এইসব কর্তব্য সম্পাদনে ব্যাঙ্ক যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। খোলাবাজার নীতি, পুনর্বাট্টা প্রদান নীতি, রিজার্ভের শতকরা দর কমিয়ে ও বাড়িয়ে দেওয়ার নীতি ইত্যাদি হাতিয়ার অবাধে ব্যবহার করার ক্ষমতা শীর্ষ ব্যাঙ্কের থাকতে হবে। বাছাই করা নিয়ন্ত্রণনীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে কাম্যখাতে ধাবিত করতে পারে। অনুন্নয়নধর্মী ক্ষেত্র থেকে উন্নয়নধর্মী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পারে।

মুদ্রা-নীতি বিনিয়োগ ধারা ও তার আকৃতি-প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা বেশ বলিষ্ঠ হতে পারে। তবে ঋণদানযোগ্য প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট হতে হবে এবং ঋণদান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাপক হতে হবে। দরিদ্র দেশের অভ্যাস খারাপ। এই সব দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। ফটকাবাজারী কাজে তাদের উৎসাহ অধিক। জমি কেনা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদানে প্রবণতা অধিক। অথচ দীর্ঘমেয়াদী এমনকি মাঝারি মেয়াদী ঋণেও তারা তেমন উৎসাহিত নয়। ফলে, শিল্পোন্নয়ন কার্যকলাপ ব্যাঙ্কের সাহায্য তেমন পায়নি। কারণ, শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রিয়া বেশ দীর্ঘায়তনিক (long-term) ব্যাপার। কাজেই, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দীর্ঘ দিনের ঝামেলায় যেতে তেমন রাজী নয়। এমতাবস্থায় সরকারকে এগিয়ে আসা ছাড়া গতি নেই। সরকার উপযুক্ত প্রেরণা প্রদান করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে লম্বা সময়ের জন্য ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করতে পারে।

পল্লীঋণ সর্বজনবিদিত। কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা বড় নাজুক। তার দুর্বলতা ও পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মনোভাব তাকে করে

তুলেছে বড় অসহায়। সে একান্তভাবে মহাজনের উপর নির্ভরশীল। নানা-রকম বাধ্যতামূলক সামাজিক প্রথা ও আচার যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি তাকে আরও নাচার করে তুলেছে। সে হয়ে উঠেছে নিঃস্ব ও পঙ্গু। অথচ বিদ্যমান ঋণদান পদ্ধতি তার সাহায্যে আসে না, ফলে সে সর্বসময়ের জন্য রক্তচোষা মহাজনের কুক্ষিগত। এই মহাজনশ্রেণী ও হৃদয়হীন কাবুলী-ওয়ালা কৃষকের প্রাণ চোষে খায়। অথচ সহায়সম্বলহীন কৃষককে বার বার তার কাছেই যেতে হয়। এছাড়া অন্য পথ যে খোলা নেই। ফলে মাত্রাতিরিক্ত সুদ যুগিয়ে সে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে চড়া হারে সুদ দিতে হয় তা ধনবিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। অথচ মহাজনদের "এই ব্যবসায় তেমন যে একটা ঝুঁকি আছে এমন নয়। বরং তা, দরিদ্র, নিঃসহায়, অজ্ঞ ও বান্ধবহীন কৃষককে শোষণ করা ছাড়া আর কিছু নয়।"[২১] এদিকে কৃষক যে এইসব ধার নিয়ে উৎপাদনী কিছু করতে পারে তাও নয়। তার প্রায় সবটাই অপচয়ধর্মী সামাজিক আচার-প্রথা রক্ষায় ব্যয়িত হয়।

কাজেই, পল্লীঋণ সম্পর্কে সরকারী সচেতনতা বাঞ্ছনীয়। এই সমস্যা সমাধানে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চাষী-জীবনে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে এবং মহাজনী প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব করায় সরকারকে কার্যকরী নীতি গ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি যাচাই করে নিয়ে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কৃষকের জীবন অর্থনৈতিক গোলকধাঁধায় আবদ্ধ। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তার সর্বক্ষণের সাথী ঋণের বেড়াজাল, এই বেড়াজাল ছিন্ন করায় তাকে সাহায্য করতে হবে। অকল্পনীয় চড়াহারে সুদের নাগপাশ থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন যথাযোগ্য পল্লী-ঋণ ব্যবস্থা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা। মাঝারি রকমের ঋণ প্রদান জোরদার করতে হবে। তেমনি সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়ারও বন্দোবস্ত করতে হবে। সুদের হার যেন অধিক না হয়। কৃষক যাতে ঋণের টাকা কাজে লাগায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে কৃষি-ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে হবে। কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বহু দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিউবাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলন

২১. দেখুন, যথা--All-India Rural Credit Survey, Report of the Committee of Direction, the General Report, II, Reserve Bank of India, Bombay, 1954, চতুর্দশ অধ্যায়।

জোরদার করায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক কর্মীরা কৃষককে উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে ঋণের টাকা যথাযোগ্য ব্যবহারে উৎসাহিত ও শিক্ষিত করে চলেছে। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। কি ধরনের ফসল অধিক ফলন দিতে পারে সেসব উপদেশ প্রদান করছে। উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার শলা-পরামর্শ দিয়ে চলেছে। বহু দেশে সমবায় আন্দোলন ও পল্লী-ঋণ সমিতি গঠিত হয়েছে। চাষী-জীবনে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করায় সমবায় ভিত্তিক পল্লীঋণ সংস্থা গড়ে উঠেছে। কৃষককে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়ে চলেছে। তার মধ্যে সঞ্চয় স্বভাব, মামলা-মোকদ্দমা থেকে বিরত থাকা, চারিত্রিক উন্নতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিংহল, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ এই ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।[২২]

ঋণদান প্রথা নিয়ন্ত্রণে নির্বাচিত নীতি (Selective credit controls) বা বাছাই করা নীতি অধিক হারে ব্যবহার করতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনধারা প্রভাবিত করতে হবে। বিভিন্ন শাখার ঋণের প্রাপ্যতা ও খরচ মাত্রায় তারতম্য সৃষ্টি করে এই নীতি ঋণ বণ্টন যথারীতি করে তুলতে পারে। তাতে উন্নয়ন গতি প্রভাবান্বিত হবে। ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, সময়-ব্যবধান ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য স্থাপন করে বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষিত খাতে জোরদার করা যেতে পারে। অন্যদিকে, বাণিজ্য ব্যাঙ্কসমূহের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাছাই করা নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্য ব্যাঙ্কের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার অনুযায়ী অর্থ-নীতির বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার পেতে পারে।[২৩] তাতে উন্নয়ন ক্রিয়া-কল্প প্রণালীসম্মত পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

অবশ্য মুদ্রানীতির ভূমিকা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। মূলধন সংগঠনের ব্যাপারে তা রাজস্বনীতির তুলনায় তেমন কার্যকরী নয়। সহজ

---

২২. আলোচনা করুন, IMF. International Financial News Survey, VIII, No. 5. পৃ: ৩৯, (জুলাই, ২৯, ১৯৫৫ সাল)।

২৩. দেখুন I. G. Patel প্রণীত 'Selective Credit Controls in Underdeveloped Economics', IMF Staff Papers, IV No. 1, পৃ: ৭৬-৭৭ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সাল)।

মুদ্রানীতি হয়ত ঋণদান প্রণালী সুগম করতে পারে। কিন্তু মুনাফার হার অধিক না হলে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব নয়। তাছাড়া, সহজ মুদ্রানীতি মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দিতে পারে। তাহলে কিন্তু, লাভের গুড় পিঁপড়ার ভাগে চলে যেতে পারে। সঞ্চয়-স্পৃহা বাড়ানো দরকার বটে। কিন্তু, তা তারল্য মুদ্রানীতির মাধ্যমে ঘটাতে গেলে ত্রিশঙ্কু অবস্থা দেখা দিতে পারে। বহু দেশের অভিজ্ঞতা ভয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে লণ্ডভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করে। সবাই আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। সাত সিকি খেয়ে পাঁচ সিকি লাভের মত পরিস্থিতি জন্ম নিতে পারে। কাজেই, সাবধানে পা ফেলতে হবে। সুসংহতভাবে এগুতে হবে। নানারূপ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চিন্তা-ভাবনায় নিয়ে কার্যপ্রণালী রচনা করতে হবে। তাড়াহুড়ায় কাজ নেই।

দরিদ্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আজও তেমন সুষ্ঠু নয়। তাদের ক্রিয়া-কর্ম "অধিক মুদ্রা সৃষ্টিতে বরং ব্যাপ্ত। মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে তেমন পারঙ্গম নয়।"[২৪] মুদ্রা স্ফীতি দমনে তাদের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমিত। সরকারী জামানত বাজার পাকাপোক্ত নয় বিধায় শীর্ষব্যাঙ্ক খোলাবাজার নীতি তেমন শক্ত হাতে খাটাতে পারে না। অথচ খোলা বাজার নীতিই হচ্ছে মুদ্রা-স্ফীতি দমনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কাজেই, মুদ্রানীতি দিয়ে অধিক আশা করে লাভ নেই। তা হয়ত ঘোড়দৌড় মার্কা মুদ্রাস্ফীতি সংযত করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু, তা নির্মূল করার ক্ষমতা বর্তমানে তার তেমন একটা নেই।

শেষ কথা দিয়ে আলোচনা ক্ষান্ত করা যাক। প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো সুদৃঢ় করা আবশ্যক বটে। কিন্তু, কেবল তাই করলেই কার্যসিদ্ধি হল না। উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত এমন বহু দেশের অভিজ্ঞতা এই কথারই নির্দেশ দেয়। প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য সঞ্চয় অধিক হতে পারে না। ঠিক কথা, কিন্তু, তাই বলে সংখ্যা বাড়ালেই সঞ্চয় সমস্যা সমাধান হবে না। আসল কথা উৎপাদন পরিমাণ বাড়াতে হবে। বর্ধিত উৎপাদন থেকেই কেবল অধিক সঞ্চয় উৎসারিত হতে পারে। কেননা, ইহাই যে তার একমাত্র উৎস। উন্নয়ন-অগ্রগতি এগিয়ে গেলে সঞ্চয়

২৪. আলোচনা করুন, Henry Wallich রচিত Monetory Problems of an Export Economy, Harvard University Press, Cambridge, ১৯৫০ সাল, পৃঃ ২৮৪।

এমনিতেই বাড়তে থাকে। প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য সংস্থা হয়ত তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে গজাতে শুরু করে। তজ্জন্য হয়ত আলাদা করে কষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না, সরকার একটু-আধটু সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিলেই হয়ত কাজ চলে। মুদ্রাব্যবস্থা ও ঋণদান প্রণালী উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুসারী হয়ে উঠতে হবে। সংস্থাগত ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যে সরাসরি তেমন কিছু একটা সহায়তা করতে পারে না। অগ্রগতির কার্যকলাপ ক্ষমতাশীল হয়ে উঠলে, উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাশ্রেণী প্রধূমিত উদ্দীপনা যোগাতে সক্ষম হলে আবশ্যকীয় সংস্থা হয়ত আপনাতেই গজিয়ে উঠতে পারে। মুদ্রা-প্রণালী তখন হয়ত এমনিতেই যথারীতি আকার ধারণে এগিয়ে আসতে পারে। মুদ্রাপরিমাণ বাড়িয়ে যেতে হবে। মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত নয় এমনসব সম্পদের মুদ্রাজগতে অন্তর্ভুক্তির অনুপাতে মুদ্রা-পরিমাণ বাড়ালে ভাল হয়। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে উদ্যোক্তাশ্রেণীর অবর্তমানে কিছুই হবার জো নেই। কাজেই, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ালে কেবল কার্যসিদ্ধি হবে না।

৪. উদ্যোক্তা-দল

উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা এক দুরূহ কাজ। এই ব্যাপারে সরকারকে বিশেষভাবে সক্রিয় হতে হবে। অনুপ্রেরণামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে। বিদেশী উদ্যোক্তা উৎসাহিত করার যথারীতি ব্যবস্থা নিতে হবে। অবস্থাভেদে হয়ত সরকারকেই উদ্যোক্তার ভূমিকায় নামতে হবে। বিদেশী উদ্যোক্তা তেমন একটা এগিয়ে আসবে এমন আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ, দরিদ্র দেশে অন্তরায়সমূহ এমন বেখাপ্পা ধরনের যে বিদেশী পুঁজিপতি সহজে এগিয়ে আসতে চাইবে না। তাছাড়া, সরকারও হয়ত তেমন বেশী একটা আগ্রহ দেখাবে না। কারণ বিদেশী পুঁজি নিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা তেমন সুখপ্রদ নয়। 'বিদেশী প্রভাব' বা 'উপনিবেশ-গন্ধী' এমন কিছুতে দরিদ্র দেশ আগ্রহ দেখাতে পারে না।

সরকারী ভূমিকা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে সরকারকে উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তেমন উচিত নয়। অবশ্য কতকগুলো কাজ সরকার সমাধা করুক তা সবায় চায়। জনকাম্যমূলক স্থায়ী খরচা (Public overhead capital) সরকার বহন করুক তা

সবাকার মত। ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকার নামতে পারে, তাতে আপত্তি নেই। তবে উন্নয়ন-বেগ ত্বরান্বিত করায় এবং উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম পরিচালনায় সরকারী ভূমিকা গৌণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে কর্মঠ করে তুলতে হবে। সরকার হয়ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। উৎসাহ যোগাতে পারে। সার্বিক কর্মপ্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধন করতে পারে। সম্পদ ইত্যাদি সঞ্চালিত করে তুলতে পারে। কিন্তু, প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা জোরদার হতে হবে। কাজেই, উদ্যোক্তা দল তৈরী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সর্বশেষ বিবেচনায় বেসরকারী উদ্যোক্তাশ্রেণীই কাজকর্ম চালিয়ে নেবে। রাষ্ট্র নয়।

উদ্যোক্তাশ্রেণী গড়ে উঠায় বাধা প্রচুর। সংস্থাগত কাঠামো সুঠাম করায় উৎসাহী লোকের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য। আচার প্রথা চিরায়িত। এই চিরায়িত ঐতিহ্য নাগপাশের ন্যায় জড়িয়ে আছে। মুদ্রা প্রথার মাধ্যমে দেয় অনুপ্রেরণা তেমন কার্যকরী নয়। এদিকে আবার ব্যবসায়ীকে হীনচোখে দেখা হয়। উৎপাদনশীল কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া বেশ ঝুঁকির কাজ। সামাজিক কাঠামো অনড়। উর্দ্ধাহ সঞ্চালন (vertical mobility) সহজ নয়। বাজার প্রথা অপারঙ্গম। ফলে নব নব কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া এক প্রকার অসম্ভব। এদিকে সরকারী কল-কব্জা আবার স্বেচ্ছাচারী ধর্মী। কোন মুহূর্তে যে কি দাঁড়াবে তা সুনিশ্চিত নয়। ফলে আবহাওয়া বড় প্রতিকূল। এই অনিশ্চিত পরিবেশে মাথা পেতে দিতে তেমন কেউ রাজী নয়।

ষোড়শ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, এই সকল অন্তরায় উদ্যোক্তাশ্রেণীর মনোভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাদের ক্ষমতা ও নিপুণতা সীমিত করে তোলে। উপযুক্ত পরিবেশ উদ্যোক্তাকে আশ্বস্ত করতে পারে। সে কাজে এগিয়ে যাওয়ার মত অনুপ্রেরণা পায়। উৎসাহ-উদ্দীপনা বোধ করবে। কাজেই, সঠিক উস্কানিমূলক নীতি গড়ে তুলতে হবে। উদ্যোক্তা যেন সানন্দে ও হৃষ্টচিত্তে উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হয়। পরিবেশ যেন তার জন্য সঞ্চালক হিসাবে ক্রিয়া করে। অবশ্য কথাটা যত সহজে বলা গেল, কাজটা কিন্তু মোটেই তত সহজ নয়। ধ্যান-ধারণা ও চিরাচরিত আচার-প্রথা উন্নয়নধর্মী করে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন সাধন বড় সময়সাপেক্ষ। কাজেই, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে

নীতিমালা বিধিবদ্ধ করে নিতে হবে। স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমও গড়ে তুলতে হবে বৈ কি! বিশেষ করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। অবশ্য আগে-ভাগেই এই সব পরিবর্তন, পরিশোধন ও পরিযোজন করে নেয়া যাবে এমন নয়। উন্নয়ন গতিধারা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন আসতে থাকবে। তবে বড় কথা নীতিগতভাবে পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই অনুসারে কর্মপ্রণালী চালু করতে হবে।

গোড়ার দিকে সরকার হয়ত কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। কিছু কিছু প্রকল্প হয়ত সরকার নিজ চেষ্টায় গড়ে তুলতে পারে। অতঃপর 'প্রসব বেদনা' কাল কেটে যাওয়ার পর তা বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করে দিতে পারে। 'পথপ্রদর্শকধর্মী কিছু প্রকল্প' (Pilot Projects) সরকার নিজে স্থাপন করতে পারে। প্রদর্শনীধর্মী এই সব প্রকল্পের সার্থক পরিচালনায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সাহস পাবে। কর্মপ্রেরণা প্রধুমিত হবে। প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক বিদ্যা পরিচিত হয়ে উঠবে। তাতে অজ্ঞতা ও অপরিচিতির ভয় কেটে যাবে। অধিক হারে সূক্ষ্ম ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা দেখা দেবে। সরকারী চিন্তাধারা সুষ্ঠু হবে। সম্পত্তি মালিকানার বিষয় স্পষ্ট হতে হবে। শাসন-প্রণালী যেন স্থায়ী হয়। নিয়মকানুনে যখন-তখন পরিবর্তন আনা যাবে না। খামখেয়ালিপনা ছাড়তে হবে। সামাজিক স্থায়ী খরচা সরকারকে মিটাতে হবে। রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সংস্কার করে নিতে হবে। এই সমস্ত সংস্কার সাধিয়ে নিলে উদ্যোক্তা শ্রেণীতে কর্মোদ্দীপনা দেখা দেবে। ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বলশালী হবে। কঠিন কাজে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ বেড়ে যাবে। দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পুঁজিপতিরা উৎসাহ বোধ করবে। তড়িৎগতিতে উন্নয়ন কাজে হাত দেওয়ার জন্য হয়ত সমবায় আন্দোলন জোরদার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কুটিরশিল্পের সুষ্ঠু উন্নয়নে জোর দেওয়া যেতে পারে। তাতেও হয়ত উদ্যোক্তাদল ভারী হতে পারে। অপেক্ষাকৃত কঠিন ও বৃহৎ প্রকল্পে সরকার নিজে লিপ্ত হতে পারে। তাতে হয়ত বেশ ফায়দা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য সরকার পরে এই সকল প্রকল্প বেসরকারী খাতে হস্তান্তরিত করে দেবে। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম হিসাবে সরকার রাজস্ব ও মুদ্রানীতি সুষ্ঠু করে নেবে। আঙ্গিকগত সমস্যা সারিয়ে নেবে। প্রযুক্তিক নক্সা সুদৃঢ় করে তুলবে। তাতে বেসরকারী উদ্যোগ প্রধুমিত হওয়ার সুযোগ পাবে। কর্মপ্রেরণা বেগবান হবে।

অর্থনীতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধন দেখা দেবে। এককথায় সরকারী প্রচেষ্টা বেসরকারী প্রচেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। পথের কাঁটা সরিয়ে দেবে। পরিবেশ সুষ্ঠু করে দেবে। নাজুক বেসরকারী উদ্যোগ তাহলে সবল ও সুপুষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচলিত আচারপ্রথা দেশের কর্মধারাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সামাজিক মূল্যবোধ কার্যকরী শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উদ্যোগী দল গড়ে উঠার সুযোগ বিশেষভাবে সীমিত। কাজেই, উদ্যোক্তা সরবরাহ যথেষ্ট করার নিমিত্তে এই সকল প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নিতে হবে। চিন্তাধারা আধুনিক করে নিতে হবে। বস্তুগত উন্নয়ন-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। বিদেশ থেকে ধার করা ধ্যান-ধারণায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার জো নেই। সামাজিক কাঠামোতে তা বিধৃত করে নিতে হবে। সোজা কথায়, দরিদ্র দেশের মানুষকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, নিজের উন্নতি নিজে সাধিত করে নিতে হবে। 'আহার দিয়েছে আল্লায়, আহার দিব সে'-এই দৃষ্টিভঙ্গি সমূলে উৎপাটন করে দিতে হবে। স্বদেশজাত সুপ্ত-শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব আসতে হবে নিজ সমাজ থেকে। ঘুমিয়ে থাকা অস্ফুট শক্তি প্রস্ফুটিত করে নিতে হবে। নিজের হাল নিজে চেপে ধরতে হবে। সাপটে ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তরণী। তবেই কার্যসিদ্ধি সম্ভব হবে। তার আগে নয়। এই ব্যাপারে বিদ্যমান ব্যবসায়ী শ্রেণী, ফটকাবাজী, মহাজনীকাজে লিপ্ত ইত্যাদি ব্যক্তিকে অধিক উৎসাহ দিতে হবে। তারা অতি সহজে উৎপাদনী কার্যে লিপ্ত হতে পারে। উস্কানিমূলক নীতি গ্রহণ করে মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে তুলতে পারে। এই শ্রেণীর লোক অনায়াসে উদ্যোক্তার ভূমিকায় নেমে আসতে পারে।

সমস্যা যে জটিল এই সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বিরুক্তির কিছু নেই। তাই বলে নিরুৎসাহিত হওয়ারও কিছু নেই। বরং শক্ত হাতে কাজে নামলে উদ্দেশ্য-লাভ তেমন কঠিন বলে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে। এই ব্যাপারে দুটো উৎসাহব্যঞ্জক সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, সরকার সূত্রপাত ঘটিয়ে দেবে। উদ্ভাবনা-পথ নির্দেশ করে দেবে। বেসরকারী প্রচেষ্টা তা অনুকরণ করে নেবে। জ্বালিয়ে দেয়া পথ ধরে এগিয়ে যাবে। প্রযুক্তিক বিদ্যা হয়ত উন্নত দেশ থেকে ধার করে নেয়া যেতে পারে। মানুষকে শিক্ষিত করে

পারদর্শী করে নিতে হবে। দক্ষ কর্মী তখন আপন পথ আপনা আপনি বেছে নেবে। আলো জ্বেলে দেয়া সরকারের কাজ। দিশারী হিসাবে সরকার ভূমিকায় নামবে। তারপর হয়ত ঝাঁকে ঝাঁকে উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবে। Schumpeter-এর ভাষায় পথপ্রদর্শক হবে সরকার। পদাঙ্ক অনুসরণ করে মৌমাছির ঝাঁক (অর্থাৎ উদ্যোক্তার ভিড়) ভিড় জমাবে (Swarm effect)। দ্বিতীয়তঃ, উন্নয়ন ধারা যখন ভরবেগ ও সপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে তখন উদ্যোক্তা শ্রেণীও বেড়ে যেতে থাকবে। কেননা, উদ্যোক্তা ও উন্নয়ন পরস্পর উস্কানি শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। উদ্যোক্তাদল যেমন উন্নয়ন-অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ও উদ্যোক্তা সরবরাহ বাড়িয়ে তোলে। অর্থনীতির পশ্চাৎমুখিতা কেটে যায়। বাজার সম্প্রসারণ ঘটে। সঞ্চয় পরিমাণ ও স্পৃহা বাড়ে। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্যক্তির জড়তা কেটে যায়। তার মধ্যে কর্মপ্রেরণা জাগে। পরিবেশ সহজতর হয়। ফলে উদ্যোক্তাশ্রেণী বাড়তে থাকে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক নীতিমালা (১)

[International Policy Issues (1)]

দরিদ্র দেশের অভাব-অনটন নিরসনে আন্তর্জাতিক নীতিমালাও বেশ সহায়ক হতে পারে। দরিদ্র দেশ উন্নত দেশের কায়দা-প্রণালী দিয়ে উপকৃত হতে পারে। উন্নয়ন কর্ম বেগবান করায় বিদেশী পুঁজি সাহায্য করতে পারে। আন্তর্জাতিক নীতির প্রভাবে গরীব দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত আন্তর্জাতিক নীতি আভ্যন্তরীণ নীতির সম্পূরক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। দরিদ্র দেশ সচেষ্টায় অনেকগুলো নীতি অনুকূল করে নিতে পারে। বিশেষ করে বাণিজ্য নীতিতে সংস্কার সাধন করে অনেক কিছু নিজের সুবিধামত করে তুলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিদেশীদের নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যকলাপ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. বাণিজ্য-নীতি

উন্নয়ন গতিবেগ ত্বরান্বিত করায় বহু দরিদ্র দেশ তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবাধ বাণিজ্য হয়ত ধনী দেশের জন্য সুবিধাজনক। কিন্তু, দরিদ্র দেশের জন্য তেমন নয়। দরিদ্র দেশের বেলায় অবাধ বাণিজ্যের নীতি তেমন সুষ্ঠু নয়। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি বহু ধনবিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধ্রুপদী তত্ত্ব নিয়ে মতভেদ প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র দেশের বেলায় তা তেমন বাস্তবধর্মী নয় বলে মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে চলিষ্ণু পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তা অপারগ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন ধ্রুপদী তত্ত্বের স্থবির কাঠামো হয়ত প্রমাণ করতে পারে যে, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল', অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত না হওয়ার চেয়ে হওয়া উৎকৃষ্ট। কিন্তু, তা একথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, দেশের মঙ্গলের জন্য অবাধ বাণিজ্য শ্রেয়।

ধ্রুপদী তত্ত্ব যেহেতু সুষ্ঠু নয় তাই তাঁরা সংরক্ষণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বহু রকম যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছে।

একদল তাঁদের যুক্তিতর্কে 'কৃষির হীনতা' তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এই মতে দরিদ্র দেশ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। কেননা তারা কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই, তাদের উচিত বহির্বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে তোলা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষপাদে রুমানিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী Mihäil Manoilesco মন্তব্য করেন যে, শিল্প উৎপাদন অপেক্ষা কৃষি উৎপাদন হেয়। কাজেই, তুলনামূলক ব্যয়-বিধি কৃষি-প্রাধান্য দেশে প্রযোজ্য নয়। তিনি ধরে নেন যে, মূলধন ও শ্রমের উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র আপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রে অধিক। কাজেই, শুল্ক ধার্য করে শিল্পকে সংরক্ষণ করতে হবে। তাতে মাথাপিছু আয় বেড়ে যাবে। Fredrich List তারও আগে শিল্প উন্নয়নের সুবিধার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে জার্মান শিল্প উন্নয়নের জন্য বলেছিলেন। Presbisch ও Singer যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তাও এই মতের অনুসারী। তাঁদের মতে কৃষিপ্রধান দেশের বাণিজ্য শর্তে (terms of trade) সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে অবনতি ঘটে থাকে। কাজেই, শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বহুবিধ কারণ দর্শিত হয়েছে। বহির্ব্যয় সঙ্কোচ (external economics) তন্মধ্যে একটি। শিল্পোৎপাদন বহির্ব্যয় সঙ্কোচ সাধন করে। বস্তুতঃ, শিল্পোৎপাদন থেকেই এই সঙ্কোচনের জন্ম। তাছাড়া, শিল্পক্ষেত্রে সমপ্রসারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তন পরিবর্ধনধর্মী। ফলে, তার থেকে ব্যয়সঙ্কোচ উৎসারিত হয়। অনেকে বলেন, শিল্পোন্নয়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহুভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। H. W. Singer বলেন যে, শিল্পক্ষেত্রে প্রসারের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অপ্রত্যক্ষ ফল এই যে "তা শিক্ষা-দীক্ষার মান উন্নত করে। দক্ষতা, জীবনযাত্রা প্রণালী, উদ্ভাবনা, আচার-প্রথা-অভ্যাস, প্রযুক্তিক জ্ঞান, নব নব চাহিদা ইত্যাদি প্রভাবিত করে ও জন্ম দেয়।"[১] একটা শিল্পক্ষেত্রে সমপ্রসারণ অন্য শিল্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এক

১. দেখুন, H. W. Singer প্রণীত "Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries," American Economic Review, Papers and Proceedings, XL, No.2, পৃ: ৪৭৬ (মে, ১৯৫০ সাল)

জায়গায় সুষ্ঠু ও সুনিপুণ উৎপাদন অন্যত্র প্রভাব সৃষ্টি করে। তার ফলে বহির্ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে। সামাজিক উৎপন্ন (Social product) ব্যক্তি-উৎপন্ন (Private product) ছাড়িয়ে যায়। Singer-ও তার মতাবলম্বী অন্যান্যের মতে দরিদ্র দেশ এই জাতীয় বহির্ব্যয়-সঙ্কোচ সুবিধা হতে বঞ্চিত। কেননা, এই সকল দেশে কৃষি-প্রাধান্য বেশী। অধিকাংশ দেশবাসী ও সম্পদ কৃষি-কাজে ব্যাপৃত। কাজেই, তাদের জন্য সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ অধিকতর লাভজনক। তাতে তারা বহির্ব্যয়-সঙ্কোচ সুবিধা কিছুটা পেতে পারে। কেননা, এক্ষেত্রে শিল্প-উন্নয়ন বেগবান হবে। কৃষিখাত থেকে সম্পদ শিল্প-খাতে সরে আসতে থাকবে।

কৃষির হীনতা তত্ত্ব মেনে নিতে হলে বলতে হয় যে, দরিদ্র দেশ গরীব। কেননা, সেইসব দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু, কথাটা যে সত্য নয়। আমরা বহু জায়গায় উল্লেখ করেছি যে, দরিদ্র দেশের দুর্ভোগের জন্য কৃষি দায়ী নয়। বরং অপক্ক কৃষি-উৎপাদন দায়ী। কৃষির অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থাকে শিল্পের আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা বোকামির নামান্তর। কৃষি-প্রাধান্য হয়েও অনেক দেশ উন্নত। উদাহরণ হিসাবে নিউজিল্যাণ্ডের কথা বলা যায়। কাজেই, কৃষি প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল একথা বলা ঠিক হবে না। তেমনি কৃষিকাজে ব্যাপ্ত বলে দেশ দরিদ্র একথা বলাও সত্যের অপলাপ ব-ই কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, দরিদ্র দেশসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য, কৃষি-প্রাধান্য বটে। কিন্তু, তা কারণিক ঘটনা এমন কথা বলার মত সাক্ষ্য-সাবুদ কোথায়?

কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন হয়ত কিছুটা কম। সেই তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে হয়ত একটু বেশী। কিন্তু, মূলধনের উৎপাদনের কথাও ত ভাবা দরকার। মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তি কৃষিক্ষেত্রে ন্যূন হওয়ার তেমন কোন কারণ ত দেখি না। হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে তার সামাজিক ফলাফল (Social returns) অধিক হওয়াই ত স্বাভাবিক।

সে যাই হউক, লম্বাচওড়া বিতর্কে না যেয়ে সোজা কথায় আসা দরকার। অধিকাংশ দরিদ্র দেশ কৃষিপ্রাধান্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম নয়। হয়ত বাঞ্ছনীয়ও নয়। "ভারসাম্য উন্নয়ন" সাধনে কৃষিকে ভিত্ করেই দরিদ্র দেশকে এগুতে হবে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা নির্দেশ দেয় যে, শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিয়ে নেওয়া।

হীন কৃষি তত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এমন আরেকটি বক্তব্য হল কচি শিল্প যুক্তি (Infant Industry Argument) এই

বক্তব্যটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 'শিশুকে লালন-পালন কর, কিশোরকে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়প্রাপ্তকে মুক্তি দাও'...এই যুক্তি বিস্তৃত করে শিল্পক্ষেত্রে তা গ্রহণের এই যুক্তিব সমর্থকরা বলে থাকেন। সময় আসবে যখন দেশেব কচি-শিল্প ফেঁপে-ফুলে বিদেশী শিল্পের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে। এই বক্তব্যের পেছনে যুক্তি হচ্ছে এই যে, কিছুকাল হয়ত দেশকে বেশ দাম দিযে জিনিস কিনতে হবে। আমদানী দ্রব্য তত দামী নয়। কিন্তু, আমদানী বন্ধ কবে দেওয়া হল। স্বদেশী মাল একটু চড়াদামে কিনাতে হবে। গর্ভাবস্থা সম্ভাবনা কেটে যাওয়ায় দেশের শিল্প বিদেশজাত দ্রব্যের ন্যায় দ্রব্য উৎপন্ন সক্ষম হবে। মানেব দিক দিযে যেমন দামের দিক দিয়েও তা হবে বিদেশী দ্রব্যের সাথে তুল্য। সাময়িক-ভাবে কষ্ট স্বীকার করে নিজ শিল্পকে আপন পায়ে দাঁড়াতে দাও। অচিরে সে সবল, সতেজ ও সপুষ্ট নধরকান্তি যুবায় পবিণত হবে। তখন খুব মজাসে তা চেটে-পুটে ভোগ করতে পারবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পব থেকে এই যুক্তি বেশ জোরদাব হযে উঠেছে। বহুদেশ এই যুক্তির বলে সংরক্ষণ নীতি গড়ে তুলেছে। কলাম্বিয়া ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালেব মধ্যে লৌহ ও ইস্পাতজাত বহু দ্রব্য আমদানী বন্ধ কবে দিয়েছে। এলসালভাডর ধাতব দ্রব্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ কবতে শুরু কবেছে। ম্যাক্সিকো বোতলজাত খাদ্যদ্রব্য আমদানী রহিত করেছে।

শিশু-শিল্প যুক্তির সরলতা বেশ চমৎকৃত বলে মনে হয। আবেদনও অভিভূতকারী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, এই যুক্তির হোতারা একটা কথা ভুলে যান। মেনে নেওয়া গেল, কচি শিল্প কালে নাদুস-নুদুস হযে উঠবে। কিন্তু, মূলধন সববরাহ আসবে কোত্থেকে।[২] সংরক্ষণ করবে কি? প্রথমত: শিল্প গডে তোলা চাই। পুঁজির অভাব তাই যে সম্ভব হচ্ছে না। শুল্ক কমিশন(Tariff Commission) সংরক্ষণের নিমিত্তে সুপারিশ করে বটে। কিন্তু, মূলধন সৃষ্টিতে যে কিছুই করতে পারে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়ায চাহিদাক্ষেত্রে হয়ত কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটে। কেননা, মুনাফা সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। কিন্তু, পুঁজি সববরাহ আশানুরূপ হয় না। কাজেই এই নীতি পুরোপুরি সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয।

---

২. এই সমস্যার জন্য দেখুন, R. Nurkse-এর Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries.

কচি-শিল্প তত্ত্ব নিয়ে আরও জ্বালা আছে। যেমন-তেমন করে শিল্প-ক্ষেত্র বাছাই করে নিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। তেমনি সংরক্ষণ ব্যতীত শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য—কেবল তখনই এই যুক্তি অনুসরণ করা যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই সংরক্ষণ স্থায়ী ব্যাপারে পরিণত হতে না পারে। প্রায়শঃ দেখা যায় শিশু আর বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না। আর যদি বা কস্মিনকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হল তখন উল্টা কল ঘোরাতে শুরু করে। নিজের জমাকৃত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে অধিক সংরক্ষণের জন্য লড়াই শুরু করে।

কচি-শিল্প যুক্তির আধুনিক ভাষ্য ব্যাপৃত করে সার্বিক অর্থনীতির কাঠা-মোতে জুড়ে দেয়া যায়। অনেকে এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের মতে দরিদ্র দেশের অর্থনীতিকে "শিশু অর্থনীতি" (infant economy) রূপে ভাবা যায়। অর্থনীতিকে এইভাবে আখ্যায়িত করে তার সার্বিক চেহারায় সংরক্ষণ-নীতি বিধৃত করে দেয়া চলে। তাতে, বিশেষ করে, কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান অগণিত শ্রমিক বেশ কিছুটা শিল্পক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায়। তাতে কৃষি-ফলন হ্রাস পাওয়ার কোন কারণ নেই। অথচ শিল্পক্ষেত্রে ফলন বেড়ে যেতে বাধ্য। এই উদ্বৃত্ত ফলন হবে নিরঙ্কুশ লাভ। এই যুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে দেশ বেশ কিছু শিল্পক্ষেত্রে মূল্যানুসারে (advalorem) ঢালাই শুল্ক-বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। তাতে শিল্প-উন্নয়ন উজ্জীবিত হতে পারে। কৃষিতে হয়ত তেমন আঘাত লাগবে না।

উপযুক্ত মূলধন পাওয়া গেলে দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য এই পন্থা অবলম্বন হয়ত মন্দ নয়। শিল্পক্ষেত্রে প্রসার ঘটতে পারে। কিন্তু, কথা হল, এই নীতি কাম্য কি-না? অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তোলা প্রয়োজন কি-না? শিল্পে অহেতুক জোর প্রদানের প্রয়োজন আছে কি? এইসব বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে। সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই রয়েছে, অসুবিধার তুলনায় সুবিধা অধিক হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়: সংরক্ষণ সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি কি-না? অন্য পথ অবলম্বন করে অধিক ফল পাওয়ার উপায় আছে কি-না? 'কঁচি অর্থনীতি' তত্ত্ব অনেকটা পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বজায় রাখার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ন্যায়। ফলে, কর্মসংস্থান যুক্তি যে দুর্বলতায় ভোগে, 'কচি অর্থনীতি' তত্ত্বও সমরূপ দুর্বলতায় ভোগে। পূর্ণ কর্ম-সংস্থান বজায় রাখায় সংরক্ষণ নীতির তুলনায় আভ্যন্তরীণ নীতি-মালা গ্রহণ যেমন শ্রেয়, তেমনি উপাদান সামগ্রী সঞ্চালনে ও আভ্যন্তরীণ

নীতি বাণিজ্য নীতির হেরফের অপেক্ষা শ্রেয়। কেননা, উভয় পন্থাতেই হয়ত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। তবে বাণিজ্য নীতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তার তুলনায়, বরং সংরক্ষণ-নীতি গড়ে না তুলে অনুদান (subsidy) প্রদান করে শিল্প-প্রচেষ্টা জোরদার করে তোলা অধিকতর শ্রেয়। তাছাড়া, সরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়ে ও শ্রম-সঞ্চালন সহজ করা যায়। তাতে বহির্ব্যয়-সঙ্কোচ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টাও অধিক সুবিধা পাবে। বিকল্প পন্থা হিসাবে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে পল্লী-বেকারত্ব হ্রাস করা যায়।

কোন কোন প্রবক্তা বহুমুখীকরণ সহজ করার নিমিত্তে ব্যাণিজ্যক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাদের মতে সংরক্ষণ নীতি দেশের অর্থ-নীতিকে বহুমুখীকরণে সহায়তা করে। ফলে দেশের অবস্থা সুরক্ষিত হয়। হেলে-দুলে পড়ার বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়। আন্তর্জাতিক চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন ক্ষতি করতে পারে না। অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ উদ্যোগ কেবল বহির্বাণিজ্য শিল্পে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা থেকে অব্যাহতি পায়। কথাটা বোঝার জন্য পাঠকের দৃষ্টি পঞ্চদশ অধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট করছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত দরিদ্র দেশ 'দ্বৈত অর্থনীতি'র (dual economy) ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব তার জন্য তেমন সুখপ্রদ হয়নি। ফলে বহির্বাণিজ্যের সুবিধা ধনী দেশের তুলনায় দরিদ্র দেশ তেমন একটা ভোগ করতে পারেনি।

সত্যি কথা, এই নিয়ে বিতর্কে নামার তেমন কিছু নেই। কিন্তু, এই মন্তব্য থেকে একথা ত বলা চলে না যে, দরিদ্র দেশের উচিত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে ফেলা এবং অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তোলা। কেবল বহুমুখী করে তোলার জন্য বহুমুখী নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়। অর্থনীতিকে বহুমুখী করে নিতে হবে তুলনামূলক খরচা তত্ত্বের সূত্র ধরে। অনেকে হয়ত আপত্তি তুলবেন। বলবেন, সাময়িক জ্বালা সয়ে ভবিষ্যৎ নিরাপদ করে নেয়া শ্রেয়। রপ্তানি বাড়িয়ে আমদানী দিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মত ঘোরপ্যাচে না ঢোকাই উচিত। বিশেষ করে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদান সামগ্রী সীমিত হলে তা না করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই আপত্তির সারবত্তা মেনে নিয়েও

বলা চলে যে, রপ্তানি বাড়াতেই হবে। বহুমুখিতা বাড়াবার জন্যও যে রপ্তানি প্রয়োজন। বিশেষ করে গোড়ার দিকে বহুমুখিতা বেগবান ও বিস্তৃত করতে হলে রপ্তানি সম্প্রসারিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই, বহুমুখীকরণ করতে যেয়ে রপ্তানিশিল্প থেকে উপাদান উঠিয়ে আনা উচিত হবে। বরং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের পরিসর বিস্তৃত অধিক শ্রেয় হবে। কোন দেশকে যেন একটি বা সামান্য কয়েকটি রপ্তানি শিল্পে জড়িয়ে না থাকতে হয়। রপ্তানি শিল্পে যেন বহুবিধ দ্রব্যের অবদান বিস্তৃত হয়। আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে সম্প্রারণ উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে বেগবান করে। অথচ তা কমিয়ে দিলে যাত্রা ব্যাহত হয়। তাই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কিউবাকে পরামর্শ দিয়েছে তার অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তোলার জন্য। কিন্তু, তা করতে হবে চিনির উৎপাদন কমিয়ে নয়। বরং অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে, চিনিজাত ও তার উপ-জাত (by-product) শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তেমনি অন্যান্য দ্রব্যের আয়তন ও পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। নিজের অর্থনীতিকে বিশ্ব প্রবাহ থেকে আলাদা করে নয় অথবা রপ্তানি হ্রাস করে নয়। বরং আমদানী-রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে প্রসার ঘটিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিক সুবিধা অর্জনে প্রয়াসী হতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। তবেই উন্নয়ন-অগ্রগতি নিজের পায়ে দাঁড়াবার সফলতা লাভ করবে।

সোজা কথায়, বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসারিত 'অসমতাধর্মী প্রভাব' (disequalizing forces) কাটিয়ে তোলার জন্য যে-সব নীতি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলো নানারকম দুর্বলতায় ভোগে। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ যুক্তিতে অযৌক্তিক প্রাবল্য দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্য দোষণীয় নয়। আসল গলদ অন্যত্র। বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসারিত সুষ্ঠু প্রভাবগুলো দরিদ্র দেশের অর্থনীতিতে চলকাইয়া (spill) ঢোকার পথ খুঁজে পায় না। নানারকম অন্তরায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে বাজার অপারঙ্গমতা ও নষ্টচক্রগুলো প্রধান। কাজেই, সর্বাগ্রে ঘর শুধরে নেয়া প্রয়োজন। সংরক্ষণমূলক যুক্তিতর্ক উত্তম পন্থা নয়। এই সকল নীতি 'দ্বিতীয় বিকল্প' হিসাবে হয়ত বিবেচিত হতে পারে।[৩] সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা নয়। অর্থনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে নানারকম জট বিদ্যমানহেতু প্রান্তিক মূল্য বিবেচনায় তারতম্য বিদ্যমান। সেই কারণে হয়ত অনেকে যুক্তি দেখাতে

৩. আলোচনা করুন J. E. Meade-এর Trade and welfare, Oxford University Press, New York, ১৯৫৫ সাল, চতুর্দশ অধ্যায়।

পারেন যে সংরক্ষণ নীতি অবশ্যই শ্রেয়। কিন্তু, এটাই শেষ কথা নয়। আসল কাজ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সারিয়ে নেয়া। বৈদেশিক বাণিজ্যে হামলা না করে বাজার অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে তোলা প্রয়োজন। তেমনি বৈদেশিক বাণিজ্যের হাতিয়ার দিয়ে বরং নষ্টচক্রের ব্যূহ ভেদ করা আবশ্যক। বাণিজ্যক্ষেত্রে বাধার পাহাড় না তুলে অন্যভাবে 'দৈত প্রভাব' কাটিয়ে তোলার চেষ্টা অধিকতর কাম্য। আভ্যন্তরীণ নীতিমালা সুষ্ঠু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা অধিক বাঞ্ছনীয়। বাজার পরিস্থিতি উন্নত করা ও বাজার সম্পর্কীয় খববাখবর সর্বত্র প্রচার করা অধিক উচিত। ঋণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভিত্তিতে গড়ে তোলা আবশ্যক। মূলধনী বাজার সম্প্রসারিত করা দরকার। প্রযুক্তিক বিদ্যা আধুনিকীকরণ ও উপাদান সামগ্রীর ব্যবহার বিস্তৃত করা অত্যাবশ্যক। একচেটিয়া ব্যবসায়াধিপত্যজনক দুষ্ট প্রভাবগুলো সারিয়ে তোলা কাম্য। আভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি অপসারিত করে নেয়া সম্ভব হলে উন্নয়ন-অন্তরায়সমূহ দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন অতি সহজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহের সাথে আভ্যন্তরীণ নীতিমালা-সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নেয়া যাবে। রপ্তানি বাণিজ্যে সম্প্রসারণ সমগ্র অর্থনীতিতে সুফল ফলাতে সক্ষম হবে। হয়ত তা তখন গোটা অর্থনীতিতে সঞ্চালক শক্তি (Propulsive factor) হিসাবে ক্রিয়া করতে পারবে। মনে রাখতে হবে উন্নত দেশগুলো প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি-বাণিজ্যে লিপ্ত। এমন অনেক দেশও আছে যারা কৃষি-জাত দ্রব্য রপ্তানি করে বেশ ভাল আছে। কাজেই, রপ্তানি বাণিজ্যে লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। হয়ত তা মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশী টেনে আনবে। এমন কি উন্নয়ন-ধারায় ওলট-পালট সৃষ্টি করে দিতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় সংরক্ষণ তত্ত্বে সারবত্তা নিয়ে সাধারণ পর্যালোচনা করা গেল। এইসব তত্ত্বের মৌলিক দুর্বলতা উন্মোচিত করা হল। তবে সংরক্ষণের আরও অনেক যুক্তিতর্ক আছে যেগুলো হয়ত অধিক সহানুভূতির দাবীদার। বিশেষ করে, উন্নয়ন ক্রিয়াকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যুক্তিজাল অধিকতর সতর্কতার সাথে হাতড়িয়ে দেখা প্রয়োজন। এক যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, দরিদ্র দেশে তার বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে সঞ্চয়স্পৃহা বাড়াতে পারে। ফলে, মূলধন-সংগঠন সবল হয়। যুক্তিটি বড় মূল্যবান এবং তার ভিত্তি বেশ পাকাপোক্ত। তিন উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায় : বাণিজ্য অনুপাত অনুকূল করে, বিদেশী পুঁজি সরাসরিভাবে উৎসাহিত করে এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বর্ধিত করে। উপায়গুলো খতিয়ে দেখা যাক।

বাণিজ্য-শর্ত (terms of trade) অনুকূলে আনা বিশেষ করে দরিদ্র দেশের পক্ষে বেশ দুরূহ কাজ। তজ্জন্য 'সর্বোচ্চ শুল্ক' (optimum tariff) ধার্য করা যেতে পারে। এতে হয় রপ্তানি মূল্য-স্তর বর্ধিত হবে নতুবা, আমদানী মূল্য-স্তর হ্রাস পাবে। এই শুল্ক কার্যকরী করা গেলে বস্তুতঃ 'বিদেশীরা তা দেবে' ('make the foreigner pay the duty')। ফলে অল্প রপ্তানিতে প্রচুর আমদানী দ্রব্য পাওয়া যাবে। কিন্তু, কথা হল তা কি সম্ভব? দরিদ্র দেশের এত ক্ষমতা কোথায় যে বিদেশীদেরকে বাধ্য করাতে পারে? সমবায় ভিত্তিতে এগুতে পারলে হয়ত অনেকগুলো দরিদ্র দেশ একত্র হয়ে কিছুটা জোর খাটাতে পারে। অন্যদিকে, যদি দরিদ্র দেশের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহ একটা সঙ্কট-মাত্রায় নমনীয় হয়[৪] (elasticities of demand and supply were in critical range of values) তাহলে হয়ত সে সর্বোচ্চ শুল্ক ধার্য করতে পারে। এই সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আর যদি বা সম্ভব হয় তবে তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। বিদেশীদের মধ্যে তড়িতগতিতে প্রতিশোধ বৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে। তারাও বিরুদ্ধা-চরণশীল নীতি গড়ে তুলবে। সৃষ্টি হবে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে হয়ত নমনীয়তা পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। কাজেই, এই নীতি তেমন ফলবতী হতে পারে না।

তারচেয়ে বরং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা যেতে পারে। বাস্তবধর্মী শুল্ক নীতি গড়ে তুলে বিদেশী পুঁজিপতিকে হাতছানী দিয়ে ডাকা যেতে পারে। তাতে অধিক ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তথা-কথিত 'শুল্ক কারখানা' (tariff factories) স্থাপন করা যেতে পারে। তাতে সরাসরি শুল্ক ধার্যের অভিশাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। তেমনি উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী রহিত করা যেতে পারে। অথচ মূলধনী সাজ-সরঞ্জাম আমদানী অব্যাহত থাকবে। উদাহরণ হিসাবে কানাডার কথা উল্লেখ করা যায়। কানাডীয় শুল্ক নীতির প্রভাবে আমেরিকান শিল্পপতিরা সেই দেশে শিল্পশাখা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। ম্যাক্সিকোতেও এই জাতীয়

---

৪. এই ব্যাপারে শুল্ক তত্ত্ব ও একচেটিয়া তত্ত্বে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দেখুন T. de Scitovsky-এর "A Reconstruction of the Theory of Tariffs", Review of Economic Studies ix (2), পৃঃ ৮৯-১১০ (১৯৪১-১৯৪২); J. de V. Graff-এর Theoretical Welfare Economics, Cambridge University Press, Cambridge, ১৯৫৭ সাল. পৃঃ ১২২-১২৮।

শিল্পোন্নয়ন যথেষ্ট ঘটেছিল। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কীর্ণ হলে কিছুই হবার জো নেই। শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা আর না করা একই সমান হবে। কাজেই, বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে প্রাথমিক কর্তব্য। তবেই বিদেশী শিল্পপতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। তার আগে নয়।

নির্বাচিত পন্থা অনুসরণ করে সঞ্চয়স্পৃহা বাড়ানো যেতে পারে। বাছাই করা আমদানী নীতি প্রবর্তন করে সঞ্চয় অনুপাত বর্ধিত করে তোলা যেতে পারে। সযত্নে নির্বাচিত পন্থা ধরে অগ্রসর হয়ে কতকগুলো জিনিসের আমদানী সীমিত করে তুলতে হবে। তাহলে সৌখীন সেই-সব জিনিসের ভোগমাত্রা ও স্পৃহা হ্রাস পেতে থাকবে। তজ্জন্য আমদানী শুল্ক ধার্য করা যেতে পারে। লাইসেন্স নীতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। কোটা (quota) নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করাও হয়ত অনুচিত হবে না। আমদানীকৃত ভোগ-বিলাস সামগ্রী ভক্ষণ হ্রাস পাওয়া মানে দেশে সঞ্চয় বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ বিনিয়োগযোগ্য আয়ের মাত্রা বর্ধিত হওয়া। এই বর্ধন মূলধন-সংগঠনের নামান্তর। অতি সহজে এই আয় বিনিয়োগধারায় চালিত করে দেয়া যেতে পারে। অবশ্য নির্বাচিত নীতি ধরে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করায় অসুবিধাও রয়েছে বটে। তার ফলে মূল্যধারায় (price system) বাধা সৃষ্টি হয়। সহজ প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া হয়ত আমদানীকৃত ভোগের মাত্রা কমে যাওয়ায় দেশীয় জিনিসের ভোগমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাতে নীট লাভ হয়ত তেমন কিছুই হবে না। সঞ্চয় বাড়বে না অথচ বিপদের ঝুঁকি আছে। কেননা, দেশজ দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত চাহিদার চাপ পড়বে। তাতে মুদ্রাস্তর ঊর্ধ্বমুখী মোড় নিতে পারে। সর্বোপরি, হয়ত প্রশাসনিক গোল-যোগ দেখা দেবে। নিয়ন্ত্রন প্রথা কার্যকখা নানারকম কৃত্রিম বাধার পাহাড় সৃষ্টি করতে হয়। ক্রমে ক্রমে তা জটিলাকার ধারণ করে। ফঁকি দেয়ার প্রবণতা বাড়ে। অনুগ্রহ বিতরণের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। তাতে ঘুষপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতিমূলক স্পৃহা মাথা উচিয়ে উঠে। তারচেয়ে বরং দেশে বিলাসসামগ্রীর ভোগ কমাবার চেষ্টা করা অধিক শ্রেয়।

শুল্ক ও পরিমাণগত বাধা যেমন সৃষ্টি করা যায়, তেমনি বহুমুখী বিনিময় হারের (multiple exchange) রীতিনীতি চালু করা যেতে পারে। এই রীতি উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুসারী করে তোলা যেতে পারে।

কার্যক্রমের অগ্রাধিকার অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন ও নক্সা নির্ধারণ করে তোলা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় আমদানী করা হবে প্রথমে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্যতা অনুসারে আমদানী দ্রব্যের পরিসর ঠিক করে নিতে হবে[৫] বহুমুখী বিনিময় হার কতকাংশে মুদ্রামান হ্রাস করার ন্যায়। তাতে একদিকে যেমন পার্থক্যমূলক রীতির আওতা থেকে বাঁচা যায় তেমনি হয়ত তা দেশের জন্য একটা ভাল আয়ের সূত্র হতে পারে। দরিদ্র দেশের জন্য এই নীতি বিশেষ মঙ্গলকর হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে।

দ্রব্য-সামগ্রীর শ্রেণীভেদে বিনিময়হারে তারতম্য ঘটিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। তাতে রপ্তানি পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, আমদানী দ্রব্যে শ্রেণীগত বৈষম্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার ব্যয়সঙ্কোচ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। একটা দ্রব্যের উঁচু বিনিময় হার তার আমদানী তীব্রতর করতে পারে। ফলে তার আমদানীতে একটা 'অনুদান প্রভাব' (subsidy effect) ক্রিয়া করবে। মূলধনী সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল ও ভোগদ্রব্য ইত্যাদির বেলায় এই নীতি চালু করা যেতে পারে। অন্যদিকে, কোন দ্রব্যের হ্রাসকৃত বিনিময় হার তার আমদানী নিরুৎসাহিত করে। কেননা, তার আমদানী মূল্য বেড়ে যায়। ফলে দেশে উৎপাদিত সেই জাতীয় দ্রব্যের ভক্ষণ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। তাতে দেশীয় শিল্পে 'আশ্রয় প্রভাব' (shelter effect) ক্রিয়া করতে পারে।

তাতে অবশ্য বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুটা আছে বটে। কেননা, দরপ্রবাহ প্রতিহত হয়। তার স্থলে মুদ্রাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য এক্ষেত্রে মূল্যস্তরের অনুসারী না হয়ে মুদ্রাস্তরের অনুগামী হয়ে উঠে। এছাড়া, নিয়ন্ত্রণের অসুবিধাও এই রীতিতে পুরাপুরি বিদ্যমান। প্রশাসনিক গোলমাল দেখা দিতে পারে। বেসরকারী কর্মপ্রবাহ বিরূপভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি তীব্রতর হতে পারে। এদিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আশা-আকাঙক্ষার বিভ্রাট ঘটাতে পারে।

৫. বহুমুখী বিনিময় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন E. R. Schlesinger-এর Multiple Exchange Rates and Economic Development, International Finance Section, Princeton University Press, 1952; E. M. Bernstein-এর some Economic Aspects of Multiple Exchange Rates, IMF Staff Papers 1, No. 2, পৃঃ ২২৪-২৩৭ (সেঃ ১৯৫০ সাল)।

বাণিজ্যনীতি সীমাবদ্ধ করায় অপর যুক্তি বাণিজ্যিক ভারসাম্যের খাতিরে। বাণিজ্যিক লেনদেন সুষ্ঠু রাখা আবশ্যক। অথচ প্রায় সব দরিদ্র দেশ এই দুর্ভোগে ভোগে। তাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্যে অসম অবস্থা প্রায় নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। তিনদিক থেকে এই বৈষম্য জন্ম নিতে পারে : বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিশোধ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-চক্র ও মাত্রাতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি, কাজেই, বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োজন হতে পারে।

বিদেশী লগ্নী পরিশোধ করায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। দুদিন আগে আর পরে দরিদ্র দেশকে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। বিনিয়োগ হার, ক্রমঋণপরিশোধ সময় ও হার (amortizaton rate) এবং সুদের হার অনুসারে পরিশোধ সময় নির্ণিত হবে।[৬] পরিশোধ বোঝা উন্নয়ন কার্যক্রম-ধারা ব্যাহত করতে পারে। হয় রপ্তানি পরিমাণ বাড়াতে হবে, না হয় আমদানী কমাতে হবে। তবেই ঋণ পরিশোধ করা যাবে। সমস্যাটি আমা-দেরকে দেশের পরিশোষণ ক্ষমতার গোড়ায় নিয়ে যায়। বিদেশী বিনিয়োগ অন্তরিত করার ক্ষমতা অনুযায়ী পরিশোধ বোঝা কমবেশী হবে। সরাসরি বিদেশী বিনিযোগ তেমন অসুবিধা সৃষ্টি করে না। এই বিনিয়োগ মোটামুটি সহজভাবে বিধৃত হয়ে যায়। ঝামেলা বাধায় 'পত্রকোষধনী বিনিয়োগ' (Portfolio investment)। সরাসরি বিনিয়োগের সাথে প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক বিদ্যার আগমন ঘটে। তাছাড়া, সরাসরি বিনিয়োগ সাধারণতঃ রপ্তানি-শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই, এই বিনিয়োগ নিযে তেমন মাথা ঘামাতে হয় না। যত ঝক্কি দেখা দেয় অপ্রত্যক্ষ লগ্নী নিয়ে। এই বিনিয়োগের অন্তরণে একটু অসুবিধা হতে দেখা যায়। সে যাই হউক বিদেশী লগ্নী উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হলে এবং মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে পরিশোষিত হয়ে গেলে পরিশোধ সমস্যা তেমন প্রকট আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা, এই পরিস্থিতিতে হয় রপ্তানি বেড়ে যাবে না হয় আমদানীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। ফলে পরিশোধ সমস্যা সহজ হয়ে উঠবে। অবশ্য দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নামমাত্র হলে তাকে তা বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

---

৬. দেখুন, যথা E. D. Domar রচিত "Foreign Investment and Balance of Payments", American Economic Review, XL, No, 5, পৃঃ৮০৫-৮২৬ (ডিসেম্বর, ১৯৫০)।

আন্তর্জাতিক মন্দাবস্থা দেখা দিলে দরিদ্র দেশ বেশ বেকায়দায় পড়ে। দরিদ্র দেশ সাধারণতঃ কাঁচামাল রপ্তানি করে আর আমদানী করে। যন্ত্রপাতি, শিল্পজাত দ্রব্য ও অন্যান্য মূলধনী সামগ্রী। কাঁচামাল ভিত্তিক রপ্তানি বলে আন্তর্জাতিক ঝড়-ঝাপটার আঘাতটা দরিদ্র দেশে বেশ বড় করে লাগে। তার রপ্তানি মূল্য পড়ে যায়। বাণিজ্যিক লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র দেশের পক্ষে আমদানি বাধাবিপত্তি আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্যথায়, বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তন সাধিয়ে রপ্তানি বর্ধনে সচেষ্ট হতে হয়। চড়াহারে হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য হয়ত দেশকে নানারকম উপায় গ্রহণ করতে হবে। দ্রব্য-চুক্তি (Commodity agreements) সম্পাদন করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাফার স্টক বন্দোবস্ত করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। বাজার-বোর্ড প্রথা চালু করায় নামতে হবে।

দ্রব্য-চুক্তি নিয়ন্ত্রণ নানা কাজে আসে। উৎপাদন পরিমাণ রোধ করার জন্য হতে পারে। রপ্তানি পরিমাণ নিয়ন্ত্রনের জন্য হতে পারে। আমদানী হ্রাস করার জন্য হতে পারে। অথবা দরমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও হতে পারে।[৭] ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা দ্রব্যের বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা আনার জন্য বহু পাক্ষিক দ্রব্য-চুক্তি (Multilateral Commodity agreements) সম্পাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে, চিনি ও গমের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৫৩ সালে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক গম চুক্তিতে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ সংযোজিত হয়নি। তেমনি রপ্তানি পরিমাণ সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি, তা সমস্যাটিকে অন্যভাবে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছিল। কথা ছিল প্রতিটি দেশ একটা নির্দিষ্ট মানের গম একটা নির্ধারিত দাম মাত্রায় বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে এবং প্রতিটি আমদানীকারক দেশ নির্ধারিত পরিমাণ স্থিরীকৃত দরমাত্রায় কিনতে বাধ্য থাকবে। জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল উদ্যোগ নিয়ে ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক দ্রব্য বাণিজ্য কমিশন স্থাপন করে।

---

৭. দ্রব্য-চুক্তি ও বাজার স্টক বন্দোবস্তের সুন্দর আলোচনা করেছেন G. Myrdal তার বই "An International Economy"তে। আরও দেখতে পারেন জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত "Measures for International Economic Stability", New York, 1951 ; জাতীপুঞ্জ প্রকাশিত "Commodity Trade and Economic Development", New York, 1954.

কমিশনের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়: কাঁচামালের ব্যবসায় মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি দমন করার পথ বাতলানো, দরমাত্রা ও পরিমাণে যে উঠা-নামা দেখা যায় তা রোধ করার জন্য উপায় নির্দেশ করা, শিল্পদ্রব্যের দামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাঁচামালের ন্যায্যমূল্য নির্ধারিত করার পরামর্শ দেয়া।

বহুদেশ বাজার-বোর্ড (Marketing Board) গড়ে তুলেছে। যেমন, নাইজিরিয়া, গোল্ডকোষ্ট, বার্মা ও থাইল্যাণ্ড। এই সমস্ত দেশের সরকার বাজারকরণীয় বোর্ডের মাধ্যমে স্থিরীকৃত দামে কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনে নেয়, পরে সেই সব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। ফলে, হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত সমস্যা হ্রাস পায়। কৃষকের হাতে টাকার প্রবাহ থাকে। অর্থাৎ বোর্ড কাঁচামালের দামে উঠানামাজনিত জটিলাবর্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। আরও একটু ক্রিয়াশীল হয়ে বোর্ড কৃষকের অশেষ উপকার সাধন করতে পারে। উপযুক্ত ফাণ্ড সৃষ্টি করে মন্দাকালে কৃষককে সাহায্য দিতে পারে। আবার প্রাচুর্য-পর্বে তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে বেশ কিছুটা বেশী করে। তাতে একদিকে যেমন কাঁচামালের দামে স্থিতিশীলতা আসে, অন্যদিকে বোর্ডের হাতে বেশ পুঁজি জমা হয়। এই পুঁজি বোর্ড অন্যত্র খাটাতে পারে। যেমন পশ্চিম আফ্রিকা এবং উগাণ্ডা করেছে। তথাকার আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ডগুলো যানবাহন ও শিক্ষাখাতে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করেছে এবং সবচেয়ে মজার কথা পশ্চিম আফ্রিকার বাজার বোর্ডগুলোর হাতে সেই দেশের সরকারের চেয়েও বেশী টাকা সঞ্চিত হয়েছে। অথচ মাত্র ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সনের মধ্যে এই সকল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা। এই সকল টাকা পুরোপুরি লগ্নী হওয়ার পর পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ অবশ্যই চাঙ্গা হয়ে উঠার সুযোগ পাবে।[৮]

এমন কি কেউ কেউ মনে করেন সুষ্ঠু মার্কেটিং বোর্ড ব্যবস্থা গড়ে উঠলে কৃষিজাত দ্রব্য বাজারীকরণে বিদ্যমান মধ্যবর্তী দালালদেরকে অপসারিত করা সম্ভব হবে। বেপারী, ফরিয়া, আড়তদার, ঠিকাদার প্রভৃতি

৮. এই জাতীয় বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে P.T. Baner রচিত "West African Trade", Cambridge University Press, Cambridge, 1955. পঞ্চম ভাগ দেখুন। এখন থেকে বইটিকে Baner-এর 'West African trade বলে চিহ্নিত করা হবে।

দালালদের কারসাজির ফলে কৃষকরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও অপদস্থ হয়। তাঁরা তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। অন্যদিকে, দরমাত্রা স্থিরীকৃত হওয়ার ফলে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে। ফলে সে উৎপাদনের গুণগত দিকে নজর দেয়ার অধিক সুযোগ পাবে। নাইজিরিয়ার অভিজ্ঞতা এই কথার নির্দেশ দেয়।

আভ্যন্তরীণ দরমাত্রা নিশ্চিত ও স্থিরীকৃত করার জন্য বোডকে অবশ্য বিশেষ সাবধানে পা ফেলতে হবে। বিদ্যমান দাম ও ভবিষ্যৎ দামের হিসাব কষে গড় ঠিক করে নিয়ে দরমাত্রা ধার্য করতে হবে। তাতে প্রাচুর্যকালে যে লাভ পাওয়া যাবে তা দিয়ে মন্দাকালের লোকসান পুষিয়ে যাবে। অবশ্য মধ্যবর্তী কাম্য এই দাম মাত্র ঠিক করা মুখের কথা নয়। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই দামমাত্রা হিসাব কষে নিতে হবে। বড় জটিল এই হিসাব। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দাম সাধারণত: নীচের দিকে ধরা হয় এবং কৃষকের কাছ থেকে বেশ একটা বড় ভাগ রেখে দেওয়া হয়।[৯] এতে কৃষককুল নিরাশ বোধ করে। বিশেষ এই প্রভাবের দীর্ঘকালীন ফলাফল তেমন সুখপ্রদ নাও হতে পারে। কৃষকরা হয়ত ফসল ফলানোতে তেমন উৎসাহ না-ও বোধ করতে পারে।

আরও বিপদ হতে পারে। স্থিতিশীল কথাটাই যে অনিশ্চিতার্থক। কাকে স্থিতিশীল করতে হবে? কিসে দৃঢ়তা আনত হবে? সে কি দামমাত্রা? না মুদ্রা আয়? নাকি খাঁটি আয়? একটাকে স্থিতিশীল করতে যেয়ে অন্যটা যে বাঁকাচূড়া হয়ে যায়।[১০] এক জায়গায় সাড়াতে যেয়ে অন্য সর্বত্র যে ওলট-পালট ঘটে যায়। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেন বাধ্যতামূলক সামাজিক সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলা হল। বেশ কথা। কিন্তু,

৯. P.T. Baner ও E. W. Paish-এর "The Reduction of Fluctuations in the Incomes of Primary Producers Further Considered", Economic journal, LXIX, No. 256, 722 (Dec. 1954) ও Baner প্রণীত "Marketing Monopoly in British Africa," Kyklos IX, No 2, 164—178 (1956) আলোচনা করুন। সুষ্ঠু আলোচনার জন্য P. Ady প্রণীত "Fluctuations in Incomes of Primary Producers : A Comment," Economic Journal, LXIII; No.-এর 251, 594-607 (Sept, 1953) দেখতে পারেন।

১০. Baner, "West African Trade", পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭১-২৭২।

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের কি অবস্থা? ব্যক্তিগত সঞ্চয় পথ যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদকের হাতে যে নূতন বিনিয়োগ ঘটাবার মত কিছুই থাকে না। এদিকে কৃষককে অন্নদাম প্রদান করে (প্রাচুর্য কালে) তাকেও যে দুর্বল করে তোলা হয়। তার মধ্যেও যে উজ্জীবন শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। সে যে অর্থকরী ফসল বেশী করে ফলাবার অর্থ খুঁজে পায় না। সরকারও যথেষ্ট ঝামেলায় জড়িয়ে যান। বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। আবার মাথায় বোঝাও যথেষ্ট চাপে। দরিদ্র দেশের নড়বড়ে সরকারের পক্ষে বোঝার উপর শাকের এই আঁটি বহন করা সম্ভব কি-না তাও ভেবে দেখার বিষয় বটে।

বাণিজ্যচক্রের ঘূর্ণনের ফলে দরিদ্র দেশ ঝক্কি পোহায়। হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত স্বল্পমেয়াদী এই সমস্যা যথেষ্ট কঠিন বটে। এদিকে আবার মূল্যস্তরে নড়াচড়া শুরু হয়। স্বাভাবতঃ তা উর্ধ্বমুখী মোড় নেয়। ক্রমে তা গাঢ় হয়। উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব তীব্রতর হতে থাকে। সঞ্চয় ও মূলধনাগম (Capital inflow) অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশী হলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে চাপ পড়ে। বাণিজ্য নীতি কিছুটা উপশম দিতে পারে। ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার পথ করে দিতে পারে। বিনিময় নিয়ন্ত্রণও হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পারে। পুঁজি-পাচার (Capital flight) বন্ধ করে অবস্থা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, বাণিজ্য নীতি একাকী মুদ্রাস্ফীতি দমনে যথেষ্ট নয়। তার ক্ষমতা সীমিত। তজ্জন্য আভ্যন্তরীণ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি সংস্কার করে নিতে হবে। তাছাড়া রপ্তানি বাড়াবার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রপ্তানি বাড়লেই কেবল অধিক আমদানী করা যায়। ফলে উন্নয়ন মাত্রা বেগবান করে তোলা যায়। অথচ মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে না। বাণিজ্যিক লেনদেনের ঝক্কি-ঝামেলাতেও পড়তে হয় না। মুদ্রাস্ফীতি বিরাজমান এমন দেশে বাণিজ্য নীতি উত্তপ্ত আবহাওয়াকে কিছুটা ঠাণ্ডা করার ভূমিকায় নামতে পারে। অনেকগুলো দুষ্ট প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। উদাহরণ দেয়া যাক—মুদ্রাস্ফীতি মজুরকে এক চোখে দেখে। ওদিকে মুনাফার মালিককে বড় বড় দুই চোখে দেখে। ফলে, চাহিদা মাত্রায় ওলট-পালট ঘটে যায়। এক্ষেত্রে বাণিজ্য নীতি ভূমিকায় নামতে পারে। চাহিদা সদ্য বেড়েছে এমন সব দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে অবস্থা কিছুটা সংহত করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম বাস্তবায়নে বাণিজ্য নীতি বেশ সুষ্ঠু ভূমিকা নিতে পারে। জাতীয় বেশ কয়টি লক্ষ্য অর্জনে তা সহায়ক হতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবাধ নীতি নিয়ে যে বাদানুবাদ চলছে সেক্ষেত্রেও বাণিজ্য নীতি শান্ত অথচ দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে পারে। অবাধ নীতিকে বেশী না ঘাটিয়ে তা উন্নয়ন কার্যক্রম-লক্ষ্য আকাঙ্ক্ষিত হারে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এদিকে আবার উন্নয়ন, অবাধ বাণিজ্য নীতি ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য যে যুগপৎ সম্ভব নয় সে কথাও নির্দেশ করে। একটাকে পেতে হলে অন্যটার একটু স্বার্থত্যাগ করতেই হবে। দরিদ্র দেশ অবশ্য অবাধ নীতিকে বলি দিতেই রাজী। কেননা, বাণিজ্য নীতি ঘুরিয়ে সমস্যাটির সমাধান দেয়া সবচেয়ে সোজা। উন্নয়ন কার্যকলাপ যেমন অব্যাহত থাকে তেমনি বাণিজ্যিক অসামঞ্জস্যের জ্বালা থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দরিদ্র দেশে মুদ্রা ও রাজস্বনীতি সারিয়ে নেয়া মোটেই সহজ নয়। কাজেই অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ কাজে দক্ষ বাণিজ্য নীতিকে সবাই হাতিয়ার করে নেয়।

আমদানী রপ্তানী-কর সুযোগ বুঝে বসাতে পারলে বেশ লাভ হয়। তেমনি বহুমুখী বিনিময় হার নীতি কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানীকারক দরিদ্র দেশকে বিশ্ব বাজারের মর্জি স্বেচ্ছাচারিতার কবল থেকে কতকাংশে রক্ষা করতে পারে। হয়ত অর্থনীতিকে বহুমুখী করণেও বেশ সহায়ক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু তার একটা খারাপ দিক আছে বটে। বিশ্ব-বাণিজ্যের ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সর্বোচ্চ উৎপাদন সীমা অর্জন সম্ভব হয় না। হয়ত অসুস্থ ও অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতার জন্ম দিতে পারে। মূলধনাগম ব্যাহত করে। অবাধ বাণিজ্য ছেড়ে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করার আগে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করে নিতে হবে। কেননা, বহির্বাণিজ্য উন্নয়ন কর্মপ্রচেষ্টায় এক বিরাট সঞ্চালক শক্তি। উনিশ শতকের অভিজ্ঞতা পরিষ্কার এই শিক্ষা দেয়। অবাধ বাণিজ্য বৃহদায়তন উৎপাদনকে সাহায্য করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই, এই নীতির পথে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করায় প্রচুর সাবধানতা প্রয়োজন। সূক্ষ্ম-ভাবে চুলচেরা বিবেচনা করে তবেই বাধার প্রাচীর গড়ে তোলা উচিত। এই বাঁধার প্রাচীর যত ন্যূন হয় ততই মঙ্গল। কেননা, দরিদ্র দেশ বাধার পাহাড় সৃষ্টি করে নিজকেই বরং বিশ্ব বাণিজ্যের সুবিধা থেকে

বঞ্চিত করে। গরীব দেশ বহির্বাণিজ্য ছাড়া চলতে পারে না। বিশ্ব-বাণিজ্যের ধারা থেকে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব-বাজারের পরিস্থিতি তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার আঙ্গিক প্রদান করবে। ফলে, উন্নয়ন-অগ্রগতি গতিশীল ও বেগবান। অন্যথায় তা হোঁচট খেতে থাকবে।

২. প্রযুক্তিক সাহায্য (Technical Assistance) :

বাণিজ্য নীতির আলোচনায় দরিদ্র দেশকে একাকী বিবেচনা করা হয়েছে। ধনী দেশের সাথে তুলনা করা হয়নি। অথবা ধনী দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও আলোচিত হয়নি। সম্প্রসারিত বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ধনী-দরিদ্র উভয় দেশের সুষ্ঠু নীতিমালার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উন্নত দেশ যথাবিহিত নীতিমালা গ্রহণ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারে। অবাধ বাণিজ্য বজায় রেখে এবং দরিদ্র দেশ থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের সুষ্ঠু প্রবাহে বাধার প্রাচীর না তুলে উন্নত দেশ সম্প্রসারিত বাণিজ্যের সুবিধা দরিদ্র দেশকে বেশ কিছুটা বিতরণ করতে পারে। প্রযুক্তিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে এই অবদানের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।

প্রযুক্তিক সাহায্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগ দরিদ্র দেশে সহজে অন্তরীত হতে পারে না। গরীব দেশের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম নূতন প্রচেষ্টা। চিরাচরিত কার্যবিধি ধারায় উন্নয়ন প্রকল্প বিধৃত করা বেশ জটিল কাজ। এই জটিলতাকে ধনী দেশের মূলধন হাল্কা করে দিতে পারে। একদিকে চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা আধুনিকীকরণে তা সহায়ক হতে পারে। অন্যদিকে মূলধনী সাজসরঞ্জাম বর্ধনে সঞ্চালক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। প্রচলিত আচার-প্রথা উন্নয়ন কার্যক্রমের তেমন অনুকূলে নয়। শিক্ষাদীক্ষা খাতে বিনিয়োগ ঘটিয়ে তা যথারীতি করে তুলতে পারে। ভাবনাচিন্তা আধুনিক করে দিতে পারে। সেই জন্যেই মার্শাল বলেন, "ভাবধারা, চাই শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রের হউক কি বিজ্ঞান জগতের হউক অথবা বাস্তব ক্রিয়াকর্ম জনিত হউক, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রতিটি মানবগোষ্ঠী তার পূর্ববর্তী বংশধরদের ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়। মানব জাতির বস্তুগত অগ্রগতি বিনষ্ট হয়ে গেলে তা অচিরেই পূরণ করা যায়। কিন্তু, তার ভাবধারা নষ্ট হয়ে গেলে

তা অপূরণীয়। দিনে দিনে সেই জাতি ক্ষয়ে যেতে থাকে এবং অতি-সত্বর তা দুঃখ-লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়ে উঠে।"[১১]

উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে মূলধনাগম হওয়া উচিত, শুধু তাই না, দরিদ্র দেশের উন্নয়ন কর্মক্রিয়ার সাহায্য-হস্ত সম্প্রসারিত করতে চাইলে ধনী দেশকে অবশ্যই প্রযুক্তিক ও শিক্ষাগত সাহায্য প্রদান করতে হবে। শতাব্দীর প্রাচীন উন্নত দেশগুলো প্রযুক্তিক ও প্রকৌশলিক বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছে। অর্থাৎ ধনী দেশ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক উন্নত এবং তার উৎপাদন-শক্তি অধিকতর দক্ষ। দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মূলধনাগম যেমন ঘটেছে, তেমনি জনাগম ও প্রযুক্তিক বিদ্যার আগমন ঘটেছে। আজকের দুনিয়ায় জনাগম তেমন উল্লেখযোগ্য হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু, প্রযুক্তিক বিদ্যার সম্প্রসারণে বাধা নেই। এই সম্প্রসারণ উন্নয়নক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ। ইতিমধ্যে প্রচুর চেষ্টা-চরিত্র চলছে। প্রযুক্তিক-বিদ্যা দরিদ্র দেশের নাগালে পৌঁছে দেবার জন্য বেশ কতকগুলো প্রযুক্তিক সহযোগিতা-মূলক কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এর কিছুটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফল। আর বাকীটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিণাম।

বৃটিশ যুক্তরাজ্যে প্রণীত ১৯২৯ সালের (Colonial Development and Welfare Act) এই জাতীয় প্রচেষ্টার গোড়ার দিককার একটি দৃষ্টান্ত। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, জলসরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। তার ফলে বৃটিশ অধিকৃত উপনিবেশ-গুলোতে প্রযুক্তিজ্ঞান সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। তার সাথে আর্থিক সাহায্যও আসতে থাকে।

অবশ্য যুক্তরাজ্যের সাহায্য-নীতিতে প্রযুক্তির সাহায্যের চেয়ে আর্থিক সহযোগিতার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয়। আমেরিকান সাহায্যনীতি প্রযুক্তিক সহযোগিতার প্রতি বেশী জোর দেয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'চারদফা' (Fourth point) নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিক সহযোগিতা সংস্থা (United States Technical Co-operation Administration) স্থাপন করে। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থাকে Foreign Operations Administration-এর অন্তর্ভুক্তি

১১. দেখুন, Alfred Marshall-এর Principles of Economics, eighth edition, Macmillan & Co. Ltd., London, 1930, পৃঃ ৭৮০।

করে নেওয়া হয়। এই সংস্থার উপর অর্পিত হয় বিদেশী সাহায্যের সর্ব কর্মাবলী। কেবল আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক (Export-Import Bank) ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ক্রিয়াবলী বাদ দিয়ে। বর্তমানে অবশ্য বৈদেশিক সাহায্যের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান International Co-operation Administration স্থাপিত হয়েছে।

১৯.১ সারণীতে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্তিক কার্যক্রমে দেয় ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের সাহায্যের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১১৬,৯00,000 ডলার ও ১১৬,৪00,000 ডলারে এসে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শিল্প প্রকল্পে তেমন একটা সাহায্য দেওয়া হয়নি। প্রধান অংশ গিয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে। সাহায্য প্রথা ভিন্নমুখী হয়ে উঠেছে। কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে আমেরিকান প্রকৌশলিক, প্রযুক্তি-বিদ্যাবিশারদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছে। কিছু স্কীম গ্রহণ করে দরিদ্র দেশের লোকদেরকে আমেরিকায় এসে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কিছু প্রকল্প 'প্রদর্শনী স্কীম' বাস্তবায়িত করেছে। এই দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদন-আঙ্গিক সুষ্ঠু করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ১৯৫৪ সালের এক হিসাব মতে দেখা যায় যে, প্রায় ৩000 আমেরিকান কর্মী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮00 জন লাতিন আমেরিকায়, ১১00 জন নিকটপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় এবং ১১00 জন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছিল।

সারণী ১৭.১

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রাযুক্তিক সাহায্য ব্যয়-বন্টন; রাজস্ব বর্ষ ১৯৫২ ও ১৯৫৩

অঞ্চল	১৯৫২ মোট (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১৯৫২ শিল্প প্রকল্পে (শতাংশ হিসাবে)	১৯৫৩ মোট (লক্ষ টাকার হিসাবে)	১৯৫৩ শিল্প প্রকল্পে (শতাংশ হিসাবে)
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	৩৭৮	১১.৭	৫২৪	৮.২
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৮৫৭	১৭.৭	৬৮৪	১৯.৯
লাতিন আমেরিকা	১৭৮	১.৪	২২৬	৭.১
মোট :	১.৪১৩	১৪.৩	১.৪২৪	১৩.৬

সূত্র: Technical Co-operation Administration, Proposed Program, Fiscal year, 1954, Parts, I and II, Washington D.C., May, 1954.

দেশভিত্তিক কিছুটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। লিবারিয়ায় আমেরিকান কর্মীরা প্রায় ৩০টি প্রকল্পে নিযুক্ত ছিল। এই সকল প্রকল্প জনকল্যাণমূলক কাজ, খনিজদ্রব্য উত্তোলন ও কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত ছিল। তার ফলে লিবারিয়ার অর্থনীতি বহুমুখী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ১৩ জন আমেরিকান বিশারদ ইন্দোনেশিয়ায় নিয়োজিত ছিল। তারা উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য কাজে সাহায্য করেছে। রাসায়নিক শিল্পে শ্রমিক সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করেছে। যান্ত্রিক বিদ্যা উন্নত করায় সহায়তা করেছে। পাকিস্তানে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছে। আবার ৭০ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্যও দিয়েছে। এই সাহায্য সার কারখানা গড়ে তোলায় সাহায্য করেছে। তাতে তার প্রধান খাদ্য চাউল উৎপাদন জোরদার হয়েছে। কলাম্বিয়া ১৯৫১ সালে আমেরিকান সহযোগিতা নিয়ে একটা শিল্প-জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছিল। এই জরিপের ভিত্তিতে Servicio অর্থাৎ যুক্ত কলাম্বিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সংঘ গড়ে উঠেছিল। এই সংঘ বিদ্যমান ছোটখাট শিল্প কারখানা সংস্কার করতে সাহায্য করেছিল এবং নব নব শিল্প স্থাপনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির আরও বহু সাহায্য অন্যান্য আরও অনেক দেশে বিতরণ করা হয়েছিল। এই সকল প্রযুক্তিক সহযোগিতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জনকল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা। উদাহরণ হিসাবে ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। কেবল ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের মধ্যে আমেরিকা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতকে প্রায় ১১০ লক্ষ ডলার প্রদান করেছিল। এই সাহায্য দিয়ে ভারত প্রযুক্তি জ্ঞান বিতরণ করেছে। সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য তৈরীকৃত দ্রব্য আমদানী করেছে। তাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে।

জাতিপুঞ্জ প্রযুক্তিক বিদ্যা সহায়ক সংস্থা এদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১৯৪৯ সালে প্রযুক্তিক সহযোগিতা বিতরণের জন্য বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাতে জাতিপুঞ্জের সমস্ত বিশেষজ্ঞ সংস্থা অংশগ্রহণ করে। টাকা আসে প্রতিটি সদস্য দেশ থেকে। ১৯৫৮ সালে এই কর্মসূচীর বাজেট ছিল ৭০,০০০,০০০ ডলার। তার মধ্যে ২৫,০০০,০০০ ডলার ছিল বিস্তৃত প্রযুক্তিক সহযোগিতা কার্যক্রমের অধীনে।

প্রযুক্তিক এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক

ও সামাজিক কাউন্সিল বিস্তৃত নীতিমালা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। এই নীতিগুলো হচ্ছে, (ক) সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক বিশারদ-দল গঠন করা; (খ) অনুন্নত দেশের কর্মীদলকে বিদেশে ট্রেনিং দিয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলার কর্মসূচী প্রণয়ন; (গ) স্বদেশে দক্ষ কারিগর গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করা; (ঘ) উন্নয়নকামী দেশকে প্রযুক্তি বিদ্যা বিশারদ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ পেতে সাহায্য করা এবং উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে সাহায্য-হস্ত সম্প্রসারিত করা।[১২]

জাতিপুঞ্জের প্রযুক্তিক সহযোগিতা নানারূপ হতে পারে। কোন বিশেষ বিশেষজ্ঞ কি বিশেষজ্ঞ দল অথবা যুক্ত মিশন দরিদ্র দেশকে পরামর্শ দিতে পারে ও নানারূপ কারিগরি সাহায্য প্রদান করতে পারে। ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি নাগাদ প্রায় ১৪৪০ জন বিশারদ বিভিন্ন দেশে কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা জীবনযাত্রামান উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। একটা ছোট্ট অথচ প্রতিভূমূলক উদাহরণ থেকে বিষয়টা অনুধাবন করা যাক: ইন্দোনেশিয়ার জন্য "সামাজিক ও শ্রম সম্পর্কিত একজন অভিজ্ঞ উপদেষ্টা" পাকিস্তানের জন্য "কর্মসংস্থান ও পেশাগত ট্রেনিং বিষয়ে দক্ষ উপদেষ্টা" একুয়েডরের জন্য 'কারিগরি ট্রেনিং, সাধারণ ট্রেনিং, কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিষয়ক ট্রেনিং সম্পর্কিত উপদেষ্টা বিশারদ"; থাইল্যাণ্ডের জন্য "বিজ্ঞান শিক্ষার বিশারদ, বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উপদেষ্টা"; সউদী আরবের জন্য "সেচ প্রকৌশলিক, যিনি সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে উপদেশ দিতে সক্ষম", বার্মার জন্য। "পরিসংখ্যান বিশারদ, তার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত বিভাগ আধুনিক করে তুলার নিমিত্তে" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মিটাতে শত শত দক্ষ, অভিজ্ঞ বিশারদ, পণ্ডিত ও উপদেষ্টা প্রয়োজন।

---

১২. জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল-এর E/1553, Resolution 222A (IX) Annex I-এ জ্ঞাতব্য নীতিমালা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রস্তাবে কার্যমান ও কারিগরি প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের অংশ গ্রহণের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কর্মপ্রবাহ সমন্বয় ও প্রকল্প নির্বাচন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দেশী দক্ষ কারিগর দল গড়ে তোলা প্রয়োজন। তেমনি বিশেষ বিশেষ কাজে পাকাপোক্ত বিশেষ কর্মীদল সৃজন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিপুঞ্জ ও তার অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ সংস্থা নানারূপ বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তিধারী ব্যক্তিরা বিদ্যুত উন্নয়ন, জল সরবরাহ, খনিজদ্রব্য উত্তোলন, শিল্পজ্ঞান, রাজস্বনীতি, যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করে থাকে।

প্রযুক্তিক সহযোগিতার অপর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে প্রদর্শনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন। এতে দরিদ্র দেশের মানুষ দেখে শেখার সুযোগ পায়। প্রকল্পগুলো বেশ হিসেব-নিকেশ করে বাছাই করা হয়। উন্নত উৎপাদন-আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়। উৎপাদিক শক্তি বাড়ার কায়দা প্রদর্শিত হয়। ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। হাতেনাতে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ঠেকে শেখার পরিবেশ দেয়া হয়। ফলে, শিক্ষা [illegible] সহজ হয়। টাকা-পয়সা ও সাজ-সরঞ্জাম জাতিপুঞ্জের [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] বাংলাদেশে এই কার্যক্রমের একটি বিশেষ [illegible]।

সারণী ১৯ ২

জাতিপুঞ্জের সম্প্রসারিত প্রযুক্তিক সহযোগিতা কার্যক্রম ঃ প্রত্যক্ষ প্রকল্প ব্যয় বণ্টন, ১৯৫৪ সাল

(হাজার ডলারের হিসাব)

কার্যক্ষেত্র	আফ্রিকা	দূরপ্রাচ্য	ইউরোপ	লাতিন আমেরিকা	মধ্যপ্রাচ্য	আন্তঃ অঞ্চল	মোট
শিল্প, খনিজ	—	১০১.২	১৬১.১	১১১.৪	১৪৫.১	২৪৩.৫	৮২৩.৪
কুটিরশিল্প ও চারুশিল্প	৯.৭	২০৩.০	—	৩৫.৬	১৬.২	—	৩১৭.৫
উৎপাদিকা-কেন্দ্র ইত্যাদি	৩০.৮	১০০.৪	৫.৩	—	২১.৯	৩৭.৬	২০৩.০
শিল্প সম্পর্ক, শ্রম-আইন	১১.২	৩৩.১	১১.১	১২.০	[illegible]	—	১৮৯.৮
প্রযুক্তিক-বিদ্যা ও ট্রেনিং	২২.১	—	—	৯১.০	৮১.১	—	২০০.২
পেশাগত ট্রেনিং	১৭৬.৭	১৬৫.২	২২৪.৫	১৭৪.৩	৫১.১	—	৭৯৪.২
মোট :	২৫০.৫	৭১৫.৮	৪০২.২	৫২০.৩	৩৩৭.৬	২৮১.৪	২,৫২৮
মোট, প্রত্যক্ষ প্রকল্প-ব্যয় :	১,৯৫৭.৫	৬০২০.৭	১,৪৩৮.১	৪,৩৩৮.০	৩০৩৫.৭	৭২০.৮	১৭,৫৮১.৫

সূত্র : অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, Official Records, 18th Session, Supplement No. 4, Sixth Report of the Technical Assitanc Committee. 1954, Statistics relate to the approved program for 1954.

জাতিসঙ্ঘ প্রযুক্তিক সহযোগিতা সংস্থার প্রশাসনিক শাখা অনুন্নত দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সবল করার চেষ্টায় রত রয়েছে। শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার গোড়ার কথা দক্ষ প্রশাসক দল গড়ে তোলা। প্রশাসনিক শাখা শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করে এবং হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয়। তার কর্ম-প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে দেশের প্রশাসন বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয়ে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সেইসব নীতিমালা বাস্তবায়নে আঙ্গিক সাহায্য থেকে উপদেষ্টা, প্রশাসন বিশারদ যোগান করে দেওয়া। প্রশাসন সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে সাহায্য করে শাসকবর্গকে সচল ও সজ্ঞান করে তোলা, ধারাবাহিকতায় উদ্বুদ্ধ করা, অর্থনৈতিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ করে তোলা, নিষ্ঠা, শ্রম, জ্ঞান ও সম্প্রীতির মর্যাদায় মর্যাদাশীল করে তোলা। প্রশাসনিক পটভূমিকা প্রশাসকের আয়ত্তে এনে দেওয়া। সমকালীন অভিজ্ঞান অনুসৃত পন্থা ও কর্মাবলীতে, প্রশাসনিক কর্মধারা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থায় সজাগ করে দেওয়া যাতে জাতিসঙ্ঘের সহযোগিতা উঠিয়ে নেবার পর দেশী শাসকবর্গ প্রশাসনরজ্জু এবং সাথে সাথে উন্নয়ন কর্মসূচী সচল ও সুস্থ রাখতে পারে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কলম্বো পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিক সহযোগিতার অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশ এই সংস্থার সদস্য। তাছাড়া রয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ তিনবৎসরের মধ্যে এই সংস্থাকে ৮০ লক্ষ ডলার চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হয়। এই ফাণ্ড প্রযুক্তিক সহযোগিতা কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার কথা। কর্তব্য অর্পিত হয় (ক) অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশগুলোর কর্মীবৃন্দকে ট্রেনিং দেওয়া। এই ট্রেনিং সদস্যভুক্ত অন্য কোন দেশে দিতে হবে। সর্বাধুনিক প্রথা ও পন্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য মিশন প্রেরণ করা; (খ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যসূচী প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও উপদেষ্টা দল প্রেরণ করা। তেমনি প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষ বিশারদ প্রেরণ করা। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা দল প্রেরণ করা; (গ) ট্রেনিং প্রদানে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সাহায্য দেওয়া।[১৩]

---

১৩. দেখুন, Report by the Commonwealth Consultative Committee, the Colombo Plan, H. M. S. O., London, Cmd. 8080, 1950. পৃঃ ৫৩।

১৯৫৩ সালের জুন মাস নাগাদ প্রায় দুই শত বিদেশী বিশেষজ্ঞ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে প্রেরণ করা হয়। তেমনি প্রায় ১১৫০ জন শিক্ষানবিশ বিনিময় কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন সদস্যদেশ পরিভ্রমণ করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রকৌশলিক, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, ব্যবস্থাপনা বিশারদ, কৃষিবিদ্যা বিশারদ, চিকিৎসক ও শিক্ষকের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্পও সংস্থাপিত হয়েছে। বৃটেন করাচিতে একটা টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম যুগিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়ায় ছাপাখানা সম্পর্কীয় স্কুল স্থাপনে সাহায্য প্রদান করেছে। ক্যানাডা পাকিস্তানে দুটো সিমেন্ট কারখানা ও একটা পাইপ ফ্যাক্টরী স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

প্রযুক্তিক সহযোগিতা এখনো তেমন ব্যাপক হয়ে উঠেনি। তার ক্ষেত্র-পরিসর আজও বেশ সীমিত। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই সহযোগিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে এবং সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা লাভের পন্থাবলী সম্পর্কে গঠনমূলক পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। প্রথমে কথা উঠে প্রযুক্তিক সহযোগিতা কি দ্বিপাক্ষিক হবে, যেমন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র করে চলেছে, না বহুমুখী ভিত্তিতে হবে যেমন, কলম্বো পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ করে চলেছে। পরিমাণের দিক থেকে আমেরিকান কর্ম-প্রণালী সবচেয়ে বৃহৎ। উপদেষ্টার বিবেচনায় তা জাতিসংঘ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বড়। খরচের হিসাবে প্রায় দশগুণের চেয়েও বেশী। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মপন্থা পরিচালনায় বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে তা অধিক গ্রহণীয় হয়। এই সহযোগিতার সাথে সূতা জড়ানো থাকে না। গজ-দাঁতের ভয় থাকে না। দাতা ও গ্রহিতার প্রশ্ন উঠে না। সদস্য হিসাবে দেশ সাহায্য পায়। বহু দরিদ্র দেশে "অতীত অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ নয়। এককালে বিদেশী শোষকের যাঁতাকলে পিষ্টদেশ কাউকে আজ তেমন বিশ্বাসের সাথে নিতে পারে না। সব সময় খুঁত খুঁজতে ভাব দেখা যায়। ফলে আধুনিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়।.... এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া সহযোগিতা অধিক গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। তেমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে না। সমকক্ষ অংশী হিসাবে উন্নত দেশের সাথে কাজ-কারবার করতে পারে।"[১৪]

১৪. জাতিসংঘ, Technical Assistance for Economic Development, New York, May 1949, E/1327, Add. 1, পৃ: ১২-১৩ দেখুন।

দ্বিতীয়তঃ এক দেশের দেখাদেখি অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়। বিশ্ব-সংস্থায় কোন দেশ বেশী চাঁদা দিতে দেখলে অন্য দেশও এগিয়ে আসার উৎসাহ বোধ করে অনেকটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে। তাতে আন্তর্জাতিক সংস্থা সবল ও সুস্থ হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে এমনটা হওয়ার সুযোগ বেশ নগণ্য। তৃতীয় সুযোগ হিসাবে সহযোগিতা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃবোধ প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যায়। বহু দেশ থেকে বহুবিধ বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে এমনটি পাওয়ার জো নেই। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণ রজ্জুবদ্ধ (tied loan) হয় না। তার ফলে ঋণগ্রহীতা দেশ ইচ্ছামত সাজসরঞ্জাম কেনার সুযোগ পায়। ঋণদাতা দেশ থেকে কেনার প্রয়োজন পড়ে না। পঞ্চমতঃ, ঋণ-স্রোত নিরন্তর হওয়ার সুযোগ বেশী হয়। কেননা, আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বৎসর বৎসর ধন-পরিষদের সম্মুখীন হতে হয় না। অথচ দেশ-ভিত্তিক হলে এই অনাবশ্যক অথচ প্রয়োজনীয় এই প্রথার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। সর্বশেষ সুবিধা হিসাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা যায়। বহু কাজে দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশীর দ্বারস্থ হতে হয়। যেমন যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, কি জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন। এই একটা প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রায়শঃ প্রয়োজন পড়ে।

প্রযুক্তিক সহযোগিতা সর্বক্ষম উৎপাদিত প্রক্রিয়া অথবা বড় শিক্ষা [illegible] যে, উন্নত দেশের পক্ষে অথচ দরিদ্র [illegible] যন্ত্রপাতি চালাই হাতে অনুন্নত দেশের [illegible] জো নেই। [illegible] দিক থেকে যত উন্নতই হউক না কেন, ধনী দেশে আবিষ্কৃত ও [illegible] ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যে দরিদ্র দেশে খাপে খাপে লেগে যাবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিকগত ভিন্নতা হেতু ধনী দেশের সাজ সরঞ্জাম দরিদ্র দেশে ব্যবহার করার সংস্কার করিয়ে নিতে হবে। অবিকল চাপ লাগাতে গেলে গোলমাল বেধে যাবে। বিদ্যমান সেকেলে পন্থা হয়ত আধুনিকীকরণের উপযোগীই নয়। এমতাবস্থায় চক মিলিয়ে অতি উন্নত প্রণালী গ্রহণ সম্ভব নয়। কাজেই, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত দেশের কলকারখানায় যথারীতি কাটছাঁট ঘটিয়ে তবে তা দারিদ্র দেশের কাজে লাগাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় বিকল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া উন্নত দেশের উৎপাদন

প্রণালী সাধারণতঃ পুঁজিভিত্তিক হয়। অথচ, দরিদ্র দেশে তা হয় শ্রমভিত্তিক। আধুনিক উৎপাদন ধারায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিচালন সে এক ঝক্কিমারি কাজ। তার জন্য চাই দক্ষ শ্রমিক, নিপুণ চালক, প্রবীণ কার্যনির্বাহক ও প্রকৌশলী। অথচ এগুলো যে দরিদ্র দেশে বাঘের দুধ। একেবারে না হলেও বিশেষভাবে দুষ্প্রাপ্য। এদিকে আধুনিক সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি পরিচালনায় যে সতর্কতার প্রয়োজন তা দরিদ্র দেশে পাওয়া যায় না। যন্ত্রপাতিরও যথেষ্ট অভাব, খুচরো নাট-বল্টু পাওয়া দুষ্কর। এমতাবস্থায় যন্ত্রপাতির জীয়নকালে ধনী দেশের তুলনায় দারিদ্র্য দেশে অনেক কম হয়। আজকের দিনে সাধারণতঃ উৎপাদন আকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়। অথচ দরিদ্র দেশে তেমনটা হওয়ার সুযোগ নগণ্য। কেননা, এখানে বাজার সঙ্কীর্ণতা বিশেষভাবে বিদ্যমান। কাজেই, ক্ষুদ্রাকৃতি ও মাঝারি আকৃতির উৎপাদন-আঙ্গিক হওয়া উচিত সূক্ষ্ম ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাতে সীমিত হয়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অবশ্য একথা অনুধাবন করার সঙ্গত কারণ নেই যে, তাহলে দারিদ্র দেশ মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে থাক। না, তা নয়। বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। পশ্চিম তার চেষ্টায় প্রকৃতিকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধেছে। সেবায় লাগিয়েছে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ। ফলে, প্রকৃতি সেবাদাসী সেজে তার পদপ্রান্তে পূজো দিয়ে চলেছে। এসেছে যান্ত্রিক বিপ্লব। কাজেই, এই অসুবিধা প্রাচ্যকেও অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তবে তা যেন অন্ধ অনুকরণ না হয়। নিজের দেশে জলবায়ুর সাথে যেন সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে নেয়া হয়। মান্ধাতার আমলের সেকেলে পদ্ধতি আঁকড়ে পড়ে থাকার যেমন মানে হয় না তেমনি দেশের জন্য সহনীয় নয় এমন উচ্চতর কায়দাকানুন ও যন্ত্রপাতি গ্রহণও বাঞ্ছনীয় নয়। তার মধ্যবর্তী সুলভ অথচ উপযোগী এমন কিছু একটা বেছে নিতে হবে।[১৫] সুচিন্তিত চয়ন যেন হয়। সব কিছু হাতিয়ে,

১৫. দেখুন, যথা Yab Brozen প্রণীত "Invention, Innovation and Imitation" American Economic Review, papers and proceedings XLI, No. ২, পৃঃ ২৫৫-২৫৬ (মে, ১৯৫১); H. De. Graff-এর "Some problems Involved in Transferring Technology to Underdeveloped Areas" Journal of farm Economics, XXXIII, No. 4, ৬৯৭—৭০৪ (নভে. ১৯৫১); আরও দেখতে পাবেন R. L Meier প্রণীতি Science and Economic Development John wiley & Sons & the Technology press, New York, 1956' পরিশিষ্ট।

সুফল-কুফল খতিয়ে, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দেখে নিয়ে তবে যেন উৎপাদন-আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়।

সংগতিপূর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে বিধিসিদ্ধ নীতিমালা প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রতিটি দেশকে আপন আপন আলোতে তা বিচার করে নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো, আঙ্গিকগত চক ইত্যাদি পরিস্থিতিতে প্রতিটি দেশকে তার উৎপাদন-আঙ্গিক বাছাই করে নিতে হবে। অবশ্য সাধারণভাবে কিছু বলা যেতে পারে। "সেই পন্থাই হবে উৎকৃষ্ট যা পুঁজির হারে সর্বোচ্চ ফলন দিতে পারে। হিসাব কষতে হবে শ্রম দামে, বাজারদরে নয়। এই বিচারে হয়ত সেইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার উচিত হবে যা সমগ্র বিকল্পের মধ্যে সহজ বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ চেহারা-সুরতে হবে বেশ শক্তপোক্ত ও গাট্টাগোট্টা টাইপের। ছোট ছোট আকারের হওয়া চাই, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আঙ্গিকগত নৈপুণ্য বজায় রাখা যায়। সেই আঙ্গিক গ্রহণ করতে হবে যা কাজে লাগাবে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত উপাদান সম্ভার।"[১৬]

সাধারণভাবে উপরোক্ত আঙ্গিকের সাথে মিলিয়ে চলা যেতে পারে। তার সাথে অবশ্য আরও যোগ করে নেয়া যায়,

১। এমন প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় যা অতিসহজে শেখা যায়। ঘোরপ্যাচালো কিছু গ্রহণ ঠিক নয় ;

২। বিনিয়োগের গর্ভধারণকাল ন্যূন করতে সক্ষম এমন প্রণালী গ্রহণ অধিক যুক্তিসঙ্গত ;

৩। শ্রমভিত্তিক উৎপাদন-আঙ্গিক দরিদ্র দেশের জন্য অধিক জনপ্রিয়। পুঁজিভিত্তিক আঙ্গিক বেশ বিরোধিতার সম্মুখীন হয় ;

৪। উপাদান ব্যবহারে মিতব্যয়ী এমন উৎপাদন-আঙ্গিক অধিক কাম্য। বিশেষ করে দরিদ্র দেশে সরবরাহ তেমন তেজী নয় (যেমন খনিজদ্রব্য, বিদ্যুৎশক্তি) এমন উপাদান বড় অল্প করে ব্যয় করে এমন আঙ্গিক বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।[১৭]

---

১৬. জাতিসঙ্ঘ. Processes and Problems of Industrialization in Underdeveloped Countries, New York, ১৯৫৫ সাল, পৃ: ৪৮।

১৭. দেখুন, L. H. Dupnier সম্পাদিত Economic Progress, Institute de re-charches Economiques at Sociales, Louvain, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত C.N. Vakil and P.R. Brahmanand রচিত "Techrical Know- ledge and Managerial Capacity As Limiting Factors in Industrial Expansion in Underdeveloped countries.

নব নব উন্মেষণী শক্তি, নব নব ধ্যান-ধারণা, নব নব যন্ত্রপাতি প্রবর্তন এক কথা, আর এই সব কার্যকরী করে তোলা অন্য কথা। আচার-প্রথার জঞ্জালে নিমজ্জিত দরিদ্র দেশের মানুষ সম্পূর্ণ অপরিচিত তেমন কিছু গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। কাজেই, নূতন প্রথা গ্রহণ ও তা জনসাধারণ্যে বিধৃত করা এক জটিল সমস্যা। ধনী দেশ আধুনিকতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। দরিদ্র দেশে সেকেলে প্রথা ও মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-আঙ্গিক এখনো বেশ ঝাঁকিয়ে বসে আছে। এই দুই দেশের পার্থক্য বিরাট। এই ফাঁক কমিয়ে আনতে হবে। কথাটা বলা যত সহজ করাটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। তজ্জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শ্রম নিয়োগ ও দক্ষ কলাকুশলী গড়ে তোলা, ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু করে নেওয়া, এবং প্রদর্শনীমূলক প্রকল্প অধিক হারে স্থাপন করা। সবচেয়ে বড় কথা, যোগ্য অনুপ্রেরণা প্রদান করা। অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে উদ্দীপনা আশা করা যায় না। উজ্জীবিত দৃষ্টিভঙ্গী নূতন প্রথা ও প্রণালী গ্রহণে শক্তিসুধা হিসাবে ক্রিয়া করে। হয়ত তেমন একটা কিছু করতে হবে না। সুচিন্তিত নীতি অনুসরণ করে সাদা-মাঠা প্রেরণা দিয়েই হয়ত কাজ সিদ্ধ হতে পারে। যেমন ধরুন অল্পসুদে ঋণ দেয়ার একটা শর্ত হতে পারে যে, উন্নত প্রণালী গ্রহণ করতে হবে। অথবা ভূমিসংস্কার ঋণ প্রদানের একটা শর্ত হতে পারে। অবশ্য প্রজা ফসলের একটা বিশেষ ভাগ পাবে।

বিদ্যমান মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে সংগতি রেখে প্রবর্তন করা যায় এমন প্রণালী তারচেয়ে সুষ্ঠু অথচ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন প্রণালী অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। তাতে হয়ত প্রচুর ফল পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য আস্তে আস্তে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নিতে হবে। মূল্যবোধ সতেজ ও সবল করে তুলতে হবে। তেমনি তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন করে নেয়া উচিত। কেবল তবেই উন্নত উৎপাদন-প্রণালী কার্যকরীভাবে চালু করা যাবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, উৎপাদন-প্রণালী সার্বিক সমস্যার একটা দিক মাত্র। কাজেই, সার্বিক চেহারায় পরিবর্তন সাধিয়ে তবেই প্রযুক্তিক সহযোগিতা কার্যক্রমের পুরো-পুরী ফল পাওয়া যাবে। তার আগে নয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক নীতিমালা (২)

১। বিদেশী বিনিয়োগঃ বেসরকারীঃ

আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হার অর্জনে দেশী সঞ্চয় ও কর যথেষ্ট নয়, কাজেই বাকীটুকু বিদেশ থেকে পাওয়া দরকার। বিদেশী মূলধনাগম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা স্বদেশজাত বিনিয়োগ সঞ্চালিত ও জোরদার করে। বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনী সাজসরঞ্জাম ও তৈরী দ্রব্য আমদানী সহজ করে। তাতে উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম দ্রুত হওয়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া, উন্নয়ন গতি বেগবান হয়ে উঠার সাথে সাথে বহু জিনিসের পরোক্ষ প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। বিদেশী পুঁজি এই সব দ্রব্য আমদানী সুলভ করে দেয়। বিপরীত পক্ষে, মূলধনাগম না হলে উন্নয়নমাত্রা আশানুরূপ হতে পারে না। ফলে, দরিদ্র দেশের পক্ষে উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম প্রয়োজন মাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না: হতে পারে, যদি দেশের অধিকাংশ সম্পদ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা চলে। তাতে জীবনযাপন মাত্রা সরাসরিভাবে নেমে আসতে পারে। হয়ত ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি মেনে নেয়া সম্ভব হলেও কার্যসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব? কলম্বো পরিকল্পনা তাই বলে।

এই সকল পন্থা বাস্তবধর্মী নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে উন্নয়ন কার্যক্রম হ্রাস করা সম্ভব নয়। তা করতে গেলে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। দরিদ্রতা তীব্র হতে পারে। জীবনযাত্রার মান নীচু করার সুযোগ নেই, করতে হলে প্রয়োজন একনায়কত্ববাদী সরকার। এদিকে মুদ্রাস্ফীতি মোটেও কাম্য নয়। তা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ভাঙ্গন ধরায়, সামাজিক কাঠামো-বৈকল্য ঘটায়।

নিজেদের সামর্থ্য যথেষ্ট নয়। স্বচেষ্টায় উন্নয়ন সাধন দরিদ্র দেশের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় বিদেশী সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর কি? কাজেই

নির্জীব অর্থনীতিকে সজীব করে তোলায় বিদেশী বিনিয়োগ দরিদ্র দেশের জন্য একান্ত আবশ্যক।[১]

সারণী ২০.১ লক্ষ্য করুন। এই নক্সা কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত দেশসমূহের জাতীয় পরিকল্পনায় পরদেশী মূলধনের ভূমিকার নির্দেশ দেয়। হিসাবটি কলম্বো পরিকল্পনার প্রথম ছয় বৎসরকার। হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সিংহল তার নিজ সম্পদ দিয়ে মোট ব্যয়ের মাত্র ৬০ ভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়। ভারত, পাকিস্তান ও মালয় আধা ভাগ করতেও সক্ষম নয়। ভারত তার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১.৬ বিলিয়ন ডলার বিদেশী মুদ্রা ঘাটতি বলে হিসাব কষেছে। পাকিস্তানের বেলায় তা প্রায় ৫০০ মিলিয়ন থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের মত।[২]

সারণী ২০.১. নির্বাচিত কতকগুলো দেশে উন্নয়ন কার্যসূচীর আয় সূত্র, সময়কাল—১৯৫১-১৯৫৭
(মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং-এর হিসাবে)
(ষষ্ঠ-বর্ষ উন্নয়ন কার্যক্রম)

আয়-সূত্র	ভারত	পাকিস্তান	সিংহল	মালয়
মোট ব্যয়	১৩৭৯	২৮০	১০২	১০৭
দেশী আয়	৫৬১	১৩৫	৬২	৪৬
স্টার্লিং উদ্বৃত্ত (Sterling balances)	২১১	১৬	১৯	—
অন্যান্য বহির্সূত্র	৬০৭	১২৯	৪১	৬১

সূত্র: Report by the Commonwealth Consultative Committee, the Colombo Plan, Cmd. 8080, H.M.S.O., London, 1950, 58.

বিদেশী মূলধন সরকারী অথবা বেসরকারী সূত্র থেকে আসতে পারে। বেসরকারী মূলধন আবার দুই জাতীয় হতে পারে। তা "সরাসরি

১. দেখুন, Government of Pakistan, Ministry of Economic Affairs, the Colombo Plan for Co-operative Economic Development in South & South-East Asia, পৃ: ৫৫।

২. দেখুন, E. S. Mason-এর "Emerging Requirements for an Expanding World Economy" in the Changing Environment of International Relations, Brooklings Lectures, 1956, Brooklings Institution, Washington, 1956, পৃ: ৮৯।

বিনিয়োগ'' হতে পারে, অথবা ''পত্রকোষ বিনিয়োগ'' Portfolio investment) হতে পারে। সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হলে বিদেশী লগ্নীকারক পরিসম্পৎ (assets)-এর মালিক হয়। পত্রকোষ বিনিয়োগ ঘটে কোম্পানী-কাগজ (Securities) কিনে। বিদেশী সরকারী ঋণ আসে সরকারী ঋণ ও অর্থ মঞ্জুরী হিসাবে। তা বিদেশী সরকারী সূত্রে আসতে পারে অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

বেসরকারী ঋণ কতকাংশে বেশ সুবিধাজনক। সরকারী ঋণ গ্রহীতা-দেশের করমাত্রা তীব্রতর করে। কিন্তু, বেসরকারী বিনিয়োগ তা বরং হালকা হয়। বিদেশী পুঁজিপতি হিসাব নিকাশ কষে বিনিয়োগ ঘটায়। কাজেই, ইহা অধিক উৎপাদনশীল হওয়া স্বাভাবিক। সরাসরি বিনিয়োগ সাথে করে নিয়ে আসে উন্নত উৎপাদন প্রণালী, উদ্যোক্তার নৈপুণ্য ও নব নব ধ্যান-ধারণা। এই বিনিয়োগ দরিদ্র দেশের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। দেশে একদল দক্ষ কারিগর গড়ে তোলে। পরিণামে উন্নত দেশের আধুনিক উৎপাদন-আঙ্গিক দরিদ্র দেশে অন্তরীত হওয়ার সুযোগ পায়। দক্ষতা বেড়ে উঠার প্রবণতা বাড়ে। 'পত্রকোষ' বিনিয়োগ অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ শ্রেয়। বিদেশী বিনিয়োগের লাভাংশ বেশ কিছুটা গ্রহীতা দেশে পুনর্বিনিয়োজিত হয়। অপ্রত্যক্ষ বিনিয়োগে সাধারণত: তা হয় না। তাছাড়া, সরাসরি বিনিয়োগ বাণিজ্যিক লেন-দেন তেমন চাপ সৃষ্টি করে না। অপ্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কিন্তু, বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায়ে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে মন্দাপর্বে তা অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। সরাসরি বিনিয়োগ মানে বাণিজ্য ও শিল্প ক্রিয়াকর্ম। তাতে লাভ-লোকসান উভয়ই হতে পারে। লোকসান না গেলেও লাভের মাত্রায় তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু, বেসরকারী ঋণে ধরাবাঁধা সুদ দিতে হয়। তেমনি তা নির্ধারিত সময় অন্তে আদায় করতে হয়। তাতে প্রচুর অসুবিধা বিদ্যমান। অনমনীয়তা ও ঋজুবদ্ধতা দরিদ্র দেশের জন্য বেশ দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায়। সরাসরি বিনিয়োগ দেশজ বিনিয়োগমাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। ক্ষেত্রবিশেষে তা অনুপ্রেরণা হিসাবে ক্রিয়া করে। দেশী মূলধনের সাথে মিশে বিনিয়োগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারণে সহায়তা করে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ মানে দেশের উৎপাদন ক্ষমতায় সরাসরি সংযোজন। বাকী ঋণ তেমন নাও হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত ফালতু কাজে বিনিয়োজিত হয়ে দেশের বোঝা বাড়াতে পারে।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় এতসব সুবিধা সত্ত্বেও বেসরকারী ঋণের পরিমাণ আজ আর তেমন বেশী নয়। দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধের ফলে বৃটেনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। তার বাণিজ্যিক লেন-দেন পরিস্থিতি মোটেও সুখের নয়। ফলে তার পক্ষে, বিদেশে তেমন আর পুঁজি খাটানো সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৫৬ সালের দরমাত্রার হিসাবে ১৯১৩ সালে বৃটেনের বিদেশে খাটানো পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮,০০০ লক্ষ পাউণ্ডের মত। অথচ ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে গড়ে তা ৬০০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হয়নি। ব্যক্তিগত মূলধনের প্রধান সূত্র আজকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগও বিশেষভাবে কমে গিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের তুলনায় তা নেহায়েতই নগণ্য। দশম অধ্যায়ে তা উন্মোচিত করা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালে তা সরাসরিভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর যেটুকু বা ঘটেছে তার নামমাত্র অংশ কেবল দরিদ্র দেশে এসেছে। উদাহরণ দেয়া যাক, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এশিয়ান দেশগুলো গড়ে প্রতি বৎসর মাত্র ২৫০০ লক্ষ ডলার পেয়েছে। ১৯৫০-১৯৫৫ সালে আমেরিকান সরাসরি বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ৭৩,৯৭০ লক্ষ ডলার। তার মধ্যে ক্যানাডা ও পশ্চিম ইউরোপ পেয়েছে প্রায় ৪১৫১ লক্ষ ডলার।[৩] যুদ্ধোত্তর কালের আমেরিকান প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বিশেষভাবে ঘটেছে পেট্রোলিয়াম শিল্পে। দরিদ্র দেশে বিনিয়োজিত সিংহভাগ গিয়েছে কৃষি ও আহরণ-ধর্মী (Extracting) শিল্প খাতে। নামমাত্র অংশ পেয়েছে উৎপাদনধর্মী শিল্পসমূহ। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঘটেছে এমন সব দেশে যেগুলো আগে থেকেই শিল্পে বেশ উন্নত। জনকাম্য প্রকল্প (Public utilities) ও রেলওয়ে উন্নয়নে বিদেশী বিনিয়োগ তেমন একটা ঘটেনি। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বৃটিশ বিনিয়োগের প্রায় অধিকাংশটা এই সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছিল। এদিকে আমেরিকান বিনিয়োগ ঘটেছে চক্রাকার তাল লয়ে। মন্দাকালে তা বিশেষভাবে নেমে এসেছে।

পরদেশী মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে পেতে হলে দাতা ও গ্রহীতা উভয় দেশকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। মূলধনাগম পথে অন্তরায়সমূহ

৩. আলোচনা করুন, U. S. Department of Commerce, "Growth of Foreign Investments in the United States and Abroad." Survey of Currnent Business, Aug. 1956, পৃঃ ১৪।

অপসরণে কার্যকরী নীতি গ্রহণ করতে হয়। পরিমাণ ও পরিসর সম্প্রসারণে উদ্যোগী হতে হয়। দরিদ্র দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে হয় যেন মূলধনাগম নিরন্তর হতে পারে।

উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াতে হবে। অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। তবেই বিদেশী ব্যক্তিগত মূলধন এগিয়ে আসবে। ঋণদাতা দেশের সরকার অনেক কিছু করতে পারে। বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত খবরাদি সংগ্রহ করে দেশের ব্যবসায়ী কুলকে জ্ঞাত করে তুলতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহ যোগাতে পারে। অধিক মুনাফার আশ্বাস দিতে হবে। ঝুঁকির মাত্রা কমাতে হবে। সমস্যার অন্তঃমূল খুঁজে বের করতে হবে এবং তা সারিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিদেশে বিনিয়োগ ঘটাবার ঝুঁকি বহুতর। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদেশী পুঁজিপতিকে নিরুৎসাহ করে। আইনিক দূর্বলতা তার কাছে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। জাতীয়তাকরণ প্রবণতা তার গতিবিধি সীমিত করে। তেমনি রাষ্ট্রায়ত্তকরণও। প্রতিদ্বন্দ্বিধর্মী শিল্পে সে নাক গলাতে রাজী নয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি ও মুদ্রাবিনিময় প্রথা তার কাছে এক ভয়াবহ জিনিস। অনেকগুলো শিল্পক্ষেত্রে হয়ত বিদেশী পুঁজি আগ্রহ দেখাতে পারে। কিন্তু, দরিদ্র দেশ সে সবে বিদেশী পুঁজি স্বাগত জানায় না। লাতিন আমেরিকার বহু দেশে বিদ্যমান "Saturation Laws" এই জাতীয় বাধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তেমনি ভারতে চারু ও কারুশিল্প সংরক্ষণ নীতি। মৌলিক শিল্পে বিদেশী পুঁজি তেমন অভিনন্দিত নয়। তেমনি অত্যাবশ্যক শিল্পক্ষেত্র বিদেশীর জন্য উন্মুক্ত নয়। কতক দেশ আবার বিদেশী গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। তার আয়মাত্রা বেঁধে দেয়। তার উপর কর-বোঝা ভারী করে। দেশী শ্রম নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়। এগুলো বিদেশী মূলধনাগম সীমিত করে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাণিজ্য-বিভাগ বিদেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের অন্তরায়সমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। প্রতিবন্ধকগুলো হল :

(ক) বাণিজ্য ও মুদ্রা প্রথায় বৈষম্য বিদ্যমান। বিকলতা বিরাজমান। ফলে সমতাধর্মী সন্ধি-স্থাপন কঠিন হয়। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মূলধনাগমন সীমিত করতে হয়। নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপ করতে হয়। বিনিয়োগক্ষেত্রে হিসাব কষে বাছাই করে নিতে

হয়। অবাধে সর্বত্র লগ্নী ঘটার সুযোগ সীমিত হয়। হিসাব নিকাশ মিটানো জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। মূলধন ও তৎ-উৎসারিত মুনাফা প্রত্যাবাসন (**repatriation**) নিয়ে যথেষ্ট ঝক্‌মারী পোহাতে হয়;

(খ) অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রবণতা বিরাজমান। ফলে বিদেশী পুঁজিপতি ভীতগ্রস্ত হয়। এদিকে আবার দেশী পুঁজিপতি বিরোধিতা করে। সরকারও দেশী পুঁজিপতির পক্ষ নেয়। গড়ে তোলে নানা রকম বাধা-বিপত্তির প্রাচীর। বিদেশী পুঁজির ধরন-ধারণ ও চলন-বলন নিয়ন্ত্রিত করে;

(গ) রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজমান বলে লগ্নীকারক নিরুৎসাহিত হয়;

(ঘ) দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সুস্থ নয়। মৌলিক সুবিধাদি বিদ্যমান নয়। দক্ষ শ্রমিকের অভাব। দেশী মূলধন নাজুক।[৪]

বিদেশী মূলধনাগম সবল করায় অনেকগুলো উপায় গ্রহণ করা যায়। বিদেশী পুঁজিপতির তথাকথিত ভয়ভীতি নিরসন করায় কার্যকরী পন্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বিনিয়োগ সন্ধি স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার সুস্পষ্ট ভাষায় আশ্বাস প্রদান করতে পারে। করপ্রথা মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। 'যুক্ত উদ্যোগ' উৎসাহিত করতে পারে। গ্রহীতা-দেশ বাধা-বিপত্তির লাগাম হালকা করতে পারে। তেমনি বহুতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারে।

সরকারী পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। চুক্তির শর্তাবলী স্পষ্ট ভাষায় একে অপর দেশে বিনিয়োগের ধারা ও গতি-প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করে নেবে। তাতে বৈমাত্রেয়সুলভ ব্যবহারের ভয় নিরুসিত হবে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। দেশগুলো হলো কলম্বিয়া, ইথিওপিয়া, হাইতি,

---

৪. আলোচনা করুন, Department of Commerce, Study of Factors Limiting American Private Foreign Investment, Washington D.C., July, 1953. আরো দেখতে পারেন, J. F. Gaston-এর Obstacles to Direct Foreign Investment, National Industrial Conference Board, New York, 1951.

ইসরাইল ও উরুগুয়ে। উরুগুয়ের সাথে সম্পাদিত বন্ধুসুলভ চুক্তি (Treaty of Friendship) উরুগুয়ে আমেরিকান ব্যবসায়ের অবাধ অন্তর্ভুক্তি ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অর্থনীতির সর্বত্র বিনিয়োগ হতে পারবে এবং একইরূপ ব্যবহার পাবে। কোথাও বৈষম্যমূলক ভেদাভেদ চলবে না। আমেরিকান কোমস্পানীগুলো ইচ্ছামত কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। করমাত্রা অধিক হবে না। আইন আদালতের চোখে সমান ব্যবহার পাবে। অর্থাৎ দেশী ও আমেরিকান পুঁজিপতিতে কোন ভেদাভেদ করাহবে না। জাতীয়-করণ প্রয়োজন হলে আমেরিকান ব্যবসায়ীরা তড়িগতিতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবে। মূলধন ও আয় ডলার হিসাবে পুনর্বাসিত হবে। কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। অবশ্য সঙ্কট দেখা দিলে হয়ত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি গ্রহণ করা যেতে পরে।

বিদেশে বিনিয়োগ সম্পর্কে সরকারী আশ্বাস এক বিরাট সঞ্চালক-শক্তি। তাতে ভয়ের মাত্রা হ্রাস হয়। বেসরকারী বিনিয়োগ জোরদার হওয়ার সুযোগ পায়। যেমন ধরুন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার পুঁজিপতি-দেরকে আশ্বাস প্রদান করল এই বলে যে, স্বত্ব-নিরসন (expropriation) কি ডলার হিসাবে আয় প্রত্যাগমন অনিশ্চিত হয়ে উঠলে, সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাহলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ভয়মুক্ত হতে পারে এবং অনেকটা আস্থা নিয়ে বিদেশে পুঁজি খাটাতে পারে। অবশ্য প্রত্যাভূতিমূলক guarantee অঙ্গীকার প্রদান যথেষ্ট অসুবিধার ব্যাপার। জটিল ও বিস্তৃত শর্তাবলীতে মাথা ঢুকাতে হয়। নানা জাতীয় প্রত্যয়িক অসুবিধা দেখা দেয়। ভিন্ন বিনিয়োগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নীতিমালা লিপিবদ্ধ করতে হয়। এদিকে ব্যবসায়ীরাও তেমন উৎসাহিত নয়। খরচ অধিক বলে প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যাভূতি পেতে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয়। তাছাড়া, সরকার কোম্পানীর দলিল দস্তাবেজ খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পায়। কোম্পানীর জন্য তাও এক ভীতির ব্যাপার বটে। এই সকল বাস্তব অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে আমে-রিকান সরকার এই ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি অথবা তেমন উৎসাহও দেখায়নি।

করক্ষেত্রে সুবিধাপ্রদান বরং অধিক লোভনীয়। ব্যবসায়ী বেশ আগ্রহ সহকারে কর সুবিধায় প্রতিউত্তর করে। ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয় দেশ কর-বোঝা হালকা করে সুবিধা প্রদান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দাতার পক্ষে ক্রিয়া করা অধিক সুবিধাজনক। গ্রহীতা-দেশ এমনিতেই

অসুবিধায় আছে। তার পক্ষে আয় হ্রাস করা অসুবিধাজনক বৈকি ; কিন্তু, দাতা-দেশের জন্য এমন নয়। তার টাকার থলে বেশ ভারী। সামান্য কিছুটা বেড়িয়ে গেলে তার জন্য এমন কিছু আসে-যায় না। সহজে সে তা সযে নিতে পারে। যেমন ধরুন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা কি বৃটেনের কথা। এইসব দেশে কব উদ্বৃত যথেষ্ট। তাদের জন্য একটু হ্রাস-বৃদ্ধিতে তেমন কিছু আসে-যায় না। দুইবার কর দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি দিযে দাতা-দেশ তাদের পুঁজিপতিদেরকে অধিক সুবিধা ও অনুপ্রেরণা প্রদান কবতে পারে। যুদ্ধোত্তর কালে এই প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে। বহু দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশ্য এখনো বহু বাধা বিদ্যমান রয়েছে। এই সকল বাধা-বিপত্তি অপসারণ আবশ্যকীয়।

বিদেশে অর্জিত আয় করমুক্ত করে তোলার জন্যও অনেকে বলে থাকেন। National Foreign Trade Council ও International Development Advisory Board আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রকে এই পরামর্শ দিয়েছে। পরামর্শটি অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যবহ। কিন্তু, আজও তা পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। মাত্র আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। আমেরিকান সরকার বিদেশে অর্জিত আয়কে করমুক্ত করেনি। তবে বিদেশে দেয় কর পরিমাণ জমা হিসাবে বিবেচিত বলে ধরে নেওয়ার নীতি গ্রহণ কবেছে। অর্থাৎ আমেরিকান কোম্পানীগুলো বিদেশে শাখা স্থাপন করে যে মুনাফা অর্জন করে তা কোম্পানীর মোট আয়ে যোগ করে নিয়ে তবে কর ধার্য হয়। তবে বিদেশী দেয়া কর কোম্পানীর জন্য জমা বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই পরিমাণ কর দেওয়া হতে কোম্পানীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমেরিকান সরকার বিদেশী আয়কে সরকারী কর আওতা বহির্ভূত করেনি। অথচ তা করে নিলে বেশ সুবিধা হতে পারে। একদিকে পুঁজিপতিরা অধিক উৎসাহ পেতে পারে। অন্য দিকে আমেরিকার দেখাদেখি অন্যান্য দেশও কর-বোঝা হালকা করার নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। গ্রহীতা-দেশ আমেবিকান পুঁজি আকৃষ্ট করায় অধিক আগ্রহশীল হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমেরিকান পুঁজিপতিরা অন্য দেশের পুঁজিপতির তুলনায় একটু সুবিধাও পাবে। তাকে আর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে না। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই নীতি গ্রহণে বেশ কিছুটা অসুবিধা রয়েছে। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে কোম্পানী অভাবনীয় লাভ (Windfull gain) পাওয়ার

সুযোগ পায়। অথচ দেশের রাজস্ব আয় হ্রাস পায়। এদিকে আয়-বন্টন প্রথায় বৈষম্য দেখা দেয়। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান রেয়াত-সুরাদ (concession) পায়। কেননা তারা বিদেশে শাখা স্থাপন করতে পারে। অথচ ছোট-খাট এমনকি মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ তারা যে দেশের সীমানার বাইরে কার্যকলাপ বিস্তৃত করতে পারে না। এদিকে বিনিয়োগ প্রথায়ও সঙ্কট অবস্থা দেখা দিতে পারে। এমনকি দাতা-দেশের অবস্থাও কাহিল হয়ে উঠতে পারে। কেননা, বাছ-বিচার ছাড়া রেয়াত দেয়া হলে সবায় সমভাবে সুযোগের ভাগী হয়। দেদার কার্যকলাপ বাড়িয়ে যেতে থাকে, ক্ষেত্র-অক্ষেত্র বাছ-বিচার ছাড়াই। ফলে বিনিয়োগ প্রবাহে বিষম অবস্থা দেখা দিতে পারে।

অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন যে বিদেশে বিনিয়োগ-খরচা ব্যবসায়ী-খরচা (business expense) বিসাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। এবং তদনুসারে তা লাভ-লোকসান খতিয়ানে (profit & loss A/C) অন্তরীত হওয়া দরকার। এই পরামর্শ মেনে নিলে বিনিযোগ-বর্ধন বিশেষ ত্বরান্বিত হতে পারে। কেননা, তাতে মূলধন-লোকসান (capital loss) ভয় তিরোহিত হয়ে যেতে বাধ্য। এমনকি এই নীতি করক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদান অপেক্ষাও শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। কেননা, আয় হলে এতে কর্‌বোঝা হাল্কা করার কথা উঠে। অর্থাৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান লাভজনক হয়ে উঠার পরে তবে কর-সুবিধা প্রদান করা যায়, তার আগে নয়। অথচ এই নীতিতে আয় হিসাবে আসবে এই সুযোগ দেয়ার পর।[৫]

স্বত্ব-নিরসন ভীতি দূরীভূত করার একটা উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে 'যৌথ উদ্যোগ' অথবা 'সরকারী-বেসরকারী যৌথ ব্যবসা' (Public-Private Partnership Investments) উৎসাহিত করা যেতে পারে। এই জাতীয় উদ্যোগে বিদেশী লগ্নীকারক, দেশী উদ্যোক্তা ও গ্রহীতা-দেশের সরকার একত্র হয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। যুক্ত উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লাতিন আমেরিকায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তেমনি দূরপ্রাচ্যেও যুক্ত প্রচেষ্টায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বহু বিদেশী কোম্পানী ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে

৫. দেখুন, যথা—M. C. Conick-এর "Stimulating Private Investment Abroad" Harvard Business Review, Nov-Dec, 1953, পৃঃ ১০৪।

তাদের জিনিসপত্তর উৎপাদন করায় অনুমতি প্রদান করেছে। অনেকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য পর্যন্ত করেছে। অনেক কোম্পানী তাদের মালামাল বিপণীকরণে শাখা স্থাপন করে চলেছে। বহু কোম্পানী ভারত সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে কালক্রমে তারা দেশী উদ্যোক্তার হাতে ব্যবসা ছেড়ে দেবে। ম্যাক্সিকোর Naciahal Financiera আমেরিকান পুঁজিপতির সাথে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আন্ত-র্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেশন বহু দেশে যুক্ত-উদ্যোগ সবল ও বিস্তৃত করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।[৬]

বৈদেশিক বেসরকারী পুঁজি আকৃষ্ট করার বহু নীতি নিয়ে আলোচনা করা গেল। এই সকল কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হলে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ও পরিসর বিস্তৃত হতে বাধ্য। তবে ইহাই যথেষ্ট নয়, অনুন্নত দেশের 'বিনিয়োগ-আবহাওয়া' বড় বিষাক্ত। এই দুষিত আবহাওয়া বিশুদ্ধিকরণ সোজা নয়। মূলধনাগম সহজ ও সুগম করায় আরও সচেষ্ট হতে হবে। বিদ্যমান জটিলাবস্থা সহজ করে তুলতে হবে। নানা-রূপ বাধা-বিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণ নাগপাশ কাটিয়ে তুলতে হবে। তবেই বিদেশী পুঁজিপতি অধিক আগ্রহান্বিত হবে। এই প্রসঙ্গে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর কথা উল্লেখ করা যায়। অনুন্নত দেশের বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রথা বড় বিদ্ঘুটে। এই প্রথা আরও শিথিল করে তুলতে হবে। তাতে সুদ ও লভ্যাংশ প্রেরণ সহজ হবে। তেমনি মুলধন প্রত্যাবাসন প্রথা অধিক নমনীয় হবে। তাতে বিদেশী পুঁজিপতি অধিক আশ্বস্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। বিধিবদ্ধ নীতিমালা গড়ে তুলতে হবে। এই সকল নীতি প্রণালী বিদেশীদের গোচরে আনতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চলার সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাতে করে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করার ঘোরপ্যাচালো বাছাই শিথিল হবে।[৭] শুল্ক-নীতি যথাবিহিত করে তুলতে হবে। বিদেশী পুঁজিপতি কর্তৃক স্থাপিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয়

---

৬. I.B.R.D. ও I.F.C.-এর কার্যপ্রণালী পরবর্তী অংশে আলোচিত হল।

৭. বিদেশী বিনিয়োগ সুক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্য : বিদ্যমান প্রযুক্তিক বিদ্যার হিসাবে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন ; বিনিয়োগ-গতি আকাঙ্ক্ষিত দিকে ধাবিত করা ; বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখা। অবশ্য এই সমীক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর হতে পারে। পরিশোধ অসুবিধা, কি দেশজ দ্রব্যে চাহিদার তারতম্যের দোহাই পেড়ে বিদেশী বিনিয়োগ নাকচ করে দিলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। আমদানী দ্রব্যে চাপ বাড়তে পারে। রপ্তানীক্ষেত্রে বিষম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বাজার প্রথা বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সুক্ষ্ম অনুসন্ধান চালাবার আগে মৌলিক প্রশ্ন (অবাধ নীতি সম্পর্কে) সমাধান করে নিতে হবে।

সাজ-সরঞ্জাম ও কাঁচামাল ইত্যাদি আনয়নে শুল্ক সুবিধা প্রদান করতে হবে। তেমনি বিদেশী বাণিজ্য-সংস্থাকে নানারূপ উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে বৈধ ব্যবস্থা, শ্রম নিয়োগ, স্থান নির্ণয় ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক হাজারো বিষয়ে অবহিত করে তুলতে হবে।

সোজা কথায়, মূলধনাগম সহজ ও সক্রিয় করায় দাতা ও গ্রহীতা উভয় দেশকে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে অগ্রসর হতে হবে। বিধিবদ্ধ নীতিমালা রচনা করে বিনিয়োগ-পরিবেশ সুস্থ করায় উভয় দেশকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এদিক থেকে চিলিতে প্রচলিত একটা বিধি শিক্ষাপ্রদ বলে প্রমাণিত হতে পারে। এই বিধি অনুসারে বিদেশী বিনিয়োগ রপ্তানী-শিল্পে, অথবা এমন শিল্পে যা শতকরা ৮০ ভাগ বা ততোধিক দেশী কাঁচামাল ব্যবহার করে অথবা উৎপন্ন দ্রব্য দেশে বিক্রি করে ঘটাতে হবে। তাহলে নিম্নে বর্ণিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে :

অন্ততঃ ১০ বৎসর পর্যন্ত সুদ ও মুনাফার টাকা অবাধে স্বদেশে প্রেরণ করতে পারবে;

৫ বৎসর পর থেকে প্রতি বৎসর মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যাবাসিত করতে পারবে;

সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আনয়নে আমদানী-শুল্ক মওকুফ পাবে;

১০ বৎসর অবধি নূতন কর রেহাই পাবে;

দর-নিয়ন্ত্রণ চালু করা যাবে না;

মূলধনের নব-মূল্যায়ন করা যাবে;

বিনিময় হারে বিনিময় হেতু মূলধনী-আয় দেখা দিলে তাতে কর চাপানো যাবে না; এবং

অর্জিত আয় বিনিয়োজিত হলে তা বিদেশী মূলধনে সংযোজন বলে পরিগণিত হবে এবং সব রকম সুবিধার ভাগীদার হবে।

সুতরাং, বেসরকারী বিদেশী বিনিয়োগ সম্প্রসারণের নীতি পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা গেল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তেমন একটা বর্ধন আশা করা হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রবাহ তেমন সবল হবে এমন আশা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ লক্ষ করা যায় না। বিদেশী পুঁজিপতি বড় স্পর্শকাতর ও অভিমানী, একটু নড়চড় দেখলেই তার কম্প দিয়ে জ্বর এসে যায়। সে ভেবে বসে আমায় বুঝি

নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে আবদ্ধ করে নিল। এদিকে গ্রহীতা ভাবে বিদেশী পুঁজি-পতিকে লাগাম দেয়া মানে তার করতলগত হয়ে পড়া। অর্থাৎ সে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক ঢুকাতে পারে। দাতার কাছে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বড় ভয়াবহ। সে এই সবের ভয় কাটাতে অনেক সময় নেয়। এদিকে আবার নীতিগত অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোজনিত তারতম্যও বাধা হিসাবে দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ বাজার তেমন সম্প্রসারিত নয় বলে বিদেশী উদ্যোক্তা নিরুৎসাহ বোধ করে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের মতে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার বিনিয়োগ বিদেশে তেমন বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত। আর জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের বক্তব্য হচ্ছে চুক্তি "মানেই সুস্থ পরিবেশ নয়। কাজেই, বিনিয়োগ-বিধি ঘোষণা করা, সন্ধি-শর্ত বাধ্য-বাধকতা, বাণিজ্য নীতি কি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মানেই বেসরকারী বিনিয়োগ জোরদার হয়ে উঠা নয়। সহজে তা স্বয়ংক্রিয় হবে উঠার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য।.......বিদেশী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বেগবান ও বিস্তৃত করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বোধ হয় অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা সবল ও সপুষ্ট করে তোলা এবং বিদেশী পুঁজিপতির মনে দৃঢ় আস্থা জাগানো। তার মধ্যে অভিজ্ঞতার সুস্থতা দেখা গেলে তবেই কেবল বিদেশী বিনিয়োগ ধারা বলবান ও নিরন্তর হতে পারে। কাজেই, সময় ও ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে নানা রকম সংস্থার মাধ্যমে বিদেশী পুঁজিপতির অত্যাধিক পরিচিতি বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তুলবে এবং তবেই সে বিনিয়োগ উৎসাহ বোধ করবে. হয়ত কালে বিদেশী বিনিয়োগ পরিসর ও পরিমাণ ব্যাপৃত হবে।"[৮]

২। বিদেশী বিনিয়োগ ঃ সরকারী

সুতরাং, বেসরকারী সুত্রে মূলধনাগম যেহেতু স্বল্প, সেহেতু উন্নয়ন-কামী দেশগুলোকে সরকারী সুত্রে অধিক হারে নির্ভরশীল হতে হবে।

৮. আলোচনা করুন, জাতিসংঘ প্রকাশিত Processes and Problems of Industrialization in Under-developed Countries, New York, ১৯৫৫ সাল, পৃষ্ঠা ৮৯, আরও দেখুন, W.L. Turop প্রণীত "American Interest in Asian Development" in the Changing Environment of International Relations, Brooklings Lectures, 1956, পৃ: ১২৮, ১৪৩-১৪৪।

কথাটা ভারতের কথা দিয়ে পরিসফুট করা যাক। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার। তার মাত্র ৫ শতাংশ অর্থাৎ কিনা ৯০০ মিলিয়ন ছিল সঞ্চয়। এই নামমাত্র সঞ্চয় দিয়ে মূলধনী-সম্পদের মূল্যাবনতি পুষিয়ে রাখা হয়ত চলে। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জীবনযাত্রামান সমপর্যায়ে রাখা না হয় সম্ভব হল। কিন্তু, উন্নয়ন খরচ আসবে কোথেকে? এই সঞ্চয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ কিনা আরও ৯০০ মিলিয়ন ডলার সঞ্চয় করা গেলেও যে উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালনা করা সহজ নয়। এমতাবস্থায় বিদেশী সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর কি? অথচ ১৯৫৪ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, সেই সময় পর্যন্ত ভারতে আমেরিকার সরাসরি ব্যক্তিগত বিনিময় মাত্র ৯২ মিলিয়ন ডলারের মত ছিল।

ভারতের এই হিসাব অনুযায়ী অন্য সব দরিদ্র দেশের প্রয়োজনীয়তা হিসাব কষা গেলে সমস্যাটির গুরুত্ব আন্দাজ করা যেতে পারে। ভেবে দেখুন কি বিরাট সমস্যা তা। জাতিসংঘের এক বিশারদ দলের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মাথাপিছু জাতীয় আয় বৎসরে ২ শতাংশ বাড়তে হলে বৎসরে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার লগ্নী করা প্রয়োজন।[৯] অথচ ১৯৪৯ সালের হিসাবে দেখা যায় এই সব দেশগুলো প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার ঘাটতিতে ভুগছে। দেশীয় সঞ্চয় বেশ কিছুটা বেড়ে যাবে এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা ধার্য করা হয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলারে। তার সাথে তুলনা করুন বর্তমান মূলধনাগম। বর্তমান মূলধনাগমের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন ডলারের অধিক নয়। কাজেই এবারে চিন্তা করুন মূলধনাগম কতগুণ বাড়ানো দরকার। বেসরকারী মূলধন যাহাই বাড়ুক না কেন, বিশেষভাবে নির্ভরশীল হতে হবে সরকারী বিনিয়োগের উপর।

৯. জাতিসংঘ প্রকাশিত Measures for the Economic Development of Under-developed Countries, New York, 1951-এর ৭৫-৮০ পৃষ্ঠা দেখুন। হিসাবটুকু ঐখান থেকে কষা। কৃষিখাত থেকে কর্মী অকৃষিখাতে উঠে আসবে, অকৃষিখাতে কর্ম-সংস্থানে মূলধন প্রয়োজন হবে, শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে মূলধন পরিমাণ প্রয়োজন, দেশী নীট সঞ্চয় ও উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে (assumptions)। এই ধরে নেওয়া কথাটা স্বাভাবিক কারণে তেমন স্পষ্ট নয়। কাজেই হিসাবটা নিখুঁত এমন দাবী করার কোন কারণ নেই। তবে সমস্যার নির্দেশ প্রদানে অবশ্যই যথেষ্ট।

বিদেশী সরকারী বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনায় বেশ কিছুটা সুবিধাজনক। প্রথমত সরকারী সুত্র থেকে পাওয়া ঋণগ্রহীতা-দেশ নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে। সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ছকের সাথে মিলিয়ে তা কাজে লাগানো যেতে পারে। খাতক দেশ নিজের প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ ব্যয় করতে পারে। ফলে বিদেশী ঋণের যে বদনাম অর্থাৎ কিনা বিদেশী ঋণের সবটা মজা মহাজন দেশ পায়, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা উৎসারিত ঋণে রাজনৈতিক প্রভাবজনিত ভীতি-ভয় থাকে না। সবে ঔপনিবেশিক শিকলমুক্ত অনুন্নত দেশগুলো স্বভাবত একটু অনুভূতিশীল। কাজেই রাজনৈতিক গন্ধযুক্ত মূলধন গ্রহণে বেশ একটু সচেতন। এই কারণেও সরকারী সূত্র থেকে পাওয়া ঋণ অধিক কাম্য। তাছাড়া, জনকাম্য প্রকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক এবং ঝুঁকির মাত্রা এত ব্যাপক যে বেসরকারী ঋণ সেইসবে একদিকে যেমন যথেষ্ট নয়, অন্যদিকে, তেমন আগ্রহান্বিতও নয়। কাজেই, স্থায়ী খরচামূলক প্রকল্পে সরকারী ঋণই অধিক শ্রেয়।

বহু দেশে ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ সরকারী সংস্থা বিদ্যমান রয়েছে। ১৯২৯ সালের Colonial Development and Welfare Act বৃটিশ সরকারকে ঔপনিবেশ দেশগুলোতে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে। এই ঋণের পরিমাণ অবশ্য বৎসরে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হতে পারে না এবং এই ঋণ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে। ১৯৪৫ সালের আইনে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ১২০০ লক্ষ পাউণ্ডে উন্নীত করা হয় এবং তা ১৯৪৬–১৯৫৬ এই দশ বৎসরের জন্য। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত Colonial Development Corporation এবং ১৯৫৩ সালে স্থাপিত Commonwealth Development Finance Company-ও একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বৃটিশ কলোনীগুলোতে ঋণ দানের নিমিত্তে। Colonial Development Corporation স্বয়ং কতকগুলো প্রকল্প পরিচালনা করে। অন্যান্য-ক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সহায়তা করে। আবার কতক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাথে সংযুক্ত হয়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। শর্ত থাকে যে কেউ এককভাবে তা পরিচালনা করতে পারবে না।[১০]

---

১০. Colonial Development Corporation-এর বিস্তৃত কার্য্যাবলী জানার জন্য আলোচনা করুন, Colonial Development Corporation, Report and Accounts, H.M.S.O London, annual.

Commonwealth Development Finance Company-এর নির্দিষ্ট মূলধন (authorised Capital) পরিমাণ হচ্ছে ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড আর ধার গ্রহণ করার ক্ষমতা হচ্ছে তার ইস্যুকৃত মূলধনের দ্বিগুণ। ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে তা অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া মূলধনের সম্পূরক হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। অনুমোদিত খাতককে এই কোম্পানী প্রয়োজনের একটা অংশ মাত্র ঋণ প্রদান করে থাকে। কোম্পানী তার কার্যকলাপের প্রথম বৎসরে তিনটা বড় জাতীয় প্রকল্পে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বিনিয়োগ করে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদ্যুত উৎপাদন প্রকল্প ও সেলিউলোজ মণ্ড উৎপাদন (Cellulose Pulp Production) প্রকল্প এবং পাকিস্তানে প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প।

১৯৩৪ সালে আমেরিকায় আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি সরকারী সংস্থা। আমেরিকার রপ্তানী-বাণিজ্য সমপ্রসারণের উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ক্ষমতা দেওয়া হয় এমন সব লেন-দেন ও প্রকল্পে উদ্যোগী হতে যেগুলো আমেরিকান রপ্তানী-বাণিজ্যে সহায়ক হতে পারে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তা পরিচালিত হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন করে "যোগ্যতা অনুসারে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতার ভিত্তিতে। ঋণ-গ্রহীতা দেশে উপকারের আলোতে। উপকারের হিসাব হয় ডলার অর্জন বা সঞ্চয়ের ক্ষমতানুসারে।[১১] ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা ১৯৫৪ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। সুদের হার ৩½ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত হয়। ঋণ দেওয়া হয় এক বৎসর থেকে ২০ বৎসরের জন্য সময় পর্যন্ত। নির্দিষ্ট প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয় এবং সাধারণত সরাসরি সরকারকে অথবা সরকারী করপোরেশনে। যদিও বেসরকারী ব্যাঙ্ক অথবা করপোরেশনে ঋণ দেওয়ায় বাধা নেই। সরকারী অনুমতি নিয়ে ব্যাঙ্ক বিদেশী নিয়োজিত বেসরকারী ঋণের জন্য জিম্মাদার হিসাবেও ক্রিয়া করতে পারে।

১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক দেয় ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭,৬৭০ লক্ষ ডলার। তার মধ্যে ৮,৯৭০ লক্ষ ডলার ছিল লাতিন আমেরিকায়, ১১০০ লক্ষ ডলার ছিল আফ্রিকায় এবং ৩৪৬০ লক্ষ ডলার ছিল এশিয়ায়। এই সমস্ত ঋণের অধিকাংশই নিয়োজিত ছিল

১১, দেখুন, U. S. Congress, House Committee on Foreign Affairs, the Mutual Security Act and Overseas Foreign Investment, Washington, June, 1953, পৃ: ৫৮।

জনকাম্যমূলক প্রকল্পে। পরে অবশ্য শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগ অনেক বেড়েছে। ব্যাঙ্ক ইস্পাত কারখানা স্থাপনে টাকা খাটিয়েছে (ব্রাজিল, চিলি, ম্যাক্সিকো, তুরস্ক); লৌহকারখানা স্থাপনে সাহায্য করেছে (ব্রাজিল, ম্যাক্সিকো); সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠায় ঋণ দিয়েছে (ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, ভেনেজুয়েলা); চিনির কল স্থাপনে সহায়ক হয়েছে (ম্যাক্সিকো), এবং রাসায়নিক ও সারকারখানা স্থাপনে টাকা খাটিয়েছে (মিশর, ইসরায়েল, ম্যাক্সিকো, তুরস্ক)।

যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকান সরকার আরও বহুতর ঋণ ও অর্থমঞ্জুরী প্রদান করেছে। ১৯৪৬-১৯৫০ সালে তার ঋণ ও অর্থমঞ্জুরীর (grants) পরিমাণ বেড়ে ২.৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্য থেকে লাতিন আমেরিকার ভাগে পড়েছে ৬০০ মিলিয়ন ডলার।[১২] ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দরিদ্র দেশে প্রায় ৮১৫০ লক্ষ ডলার প্রদান করেছে। ১৯৫৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩০০ লক্ষ ডলারে।[১৩] অবশ্য আমেরিকান সরকারের সাকুল্য ঋণের তুলনায় তা ছিল সামান্য মাত্র। ১৯৫২ সালে তার দেয় মোট ঋণের মাত্র ১৭ শতাংশ পেয়েছিল দরিদ্র দেশগুলো। ১৯৫৩ সালে তা নেমে ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। বেসরকারী ঋন যেমন তেলামাথায় তেল দিতে উদ্যোগী তেমনি আমেরিকান সরকারের ঋণের সিংহভাগ পেয়েছিল তথাকথিত উন্নত দেশগুলো।

দরিদ্র দেশে আমেরিকান সাহায্যের মোটা অঙ্ক এসেছে International Co-operation Administration ও তার পূর্বসূরীর মাধ্যমে। গুরুত্বের দিক থেকেও এই ঋণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩-৫৪ সালে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিক সহযোগিতার জন্য দেয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩৫০ লক্ষ ডলার। প্রযুক্তিক ঋণ বিতরিত হয়েছিল বহু দেশে। সেই তুলনায় অর্থনৈতিক ঋণ কেন্দ্রীভূত ছিল মাত্র কয়েকটি দেশে। তন্মধ্যে ভারত ইরান, ইসরাইয়েল ও আরব দেশগুলো সিংহভাগ পেয়েছিল। অর্থনৈতিক ঋণপ্রদানে নিয়ামক হচ্ছে অনুন্নত দেশকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত

১২. দেখুন, যথা M. L. Weiner ও R. Dalla Chiesa-এর "International Movements of Public Long-Term Capital and Grants, 1946-1950" IMF Staff Papers, IV No. 1, পৃঃ ১৪২ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)।

১৩. আলোচনা করুন, N. S. Buchanon ও H.S. Ellis প্রণীত Approaches to Economic Development গ্রন্থের ৩৬৩ পৃষ্ঠা। বইটি Twentieth Century Fund কর্তৃক ১৯৫৫ সালে New Yourk থেকে প্রকাশিত।

প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করা।" "স্বচেষ্টায় সেইসব প্রকল্প বাস্তবায়নে অক্ষম হলেই কেবল এই ঋণ দেয়া হয়।"[১৪] এই ঋণ অত্যাবশ্যকীয় আমদানীদ্রব্য আনয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঋণ দেওয়া হয় মঞ্জুরী আকারে অথবা ঋণ আকারে, শর্তাবলী বেশ শিথিল, আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্কের তুলনায়।

সরকারী ঋণের অপব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.)। এই ব্যাংক উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ-মঞ্জুরী দিয়ে থাকে। তা নিজের তহবিল থেকে হতে পারে অথবা বেসরকারী ঋণ বন্দোবস্ত করে হতে পারে। ব্যাঙ্কের গঠনপ্রণালী ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ-কাঠামো এমন যে বিনিয়োগের ঝুঁকি সদস্য সব সরকারের (১৯৫৬ সালে সদস্যসংখ্যা ৫৮ ছিল) কাঁধে পড়ে। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে ১০ বিলিয়ন ডলারের সমান। অবশ্য তার মাত্র ২০ শতাংশ আদায়কৃত হয় এবং এই আদায়কৃত মূলধনের একটা অংশ কেবল ঋণমঞ্জুরী দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন প্রণালী এমনভাবে প্রণীত হয় যেন ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে বেশ সম্পদ আয়ও করতে পারে। ফলে তার পক্ষে বেসরকারী ঋণ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ঘটানো সহজ হয়। তার জন্য ব্যাঙ্ক স্বীয় ঋণপত্র বিক্রি করতে পারে অথবা আন্তর্জাতিক ঋণ সংস্থাসমূহ থেকে ধার নিতে পারে। ব্যাঙ্কের আইন অনুযায়ী ঋণ উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে। শুধু তাই নয়, নির্বাচিত প্রকল্পে তা বিনিয়োজিত হতে হবে এবং কেবল বৈদেশিক মুদ্রার ভাগটুকু। প্রকল্প মূল্যায়ন যথাবিহিত হতে হবে। তজ্জন্য বিস্তৃত ও সুক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে নিতে হবে। ঋণ দিতে হবে এমন সব প্রকল্পে, গুরুত্ব বিবেচনায় যেগুলো অগ্রাধিকারসম্পন্ন। খাতক সদস্য-সরকার হতে পারে অথবা কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হতে পারে। ব্যক্তিগত কাউকে ঋণ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারকে জামিন হতে হবে। রজ্জু বাঁধা (tied loan) ঋণ দেওয়া বারণ। ব্যাঙ্ক যাচাই করে নেবে যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোন বেসরকারী সূত্র থেকে ঋণ পাওয়া সম্ভব কিনা। পেতে অসম্ভব হলে কেবল এই ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারবে।

---

১৪. দেখুন, Foreign Operations Administration, Monthly Operation Report, July,31, 1954, পৃ: ৮।

১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্কের দশ বৎসর পূর্তি হয়। এই সালের জুন মাস নাগাদ ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭,২০০ লক্ষ ডলারে। মোট ঋণসংখ্যা ছিল ১৫০টি এবং তা ৪২টি দেশে বিস্তৃত ছিল। রোডেশিয়া ও নিয়াশাল্যাণ্ড পায় ১২২০ লক্ষ ডলার। এল-সালভাডর ২৪০ লক্ষ ডলার। ভারত পায় ২,০০০ লক্ষ ডলার। কলাম্বিয়ার ভাগে পড়ে ১১১০ লক্ষ ডলার। পাকিস্তান ৭৭০ লক্ষ, পেরু ৩৬০ লক্ষ, সিংহল ১৯০ ও চিলি ৩৭০ লক্ষ ডলার পায়। তন্মধ্যে একক প্রকল্পের জন্য সবচেয়ে বড় ঋণ ছিল রোডেশিয়া ও নিয়াশাল্যাণ্ডস্থিত কারিবা জল-বিদ্যুত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের জন্য দেয় ৮০০ লক্ষ ডলারের ঋণটি আর শিল্পক্ষেত্রে বড় ঋণ হল ভারতের টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য দেওয়া ৭৫০ লক্ষ ডলারের ঋণটি।

I.B.R.D.-এর দেওয়া অধিকাংশ ঋণ গিয়েছে বিদ্যুত প্রকল্প, যানবাহন ও পরিবহন সম্পর্কিত স্কীম উন্নয়নে। সরাসরি কৃষি ও শিল্পখাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প খুব কমই পেয়েছে। ১৯৫৬ সালের হিসাবে দেখা যায়, বিদ্যুত প্রকল্প ৭৮৯০ লক্ষ ডলার পেয়েছে। যানবাহন খাত পেয়েছে ৬৫৬০ লক্ষ ডলার। পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্পে পড়েছে ২৬০ লক্ষ ডলার। কৃষি ও বন শিল্প পেয়েছে ২২৮০ লক্ষ ডলার, শিল্পখাতে গিয়েছে ৩,৩১০ লক্ষ ডলার। সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ভাগ পেয়েছে ১,৪০০ লক্ষ ডলার।[১৫] এই বর্ণনায় একটা বিষয় লক্ষ করা যায়। দরিদ্র দেশের প্রয়োজনীয়তার দিকটা বিশেষভাবে ফুটে উঠে। ব্যাঙ্ক তার কার্যপ্রণালী দিয়ে বিশেষ কোন শিল্প-প্রসার প্রভাবিত না করে বরং উৎপাদন পরিবেশ সুষ্ঠু ও সম্প্রসারিত করায় অধিক আগ্রহী বলে মনে হয়।

উত্তমর্ণ কি জিম্মাদার (guarantor) উভয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বেশ হিসেব-নিকেশ করে এগোয়। যত্র-তত্র টাকা ছড়ায় না। রীতিমত আট-ঘাট বেঁধে তবে ঋণ দেয়। টাকা ফিরে পেতে যেন ঝক্কি না পোহাতে হয়। অবশ্য ধার দেওয়ার ব্যাপারে তার তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম বা নির্ণায়ক নেই। তুলনামূলক গুরুত্ব ও উৎপাদনশীলতা যাচাই করে বৃহত্তর স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাঙ্ক প্রকল্প নির্ধারণ করে নেয়। গ্রহীতা-দেশের সার্বিক মঙ্গলে প্রকল্পের কি অবদান হতে পারে, তার অর্থনীতি কি প্রকারে দৃঢ় হতে পারে, সেই

১৫. দেখুন, IBRD-এর Eleventh Annual Report, Washington, 1956, পৃ: ৫৮।

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে ব্যাঙ্ক প্রকল্পের লিস্ট তৈরী করে নেয়। অতঃপর বিনিয়োগ কর্মসূচীর সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী লিপিবদ্ধ করে নিয়ে সেই আলোতে লিস্টিবদ্ধ প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার ধার্য করে ঋণ প্রদানে অগ্রসর হয়। প্রকল্প প্রশাসনের প্রতিও দৃষ্টি দিয়ে থাকে। তেমনি সরকারের সহনযোগ্যতার প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখে।

ঋণ-বাছাই কার্যপ্রণালী (Processing of Loan) দুই পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে গ্রহীতা-দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লিপ্ত হয়। প্রকৌশলিক, প্রযুক্তিক, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে সাধারণ বিশ্লেষণ ছেড়ে প্রকল্প বিশেষের তন্ন তন্ন খোঁজ নেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের মতে এই সূক্ষ্ম অথচ বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। কেননা উপযুক্ত যাচাই ছাড়া ঋণ প্রদান মানে বোকামীর নামান্তর। খাতক-দেশের সত্যিকার দরকার কিনা দেখতে হবে। ঋণ নিয়ে তা সঠিক পথে ও ভাবে বিনিয়োগ ঘটাতে পারবে কিনা যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। না হয় ধরা গেল নিজের সম্পদ ছাড়া বাইরের সম্পদও গ্রহীতা-দেশ খাটাতে সক্ষম, তাহলে কথা দাঁড়ায় কতটুকু এবং কি হারে? ঋণ পরিশোধ করতে পারবে ত? ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বৈকি! ব্যাঙ্কের পক্ষে মাত্রাহীন ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়। তাছাড়া, দেশের উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তাও একটু দেখা প্রয়োজন। সর্বাগ্রে কোন্ কোন্ খাতে লগ্নী করা বাঞ্ছনীয় তাও বিবেচ্য। তন্মধ্যে কোন্ খাতে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা যাচাই করে নিতে হবে। সর্বোপরি, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিদ্যমান নীতিমালা ও পরিচালন প্রণালী উন্নয়নে অনুসারী কিনা, না কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিশোধন ঘটিয়ে তোলা দরকার তাও দেখা অবশ্যই দরকার। তা না হলে যে উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারিত হতে চাইবে না।[১৬] প্রাথমিক অনুসন্ধান সম্ভাবনাময় হিসাবে বিবেচিত হলে ব্যাঙ্ক বিস্তৃত আলোচনায় লিপ্ত হয়। স্বীয় উপদেষ্টা দল ও পরামর্শদাতাদেরকে দিয়ে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিক ও প্রশাসনিক দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নেয়।

১৬. দেখুন, যথা—The International Bank for Reconstuction and Development, 1946-1953, John Hopkins Press, Baltimore, 1954, পৃঃ ৬১।

নানারকম ঝুঁকি-ঝামেলার জন্য I.B.R.D. বেসরকারী খাতে তেমন লগ্নী করতে চায় না। সরকারী জামানত নাও, দেশীয় টাকা যোগাড়ের ঝুঁকি পোহাও ইত্যাদি কারণে বেসরকারী খাতে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ বিশেষ সীমিত, এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের নিমিত্তে ব্যাঙ্কের সঙ্গ সম্বন্ধীকৃত International Finance Corporation-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৫৬ সালে। I.B.R.D. সদস্যদের জন্য করপোরেশনের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়। কিন্তু তার পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করা হয়। সব দেশের সরকার সদস্য হলে করপোরেশনের মূলধন ১,০০০ লক্ষ ডলারে পরিণত হতে পারে। করপোরেশন বাইরে থেকেও ঋণ যোগাড় করে দিতে পারে। যাত্রাকালে করপোরেশনের সদস্যসংখ্যা ছিল ৩১ ও প্রাপ্ত মূলধন ছিল ৭৮০ লক্ষ ডলারের উর্ধ্বে।

সারণী ২০·২

দরিদ্র দেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ-প্রবাহ

সূত্র	পরিমাণ (লক্ষ ডলার হিসাবে) (বার্ষিক হার)
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র:	
পারস্পরিক নিরাপত্তা কার্যসূচী	৪,১৫০
আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক (নীট)	৭২০
দীর্ঘ মেয়াদী বেসরকারী বিনিযোগ	৫,০০০
আই.বি.আর.ডি. (নীট)	৯৮০
পশ্চিম ইউরোপ: সরকারী ও বেসরকারী	৫০০
মোট	১১,৩৫০

ব্যাখ্যা: (১) "দরিদ্র দেশ" মানে এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার স্বাধীন ও অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহ (জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতিরেকে)

(২) পারস্পরিক নিরাপত্তা কার্যসূচীতে ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত শেষ হওয়া রাজস্ব-বর্ষের হিসাব ধরা হয়েছে। তাতে ব্যয়ের হিসাব অন্তরীত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ১৬২০ লক্ষ ডলার "উন্নয়ন সাহায্য", ১৫৩০ লক্ষ ডলার "প্রযুক্তিক সহযোগীতা" (জাতিপুঞ্জ প্রযুক্তিক

সহযোগীতা কার্যক্রমে দেওয়া আমেরিকান টাকাও এর অন্তর্ভুক্ত), এবং এশিয়ান অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রেসিডেন্টের দেওয়া ১000 লক্ষ ডলার।

(৩) আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক ও আই.বি.আর.ডি.-এর হিসাব ১৯৫৪ পঞ্জিকা বর্ষের (Calendar years)।

(৪) আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দীর্ঘমেয়াদী বেসরকারী বিনিয়োগ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সালের গড় হিসাবে প্রদত্ত হয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র : Committee for Economic Development, Economic Devolopment Abroad and the Role of American Foreign Investment, New York, Feb. 1956. পৃঃ ৩০-৩১।

I.B.R.D.–এর তুলনায় বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের ক্ষমতা **I.F.C.**-এর অধিক। করপোরেশন একাকী বিনিয়োগ করতে পারে। দরকার মত বেসরকারী উদ্যোগের সাথে মিলে লগ্নী ঘটাতে পারে। তা নির্দিষ্ট সুদে ঋণ দিতে পারে। এমনকি সরকারী জিম্মাদারী ছাড়া ঝুঁকিদার প্রকল্পেও (venture capital) টাকা খাটাতে পারে। করপোরেশন সরাসরি ব্যবস্থাপনায় নামে না। তবে তা দক্ষ পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনে সহায়তা করে। সুযোগ বুঝে করপোরেশন বেসকারী ব্যবস্থাপনায় স্বীয় প্রকল্প ছেড়ে দিতে পারে। ফলে তার পক্ষে নিজের টাকা ফিরে পাওয়া কতকটা সহজ হয়।

এখানে অভিজ্ঞতার কথা বলা যাক। সরকারী সূত্র থেকে দেওয়া ঋণের মূল্যায়ন করা যাক। আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও আই.বি.আব.ডি. দেওয়া ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে। বেসকারী ঋণের অপ্রাচুর্যতা অনেকটা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেই যথেষ্ট নয়। সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম গড়ে তোলায় তা নেহায়েতই নগণ্য। উপরে প্রদত্ত ২০·২ সারণী লক্ষ্য করুন। তাতে দরিদ্র দেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ-প্রবাহ দেখানো হয়েছে। মোট পরিমাণ মাত্র এক বিলিয়ন ডলারের কিছুটা উপরে। ভবিষ্যতে তেমন একটা বেড়ে যাবে এমন মনে করারও যুক্তিসঙ্গত তেমন কারণ দেখা

যায় না। গ্রে রিপোর্টের হিসাব মতে এই সম্প্রসারণ ১.৬ বিলিয়ন থেকে ২.১ বিলিয়ন ডলারের মত হতে পারে।[১৭]

কাজেই, আন্তর্জাতিক ঋণ-প্রবাহ জোরদার ও বিস্তৃত করতে হলে নূতন সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ মোটেই যথেষ্ট নয়। দুটো নূতন সংস্থা গড়ে তোলার জন্য শলাপরামর্শ চলছে। এগুলো আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সম্পূরক হিসাবে ক্রিয়া করবে। যে দুটো সংস্থার কথা বলা হচ্ছে এগুলো হল: একটা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ তহবিল গড়ে তোলা (তহবিল ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়ে গিয়েছে—অনুবাদক)। তহবিল জাতিপুঞ্জের অধীনে একটা স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে ক্রিয়া করবে ও অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ অথবা অর্থমঞ্জুরী দেবে। শর্তাবলী অনেকটা সহজ হবে।[১৮] এদিকে বিদ্যমান সংস্থাগুলোকে আরও একটু জোরদার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আই.বি.আর.ডি.-এর ক্ষেত্রভূমি আরও প্রসারিত হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের একদল বিশারদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেন, "ব্যাঙ্কের কার্যক্রম আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে এমনভাবে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন যেন তা দরিদ্র দেশগুলোকে বৎসরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের মত দিতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে হয়ত আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদান কাঠামো নূতন করে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হতে পারে। জাতিপুঞ্জকে তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।"[১৯]

ঋণের ধরন-ধারণ ও আকার-প্রকৃতি নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ বলেন, ঋণ এমন হতে হবে যেন, যে প্রকল্পে তা বিনিয়োজিত হয় সেই প্রকল্প তা আদায় করতে পারে। অন্যদিকে, পরিশোধ ও সুদের ঝামেলাহীন অর্থমঞ্জুরী অন্যসব প্রকল্পে হতে পারে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কি কল্যাণমূলক প্রকল্প। আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক

---

১৭. দেখুন, Report to the President on Foreign Economic Policies, Washington, নভেম্বর ১০, ১৯৫০ সাল, পৃ: ৭২।

১৮. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগের Report on a Special United Nations Fund for Economic Development, New York, 1953.

১৯. জাতিপুঞ্জ প্রকাশিত Measures for Economic Development of Under-developed Countries, New York, ১৯৫১ সাল, পৃ: ৮৩-৮৪।

ব্যাঙ্ক অর্থমঞ্জুরী দিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলো অর্থমঞ্জুরী দিয়েছে বটে। তবে এমন সব দেশে যেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা অধিক যুক্তিযুক্ত। এমনিতে আমেরিকান গণ-পরিষদ অর্থমঞ্জুরী প্রদানের মোটেই পক্ষপাতি নয়।

অর্থমঞ্জুরী (grants) বাড়াবার পক্ষে বহু যুক্তি প্রদান করা যায়। দরিদ্র দেশের প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। অথচ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় অধিক ঋণ দেওয়া হলে সেই সব দেশের পক্ষে সুদে-আসলে তা আদায় করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, মহাজন-দেশও এত টাকা যোগাতে তেমন সক্ষম নয়।[২০] অর্থ-মঞ্জুরী এই অসুবিধা দূরীকরণে অনেকটা সাহায্য করতে পারে। আন্তর্জাতিক শোধ-পরিশোধ প্রবাহ-ধারা অনেকটা সুগম ও তরলতর করতে পারে। তাছাড়া, অনেকের মতে, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থমঞ্জুরী প্রদান করা একান্ত উচিত। ইহা, যুগধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, জীবনযাত্রার মানে দেশে দেশে যে বিভেদ বিদ্যমান এবং যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে তার দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে বিরল। তা সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যুগের ঘটনা। এদিকে, দেশে দেশে সহযোগিতা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান চলছে ক্রমবর্ধমান হারে। ফলে আকাশ-পাতাল এই ফাঁক সবার চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।......দরিদ্র দেশ থেকে সুদ নেয়া শুধু অন্যায় নয় বরং যুগধর্মের ব্যত্যায়। অনেকে আজ একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চলেছেন।"[২১] সুতরাং, বলা চলে যে ধনী-দরিদ্র দেশের লেন-দেন একমুখী হওয়া প্রয়োজন। তাই হয়ত হবে অধিক যুক্তিসঙ্গত ও যুগধর্মের অনুকূলে। ধনী দেশ হয়ত সুদ ইত্যাদি পাবে না। কিন্তু, পরোক্ষ-ভাবে যে লাভবান হবে এই সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কিছু নেই। কেননা, দরিদ্র দেশের যথার্থ আয় বর্ধনজনিত সুবিধা ধনী দেশও সমভাবে পাবে।

তবে মনে রাখতে হবে যেন অর্থমঞ্জুরী ভোগ-বিলাসে নষ্ট না হয়। তাহলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। মূলধন অপ্রাচুর্যতা সমস্যা সহজ হবে না। কাজেই, সাবধানে তা কাজে লাগাতে হবে। এদিক থেকে হয়ত

২০. আলোচনা করুন, W. L. Throp-এর Trade, Aid, or What? John Hopkins Press, Baltimore, ১৯৫০ সাল, পৃ: ২০১-২০২।

২১. দেখুন, R. Nurkse-এর "The Problem of International Investment in the Light of Nineteenth Century Experience", Economic Journal, LXIV, No 256, p.757 (Dec. 1954).

অর্থমঞ্জুরী গবেষণা, শিক্ষা সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্য, কৃষিঋণ কি পল্লীমঙ্গল কাজ ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যয়িত হতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে যেন অর্থমঞ্জুরী রাজনৈতিক দাবা-খেলার গুটিতে পরিণত না হয়।

সর্বশেষ কথা বলে আলোচনা ক্ষান্ত করা যাক। বিদেশী সাহায্য উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার ও বেগবান করবে সত্য। কিন্তু তাই বলে যেন দেশী সঞ্চয় প্রচেষ্টার অলসতা দেখা না দেয়। বেশী সঞ্চয়-মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। তা না হলে বিদেশী সাহায্য সংযোজন না হয়ে সংস্থাপন-ধর্মী হয়ে উঠতে পারে। তাতে মূলধন সংগঠন হার বাড়তে পারবে না। সুতরাং, কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজের সঞ্চয় বাড়িয়ে এবং তা উপযুক্ত খাতে সঞ্চালিত করেই কেবল অর্থনৈতিক পুনর্নব (rejuvenation) অর্জন সম্ভব। বিদেশী ঋণ ও অর্থমঞ্জুরী এই প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে পারে মাত্র।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

উন্নয়ন সম্ভাবনা

এই পর্বে উন্নয়ন-অন্তরায় ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করার সাধারণ নীতিমালা উন্মোচিত করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে বিচার বিশ্লেষিত নীতিমালা প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সক্ষম কিনা? দরিদ্র দেশে উন্নয়ন-সম্ভাবনা কতটুকু বিদ্যমান?

বর্তমান আলোচনার প্রথম অংশে এই সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্যাবলী সন্নিবেশিত করা হবে। এখানে এর অধিক কিছু বলার জো নেই। তজ্জন্য দেশভিত্তিক বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যে সাধারণ নীতি-নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে সেই আলোতে প্রতিটি দেশের বিশেষ সমস্যা সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখতে হবে এবং সমাধান-পন্থা খুঁজে নিতে হবে। এই বিশেষ অনুসন্ধানের সুবিধার্থে দ্বিতীয় পর্যায়ে কতকগুলো বিষয়ের রূপরেখা প্রদত্ত হবে।

১। উন্নয়ন সম্ভাব্যতা (Development Potential)

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। তার থেকে বুঝা যায় যে কতকগুলো দেশে উন্নয়ন পরিবেশ অধিক অনুকূল। বাকী দেশে তেমন নয়। অনুন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ মোটেই সুস্থ নয়। অন্তরায়সমুহ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। বাজার অপারঙ্গমতা, নষ্ট-চক্র, বিদেশী প্রভাব ইত্যাদি তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অবশ্য নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। অথবা এই মন্তব্য করাও হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয় যে দরিদ্র দেশে উন্নয়ন-সম্ভাব্যতা নেহায়েত নগণ্য।

এমন কথা কেউ হয়ত বলতে পারবেন না যে দরিদ্র দেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান তা দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন-সম্ভাবনার বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন একটা ধর্তব্য বিষয় নয়। গুরুত্বের দিক থেকে তা দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান হিসাবে পরিগণিত।[১] ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা

---

১. দেখুন, যথা—R. Leckachman সম্পাদিত National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Doubleday & Co., New York, 1955-এ প্রকাশিত S. Kuznets-এর "Toward a Theory of Economic Growth," পৃঃ ১০১।

দিয়ে কথাটা প্রমাণ করা যায়। জাপানের কথা ভাবুন। অথবা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা ইসরাইলের কথা চিন্তা করুন। তাছাড়া, অনুন্নত দেশ আজও তার প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরী ব্যবহারে লাগাতে পারেনি। আবিষ্কৃত সম্পদ ধনী দেশের মত কাজে লাগাতে শেখেনি। উন্নত উপায়ে কাজে খাটাবার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। উপাদান সামগ্রীর ফলন অধিক বাড়াতে পারে। অন্যদিকে যানবাহন ও বন্টন-জনিত খরচ হ্রাস করতে পারে। তদুপরি, প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার সম্ভাবনাও নগণ্য নয়। নব নব আবিষ্কারে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ দেশকে প্রচুর সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারে। নব নব উন্মোষণী শক্তির উদ্ভাবনে ও আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে আবিষ্কৃত সম্পদের তথা বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহার মাত্রা পরিসর বিস্তৃত হতে পারে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।[২] অন্যদিকে, প্রচুর উপাদান সামগ্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বহু দেশ আজও উন্নতির স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। কাজেই, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্যতার দোহাই পেড়ে উন্নয়ন অগ্রগতির অক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বাতুলতার নামান্তর। অপ্রাচুর্যতা বাধা বটে, তবে দুর্লংঘনীয় নয়। মূলধন ও দক্ষতার মাত্রা বাড়িয়ে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা যায়। নব নব দিগন্ত উন্মোচনা করা চলে।

জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দেদার গতিতে। দরিদ্র দেশের জন্য অবশ্যই তা মাথাব্যথার কারণ। তবে এক্ষেত্রেও হতাশ হওয়ার মত কিছু নেই। দুরতিক্রম্য বাধা নয় তা। তাছাড়া বহু দরিদ্র দেশ জনসংখ্যার চাপে ভোগে না। বরং, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ ক্ষীণ বসতিপূর্ণ। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে হয়ত এরা অধিক লাভবান হতে পারে। তাদের উন্নয়ন-গতি ত্বরান্বিত হতে পারে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোতে দেখতে গেলেও সমস্যাটা তেমন জটিল বলে মনে হওয়ার তেমন সঙ্গত কারণ নেই। কারণ আজকের যেসব উন্নত দেশ গোড়ার দিকে সেই সব দেশের জনসংখ্যা বর্ধন-হার যথেষ্ট ছিল। হয়ত আজকের বহু অনুন্নত দেশের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। কাজেই, ম্যাল-থুসিয়ান তত্ত্বের ভয়ে ভীত হওয়ার কিছু নেই, ইতিহাস এই তত্ত্বকে নাকচ্ করে

২. আলোচনা করুন, R.L. Meier প্রণীত Science and Economic Development, John Wiley & Sons & The Technology Press, New York, ১৯৫৬ সাল, পরিচ্ছেদ ২-৪।

দিয়েছে। জনসংখ্যার অধিক বর্ধন ভবিষ্যত উন্নয়নের অনুকূলে কেউ এমন বললেও আপত্তির তেমন কিছু দেখি না। নিমজ্জিত বেকারী যথা খাতে পরিচালিত করে উৎপাদনশীল করে তোলা সম্ভব হলে হয়ত তা মূলধন সংগঠনের একটা বলিষ্ঠ সূত্র হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একই স্তরে অবস্থিত দুইটি দেশ নিয়ে তর্ক বাধলে হয়ত প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে, অধিক লোকসংখ্যাসম্পন্ন দেশটি শ্রম-স্বল্পতায় ভোগা দেশটি অপেক্ষা অধিক দ্রুত হারে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।[৩]

সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে, সম্পদ-অপ্রতুলতা ও জনসংখ্যাধিক্য উন্নয়নের পথে তেমন দুর্লংঘ্য বাধা নয়। এই কথা মেনে নিয়ে ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করা চলে যে, দরিদ্র দেশের স্ফুটনোন্মুখ অগ্রগতির মাপকাঠি নির্ণীত হবে, অন্যান্য বাধা দূরীকরণে তার স্বার্থকতার উপরে। মূলধন-স্বল্পতা সরিয়ে তোলা, দক্ষ কর্মী দল সৃষ্টি করা, উদ্যোক্তা শ্রেণী জন্ম দেওয়া, জনশক্তিকে অধিক উৎপাদনশীল করে তোলা ও আধুনিকীকরণ করে নেয়া তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণে যেই দেশ যত দ্রুততার সাথে সক্ষম হবে তার উন্নয়নমাত্রা সেই হারে সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

প্রতিটি দেশ আজ জেগে উঠেছে। উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টায় সে মেতে উঠেছে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা বিস্তৃত ও বলশালী হয়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও দরিদ্র দেশ সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দেশ তার আভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রখর করে তোলাতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক স্থায়ী খরচা, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত হয়ে উঠেছে। রাজস্ব ও মুদ্রা-নীতি সংস্কার করে তুলছে। উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলায় সক্রিয় রয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আর্থিক, প্রযুক্তিক, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে।

আজকের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেও দরিদ্র দেশ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইতিহাসের প্রথম পাতায় চলে যান। দেখবেন সেকালে আজকের উন্নত দেশের সমস্যা কোন অংশে কম

৩. H.W. Singer-এর "Problems of Industrialization of Under-developed Countries" দেখুন. পৃঃ ১৮৬। প্রবন্ধটি L. H. Dupriez সম্পাদিত প্রাগুক্ত পুস্তকে পাওয়া যাবে।

ছিল না। হয়ত আজকের অনুন্নত দেশ অপেক্ষা তা ছিল আরও বিস্তৃত ও গভীর। তাদেরকেও মোটামুটি একই রকম সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু, তাদের অজেয় চেতনা তাদেরকে লক্ষ্যতীর্থে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারা উন্নত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। এইমাত্র এক শতাব্দী পেছনের কথা। জাপান দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ছিল। সম্পদ নেই, অথচ জনসংখ্যা-ভারগ্রস্ত। কৃষিভূমি পর্যাপ্ত নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল জটিলাকারে। চিরাচরিত সমাজপ্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পঙ্গু করে রেখেছিল জাপানী জীবন-চেতনাকে। কিন্তু, সেই ঘুমন্ত সিংহ আজ বিশ্বের এক বিস্ময়। উন্নয়নকামী দেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার কাছে ত কোন বাধা টেকেনি। তার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি সেই অলংঘনীয় জটিলাবর্ত। তাহলে আজকের দরিদ্র দেশ ঘাবড়াবে কেন? তার উন্নয়ন-সম্ভাবনাই বা সীমিত হবে কেন?

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা দেখে এবং বর্তমান অংশের বিশ্লেষণ পড়ে অনেকে হয়ত সেদিন আর এদিনের উন্নয়ন পথের বাধার প্রাচীরে তারতম্য লক্ষ্য করতে পারেন। অনেকের কাছে এই পার্থক্য আজকের জন্য তেমন সুবিধাজনক বলে মনে নাও হতে পারে। এই জাতীয় চার রকম পার্থক্য চিন্তা করা যায়, যথা (১) অধিকাংশ দরিদ্র দেশে কৃষিবিপ্লব অথবা বাণিজ্যবিপ্লব ঘটেনি। কাজেই তাদের উন্নয়ন-ভিত্তি দৃঢ় হতে পারেনি। ফলে শিল্পবিপ্লব ঘটার মত খুঁটি তৈরী হয়নি; (২) সেদিনকার পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অধিকাংশ দরিদ্র দেশ আজ অধিক জনসংখ্যাধিক্যে ভুগছে। এই জনাধিক্য উন্নয়নপ্রসূত নয়। বরং, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের জন্য; (৩) পশ্চিমা দেশগুলোর মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রতিকূলে ছিল না। অথচ আজকের যেসব দরিদ্র দেশ, তাদের মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা তেমন অনুকূল নয়, (৪) ধনী দরিদ্র দেশে বিদ্যমান ফাঁক দিনে দিনে প্রশস্ততর হচ্ছে। কাজেই ধনী দেশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দরিদ্র দেশ তাকে ধরতে যেয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। বর্তমানে শ্রমিক-প্রতি যান্ত্রিক ব্যয় সেকাল অপেক্ষা অধিক।[৪] তাই বলে অনুকূল আবহাওয়াও কিন্তু কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। প্রতিটি দেশ আজ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

৪. H. Aubrey রচিত "The Role of the State in Economic Development", American Economic Review, Papers & Proceedings. XLI, No. 2, পৃ: ২৭২ (মে, ১৯৫১)।

নেতৃবর্গ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উন্মুখ। উন্নত দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সহজলভ্য। ভুল-ত্রুটির খপ্পরে পা না দিয়ে অতি সহজে আজকের দরিদ্র দেশ উন্নত কায়দা-কানুন, উৎপাদন-আঙ্গিক ও যন্ত্রপাতি পেতে পাবে। সেদিনের অনুন্নত দেশের জন্য এর কোনটাই সহজলভ্য ছিল না।

সে যাই হউক, তুলনা দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে না। সমস্যার গুরুত্ব হয়ত উদঘাটিত হতে পারে। আসল বিবেচ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা কতটুকু বিদ্যমান তা খতিয়ে দেখা। দরিদ্র দেশকে একথা সম্যক উপলব্ধি করতে হবে যে, উন্নয়ন-ব্যয় তাকে বইতে হবে। উন্নয়ন ঘটাবার জ্বালা তাকে সইতে হবে। তবেই তার স্ফুটনোন্মুখ উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রস্ফুটিত হওয়ার পথ খুঁজে পাবে। উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে সুষ্ঠ ও সুচিন্তিত কার্যক্রম গড়ে তুলে নিষ্ঠার সাথে কর্ম-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই লক্ষ্মী চোখ তুলে চাইবে। তার আগে নয়।

সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটা বৃহত্তর বাধা মূলধন সংগঠন। একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মন্তব্য করা যায়, উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনের পথে মূলধন-হার সম্প্রসারণ একটা বড় রকমের ফ্যাকড়া ও যথেষ্ট অসুবিধের ব্যাপার। তার জন্য কেবল ভোগ কমালেই হল না। বরং তুলনামূলক দিক থেকে তা এমন গুরুত্বপূর্ণ নয় যেমনটা গুরুত্বপূর্ণ কৃষিখাত থেকে শ্রমিক শিল্পখাতে চালনা করা এবং ফটকা বাজারী ও অন-উৎপাদনধর্মী কার-কারবার থেকে অধিক উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মে বিনিয়োগ ধাবিত করা। পুঁজি-সংগঠন প্রথা চালু হয়ে বলবান হয়ে উঠলে পরে দৃষ্টি দিতে হবে যেন বাড়তি আয়ের বেশ একটা অংশ জমার খাতায় স্থান পায় অর্থাৎ কিনা মূলধন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তার মানে যেন নীট সঞ্চয় বাড়তে থাকে। আয় বেড়ে চলেছে অথচ ভোগমাত্রা তেমন বাড়তে দেয়া যাবে না—উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এই যে দুর্ভোগ—এটা সম্পর্কে ধ্রুপদী ও নব্য ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানীরা বড্ড বেশী মাথা ঘামিয়েছেন। দেশ দরিদ্র। তাকে হয়ত সম্পদ অধিক হারে কাজে খাটাতে হবে নতুবা বর্ধিত আয় ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই অগ্রগতির পথ মসৃণ ও দ্রুতশীল হবে। বিনিয়োগ বাড়ালে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে। এর হাত হইতে রক্ষা পেতে হলে উদ্বৃত্ত শ্রম কাজে লাগিয়ে পুঁজি-গঠন জোরদার করে নিতে হবে। অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয় বাড়াবার স্পৃহা যোগাতে হবে। নয়ত বর্ধিত কর অথবা অধিক হারে ঋণের পথ বেছে নিতে হবে।

মুদ্রাস্ফীতি নীতি মেনে মূলধন বাড়ানো যায়। কিন্তু, তাহলে স্ফীতি-জনক প্রতিক্রিয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে। এর ঝক্কিমারী পোহাতে হবে ও যথার্থ ব্যয় যোগাতে হবে। তেমনি, দেশের পরিশোষণ ক্ষমতা তার মূলধন-হার অপেক্ষা ন্যূন হলেও দেশকে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলা হতে হবে। মুদ্রাস্ফীতি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে পারে এবং তাহলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হতে বাধ্য।

মুদ্রাস্ফীতি ও তৎসৃষ্ট চাপ দূরীকরণে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক চেহারায় সমন্বয় সাধনে হয়ত সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জরুরী বলে প্রমাণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহনের জন্যও দেশকে তৈরী থাকতে হবে।

উন্নয়ন-অগ্রগতি মানে পরিবর্তন সাধন আর পরিবর্তন ঘটাতে গেলেই কতক হাণ্ডুল-পাণ্ডুল হয়ে যায়। দেখা দেয় নিরাশা ও হতাশা। চিরাচরিত আচার-প্রথা ও চলন-বলনে ভাঙ্গন ধরে। আবার আঁকড়ে ধরে থাকার লোকেরও অভাব হয় না। কায়েমীস্বার্থও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এইসব বাধা কাটিয়ে তোলার সুস্পষ্ট নীতি গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে-গড়ে আকাঙ্ক্ষিত ছকে ঢালাই ক'রে সাজিয়ে নিতে হবে। উন্নয়নের খাতিরে এই জ্বালা সইতে হবে।

উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে হাঁটিতে বেসে অন্যতর আরও বহু বাধা ও ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। সামাজিক, নৈতিক, ধার্মিক ইত্যাদি সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন ক্ষেত্রেও বিষম অবস্থা দেখা দিতে পারে। বিকলতা দেখা দিতে পারে। অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে পারে। সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক রীতি-নীতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে নিতে হবে। আচার-প্রথায় পরিবর্তন ও পরিশোধন করে নিতে হবে। তবেই উন্নয়ন-বেগ ত্বরান্বিত হবে। এক কথায়, সমাজকে উন্নয়নকামী ক'রে সাজাতে হবে। সমাজের একটা বিশিষ্ট শ্রেণী উন্নয়ন ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়ে উঠবে। ভবিষ্যত নিয়ে গবেষণা করবে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে অনার প্রেরণায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

সুতরাং, সোজা করে বলতে গেলে বলা যায়, উন্নয়ন-ব্যয়ভার [তা মুদ্রাজনিত কি অ-মুদ্রাজনিত (non-monetory)] বহন **উন্নয়ন প্রচেষ্টার গোড়ার কথা। মূল সমস্যা, কি আভ্যন্তরীণ নীতি, কি আন্তর্জাতিক নীতি এই উভয়েই কেন্দ্রীয় এই সমস্যার বেড়াজালে**

অনেক কাল জড়িয়ে থাকতে বাধ্য। এই জট বড় শক্ত জট। বিদ্যমান সমাজ প্রথা, রাজনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক আঙ্গিকে তা সারিয়ে তোলা যাবে না, তজ্জন্য চাই মূল্যবোধে পরিবর্তন। আচার-প্রথায় সংস্কার। অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথ করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নূতন ক'রে সাজিয়ে নিতে হবে, যেন তা উৎসাহ-উদ্দীপনার অনুসারী হয়। উদ্ভাবনী প্রথার সহায়ক হয়। তবেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা গতিশীল ও চলমান হয়ে উঠবে। সার্বিক উন্নয়ন সাধন সোজা কাজ নয়। সমাজের সর্বস্তরায় অর্থনৈতিক জাগরণের মাধ্যমে কেবল উন্নয়ন-গতি বেগবান করা যায়।

নিজের কাজে নিজে উঠে-পড়ে লাগতে হবে। দরিদ্র দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় দরিদ্র দেশকেই উদ্যোগী হতে হবে। সুচিন্তিত ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে তা সাধন করতে হবে। গোড়ার দিকে সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সূত্রপাত ঘটাতে হবে সরকারকে। স্থবির অর্থনীতিকে চলিষ্ণু ক'রে তুলতে হবে। সরকারই কেবল এই স্থবিরতা কাটিয়ে তুলতে পারে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নয়। দরিদ্র দেশের বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই তেমন সুসংবদ্ধ ও বলশালী নয়। কেবল সরকারই স্থির করতে পারে, উন্নয়ন-প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠানিক খাতে প্রবাহিত হবে কি অবাধ গতিতে বেসরকারী উদ্যোগেই প্রবাহিত হবে। পশ্চিমা দেশের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণায় অবশ্য অবাধ বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই উৎকৃষ্ট। কেননা, তাদের মতে সমমের ব্যপ্ত পরিসরে কেবল বেসরকারী উদ্যোগই উন্নয়ন-গতিবেগ অব্যাহত রাখতে পারে। তা ছাড়া, এই নীতি অধিকতর গণতান্ত্রিকধর্মীও বটে।

অবশ্য, সপ্তদশ অধ্যায় থেকে শুরু ক'রে বিংশ অধ্যায় অবধি আলোচনা পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, দরিদ্র দেশে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বেগবান করায় সরকারী ভূমিকা যথেষ্ট বটে। বিশেষ ক'রে উন্নয়ন কার্যক্রম সার্থকভাবে বাস্তবায়নে সরকারী করণীয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বলতে দ্বিধা নেই যে অনুন্নত দেশের প্রশাসন-যন্ত্র মোটেই সন্তোষজনক নয়। কাজেই, সর্বাগ্রে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সুষ্ঠু করে নিতে হবে। দক্ষ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারী চাকুরে নিয়োগ ক'রে নিতে হবে। তথা-কথিত মান্ধাতার আমলের সরকারী ক্রিয়াকর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত ক'রে আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বদভ্যাসজনিত রীতি-নীতি, ঘুষ

ও স্বজনপ্রীতি হ্রাস করতে হবে। কায়েমী-স্বার্থ ধ্বংস করতে হবে। আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। এক কথায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে নিতে হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে ক্রিয়া করে—একথা বুঝে এগুতে হবে।

বড্ড বিপর্যয়-সঙ্কুল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ। বড় কঠিন কাজ তা। বড় দাঁতভাঙ্গা তার অন্তরায়সমূহ। জটিলাবর্তে তা পরিপূর্ণ। সাপটে ধরে কষে মারতে পারলে তবেই এই গিট্ শিথিল হয়ে আসে। তার আগে নয়। উন্নয়ন-ব্যয়ভার, যা যথেষ্ট ভারী ও বেদনাদায়ক, সইতে হবে। সামাজিক রীতি-নীতি রীতিসিদ্ধ করে নিতে হবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে তোলার জন্য কোমর বেঁধে লাগতে হবে। তবেই উন্নয়ন-পথ উন্মুক্ত হবে। সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দিগন্তে আলোর রেখা ফুটে উঠবে। উন্নয়ন-তরী ঝড়-ঝাপটা বেয়ে এগুতে শিখবে। ক্রমে ক্রমে গিট্ শিথিল হয়ে আসবে। অন্যদিকে সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ সুষ্ঠু হতে শুরু করবে। সুস্থ প্রভাব উভয়দিকে বইতে থাকবে। পালে বাতাস লাগবে—বেগবান হয়ে উঠবে, উন্নয়ন-রূপ তরী তরতর করে বাধা কেটে এগুতে থাকবে। সামনের বাধা অপসারিত হবে। হাওয়া আরও অনুকূল হবে। শনৈঃ শনৈঃ সোপান জোড়া লাগতে থাকবে।

২. দেশভিত্তিক আলোচনার নিমিত্তে কতকগুলো বিষয়

পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনা সামনে রেখে প্রতিটি দেশের উন্নয়ন-সমস্যা আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই আলোতে প্রতিকার-প্রণালী বিধিবদ্ধ ক'রে নেওয়া দরকার। এবং সেই পটভূমিকায় প্রতিটি দেশের উন্নয়ন-সম্ভাবনা যাচাই ক'রে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, সাধারণভাবে যত কথাই বলা হউক না কেন, যত নীতিমালাই প্রণীত হোক না কেন, সর্বশেষ পর্যালোচনায় দেশভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমেই কেবল সুষ্ঠু নীতিমালা গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য বিস্তৃত এই আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এই স্বল্পপরিসরে বিশেষ দেশের সত্যিকার মুক্তিপথ প্রদর্শনের সুবিধা সীমিত। তবে দেশভিত্তিক

সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসাবে নিম্নে কতকগুলো অতি প্রাসংগিক বিষয়ের রূপরেখা প্রদত্ত হল:

ক: "অর্থনৈতিক উন্নয়ন"-এর সংজ্ঞা

(১) প্রকৃত জাতীয় আয়।
(২) প্রকৃত মাথাপিছু আয়।
(৩) জনকল্যাণ তাৎপর্য্য।

খ: উন্নয়ন ও জনকল্যাণ

(১) সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী।
(২) প্রকৃত মাথাপিছু আয় বর্ধন ও "অর্থনৈতিক কল্যাণে" পার্থক্য।
(৩) "অর্থনৈতিক মঙ্গল" ও "জনকল্যাণে" পার্থক্য।
(৪) অর্থনৈতিক স্বাজাত্যবোধ ও নব্য মার্কেন্টালিজ্‌ম্ : জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ।
(৫) উন্নয়ন-অগ্রগতি ও নিরাপত্তা।
(৬) তথ্যানুসন্ধ্যানীর মূল্যবোধ।

গ: সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবয়ব

(১) আচার-প্রথার ভূমিকা।
(২) ধর্মের গুরুত্ব।
(৩) সরকারী ভূমিকা।
(৪) শিক্ষা-দীক্ষার মান।
(৫) স্বাস্থ্য-মান
(৬) ভূমিস্বত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি।
(৭) প্রেরণা ও অভিপ্রায়।
(৮) মূল্যবোধ।
(৯) প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিক দক্ষতা।
(১০) আঙ্গিকগত অগ্রগতি।
(১১) উদ্যোগ প্রণালী।
(১২) প্রযুক্তিক ও সাংগঠনিক উদ্দীপনা।

ঘ: জনসংখ্যার আকার ও আকৃতি

(১) জনসংখ্যার আকার।
(২) জনসংখ্যা আকারে পরিবর্তন ধারা : হ্রাস-বৃদ্ধির হার : স্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি : নীট জন-নির্গম।

(৩) বয়সগত বন্টন।
(৪) বয়সগত বন্টন-ধারা।
(৫) স্বদেশী ও বিদেশী : সমজাতীয় বা বহুগোত্রীয় সমস্যা।
(৬) জনসংখ্যার ঘনত্ব : মাথাপিছু আবাদী জমি : মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য জমি।

ঙঃ শ্রম-সরবরাহ ও চাহিদা

(১) শ্রমের স্বল্পকালীন সরবরাহ : শ্রমের আকার ও গঠন।
(২) শ্রমের দীর্ঘকালীন সরবরাহ: সম্ভাব্য শ্রম সরবরাহ।
(৩) পেশাগত বন্টন।
(৪) কর্ম-সংস্থান নিশ্চয়তা : শ্রম-উৎপাদন : মৌসুমী-শ্রম।
(৫) শ্রমিক-সংস্থা।
(৬) শ্রম-আইন।
(৭) শ্রম-আইনে অনুপ্রেরণা ও তার প্রতিক্রিয়া।
(৮) প্রকৃত মজুরী।

চঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ ও চাহিদা

(১) ভৌগোলিক ও বস্তুগত পটভূমিকা।
(২) জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি : বৃষ্টিপাত, জলসেচ, অবক্ষয় ও উর্বরতা হ্রাস।
(৩) ভূমি-ব্যবহার : ব্যবহার প্রণালী : ব্যবহার নীতি ও আচার-প্রথা।
(৪) খনিজ-সম্পদ : বিদ্যমান খনিজ সম্পদ ? পরিবহন সুবিধা-অসুবিধা।
(৫) অন্য সব সম্পদ ? খাদ্য-দ্রব্য ?
(৬) সম্ভাব্য সম্পদের জরীপ।
(৭) ভূমি-উৎসারিত দ্রব্যের চাহিদা মাত্রা।

ছ ঃ মূলধন সরবরাহ ও চাহিদা

(১) আভ্যন্তরীণ মূলধন-সংগঠন।
(২) মূলধনাগম।
(৩) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।
(৪) বিনিয়োগ-নক্সা।
(৫) বিনিয়োগ-লাভালাভ।

(৬) বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা।
(৭) বিনিয়োগ-নির্ণায়ক।
(৮) সরকারী বিনিয়োগ: যানবাহন সুবিধাদি: যোগাযোগ সুবিধা-বলী: জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানাবলী।

জ : অর্থনীতির গঠন-বৈশিষ্ট্য

(১) জাতীয় আয়

(অ) আকার।
(আ) ধারা-পর্বসমূহ।
(ই) ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারী ব্যয়।
(ঈ) সঞ্চয় হার ও ভোগ-অনুপাত।
(উ) প্রকৃত আয়।
(ঊ) আয়-বণ্টন।

(২) অর্থনৈতিক কাঠামো

(অ) সামাজিক স্থায়ী খরচা।
(আ) উৎপাদন-নক্সা : বাণিজ্য-ভিত্তিক কি প্রজা-ভিত্তিক : প্রতিযোগী-ধর্মী কি একচেটিয়াধর্মী : কৃষিজাত দ্রব্য বিপণীকরণ প্রথা ও মাত্রা : শিল্প-কর্মের আয়তন ও পরিসর।
(ই) কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কাজে সম্পদ ব্যবহারের অনুপাত।
(ঈ) জাতীয় উৎপাদনে শ্রম, ভূমি ও পুঁজির অবদান।
(উ) নিমজ্জিত বেকারী ও উদ্বৃত্ত শ্রম।
(ঊ) বাজার-পরিসর ও শ্রম-বিভাজন।
(এ) মুদ্রা ও ঋণ : মুদ্রায়িত ও অ-মুদ্রায়িত শাখা : ঋণ-প্রাপ্যতা : মুদ্রা-বাজার : মুদ্রা-নীতি।
(ঐ) রাজস্বনীতি : আয়-নক্সা : বাজেট-পন্থা।

(৩) বাজার অপারঙ্গমতা

(অ) উৎপাদনী বাজার: আমদানী-রপ্তানীক্ষেত্রে বিদেশী উদ্যোগ: মধ্যবর্তী দালাল: খুচরা ব্যবসা।
(আ) উপাদান-বাজার : শ্রম-সঞ্চালন: অনুপ্রেরণা-দর ও আয় উৎসারিত দ্যোতনা।

(ঈ) জ্ঞান: স্থানীয় বাজার: বিশ্ব-বাজার: সময়ের ব্যাপ্ত পরিসর: আচার-প্রথা: অর্থনৈতিক শুল্ক-বৃদ্ধি।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব

(অ) বৈদেশিক বিনিয়োগ।

(আ) বিদেশী উদ্যোগ-মাত্রা।

(ই) রপ্তানী-শিল্প প্রাধান্য উৎপাদন।

(ঈ) শুল্ক-আয়।

(উ) বাণিজ্যিক লেন-দেন পারিস্থিতি।

ঋ: অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বসমূহের প্রাসংগিকতা

(১) ধ্রুপদী: বাজার পরিসর: শ্রম-বিভাজন: মূলধন-সংগঠন: জনসংখ্যার ম্যালথুসীয় তত্ত্ব: স্থবির পর্যায়।

(২) মার্ক্সীয়: প্রাগৈতিহাসিক সংগঠন; উদ্বৃত্ত মূল্য; শোষণ; বৈধ ও রাজনৈতিক গাঁথনীর ভীত হিসাবে অর্থনৈতিক কাঠামো; সাম্রাজ্যবাদ।

(৩) নব্য-ধ্রুপদী: সম্পদের আদর্শ বরাদ্দকরণ, মূলধন-সংগঠন; বহির্ব্যয়-সঙ্কোচ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা।

(৪) সুম্পিটারীয়: উদ্দীপনা ও উদ্যোক্তা।

(৫) কেয়নসীয়োত্তর: উৎপাদনের সাকুল্য সরবরাহ ও চাহিদার নিয়ামকসমূহ: আয়-বর্ধক ও বিনিয়োগ-বর্ধক তত্ত্ব।

(৬) আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক:

(অ) আমদানীক্ষেত্রে চাহিদার অনুপ্রবেশ; আয়-বর্ধক ও বিনিয়োগবর্ধক তত্ত্ব।

(আ) কচি শিল্প কি কচি অর্থনীতি তত্ত্ব?

(ই) ধনী-দরিদ্র দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা বণ্টন।

(ঈ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপাদানের স্থানান্তরণ: শ্রম; মূলধন ও আঙ্গিক।

(উ) তুলনামূলক খরচাতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা।

এ: উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক

(১) বাজার অসম্পূর্ণতা ও সম্পদের বিষম বণ্টন।

(২) নষ্ট-চক্রসমূহ

(৩) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত
(৪) সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা।

ট: প্রতিকার প্রণালী

(১) উন্নয়ন পর্যায়ক্রম : কৃষির ভূমিকা : শিল্পের ভূমিকা : গ্রামাঞ্চলে শিল্পায়ন : প্ররোচিত শিল্পায়ন।
(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে নব্য ধারা সৃষ্টি করা কি বিদ্যমান ধারা প্রচলিত রাখা ?
(৩) বর্ধন-সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ ও সুসমঞ্জস অগ্রগতি।
(৪) আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা : স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ; যানবাহন ও যোগাযোগ ; কৃষি-উন্নয়ন ; রাজস্ব-নীতি ; মুদ্রানীতি ; প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ; আঞ্চলিক ঋণদান-প্রথা : সুযোগ ও সুবিধা এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কাজে লাগানো ; শিল্প খাতে বহুমুখীতা অর্জন।
(৫) আন্তর্জাতিক নীতিমালা : বিদেশী বিনিয়োগের ভূমিকা ; ঋণ ও অর্থ-মঞ্জুরী ; প্রযুক্তিক সহযোগিতা ; বাণিজ্য-নীতি।
(৬) সরকারী সক্রিয়তার মাত্রা।

ঠ: উন্নয়ন-সম্ভাবনা

(১) উন্নয়ন পথে অন্তরায়সমূহ।
(২) উন্নয়ন ব্যয়-ভার।
(৩) অগ্রগতি সাধনে আবশ্যকীয় করণীয়।
(৪) সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব-শর্ত।
(৫) আভ্যন্তরীণ নীতিমালা।
(৬) আন্তর্জাতিক নীতিমালা।

চতুর্থ পর্ব

ধনীদেশে উন্নয়ন-যাত্রা অব্যাহত রাখার সমস্যা

"......... সমৃদ্ধিকাল দীর্ঘায়ত করার পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং অবমাননা-কাল সেই সুদূরে নির্বাসন দেওয়ার নিমিত্তে।"

—উইলিয়াম প্লেফেয়ার

প্রারম্ভিক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা করার সময়ে জোর আরোপ করা হয়েছে যে প্রগতি-প্রক্রিয়ার আলোচনা কেবল দরিদ্র দেশে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ধনী দেশে উন্নয়ন-মাত্রা বজায় রাখার সমস্যা নিয়েও আলোচনা করতে হবে। তা না হলে বিশ্লেষণ অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, ধনী দেশকে বাদ দিয়ে কেবল দরিদ্র দেশে বিচরণ করা হলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিরন্তর বহমানতা ধারণা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। কারণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে যত বৈসাদৃশ্যই বিরাজমান থাকুক না কেন, ধনী-দরিদ্র উভয় দেশে উন্নয়ন অগ্রগতির মৌলিক শক্তিনিচয় ও ধারা-পর্ব মোটামুটি একই রূপ। ধনী-দরিদ্র বাছাই করে উন্নয়ন-তত্ত্ব নেই। কি উন্নত কি অনুন্নত উভয় প্রকার দেশের জন্য এক প্রকার তত্ত্বই বিরাজমান। তার মধ্যে কোন নিখাদ বিভাজক-রেখা নেই।

সুতরাং, চতুর্থ পর্বে অগ্রসরমান দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমস্যা খতিয়ে দেখা হবে। মাথাপিছু আয়-নির্দেশক রেখার তুঙ্গ সীমার ধারে-কাছে অবস্থিত দেশসমূহের জটাজাল বিস্তৃত করা হবে। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে অর্থ-নৈতিক প্রগতির উদ্দেশ্যাবলীর পাশাপাশি অর্থনৈতিক অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের চিত্র তুলে ধরা হবে। অতঃপর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গৃহীত কার্য-ধারার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করে উন্নয়ন অগ্রগতির লক্ষ্যাবলীর উপর তাদের প্রভাব স্থিরীকৃত করা হবে। এই পরিচ্ছেদের আলোচনার সমাপ্তি টানা হবে গত পঁচাত্তর বৎসর কাল ধরে উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বার্থকতার চিত্র অঙ্কন করে। আলোচনাটি অল্প কয়েকটি উন্নত দেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হবে। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে স্থান পাবে ধনী দেশে উন্নয়ন-হার প্রভাবিত করার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী ও গতিপ্রবাহসমূহ। এই দুই অধ্যায়ের আলোচনা সামনে নিয়ে, প্রথম পর্বের বিশ্লেষণ টেনে এনে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ধনী দেশে উন্নয়ন-মাত্রা বজায় রাখার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাসমূহ নির্দেশ করবে। অবশেষে পঞ্চবিংশ অধ্যায় উন্নয়ন কার্য-ক্রিয়া জোরদার রাখার মুখ্য পথসমূহ নির্দেশ করবে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে উন্নয়ন-ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ প্রদান করবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি

উন্নয়ন-অগ্রগতি হার অবশ্যই সন্তোষজনক পর্যায়ে হওয়া কাম্য। তবে অগ্রসরমান দেশে ইহাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে উন্নয়ন হার যথারীতি পর্যায়ে বজায় রাখা ছাড়াও আরো অনেক-গুলো লক্ষ্য সংযোজিত করে নিতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন অগ্রসর যেমন নিশ্চিত করতে হবে তেমনি (১) উঁচু ও স্থায়ী চাকুরী-বাকুরী সংস্থান, (২) দর-মাত্রার মোটামুটি স্থায়িত্ব, (৩) আয়-মাত্রার ন্যায়ানুগ বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা, (৪) সুষম সম্পদ বিতরণ এবং (৫) সন্তোষজনক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার নিশ্চয়তা হাসিল করতে হবে।[১] অন্যান্য আরো বহু লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তালিকা আর বাড়িয়ে দরকার নেই। উপরোক্ত তালিকায় আজকের দিনের উন্নত দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের প্রায় সব কয়টাই ধরা পড়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উন্নয়ন-অগ্রগতি হার যথাবিহিত পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করতে যেয়ে ধনী দেশ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য সেগুলো যথারীতি অনুধাবনে পরিপ্রেক্ষিত ঠিক করে নেয়া দরকার। তদুদ্দেশ্যে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগে উন্নয়ন উদ্দেশ্যাবলী ও অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের মধ্যে বিরাজমান বিপরীতধর্মী ও পরিপূরকধর্মী প্রবণতাসমূহ আলোচনা করা হবে। পরবর্তী দুই ভাগে অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলীর তুলনায় উন্নয়ন অগ্রগতির লক্ষ্যে অধিক জোর আরোপ করার যুক্তিযুক্ততা যাচাই করা হবে এবং উন্নত দেশসমূহে প্রচলিত নীতিমালার আঙ্গিকে নিরীখ করে নেয়া হবে। শেষাংশে ১৮৭০ সাল সময় থেকে শুরু করে ঐ সকল দেশের প্রগতি কার্য-ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিবৃত করা হবে।

---

১. দেখুন, A. Smithies-এর "Economic Welfare and Policy." Economics and Public Policy, the Brookings Institution, Washington, 1955, 14.

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ

প্রথমে বিবেচনা করা যাক: অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং যমজ লক্ষ্য তথা, পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান ও দরমাত্রার মোটামুটি স্থায়িত্বের মধ্যেকার সংঘর্ষধর্মী ও মিলনধর্মী আন্তঃসম্পর্কসমূহ। বড় আকারের বেকারত্ব কেউ সহ্য করতে রাজী নয়। সবার কামনা করে মোটামুটি পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি। কিন্তু, কথা হল তা অর্জ্জন করা কি সম্ভব না কাম্য? অনেকে বলেন (যেমন কিছু কিছু নয়া ক্লাসিক্যালবাদী ধনবিজ্ঞানী বলেছেন) কিছুটা বেকারত্ব বিরাজমান থাকা ভাল। তাতে অর্থনীতি অনড় অবস্থার নাগপাশে জড়িয়ে যায় না। তার মধ্যে কিছুটা নমনীয়তা বিদ্যমান থাকে। ফলে দীর্ঘকালীন বিবেচনায় উন্নয়ন হারে বেগবান হতে পারে। "সর্বোচ্চ" কর্ম-সংস্থান বজায় রেখে তেমনটা সাধন সম্ভব নয়। কেয়নশীয় মতাদর্শী অনেকে এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন, শ্রম-বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখা সম্ভব হলে বরং ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই অধিক। তাতে উন্নয়ন গতি জোরদার হতে পারে। কেননা, এতে করে ক্রয়ক্ষমতা অধিক হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে সচেষ্ট হন। এদিকে শ্রম-সঙ্কট দেখা দিলে প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধনের প্রয়াস প্রবলতর হতে পারে।

দরমাত্রা সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দেখা যায়। স্থায়ী উন্নয়ন অগ্রগতিতে স্থায়ী দরমাত্রার প্রভাব সম্পর্কেও দু'টি ভিন্নমুখী মত তুলে ধরা যেতে পারে। নিশ্চল মাত্রা অপেক্ষা ধীরে-সুস্থে অগ্রসরমান দরমাত্রা (হয়ত পূর্ণ কর্ম-সংস্থান নিশ্চিত করার নীতি অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে) হয়ত দ্রুত বর্ধনের পরিপক্ষে। অর্থাৎ ক্রম-উর্ধমুখী দরপর্যায় উন্নয়ন-হার বেগবান করার সহায়ক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে। নিশ্চল দরপর্যায় তেমনটা করতে পারে না। মুনাফামাত্রায় তেজীভাব বিরাজমান থাকে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। নব নব উদ্যোগ জন্ম নেয়। ক্রমান্বয়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে যেতে থাকে। এদিকে বাণিজ্য জগত সীমাবদ্ধ মুদ্রা সরবরাহের নিগড় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু, এই সুখ কাঁটাহীন কমল নয় যে, উন্মার্গগামী দরমাত্রা স্বল্পসূত্রী ও দরকল্পী প্রকল্পে উসকানি যোগায়, দীর্ঘসূত্রী প্রকল্পে প্রেরণা দেয় না। ফলে দীর্ঘকালীন বিবেচনায় উন্নয়ন-গতি ব্যাহত হতে পারে। কাজেই, হয়ত স্থায়ী দরপর্যায় নিরঙ্কুশ অগ্রগতির অনুকূলে বলে প্রতিপন্ন হতে পারে।

কেউ কেউ হয়ত এমনও বলতে পারেন যে, দরমাত্রা কিছুটা নিম্নগামী হলে আরো ভাল হয়। তবে এই মতের প্রবক্তা খুব বেশী একটা নেই। ধনী দেশে পারিশ্রমিক ও দরমাত্রায় সুকঠিন ঋজুবদ্ধতা বিরাজমান হেতু দরমাত্রার ক্রমহ্রাসমান নীতি স্বার্থক হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে না।

মুদ্রাস্ফীতির বাড়াবাড়ি বিবর্জিত পূর্ণ চাকুরী সংস্থান কার্যপ্রণালী উন্নয়ন-হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার সমস্যা প্রভাবিত করে। তেমনি বিপরীতটাও সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ উন্নয়ন-হার ও পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি অর্জনে এবং দরমাত্রা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বজায় রাখায় সহায়তা করতে পারে। সুম্পিটার বলেন, অগ্রগতি-রূপ ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, অর্থাৎ কিনা উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধিত হয় চক্রময় তালে। আর বিনিয়োগ-স্পৃহা তথা মাত্রা যত তীব্র হয়, চক্রাকার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা তত কঠিন হয়। উত্তর-কেয়নশীয় মতবাদীরাও এমন সংশয়ের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন, প্রগতি-প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট চক্রময় অস্থিরতা অবশ্যই দেখা দিতে পারে। তবে কথা হচ্ছে, জড়ত্ববাদীদের ভাষায় বলতে গেলে, অগ্রগতি-হার যথোপযুক্ত অধিক না হলে দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বের বেড়াজালে জড়িয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

এবারে উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ন্যায়ানুগ আয়-বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের কথা বলা যাক। এই উভয়ের মধ্যেও ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজমান। ক্লাসিক্যাল লেখকেরা তাই মত প্রকাশ করেছেন যে, উচ্চ মুনাফা ও নিম্ন মজুরী-হার উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে। রিকার্ডো অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আয়-বণ্টন সুষম করার নিমিত্তে কর ধার্য করা হলে তা মুনাফায় আঘাত হানে। ফলে মূলধন সংগঠন-ক্রিয়া ব্যাত্যাহত হয়। সুম্পিটারও এই ভয় সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বণ্টন-প্রথা সামাজিক পরিবেশে প্রতিকূল পরিবেশ জন্ম দিতে পারে। তাতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। কেয়নশীয় ধনবিজ্ঞানীরা কিন্তু বিপরীত মত প্রদান করেন। তাঁদের মতে, বণ্টন-প্রথা বরং ক্ষতিকারক না হয়ে লাভজনক হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। পূর্ণ-বণ্টনপ্রণালী ভোক্তা বাজার সম্প্রসারিত করে। ফলে উন্নয়ন-অগ্রগতি জোরদার ও বেগবানসম্পন্ন হতে পারে।

উন্নয়নহারও কিন্তু বণ্টন-প্রথাকে প্রভাবিত করতে পারে। তা

দ্বন্দ্বমুখী পথে যেমন, তেমনি মিলনধর্মী পথেও। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা বাদ-বিসম্বাদ পথের নির্দেশ দেয়। তাঁদের যুক্তি: দ্রুত উন্নয়ন শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যেকার বিভেদ তীব্র করে তুলে। তাতে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিকটাকার ধারণ করার সুযোগ পায়। বিপরীত যুক্তি তুলে ধরাও কঠিন নয়। অতি সহজেই দেখানো যেতে পারে যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান হয়ে বরং শ্রেণী-বৈষম্যের তীব্রতা হ্রাস করে দেয়। যেমন সুম্পিটার বলেন, প্রগতি-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলাকালে সমাজের প্রায় সবার লাভবান হয়। কাজেই, একদলের মঙ্গল অন্য দলের জন্য অমঙ্গলের কারণ হওয়ার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই। একের জীবনমানে উন্নতি অপরের অবনতি না ঘটিয়েও সাধিত হতে পারে।

এক্ষণে বাজার-পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন ও দ্রুতগামী উন্নয়ন সাধনের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। এই দুইটি সমস্যা যুগপৎ সম্পাদনে জটিলতা অনেক। ক্লাসিক্যাল লেখকরা অবশ্য বলেন, না, তেমন নয়। তাঁদের মতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাধর্মী বাজার-ব্যবস্থা একদিকে, সম্পদের সুষম যেমন নিশ্চিত করে, তেমনি অন্যদিকে উন্নয়ন-অগ্রগতি ও দ্রুতগামী করে তুলে। তাঁদের ধারণায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মহীরুহ দেখা দেয় একচেটিয়াবাদের কারণে আর একচেটিয়াবাদ উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রতিহত করে। সুম্পিটার ইত্যাদি লেখকরা এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের চোখে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় আকার বরং নানারূপ সুবিধার সৃষ্টি করে। বিরাটাকার বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন-ব্যয়ে সঙ্কোচ ঘটাতে পারে। বিস্তৃত বাজারের সুবিধা লুটতে পারে। বড় আকারে গবেষণা কাজে লিপ্ত হতে পারে। অধিক হারে মূলধন সংগ্রহ করে নিতে পারে। ছোট-খাট ব্যবসায় সেই সুযোগ নেই। কাজেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের 'বড়ত্ব' দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। সম্পদ বিতরণে কিছুটা অসুবিধা হয়ত হতে পারে। কিন্তু, সাময়িক এইসব দুর্দশা সামলে নেয়া সম্ভব হলে আখেরে প্রচুর লাভ পাওয়া যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি নিশ্চিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার-ব্যবস্থার কল-কব্জা দিয়ে এটা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, বেগবান অগ্রগতি অর্জনের খাতিরে সম্পদের সুষম বন্টন লক্ষ্য কিছুটা শিথিলভাবে গ্রহণ করায় তেমন ক্ষতির কিছু নেই।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে অগ্রগতি হার প্রভাবিত করে।

তেমনি অগ্রগতি হার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শুল্ক ধার্য, কোটা বেঁধে দেয়া, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের নীতি গ্রহণ ইত্যাদি কার্যপ্রণালী অগ্রগতি লক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তদ্রূপ, আন্তর্জাতিকভাবে শ্রম ও পুঁজি বিচলন অগ্রগতি ধারায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম পর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, উন্নয়ন অগ্রগতির খাতিরে শুল্ক-প্রাচীর গড়ে তোলার পক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি রয়েছে। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন-অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সন্তোষজনক পর্যায়ে সংস্থাপন করার নীতি-প্রণালী প্রভাবিত করে থাকে। উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যাক। দ্রুত উন্নয়নশীল ধনীদেশ সংরক্ষণ প্রথা বাতিল করে দিয়ে বিদেশে পুঁজি-সামগ্রীর রপ্তানী বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে বর্ধনশীল দেশে অগ্রগতি হার অধিক হলে তা লেন-দেন ভারসাম্যে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। "ডলার-স্বল্পতা" যুক্তিবাদী বহু ধনবিজ্ঞানী এই মতের সোচ্চার প্রবক্তা। কাজেই, দ্রুত সম্প্রসারণশীল দেশ বিদেশে ঋণ-প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। অন্যরা সংরক্ষনশীল-নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে। তাতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নিশ্চিত হতে পারে।

সুতরাং, বলা যায় যে, অর্থনৈতিক বিভিন্ন লক্ষ্য যুগপৎ অর্জন বেশ একটু বেকায়দা ব্যাপার। প্রতিদ্বন্দ্বিমুখী ও পরিপূরকধর্মী সংঘর্ষ হেতু তা সম্পাদন বেশ জটিল হয়ে উঠে। কাজেই, একটা আপোষ-রফা নীতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয় বলে প্রতিপন্ন হয়। তবে এই আপোষ-মীমাংসা কিভাবে হতে পারে তা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। প্রথমতঃ, বিভিন্ন লক্ষ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপ করে নেয়া প্রয়োজন। অতঃপর গৃহীত নীতিমালার প্রভাব যাচাই করে নেয়া আবশ্যক। অর্থাৎ যে সব কার্যপ্রণালী গৃহীত হয় বিভিন্ন লক্ষ্যের উপর তাদের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করে নেয়া আবশ্যক। মূল্যবিচারের এই তুলাদণ্ডে আকাঙ্ক্ষিত আপোষ-রফা নির্ণীত হওয়া উচিত। দৃষ্টি দিতে হবে যে বিশেষ একটা লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে যে কার্যপ্রণালী গৃহীত হল তা কিভাবে অন্য সব লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, যে উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে নীতিটি গৃহিত হল সেই উদ্দেশ্য সাধনে তা কতটুকু পারঙ্গম তাও খতিয়ে দেখতে হবে। অন্যথায়, সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী সম্ভাবনার জটাজালে জড়িয়ে যেতে হতে পারে। অপর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও

নজর রাখতে হবে। একের জন্য যা মহৌষধ অন্যের জন্য তা বিষ--এই সাধারণ মূল্যবান বাণীটি স্মরণে রাখতে হবে। এক দেশের জন্য গৃহীত নীতি অন্য দেশে তেমন স্বার্থক নাও হতে পারে। এককালে কর্মক্ষম নীতি অন্যকালে এসে বিকল বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। কাজেই, সব দেশে ও সর্বকালে একই আপোষ-রফা সমরূপ কার্যকরী হবে--এমন কথা যেন মনে করা না হয়। দেশ ভেদে পারিপার্শ্বিক ভিন্নতা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বৈষম্যতা ও পরিস্থিতির মাত্রাভেদ বিবেচনায় নিয়ে তবে অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করতে হবে এবং সময়-পরিসরে সাযুজ্য ঘটিয়ে নিতে হবে।

২. উন্নয়ন লক্ষ্য ও উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম

উপরোক্ত অংশে দেখানো হয়েছে অর্থনৈতি অন্যান লক্ষ্য ও উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে কি জাতীয় দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। সংঘাতভিত্তিক ও মিলনধর্মী আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটিত করে সম্ভাব্য আপোষ-রফার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আগামী দুই অংশে এই আপোষ-রফার বাস্তব ফলাফল বিবেচিত হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে সরকারী প্রয়াস-প্রচেষ্টা উৎসারিত আপোষ-রফার রূপটি উন্মোচিত করে দেখানো হবে। নির্বাচিত কয়েকটি ধনী দেশ কর্তৃক অনুসৃত উনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর মুখ্য কার্যধারা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

বৃটেনে উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সর্বনিম্ন সরকারী হস্তক্ষেপের পরিবেশে। কেন্দ্রীয় সরকার মোটামুটি নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। সরাসরি তেমন কোন উৎপাদনেই গরজ দেখায়নি। শিল্প গড়ে উঠেছে বেসরকারী প্রচেষ্টায়। এমনকি, এমন যে জনকল্যাণে উৎসর্গিত টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেল লাইন, খাল-পদ্ধতি, জলপথ ইত্যাদিও স্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তথা উদ্যোগে।[২] বাজার পদ্ধতিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার নামাবলী পরিয়ে ব্যষ্টি কি সমষ্টি তথা সরকার সবাই নিশ্চুপ ও নিশ্চিন্ত ছিলেন। কোনরূপ হস্তক্ষেপ সহ্য করার মত মনোভঙ্গিই বিদ্যমান ছিল না। বরং, কেউ মাতবরী করতে চাইলে তা ঘৃণার চক্ষে দেখা হত। ব্যক্তি কি সরকার কারো

২. টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন-শিল্প অবশ্য যথাক্রমে ১৮৬৮ ও ১৯১১ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হয়।

হাতে অসীম ক্ষমতা অর্পণ ছিল সেকালের ধ্যান-ধারণা বিপক্ষে।[৩] তাই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক্কার কিছু সরকারকে বিদ্যমান নামমাত্র, সরকারী বাধাসমূহ অপসারিত করায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ১৮৪৬ সালে শস্য আইন রদ করে দেওয়া হয়। নৌবাহ-আইন উদার করে তোলা হয়। তার শক্ত জট আস্তে আস্তে খুলে ধরা হয়। ১৮৫৩ সালে এসে তা উঠিয়ে দেয়া হয়। শিল্পীকুশলীর বহির্গমন নিষিদ্ধ করে যে আইন বলবৎ ছিল তা ১৮২৪ সালে নাকচ্ করে দেয়া হয়। সেই একই সালে যন্ত্রপাতির বহির্গমনও হালকা করে তোলা হয়। শিক্ষানবিসি কাল উঠিয়ে দেয়া হয় ১৮১৪ সালে। ভারত ও চীনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একাধিপত্য বাতিল করে দেয়া হয় যথাক্রমে ১৮১৩ ও ১৮৩৩ সালে। ১৮২০ দশকে এসে ব্যাঙ্কিং ও বীমাক্ষেত্র সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

একদিকে চলে বাধামুক্ত করে দেবার এই প্রচেষ্টা অন্যদিকে সরকার উঠে-পড়ে লাগে কর ধার্য করায়। অথচ সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে। উদাহরণ হিসাবে রেলপথের কথা উল্লেখ করা যায়। সরকার রেলপথে সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করে অথচ রক্ষণা-বেক্ষণের সর্বনিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। গণপরিষদও একই নীতি অনুসরণ করে চলে। একই মালিকানায় শিল্প-সংস্থা একত্রিত ও সমন্বিত করায় উৎসাহ দান করে অথচ একক্ষেত্রে বিভিন্ন মালিকানা একত্রিত হয়ে শিল্প-সংঘ গড়ে তোলার বিধিনিষেধ আরোপ করে।

অবশ্য একক্ষেত্রে সংঘ গড়ে উঠায় একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া হয়। সে হচ্ছে শ্রমক্ষেত্রে। শ্রমিক কি মালিক শিল্পসংঘ গড়ে তুলুক তা নিষেধ করে যে সমস্ত শিল্প-সংঘ আইন বলবৎ ছিল ১৮২৪ সালে সেগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বৎসরে অন্য একটা আইন জারী করা হয়, "যা শিল্প-সংঘ গড়ে তোলায় নামেমাত্র বাধানিষেধ আরোপ করে, কিন্তু মজুরী অথবা কর্ম-সময় নির্ধারণে সংঘ গড়ে তোলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করে এবং তা বিচারাধীন নয় বলে ঘোষণা করে।"[৪] কিন্তু

---

৩. দেখুন, C. R. Fay-এর Great Britain from Adam Smith to the Present Day, Longmans, Green and Co., London, 1948, পৃ: ২০১।

৪. দেখুন, E.L. Bogart-এর Economic History of Europe, 1760-1939, Longmans, Green and Co., London, 1942, পৃ: ২০৬।

ষড়যন্ত্র সম্পর্কীয় সাধারণ আইন তখনো বলবৎ ছিল। এবং এই আইন শ্রম-সংঘের কর্মাবলী খর্ব করায় বেশ পারঙ্গম ছিল। ১৮২৫ সালের আইনে এই সব সাধারণ নীতি প্রণালী সংশোধিত হয়নি বলে কোর্ট-কাচারী তখনো বেশ সঙ্কীর্ণ ফোকরে সাধারণ আইনের ধারাপর্বগুলো ব্যাখ্যা করত এবং সেই অনুসারে শ্রম ও অনুপাতে শ্রমিক সংঘকে হয়রান করে যাবত।[৫] বহু ঝাকাঝাকি ও কোর্ট-আদালত করার পরে অবশেষে ১৮৭৫ সালে এসে শান্তিপূর্ণ পথে কার্য থেকে নিরত রাখার ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়। তেমনি অনাহূত কারণে ফৌজদারী মকদ্দমার হয়রানির হাত থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়। ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে কিছু ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে তা ফৌজদারী আইনের আওতায় আনা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়, যদি ব্যক্তিগত ভাবে কেউ এই দোষ করলে তা আইনের চোখে তেমন দোষণীয় বলে প্রতিস্থাপিত হয়।[৬]

শ্রমিক-মঙ্গল সাধনের নিমিত্তে উনবিংশ শতাব্দীতে আরো বেশ কিছু পন্থা গৃহীত হয়। নারী ও শিশু নিয়োগে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। কর্ম-সময় দিনে ১০ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়। নিরাপত্তা-নীতি গৃহীত হয়। শ্রমিক-স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা হয়। কর প্রথায় প্রবর্তন সাধনে শ্রমিককে অধিক সুবিধা প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৪২ সালে আয়কর পুনরারোপ করা হয় এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীতে পরোক্ষ কর কমিয়ে কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনা হয়।[৭]

দরমাত্রার চক্রময় হ্রাসবৃদ্ধি এবং অর্থ-ব্যবস্থা উৎসারিত সাময়িক দুঃখ-কষ্ট লাঘবের নিমিত্তে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ জরুরী বলে বিবেচিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এই উভয় বিবেচনায় সুফলপ্রসূ হিসাবে গণ্য হয়। সেই অনুসারে ১৮৪৪ সালের Bank Charter Act ব্যাঙ্কনোটের ইস্যু সীমিত করে তুলে। শুধু তাই নয়, এই Act নোট ছাপাবার সর্বময় কর্তৃত্ব শীর্ষ ব্যাঙ্কের (Bank of England) হস্তে অর্পণ করতে সচেষ্ট হয়। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান

৫. H. E. Millis ও R.E. Montgomery-এর Organized Labour, Mc Grow-Hill Book Co., Inc., New York, 1945, পৃ: ৪৯২।

৬. Bogart-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৪৩৮।

৭. যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ১৭৯৯ ও ১৮১৬ সালে আয়কর বসানো হয়েছিল।

(Joint Stock Company) উৎসাহিত করে সরকার লাভের মাত্রা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী হয়। ১৭১৯ সালের Bubble Act যৌথ বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনে যে সকল বাধা-নিষেধ প্রাচীর তুলে ধরেছিল সেগুলো ১৮২৫ সালে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়। ফলে অবরোধের প্রাচীর ধ্বসে পড়ে এবং যৌথ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ব্যাপক হারে গজিয়ে উঠতে থাকে। ১৮৬২ সালে সীমিত দায়িত্বের নীতি সর্বত্র গৃহীত হয়। অর্থাৎ সব ব্যবসা-বাণিজ্যে (শুধু ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট-ইস্যুর কারবার ছাড়া) এই নীতি ছড়িয়ে দেয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মোটা-মুটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৮] সরাসরি তেমন কোন উৎপাদন কর্ম-ক্রিয়ায় নিজকে ব্যাপৃত করেনি। উন্নয়নগতি ত্বরান্বিত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত থাকে। অবশ্য, আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন-অগ্রগতি সবল করার উদ্দেশ্যে তা খাল-বিল খনন ও ফেরীঘাট ইত্যাদি উন্নয়নে কিছুটা সহায়তা করে। এই উদ্দেশ্যে ফেডারেল সরকার একদিকে যেমন বেশ উদারভাবে জমির স্বত্ব বিলিবণ্টন করে তেমনি রাষ্ট্র সরকারকে প্রচুর জমি যোগায় এবং পরে রেলপথ স্থাপন সহজ করার নিমিত্তে বেসরকারী কোম্পানীগুলোকেও সরাসরি প্রচুর জমি প্রদান করে। রাস্তার দুই পাশের জমিতে আধিপত্য প্রদান করে। সমগ্র দেশ জুড়ে রেলপথ স্থাপনে উদ্যোগী কোম্পানীগুলোকেও সরকার সাহায্য যোগায়। এইভাবে প্রদত্ত জমির পরিমাণ ১৮৭১ সাল নাগাদ প্রায় সারা ফরাসী দেশের আকারের সমান হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৭১ সালেই জমি-প্রদান আইন বাতিল হয়ে যায়।

মহাবিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্তে ফেডারেল সরকার ১৮৬২ সালে রাজ্য সরকারগুলোকে প্রচুর জমি প্রদান করে। এই সকল জমি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে একটা ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয়। ট্রাস্ট উৎসারিত সুদের টাকা দিয়ে কলেজসমূহের ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৬২ সালে Homestead Act পাস হয়। এই আইনের বলে আভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন পদ্ধতি রীতিসিদ্ধ করে নেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। প্রতিটি পরিবারের কর্তাকে সরকার থেকে ১৬০ একর করে জমি দেওয়া হয়।

---

৮. দেখুন, E.F. Humphrey প্রণীত An Economic History of the United States, the Century Co., New York, 1931, 287.

অবশ্য তা শর্ত-সাপেক্ষ করে তোলা হয়। শর্ত হিসাবে কর্তা ঐ জমিতে ৫ বৎসর বসবাস করবে, না হয় তা চাষবাস করবে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের শলা-পরামর্শ তেমন একটা আমল দেয়নি। সে বরং আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের উপদেশ অনুসরণ করে চলে। শিশু-শিল্প যুক্তি প্রাধান্য পায় এবং তা সর্বত্র গৃহীত হয়। ১৮১৬ সাল থেকে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ অবধি শিল্পজাত দ্রব্যে শুল্কহার বেশ চড়া রাখা হয়। ১৮৩৩ সালে আইন পাশ করে এই হারে একটু ন্যূন্যতা আনা হয়। কিন্তু ১৮৪২ সালে তা আবার উল্টে দেয়া হয়। শক্ত সংরক্ষণ নীতি আবার গৃহীত হয়। ১৮৪৬ সালে অবশ্য রাশ্ একটু হালকা করা হয়। এই হালকা পরিবেশ গৃহযুদ্ধ কাল অবধি অব্যাহত থাকে। অতঃপর আবার কষে টানা হয়। এই শক্ত সংরক্ষণ গাঁথুনী শতাব্দীর বাকী কালটা চলে। অবশ্য মূলধন আমদানী পথে কোন বাধা আরোপ করা হয়নি। তেমনি ১৮৮০ দশক অবধি জনাগম পথেও কোন বেড়া দাঁড় করা হয়নি।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রম-ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকার "খাট ছাড়া" নীতি মেনে চলে। শ্রম ইউনিয়ন কার্যকলাপ তেমন সুনজরে দেখা হয়নি। দর কষাকষি করে মজুরী বাড়ানো কি কার্য-পরিবেশ উন্নত করার চেষ্টাকে কোর্ট-আদালত তেমন উদার দৃষ্টিতে নিতে পারেনি।[১] অবশ্য শ্রম-ইউনিয়নকে বাঁচতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হয়নি। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে। ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং শক্তহাতে দমন করা হয়েছে। ১৮৪০ দশকে এসে রাজ্যসরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে শিশু-শ্রম সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের জন্য। তেমনি কার্যসময় নির্দ্ধারণ এবং শ্রম-স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানের অধিকারও রাজ্যসরকারকে অর্পণ করা হয়েছে। অবাধ এক-চেটিয়া বাণিজ্য প্রতিহত করার কোন চেষ্টা নেয়া হয়নি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি। শেষভাগে এসে একচেটিয়াবাদের বিরুদ্ধে কিছুটা নীতি পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে Inter-state Commerce Act ও ১৮৯০ সালে Sherman Act পাস হয়। এই দুই Act-এর মাধ্যমে ফেডারেল সরকার একচেটিয়াবাদ বন্ধ করার প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করে। উপরোক্ত আইনে রেলভাড়া ও অভিকর (Rates) নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নেয়া

১. দেখুন, Millis ও Montogomery-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৫৫৩-৫৫৮।

হয়। শেষোক্ত আইনের বলে শিল্পজগতের ধনকুবেরদেরকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় কুক্ষিগত করে নেয়ার প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়া হয়। আবিষ্কার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অবশ্য একাধিপত্য শুভ বলে বিবেচিত হয়, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য। তাই দেখা যায়, কংগ্রেস কৃতিস্বত্ব আইন (patent laws) পাস করছে এমনভাবে যেন বিশেষ অধিকার পত্রধারী আবিষ্কারক ১৭ বৎসর কাল তাঁর অবিষ্কারের নিরঙ্কুশ শর্ত ভোগ করতে পারে।

ফেডারেল সরকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কিছুটা হস্তক্ষেপ করে। আমেরিকার প্রথম ব্যাঙ্ক ১৭৯১ সাল থেকে ১৮১১ সাল অবধি চালু ছিল। দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক ১৮১৬ থেকে ১৮৩৬ সাল নাগাদ কার্যকরী ছিল। এই উভয় ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বহু করণীয় কার্য সম্পাদন করে। দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ার পরে সরকার বেশ কিছুকাল নিশ্চুপ থাকে। অতঃপর ১৮৬৩ সালে National Banking Act পাস হলে পরে সরকার আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। এই আইনের বলে একটা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দানা বেঁধে উঠে এবং ফেডারেল সরকার তার উপর কর্তৃত্ব আরোপ করে। সরকার অনুমোদিত এই সকল জাতীয় ব্যাঙ্কের উপর নোট ছাপাবার সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হয়। পরিবর্তে তাদেরকে তাদের ইস্যুকৃত নোটের উপর শতকরা ১০ ভাগ হারে কর দিতে বাধ্য করা হয়।

কাজেই, বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ফেডারেল সরকারের কার্যকলাপ নেহায়েতই সীমিত ছিল। অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে সে তেমন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তবে রাজ্যসরকারের ভূমিকা নেহায়েত নগণ্য ছিল না।[১০] ১৮২৫ সালে নিউ ইয়র্কের এরি খাল খনন দিয়ে যে সূত্রপাত ঘটে তার রেশ ধরে অনেকগুলো রাজ্যসরকার খাল কর্তনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণে প্রচুর টাকা খাটানো হয়। বেশ কতকগুলো রাষ্ট্রে যানবাহন ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ জন্ম নেয়। বেসরকারী প্রয়াস ও সরকারী প্রচেষ্টা একত্রিত হয়ে পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠুকরণে অগ্রগামী হয়। অবশ্য সরকারী

১০. Pennsylvania রাজ্যের সরকার যে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রিয়া নিষ্পন্ন করে সে সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন, L. Hartz-এর Economic Policy and Democratic Thought, Harvard University Press, Cambridge, 1948.

মালিকানায় খুব বেশী একটা রেলপথ ইত্যাদি ছিল না। কিন্তু তাদের উন্নয়নে সরকার প্রচুর সহায়তা প্রদান করে। টাকা যুগিয়ে, জমি প্রদান ক'রে, শেয়ার কিনে, ঋণপত্র গ্রহণ করে সরকার সর্বোতভাবে সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি নিশ্চিত করে। শতাব্দীর শেষপাদে এসে অবশ্য সরকার নিজকে গুটিয়ে নেয়। সরকারী সাহায্য সর্বনিম্ন মাত্রায় নেমে আসে। অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণে এমনটা ঘটে। পরপর কয়েকটা সঙ্কটে পড়ে এবং ব্যর্থতার গ্লানি বুকে ধারণ ক'রে সরকার বাধ্য হয়ে স্বীয় কার্যাবলী সীমিত করে নেয়।

রাজ্য সরকার কেবল যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত করেই নিরস্ত থাকেনি। অন্যান্য বহুক্ষেত্রেও সে তার হস্ত প্রসারিত করে। অভিকর, লাভ ও কর্মপ্রবাহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তা যথাবিহিত করে তোলায় সাহায্য করে। অবশ্য রেলপথ নিয়ন্ত্রণে সরকার শক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নেয় গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকে এবং এই চেষ্টায় রাজ্যসরকার বেশ সার্থকতাও লাভ করে।[১১]

অনেকগুলো রাষ্ট্র, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনায় বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে। সরকারী উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রয়াস সংযুক্ত হয়েও প্রচুর ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্র নোট-ইস্যু সীমিত করে বহু আইন পাস করে। অবশ্য এই সকল আইন তেমন ঋজুভাবে কার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হতে পারেনি।[১২]

শিল্পক্ষেত্রে সরকার সরাসরি তেমন কিছু করেনি। টাকা-পয়সা দিয়েও তেমন একটা সাহায্য করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশেষ কতকগুলো শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে রাষ্ট্র অবশ্য কিছুটা অনুদান সুযোগ (subsidy) ও পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান করে। তবে ঐ পর্যন্তই। সংখ্যায় যেমন এরা ছিল নগণ্য, তেমনি ব্যাপ্তিতেও। General Incorporation Acts এবং যৌথ কারবারে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে অবশ্য শিল্প পরিবেশ বেশ কিছুটা অনুকূল হয়। তাতে করে

---

১১. দেখুন, E. S. Kirkland-এর A History of American Economic Life, F. S. Crofts and Co., New York, 1946, 557.

১২. H. F. Williamson সম্পাদিত The Growth of the American Economy, Prentice Hall. 1946, 265-268 দেখুন।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ লাভবান হয় এবং সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। সরকার একাধিপত্য রূপ রাক্ষসের কবল থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে উদ্যোগী হয় ও আইন প্রণয়ন করে। ১৮৯০ সালে যখন Sherman Act প্রণীত হয় তখন প্রায় ২১টি রাষ্ট্রে একাধিপত্য নিরসনের আইন প্রণীত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, কার্যত এরা তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি।[১৩]

জার্মানী আর ফ্রান্সে অবশ্য অবস্থা একটু ভিন্নরূপ ছিল। এই দুই দেশে সরকার বেশ সক্রিয় ছিল। বৃটেন কি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তুলনায় শিল্পোন্নয়ন এই দুই দেশের সরকারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফরাসী সরকার বিস্তৃত রাস্তাঘাট গড়ে তুলে। ১৮১৮ সালে সরকার খাল কর্তনের এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। অবশ্য ব্যয় নির্বাহিত হয় বেসরকারী খাত থেকেই। কিন্তু, ১৮৫০ সালের পরে এসে প্রায় অধিকাংশ খাল রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। রেলপথ নির্মাণেও সরকারী ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সরকার জমি যোগায় ও রাস্তা বানিয়ে দেয়। তার উপর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রেলপথ স্থাপন করে। তা পরিচালনা করে। চলতি মূলধন যোগায়। জার্মানী সরকার বেশ কিছু রেলপথ স্থাপন করে এবং স্বীয় পরিচালনায় রাখে, বাকী রেলপথ অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯১২ সাল নাগাদ রেলপথ সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মত জার্মানী ও ফরাসী সরকারও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সুষ্ঠ করায় অগ্রণী হয়। ১৮০০ সালে ফরাসীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Bank of France) স্থাপতি হয়। অবশ্য বেসরকারী পুঁজিতে। কিন্তু, কার্যত: তা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে। সরকারী টাকা-পয়সা তাতে জমা হয়। এই ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণের সুদ আদায় করে। ১৮৫০ সালের পরে এই ব্যাঙ্ককে নোট-ইস্যুর পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হয়। জার্মানীতে নোট-ইস্যুর কর্তৃত্ব ছিল বেসরকারী ও আধাসরকারী ব্যাঙ্কগুলোর আয়ত্তাধীন। ১৯৩৬ সাল অবধি এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এই সালে নোট-ইস্যুর পূর্ণ কর্তৃত্ব আধা-সরকারী ব্যাঙ্কগুলোকে দেয়া হয়। অবশেষে ১৮৭৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Reichsbank) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নোট-ইস্যুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এই ব্যাঙ্কের উপর দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

১৩. প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৭১৭।

১৯১৪ সাল নাগাদ মাত্র ৪টি আধা সরকারী ব্যাঙ্ক নোট ছাপাতে পারত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য ব্যাক্তিগত মালিকানায় ছিল। কিন্তু, তা পরিচালিত হত সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা।

১৮৫২ সালে ফরাসী সরকার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হল Credit Foncier ও Credit Mobilier. Credit Foncier-এর যাত্রা শুরু হয় ১০ মিলিয়ন সরকারী ফ্রাঙ্ক নিয়ে। সংস্থাটি জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্তব্য হিসাবে কৃষিজীবী ও শহরবাসী-দেরকে ঋণ দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। ব্যাঙ্কটি জমি বন্ধক নিয়ে ঋণ দিত। ১৯০০ সালে স্থাপিত হয় Credit Agricole. কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প সুদে আরো অধিক ঋণ দেয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। Credit Mobilier কর্তব্য পায় রেলপথ ও শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি যোগাবার। এই ব্যাঙ্ককে তার নির্দিষ্ট মূলধনের দশগুণ ঋণ প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ১৮৬৭ সালে তা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তী কালের শিল্প-ব্যাঙ্কিংয়ের অগ্রদূত হিসাবে তা পথিকৃত হয়ে থাকে।[১৪] জার্মানীতে শিল্প ব্যাঙ্কগুলো প্রথম থেকেই দীর্ঘসূত্রী ঋণ দিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পরিসর আরো বিস্তৃত হয়। সময়-সীমা বর্ধিত হয়। পরিণামে, ব্যাঙ্কগুলো বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রাধিকার অর্জন করে বসে।

শিল্প-অগ্রগতি অনুকূল করার কাজেও জার্মানী এবং ফরসী সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তারা রীতিমত আদেশ-নির্দেশ জারী করে। অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হয়। এদিক থেকেও এদের ভূমিকা বৃটেন কি যুক্তরাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফরাসী সরকার বাস্তকার বিদ্যালয় স্থাপন করে ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করে। তেমনি খনি-বিদ্যায় ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করে। শুধু এই করে সে শান্ত থাকে না। বরং নব নব শিল্প স্থাপনেও উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য প্রদান করে এবং উৎসাহ যুগিয়ে যেতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন-কানুন সহজ করে তুলে। সীমিত দায়িত্বের নীতি গৃহীত হয়। ফলে শিল্পোন্নয়ন পারি-বেশ সহজ করে তুলে। সীমিত দায়িত্বের নীতি গৃহীত হয়। ফলে শিল্পোন্নয়ন

১৪. J. H. Clapham-এর The Economic Development of France and Germany, 1815-1914, Cambridge Univercity Press, Cambridge, 1951, 384 দেখুন।

পরিবেশ সহজ ও অনুকূল হয়ে উঠে।[১৫] জার্মানী নানারূপ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে সরাসরি ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। ১৮২১ সালে Institute of Trader স্থাপিত হয়। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজে বলিষ্ঠ সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে। শিল্পের নব নব প্রথা-প্রদ্ধতি ও আঙ্গিক জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে এবং শিল্প-জ্ঞান প্রসারের নিমিত্তে সুষ্ঠু ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলে।

শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত করা নিয়ে জার্মানী সরকার মোটেই মাথা ঘামায়নি। এই ব্যাপারে জার্মানী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য সব দেশের সরকার অপেক্ষ ভিন্নতর ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যে একাধিপত্য অপসারণের খাতিরে একচেটিয়াবাদ-নিরোধ নীতি গ্রহণ ক'রে আইন প্রণয়ন করেছিল। অথচ জার্মানী সরকার অপসারণ করা দূরে থাক বরং 'কার্টেল'-প্রথার বিকাশে এতটুকু বাধা দান করেনি। নির্বিচারে 'মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সংঘ' (cartel) গজিয়ে উঠে। জার্মানী আইনে এই সংঘ গড়ে উঠার পথে এতটুকু বাধা-বিপত্তি ত ছিলই না, বরং তা বলবৎ করার বিধান ছিল।[১৬]

শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে কিন্তু জার্মানী ও ফরাসী আইন মোটামুটি বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত ছিল। শ্রম-ইউনিয়ন কার্যাবলী তেমন সুনজরে দেখা হত না। মজুরী বৃদ্ধির নিমিত্তে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হত। কোর্ট-কাচারী এই সকল কার্যকলাপ খোলা মনে গ্রহণ করত না। ১৮৬৮ সাল অবধি ফ্রান্সে শ্রম-সংস্থার সংযোজন নিষিদ্ধ ছিল। জার্মানীতে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত তা বে-আইনী বলে বিবেচিত হত।[১৭] তারপরে অবশ্য ফ্রান্সে শ্রম-আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠে। কিন্তু, জার্মানীতে বেমক্কা অবস্থার সম্মুখীন হয়। ১৮৭৮ সালে যে আইন প্রণীত হয় সেই আইনে শ্রম-আন্দোলন বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আস্তে আস্তে অবশ্য শক্ত গেরো ঢিলা হতে থাকে। উভয় দেশ শিশু-শ্রমের অপব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কার্যকাল সীমিত করে দেয়ার নীতি গ্রহণ করে। কার্য-পরিবেশ

---

১৫. প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৩০-১৩১।

১৬. দেখুন, D. Day প্রণীত Economic Development in Europe, the Macmillan Co., New York, 1942, 409.

১৭. Bogart-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২১৮ এবং ২২৪-২১৫।

উন্নত কাবার প্রতি দৃষ্টি দেয়। বৃদ্ধ বয়সের জ্বালাতন নিরসনের জন্য জার্মানী বীমা কার্যক্রম গ্রহণ করে। তেমনি আপদ-বিপদ, কার্যকালে পঙ্গু হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দুঃখ-দুর্দশা মোচনের নিমিত্তেও বীমা কার্যক্রম গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জার্মানী কি ফরাসী কেউ তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বৃটেনের মত অবাধ বাণিজ্য নীতি গড়ে তোলায় তারা কেউ তেমন স্বার্থক হতে পারেনি। বৈদেশিক বাণিজ্যে জার্মানীর পদ-যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৪ সালে Zollverein নামক কাস্টমস্-সংঘ গড়ে তোলার মাধ্যমে। এই আইন দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র দ্বারা গঠিত জার্মানীর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অবাধ বলে ঘোষিত হয়। শিল্প-পণ্য আদানীতে মাঝারি হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। কাঁচামাল আমদানীতে কতক ক্ষেত্রে শুল্ক উঠিয়ে দেয়া হয় আর কতক ক্ষেত্রে নামমাত্র হারে ধার্য করা হয়। ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শিল্পপণ্যে আরোপিত শুল্ক হারে একটু উর্ধগতি নেয়। কিন্তু, ১৮৫০ ও ১৮৬০ দশকে এসে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে পরিপূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যায়। অবাধ বাণিজ্যের ধারা জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু, ১৮৭৯ সালে ঘড়ি আবার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করে। শিল্প-পণ্যে সংরক্ষণ নীতি পুনরায় আরোপিত হয়। ১৮৯০ দশক অবধি তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে এসে শুল্ক হারে কিছুটা হ্রাস ঘটানো হয়।

১৮১৬ সাল থেকে শুরু করে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী দেশ ঋজুবদ্ধ সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে চলে। শিল্প-পণ্য ও কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে তা অধিক দৃঢ়তর হয়। ১৮৫০ সালোত্তর কালে আবহাওয়া একটু মুক্ত হতে শুরু করে। বেশ কিছু বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এদিকে, দেশীয় শিল্পে সাহায্য-নীতি গৃহীত হয়। তাতে করে অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশ একটু সহজতর হয়। কিন্তু, ১৮৯২ সালের Tariff Act প্রবর্তন ক'রে এক থাবলায় তুড়ি মেরে এই অবাধ পরিবেশ উড়িয়ে দেয়া হয়।

দৃঢ় সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ ক'রে শিল্পায়ন পথে অগ্রসর হওয়ার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ জাপান। উনবিংশ শতাব্দীতে কঠিন ঘরমুখো নীতি অনুসরণ ক'রে জাপান তার শিল্পোন্নয়ন পথে এগোয়। মাত্রার দিক থেকে তার এই সঙ্কোচন-নীতি জার্মান ও ফরাসী অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল।

১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত জাপান সরকার নিজে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে চলে, টাকা-পয়সা যোগায় ও পরিচালনা করে। তার এই উদ্যোগ উৎপাদনশিল্পে যেমন, তেমনি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পেও বিস্তৃত হয়। সরকার রেলপথ স্থাপন করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা স্থাপন করে। তাদের পরিচালনা নিষ্পন্ন করে। পোত-বহর সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় গড়ে উঠে। সরকার লোহার কারখানা, যন্ত্রপাতিরর কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করে। কাপড়ের কল বসায়, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী বানায়। কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করে এবং গ্লাস কারখানা গড়ে তুলে।

১৮৮২ সালোত্তর কালে এসে সরকার অধিকাংশ শিল্প-প্রকল্প বেসরকারী মালিকানায় ছেড়ে দেয়, কেবল লোহা ও ইস্পাত কারখানা ছাড়া। অবশ্য সরকার লোহা ও ইস্পাত শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগকে বাধা দেয়নি। কিন্তু, স্বীয় প্রতিষ্ঠিত Yawata Iron Works (স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) এই শিল্পে প্রাধান্য বজায় রেখে চলে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সরকার স্বীয় আয়ত্তাধীনে রেখে দেয়। ১৯০৬ সালে বড় বড় সব রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়া হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ শিল্পসমূহও সরকারী মালিকানায় রেখে দেওয়া হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার বেশ সক্রিয় থাকে। দলে দলে শিক্ষার্থীদেরকে বিদেশে পাঠানো হয় বিদেশী শিল্প-আঙ্গিক ও কায়দাকানুন শিখে আসার নিমিত্তে। শত শত বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানী করে আনা হয় নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে। দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেকনিক্যাল স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।

সুতরাং সরকারী কার্য-ক্রিয়া বিরাট বপুসম্পন্ন হয়ে উঠে। বিরাটাকার এই কার্যপ্রণালী বাস্তবায়িত করায় যে সীমাহীন অর্থসম্পদের প্রয়োজন তার অধিকাংশটা আসে ভূমি ও ভোগ-কর থেকে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, আয়করের হার নামমাত্র পর্যায়ে রাখা হয়। বাণিজ্য-উৎসারিত আয়েও করের বোঝা তেমন অসহনীয় ছিল না। সরকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়েও লিপ্ত হয়। Bank of Japan কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মর্যাদায় সমাসীন হয়ে নোট-ইস্যুর সর্বময় কর্তা হয়ে উঠে এবং সরকারী টাকা-পয়সার আধার হিসাবে কাজ করতে থাকে। বেসরকারী উদ্যোগে অথচ প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের উপর সরকারী কর্তৃত্বে বিশেষ বিশেষ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠে। এই সকল ব্যাঙ্ক, তেমনি বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলোও, শিল্পখাতে

টাকা যোগাতে থাকে। স্বল্পমেয়াদী হারে যেমন, তেমনি সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরেও। যৌথ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ ক'রে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করে যেতে থাকে।

জাপান সরকার সমাহরণ (concentration) বন্ধ করতে কোন উদ্যোগ নেয়নি। তেমনি, একচেটিয়া বাণিজ্য মাথা গজিয়ে উঠায় বাধা-নিষেধের গণ্ডী টেনে ধরেনি। ফলে বেসরকারী খাত আপন বেগে এগিয়ে যেতে পেরেছে। দরমাত্রা কি উৎপাদন পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে ইচ্ছামত কার্য নির্বাহ করতে পেরেছে, অন্য দশ জনের সাথে মিলে কি একাকী যে কোন নীতি স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রচলিত আইন তাতে বাধা দেয়নি।[১৮] কিন্তু, শ্রম-আন্দোলন প্রতিহত করেছে। মজুরী তেমন বাড়তে দেয়নি। দর কষাকষি সুনজরে দেখেনি। ১৯00 সালে আইন ক'রে ধর্মঘট প্রায় নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।[১৯] কেউ ধর্মঘটে উদ্যোগী হলে তা গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়। এমনকি ১৯১৪ সালেও শিশু-শ্রম কি কার্য-পরিবেশ নিয়ে তেমন কোন আইন ছিল না।

জাপান চুক্তিবদ্ধ ছিল। তাই ১৮৯৯ সাল অবধি সংরক্ষণ-প্রাচীর গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু, চুক্তিকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে বেশ দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিংশ শতাব্দীর কার্যধারা

উনবিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত অর্থনৈতিক কার্যধারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ছিল বটে। কিন্তু এক বিষয়ে মোটামুটি সাদৃশ্য বিরাজমান ছিল। উপরে বর্ণিত প্রায় প্রত্যেকটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতিতে প্রাধান্য আরোপ করেছিল। সব কয়টি দেশ প্রগতি-প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার প্রদান করেছিল। অন্যান্য লক্ষ্যাবলী তেমন গুরুত্ব পায়নি। বিশেষ করে অগ্রগতি লক্ষ্যে বাধাদানকারী উদ্দেশ্যাবলী নিষ্প্রভ তাৎপর্য লাভ করেছিল। আয়-বন্টনে ন্যায়ানুগ নীতি অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তেমনি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ট সহানুভূতির অভাব ছিল।

---

১৮. দেখুন, W. W. Lockwood-এর The Economic Development of Japan, Princeton University Press, Princeton, 1954, 565,

১৯. প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৫৫৭।

সরকার শ্রমকে এতটুকু মাথা তুলতে দেয়নি। তার কার্য-ক্রিয়া শক্ত হাতে দমন করেছিল, ইউনিয়ন কর্মাবলী রূঢ় আচরণ লাভ করেছিল, স্বীয় অবস্থা উন্নয়নে কি ধর্মঘট ইত্যাদি মাধ্যমে মজুরী বর্ধনে প্রয়াসী হলে সরকার দৃঢ়হাতে শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শ্রমের কার্য-পরিবেশ উন্নয়নে কোন কার্যকরী প্রথা সহজে গৃহীত হয়নি। নেহায়েত দায়ঠেকা অবস্থায় পড়লে কেবল কিছুটা উদ্যম নেয়া হত, করপ্রথা দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাক বরং বহু সরকার পশ্চাৎমুখী কর নীতি গ্রহণ করে শ্রমকে বঞ্চনা করেছিল। শিল্প-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে প্রচুর সুযোগ প্রদান করেছিল। শুল্ক-নীতি গ্রহণ করে শিল্পকে অন্যায় সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা বলবৎ রেখেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে এসে অবস্থার মোড় নিয়েছে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এবং আয়-বন্টন ন্যায়নীতিভিত্তিক করায় অধিক হারে উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। আয়কর ও করপোরেশন কর প্রথা প্রগতিশীল করে তোলা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি দেশ এই প্রথা মেনে চলেছে। বৃটেনে অবশ্য অনেক কাল আগে থেকেই আয়কর প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, প্রথম মহাযুদ্ধ অবধি তা তেমন ধর্তব্য কিছু ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধকাল সময়ে এসে এই কর বেশ একটু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিধানিক উপায়ে ব্যক্তিগত আয়করনীতি গ্রহণ করেছে মাত্র ১৯১৩ সাল থেকে। তবে মাত্রায় তখনো তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ১৯১৩ সালে তা মোট ফেডারেল রাজস্বের মাত্র ৫ শতাংশের মত ছিল। ১৯৫২ সালে তা বেড়ে বেড়ে শতকরা ৮২ ভাগে উন্নীত হয়।[২০] জাপানে আয়, মূলধন ও বাণিজ্য-সংস্থায় আরোপিত করের পরিমাণ সার্বিক রাজস্বের তুলনায় শতকরা মাত্র ১৩ ভাগের মত ছিল। এটা ১৮৯৩-১৮৯৪ সালের কথা। ১৯১৩-১৯৩৪ সালে তা শতকরা ৪৩ ভাগে উন্নীত হয়।[২১]

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানেও ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয় বর্তমান শতাব্দীতে। বৃটেন ও জার্মানী এই সম্পর্কে পথিকৃত হিসাবে ক্রিয়া

---

২০. দেখুন, J. F. Dewhurst ও Associates-এর, America's Needs and Resources, A New Survey, The Twentieth Century Fund, New York, 1955, Table 239, 584.

২১. Lockwood-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৫২৩।

করে। এই উভয় দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালেই জাতীয় ভিত্তিক স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম গ্রহণ করে। তেমনি বৃদ্ধ বয়সে অবসর-বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। ১৯৪৬ সালের National Health Service Act-এর আয়ত্তায়, বৃটেন বিস্তৃত স্বাস্থ্য কার্যধারা গ্রহণ করে, বৃদ্ধ বয়সে অধিক হারে বীমা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং ঘর-বাড়ী ও শিক্ষা খাতে সাহায্য দেয়ার কার্যসূচী নেয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৫ সালে বার্ধক্য-নিরাপত্তা-বীমা কার্যক্রম গ্রহণ করে নেয়। তেমনি দীন-দরিদ্রের সহায়তার জন্য রাষ্ট্র সরকারকে ভাতা যোগাতে শুরু করে। ১৯৩০ দশকে স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকারার্থে ঘর-বাড়ী নির্মাণের একটা ফেডারেল কার্যক্রম গৃহীত হয়। জাপানের মত দেশও এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। জাপান সরকার ১৯২২ সালে Health Insurance Act পাস ক'রে শ্রমিক শ্রেণীকে সুবিধা দানের ব্যবস্থা করে। অসুখ-বিসুখে সাহায্য দানের কর্মপন্থা গ্রহণ করে। আপদে-বিপদে, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের ব্যথা লাঘব করার কর্মপ্রণালী গ্রহণ করে। প্রসূতিকালে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করে। শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবারকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য দানের কার্যক্রম নেয়।

শতাব্দীর সীমা পেরিয়ে সরকার আরো একটু বাস্তব-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে এগিয়ে আসে। অবহেলিত শাখাসমূহে অধিক দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এদ্দিন শোষিত বিভাগসমূহে একটু কৃপা বিতরণে অগ্রণী হয়। কৃষিখাত বহুকাল ধরে তেমন কিছু পায়নি। তাই প্রথম দৃষ্টি যায় কৃষিখাতে। বৃটিশ সরকার ১৯২১ সালে গম ও জই (oat) উৎপাদনে যে দর-সমর্থন উঠিয়ে দিয়েছিল তা গমের বেলায় ১৯৩১ সালে পুনরারোপ করে এবং ১৯৩৭ সালে জই ও বার্লি উৎপাদনেও সম্প্রসারিত করে। গো ও শুকর মাংস আমদানীতে কোটা বেঁধে দেয়া হয়। সেই একই দশকে (১৯৩০ দশক) দুধ ও গোলআলু আমদানীতে'ও কোটা নীতি প্রবর্তন করে। ১৯২৮ সালে Agricultural cerdit Act পাস ক'রে কৃষককুলকে অল্প সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করে। ১৯৪৭ সালের কৃষিআইন দ্বারা কৃষিপণ্যের নির্ধারিত দর নিশ্চিত করার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও প্রসারিত করে।

ফরাসী ও জার্মানী সরকার মোটামুটি একই পথে এগোয়। উত্তর-প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ফরাসী সরকার কৃষি উন্নয়নে অধিক মনোযোগী হয়। সেই

উদ্দেশ্য সাধনে শুল্ক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করে। ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করে। দরমাত্রা বেধে দেয়ার নীতি চালু করে। কৃষি-শিক্ষা সম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করে। জার্মান সরকার দরমাত্রায় স্থায়িত্ব আনার নিমিত্তে কৃষিখাতে সর্বনিম্ন মজুরী ঠিক করে দেয় এবং বিপণীকরণ প্রথা সুষ্ঠু করার উদ্যোগী হয়। ১৯৩০ দশকে শুল্ক-নীতি গ্রহণ ক'রে বহু কৃষি-পণ্য তার আওতাভুক্ত করে দেয়। কতকগুলো কৃষিপণ্যে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে। সেচ ও জল-নিষ্কাশন প্রণালী প্রকল্প গ্রহণ ক'রে কৃষি উন্নয়নে অগ্রণী হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কৃষিঋণ সহজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিপণীকরণ প্রথা সুষ্ঠু করার নিমিত্তে ১৯২৯ সালে ফেডারেল খামার বোর্ড স্থাপন করে। অতঃপর কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করে। উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। ব্যাপক অনুদান (subsidy) প্রথা কার্যকরী করে। ফসল-বীমা চালু করে দেশব্যাপী দর-সমর্থন নীতি গ্রহণ করে।

১৯০০ সালের পরে শ্রমিক-জীবন অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রতি সুবিচারের নীতি গৃহীত হয়। তাকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ক'রে আয়-মাত্রার পর্বত-প্রমাণ বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টা চালানো হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃটেনে ১৮৭৫ সালে যৌথ দর কষাকষির নীতি বৈধ হিসাবে গৃহীত হয়। ১৮৭৫ সালের আইনে যে সব কার্যক্রিয়া অত্যধিক দূষণীয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল সেগুলো ১৯০৬ সালে Trade Disputes Act-এ সাধারণ অন্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়। ঝগড়া-বিবাদে সালিশ করার জন্য ১৮৯৬ সালের Conciliation Act পাস হয়। ১৯১৯ সালের Industrial Courts Act শান্তি সংস্থাপক প্রথার প্রচলন করে। ১৯০৯ সালের এক আইন দিয়ে ছোটো কাজে সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ করে দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এসে জার্মান সরকার শ্রমের যৌথ দর কষাকষি নীতি গ্রহণ করে নেয়। ইউনিয়ন কার্যাবলী বৈধ ঘোষণা করে। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কার্যকাল ঠিক করে দেয়। ঝগড়া-ফ্যাসাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৩৫ সালে National Labour Relations Act পাস করে শ্রমিক অধিকার বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়। শ্রমিক কার্যাবলী বিহিত বলে ঘোষণা

করে এবং যৌথ দর কষাকষি নীতি মেনে নেয়। ১৯৩৮ সালের Fair Labour Standards Act শ্রমিকের অবস্থা আরো ভাল করে দেয়। তবে প্রাপ্য সর্বনিম্ন মজুরী স্থির করে দেয়। তার কার্যকাল আইনের সীমায় বেধে দেয়।

পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান করা বিংশ শতাব্দীর একটা বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত প্রায় প্রতিটি দেশ এই লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়। জাতীয় বীমা আইন পাস ক'রে বৃটেন ১৯১১ সালে বেকার-বীমা প্রবর্তন করে। এই আইনের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও সরকার এই তিন পক্ষ টাকা দান ক'রে বেকার শ্রমিকের জন্য রসদ যোগাবার বন্দোবস্ত করে। বেকার শ্রমিককে সর্বোচ্চ ১৫ সপ্তাহের জন্য ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করে। ১৯২৭ সালে জার্মানী বেকার-বীমা আইন প্রচলন করে। মালিক ও শ্রমিক সমপরিমাণ টাকা দান করে বেকার শ্রমিকের জন্য সর্বোচ্চ ২০ সপ্তাহের খোরপোষ যোগাবার ব্যবস্থা করে। ফরাসী সরকার ১৯২৮ সালে এই নীতি প্রবর্তন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৩৫ সালে Social Security Act পাস ক'রে বেকার শ্রমিকের জন্য নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে।

বেকার শ্রমিককে কিছুটা শান্তি দিয়েই সরকার ক্ষান্ত থাকে না। বেকারত্ব জটিলতার সুষ্ঠু সমাধানেও সে অগ্রণী হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনে রাজস্ব ও মুদ্রানীতিতে সংস্কার সাধিয়ে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি অর্জনে প্রয়াসী হয়। করভার হ্রাস করে, সরকারী খাতে ব্যয় বাড়িয়ে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ক'রে বেকারী দূর করার বাস্তব পন্থা গ্রহণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বেকারত্ব নিরসনে বিধানিক প্রথা প্রবর্তন করে। ১৯৪৬ সালে Employment Act পাস করে সরকার তার দৃঢ়তার বাস্তব রূপ দেয়। এই আইনের মাধ্যমে ফেডারেল সরকার বেকারত্ব দূরীকরণের কর্তব্য গ্রহণ করে। "সর্বোচ্চ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান অর্জন, উৎপাদন, বৃদ্ধি করা ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার" লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী হয়। বৃটিশ সরকার ১৯৪৪ সালে চাকুরী-বাকুরী সম্পর্কীয় এক "শ্বেত পত্রে" নীতি হিসাবে মেনে নেয় যে, যুদ্ধাবসানে তার (সরকারের) এক প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্য হবে চাকুরী-বাকুরী নিশ্চিত ও স্থিতিশীল করা।" "পূর্ণ কর্মী বিনিয়োগ" নিশ্চিত করার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে ফরাসী

সরকার তার যুদ্ধোত্তর আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা (মনেট্ প্ল্যান) পথে এগোয়।

শুধু পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান করার কথা ঘোষণা করেই সরকার বসে থাকেনি। দরমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখার নিমিত্তেও সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলে। ১৯৩০ দশক অবধি কেবল মুদ্রা-নীতির ছত্রচ্ছায়ায় দরমাত্রা ও চাকুরী-বাকুরী সংস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হত। অন্ততঃ এটাই ছিল মুখ্য অস্ত্র। আমেরিকা ১৯১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন করে নেয়। অতঃপর তার উপর "কর্ম জগতের সর্বত্র তথা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু মুদ্রা ও ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবেশ অনুকূল স্রোতে বইতে পারে।" ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলো বেসরকারী মালিকানায় ছিল বটে। কিন্তু, এই ব্যবস্থার পরিচালক-মণ্ডলী (Board of Governors) সিনেটের সম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হত। বৃটিশ সরকার Bank of England-এর উপর সীমিত কর্তৃত্ব খাটিয়ে আসছিল অনেক কাল ধরেই। তার এই কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় ১৯১৪ সালোত্তর কালে। ফরাসী দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার তাদের এই ব্যাঙ্ক দুইটি রাষ্ট্রায়াত্ত করে নেয়। একদিকে সরকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সরাসরি হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে চলতে থাকে, অন্যদিকে রাজস্ব-নীতিতে হের-ফের ঘটিয়ে দর-মাত্রা প্রভাবিত করতে থাকে।

উপরে উল্লেখিত চাকুরী-বাকুরী সংক্রান্ত ইস্তাহারে বৃটিশ সরকার দরমাত্রা সম্পর্কেও তার মতামত ব্যক্ত করে। দরমাত্রা মোটামুটি পর্যায়ে বজায় রাখার সিদ্ধান্তও উক্ত ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত হয়। "চাকুরী-বাকুরী সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সুতরাং, এই দুইটি বিষয়ের (মজুরী ও দর) স্থিতিশীলতা অত্যাবশ্যকীয় আর স্থিতিশীলতার এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে কেবল সরকার, মালিকপক্ষ ও সংঘবদ্ধ শ্রমের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সরকার তার কর্তব্য সম্পাদনে বদ্ধ পরিকর। দর মাত্রা স্থিতিশীল পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়োজনে সরকার আবশ্যকীয় সব কিছু করতে সদা প্রস্তুত। দরমাত্রায় ওলট-পালট ঘটে কি আমদানী পরিমাণ অথবা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-মাত্রা ভণ্ডুল করে দিক তা মোটেই কাম্য নয়। কাজেই,

সরকার এই অবস্থার নিরসনে সর্ব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।"[২২] যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বহু ঘোষণায়ও একথার প্রতিধ্বনি শুনা গিয়েছে। এদিক থেকে রিপাবলিকান কি ডিমোক্রেটিক কোন দলের সরকারকেই পিছপা দেখা যায়নি।[২৩]

সম্পদ-বিতরণ অপর একটি ক্ষেত্র, যেখানে সরকার সরাসরি সক্রিয়তা প্রদর্শন করে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই সক্রিয়তা বিশেষভাবে জোরদার হয়েছে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো সরকার হয় স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলেছে অথবা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার বেতার ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়, British Overseas Airways Corporation প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদ্যুৎ-শিল্পের বেশ কিছুটা কর্তৃত্বাধীন পরিচালনা করে। একই সময়ে ফরাসী সরকার রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়, অধিকাংশ অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ-শিল্প স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে এবং উড়োজাহাজ নির্মাণ স্বীয় পরিচালনাভুক্ত করে নেয়। Bank of France-কে রাষ্ট্রের অধীনে আনেনি বটে, তবে তা কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। সুষ্ঠু পরিচালনার অপেক্ষাকৃত দুর্বল এমন বেশ কিছু অর্থ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ারও ফরাসী সরকার কিনে নেয়। জার্মানী সরকার আরো অধিক দূর অগ্রসর হয়। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো স্বীয় পরিচালনায় নিয়ে এসে সে শান্ত থাকেনি। ইস্পাত, মোটর গাড়ী ইত্যাদি শিল্পও সরকার স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে। ১৯২০ সালে রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। উক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তেমন একটা সক্রিয়তা দেখায়নি বটে, তবে ফেডারেল সরকার যুদ্ধ-মধ্যবর্তীকালীন সময়ে ক্রেডিট, বিদ্যুৎ উন্নয়ন, জলসেচ বন্যা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছুটা উদ্যোগী হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ধুম পড়ে যায় দেশে দেশে। বৃটেন ও ফরাসী দেশ সবচেয়ে অগ্রণী হয়। Bank of England সরকারের করতলগত হয়। তেমনি Bank of France রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে চলে

২২. S.E. Harnis তার Economic Planning নামক পুস্তকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, Alfred A. Knopf. New York, 1949,147.

২৩. উদাহরণ হিসাবে দেখুন, যথা—Midyear Economic Report of the President, July, 1950, 10 এবং Economic Report of the President, 1954, III.

আসে। সাথে চারটি প্রধান বাণিজ্য ব্যাঙ্কও। ফরাসী সরকার অধিকাংশ বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করে নেয়। সমুদ্রগামী জাহাজ-শিল্প ও বিমান-শিল্পে সরকারী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রেনল্ট গাড়ী কোম্পানী (Renault automobile Company)-সহ আরো বেশ কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা হয়।[২৪] বৃটেনে আভ্যন্তরীণ পরিবহন, বেসামরিক নভোশ্চরণ (civil aviation), টেলি-যোগাযোগ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করে নেয়া হয়।[২৫] ১৯৫৩ সালে অবশ্য লৌহ ও ইস্পাত এবং রেলপথে মালবহন শিল্প বেসরকারী খাতে দিয়ে দেয়া হয়।

বহু দেশ নীতিগতভাবে সরকারী মালিকানা তেমন পছন্দ করে না। তাই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনতে তেমন উদ্যোগী নয়। কিন্তু, তবু এই সকল দেশেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশ কিছুটা বেড়েছে। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সবকিছু সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে রাজী নয়। কিন্তু, তবু সে বহু নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপন করে চলেছে। অভিকর (Rates) ধার্য করে দেয়ার নিমিত্তে এবং সেবার সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করে দেয়ার জন্য এই সকল কমিশন কাজ করে চলেছে। রেলপথ, তড়িৎ যোগাযোগ, পাইপ লাইন, বাস ও ট্রাক লাইন, জল-পরিবহন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানী, রেডিও এবং টেলিভিশন কোম্পানী, বিদ্যুত ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ এই সকল সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

বর্তমান শতাব্দী জনকল্যাণমূলক প্রকল্প-বহির্ভূত অঞ্চলেও সরকারী সক্রিয়তা জন্ম দিয়েছে এবং এই হস্তক্ষেপ ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে। ১৯৩০ দশকের দিকে বৃটিশ সরকার কয়লা-শিল্পে দর-নিয়ন্ত্রণ-সংঘ গড়ে তোলার প্রেরণা দিয়ে আইন পাস করেছে এবং অন্যান্য শিল্পে এই জাতীয় সংঘ গড়ে তোলার উস্কানী যুগিয়েছে। নাজী-জার্মানী খোলাখুলি পথে কার্টেল-প্রথা প্রবর্তিত ক'রে বেসরকারী খাতকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

---

২৪. দেখুন, M. Einaudi, M. Bye ও E. Rossi প্রণীত Nationalization in France and Italy, Cornell University Press, Ithaca, 1955, 81-86.

২৫. দেখুন Central Statistical office, National Income Statistics, H.M.S.O. London, 1956, 169-170. এতে সরকারী করপোরেশনগুলোর পূর্ণ তালিকা পাবেন।

করেছিল। ১৯৩০ দশকে জাপান সরকারও এই প্রথা চালু করেছিল। অবাধ নীতর এমন যে সোচ্চার প্রবক্তা আমেরিকা সেও ১৯৩৩ সালে **National Recovery Act** পাস করে তার মহামন্দা পরিস্থিতি কাটিয়ে তোলার নিমিত্তে সর্বনিম্ন দরমাত্রা চুক্তি সম্পাদনের প্রেরণা যোগাতে প্রয়াসী হয়েছিল। অবশ্য এই প্রচেষ্টা তেমন ফলবতী হতে পারেনি এবং অচিরে এই আইনের অকালমৃত্যু ঘটে। সাধারণভাবে বলতে গেলে অবশ্য কার্টেল-প্রথা কোন কালেই আমেরিকায় তেমন সমাদর পায়নি। বরং, আভ্যন্তরীণ শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়াবাদ নিরসনের নিমিত্তে বহু আইন প্রণীত হয়েছে। ১৯১৪ সালের **Federal Trade Commision Act & the Clayton Act** এবং ১৯৩৬ সালের **Robinson-Patnan Act** এই জাতীয় আইনের তিনটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বৃটিশ সরকারও তার এদ্দিনকার নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে ১৯৪৮ সালে এসে বাণিজ্য জগতের এক-চেটিয়াবাদ দূরীকরণের আইন প্রণয়ন করে নিয়েছে। যুদ্ধকাল পেরিয়ে বিজিত শক্তিবর্গ ও অধিকৃত জাপান এবং জার্মানীতে বিদ্যমান অত্যধিক শিল্প-কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতা দূরকরণে উদ্যোগী হয়। অবশ্য বিজিত শক্তিবর্গ অধিকার ছেড়ে দিয়ে চলে আসার পর এইসব দেশে কেন্দ্রীকরণ-প্রথা আরো ঘনীভূত হয়।

যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানী সহ-নির্ধারণ (**Co-determination**) নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির দ্বারা শ্রমকে বেসকারী শিল্প ব্যবস্থাপনার কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। অর্থাৎ শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থির করা হয় যে ইস্পাত ও লৌহ শিল্পে সে পরিচালক-মণ্ডলী দীর্ঘসূত্র নীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করবে তার মধ্যে শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে ৫ জন আর শেয়ার-হোল্ডারদের প্রতিনিধি থাকবে ৫ জন। আর এই ১০ জন মিলে একাদশ সদস্য নির্বাচন করে নেবে। কার্যনির্বাহী পরিচালক-বোর্ড গঠিত হবে ৩ জন সদস্য নিয়ে আর তার একজন হবে শ্রমিক-প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালে এসে এই সহ-নির্ধারণ নীতি আরো একটু উদার করে নিয়ে বেসরকারী বাণিজ্যিক করপোরেশনগুলোতেও সম্প্রসারিত করা হয়। পরিদর্শন-মণ্ডলীর এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কার্যনির্বাহী বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে না বলে ঘোষণা করা হয় সরকারী, বেসরকারী সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান ক্রিয়া-কাউন্সিলসমূহ

(Works Council) ১৯৫২ সালের আইনের আওতাভুক্ত করা হয় এবং সহ-নির্ধারণ নীতির সুযোগ দেয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সরকারী আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। সরকার এক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠে। অবাধ বাণিজ্যের সেই যে বিরাট পূজারি, বৃটেন সেও ১৯১৪ সালোত্তর কালে এসে এই নীতি পরিহার করে। ১৯৩২ সালে Import Duties Act পাস করে সরাসরি সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করে। ১৯৩০ দশকে কতক ক্ষেত্রে কোটা-নীতিও বেঁধে দেয়। স্বর্ণমানের বেড়াজাল কাটিয়ে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি লঘু করার নিমিত্তে বৃটেন বিনিময় স্থিতিকারী ফাণ্ডের পত্তন করে। অবশ্য ১৯৩৯ সাল অবধি বিনিময়ের পরিমাণাত্মক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়নি। ১৯২০ দশকে ফ্রান্স উঁচু শুল্ক-প্রাচীর উঠিয়ে চলেছিল। ১৯৩০ দশকে এসে সে ব্যাপক হারে কোটা-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রম-বর্ধনশীল বাণিজ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এই ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয়। জার্মানীতেও বৈদেশিক বাণিজ্য দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৩০ দশক নাগাদ এই নিয়ন্ত্রণ বেশ ঘনীভূত ও বিস্তৃত আকার ধারণ করে। সরকারী তদারক ছাড়া বিদেশী ব্যবসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর-প্রথম মহাযুদ্ধকাল ছাড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ইতিহাসের সর্বোচ্চ শুল্ক-প্রাচীর গড়ে তুলে। Smoot Howby আইন পাস করে তা করা হয় (১৯৩০ সাল)। ১৯৩৪ সালে Trade Agreements Act জারী করে অবশ্য ক্রমে ক্রমে তার দৃঢ়তা কিছুটা লঘু করা হয়।

রাশিয়ান অগ্রগতি পৃথকভাবে বিবেচনা করার দাবী রাখে। প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তর কালে এই দেশে যে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয় তা রীতিমত ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দেয়ার মত। তার অগ্রগতি সাধিত হয় কড়াকড়ি রাষ্ট্রীয় বন্ধনে। পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সাধিত হয় তার শৈল্পিক সম্প্রসারণ। অবশ্য একথা মনে করা উচিত হবে না যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় কোন উন্নয়নই ঘটেনি। না, মোটেই তেমন নয়। ১৮৬১ সালে সামন্ত-প্রথা তিরোহিত হয়। এই সময় থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ কালের সূচনা সময় পর্যন্ত রাশিয়ায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। সরকার এই অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ রেলপথ স্থাপিত হয় সরকারী টাকায়। বহু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক উদার হাতে ঋণ দিয়ে বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে

সহযোগিতা যোগায়। বিদেশী মূলধন আমদানী উৎসাহিত করা হয়। বহু বিদেশী কলাকুশলী আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। শুল্ক-প্রথা প্রবর্তন করে দেশী শিল্পের মাথায় সংরক্ষণের শীতল ছায়া মেলে ধরা হয়।

কম্যুনিস্ট সরকার তড়িঘড়ি সবকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে থাকে। ১৯২১ সাল নাগাদ ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক-বাণিজ্য, শিল্প, আভ্যন্তরীণ-বাণিজ্য ও পরিবহণ-ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে চলে আসে। জমি-জেরাত সরকারের করতলগত হয়। তার পরবর্তী কয়েক বৎসর সরকার অবশ্য রাশ একটু হালকা করে দেয়। ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে, অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশে অগ্রসর হয়। নব অর্থনৈতিক কার্যধারা (N.E.P.) প্রবর্তিত হয় এবং এর কার্যকাল সময়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্য চলতে দেয়া হয়, ছোট ছোট কল-কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখতে দেয়া হয়। কৃষককুলকে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্যের কিছুটা খোলা বাজারে বিক্রি করতে দেয়া হয়। কয়েক বৎসর ধরে এই ব্যবস্থা চলতে থাকে। অতঃপর আবার রাশ কষে ধরা হয়। আস্তে আস্তে সব কিছু সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসে যেতে থাকে। ১৯৩০ সাল নাগাদ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। নামমাত্র কিছু কিছু কাজ কেবল বেসরকারী মালিকানায় থাকে। এদিকে সরকার যৌথ খামার-ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে অগ্রণী হয়। সুষ্ঠু কার্যক্রম প্রণয়ন করে তা রূপায়নে মনোনিবেশ করে। ১৯৩৬ সাল নাগাদ দেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন কৃষক যৌথ-খামারে কাজ করতে থাকে।

সোভিয়েট সরকার ১৯২৮ সালে তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করে। এই পরিকল্পনায় অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ বিবৃত করে নেয়া হয় এবং সেসব অর্জনের স্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করা হয়। উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করে নেয়া হয়। জাতীয় আয় ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ে ভাগ করে নেয়া হয়। প্রধান প্রধান আয়কারী গোষ্ঠীসমূহে ভোগ্য-দ্রব্য ও বিনিয়োগ-সামগ্রী ভাগ করে দেয়া হয়। এককথায়, অর্থনীতির সর্ব শাখায় সীমা-সরহদ্দ বেঁধে দেয়া হয়। ব্যাপৃত কার্যক্রম প্রনয়ণ করে নেয়া হয়। তবে পূর্ণ পরিকল্পনাটি অনড় করে তোলা হয়নি। বরং নমনীয় কাঠামোর বিস্তৃত ছকে পরিবর্তিত অবস্থা খাপ খাইয়ে নেয়ার সুঠাম ব্যবস্থা রাখা হয়। উদ্দেশ্যাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করে নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা: প্রথম ও পরবর্তী সবগুলো

পরিকল্পনাতে বিনিয়োগ কার্যে অধিক জোর আরোপ করা হয়। বিশেষ করে ভারী শিল্প উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এক হিসাব মতে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বর্ষে জাতীয় আয়ের প্রায় চব্বিশ শতাংশ বিনিয়োগে নিয়োজিত হয় আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম সালে লগ্নী হয় শতকরা ১৯½ ভাগ।[২৬] সোভিয়েট দেশের মূলধন সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে এক লেখক মন্তব্য করেছেন যে ১৯৫৫ সালে রাশিয়া তার মোট জাতীয় উৎপন্নের ২৫ শতাংশ লগ্নী করে।[২৭] অতি দ্রুত হারে শিল্পায়ন পথে এগিয়ে যাওয়াই অভীষ্ট লক্ষ্য বলে সম্মান পায়।

বর্তমান অংশে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা তা একটু খতিয়ে দেখলে অনুধাবন করা সহজ হবে যে, অধিকতর দ্রুত হারে উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পটভূমি হিসাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে। বেকারত্বের ছড়াছড়ি কি মুদ্রাস্ফীতির ভয়াবহ আশঙ্কা নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগমন সম্ভব নয়। তেমনি শ্রমিক অসন্তুষ্টি কি সামাজিক অস্থিরতা বিরাজমান পরিবেশে প্রগতি-প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে না। কাজেই, উন্নয়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করার খাতিরে সামাজিক মঙ্গল বিধান তৈরী করে নিতে হয়। আইন দিয়ে তা বাধ্যবাধকতার মোড়ক পড়িয়ে দিতে হয়। এতে করে শ্রমের পটুতা বাড়ে। তাতে উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত হওয়ার সুযোগ পায়, সেই একই যুক্তিতে সরকারও ব্যবসা-বাণিজ্য পথে পদক্ষেপ করে। কোথায়ও হয়ত নিয়ন্ত্রণের জাল ছড়িয়ে দেয়। জনকল্যানমূলক প্রকল্প সরকারী আওতায় নিয়ে আসা হয় একদিকে একচেটিয়াবাদের অশুভ প্রতিফল নিরোধ করার জন্য এবং অন্যদিকে, মূলধন আবদ্ধকারী সামাজিক কার্যাবলী নিষ্পন্ন করে উন্নয়ন-পরিবেশ অনুকূল করে তোলার নিমিত্তে। যুদ্ধ-মধ্যবর্তীকালীন সময়ে অন্যান্য সব শিল্পে যে সরকারী সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে তাও সেই প্রগতি-ক্রিয়া সুষ্ঠু করার যুক্তিতে। যেমন বৃটেনের কথা ধরুন। বৃটেন ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পুনর্বিন্যাস

২৬. দেখুন, Maurice Dobb-এর Soviet Economic Development since 1917, Routledge and K. Paul, Ltd., London, 1948, 268.

২৭. দেখুন, G. Grossman প্রণীত "Some Current Trends in Soviet Capital Formation," in Capital Formation and Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton, 1955,176.

আন্দোলন জোরদার করে। যুক্তি হিসাবে তুলে ধরা হয় যে তাতে বৃটিশ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতা বেড়ে যাবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জার্মানী শিল্পক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে তুলে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে। আমেরিকা একচেটিয়াবাদের দোষ-ত্রুটি নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে উন্নয়ন-হার সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখার নিমিত্তে।

যে যাই হউক, দুই মহাযুদ্ধকালীন অন্তবর্তী সময়ে তথাকথিত স্বাধীন-বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য কিছুটা দূরে ঠেলে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান ও আয়-বৈষম্য ন্যায়ভিত্তিক করায় অধিক মনোযোগ দেয়। তেমনি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে অধিক জোর আরোপ করে। আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে যেয়েও বহু ধনীদেশ বেশ ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। ১৯৩০ সালের মহা-মন্দাকাল বহু দেশকে ভাবিয়ে তুলে। তারা যথাবিহিত নীতি গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। অর্থনৈতিক অন্যান্য লক্ষ্য উন্নয়ন অগ্রগতি জোরদার করে একথা সাধারণভাবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও উন্নয়ন লক্ষ্যে তেমন জোর আরোপ করা হয় না। অন্ততঃ তৎকালীন কার্যধারায় এই গুরুত্ব তেমন প্রতিভাব হয়নি। তাই লর্ড কেইনস্ ভেংচি কাটেন, "সময়ে ব্যপ্ত-পরিসরে আমরা সবাই মৃত।" তাঁর এই টিপ্পনী থেকে সেকালীন অধিকাংশ সরকারের নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়া যায়। সব সরকার স্বল্পকালীন বিবেচনায় উন্মুখ হয়ে উঠে এবং সেই অনুসারে কার্যসূচী গ্রহণ করে পূর্ণ বিনিয়োগ পরিবেশ অর্জনে ব্রতী হয়। দীর্ঘসূত্রী বিবেচনা অবহেলিত হয়।

কার্যতঃ অপরোক্ত চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতি প্রাগ যুদ্ধকালীন সময়ের অভ্যাসের পরিণতি তথা প্রবহমান ধারাবাহিকতার জের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে বিশ্বাস ছিল যে উন্নয়ন কার্যকলাপ বেসরকারী খাতেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। অনবচ্ছেদ্য এই চিন্তাস্রোত বাধাহীন পথে এবং যুদ্ধোত্তর কালেও প্রশংসা পায়। তারই স্বাভাবিক পরিণতি উপরে বর্ণিত কার্যক্রম। প্রথম যুদ্ধকাল সময়ে এসে উনবিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাস্রোত ভেঙ্গে পড়ে। সরকারী প্রচেষ্টার ধরন-ধারণ বদলায়। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও শিল্প-প্রসার নিয়ে ধ্যান-ধারণায় রূপান্তর ঘটে। জনকল্যাণমূলক ক্রিয়াকর্মে সরকারী সক্রিয়তা অব্যাহত থাকে। শিল্প অগ্রগতি আপন পথে এগোয়। বিনা বাধায়, বিনা নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছ গতিতে আপন স্রোতে

বয়ে চলে। সরকারী উদ্যোগ উৎসাহ ব্যতিরেকেই আপন বেগে সম্মুখপানে ধেয়ে যায়। সরকার অবশ্য মারাত্মকধর্মী একচেটিয়াবাদে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আইন আরোপ করে। এদ্দিন ধরে এমনকি, সরকার শিল্পক্ষেত্রে তেমন কোন আর্থিক-সাহায্যও প্রদান করেনি। অবশ্য বেসরকারী অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টা জোরদার করার খাতিয়ে মুদ্রা-নীতি সবল রাখায় চেষ্টা চালিয়ে যায় কিন্তু, বেসরকারী খাতে দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার তেমন কোন বটে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়নি। শুল্ক-নীতি ও ধার্য করেছে কেবল বিদ্যমান শিল্প-নক্সা বাধামুক্ত রাখার নিমিত্তে, নব নব শিল্প-সংযোজনের উদ্দেশ্যে নয়। অথচ নিরবচ্ছিন্ন অগ্রসর নিশ্চিত করার প্রধান শর্ত হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে নব নব সংযোজন।

সে তখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কাল। তদ্দিনে বিভীষিকাময় বেকারত্ব দূরীভূত হয়েছে। ১৯৩০ দশকের সেই ভয়াবহ চিত্র অপসারিত হয়ে অর্থনৈতিক আকাশ বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। মেঘমুক্ত এই উজ্জ্বল গগনের নীচে দাঁড়িয়ে সরকার তার দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত করায় সক্ষম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয়বিধ সরকার নিরন্তর প্রবাহী উন্নয়ন কাম্য বলে নীতিমালা প্রণয়নে জোর দিয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করার নিমিত্তে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাই সুপারিশ করেন :

> ব্যাপক ঘর-বাড়ী ও নাগরিক পুনর্গঠন বিধি-বিধান; আরো অধিক হারে বহুমুখী বাঁধ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান; শিক্ষাখাতে সাহায্য প্রদানের নিমিত্তে বিস্তৃত ফেডারেল কার্যক্রম, [বিজ্ঞান ক্ষেত্রে গবেষণা এবং তা যথাযথ প্রয়োগে] ব্যাপক কার্যক্রম যাতে ফেডরেল সরকারের ভূমিকা ও সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিভাত হবে. বিস্তৃত জাতীয় স্বাস্থ্য কার্য-সূচী সম্প্রসারিত সামাজিক বীমা কার্যক্রম, অন্যায় সমাহরণ প্রথার অতীত প্রবাহ ঘুরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে শিল্প-কেন্দ্রীকরণ সীমিত করে তোলা এবং ছোট্ট-খাট কি মাঝারি আকৃতির শিল্প-সংস্থা বাঁচিয়ে রাখার বাস্তব-ধর্মী পন্থা অবলম্বন।[২৮]

তিনি আরো সুপারিশ করেন: কৃষিখাতে অধিক হারে আর্থিক সাহায্য

---

২৮. দেখুন, **Economic Report of the President, Jan. 1948, U.S. Govt. Printing office, 1948, 6-10 এবং 53-89.**

ও শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়নে বাড়তি হারে ফেডারেল সাহায্য প্রদান করা হউক।

প্রেসিডেন্ট আইসেন্‌হাওয়ার লেখেন: আমাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য জাতীয় আয় বাড়িয়ে তোলা, তা সবাইকে ন্যায়ানুগ পথে বিলিয়ে দেয়া এবং ডলারের ক্রয়-ক্ষমতা স্থিতিশীল করা।"[২৯] তার অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিষ্পন্ন হবে বেসরকারী খাতে। "সরকার পরিবেশ অনুকূল রাখায় সচেষ্ট হবে। মুক্ত পরিবেশে ব্যক্তি তার কর্তব্য সম্পন্ন করবে। অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধন ব্যক্তি-কর্তব্য। মুক্ত সমাজে সরকারী কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তির এই কর্তব্য সম্পাদনে পরিবেশ সুষ্ঠু রাখা....।"[৩০] তিনি যুক্তি দেন, অবশ্য এই কর্তব্য সম্পাদনে সরকার ঠুটো জগন্নাথ হলে চলবে না। তার হাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। "ব্যক্তি-প্রচেষ্টাকে অব্যাহত ও বলশালী রাখায় আমাদেরকে অবশ্যই ক্রিয়া করতে হবে। কর সম্পর্কীয় আইনে সংশোধন ঘটিয়ে অধিক অনুপ্রেরণা যোগানার ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্যোগ পথের কাঁটা দূরে সরিয়ে দিতে হবে। ছোট, ছোট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। ঘরবাড়ী নির্মাণে, আধুনিকীকরণে এবং নাগরিক পুনর্বাসনে ঋণ যোগাবার সুষ্ঠু সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। রাজপথগুলো সংস্কার করে নিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বর্তমান কালের চাহিদা ও প্রযুক্তিক জ্ঞানের অনুসারী করে তুলতে হবে।[৩১]

ইউরোপও চুপ করে বসে থেকে নেই। ইউরোপেরও অধিকাংশ দেশ যুদ্ধাবসানে অগ্রগতির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। বৃটেনে শ্রমিক-দল ১৯৪৫ সালের গণভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। তাদের ক্ষমতা লাভের সাথে উন্নয়নক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ধারার অবসান ঘটে। উন্নয়ন-লক্ষ্যে পরিবর্তন আসে। "নব বৃটেন শিল্প অগ্রগতির লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে নেয়---শ্রমিক পিছু সর্বোচ্চ উৎপাদন-মাত্রা। কেননা কেবল তাতেই জীবনযাত্রার মান বর্ধিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্য হাসিলে ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে নেওয়া হয় অথবা পরিকল্পনা

---

২৯. Economie Report of the President, Letter of Transmittal, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 1954, iii.

৩০. প্রাগুক্ত, iii.

৩১. ঐ., V.

করে নেওয়া হয়।"[৩২] এই সকল মৌলিক পরিবর্তনে রাষ্ট্র কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সূত্র বিধৃত করে নেয়া হয়। প্রথমত, ভিত্তি-স্থানীয় অনেকগুলো শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। শ্রমিক সরকার যুক্তি প্রদর্শন করে যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে এই সকল মৌলিক শিল্প-সংস্থায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। তারা দাবী করে, "ব্যক্তিগত স্বার্থ-সীমানা ডিঙিয়ে নব 'মালিকগোষ্ঠী' সারা দেশের মঙ্গলে সব কিছু নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে পারে এবং যেহেতু, সরকারী সমর্থন বিদ্যমান, সেহেতু কোন সময়ে টাকা-পয়সার অভাবে পড়তে পারে না।"[৩৩]

শিল্পক্ষেত্রে উপদেশ নিমিত্তে সরকার কতকগুলো কার্যকরী-দল (Working Party) গঠন করে। এই সকল দল "বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে এবং সংস্থাগত উন্নয়ন, উৎপাদন ও বণ্টন প্রথা এবং শিল্পের ধারা-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রদত্ত বিভিন্ন শলাপরামর্শ যাচাই করে অতঃপর দেশের স্বার্থ, শিল্পের অগ্রগতি ও দেশে-বিদেশে বিদ্যমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় কর্তব্য নির্দেশ দেয়।"[৩৪] কার্যরত দলসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে Industral Organization and Development Act পাস হয়। এই আইন দিয়ে বিভিন্ন শিল্পে উন্নয়ন-কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। উন্নয়ন-কাউন্সিল শিল্প-দক্ষতা নিরন্তর-প্রবাহী করার পথ নির্দেশের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়। অবশ্য এই সকল কাউন্সিলকে বাধ্যবাধকতা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কাজেই, এরা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্বীয় প্রচেষ্টায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম ছিল না।

বেসকারী খাতে বিনিয়োগ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করাব সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়। তদনুসারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বেসকারী দালান-কোঠা নির্মাণে সরকারী অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। Capital Issuer Committee স্থাপন করা হয়। অধিক হারে ঋণ গ্রহণ করা কি মূলধন সংগ্রহে শেয়ার বেচাকেনায় কমিটির অনুমোদন অত্যাবশ্য-কীয় করে তোলা হয়। এদিকে সরকার রাজস্ব ও মুদ্রাযন্ত্র সচল করে বিনিয়োগ- পরিমান নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ১৯৫১ সাল নাগাদ প্রায়

৩২. দেখুন Labour and Industry in Britain, British Information Service, V, No. 8, 162 (Sept-Oct. 1947).

৩৩. প্রাগুক্ত পৃ: ১৬২।

৩৪. দেখুন G.D.N. Worswick ও P.H. Ady সম্পাদিত, The British Economy, 1945-1950, Clarendon Press, Oxford, 1952, 455.

অর্ধেকের অধিক বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পথে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।[৩৫] দীর্ঘমেয়াদী বর্ধন-চরিত্র হিসাব-নিকাশ মাফিক করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে Economic Planning Board সৃষ্টি করা হয়। কর্তব্য দেয়া হয় "দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন এবং সাথে সাথে সাময়িক অসুবিধাগুলো দূরীকরণে অব্যর্থ প্রতিকারমালা সন্নিবিষ্ট করে আমাদের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সরকারকে উপদেশ প্রদান করা।"[৩৬]

বৃটিশ সরকার এই করেই ক্ষান্ত থাকেনি। শিক্ষা, ঘরবাড়ী নির্মাণ ও স্বাস্থ্য খাতেও তার খরচা বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ আসে পরোক্ষ ফল হিসাবে। আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সচল ও সজীব করে তোলা। সরকার তার মূল উদ্দেশ্য সাধনে প্রচুর স্বার্থকতা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৫১ সালের শেষভাগে রক্ষণশীল দল ক্ষমতা দখল করে। তাদের আগমনের সাথে সাথে আবার নড়চড় দেখা দেয়। পরম্পরাগত প্রথার প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী সক্রিয়তা সর্বনিম্ন মাত্রায় রাখার নীতি পুনরায় গৃহীত হয়। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "সরকারী মালিকানায় যে সব শিল্প রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগ সমাদর পাবে। আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তিগত-প্রচেষ্টা সার্বক্ষণিক সরকারী সহযোগিতা পেয়ে যাবে। বেসরকারী খাত আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ঘটাবে এবং শ্রমিক-মালিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায়ে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তবেই শিল্প-অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে।"[৩৭] রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রায় উঠিয়ে দেয়, করভার লঘু করে দেয় এবং লৌহ, ইস্পাত ও রাস্তাপথে মালবহন শিল্প বেসরকারী মালিকানায় অর্পণ করে দেয়।

অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন, "আমরা যে আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতার

---

৩৫. প্রাগুক্ত Labour and Industry in Britain, IX, No. 3, 129 (Sept. 1951).

৩৬. Worswick ও Ady সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই, পৃ: ৩৪৬।

৩৭. প্রাগুক্ত Labour and Industry in Britain, IX, No. 4, 146 (Dec. 1951).

পূর্ণ ব্যবহারে অক্ষম হয়ে আছি তার জন্য দায়ী আমাদের মাথাভারী কর প্রথা। এই করের বোঝা ভীষণ ভারী হয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বিশ্বে প্রায় সর্বোচ্চ এই বোঝার চাপে আমরা ন্যুব্জ-দেহ হয়ে আছি এবং এই বাজেট দিয়ে তা বিশেষভাবে কমিয়ে আনতে পারব তাও আশা করা উচিত নয়। তবে উৎপাদনক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা প্রদায়িনী সব রকম উপশম অত্যধিক যত্নের সাথে বাছাই করে বেদনা অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে।"৩৮

যুদ্ধাবসানে ফরাসী সরকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। তার এই প্রচেষ্টা মনেট্ প্লানে (Mounet Plan) প্রতিফলিত হয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে "ফরাসী অর্থনীতি ও ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশ-গুলোর অর্থনৈতিক মঙ্গল ও আধুনিকীকরণ সুনিশ্চিত করার" ৩৯ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে এই পসিকল্পনা বিধৃত করে নেয় জীবনমান উন্নত করা, শ্রম-উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করা, পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক ভারসাম্য অর্জন এবং বসত বাটির অপ্রাচুর্যতা কাটিয়ে তোলা। বিশেষ জোর আরোপের নিমিত্তে ছয়টি মৌলিক শিল্প, যথা কয়লা, বিদ্যুত রেলপথ, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি বাছাই করে নেওয়া হয়। আধুনিকীকরণ কমিশনের সহযোগে সরকারী পরিকল্পনা কমিশন এই সকল শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা বিনিয়োগ,কর্মসূচী প্রণয়ন করে নেয়। আধুনিকীকরণ কমিশনে শ্রম-প্রতিনিধি, কার্যনির্বাহী প্রতিনিধি, কৃষি-প্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।

পরিকল্পিত লগ্নী কার্যক্রম রূপায়নে সরকার দুটো পথ বেছে নেয়। প্রথমত তা ঋণ প্রণালী, কাঁচামাল ও আমদানীক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষিত খাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকার নিজেই অধিকাংশ বিনিয়োগে টাকা যোগাতে শুরু করে। এই দ্বিতীয় পন্থাটিই অধিক ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৮ সালে আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রীকরণ তহবিল গঠন করে সরকার বিনিয়োজিত সরকারী সব মূলধন কেন্দ্রীভূত করে নেয়। এই তহবিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী

---

৩৮. প্রাগুক্ত, Labour and Industry in Britain, IX, No. 2, 52-53 (June, 1953).

৩৯. Harris-এর পর্বোক্ত বই, পৃঃ ৩৯৫।

সব শিল্প খাতে আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রীকরণ ঋণ প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৭-১৯৫০ সাল পর্বে শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ লগ্নী সরকারী টাকায় সম্পাদিত হয়।[৪০]

জার্মানীর প্রচেষ্টা একটু ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। বৃটিশ কি ফরাসীদের পথে সে এগোয়নি। যুদ্ধোত্তর কালে সে বেসরকারী খাতকে আপেক্ষিক অর্থে বেশ স্বাধীনতা প্রদান করে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ তেমন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রথার বদলে সহ-নির্ধারণ নীতি অনুসরণ করে উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশ্য তার জন্য সরকারী ভূমিকা ন্যূন হয়ে পড়েনি অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার গুরুত্বও হ্রাস পায়নি। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মানী সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ মোট লগ্নীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ হয়।[৪১] অবশ্য এর প্রায় সবটাই ঘরবাড়ী নির্মাণে ব্যয়িত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের যে ব্যাপক কার্যক্রম প্রচলিত ছিল সরকার তা অব্যাহত রেখে চলে। এদিকে বহু শিল্প যথা রেলপথ, টেলগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক ও অনেকগুলো শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু, সে যাই হউক, ওয়ালিশের (Wallich) ভাষায় বলতে গেলে অবশ্যই বলতে যে "ন্যায়ানুগ পাওনা" ও পূর্ণ চাকুরী সংস্থানে জার্মানী সরকার তেমন জোর আরোপ করেনি যেমনটা করেছিল বৃটিশ সরকার।[৪২] বরং জার্মানী সরকার "সামাজিক অবাধ অর্থনীতি" পথে অগ্রগতি হাসিলে অধিক মনোযোগী হয়।

এই পথে এগুতে যেয়ে সরকার বেসরকারী খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ককারী অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। নাজী-জার্মানী যে বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ জাল বিস্তার করেছিল তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দিয়ে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় এবং তা ঋজুভাবে আরোপের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু

৪০. H. Lubell-এর The French Investment Programme : A Defence of the Monnet Plan, Ph.D. Thesis, 1951, Harvard University, 63.

৪১. দেখুন, H. C. Wallich-এর Mainsprings of the German Revival, yale University Press, New Haven, 1955,169.

৪২. উপরোক্ত বই, পৃ: ১৯।

সবচেয়ে মজার কথা, উন্নয়ন-অগ্রগতি উৎসাহিত করার নিমিত্তে এক ধরনের অনুপ্রেরণাদায়ী কর প্রথা চালু করা হয়। প্রথমত, বিক্রয় কর ও মোট ব্যবসায়ে আরোপিত ট্যাক্সের মাধ্যমে সরকার অধিকাংশ রাজস্ব আদায় করে। এগুলো অপ্রত্যক্ষ কর। কাজেই, এদের বোঝা অধিক হারে ন্যস্ত হয় স্বল্প আয়ের লোকদের উপর। অথচ বড়রা বেশ রেহাই পায়। অর্থাৎ, এই কর প্রথার ফলে ধনী শ্রেণী যেমন হারে কর দেয়নি যেমনটা অন্যথায় দিত। দ্বিতীয়তঃ, লগ্নী-ক্রিয়া জোরদার করার নিমিত্তে সরকার অনেক রকম মওকুফ সুবিধা প্রদান করে। অধিকাল (overtime) খেটে অর্জিত আয় আয়কর মুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যে সকল বাণিজ্য-সংস্থা ও ব্যবসায়ী জনসাধারণ ঘরবাড়ী ও জাহাজ নির্মাণে সুদ-মুক্ত ঋণ প্রদান করে তাদের করযোগ্য আয় উক্ত ঋণ বাদ দিয়ে নির্ণীত হওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতি, নব নির্মিত আবাসিক সম্পত্তি এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতির সংস্কারের উপর অধিক হারে মূল্যাবনতি সুযোগ প্রদান করা হয়। অর্জিত আয়ের সঞ্চিত ভগ্নাংশে কর হার লঘু করার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়।

৪. সাম্প্রতিক কালের উন্নয়ন কার্যকলাপ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি নিয়ে যুদ্ধোত্তর কালে নব চেতনা জন্ম নিয়েছে। যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই তৎপ্রতি জোর আরোপ করা হচ্ছে। নানা কারণে তা করা হচ্ছে। বহু দেশের সকার পূর্ণ বিনিয়োগ তথা পূর্ণ চাকুরী-সংস্থান পরিস্থিতি বজায় রাখায় উদগ্রীব। তারা জানেন যে স্থির পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব নয়। শ্রমশক্তি বেড়ে চলেছে। পুঁজির পরিমাণ স্ফীতকায় হচ্ছে। এই সব উপাদান পরিপূর্ণ-ভাবে কাজে খাটাতে হলে চাই নিরবচ্ছিন্ন সুষ্ঠু অগ্রগমন। থেমে থেমে কি ঠেকে ঠেকে অগ্রগতি দিয়ে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান সম্ভব নয়। বহু দেশে আবার বৈদেশিক বাণিজ্যে অধিক নির্ভরশীল। এই অত্যধিক নির্ভর-শীলতার ফলে দেশ খুবই স্পর্শকাতরসম্পন্ন। সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। সব দেশের সাথে তাল দিয়ে চলতে হয়। সর্বশেষ উৎপাদনী আঙ্গিক সাত-তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নিতে হয়। উৎপাদনী ধারায় নিরন্তর উন্নয়ন ঘটিয়ে যেতে হয়। তবেই বৈদেশিক বাজার হারাবার ভয় থাকে না। না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়। অন্যদের সাথে ঠেলাঠেলিতে হটে যেতে হয়।

বহু দেশ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে ও প্রকট আয়-বৈষম্য দূরীকরণে অধিক মনোযোগী। তারাও উন্নয়নবেগ বলশালী করার পক্ষপাতি। কেননা, এই পথে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জন অধিকতর সহজ হয়। সামাজিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রকট আকার নিতে পারে না। সবাকার জীবন-যাত্রার মান বাড়িয়ে সামাজিক সেবা প্রদান যত সহজ অন্যথায় ততটা সহজ নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরন্তরপ্রবাহী ও দ্রুততর করার এত গেল কল্যাণ-মুখী যুক্তিতর্ক এছাড়াও যুক্তি রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কোরিয়ান যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন। বর্ধনশীল অর্থনীতির পক্ষে যত সহজে সামাজিক প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছিল অন্যথায় তেমনটা সম্ভব হত কি? জোড়াতালি দেয়া অর্থনীতির পক্ষে বিরাটাকার যুদ্ধংদেহী ভাব ধারণ করা সহজ নয়। আবার বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হতে হলেও জাতীয় অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো প্রয়োজন। কাজেই নানাবিধ কারণে সব দেশ চায় ক্রমাগত এগিয়ে যেতে। কেউ দুঃখ-দুর্দশা কামনা করে না। অথবা মাথা-পিছু আয় কম হয়ে যাক চায় না। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচামাল আমদাণীকারী দেশ সদা-নিয়ত নিজের অবস্থা সবল রাখায় প্রয়াণী হয়। কারণ তারা জানে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়া মানে তাদের জীবন যাত্রার মান নিম্নগামী হওয়া। নিম্নমুখী এই সম্ভাবনা দূরে ঠেলে রাখার নিমিত্তে তারা উঠে-পড়ে ছুটে চলেছে। লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমহারে প্রতিযোগিতা বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় বাধাহীন অগ্রসর নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে মুসিবৎ অনিবার্য। সুষ্ঠু উন্নয়ন-প্রবাহ অব্যাহত রাখা না গেলে কুপোকাৎ অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। কাজেই, তাদের চেষ্টা যে করেই উন্নয়ন-পথ অবারিত রাখতে হবে।

সব দেশ বন্ধ্যাত্ব এড়াতে চায়। সবার উন্মুখ হয়ে আছে জড়তা নির-সনে। যুদ্ধমধ্যবর্তীকালের হাতাশা-বিভ্রান্তি ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি সবায় এড়িয়ে চলতে চায়। ২২·১ নক্সা লক্ষ্য করুন। ১৯১৩ ও ১৯২৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে নামমাত্র বর্ধন ঘটে। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯২৯ সালে বৃটিশ মাথাপিছু আয় শতকরা মাত্র ৬ ভাগ সম্প্রসারিত হয়। ঠিক একই সময়ে জার্মানীতে তা মাত্র ২ শতাংশের ন্যায় হয়। উপরোক্ত
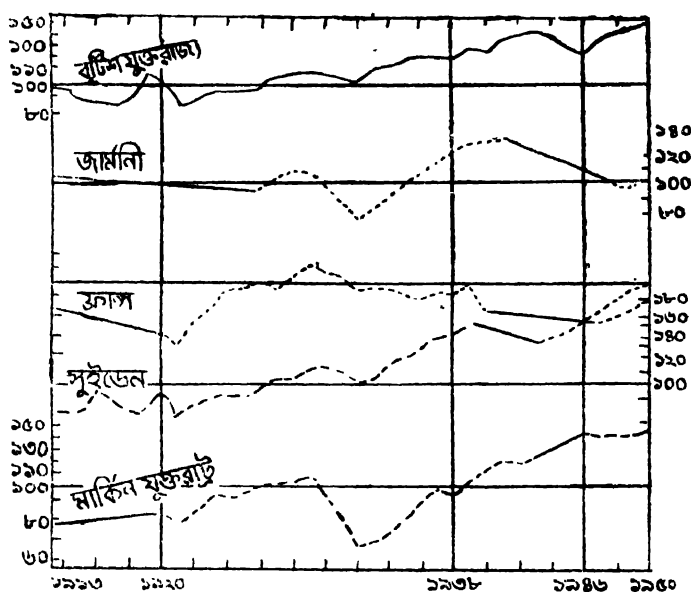
নক্সা ২২·১ নির্বাচিত কতকগুলো দেশে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়, ১৯১৩-১৯৫০। (সূচক ১৯২৫ ১৯২৯ ১০০)। সূত্র : 1. Svennilson, Growth and Stagnation in the European Economy, United Nations, Geneva, 9154, Chart 2, 29. বিশেষ দেশের বিভিন্ন সাল সংযুক্তকারী রেখার আকৃতিগত পবিবর্তন জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় একটা হিসাবের ব্যবহার নির্দেশ করে। এই দ্বিতীয় হিসাব পূর্বোক্ত হিসাবের সাথে ঠিক তুল্য নয়।

এই সময়ে মাত্র চার সালে বৃটিশ মাথাপিছু আয় ১৯১৩ সালের সীমা ছাড়িয়ে যায়। জার্মানীতে তা আরো কম হয়। কেবলমাত্র দুই বৎসর ১৯১৩ সালের সীমারেখা অতিক্রা করতে পারে। অথচ ফ্রান্স ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত সময়ে মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৩২ ও ৩৮ শতাংশ বর্ধিত হয়। কিন্তু, তাদের ও কাল সুখের হয়নি। ১৯৩০ দশকে এই উভয় দেশের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। রীতিমত বন্ধ্যাত্ব অবস্থা দেখা দেয়। ১৯৩৯ সালের আয়মাত্রা ১৯২৯ সালের আয়মাত্রার নিম্নে চলে আসে। অন্যদিকে, বৃটেন ও জার্মানীর অবস্থা বেশ একটু ভাল হয়ে উঠে। ১৯২৯-১৯৩৯ দশকে এই উভয় দেশের মাথাপিছু আয় বেশ সম্প্রসারিত হয়। শতকরা

হিসাবে ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বৃটেনের আয়মাত্রা ২০ শতাংশ ও জার্মানীর আয়মাত্রা ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

কেবল বৎসর আর দশকের হিসাব নয়। বরং যুদ্ধমধ্যবর্তী কালীন সারাটা সময়ের হিসাবেও অধিকাংশ ধনী দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের হিসাবে বহু দেশের মাথাপিছু আয় নামমাত্র হারে কেবল বৃদ্ধি পায়। নব শতাব্দীর সূচনা-পর্ব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল সময় পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দেশের মাথাপিছু আয় স্বল্পমাত্রা হারে বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘসূত্র বর্ধন সূচক-রেখা অনুসরণ করে বরং দেখা যায় যে বাস্তবে হয়ত অবনতিই ঘটেছে।

দশক হিসাবে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের বর্ধন এইরূপ:

১৮৬৯—১৮৭৮ থেকে ১৮৭৯—১৮৮৮ = শতকরা ৫০·৯ ভাগ
১৮৭৯—১৮৮৮ থেকে ১৮৮৯—১৮৯৮ = শতকরা ৯·৮ ভাগ
১৮৮৯—১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯—১৯০৮ = শতকরা ২৮·৮ ভাগ
১৮৯৯—১৯০৮ থেকে ১৯০৯—১৯১৮ = শতকরা ১১·৭ ভাগ
১৯০৯—১৯১৮ থেকে ১৯১৯—১৯২৮ = শতকরা ১৮·৮ ভাগ
১৯১৯—১৯২৮ থেকে ১৯২৯—১১৯৩৮ = শতকরা ৬·৫ ভাগ।[৪৩]

বৃটিশ যুক্তরাজ্যের মাথাপিছু আয় সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। সেই হিসাব অনুসারে তার আয় দাঁড়ায়:

১৮৭০—১৮৭৯ থেকে ১৮৮০—১৮৮৯ = ১৭ শতাংশ
১৮৮০—১৮৮৯ থেকে ১৮৯০—১৮৯৯ = ২৫ শতাংশ
১৮৯০—১৮৯৯ থেকে ১৯০০—১৯০৯ = ৮ শতাংশ
১৯০০—১৯০৯ থেকে ১৯১০—১৯১৯ = ৩·৫ শতাংশ
১৯১০—১৯১৯ থেকে ১৯২০—১৯২৯ = ৬·১ শতাংশ, এবং
১৯২০—১৯২৯ থেকে ১৯৩০—১৯৩৯ = ১৭·৭ শতাংশ [৪৪]

৪৩. দেখুন, S. Kuznets-এর "Long-term Change in the National Income of the United States of America since 1870," Income and Wealth, S. Kuznrts (ed), Series II, Bowes and Bowes, Cambridge, 1952, Computed from table 4,55.

৪৪. দেখুন, J.B. Jefferys ও D. Walters প্রণীত "National Income and Expenditure of the United Kingdom, 1870-1952," S. Kuznets (ed), Income and Wealth, Series V, Bowes and Bowes, London, 1955, 14.

জার্মানীতে যে পরিবর্তন লক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

১৮৭০—১৮৭৯	থেকে	১৮৮০—১৮৮৯	=	৩৭·৪ শতাংশ
১৮৮০—১৮৮৯	থেকে	১৮৯০—১৮৯৯	=	২৬·৭ শতাংশ
১৮৯০—১৮৯৯	থেকে	১৯০০—১৯০৯	=	৬ শতাংশ।

১৯০৫-১৯১৪ থেকে ১৯২৫-১৯৩৪ সাল সময়কালে জার্মানীতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় শতকরা ৪·৩ ভাগ হ্রাস পায়। ১৯২৫-১৯৩৪ থেকে ১৯৩০-১৯৩৮ সময়কালে অবশ্য তা ৬·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৪৫]

এবারে জাপানের কাহিনী বিবৃত করা যাক। জাপানী মাথাপিছু আয়েও আকর্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। তার হিসাব এইরূপ:

১৮৮৩—১৮৮৭	থেকে	১৮৯৩—১৮৯৭=	শতকরা ৩২ ভাগ
১৮৯৩—১৮৯৭	থেকে	১৯০৩—১৯০৭=	কোন পরিবর্তন ঘটেনি
১৯০৩—১৯০৭	থেকে	১৯১৩—১৯১৭=	শতকরা ২১ ভাগ
১৯১৩—১৯১৭	থেকে	১৯২৩—১৯২৭=	শতকরা ৪৪ ভাগ
১৯২৩—১৯২৭	থেকে	১৯৩৩—১৯৩৭=	শতকরা ২৬ ভাগ।[৪৬]

সরকারী সূত্রে পাওয়া হিসাব থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় আয়ের বর্ধন শতকরা হিসাবে ২৮৫ ভাগ ঘটে।[৪৭] ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল সময় কালে। এই একই সূত্রের ভিত্তিতে এবং একই সময়কালে মাথাপিছু আয়ে সম্প্রসারণ ঘটে ২৪৫ শতাংশ।[৪৮] তবে রাশিয়ার সরকারী হিসাব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। পশ্চিমা বহু ধনবিজ্ঞানী হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে উক্ত সময়ে রাশিয়ায় বড় জোর বর্ধন ঘটে ৫০ শতাংশ থেকে ৯৮ শতাংশ মাত্র।[৪৮ক] তাঁদের এইসব হিসাব অনুসারে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মাথাপিছু আয় বাড়ে যথাক্রমে ৩৫ ও ৮০ শতাংশ।

---

৪৫. P. Jostock-এর "The long-term Growth of National Income in Germany" S. Kuznets সম্পাদিত প্রাগুক্ত বই, Computed from Table III, 94.

৪৬. Lockwood-এর পূর্বোক্ত বই, Computed from Table 12,135.

৪৭. দেখুন, Bergson সম্পাদিত Soviet Economic Growth, Row, Peterson & Co., White Plains, 1953, 5.

৪৮. উপরোক্ত বই থেকে হিসাবকৃত ১৯২৮ ও ১৯৩৭ সালের লোকসংখ্যা, Table 3.1, 102.

৪৮ক. ঐ, Table 1.1, 7.

যুদ্ধোত্তর কালের অগ্রগতি রীতিমত চমকপ্রদ ব্যাপার। কি জাতীয় আয়ে কি মাথাপিছু আয়ে উভয়ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রায় প্রতিটি ধনীদেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। তাতে দীর্ঘমেয়াদী গড়ধর্মী জড়ত্বের ভয়াবহতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। ২২.১ নক্সার প্রতি আবার দৃষ্টি দিন। লক্ষ্য করুন, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কাল সময়ের প্রগতি-প্রক্রিয়া। মাথাপিছু আয়ে দেশে দেশে ভেদাভেদ রয়েছে বটে; কিন্তু ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের সাকুল্য-চিত্র প্রকৃত আয়ের উল্লেখযোগ্য বর্ধন নির্দেশ করে। ১৯৩৮ সালের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ১৯৪৬ সালে শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় আর যুক্তরাজ্যে তা ১৯৩৮ সালের মাত্রায় বজায় থাকে। জার্মানী ও ফ্রান্সে মূলতঃ তা হ্রাস পায়। ১৯৪৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বর্ধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য শতকরা হিসাবে মাথাপিছু আয় ১৯৩৮ সালের পর্যায় থেকে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে ২২, ৯ ও ৬১ ভাগ অধিক হয়। ১৯৫০-১৯৫৪ সালে মাথাপিছু গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আমেরিকায় ৬ শতাংশ এবং জার্মানীতে ৩৫ শতাংশ। ফরাসী ও বৃটেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৩ সালে তা বাড়াতে সক্ষম হয় যথাক্রমে ৩ শতাংশ ও ৮ শতাংশ। ১৯৫১ সালে জার্মানীর মাথাপিছু প্রকৃত উৎপাদন ১৯৩৮ সালের পর্যায় অতিক্রম করে যায়। ১৯৫৪ সাল নাগাদ এই পরিমাণ প্রায় ২৪ শতাংশের অধিক হয়। জাপান কিন্তু ১৯৩৮ সালের সীমা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেনি, এমনকি ১৯৫৪ সালেও।[৪৯] প্রাপ্ত সংবাদাদির ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, রাশিয়ান অগ্রগতি ১৯২৮-১৯৩৭ সালের মাত্রার মতই বলবৎ থাকে।[৫০]

সুতরাং, একথা সত্য যে, গত দশকে অধিকাংশ ধনী দেশ আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অগ্রগতি হাসিলে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু, কথা থেকে যায় যে তারা এই অগ্রগতি-ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম কিনা? অর্থাৎ গত

---

৪৯. ১৯৫০-১৯৫৪ সালের হিসাবগুলো পাওয়া গিয়েছে Statistical office of the United Nations, Statistics of National income and Expenditure, Statistical Papers, Series H, No. 8, New York, 20-27 (Sept. 1955)

৫০. A. Bergoon সম্পাদিত প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১১।

দশকের কৃতিত্বপূর্ণ প্রগতি-ক্রিয়া সম্মুখে রেখে একথা বলা যায় কিনা যে ধনী দেশগুলো তাদের অগ্রগতি হার অব্যাহত রাখায় সক্ষম? নাকি পিছিয়ে পড়তে পারে? হোচট্ খাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে কি? আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে যেয়ে আব্রামোভিজ (Abramovitz) মন্তব্য করেছেন: "আপাত-প্রতীয়মান এই অসাধারণ দশকের (১৮৭০ দশকের শেষ পাদ ও ১৮৮০ দশকের প্রথম পাদ) কথা বাদ দিন। ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা অন্তরীত করে নিন। তাহলে প্রাপ্ত অগ্রগতি-হার এমন কোন নিশানা প্রদর্শন করেনা যে, অধঃপতনে নিপতিত হতে হবে যদি না ত্রিশ দশকের মহা-মন্দাকাল জন্য না নেয়......। কাজেই, মাথাপিছু হিসাবে জাতীয় উৎপাদন দীর্ঘসূত্রী পশ্চাৎমুখিতার তাঁবেদার কিনা তার সঠিক উত্তরে দুইটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অথচকিনা বর্তমান জ্ঞানের আলোতে এর কোনটাই সমাধানযোগ্য নয়। হিসাব-নিকাশের দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্ব পরিবর্ধন অথবা পশ্চাৎমুখিতার সঙ্কেত দেয় কি? অতীতের বেগ আর পরবর্তীকালেব মহা-মন্দা-পর্ব দৈবঘটনার প্রতিভূ না নির্বন্ধ (Persistent) স্রোতপ্রবাহের পরিণতি?"[৫১] হয়ত ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য, কিন্তু জার্মানী এবং বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বেলায়ও সমধর্মী এই জাতীয় প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হবে।

ধনী দেশের অগ্রগতি-সমস্যা ও আকৃতি-প্রকৃতি বিস্তৃত ছকে মেলে ধরার নিমিত্তে আগামী পরিচ্ছেদে ঐসব দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী উদ্ভাষিত করে তোলা হবে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তী অধ্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার সাধারণ প্রয়োজনাবলী নির্দেশ করা হবে।

---

৫১. দেখুন, M. Abramovitz-এর Resource and Output Trends in the United States Since 1870, occasional Papers 52, National Bureau of Economic Research, New York, 1956, 15-18.

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী ও ধারাপর্ব

যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রগতি-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা ও ঔজ্জ্বল্য প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপট দেশে দেশে ভিন্নতর হয়। একথা দরিদ্র দেশের বেলায় যেমন ধনী দেশের বেলায়ও সমভাবে সত্য। কাজেই ধনী কি দরিদ্র কোন দেশের ক্ষেত্রেই 'প্রতিনিধি' স্থানীয় দেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে এমন কতকগুলো অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে যেগুলো উচ্চতর মাথাপিছু আয়ের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত বৈশিষ্টাবলী নির্দেশ দেয়া এবং তাদের দীর্ঘসূত্রী পরিবর্তন-ধারা বিবৃত করা।

১. উৎপাদনী প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যাবলী

অতীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনী দেশে শিল্পজাত ক্রিয়া-কর্ম অত্যধিক। ধনী দেশের জন্য ইহা একটা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে নিরত শ্রম-শক্তির বণ্টনে যেমন তেমনি শিল্প-উৎসারিত জাতীয় আয়ের পরিমাণেও এই বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছভাবে পরিস্ফুট। ১৯৫০ সালের দিকে অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মানী, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনীদেশগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যে রত মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ শিল্প ও নির্মাণ-কার্যে নিয়োজিত ছিল (২৩.১. সারণী দ্রষ্টব্য)। দরিদ্র দেশে তা শতকরা ১৫ ভাগের অধিক ছিল না। তদ্রূপ, ১৯৫৪ সালে ক্যানাডা পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, ন্যাদারল্যাণ্ডস, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৩৫ ভাগ শিল্প ও নির্মাণকার্য উৎসারিত ছিল। প্রমাণ হিসাবে ২৩·২ সারণী দেখুন। অন্যপক্ষে, মাথাপিছু আয়ের নিম্নসীমায় অবস্থিত দেশগুলোতে এই পরিমাণ অনধিক ২০ শতাংশের মত ছিল। কেবল যে দরিদ্র দেশ অপেক্ষা ধনীদেশে শিল্পজাত আয়ের পরিমাণ অধিক শুধু তাই না, এমনকি বিশ্ব-সরবরাহের অধিকাংশ

শিল্পজাত-পণ্য ধনীদেশ উদ্ভূত, উদাহরণ হিসাবে ১৯৫৪ সালের কথা ধরুন। (সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও পূর্ব-ইউরোপকে বাদ দিয়ে) কেবল পশ্চিম-ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকা ঐ সালে বিশ্ব-শিল্প-উৎপন্নের প্রায় ৮৭ শতাংশ সরবরাহ করে।[১]

সারণী ২৩·১

অর্থনৈতিক কাজে নিরত জনসংখ্যার পেশাগত বণ্টন

(শতকরা হিসাবে)

	কৃষি	শিল্প ও নির্মাণ	অন্যান্য সব
অষ্ট্রেলিয়া (১৯৪৭)	১৫·৪	৩২·৫	৫২·১
ব্রাজিল (১৯৫০)	৬০·৬*	১৩·০†	২৬·৪
ক্যানাডা (১৯৫১)	১৯·০	৩২·৩	৪৮·৭
মিশর (১৯৪৭)	৫০·৬	৯·২	৪০·২
ফ্রান্স (১৯৪৬)	৩৬·৫	২৬·৮	৩৬·৭
পশ্চিম জার্মানী (১৯৫০)	২৩·২	৩৮·৯	৩৭·৯
ভারত (১৯৫১)	৭০·৬	১০·১	১৯·৩
ইতালী (১৯৫৪)	৩৯·৭	২৮·২	৩২·১
জাপান (১৯৫৪)	৪৪·৫	২০·৪	৩৫·১
মেক্সিকো (১৯৫০)	৫৭·৮	১৪·৪	২৭·৮
ন্যাদারল্যাণ্ডস (১৯৪৭)	১৯·৩	৩১·০	৪৯·৭
ফিলিপাইনস (১৯৪৮)	৬৫·৭	৭·৯	২৬·৪
পোয়েরটোরিকো (১৯৫০)	৩৬·৮	২২·৫	৪০·৭
বৃটিশ যুক্তরাজ্য (১৯৫১)	৪·৯	৪৩·৬	৫১·৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫০)	১২·২	৩৩·১	৫৪·৭

*খনিজ শিল্পসহ

†বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ

সূত্র : United Nations, Statistical yearbook, Table 6,56-70.

তৃতীয় মানের ক্রিয়াকর্মের গুরুত্ব ও মাথাপিছু আয় মাত্রার মধ্যকার সম্পর্ক তেমন স্বচ্ছ নয়। সারণী ২৩·২ লক্ষ্য করুন। এমন সব

১. দেখুন, United Nations, Monthly Bulletin of Statistics, IX, No. 4 VIII (April 1955)

ভিন্নমুখী অর্থনীতিতে যেমন মিশর, ক্যানাডা, পোয়েরটোরিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৪ সালে প্রায় ৫৫ শতাংশ নীট দেশীয় উৎপন্ন আসে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ ও সরকারী ক্রিয়াকর্ম থেকে। ব্রাজিল, জাপান ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে এই মাত্রা ৪৫ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশের মত হয়।

সারণী ২৩.২

নীট আভ্যন্তরীণ উৎপন্নে শিল্পজাত অংশ

(শতকরা হিসাবে)

	কৃষি	শিল্প ও নির্মাণ	অন্য সব
ব্রাজিল (১৯৫২)	৩১.৯	১৯.৩*	৪৬.৮
ক্যানাডা (১৯৫৪)	৮.৮	৩৫.১	৫৬.১
মিশর (১৯৫৩)	৩১.৬	১০.৩	৫৮.১
পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪)	১০.৯	৫৫.৬*	৩৩.৫
ভারত (১৯৫৩)	৫০.৯	১৬.০	৩৩.১
ইতালী (১৯৫৪)	২৪.৬	৩৮.৭	৩৬.৭
জাপান (১৯৫৪)	২২.০	২৭.৬	৫০.৪
মেক্সিকো (১৯৫০)	১৯.৬	২০.১	৬০.৩
ন্যাদারল্যাণ্ডস (১৯৫৪)	১২.৭	৪২.৩	৪৫.০
নিউজিল্যাণ্ড (১৯৫২)	২৭.২	২৯.২	৪৩.৬
ফিলিপাইনস (১৯৫৩)	৩৯.৩	১৯.৪	৪১.৩
পোয়েরটোরিকো (১৯৫৩)	১৭.১	১৮.২*	৬৪.৭
বৃটিশ যুক্তরাজ্য (১৯৫৩)	৫.৪	৪৪.০	৫০.৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৪)	৫.৫	৩৫.৬	৫৮.৯

*খনিজ শিল্পসহ

সূত্র: United Nations, Statistics of National Income and Expenditure, Statistical Papers, Series H, No, 8 Table 3, 35-57.

চাকুরী-বাকুরী সংক্রান্ত খবরাখবর (সারণী ২৩.১) বরং মাথাপিছু আয়মাত্রা ও তৃতীয় পর্যায় শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্বের অনুবন্ধী সম্পর্কে বেশ কিছুটা পরিষ্কার আলোকসম্পাত করে। কিন্তু, এক্ষেত্রেও

গোলমাল আছে। নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, চাকুরী-বাকুরী সম্পর্কীয় সংখ্যা-গণিতের এইসব তথ্য তেমন নির্ভরশীল কিছু নয়। এদিকে আবার ধনী-দরিদ্র দেশভেদে পেশাগত বিশেষজ্ঞতার মাত্রাভেদ বিদ্যমান। এই কারণেও উভয়বিধ দেশের পেশাভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলনা করে দেখা কষ্টকর। কাজেই, বিশেষ কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ধনী-দরিদ্র দেশের আপেক্ষিক প্রাধান্য চিত্র অঙ্কন করা যথেষ্ট ঝুঁকির কাজ। তৃতীয়মানের শিল্পে তা আরো ঝঞ্ঝাসঙ্কুল। এক্ষেত্রে তুলনামূলক গুরুত্ব নিয়ে সাধারণ মন্তব্য করতে যাওয়া যথেষ্ট দুরূহ কাজ। সামরিক ক্রিয়াকর্মসহ সরকারী কাজকর্ম দেশে দেশে ভিন্নতর হয়। এক্ষেত্রে মিলের চেয়ে গরমিলই অধিক এবং সরকারী সক্রিয়তার মাত্রা সাধারণতঃ অগ্রগতির পরিমাণ নির্দেশ করে না।

মাথাপিছু আয়-নির্দেশক রেখার তুঙ্গসীমার ধারে-কাছে অবস্থিত দেশে আয় ও পেশাগত পরিসংখ্যান তথ্যের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন তৃতীয় পদের শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্বে উর্ধ্বগামী ধারা নির্দেশ করে। তৃতীয়মানের এইসব কার্যক্রিয়া ১৮৭০, ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে যথাক্রমে আমেরিকান শ্রম-শক্তির ২৪, ৪৭ ও ৫৫ শতাংশ অন্তরিত করে নেয়।[২] অন্যান্য উন্নত দেশেও মোটামুটি একই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[৩] শিল্প, খনিজ ও নির্মাণ শিল্পে নিরত শ্রমিক সংখ্যার পরিমাণে অবশ্য খুববেশী একটা উঠা-নামা লক্ষিত হয়নি। গত ৩০ বৎসরে উন্নত দেশগুলোতে এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা চিন্তা করুন। আমেরিকায় নিরত এই সকল কার্যে শ্রমিক সংখ্যা আনুপাতিক হিসাবে ১৯২০ সালের দিকে যেমনটা ছিল, ১৯৫০ সালে এসেও মোটামুটি তেমনই থাকে। তেমনি ইউরোপেও

---

২. দেখুন, J. F. Dewhurst ও Associates-এর America's Needs and Resources, A New Survey, The Twentieth Century Fund, New York, 1955,732.

৩. আলোচনা করুন W. S. Woytinsky ও E. S. Woytinsky-এর World Population and Production, the Twentieth Century Fund, New york, 1953, 432-433. এখন থেকে বইটি Woytinsky ও Woytinsky-এর World Population হিসাবে চিহ্নিত হবে। আরো দেখুন Svennilson-এর Growth and Stagnation in the European Economy, United Nations, Economic Commission for Europe, Geneva, 1954, 75-76.

অবস্থার বড় একটা হের-ফের পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯২০ সালে ইউরোপে মোট পুরুষ-শক্তির ৪৪ শতাংশ শিল্প কাজে নিযুক্ত ছিল। ১৯৩০ সালে এই পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৪০ সালেও তাই হয়। ১৯৫০ সালে একটু বেড়ে ৪৬ শতাংশে উপনীত হয়।[৪]

গত পঁচিশ বৎসর ধরে কৃষিকাজের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশে তা ঘটে। ১৯৩০ সালে আমেরিকান শ্রম-শক্তির ২২ শতাংশ কৃষি, বন ও মৎস্যশিল্পে নিযুক্ত ছিল। ১৯৫০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১২ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। এই একই সময়ে শিল্পোন্নত ইউরোপের অনুপাত ২৪ থেকে কমে ২০ শতাংশে এসে উপনীত হয়।[৪,৫] নিউজিল্যাণ্ডে অবশ্য অবস্থাটা একটু ভিন্নরূপ হয়। এই দেশে ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমের সংখ্যা ২৪ শতাংশ থেকে নামমাত্র হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। সুতরাং, একমাত্র নিউজিল্যাণ্ডের কথা বাদ দিয়ে নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, উন্নত প্রায় প্রতিটি দেশে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং এই হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।[৬]

ধনী-দরিদ্র দেশভেদে শ্রম উৎপাদিকা-শক্তিতেও প্রকট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ধনী দেশে কৃষিকাজে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি দরিদ্র দেশে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি অপেক্ষা ১০ থেকে ২০ গুণ অধিক হতে দেখা যায়।[৭] শুধু তাই নয়, ধনী দেশগুলোর মধ্যেও তারতম্য বিদ্যমান রয়েছে। কলিন ক্লার্ক তার একটা হিসাব দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ইউনিটে প্রদত্ত কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমের ঘন্টাপ্রতি প্রকৃত ফলন এইরূপ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন,

---

৪. Svenilson-এর প্রাগুক্ত বই পৃঃ ৭৫।

৫. কেবল কর্মনিযুক্ত পুরুষরা এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।

৬. দেখুন, Burus-এর Comparative Economic Organization, Prentice-Hall, New York, 1955, 368. আরো দেখুন, Colin Clark-এর The Conditions of Economic Progress, Second Edition, Macmillan and Co. Ltd. London, 1951, Chapter 9.

৭. ঐ পৃঃ ২৭৮।

নিউজিল্যাণ্ড	(১৯৪০—১৯৪১)	১.০৪৯
অষ্ট্রেলিয়া	(১৯৩৮—১৯৩৯)	০.৬৭৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৩৪—১৯৪১)	০.২৮২
ক্যানাডা	(১৯৩৪—১৯৩৫)	০.২০৮
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	(১৯৩৭)	০.২০০
ফ্রান্স	(১৯৩৮)	০.১৭২ এবং
জার্মানী	(১৯৩৪—১৯৩৫)	০.১৫৯।[৮]

সারণী ২৩'৩

নির্বাচিত কতকগুলো দেশে শিল্পকাজে নিযুক্ত শ্রমিকের ঘণ্টাপ্রতি প্রকৃত ফলন

(আন্তর্জাতিক ইউনিটের হিসাবে)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৩৯—১৯৪১)	১.০৭০
নিউজিল্যাণ্ড	(১৯৪০—১৯৪১)	০.৯৫৫
ক্যানাডা	(১৯৩৪—১৯৩৫)	০.৬৮৭
অষ্ট্রেলিয়া	(১৯৩৪—১৯৩৯)	০.৪৫৪
সুইডেন	(১৯৩০)	০.৩৮০
জার্মানী	(১৯৩৪—১৯৩৫)	০.৩৭৮
বৃটেন	(১৯৩৭)	০.৩৫৩
ফ্রান্স	(১৯৩৮)	০.৩১৯

উৎস : C. Clark, The Conditions of Economic Progress, Second edition, Macmillan and Co., Ltd., London, 316-319.

শিল্পের উৎপাদিকা-শক্তিতে ও উন্নত দেশগুলোতে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে আমেরিকান শিল্পে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিকের উৎপাদিকা-শক্তি বৃটেনে নিযুক্ত শ্রমিক অপেক্ষা প্রায ৩ গুণ অধিক ছিল আর সারা ইউরোপের তুলনায় প্রায় ৪ গুণেরও বেশী ছিল।[৯] প্রাগ-যুদ্ধকালীন সময়ের উৎপাদিকা শক্তির হিসাব ২৩'৩ সারণীতে প্রদত্ত হল। দরিদ্র দেশের চিত্র অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। উন্নত যে কোন দেশের

---

৮. Clark-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৩১৬-৩১৯। আন্তর্জাতিক ইউনিট হচ্ছে ১৯২৫-১৯৩৪ সাল সময় কালের গড় হিসাবে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের এক ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমান।

৯. Burns-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১৬৩।

তুলনায় দরিদ্র দেশের উৎপাদিকা-শক্তি অনেক নিম্নে অবস্থিত। আমেরিকান শিল্প-শ্রমিক ১৯৪৮ সালে যা তৈরী করছিল দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকান শ্রমিক তার থেকে যথাক্রমে ৮ গুণ ও ১৫ গুণ কম উৎপন্ন করছিল।[১০]

তৃতীয় পদের শিল্প-ফলনও ভিন্নতর হতে দেখা যায়। ২৩'৪ সারণী লক্ষ্য করুন। ধনীদেশগুলোতেও কি প্রকট ব্যবধান বিরাজমান তা প্রত্যক্ষ করুন। তবে একথা সত্য যে, তৃতীয়মানের শিল্পগুলোতে শ্রমিক-ফলন সর্বোচ্চ। তারপরে শিল্পের স্থান। অতঃপর কৃষির অবস্থান। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড অবশ্য উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই দুই দেশে কৃষির-ফলন শিল্প-ফলন অপেক্ষা অধিক।

সারণী ২৩'৪

নির্বাচিত কতকগুলো দেশে তৃতীয় পর্যায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের ঘণ্টাপ্রতি প্রকৃত ফলন

(আন্তর্জাতিক ইউনিটের হিসাবে)

দেশ	সাল	ফলন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৩৯-১৯৪১)	১.২৪১
নিউজিল্যাণ্ড	(১৯৪০-১৯৪১)	০.৬৩৬
ক্যানাডা	(১৯৩৪-১৯৩৫)	০.৭৯৫
অষ্ট্রেলিয়া	(১৯৩৮-১৯৩৯)	০.৭৩৬
সুইডেন	(১৯৩০)	০.৪০০
জার্মানী	(১৯৩৪-১৯৩৫)	০.৪৪৮
বৃটেন	(১৯৩৭)	০.৬৬৯
ফ্রান্স	(১৯৩৮)	০.৪২০

উৎস: C. Clark, the Conditions of Economic Progress, Second edition, Macmillan and Co., Ltd., London, 1951. 316-319.

ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো হিসাবে নেয়া হয়েছে।

উত্তর-মহাযুদ্ধকাল সময়ে উৎপাদিকা-শক্তিতে তেমন ওলট-পালট পরিলক্ষিত হয়নি। কি কৃষি কি শিল্প উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি মোটামুটি ভাল রেখে এগোয়। তা আমেরিকায় যেমন ইউরোপেও তেমন। শ্রমিকপ্রতি কৃষি-ফলন হয়ত বার্ষিক শতকরা ৪/৫ ভাগ হারে

১০. Woytinisky & Woytinsky, World Population, 1012-1013.

বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে।[১১] শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তিতেও (সারণী ২৩'৫) বড় রকম কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৪৮ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে তা মোটামুটি সমান হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। অবশ্য এই দুইটি দেশই অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও ন্যাদারল্যাণ্ডসের সাথে তাল রেখে এগুতে পারেনি। তবে একথা সত্য যে, ১৯৪৮ সাল নাগাদ আমেরিকা ও বৃটেন তাদের প্রাগ্-যুদ্ধকালীন পর্যায় ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হলেও বাকী সব দেশগুলোর অনেকে ১৯৫২ সালে এসেও তাদের যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালের সীমানায় পৌঁছতে পারেনি।[১২] কাজেই, এইসব দেশে যে ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষিত হয় তার অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত শিল্পসমূহের সংস্কার মাত্র।

সারণী ২৩'৫

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের ঘণ্টাপ্রতি ফলন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ

(১৯৫০=১০০)

	১৯৪৮	১৯৫০	১৯৫২	১৯৫৪	১৯৫৫*
অষ্ট্রিয়া	৭৯	১০০	১১৩	১২৫	১৩২
ফ্রান্স	৯৩	১০০	১১১	১২০	১২১
জার্মানী	৬৭	১০০	১১৭	১২৮	১৩৯
ইতালী	৮১	১০০	১১৭	১৩৬	১৪২
ন্যাদারল্যাণ্ডস	৮৭	১০০	১০৬	১১৮	১২৩
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	৯১	১০০	৯৮	১০৭	১১০
O.E.E.C. দেশগুলোর মোট হিসাবে	৮৭	১০০	১০৭	১১৬	১২৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯০	১০০	১০১	১০৭	১১২

* খসড়া হিসাব অনুসারে।

উৎস : G.D.A. MacDougall, "Does Productivity Rise Faster in the United States ?" Review of Economie and Statistics, XXXVIII, No, 2, Table 11, 170 (May, 1956)

---

১১. দেখুন, G.D.A. MacDougall-এর "Does Productivity Rise Faster in the United States ?", Review of Economics and Statistics, XXXVIII, No. 2, Table 170 (May, 1956)

১২. দেখুন, A. Maddison-এর "Industrial Productivity Growth in Europe and in the U.S." Economica, XXI, No. 84, 311, (Nov. 1954)

ধনীদেশ উৎপন্ন করে বিচিত্রতর দ্রব্য সামগ্রী। আকৃতি-প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি সূক্ষ্মতর। একদিকে অখণ্ডাকার অথচ তারি মধ্যে বহুতর সমাবেশ। ধনীদেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কেবল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মোটা হিসাব তথা বিভাজন দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যথেষ্ট কষ্টকর। অর্থাৎ অর্থনীতির ঐতিহ্যবাহী শ্রেণী বিভাগ থেকে এই অর্থনৈতিক চরিত্রটি তেমন খোলাসা হয়ে উঠেনা। দরিদ্র দেশে কিন্তু অবস্থা তেমন নয়। এখানে মোটা হিসাবের জালে সব কিছু ধরা পড়ে যায়। কারণ, দরিদ্র দেশ উৎপন্ন করে গোটাকতক কাঁচামাল সামগ্রী। এদের উৎপাদনে কোন জটিলতা নেই। নেই উৎপাদন পর্যায় অতিক্রম করে যাওয়ার তেমন কোন বালাই। অথচ ধনীদেশ? হাজারো জট-পাকানো উৎপাদন-প্রক্রিয়া আর ততোধিক জিলিপির প্যাচসম্পন্ন উৎপাদন-আঙ্গিক। শত শত পর্যায় অতিক্রম করে তবে একটা তৈরীকৃত দ্রব্য পাওয়া যায়। কাজেই, তৈরীকৃত দ্রব্যটির গুণাগুণ তথা প্রকৃত পরিস্থিতি যাচাই করতে হলে বৈচিত্র্যতর এই অসংখ্য পর্যায়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে সূক্ষ্মতা ও বিশেষীকরণের মাত্রা। তবেই উৎপন্ন সামগ্রীটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। এদিকে আবার বিচিত্র প্রকৃতির হাজারো দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং, সাকুল্য পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবনে যে কি দুরূহ জটিলতা বিরাজমান তা সহজেই অনুমেয়।

আধুনিক যুগের শিল্পোন্নত দেশের অর্থনীতির চেহারা-চরিত্র ও তার জটাজাল-বিস্তৃতি উন্মোচনে উৎপাদক-উৎপাদন বিশ্লেষণ বেশ কিছুটা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে।[১৩] এই বিশ্লেষণ থেকে উৎপাদন-পদ্ধতির জটিলাকৃতি ও আন্তঃনির্ভরশীলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। উৎপাদক-উৎপাদন নক্সা অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখাসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতার স্বরূপটি তুলে ধরে, উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। মনে করুন এই নক্সা তথা সারণীর একটা সাড়ি বা শ্রেণী প্রতি এক মিলিয়ন টাকা মূল্যের গাড়ী বানাতে কত টাকা মূল্যের ইস্পাত-দ্রব্য কিনতে হয় তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারীরা ইস্পাত শিল্প থেকে কি পরিমাণ ইস্পাতদ্রব্য

১৩. W. Leontief-এর Studies in the Structure of the American Economy, Oxford University Press, New York, 1953.

কিনে থাকে তার হিসাব প্রদান করে। তা আরো প্রদর্শন করে কত টাকা মূল্যের গদি ইত্যাদি সাজানো দ্রব্যসামগ্রী কিনতে হল, রাসায়ন-শিল্প হতে কতটুকু রং ইত্যাদি কিনতে হল। প্রয়োজনীয় এমনি সব কিছু তা অন্তরীত করে নেয়। ঠিক একইভাবে ইস্পাত শিল্পের জন্য বরাদ্দকৃত শ্রেণীতে ইস্পাত তৈরীতে প্রয়োজনীয় উৎপাদক-সামগ্রীর হিসাব প্রদত্ত হয়। আরো এক মিলিয়ন টাকা মূল্যের অধিক মোটরগাড়ী তৈরী করতে হলে মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারকদের অধিক ইস্পাত, গদি, রং ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত ইস্পাত তৈরীর জন্য অধিক কয়লা ইত্যাদি দরকার পড়ে। হয়তবা মোটরগাড়ীও প্রয়োজন হয়। মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারকরা অন্যান্য যেসব শিল্প থেকে উৎপাদন-সামগ্রী কেনে তাদেরও সেইহারে উৎপাদান-সামগ্রী প্রয়োজন পড়ে। কাজেই, এক শাখায় সম্প্রসারণ ঘটলে সংশ্লিষ্ট সব শাখার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরিণামে অর্থনীতির সর্বত্র দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের আমেরিকান অর্থনীতির উৎপাদক-উৎপাদন-নক্সা অনুসারে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের মোটরগাড়ী নির্মাণে ইস্পাত উৎপাদন বাড়াতে হয় ২,৩৫,০০০ ডলার মূল্যের সমান। অন্যান্য ধাতব-সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে হয় ১,১৮,০০০ ডলার মূল্যের সমান। ৫৬,০০০ ডলার মূল্যের সমান রবার-সামগ্রী উৎপাদন করতে হয়। ৪৭,০০০ ডলার মূল্যের পেট্রোলিয়াম ও কয়লাসামগ্রী উৎপন্ন করতে হয়। তেমনি অন্যান্য সব শিল্প উৎপাদনও। অর্থাৎ সারা শিল্প-নক্সায় পরিবর্তন সূচিত হয়।[১৪]

২. ভোগ-ব্যয়

ধনীদেশের উৎপাদন-নক্সায় যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তা তাদের ব্যয়-চিত্রেও প্রতিফলিত হয়ে উঠে। গরীব দেশ তথা মাথাপিছু আয়ের নিম্নসীমায় অবস্থানরত দেশ খাদ্য-সামগ্রীতে অধিকাংশ ব্যয় করে। তাদের মোট খরচের প্রায় ৭০ শতাংশ বা ততোধিক খাদ্য-সামগ্রীতে ব্যয় হয়।[১৫] অথচ আমেরিকা ও বৃটেন তাদের মোট ভোগ-ব্যয়ের মাত্র

১৪. দেখুন, W Leontief-এর "Domestic Production and Foreign Trade; The American Capital Position Re-examined," Proceedings of the American Philosophical Society, xcvii, No. 4,334 (Sept. 1953).

১৫. Woytinsky ও Woytinsky, World Population, 279.

(যথাক্রমে) ৩৫ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যে ব্যয় করে। আহার্য-দ্রব্য, মদ ও তামাক এই খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত (২৩.৬ ও ২৩.৭ সারণী লক্ষ্য করুন)। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত খাদ্য-সামগ্রীতে জার্মানীও ব্যয় করত ৪০ শতাংশের মত।[১৬] কাজেকাজেই, ধনীদেশে ভোগ-ব্যয়ের বিরাট অংশ ব্যয়িত হয় পোশাক-আসাক, ঘর-বাড়ী, বাসস্থান ও পরিবারিক অন্যান্য খরচে। দরিদ্রদেশে তেমনটা হতে পারে না।

সারণী ২৩·৬

প্রধান প্রধান গ্রুপভিত্তিতে ব্যয়-চিত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শতকরা হিসাবে

	১৯১৪	১৯৩৯	১৯৫০-১৯৫২
আহার্য দ্রব্য, মদ ও তামাক	৩৫·০	৩১·২	৩৪·৯
পোশাকপত্তর, আনুষঙ্গিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে	১৪·১	১৩·৬	১২·৭
বাসস্থান ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে	২৩·৬	১৭·৯	১৪·২
পারিবারিক ব্যয়	১১·১	১৫·৪	১৪·৫
ভোগ-পরিবহন	৬·৪	৯·৬	১১·৪
চিকিৎসা ও বীমা	২·৭	৪·৩	৪·৩
আমোদ-প্রমোদ	৩·০	৪·৪	৫·০
শিক্ষা (ব্যক্তিগত)	১·৫	১·৬	১·৫
ধর্ম	০·৯	১·০	০·৬
কল্যাণকার্য (বেসরকারী)	১·৬	০·৬	০·৫
সাকুল্য	১০০·০	১০০·০	১০০·০

উৎস : J.F. Dewhurst and Associates, America's Needs and Resources, A New Survey, The Twentieth Century Fund, New York, 1955, 103.

২৩·৬ সারণী লক্ষ্য করুন। ১৯১৪ ও ১৯৫০-১৯৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভোগ-পরিবহন, পারিবারিক-ব্যয়, চিকিৎসা ও বীমা এবং আমোদ-প্রমোদ খাতে আমেরিকান ভোগ-ব্যয়ে বাড়তি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, উক্ত সময়ে বাসস্থান, কল্যাণক্রিয়া, ধর্ম, পোশাকপত্তর ইত্যাদি

১৬. ঐ, পৃঃ ২৭৯।

খাতে পড়তি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই হ্রাস-বৃদ্ধি আপেক্ষিক অর্থে ঘটে। আহার্যদ্রব্য, মদ ও তামাক খাতে কিন্তু কোন উঠা-নামা ঘটেনি। ১৯০০ সাল থেকে তা মোটামুটি একইরূপ রয়েছে।

সারণী ২৩.৭

ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয়-বিচিত্রা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য শতকরা হিসাবে

	১৯৩৮	১৯৫০
আহার্যসামগ্রী, পানীয় দ্রব্য ও তামাক	৪০.৭	৪৫.৪
পোশাকপত্তর	১০.৩	১১.১
ভাড়া, অভিকর, পানিখরচ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ	১৫.৮	১১.১
টেকসই পারিবারিক দ্রব্য-সামগ্রী, যোগাযোগ ব্যয় ও ঘর-গৃহস্থালীর অন্যান্য সামগ্রী	৭.৩	৮.২
ব্যক্তিগত চলাচল ও ভ্রমণ	৬.৭	৫.৮
আমোদ-প্রমোদ, বই-পত্তর, পত্রিকা ও সাময়িকী	৩.০	৩.৫
অন্যান্য কাজ	১১.৮	৯.২
অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী	৪.১	৪.৫
দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে সামরিক বাহিনীর লোকদের আয়	০.৪	০.৪
বাদ		
যুক্তরাজ্যে বিদেশী পর্যটকদের ব্যয়	—১.০	—০.৬
বিদেশে ব্যক্তিগত ব্যয়	০.৮	১.২
মোট	১০০.০	১০০.০

উৎস: J. E. Meade and R. Stone, National Income and Expenditure, Bowes and Bowes, Cambridge, 1952, 27.

বৃটিশ যুক্তরাজ্যে আহার্য-সামগ্রী, পানীয়-দ্রব্য ও তামাকের খরচায় তেমন একটা নড়চড় ঘটেনি। তা ১৯০০ থেকে ১৯০৯ সালে যা ছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সালেও মোটামুটি সেইরূপই ছিল। ১৯০০–১৯০৯ সালে এই মাত্রা ছিল শতকরা ৪৪.৩ ভাগ। ১৯৪০-১৯৪৯ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৪৬.৫ শতাংশে।[১৭] তবে তামাকের খরচা বেশ

১৭. দেখুন, যথা—Jefferys ও Waltes-এর "National Income and Expenditure of the United Kingdom, 1870-1952," S. Kuzuets (ed), income and Wealth, Series V. Bowes and Bowes, London, 1955, 20.

বেড়ে যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিড়ি-চুরুটের ব্যয় সরাসরি উর্ধ্বমার্গগামী হয়। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি ব্যয় আপেক্ষিক অর্থে একটু নেমে আসে। তবে আমেরিকার মত নয়।[১৮] বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিলাতে মঙ্গলকাজে ব্যয় তেমন বাড়েনি যেমনটা বেড়েছে আমেরিকায়। কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। যুক্তরাজ্য সরকার সেবাব্রতী কাজে অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে বেসকারী খাতে ব্যয় তেমনটা বাড়েনি।

৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য •

বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারাপ্রবাহ লক্ষ্য করে ধনী-দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য-চিত্র পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের এক হিসাব মতে শিল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্ব-রপ্তানীর ৬৩·৭ শতাংশ রপ্তানী করে।[১৯] তার মধ্যে ৩৮·৭ শতাংশ রপ্তানী করে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে আর বাকী ২৫·০ শতাংশ রপ্তানী করে অ-শিল্পোন্নত দেশসমূহে। কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহ রপ্তানী করে ৩৬·৩ শতাংশ। তন্মধ্যে ২৫·৭ শতাংশ যায় শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আর বাকী ১০·৬ শতাংশ রপ্তানী অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদন অঞ্চলসমূহে। সুতরাং, শিল্পোন্নত ও অ-শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে বিশ্ব-রপ্তানীর ৫০·৭ শতাংশ বাণিজ্য নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ শিল্পোন্নত অঞ্চলসমূহ কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে যা রপ্তানী করে তার সাথে কাঁচামাল তৈরীকারী দেশসমূহ শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে যে রপ্তানী বাণিজ্য করে তা যোগ করলে দেখা যায় যে, বিশ্ব-রপ্তানীর ৫০·৭ শতাংশ বাণিজ্য এই উভয় দেশগুলোর মধ্যে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বকাল থেকে অবশ্য এই পরিমাণে একটু পড়তি লক্ষ্য করা যায়। তবে তা মাত্রায় তেমন কিছু নয়। সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে তা উল্লেখযোগ্য কিছু হওয়ার মত নয়।[২০]

---

১৮. Jefferys ও Waltes-এর উপরোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২২-২৩।

১৯. The Contracting Parties to the General Agreements on Tarifs and Trade (GATT), International Trade, 1955, Geneva, 1954, 4. এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে শিল্পোন্নত অঞ্চলে পড়ে ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, গ্রীস, অস্ট্রিয়া, ইতালী, ন্যাদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, আয়ারল্যাণ্ড ও জাপান।

২০. GATT প্রকাশিত পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৭, ১৫৭-১৫৮।

শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে আমেরিকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দরের রপ্তানীকারক। ২৩.৮ নম্বর সারণী লক্ষ্য করুন। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ফ্রান্স বৃহৎ চতুঃশক্তির অপর অংশীদারী দেশ। ১৯৫৪ সালে এই চারটি দেশ মিলে বিশ্ব-রপ্তানীর ৪২ শতাংশ সরবরাহ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পেরিয়ে এসে আমেরিকার রপ্তানী-বাণিজ্যে দ্রুত প্রসার

সারণী ২৩.৮

সাতটি ইউরোপীয়ান দেশ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানী, ১৯১৩,১৯২৮,১৯৩৮,১৯৫৪

(শতকরা হিসাবে)

	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩৮	১৯৫৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২.৭	৩০.০	২৭.৪	৩৭.১
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	২৩.৯	২০.৮	২০.৫	১৮.৬
জার্মানী	২২.৫	১৭.২	১৯.৪	১৩.০
ফ্রান্স	১২.৪	১২.১	৮.০	১০.৪
বেলজিয়াম লুক্সেমবার্গ	৬.৪	৫.১	৬.৫	৫.৭
ইতালী	৪.৬	৪.৫	৫.০	৪.১
জাপান	২.৯	৫.২	৬.৫	৪.০
সুইডেন	২.০	২.৬	৪.১	৩.৯
সুইজারল্যাণ্ড	২.৫	২.৫	২.৭	৩.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: এই সমস্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবের ভিত্তিতে।

ঘটে। ক্রমে ক্রমে তা উন্নতির সিড়ি ডিঙ্গিয়ে যেতে থাকে। ২৩.৮ চিত্রে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তা একনাগাড়ে অবনতির পথে ধাবিত হতে থাকে। আপেক্ষিক অর্থে জার্মানী ও ফ্রান্সের অবস্থাও খারাপ হয়। ইউরোপীয়ান অন্যান্য ছোট-খাট দেশগুলোও কম-বেশী লাভ-লোকসানের ভাগী হয়।

শিল্পোন্নত ধনীদেশগুলো তৈরীকৃত-দ্রব্য অধিক হারে রপ্তানী করে থাকে। বিশ্ব-রপ্তানীর অধিকাংশ তারা যোগায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৪ সালের

কথা ধরুন। এই সালে ২৩·৮ সারণীতে তালিকাভুক্ত নয়টি দেশ ও ক্যানাডা তৈরীকৃত দ্রব্যের বিশ্ব-রপ্তানীর ৮৩ শতাংশ সরবরাহ করে।[২১] ১৯০০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সাল অবধি এই অনুপাত মোটামুটি অপবিবর্তিত থাকে। অবশ্য গঠনগত দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ২৩·৮ সারণীতে তালিকা করা দেশগুলো ১৯৫২ সালে যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের মোট রপ্তানীর শতকরা ৪১ ভাগ যোগায়। অথচ ১৯০০ সালে তা ছিল মাত্র ১২ শতাংশের মত। অন্যদিকে, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদির রপ্তানী বেশ হ্রাস পায়। ১৯০০ সালে যেখানে কাপড়-চোপড় রপ্তানী ছিল শতকরা ৩৬ ভাগ তা হ্রাস পেয়ে ১৯৫২ সালে এসে ১৩ শতাংশে দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে অন্যান্য দ্রব্যাদির রপ্তানী ২৪ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে নেমে আসে। ধাতব ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির রপ্তানী পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

বর্তমান শতকে উপরোক্ত তালিকায় প্রদত্ত দেশগুলোর তৈরীকৃত দ্রব্যেব রপ্তানী বেশ বৃদ্ধি পায় তুলনামূলকভাবে তা বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এই দেশগুলো ১৯০০ সালে রপ্তানী করত ৫৪ ভাগ তৈরীকৃত পণ্য ও ৪৬ ভাগ কাঁচামাল। ১৯৫২ সালে এসে এই পরিমাণ পরিবর্তিত আকার ধারণ করে হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭২ ভাগ ও ২৮ ভাগ। আমদানী ক্ষেত্রে কিন্তু আকারগত তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি বরং তা সর্বসময়ে মোটামুটি একইরূপ রয়েছে। এই সকল দেশের কাঁচামাল আমদানী ১৯০০ সালে ৭৩ শতাংশ ছিল। ১৯৫২ সালে তা ছিল মোট আমদানীর ৭৪ শতাংশ। আর এই দুই সময়ে তৈরীকৃত পণ্যের আমদানী ছিল যথাক্রমে ২৭ শতাংশ ও ২৬ শতাংশ।

ধনীদেশগুলোর মধ্যে তাদের জাতীয় আয় বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যে (আমদানী-রপ্তানী একত্রিত হয়ে) ধরাবাধা কোন সহজ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য-মূল্য (রপ্তানী-আমদানী) তার জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ শতাংশের সমান ছিল।[২২] ১৯৫৪ সালে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানীর জন্য এই

২১. দেখুন, A. K. Cairneross-এর "World Trade in Manufactures Since 1900" Economia Internationale, VIII, No. 4, 10.

২২. দেখুন, U. S. Department Commerce, Survey of Current *Business, Aunmal Review Number, Feb. 1956, 6, 521, 522.*

অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩৮, ২১ ও ২১ শতাংশ। ক্যানাডায় তা ছিল ৫১ শতাংশ (১৯৪৯ সালে), অস্ট্রেলিয়ায় ছিল শতকরা ৬৩ ভাগ (১৯৪৯ সাল)। সেই একই সালে নিউজিল্যাণ্ডে ছিল ৬৩ শতাংশ, ন্যাদারল্যাণ্ডসে ৬৩ শতাংশ ও বেলজিয়ামে শতকরা ৭১ ভাগ।[২৩]

অবশ্য মানতে হবে যে এই সব হিসাব-নিকাশ তেমন নির্ভরশীল কিছু নয়। এর মধ্যে ভুলত্রুটি যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কার। বিষয়টি হচ্ছে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের আনুপাতিক গুরুত্বের হিসাব-নিকাশে যতই ভুল-ভ্রান্তি থাকুকনা কেন, উন্নত দেশগুলোর অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে তার ভূমিকা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্য ধনীদেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে নিয়ামক-শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে চলেছে। যুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমা দেশগুলোতে লেন-দেন ভার-সাম্যের যে মহাসঙ্কট দেখা দেয় তার থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যের মহামূল্যবান এই ভূমিকাটি অনুসরণ করা যায়। ১৯৩৮ সালে ইউরোপের চলতি-হিসাবে **(current account)** ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। ১৯৪৭ সালে এসে তাতে ঘাটতি দেখা দেয় ৭·৫ বিলিয়ন ডলার। এই বিরাট ঘাটতির অন্তর্নিহিত কারণ তুলে ধরার জায়গা এটা নয়।[২৪] তবে এই সমস্যার দীর্ঘসূত্রী ঘটনাপ্রবাহ তথা শক্তিনিচয় আলোচনার দাবী রাখে পুরাতন শিল্পোন্নত দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদী দুই জাতীয় সাঙ্গীকরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ, সদ্য শিল্পোন্নয়ন পথে ধাবমান দেশগুলো অধিক হারে প্রতি-যোগিতা করতে থাকে। ধনীদেশগুলোকে তা সহ্য করে নিয়ে এগুতে হয়। এদিকে বিশ্ব-বাণিজ্যের রূপ-চেহারা বদলাতে থাকে। পরিবর্তিত পটে খাপ খাইয়ে তবে ধনীদেশগুলো নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে। এই প্রসঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায়ের আলোচনার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে উল্লেখিত হয়েছে যে উঠতি দেশগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটে যাওয়ার কারণে বিশ্ববাণিজ্যে বৃটেন তার একাধিপত্য হারায়। বিশেষ

২৩. আলোচনা করুন, W. S. Woytinsky ও E. S. Woytinsky প্রণীত World Commerce and Governments, The Twentieth Century Fund, New York, 1955, 65.

২৪. দেখুন, যথা—বার্ষিক Economic Survey of Europe, United Nations, Geneva.

করে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে সে বেশ বেকায়দায় পড়ে তার চিরাচরিত রপ্তানী-পণ্য পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামাল দিয়ে চলতে সক্ষম হয়নি।

৪. সরকারী ব্যয় ও রাজস্ব

ধনীদেশের যে রূপ-কাঠামো উপরে তুলে ধরা গেল তার সাথে সঙ্গতি রেখে উল্লেখযোগ্য দুইটি প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সূচিত হয়। সংক্ষেপে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'বৃহৎ' সরকার ও 'বৃহৎ' বাণিজ্য। বর্তমান অংশে বৃহৎ সরকারের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরবর্তীভাগে বৃহৎ বাণিজ্যের ফিরিস্তি দেয়া হবে।

উত্তর-প্রথম মহাযুদ্ধকালে অধিকাংশ ধনীদেশে সরকারী ব্যয় প্রচুর হারে বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরুন। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ব্যয় ছিল মোট জাতীয় উৎপন্নের ৬.৪ শতাংশ মাত্র। ১৯২৯ সালে তা ৯.৮ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালে তা বেড়ে যেয়ে শতকরা ১৬.৩ ভাগ হয়ে উঠে। ১৯৫৪ সালে আরো বেড়ে যেয়ে ৩০.৭ শতাংশে উন্নীত হয়।[২৫] বৃটিশ যুক্তরাজ্যেও একই অবস্থা ঘটে। ১৯১৩ সালে সরকারী ব্যয় ছিল ১৫ শতাংশের মত। যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশের মত হয়ে উঠে।[২৬] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পেরিয়ে এই পরিমাণ ৪০ শতাংশের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্যান্য উন্নত দেশেও মোটামুটি একই অবস্থার উদ্ভব ঘটে।[২৭]

২৩.৯ সারণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয়-চিত্র তুলে ধরা হল। চিত্রটি ১৯১৩ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কালে সরকারী ব্যয়ের বৃদ্ধি নির্দেশ করে এবং মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের চিত্র প্রদান করে।

---

২৫. দেখুন, যথা Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৫৭৮; Bureau of the Census প্রকাশিত Summary of Governmental Finances in 1954, Bureau of the Census, Washington, Oct. 7, 1955, 25.

২৬. দেখুন, U.K. Hicks-এর British Public Finances, 1880-1952, Oxford University Press, Loadon, 1954, 12. এখন থেকে Hicks-এর British Public Finances বলে উল্লেখিত হবে।

২৭. W.S. Woytinsky ও E.S. Woytinsky-এর World Commerce and Governments, the Twentieth century Fund, New York, 1955, 695-699.

হিসাবই খাতওয়ারী ব্যয়-নক্সা তুলে ধরে। ১৯১৩ সালে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের যে পাঁচটি মুখ্য খাত ছিল তারা হল: শিক্ষা, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ, ডাক-বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা। ১৯৩২ সাল অবধি অন্য যেগুলো অধিক গুরুত্ব পায় সেগুলো :

সারণী ২৩.৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকারের কার্যওয়ারী মাথাপিছু ব্যয়, রাজস্ব-বর্ষ ১৯১৩,১৯৩২,১৯৪২,১৯৫০

(১৯৫০ সালের ডলারের হিসাবে)

	১৯১৩	১৯৩২	১৯৪২	১৯৫০
সাকুল্য সরকারী কর্তব্য	৯৯.৫৮	২১৭.১৫	৬৩৩.৫২	৪৫৯.৭৪
জাতীয় প্রতিরক্ষা	৮.৬২	১৫.০০	৩২৮.২৭	৮৩.১৯
আন্তর্জাতিক বিষয়	.২০	.৩৫	৬৪.১৭	৩০.৫৬
বেসামরিক প্রতিরক্ষা	৪.৫৯	১২.৫২	১০.৭১	৯.৯৮
শিক্ষা	২২.৭৯	৩৯.৭৪	৩৪.৭৬	৬৮.১৯
সামাজিক কল্যাণ ও অবসর ভাতা	৭.২৬	১৯.৬৪	৩৫.০৬	৩৬.০৭
সামাজিক বীমা	.২২	২.৫২	১১.৩৬	৪৮.৩৮
স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ	১৩.১০	২৭.৮৩	৩১.৫১	৩৬.১৭
পরিবহন	১৭.৭৪	৫০.৭৭	৪০.১৩	৩৮.০৫
কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২.১০	৬.৪১	৩১.৫০	২৯.২০
বাণিজ্য ও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহদান	.৭২	১.৫২	১.৮৪	১.৭৯
ডাক-কার্য	১০.১৭	১৩.৬৮	১১.৬৫	১৪.৭১
মদ-ভাণ্ডার	—	—	৩.৫৭	৪.৪১
কর্জের সুদ	১.৬৬	৮.৫৮	১৩.৮৬	৪২.১১
সাধারণ নিয়ন্ত্রণ	৭.৭৭	১২.৭৬	১০.৬০	১১.২৪
অন্যান্য	২.৬৫	৫.৮২	৪.৫৪	৪.৯৭

উৎস: J. F. Dewh hurst and Associates America's Needs and Resources, A New Survey, The Twentieth Century Fund, New York, 1955, Table 263,632.

হচ্ছে সামাজিক বীমা, কর্জের সুদ, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৩২ সালে মাথাপিছু হিসাবে সর্বোচ্চ যে পাঁচটি খাতে ব্যয় হয় সেগুলো হচ্ছে পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক মঙ্গল ও অবসর-ভাতা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা। যুদ্ধের আঘাতে এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির কারণে জাতীয় প্রতিরক্ষায় ব্যয় সর্বোচ্চ হয়ে উঠে, তা ১৯৪২ সালে যেমন তেমনি ১৯৫০ সালেও সেইরূপ হয়। ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাস পায়, অবশ্য পরিমাণের দিক থেকে তখনো তা দ্বিতীয় স্থানে স্থলাভিষিক্ত ছিল। পরিবহন খাতে মাথাপিছু ব্যয় ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪২ সালে যেমন তেমনি ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়েও হ্রাস পায়। ১৯৫০ সালে এই খাতে ব্যয় পঞ্চম স্থানে অবস্থিত ছিল। সামাজিক বীমাখাতে ব্যয়মাত্রা একাধারে বেড়ে যেতে থাকে। ফলে ১৯৫০ সাল নাগাদ এ খাতের ব্যয় তৃতীয়স্থানে স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

বৃটেনে সরকারী সক্রিয়তা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ সরকার সামাজিক কার্যাবলী সাধনে অধিক মনোযোগী হয়। ফলে সরকারী কর্মক্রিয়ার পরিসর বেশ ব্যাপক হয়ে উঠে। ১৮৯০ সালে এই ব্যয়মাত্রা ছিল জাতীয় আয়ের ১.৬ শতাংশ মাত্র (মোট সরকারী ব্যয়ের তুলনায় ১৪.৪ শতাংশ), তা বেড়ে যেয়ে ১৯৫০ সালে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয় যা ছিল মোট সরকারী ব্যয়ের হিসাবে ৩৮ শতাংশের সমান।[২৮] সামাজিক খাতে ব্যয়ের এই বিরাট অর্থের ৫২ শতাংশ শিক্ষাখাতে এবং ৪১ শতাংশ দরিদ্র জনগণের সাহায্যে ব্যয় হয়। হিসাবটি ১৮৯০ সালের জন্য। ১৯৫১ সালে সামাজিক ব্যয়ের এই চিত্র ছিল নিম্নরূপ:

শিক্ষাখাতে—	২১ শতাংশ;
জন-স্বাস্থ্য ও জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে—	২৭ শতাংশ;
সামাজিক নিরাপত্তা—	২৬ শতাংশ;
অবসর-ভাতা, দরিদ্রদের সাহায্য ইত্যাদি খাতে—	২৬ শতাংশ;

২৮. এই সকল হিসাব ও পরবর্তী হিসাবগুলো Hicks-এর পূর্বোক্ত বই থেকে নেয়া। পৃঃ ১৪-১৬, ৩১।

সামাজিক ইত্যাদি খাতে যেমন তেমনি অর্থনৈতিক খাতেও বৃটিশ সরকারের ব্যয় প্রচুর বেড়ে যায়। ১৯১৩ সালে সরকার আঞ্চলিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় আয়ের ২.৩ শতাংশ ব্যয় করত। তা বেড়ে যেয়ে ১৯৪৮ সালে ১৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়। অবশ্য কর্ম-পরিসরও বৃদ্ধি পায়। সরকার এখন কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য সুযোগ প্রধান করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং উৎপাদন ক্ষেত্রেও সরাসরি উৎসাহ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করে। সরকার বহু শিল্প স্বীয় পরিচালনায় নিয়ে আসে। সরকারী বাণিজ্যে সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সাহায্য দেবার কার্যসূচী গ্রহণ করে। এই সব কারণ একত্রিত হয়ে সরকারী ব্যয় ব্যাপক করে দেয়। জাতীয় আয়ের হিসাবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। ১৮৯০-১৯৫০ সময়কালে তা ২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৯ শতাংশে উন্নীত হয়। কিন্তু, বাজেটে শতকরা হিসাবে তা হ্রাস পায়। ১৮৯০ সালের ৩৮ শতাংশ ১৯৫০ সালে ২৫ শতাংশে নেমে আসে।

কালের প্রবহমান গতিতে ধনী দেশগুলোতে সরকারী ব্যয়ের ক্রম-বর্ধমান গতির সাথে তাল রেখে কর প্রথার আকারভেদ ঘটে। বিভিন্ন করের আপেক্ষিক গুরুতে পরিবর্তন সূচিত হয়। আয়কর অধিক প্রাধান্য পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তা সরকারী রাজস্বের মূল উৎস হয়ে উঠে। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আয়কর থেকে মোট রাজস্বের মাত্র ১.৬ আয় পেত। ১৯৫২ সালে এসে তা ৬৪ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়।[২৯] বৃটেনেও একই অবস্থা ঘটে। ১৯১৩ সালের ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে তা ১৯৫০ সালে মোট রাজস্বের ৪৩ শতাংশ হয়ে উঠে।[৩০]

৫. 'বৃহৎ' বাণিজ্য

ধনীদেশে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম নিষ্পন্ন হয় বিরাটাকারে। উচ্চতর মাথাপিছু আয়-সম্পন্ন অধিকাংশ দেশে উৎপাদন চলে বৃহৎ সংস্থা ভিত্তিতে। বৃহদাকার এই উৎপাদন আঙ্গিকটি বৃটিশ যুক্তরাজ্যের দিকে তাকিয়ে

---

২৯. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৫৮৪।

৩০. দেখুন, U. K. Hicks-এর The Finance of British Government, 1920-1936, Oxford University Press, London, 1938, 384 এবং Hicks-এর British Public Finances, 75, 79.

লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৫ সালের উৎপাদন শুমারী অনুযায়ী শতকরা ৪০ জন শ্রমিক এমন সব উৎপাদনী শিল্প সংস্থায় নিয়োজিত যাদের শ্রমসংখ্যা অনধিক ৫০০-এর মত। অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে এমন সব শিল্প সংস্থায় দেশের শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। ঘর-বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ কাজে এই অনুপাত ছিল। ১২ শতাংশ খনিজ কাজে ৮৭ শতাংশ এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ৭৬ শতাংশ।[৩১] ১৯৫১ সালের এক হিসাব মতে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মোট শ্রমিকের ৪৪ শতাংশ অকৃষিজাত বেসরকারী শিল্পে সংস্থায় কর্মরত ছিল আর এর প্রতিটি সংস্থা কম করে অন্ততঃ ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করত। অবশ্য বৃটেনের মত আমেরিকায়ও শিল্পে শিল্পে ভেদাভেদ ছিল। শতকরা ৫৯ ভাগ উৎপাদনী কাজে নিযুক্ত ছিল। পরিবহন, যানবাহন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিল ৭৪ শতাংশ খনিজ শিল্পে ব্যাপৃত ছিল শতকরা ৪৮ জন। অর্থসংক্রান্ত কাজ বীমা ও জায়গা-সম্পত্তির কাজে নিরত ছিল ৩৪ শতাংশ। খুচরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল ২৫ শতাংশ আর পাইকারী ব্যবসায় কর্মরত ছিল শতকরা ১৬ জন।[৩২]

আমেরিকান শিল্প সংস্থার খবরাখবর থেকে সত্যিকার রূপটি পাওয়া যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের গঠনগত আঙ্গিকের দ্রুত সম্প্রসারণের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিটি উৎপাদনী শিল্প-সংস্থার মূল্য-সংযোজন পরিমাণ ২৮,০০০ ডলার থেকে বেড়ে ৪০৯,০০০ ডলার হয়ে যায় এই একই সময়ে শিল্পপ্রতি নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে ২৬ জন থেকে গড়ে ৬০ জন হয়ে যায়।[৩৩]

ধনী দেশের শিল্প-নক্সায় কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা খুব প্রবল। প্রায় সবগুলো দেশে কমবেশী কিছুটা সমাহরণ স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়।[৩৪] নিম্নে

---

৩১. দেখুন, Worswick ও Ady সম্পাদিত British Economy, 1945-1950, Oxford University Press, London, 1952, Table 5, 80.

৩২. U. S. Department of Commerce Survey of Current Business 34, No. 5, Tables 1 & 2, 18 (May, 1954)

৩৩. দেখুন, Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1955, U.S. Government Printing Offiece, Washington, 1955, 799.

৩৪. দরিদ্র দেশেও এই প্রবণতা উপেক্ষণীয় নয়। তা বরং মাত্রায় একটু বেশীই, উপরে একথা উল্লেখিত হয়েছে।

আমেরিকান শিল্পে জগতের একটা অপূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয়া গেল। তালিকাবদ্ধ এই সকল শিল্পে নিয়োজিত শ্রমের শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ ৪টি শ্রমিক সর্ববৃহৎ ৪টি শিল্প-সংস্থায় নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ প্রতিটি শিল্প-ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ চারটি শিল্পসংস্থা কমকরে অন্ততঃ ৫০ শতাংশ শ্রমিকে নিয়োগ করত তালিকাটি লক্ষ্য করুন :

শস্য-দানা উৎপাদন		শতকরা ৭৫ ভাগ।
সিগারেট	–	,, ৮১ ,,
কৃত্রিম তন্তু	–	,, ৭৬ ,,
এককালীন ও ক্লবিন	–	৭১ শতাংশ।
চক্র বেষ্টন (Tire) ও আভ্যন্তরীণ নল	–	৭৮ ,,
সমতল কাঁচ		শতকরা ৮৫ ভাগ।
পেষণ মিলে তৈরী ইস্পাত দ্রব্য	–	,, ৫৫ ,,
এলুমিনিয়াম শিল্পজাত দ্রব্য	–	,, ৮৯ ,,
টিনের তৈরী পাত্রাধার	–	,, ৭৭ ,,
বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও টার্বাইন	–	,, ৮৭ ,,
কৃষিকল		৭৬ শতাংশ।
বৈদ্যুতিক বাতি	–	৯১ ,,
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র	–	৯০ ,,
উড়ুজাহাজের ইঞ্জিন	–	৫৪ ,,
মোটরগাড়ী ও খুচরো টুকরা	–	৫৯ ,,

উপরোক্ত হিসাবটি ১৯৫০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত।[৩৫]

তুলনামূলকভাবে সমাহরণ প্রবণতা বৃটেনে বরং বেশী, ১৯৩৫ সালে বৃটেন ও আমেরিকার একটি তুলনামূলক চিত্র তৈরী করা হয়।[৩৬] এই হিসাবের পরিমাপে বৃটেনের মাত্রা অধিক হতে দেখা যায়। কেন্দ্রীকরণ

৩৫. দেখুন, Faderal Trade Commission, Changes in concentration in Manufacturing, 1935 to 1947 and 1950, U.S. Govt. Printing office Washington, 1954, 132-136.

৩৬. দেখুন, Gideon Rosenbluth-এর "Measures of Concentration," Business Concentration and Price Policy ; P.S. Florence-এর The Logic of British and American Industry.

সূচকের গড় আমেরিকার জন্য হয় ২০ শতাংশ ও বৃটেনের জন্য হয় ২৫ শতাংশ, জার্মানী, ক্যানাডা, জাপান, ইতালী ইত্যাদি দেশেও কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা প্রচুর বিদ্যমান।[৩৭]

১৯৩২ সালে Berle ও Means আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা হিসাব তৈরী করেন, তাঁরা অঙ্ক কষে দেখিয়ে দেন যে, ১৯০৯ ও ১৯২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবসায় নিরত নয় এমন ২০০ বৃহদাকার করপোরেশনের সম্পদ পরিমাণ বার্ষিক শতকরা ৫.৪ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায় আর বাকীগুলোতে বার্ষিক শতকরা ২.০ হারে বৃদ্ধি পায়।[৩৮] অবশ্য ১৯০৯-১৯১৯ সময়কালের হিসাবটা তেমন নির্ভুল নয়। যেমনটা ১৯১৯-১৯২৮ সালের সময়কার। কিন্তু যাই হউক, তাঁদের এই হিসাব বের হওয়ার সাথে সাথে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, কেননা, যদি অবস্থা এমনি চলতে দেওয়া হয় তাহলে সেদিন দূরে নয় যেদিন সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য এই ২০০ শত করপোরেশনের কুক্ষিগত হয়ে উঠবে।[৩৯] সুখের বিষয় এই ধারা অব্যাহত থাকেনি, অন্ততঃ ১৯৩১-১৯৪৭ সময়কালে। ১৯৩৫ সালে Public Utility Holding Company আইন পাস হয়। এই আইন দিয়ে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ব্যাপকহারে বিকেন্দ্রীকরণ করে নেয়া হয়। Adelman তাঁর পর্যালোচনা উৎপাদিনী শিল্প-সংস্থাসমূহে সীমাবদ্ধ রাখেন, এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তত্ত্ব-তালাশ চালিয়ে তিনি হিসাব দেন যে, ১৯৩১ সালে বৃহদাকার ১৩৯টি বাণিজ্য-সংস্থা মোট করপোরেশন সম্পদের ৪৯.৬ শতাংশের অধিকারী ছিল। ১৯৪৭ সালে এসে অবশ্য একটু কমে গিয়ে তারা ৪৫.০ শতাংশের ভাগী হয়ে দাড়ায়।[৪০] সুতরাং,

৩৭. E. H. Chamberlin সম্পাদিত Monopoly and Competition and their Regulation, Conference of the International Economic Association, Macmillan and Co. Ltd., London, 1954.

৩৮. A. A. Berle ও G. C. Means প্রণীত The Modern Corporations and Private Property, The Macmillan Co., New York 1932, 35.

৩৯. ঐ, পৃঃ ৪০-৪১।

৪০. দেখুন, M. A. Adelman-এর "The Measurement of Industrial Concentration," Review of Economics and Statistics, XXXIII, No. 4, 289 (Nov. 1951)

তাঁর হিসাব অনুযায়ী পড়তি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাহরণ সম্পর্কে বিক্রয়-তথ্যও পড়তি ইঙ্গিত নির্দেশ করে, অন্ততঃ ভয়াবহ বাড়তি সংকেত প্রদান করে না, অন্য এক বিশ্লেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, ১৯০৪ সালে মোট ১৮৫,০০০টি শিল্প-সংস্থার সর্বোচ্চ এক-দশমাংশ শিল্প-উৎপাদনের ৭৫.৫ শতাংশ কুক্ষিগত করে রেখেছিল,। ১৯৩৯ সালে এসে এই পরিমাণ ৭৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়। উপরদিকার অর্ধেক শিল্প-সংস্থা ১৯০৪ সালে শতকরা ৯৬.২ ভাগের অধিকারী ছিল আর ১৯৩৯ সালে ছিল ৯৭.১ শতাংশের অধিকারী।[৪১] সর্ব বৃহৎ চারটি বিক্রয়কারীর মোট বিক্রয়কে সবাকার সাকুল্য বিক্রয় দিয়ে ভাগ করে 'সমাহরণ অনুপাত' বের করে Adelman প্রদর্শন করতে সক্ষম হল যে, ১৯০১ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যেবর্তী সময়ে কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতা কতকাংশে হ্রাস পায়।[৪২] সুতরাং নানা মুনীর নানা মত বর্তমান, কেউ বলছেন বাড়ছে আবার কেউ বলছেন কমছে, হয়ত কেউ পুরোপুরি সত্য নন, তাছাড়া, হিসাব-নিকাশের গড্‌বড্‌ত রয়েছেই। তথ্যাদির নির্ভুলতা সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, বিশেষ করে গোড়ার দিককার পরিসংখ্যান খবরাদি মোটেই নির্ভরশীল নয়। এমতাবস্থায় সঠিক করে কিছু বলার জো নেই, তবে এইটুকু হয়ত বলা চলে যে, শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে আমেরিকায় সমাহরণ প্রবণতা যেমনটি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেও হয়ত তেমনটাই ছিল।

আমেরিকান শিল্পজগতে বিদ্যমান কেন্দ্রীকরণ মাত্রা হয়ত অন্যদিক থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করা গেলে হয়ত তা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে, ১৮৭০ ও ১৮৮০ দশকে আমেরিকায় শিল্প--একত্রীকরণ প্রবণতার বান ডাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত শিল্প সংস্থা ধুয়ে-মুছে যেয়ে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, মাকড়সার জালের ন্যায় বিস্তৃত বৃহদাকার শিল্প-সংস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ লীন হয়ে যেতে থাকে। ১৮৯৭ সালে

৪১. G. Warren Nutter-এর The Extent of Enterprise Monopoly in the United States, 1899-1939, University of Chicago Press, Chicago, 1961, Table b.

৪২. Adelman-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৯০-২৯২। 'কেন্দ্রীকরণ অনুপাত ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্ব এমন সব শিল্প কেবল Adelman তুলনা করে দেখেছেন।

এসে আবার এই একত্রীকরণ জোয়ার জোরদার হয়ে উঠে। ১৯০৪ সাল নাগাদ এই উচ্ছ্বাস অব্যাহত থাকে। প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধিত হয়ে সমাহরণ পরিবেশ বেশ অনুকূল করে তোলে। তার সাথে বৃহৎ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা সংযুক্ত হয়ে সংযুক্তিকরণ আন্দোলন তীব্রতর করে দেয়। ১৯২০ দশকে পুনরায় একত্রীকরণ প্রবণতার ঢল নামে। অবশ্য মাত্রার দিক থেকে এই ঢেউ কিছুটা নমিত ছিল। কিন্তু যাই হউক, আগে থেকে শুরু হওয়া বানে নামমাত্র বাতাস হলেও তা বেশ ঝড় সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। তার ফলে কেন্দ্রীকরণ ক্রিয়া আরো সবল হয়। ১৯৩০ দশকের মহামন্দপর্ব আরো জোর তাল যোগায়। তাতে করে সমাহরণ-ক্রিয়া অধিকতর ঘনীভূত হয়। পুনর্জাগরণ-পর্ব অবশ্য মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতাকে কিছু লঘু করে তুলে। যুদ্ধকালীন প্রাচুর্য-পর্ব ও বিকেন্দ্রীকরণ শক্তিকে কিছুটা জোরদার করে দেয়। যুদ্ধোত্তর কালে এসে একত্রীকরণ-প্রবণতা আবার মাথা উচিয়ে উঠে। আজ অবধি এই সম্পর্কে তেমন একটা বিশ্লেষণ হয়নি।

সুতরাং, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে 'বৃহৎ' বাণিজ্যের প্রাধান্য সর্বাধিক। এই বৃহদাকার বাণিজ্যের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ মালিকানা থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক।[৪৩] 'নিয়ন্ত্রণ' কথাটার অর্থ নিয়ে হয়ত বাদানুবাদ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য একটা সংজ্ঞা এই যে নিয়ন্ত্রণ মানে পরিচালন-ব্যবস্থা নির্ধারণ কি পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্জন। ক্ষমতা অর্জনের উপায় হল, শেয়ারের ভাগীদার হওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Securities and Exchange Cammission নিয়ন্ত্রণ সমস্যাটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। কমিশন অর্থ ব্যবসায়ে লিপ্ত নয় এমন ২০০ বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেন। বিশ্লেষণটি ১৯৩৭-১৯৩৯ সাল সময়ে সীমিত রাখা হয়।[৪৪] উপরোক্ত ২০০ প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলো বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৬। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অর্থাৎ অধিকর্তা কার্য-নির্বাহী ও পরিচালকমণ্ডলীর

---

৪৩. দেখুন, Brady-এর Business as a System of Power, Columbia Uuiversity Press, New York, 1943, 228.

৪৪. R.A. Gordon প্রণীত Business Leadership in the Large Corporation নামক গ্রন্থে এই বিষয়টি বিশদ আলোচিত হয়েছে এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মালিকানায় যে শেয়ারগুলো রয়েছে সেই অনুপাতে করপোরেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যে ভোট দেয়ার ক্ষমতা শতকরা হিসাবে তার মধ্যমা (median) মাত্র ২.১১ ভাগ। কাজেই, কার্যনির্বাহী কি পরিচালক মন্ডলী আমেরিকান বৃহৎ বাণিজ্য পরিচালনায় তেমন কতৃত্বের দাবীদার নয়। অর্থাৎ শেয়ার মালিকানার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তাদের বক্তব্য তেমন গোচচার নয়। সে যাই হউক, কমিশন অবশ্য মন্তব্য করে যে, করপোরেশন বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় শেয়ার-মালিকানার কর্তৃত্বে যে নিয়ন্ত্রণ তা অবশ্যই আমেরিকান বাণিজ্য-ব্যবস্থায় প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ। কমিশন সভ্যরা বিশদ আলোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শেয়ারমালিকদের মধ্যে এমন একটা দল রয়েছে যারা কার্যতঃ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোম্পানীর কার্য-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এই সর্বময় দলটি ১৭৬টি করপোরেশনের মধ্যে অন্ততঃ ১১৮টি করপোরেশনে বিদ্যমান রয়েছে বলে কমিশন মন্তব্য করেছে। বাকী ৫৮টি কোম্পানীতে অবশ্য মাতবরগোছের এই জাতীয় দল দেখা যায় না। এইসকল সংস্থাতে বরং বিদ্যমান ব্যবস্থাপকমণ্ডলী আসল ক্ষমতার অধিকারী। বাণিজ্য-পরিচালনার কলকাঠি তাদের কর্তৃত্বাধীনে। তারা সহজেই নিজেদের প্রধান্য বাঁচিয়ে রেখে চলতে পারে।

৬. আয়-বণ্টন

সুতরাং, এতক্ষণকার আলোচনায় ধনীদেশের কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনধারা তুলে ধরা গেল। এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়ায় আয়-বণ্টন ধারা কেমনতর রূপ নিল? অর্থাৎ আঙ্গিকগত ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনস্রোতের সাথে তাল রেখে ধনী দেশের আয়-বণ্টন পদ্ধতি কোন্ পথে, কোন্ লয়ে ও কেমনতর ধারায় এগোল। আজকের দিনের অবস্থাদৃষ্টে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, দরিদ্র দেশের তুলনায় বরং ধনী দেশে অর্থনৈতিক সমতা অধিকতর সুখকর। কিন্তু অতীতের পরিস্থিতি কেমন ছিল? অতীত সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলার জো আছে কি? না তা নেই। কেননা অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর খোঁজখবর তেমন একটা পাওয়া যায় না। আয়-বণ্টন ধারার ঐতিহাসিক প্রবাহ তেমন স্বচ্ছ নয়। কাজেই, দেশ-ভিত্তিক পরিবর্তনধারা বিবৃত করা অনেকটা কষ্টকর বৈকি।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে সব খোঁজ-খবর পাওয়া যায় তাতে

দেখা যায় যে, ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আয়-বন্টন ধারা অনেকাংশে সমতামুখী হয়ে উঠছে। প্রমাণ হিসাবে ২৩.১০ নম্বর সারণী দেখুন। অনেক কারণ একত্রিত হয়ে তবে এই প্রবণতার জন্ম দেয়।[৪৫] ১৯৩৫-১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে বেকারত্ব মাত্রা নিম্নসীমায় নেমে আসে। এদিকে স্বল্প আয়ের লোকদের পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক বৃদ্ধি পায়। অথচ অধিক আয়ের লোকদের আয় তেমন একটা বাড়ে না। ফলে ১৯৫০ সালে এসে বৈষম্য মাত্রা অনেক লঘু হয়ে উঠে। তাছাড়া কৃষককুল যারা নাকি আয়-নির্দেশক রেখার নীচুস্তরে অবস্থিত, মাত্রাহীনভাবে অধিক আয় পায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অন্যদিক থেকেও একটু বেশী সুবিধা পায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলোতে উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা অধিক হতে দেখা যায়। এই সকল কারণেও আয়মাত্রার প্রকট বৈষম্য বেশ কিছুটা লাঘব হয়।

সারণী ২৩.১০

পারিবারিক আয়ের ভিত্তিতে শতকরা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ ভাগ পরিবার ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারিবারিক ব্যক্তিগত আয় বণ্টন

কুয়িন্টাইল (Quintiles)	১৯৩৫-৩৬	১৯৪১	১৯৪৪	১৯৫০	১৯৩৫-৩৬ থেকে ১৯৫০
সর্বনিম্ন	৪.১	৪.১	৪.৯	৪.৮	+১৭
দ্বিতীয়	৯.২	৯.৫	১০.৯	১১.০	+২০
তৃতীয়	১৪.১	১৫.৩	১৬.২	১৬.২	+১৫
চতুর্থ	২০.৯	২২.৩	২২.২	২২.৩	+৭
সর্বোচ্চ	৫১.৭	৪৮.৮	৪৫.৮	৪৫.৭	—১২
মোট:	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	—
সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ	২৬.৫	২৪.০	২০.৯	২০.৪	—২৩

উৎস: H.P. Miller, Income of the American People, John Wley & sons, New York, 1955, Table 61, 112.

৪৫. দেখুন, H. P. Miller-এর Income of the American People, John Wiley & Sons, New York, 1955, Chapter 9.

প্রাগ ১৯৩৫ সময়ের জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে আয়-বন্টনের বড় একটা হিসাব পাওয়া যায় না। সবার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য এমন কোন হিসাব নেই। কেবল শীর্ষে অবস্থিত শতকরা ৫ ভাগ লোকের আয়ের হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায়। শীর্ষস্থানীয় এই দলটির আয়মাত্রা ১৯১৯-১৯২৮ কাল সময় থেকে ১৯২৯-১৯৩৮ সময়কালে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু তৎপরবর্তী দশকে অর্থাৎ ১৯৩৯-১৯৪৮ সময় কালে তা সরাসরি হ্রাস পায়।

জার্মান দেশে পাওয়া পরিসংখ্যান তথ্য সঙ্কেত করে যে, ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে আয়-বৈষম্য হ্রাস পেয়ে সমতার দিকে ধাবমান হয়। কিন্তু ১৯৩০ দশকের মহামন্দপর্বে এসে গনেশ উল্টে যায়, অর্থাৎ বৈষম্য তীব্রতা পুনরায় বাড়তে থাকে।[৪৬] দুঃখের বিষয়, যুদ্ধোত্তর কালের জার্মানীর কোন হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশে আয়-বৈষম্য চিত্র অনেকটা আমেরিকার অনুরূপ হয়। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আয়-বন্টন মাত্রা অনেকাংশে ন্যায়ানুগ ভিত্তিক হয়।[৪৭] সে যাই হউক, এই ছিঁটেফোটা হিসাবের ভিত্তিতে আয়-বন্টন নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে দীর্ঘসূত্রী ধারাপ্রবাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে আরো বহু তথ্য ও খবরাখবর জড়ো করে নেয়া উচিত। তবেই হয়ত আয়-বন্টনের আকার-ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ধারাপর্ব নিয়ে সঠিক মন্তব্য করা সহজ হবে, তার আগে নয়।

আয়ের মাত্রানুসারে আয়-বন্টনের দীর্ঘমেয়াদী তেমন খোঁজখবর না পাওয়া গেলেও কিন্তু প্রকারভিত্তিক (by type) বেশ কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। প্রমাণ ২৩.১১. নম্বর সারণী, এই চিত্রে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র-কর্তৃক শ্রমিক-ক্ষতিপূরণ, উদ্যোগজাত আয় ও সম্পত্তি আয় (লভাংশ, সুদ ও খাজনা) খাতে দেয় মোট টাকার হিসাব দেয়া হয়েছে।

৪৬. দেখুন, Woytinsky ও woytinsky-এর world Population, 408 এবং P. Jostock প্রণীত "The Long-Term Growth of National Income in Germay" Income and Wealth, Series V, Bowes & Bowes, London, 1955, 112-117.

৪৭. দেখুন, Woytinsky ও Woytinsky-এর World Population, পৃ: ৪০৯।

১। সারণী ২৩.১১

প্রকারভিত্তিক মোট আদায়কৃত টাকার বণ্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চলতি দামে ১৯০৯-১৯৪৮

	শ্রমিক-ক্ষতিপূরণ	উদ্যোগজাত-আয়	সম্পত্তি-আয়
১৯০৯-১৯১৮	৫৬.২	২৪.৬	১৯.২
১৯১৯-১৯২৮	৬১.৭	১৯.৫	১৮.৮
১৯২৯-১৯৩৮	৬৪.১	১৪.৭	২১.২
১৯৩৯-১৯৪৮	৬৯.৬	১৮.৪	১২.০

উৎস: S. Kuznets, "Long-term Changes in the National Income of the United States of America Since 1870" Income and wealth of the United States, Income and wealth, Series II, S. Kuznets (ed), Bowes and Bowes, Cambridge, 1952, 136.

এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, শ্রমিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, এই সারাটা সময় ধরে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ক্রমান্বয় হারে বেড়ে যেতে থাকে, এমনটা ঘটে খুব সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ব্যবসা লোপ পেয়ে করপোরেশন বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটার কারণে আর করপোরেশন বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটে কৃষি প্রাধান্য লোপ পাওয়ার ফলে। তার সাথে যোগ হয় যৌথ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, ফলে যৌথ ব্যবসা ব্যক্তিগত ব্যবসার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র ব্যবসায়-বাণিজ্য জগতে ছড়িয়ে পড়ে,[৪৮] এই একই স্রোত লক্ষ্য করা যায় বৃটেনে,[৪৯] জার্মানীতে[৫০] ও ফ্রান্সে[৫১]।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্যোগজনিত আয়ের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। তা ঘটে ১৯২৯-১৯৩৮ পর্বে এবং ১৯৩৯-১৯৪৮ সময়কালে; উদ্যোগজাত আয়ের এই ব্যাপক প্রসার ঘটে কৃষিপণ্যের দর বেড়ে যাওয়ার ফলে. যুদ্ধ চলাকালে ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের কৃষিজাত দ্রব্যের দাম সরাসরি বেড়ে যায়, কর্ম-উৎসারিত মোট আয় অর্থাৎ শ্রমিক-ক্ষতিপূরণ

৪৮. ২৪,১১ সারণীর উৎস হিসাবে উল্লেখিত S. Kuznets-এর প্রবন্ধ, পৃঃ ১৩৮।
৪৯. Woytinsky ও Woytisky World Population, পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫।
৫০. Jostock-এর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১০৯।
৫১. Woytinsky ও Woytinsky-এর World Population, পৃঃ ৩৭৫।

ও উদ্যোগলব্ধ আয় ১৯০৯-১৯১৮ এবং ১৯২৯-১৯৩৯ সময়কালে মোটামুটি-ভাবে অপরিবর্তিত থাকে। এমনকি বহুকাল আগের অর্থাৎ ১৮৭০ দশকের সময়কার হিসাবেও তা তেমন পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু ১৯২৯-১৯৩৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪৮ সময়কালে এই আয় সরাসরি বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্পত্তি আয় হ্রাস পায়, কুজ্‌নেটস্‌ বলেন দুই কারণে তা ঘটে: "মূলধন-উৎপাদন অনুপাতে হ্রাস ঘটার ফলে আর এই হ্রাস ঘটে মূলধন পরিমাণে সমানুপাতিক বৃদ্ধি ব্যতিরেকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উৎপাদনে অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ হেতু এবং যুদ্ধ-ব্যয় মেটাবার নিমিত্তে ইস্যুকৃত সরকারী সেকিউরিটিসের ব্যয় সঙ্কোচন ও বাজারস্থ করার সরকারী নীতি দিয়ে সুদের হার নিম্ন পর্যায়ে রাখার কারণে, তাতে মূলধনের উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়।"[৫২]

৭. মূলধন-সংগঠন

উপাদান সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, এই পর্যায়ে পড়ে-মূলধন গঠন, প্রাকৃতিক সম্পদ পরিস্থিতি, লোকসংখ্যার আকার ও গঠনগত আকৃতি এবং শ্রম শক্তির সরবরাহ, উপাদান সরবরাহের এই বিশ্লেষণ থেকে এবং প্রযুক্তিক অগ্রগতির ধারা পর্ব উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ও দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী বৈপরীত্ব আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। বর্তমান অধ্যায়ের বাকী অংশে এগুলো আলোচনা করা হবে।

প্রথমে মূলধন সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা যাক, মূলধন বলতে কি বোঝায় এনিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই। মূলধন সম্ভারে কি কি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন তা ঠিক করা সুকঠিন কাজ। শিক্ষা ও ট্রেনিং খাতে যা হয় তা কি মূলধনের অন্তর্গত? না কি কেবল দালান-কোঠা, ঢাল-তলোয়ার, যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধন পুঁজি হিসাবে বিবেচ্য? কাজেই, ঝগড়াটা বেশ গোলমেলে, অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, অবশ্য আসলে তত জটিল নয় এই যা সুখের কথা, সর্বশেষ পর্যালোচনায়, সব সংজ্ঞাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে কথা হল তা নিয়মমাফিক পথে প্রয়োগ করতে হলে এবং যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, সুতরাং, যে কোন সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হউক না কেন তা যেন বিবেচ্য সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে পারঙ্গম হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, তাহলেই আর ঝামেলা বাধবে না।

৫২. Kuznets-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পঃ ১৩৭।

মূলধনের সংজ্ঞার চেয়েও বড় সমস্যা তার পরিমাপ করা, মূলধনের সরবরাহ যাচাই করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। পথে নানা অন্তরায়। মনে করুন ডলারের হিসাবে মূলধনী সামগ্রীর মূল্যায়ন করা হবে। তাহলে গাণিতিক বিচারে সঠিক পন্থা হবে মূলধনী সামগ্রী উৎসারিত ভবিষ্যতে প্রাপ্য দ্রব্যাদির বর্তমান অবনমিত মূল্য হিসাব করে নেয়া। কিন্তু, অনিশ্চয়তা ভরপুর চলমান বিশ্বে এই হিসাব যেমন বাস্তবধর্মী নয় তেমনি বড় একটা অর্থবহও নয়। এই কারণে মূলধনের অধিকাংশ হিসাব-নিকাশ বর্তমান মূল্যের পরিমাপে হয়ে থাকে। অবশ্য তার থেকে মূল্যাবনতি (depreciation) বাদ দিয়ে নেয়া হয়। অনেকে আবার বিকল্প পথও অবলম্বন করে থাকেন। বিকল্প পথটি হচ্ছে সম্পূর্ণ মূলধনী সামগ্রী গণনা করে নেয়া। কিন্তু, এপথও সন্তোষজনক নয়। বরং তা বাস্তব বিচারে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

বিভিন্ন দেশে মূলধন সরবরাহের তুলনামূলক খবরাখবর পাওয়া বড্ড দুষ্কর। আর যেটুকু পাওয়া যায় তাও তেমন নির্ভরশীল নয়। বরং ভুল-ত্রুটিতে ভরা। কলিন ক্লার্ক একটা হিসেব দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ইউনিটের হিসাবে তিনি মাথাপিছু মূলধনের নিম্নোক্ত হিসেব প্রদান করেছেন :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৩৯)	-	৫৮২০
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	(১৯৩২-১৯৩৪)	-	৬৬৬০
ন্যাদারল্যাণ্ডস	(১৯৩৯)	-	৬৩২০
ক্যানাডা	(১৯২৯)	-	৫৫০০
নরওয়ে	(১৯৩৯)	-	২৭৩২[৫৩]

দরিদ্র দেশের অবস্থা বড্ড খারাপ। আমেরিকা ও বৃটেনে বিদ্যমান মাথাপিছু মূলধনী সামগ্রীর শতকরা ১০ ভাগ পুঁজিওয়ালা লোক দরিদ্র দেশে খুব কমই আছে।[৫৪]

কর্মরত প্রতিটি লোকপিছু অশ্বশক্তির হিসাবেও অনেকে পুঁজিসামগ্রীর হিসাব কষে থাকেন। হিসাবটি মোটেও সন্তষজনক নয়। তবে, বেশ কিছুটা শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী বটে। এক হিসাব মতে শিল্পক্ষেত্রে এই পরিমাণ এইরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩৯) ৪.৮; বৃটিশ যুক্তরাজ্য (১৯৩০) ২.৪; ফ্রান্স (১৯৩১), ২.২; সুইডেন

৫৩. Clerk-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৪৮৬-৪৮৯।

৫৪. দেখুন, চতুর্দশ অধ্যায়, তৃতীয় ভাগ।

(১৯৩৮), ৪·৪ ; নরওয়ে (১৯৩৮) ৫·৪ ; এবং ইতালী (১৯৩৭-১৯৪০) ১·৬।[৫৫]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি-সামগ্রী নিয়ে সাম্প্রতিক কালে একটা লেখা বেরিয়েছে। এই হিসাব মতে ১৯৫০ সালে আমেরিকায় মাথাপিছু পুনঃউৎপাদনী দৃশ্যমান সম্পদের মূল্য (১৯২৯ সালের ডলারের হিসাবে) ছিল ২৩৭০ ডলার।[৫৬] অবশ্য এই হিসাব দিয়ে কিছু বোঝার জো নেই। তবে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তার পরিবর্তন-ধারা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গোল্ডস্মিথের এই হিসাব মতে এর পরিমাণ ১৯০০ সালে ছিল ১৩২১ ডলার, ১৯১২ সালে ১৬৪৭ ডলার, ১৯২৯ সালে ২৩৬১ ডলার, ১৯৩৯ সালে ২১০৭ ডলার, ১৯৪৫ সালে ২০৪৭ ডলার এবং ১৯৫০ সালে ২৩৭০ ডলার। দৃশ্যমান সম্পদের এই পরিবর্তন ধারার সাথে তাল রেখে ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বার্ষিক অগ্রগতি হার আবর্তিত হয় শতকরা ১·৪৪ ভাগ হারে। অথচ ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অগ্রগতি এগিয়ে চলে বার্ষিক শতকরা ২·৫৩ ভাগ হারে। বৃটিশ যুক্তরাজ্যে মূলধন সংগঠন নিয়ে এক আলোচনায় দেখা যায় যে, মাথাপিছু নীট স্থায়ী সম্পদের মূল্য (১৯৪৮ সালের দরের হিসাবে) ১৯৪৭ সাল ও ১৯৫৩ সালের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।[৫৭]

---

৫৫. দেখুন, United Nations, Economic Bulletin for Europe, III, No. 1, 27 (First Quarter, 1951)

৫৬. দেখুন, R. Goldsmith-এর "The Growth of Reproducible Wealth of the United States of America from 1805 to 1950", income and wealth of the United States, income and wealth, series II, S. Kuznets (ed.), Bowes and Bowes Cambridge, 1952, 273. এই হিসাবে সামরিক দৃশ্যমান সম্পদ, ভূগর্ভস্থ সম্পদ এবং বেসামরিক টেকসই, আধা-টেকসই ও ক্ষণস্থায়ী সম্পদ বহির্ভূত রাখা হয়।

৫৭. নীট স্থায়ী মূলধনের মূল্যের হিসাব পাওয়া গিয়েছে P. Redfern-এর "Net Investment in Fixed Assets in the United Kingdom 1938- 1953" নামক প্রবন্ধ থেকে আর লোকসংখ্যার হিসাব নেয়া হয়েছে Central Statistical office প্রকাশিত Annual Abilract of Statistics থেকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অপর একটি বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। অর্থ ব্যবসায়ে লিপ্ত নয় এমন ১00টি বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান জরিপ-তালিকাভুক্ত করে এই পর্যালোচনা হিসাব দেয় যে, ১৯৫২ সালে আমেরিকান প্রতিটি শ্রমিক-পিছু গড়ে ১৫,000 ডলার লগ্নী (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও চলতি সম্পদসহ) করা হয়। এই হিসাবে অবশ্য যথেষ্ট মারপ্যাচ লক্ষ্য করা যায়। গড় হিসাব করতে যেয়ে শিল্পে শিল্পে প্রকট ভেদাভেদ ঢাকা পড়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিল্পে শ্রমিক-প্রতি ৫২,000 ডলার বিনিয়োগ করা হয়। তামাকজাত শিল্পে ৪৬,000 ডলার লগ্নী হয়। পেট্রোলিয়ামজাত শিল্পে ৩৮,000 ডলার বিনিয়োগ ঘটে। রেলপথে লগ্নী করা হয় ২৪,000 ডলার। অথচ খাদ্য, মোটরগাড়ী, বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ ঘটে মাত্র ৮,000 ডলার।[৫৮]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন সংগঠনে গঠনগত পরিবর্তন সূচিত হয় ১৮৯0 সাল থেকে। ১৮৯0 সালে মূলধনী সামগ্রীর শতকরা ৭৭ ভাগ ব্যয় হত নির্মাণকার্য খাতে এবং মাত্র ২৩ ভাগ খরচ হত যন্ত্রপাতি খাতে। ১৯২0 দশকে নির্মাণ খাতের ব্যয় হ্রাস পেয়ে ৬৭ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৪৮–১৯৫২ সময়কালে তা আরো কমে গিয়ে ৫৫ শতাংশে চলে আসে।[৫৯] এটা ঘটে যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার পরিণাম হিসাবে।[৬0] ১৯২৯ সালে কৃষি ও অকৃষিজাত যন্ত্রপাতিতে ব্যয়ের মাত্রা ছিল দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রপাতি খাতে মোট ব্যয়ের ৮·১ শতাংশ ও ৩৯·৫ শতাংশের সমান। ১৯৫২ সালে এই পরিমাণ বেড়ে যেয়ে যথাক্রমে ৯·৭ শতাংশ ও ৪৮·১ শতাংশে উন্নীত হয়।[৬১]

পুঁজি-সামগ্রীতে অপর একটি পরিবর্তনও সূচিত হয়। আমেরিকার মূলধন-উৎপাদন-অনুপাত নিম্নমুখী মোড় নেয়। শিল্পখাতে এই অনুপাত ছিল ১৮৯0 সালে ১·৬৫। ১৯১৯ সালে হয়ে দাঁড়ায় ২·৫৬। ১৯৩৭

---

৫৮. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৯১১।

৫৯. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১0১৬-১0১৮।

৬0. সরঞ্জাম উপকরণ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যন্ত্রপাতি, ব্যবসায় ব্যবহৃত মোটরযান, অন্যান্য পরিবহন-যান ও বাকী সব উপকরণ।

৬১. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৪৮২।

সালে ১·৮১ এবং ১৯৪৮ সালে ১·৬৬।[৬২] খনিজ শিল্পে এই অনুপাত ছিল ১৮৯০ সালে ১·৬৬, ১৯১৯ সালে ২·৮৯, ১৯৩৭ সালে ১·৫৯ এবং ১৯৪৮ সালে ১·৫৫।[৬৩] কৃষিক্ষেত্রেও মূলধন-উৎপাদন-অনুপাতে অবনতি ঘটে ১৯১২ সালের পর থেকে। এই সকল অনুপাতে যে নিম্নগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বেসরকারী মালিকানায় বিদ্যমান কল-কারখানা ও মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনা করেও।[৬৪] ১৯১০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল অবধি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই তুলনামূলক চিত্র গড়ে তোলা হলে মূলধন-উৎপাদন-অনুপাতের নিম্নগামী প্রবণতাটি পরিষ্কার হয়ে উঠে।[৬৫]

মূলধনী-সামগ্রী ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র দেশে যে বৈষম্য বিরাজমান তার পশ্চাতে রয়েছে এই উভয়বিধ দেশের সঞ্চয়-অভ্যাসের পার্থক্য। চতুর্দশ অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে দরিদ্র দেশ অপেক্ষা ধনী-দেশে সঞ্চয় অনুপাত অধিক এবং সময়ের বিবর্তনে যেন এই ফাঁক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমেরিকার সঞ্চয় আয় অনুপাত-চিত্র তেমন স্বচ্ছ নয়। ২৩·১ নক্শা লক্ষ্য করুন। টেক্সই ভোগদ্রব্য বহির্ভূত করে সঞ্চয়ের সংজ্ঞা প্রদত্ত হলে দেখা যায় যে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় সঞ্চয়-আয় অনুপাত নামমাত্র কিছুটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু, টেকসই ভোগসামগ্রী সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিলে লক্ষ্য করা যায় যে এই অনুপাতে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য এই হিসাব-নিকাশের ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। তাই গোল্ড-স্মিথ মন্তব্য করেন, "প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে দীর্ঘসূত্রী প্রবণতা অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য উপকল্প

---

৬২. দেখুন, D. Creamer-এর Capital and Output Trends in Manufacturing Industries, 1880-1948, Occasional Paper 41, National Bureau of Economic Research, New York, 1954, Table 8.

৬৩. 1. Borenstein-এর Capital and Output Trends in Mining Industries আলোচনা করুন।

৬৪. W. Leontief-এর "Machines and Man" Scientific American 187, 154 (Sept. 1952)

৬৫. Dewhurst-এর পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ৮৩২।
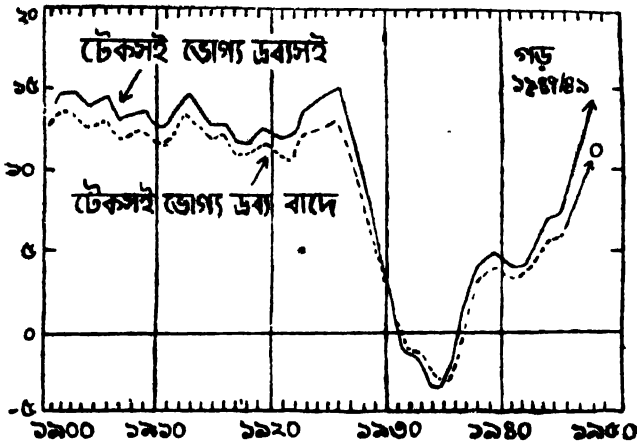
নক্শা ২৩.১. জাতীয় সঞ্চয় আয় অনুপাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৯৭-১৯৪৯, (নয় বৎসর ব্যাপী চলমান গড়ে,) উৎস : R. W. Goldsmith, A Study of Saving in the United States, Princeton University Press. Princeton, 1955, 1, 78, Chart XIV.

হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।"[৬৬] অন্যান্য দেশের অবস্থাও মোটামুটি তথৈবচ। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ধনীদেশগুলোতেও দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়-আয় অনুপাত আমেরিকার মত বলেই মনে হয়। উদাহরণ হিসাবে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা কি ডেনমার্কের কথা ধরুন। এই সকল দেশও দীর্ঘসূত্রী অনুপাত হয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে না হয় সমানুরূপ রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই চিত্র অনুরূপ রয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়।[৬৭]

---

৬৬. দেখুন, R. W. Goldsmith-এর A Study of Saving in the United States, Princeton University Press, Princeton, 1955, 1, 75.

৬৭. আলোচনা করুন, S. Kuznet-এর "International Difference in Capital Formation and Finacing," Capital Formation and Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton, 1955, 46.

সারণী ২৩·১২. নির্বাচিত সময়কালে আমেরিকার জাতীয় সঞ্চয়ে মুখ্য সঞ্চয়ী দলগুলোর শতকরা অবদান, চলতি মূল্যে

	ব্যক্তিগত	করপোরেশন্স	সরকার
১৮৯৭–১৯০৮	৬৮·৭	২৪·৯	৬·৫
১৯২২–১৯২৯	৬৪·১	১৭·৯	১৮·১
১৯৪৬–১৯৪৯	৬০·৩	২৫·৩	১৪·৩
১৮৯৭–১৯৪৯ বহির্ভূত ১৯১৭–১৯১৮, ১৯৩০–১৯৩৩, ১৯৪২–১৯৪৫	৭২·১	২০·৪	৭·৪

উৎস: R. W. Goldsmith, A Study of Saving in the United States, Prinrcton University Press, Princeton, 1955, 1, 271.

সুতরাং ২৩·১২ সারণী পরিষ্কার করে তুলে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, জাতীয় সঞ্চয়ের বৃহত্তম অংশ আসে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। বর্তমান শতাব্দীতে অবশ্য সরকারী সঞ্চয় বেশ বেড়ে গিয়েছে, তাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় যে কেবল আপেক্ষিক অর্থে হ্রাস পেয়েছে তাই নয়। বরং গোল্ডস্মিথের পরিভাষায়, ব্যক্তিগত সঞ্চয় ক্রমে ক্রমে 'রজ্জুবদ্ধ' হয়ে উঠেছে অর্থাৎ কিনা তা আর ঠিক সঞ্চয়কারীর সিদ্ধান্ত পরিমাপে ঘটতে পারছে না। তা যেন অন্যের সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে। তার চেয়ে, বড় কথা, এই জাতীয় সঞ্চয়-পরিবেশ বহু কাল যাবত বিদ্যমান থাকছে। অর্থাৎ রজ্জুবদ্ধ প্রবণতা জন্ম নিয়ে তড়িঘড়ি তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে না। তা বহু কাল ধরে অপ্রতিহত গতিতে বয়ে চলছে। হয়ত কয়েক দশক অবধি বিস্তৃত হয়ে চলছে। মানে সঞ্চয় ঘটছে চুক্তিবদ্ধভাবে। কাজেই, চুক্তিকাল শেষ হয়ে না যাওয়া অবধি এই জাতীয় সঞ্চয় বয়ে চলছে। বাধা সৃষ্টি করতে গেলে সঞ্চয় পরিমাণ কমে যেতে বাধ্য।[৬৮] এই জাতীয় সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে বীমার জন্য দেয় প্রিমিয়াম, অবসর-ভাতা অবদান, নগর-অঞ্চলে বন্ধকী আবাসস্থলের জন্য

৬৮. Goldsmith-এর পূর্বোক্ত বই, 1. পৃঃ ১৫৯।

নির্দিষ্ট সময়-অন্তে আদায়কৃত দেনা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। এই সকল খাতে সঞ্চয়কৃত টাকার পরিমাণ প্রাগ-১৯১৫ সাল কালে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ৭ ভাগের মত হয়। ১৯২০ দশকে এসে তা ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে এই জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের শতকরা ৪০ ভাগের কোঠা ছাড়িয়ে যায়।[৬৯] ১৯৫১-১৯৫২ সালে পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় যে বৃটেনে রজ্জুবদ্ধ সঞ্চয়-মাত্রা এমনকি পরিবারভিত্তিক মোট সঞ্চয় অপেক্ষাও অধিক ছিল।[৭০]

৮. প্রাকৃতিক সম্পদ

ধনীদেশ প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ব্যহার করে, শিল্প চাহিদা তার অধিক। ব্যাপকতর শিল্প-ব্যবস্থা ও তৎউৎসারিত উৎপাদন পরিমাণ অব্যাহত রাখায় অন্তহীন কাঁচামাল-সামগ্রী সরবরাহ প্রয়োজন। তা পাওয়া কি সহজ? মোটেই নয়। তাই, প্রাকৃতিক সম্পদের টানাপোড়েন দেখা দেয়। এই টানাপোড়েন কাটিয়ে উঠতে দু'পয়সা গচ্ছা দিতে হয়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত খরচ একটু বাড়িয়ে তবে সরবরাহ যোগাড় করতে হয়। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে আমেরিকায় তেলসহ খনিজ দ্রব্যাদির ব্যবহার ৫ গুণ বেড়ে যায়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মতামত ব্যক্ত করেন যে, ১৯৭৫ সাল নাগাদ কাঁচামাল ইত্যাদির ব্যবহার হার ১৯০০ সালের হারের প্রায় ১০ গুণ অপেক্ষা অধিক হয়ে দাঁড়াবে।[৭১] ১৯০০-১৯৫০ সাল সময়ে আমেরিকার কৃষিপণ্য ভক্ষণ প্রায় ১৩০ শতাংশেরও অধিক সমপ্রসারিত হয়। বন-সম্পদ ভক্ষণ অবশ্য মোটামুটি একইরূপ থাকে।[৭২] The Materials Policy Commission হিসেব দিয়েছে যে ১৯৫০-১৯৭৫ সাল পর্বে কৃষিপণ্য ও বন-সম্পদের খরচ রেড়ে

---

৬৯. Goldsmith-এর পূর্বোক্ত বই I, পৃঃ ১৬০।

৭০. দেখুন, H. F. Lydall-এর "National Survey of Personal Incomes and Savings Part IV, Personal Savings and Consumption Expenditures," Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics, XV, Nos. 10-11, 349 (Oct & Nov. 1953).

৭১. দেখুন, E. S. Mason-এর "Raw Materials, Rearmament and Economic Development," Quarterly Journal of Economics, LXVI, No. 3, 329 (Aug. 1952).

৭২. দেখুন, The Presidents' Material Policy Commission, Resources for Freedom, U.S. Government Printing Office, 1952, II, Computed from Table II, 180.

যাবে যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ।[৭৩] ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল সময়কালে বিদ্যুত শক্তির ব্যবহার বেড়ে যায় শতকরা প্রয় ৩৫০ ভাগ।[৭৪] উপরোক্ত কমিশন হিসেব-নিকেশ করে মত প্রদান করে যে ১৯৫০–১৯৭৫ পর্বে আমেরিকার দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে গেলে কাঁচামাল ইত্যাদির প্রয়োজন বেড়ে যাবে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগ।[৭৫]

অন্যান্য ধনীদেশেও কাঁচামাল ইত্যাদির চাহিদা সমপরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের জ্বালানী, পেট্রোলিয়াম ও জল-বিদ্যুত শক্তির ভক্ষণ যথাক্রমে শতকরা ৮, ৬৩ ও ৭৫ ভাগ বেড়ে যায়।[৭৬] ক্যানাডায় এই সব জিনিসের খরচ বাড়ে যথাক্রমে শতকরা ৫৪, ১৩৪ ও ৭৬ ভাগ। উক্ত-সময়ে অন্যান্য খনিজ-দ্রব্য যেমন তামা, আকরিক লৌহ, এলুমিনিয়াম, আকরিক ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক ইত্যাদির ব্যবহারও বিশেষভাবে বেড়ে যায়।[৭৭] পূর্বোক্ত কমিশন হিসাব দেয় যে, ১৯৫০–১৯৭৫ সময়পর্বে কাঁচামাল ইত্যাদির চাহিদা পশ্চিম ইউরোপে বেড়ে যাবে শতকরা ন্যূন্যাধিক ৫০ ভাগ এবং ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড ও জাপানে বেড়ে যাবে ৫০ ভাগ অপেক্ষা অধিক।[৭৮]

সুতরাং প্রায় প্রতিটি ধনীদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যেতে বাধ্য। তাহলে ফলাফল কি দাঁড়াবে? ফল দাঁড়াবে এই যে ধনীদেশগুলো অপেক্ষাকৃত অধিক হারে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলোর দ্বারস্থ হয়ে উঠবে। প্রাক-প্রথম মহাযুদ্ধ কালে আমেরিকা খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচামাল দ্রব্যাদির নীট রপ্তনীকারক ছিল, কিন্তু, ১৯২০ দশকে সে এই সকল দ্রব্যাদির নীট আমদানীকারক হয়ে উঠে। সাম্প্রতিক কালে আমেরিকা অত্যাবশ্যকীয় বহু ধাতব দ্রব্যের নীট আমদানী-কারক হয়ে উঠেছে। তন্মধ্যে পেট্রোলিম, তামা, সীসা, দস্তা, আকরিক

৭৩. See ৭২ নং ফুটনোট I, 24.
৭৪. ঐ, III, Table I, 32.
৭৪. ঐ, I, 59.
৭৬. ঐ, III, Computed from Table III, 29.
৭৭. ঐ, II, 186-204.
৭৮. ঐ, J, 59.

লৌহ, তক্তা ইত্যাদি প্রধান। ইউরোপের ললাটেও একই ইতিহাস। ১৯১৩ সালে বিলাতের কাঁচামাল সামগ্রীর রপ্তানী ছিল শতকরা ১৩ ভাগ আর আমদানী ছিল ৩৩ ভাগ। ১৯৫৪ সালে এসে রপ্তানী পরিমাণ ১০ ভাগে নেমে আসে আর আমদানী পরিমাণ ৪১ ভাগে উন্নীত হয়। জার্মানী এবং ফ্রান্সেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কাজেই, সমস্যাটা বেশ ঘোরপ্যাচালো বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আসলে কিন্তু তেমন নয়। ধনী ও দরিদ্র বিশ্বকে পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করলে বরং দেখা যাঁবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ পরিস্থিতি তত জটিল নয় যতটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়।[৭৯] অন্তত: আগামী ২০/৩০ বৎসর অবধি এই সমস্যা ঘোরতর জটিলাকার ধারণ করবে বলে মনে হয় না। বরং বলা চলে যে, সমস্যা অন্যত্র, যথা (১) শিল্পোন্নত দেশ কি তার তৈরীকৃত দ্রব্যের রপ্তানী সেই পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হবে যদ্বারা সে তার ক্রমবর্ধমান কাঁচামাল আমদানী-চাহিদা-ব্যয় মেটাতে পারবে? (২) দরিদ্র বিশ্ব কি তার পর্যাপ্ত কাঁচামাল সম্পদ উন্নয়নে সক্ষম তথা, ইচ্ছুক হবে?

৯. জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি

দরিদ্র দেশে যেমন, ধনী দেশেও মাথাপিছু আয় এবং জনসংখ্যার ঘনত্বে সহজ নিরাভরণ কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নেই।

জনসংখ্যার ঘনত্ব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হতে দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ জন লোক বাস করত, ক্যানাডায় বাস করত ২ জন মাত্র। অথচ বেলিজিয়াম ও বৃটেনে বাস করত যথাক্রমে ২৮৯ জন ও ২৪৫ জন, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করত ২১ জন। জার্মানী ও ফ্রান্সে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৯ ও ৭৮ জন।[৮০]

ধনী দেশগুলোতে বার্ষিক বর্ধন-হারও ভিন্নতর হতে দেখা যায়। ১৯৪০-১৯৫০ দশকে আমেরিকা ও ক্যানাডায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ১৫ ভাগ ও ২১ ভাগ। অথচ এই একই সময়ে বৃটেনে সম্প্রসারিত হয় শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। ফ্রান্সে তারও কম,

৭৯. Mason-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৩৩৭।

৮০. দেখুন, United Nations, Statistical office, Department of Economic Affairs, Statistical Yearbook, 1955, New York, 1955, 21-35.

শতকরা ২ ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন।[৮১] দরিদ্র দেশের চিত্র কিন্তু ভিন্নরূপ। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের আলোচনা স্মরণ করুন। সেখানে আলোচিত হয়েছে যে দরিদ্র বিশ্বে জনসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। যে, ধনী দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক হয়ে জনসংখ্যা সম্প্রসারিত হচ্ছে তদপেক্ষাও অধিক হারে দরিদ্র দেশে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার চেয়েও বড় কথা এই যে, ধনী দেশে ভবিষ্যত বর্ধন হার ন্যূন হয়ে উঠছে। দরিদ্র দেশে কিন্তু, তেমন নয়।[৮২] জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই ধনী দেশে হ্রাস পেয়ে চলেছে, সেই তুলনায় দরিদ্র দেশে এই হার তেমন হ্রাস পাচ্ছে না।

সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে ইউরোপ, এশিয়াভুক্ত সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বিশ্বগড় অপেক্ষা অধিক হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে এসে এই সকল অঞ্চলের বর্ধন হার হ্রাস পেয়েছে আর বাকী বিশ্বের বর্ধন হার বেড়ে গিয়েছে। পরিনাণে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল মধ্যবর্তী সময়ে তথাকথিত "ইউরোপীয় সংস্কৃতি অঞ্চল" ও বিশ্বের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমানুপাতিক হয়ে উঠেছে।[৮৩] এই পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে যেয়ে অধিকাংশ জনসংখ্যা বিশারদ জন্মহার ও মৃত্যুহারে অবনতির ফাঁকের কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন যে, জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস করায় যদিও সমধর্মী শক্তিনিচয় যথা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা বিস্তার ও চিরাচরিত প্রথাগত চিন্তাধারা পরিহার ক্রিয়া করেছে তবু "জন্মহার নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক আচার প্রণালী মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণকারী আচার-প্রণালী অপেক্ষা অধিকতর অনমনীয় দৃঢ়তা বজায় রেখে চলেছিল।"[৮৪] ফলে পরিণামে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়েছে কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এসে এই হার ন্যূন হয়ে পড়েছে।

৮১. দেখুন, Woytinsky ও Woytinsky-এর World Population, পৃঃ ৪৪।

৮২. দেখুন, ত্রয়োদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ।

৮৩. United Nations, Depertment of Social Affairs, Population Division, The Determinants and Consequences of Population Studies, No. 17, New York, 1953, 10-20. এখন থেকে U.N., The Determinantes and Consequences of Population Trends নামে অভিহিত করা হবে।

৮৪. ঐ, পৃঃ ১৫০।

আমেরিকা বৃটেন ও ওয়েলসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার লক্ষ্য করে অধিকাংশ ধনী দেশের বৃদ্ধি হারে মন্থর গতি অবলোকন করা যেতে পারে। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৪১ সময়কালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা প্রতি দশকে গড়ে শতকরা ১৫.৫ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪১-১৯১১ সময় পর্বে এই হার ১১ ভাগ থেকে ১৪ ভাগে উঠা-নামা করে। ১৯৩১-১৯৪১ দশকে বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪.৫০ ভাগ। ১৯৪১-১৯৫১ দশকে নামমাত্র একটু বেড়ে ৪.৭৯ ভাগে উন্নীত হয়।[৮৫] আমেরিকায় ১৮৪০-১৮৬০ সময়কালে বৃদ্ধি হার হয় প্রতি দশকে শতকরা ৩৫ ভাগের মত। ১৮৬০-১৮৯০ পর্যায়কালে এই হার হ্রাস পেয়ে ২৫ ভাগের কাছাকাছি চলে আসে। ১৮৯০-১৯১০ পর্বে আরো হ্রাস পেয়ে ২০ শতাংশের মত হয়ে উঠে। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল সময়কালে দশক প্রতি বর্ধন হার শতকরা ১৫ ভাগের মত হয়। এই পড়তি মাত্রা অব্যাহত থেকে ১৯৩০-১৯৪০ দশকে ৭.২ ভাগে নেমে এসে ১৯৪০-১৯৫০ দশকে বেড়ে গিয়ে ১৪.৫ ভাগে উন্নীত হয়।[৮৬]

যে কালে ইউরোপে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছিল ব্যাপক হারে। ঠিক সেকালে ইউরোপ থেকে বহিরাগমন ঘটেছিল অতি দ্রুত হারে। তারা প্রধানতঃ উত্তর আমেরিকায় যায়। দশম পরিচ্ছেদে একথা বলা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই জন-নির্গম সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে। যুদ্ধাবসানে হঠাৎ করে বাইরে যাওয়া থেমে যায়। অতঃপর নামমাত্র যা নির্গমন ঘটে তা আন্তর্জাতিকভাবে নিষ্পন্ন হয়। বিশেষতঃ ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে কিছুটা যাতায়াত যা ঘটে। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী এই "স্বাভাবিক" জনাগম ঘটে ফরাসী দেশে।[৮৭] আস্তে আস্তে তাও ভাটা পড়ে যায়। ১৯৩০ সালোত্তর কালে এসে তা প্রায় মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানে বহির্গমনাগমন একটু বেড়ে যায় বটে, তবে ১৯২০ দশকের তুলনায় তা তেমন বড়-কিছু একটা নয়।

---

৮৫. দেখুন, I. Bowen-এর Population, James Nisbet & Co., Ltd., London, 1954, 54.

৮৬. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৫১।

৮৭. যুদ্ধ মধ্যবর্তীকালে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানে উদ্বাস্তু ও গলাধাক্কা খাওয়া বহিরাগতদের সংখ্যা অত্যধিক হয়ে উঠে। "অস্বাভাবিক" এই যতায়াতের হিসাব-নিকাশ এখানে দেওয়া হয়নি। তজ্জন্য দেখুন, Woytinsky ও woytinsky-এর world Population, 95-104.

জনসংখ্যার ভবিষ্যত নিয়ে কিছু বলা দূরূহ কাজ। তা হয়ত অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে। ১৯৩০ দশকের শেষভাগে এবং ১৯৪০ দশকের গোড়ার দিকে বহু জনসংখ্যা বিশারদ ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, বর্তমান শতাব্দীর শেষপাদে এসে আমেরিকার লোকখংখ্যা সর্বোচ্চ ১৪০ মিলিয়ন থেকে ১৬০ মিলিয়ন হবে। অতঃপব এই সর্বোচ্চ মাত্রা অতিক্রম করে ২,০০০ সাল নাগাদ পড়তি দেখা দেবে।[৮৮] কিন্তু, তাঁদের ধ্যান-ধারণা নস্যাৎ করে দিযে আমেরিকার লোকসংখ্যা ১৯৫৬ সালের জুলাই মাস নাগাদই ১৬৮ মিলিযনেব সীমা ছাড়িয়ে যায়। আদমশুমারী কর্তৃপক্ষ গণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, ১৯৭৫ সাল নাগাদ আমেরিকার লোক-সংখ্যা হযে দাঁড়াবে ২১৩ মিলিয়নের মত।[৮৯] সাম্প্রতিক কালের বহু হিসাব-নিকাশ বৃটেনেব জনসংখ্যা নিয়ে মত ব্যক্ত করতে যেয়ে মন্তব্য করেছে ১৯৭৫ সাল অবধি বৃটেনের লোকসংখ্যা ১৯৫০ সালের মতই থাকবে।[৯০] ১৯৪৬ সালে হিসাবকৃত তালিকা অনুযাযী ফ্রান্সের লোক-সংখ্যা ১৯৭৫ সাল নাগাদ ৩১.৪ মিলিয়ন থেকে ৪৩.৮ মিলিযনের মত হয়ে দাঁড়াবে।[৯১]

ধনী ও দরিদ্র দেশের লোকসংখ্যায় একটা উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরি-লক্ষিত হয়। ধনী দেশের লোকদের গড় বয়স অধিক হতে দেখা যায়। ১৮৭০ সালে আমেরিকার জনশক্তির বয়সের মধ্যমা ছিল ২০ বৎসর। ১৯০০ সাল নাগাদ তা ২৩ বৎসরে উন্নীত হয়। ১৯৫৩ সালে এসে মধ্যমা ৩০ বৎসরেব সীমা ছাড়িয়ে যায়।[৯২] বৃটেনেও সমপরিমাণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯১ সালের ২৭ বৎসবের গড় ১৯৪৭ সালে ৩৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে এসে দাঁড়ায়।[৯৩] তেমনি ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও সুইডেনের জনসংখ্যার পিরামিড অর্থাৎ কিনা বযস-সীমার পরিমাপে

৮৮. J. S. Davis-এর "Our Changed Population outlook, American Economic Review XLII, No 3, 305-308 (June, 1952)

৮৯. New York Times, August 8, 1956, 27.

৯০. Bowen-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ২০০-২০১।

৯১. U.N. The Determinants and Consequences of Population Trends, 155.

৯২. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৬৩।

৯৩. দেখুন, Royal Commission on Population, Report, Cmd. 7695, H.M. S.O., London, 1949. 12.

বিভিন্ন গ্রুপের লোকসংখ্যার শতকরা হার উচ্চতর বয়স-সীমার দলে অপেক্ষাকৃত অধিক হয় এবং নিম্নতর বয়স-সীমার দলে ন্যূন হয়ে উঠে।[১৪] জনসংখ্যা বিষয় পারদর্শী পণ্ডিতগণ অভিমত প্রদান করেন যে আগামী বেশ কয়েক দশক এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে।[১৫]

ধনী দেশের লোকেরা অধিক স্বাস্থ্যবান তেমনি শিক্ষা-দীক্ষায়ও অধিক অগ্রগামী। স্বাস্থ্যগত উন্নতির কারণে তাদের আয়ুর-ফিতা (life expectancy) দীর্ঘতর হয়। উদাহরণ হিসাবে আমেরিকা ও বৃটেনের কথা ধরুন। বৃটেন ও আমেরিকা বাসীদের আয়ু-সীমা ১৯০০ সালের ৪৮ বৎসর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সালে ৬৫ বৎসরে উন্নীত হয়। গত কয়েক দশকে শিক্ষার মানও অনেক উন্নত হয়। ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার ঘটে। ১৯১০ সালে ৫ থেকে ১৯ বৎসর বয়স্ক শতকরা ৬২.৬ ভাগ আমেরিকান ছেলে মেয়ে স্কুলে যেত। ১৯৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৭৮.৭ ভাগে উন্নীত হয়।[১৬] প্রথম মহাযুদ্ধে সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী সৈনিকদের ৪.১ শতাংশও ১.২ শতাংশ মাত্র যথাক্রমে স্কুল ও কলেজসীমা ডিঙ্গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এসে এই সংখ্যা যথাক্রমে ২৩.৩ শতাংশ ও ৩.৬ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়।[১৭]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতি ও জনসংখ্যা হিসাবে শ্রমশক্তির অনুপাতে সরল রৈখিক কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়না। শ্রমশক্তির এই অনুপাত অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। জনশক্তির বয়স ও যৌনভিত্তিতে ভাগ, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, স্ত্রী জাতীকে কর্মী হিসাবে দেখার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে যাওয়ার বয়সকাল, বৃদ্ধ লোকদের কর্মজীবন থেকে অবরস নেয়ার কাল, জনস্বাস্থ্য, চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি, শ্রমক্তিকে পরিসংখ্যান তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার রীতিনীতি ইত্যাদি বহু বিচিত্র ঘটনা সংমিশ্রিত হয়ে তবে এই অনুপাত সীমা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।[১৮]

---

১৪. Woytinsky & Woytinsky-এর World Population. 60.

১৫. United Nations, the Determinants and Consequences of Population Trends,253.

১৬. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৩৭৯।

১৭. ঐ পৃঃ ৩৮০।

১৮. দেখুন, United Nations-এর The Deterninants and Consequences of Population Trend, Chapter II.

আমেরিকায় বিচিত্রতর এই সব শক্তিনিচয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমশক্তির অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। লোকসংখ্যা হিসাবে ১৮৭২ সালের শতকরা ৩২.৫ ভাগ শ্রমশক্তি ১৯৫০ সালে ৪২.০ ভাগে উন্নীত হয়। অবশ্য শতকরা বৃদ্ধি সমানুপাতিক হারে সাধিত হয়নি। আনুক্রমিক (successive) দশকে তা নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করে এগিয়েছে এবং ১৯৫২ সালে অনুপাত ৪১.৭ ভাগে নেমে এসেছে। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে শিশু-শ্রম গুরুত্ব হারিয়েছে আর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অবসর গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়েছে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে শ্রমশক্তির আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে। অন্যপক্ষে, জনশক্তির বয়সসীমা বর্ধিত হওয়ার ফলে অনুপাত বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।[৯৯] অবশ্য বয়স-সীমা বেড়ে যেয়ে বিপরীত ক্রিয়াও ঘটাতে পারে অর্থাৎ শ্রম-অনুপাত কমিয়ে দিতে পারে। তেমনটা ঘটে 'নির্ভরশীল বৃদ্ধ-লোকদের' দল ভারী হয়ে উঠলে, অর্থাৎ যদি অতি-বৃদ্ধ লোকদের সংখ্যা অত্যধিক হয়ে যায় এবং তারা উৎপাদনশীল কর্মীদের উপর অধিক হারে নির্ভরশীল হয়ে উঠে। অথচ শিশুশক্তি তেমন হারে মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়ে। তার ফলে যে বৈষম্যের উদ্ভব ঘটে সেই ফাঁক শ্রমশক্তির অনুপাতে হ্রাস ঘটিয়ে দিতে পারে।

অন্য যে বিষয় দ্বিরায়তনিক পরিসরে জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমশক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে অধিক হারে মেয়ে-কর্মীর কর্মজগতে অনুপ্রবেশ। ১৯০০ সালে এবং ১৯৫০ সালে দশম বর্ষব্যাপী শতকরা হিসাবে পুরুষ শক্তির যথাক্রমে ৭৮.৯ ভাগ ও ৭৫.৩ ভাগ কর্মে নিযুক্ত ছিল। উক্ত সময়ে এবং একই পরিমাপে মেয়েকর্মীর সংখ্যা ১৯.৫ থেকে ২৯.৪ ভাগে উন্নীত হয়। তাতে করে সাকুল্য শ্রমশক্তিতে মেয়েকর্মীর সংখ্যা শতকরা ১৮.৮ ভাগ থেকে ২৮.৫ ভাগে উন্নীত হয়।[১০০] ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতা জিয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়।

১৮৬১ সাল থেকে ১৯০১ সাল মধ্যবর্তী সময়ে লোকসংখ্যার তুলনায় বৃটেনের কর্মনিরত জনসংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। অতঃপর ১৯০১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল সময়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১০১] ১৫ বৎসর থেকে

৯৯. Dewhust-এর প্রাগুক্ত বই, পৃ: ৬৩।
১০০. ঐ, পৃ: ৭২৬।
১০১. দেখুন, **Royal Comission on the Distrbuntion of the Industiral Population Report, 1940.**

৬৫ বৎসর বয়সের কর্মীসংখ্যা শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্ন থেকে ১৯40 সাল অবধি বৃদ্ধি পায়। তারপর এসে কিন্তু কিছুটা নেমে যায়। এই অনুপাত ১৯০১ সালে ছিল ১.৬৯,১৯৩১ সালে ২.১৫, ১৯৩৯ সালে ২.২৮, ১৯৫১ সালে ১৯৫১ এবং ১৯৫৩ সালে কমে যেয়ে ১৯.৯৬ হয়ে দাঁড়ায়।[১০২] রাজকীয় কমিশনের এক হিসাবে ১৯৭৭ সাল নাগাদ এই অনুপাত ১.৭৯ থেকে ১.৯৬ হয়ে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়।[১০৩]

আমেরিকা ও বৃটেনের শ্রমশক্তির দিকে তাকালে একটা পার্থক্য কিন্তু অতি সহজে ধরা পড়ে। আমেরিকার তুলনায় বৃটেনে মেয়েকর্মীর সংখ্যা তেমন বড় একটা বাড়েনি; ১৯১০ সাল থেকে ১৯৫১ সাল সময় কালে। ১৯১১ সালে যেমন বৃটেনে মেয়েকর্মীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ জনের মত ১৯৫১ সালেও এই সংখ্যা তেমনই থাকে।[১০৪] ইউরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশেও ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি এই অবস্থায় বড় একটা পরিবর্তন ঘটেনি।[১০৫]

উন্নত দেশগুলোতে শ্রমিকের ঘন্টা প্রতি ফলন বেশ বেড়ে যায়। উৎপাদিকা শক্তির এই বৃদ্ধির সাথে সমতা রেখে কর্ম-সময় কমে আসে। যেমন আমেরিকার কথা ধরুন। ১৮৫০ সালে আমেরিকার সাপ্তাহিক কর্মসময় ছিল ৭২ ঘন্টা। ১৯১০ সালে তা ৫৪ ঘন্টায় নেমে আসে। ১৯৩০ সালে আরো হ্রাস পেয়ে ৪৮ ঘন্টায় এসে উপস্থিত হয়। ১৯৫৩ সালে আরো কমে গিয়ে ৪০ ঘন্টায় স্থিরীকৃত হয়। ইউরোপীয় দেশগুলোতেও তাই ঘটে। ১৮৫০ সালের ৮৪ ঘন্টা থেকে ১৯৫০ সালে ৪৮ ঘন্টায় নেমে আসে। The Presidents Material Conmission ভবিষ্যদ্বাণী যে ১৯৫০-১৯৭৫ সময়কালে কর্মসময় শতকরা প্রায় আরো ১৫ ভাগে নেমে আসবে।[১০৬] কমিশন বৃটেন ও "মুক্ত" ইউরোপ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয় যে ১৯৭৫ সাল নাগাদ তাদের কর্মসময়ে শতকরা আরও ১০ ভাগ হ্রাস ঘটবে।

---

১০২. দেখুন, Central Statistical Office, Annual Abstract of Statistics, No 19, 1954, H.M. S.o. London, 1954, Table 7, 7.

১০৩. Royal Comission on Population, Report, 1949,84-85.

১০৪. Central Statistical Office-এর প্রাগুক্ত Abstract, Table 13, 15.

১০৫. Woytinsky & woytinsky-এর World Population, 354.

১০৬. Presidents Material Commission-এর প্রাগুক্ত রিপোর্ট II, III, 131.

শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার দিয়ে উন্নয়ন-অগ্রগতির হার প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ শ্রমশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারে উন্নয়ন অগ্রগতি তরান্বিত হয়। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল সময় কালে বৃটিশ শ্রমিক সংঘগুলোতে বেকারত্বের হার শতকরা ২ ভাগ থেক ৮ ভাগে উঠানামা করে (অবশ্য ১৮৭৯ সালের কথা বাদ দিয়ে। ঐ সালে বেকারের পরিমাণ ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়)।[১০৭] দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে কিন্তু বেকারের-মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কেবল মাত্র এক বৎসরেই (১৯২৭ সালে) সাধারণ বেকারের হার শতকরা ১০ ভাগ অপেক্ষা অধিক হয়ে যায়। তন্মধ্যে ৭ বৎসব এই মাত্রা ১৫ শতাংশের সীমা ছাড়িয়ে যায়।[১০৮] যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশও তেমন সুখে কাল কাটাতে পারেনি। প্রায় সব দেশে কম-বেশী কিছু না কিছু বেকারত্ব প্রকট হয়ে উঠে।[১০৯] আমেরিকার অবস্থাও তেমন সুখপ্রদ ছিল না। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি আমেরিকায় বেকারের মাত্রা শতকরা ২ ভাগ থেকে ৬ ভাগে উঠানামা করে (১৯২১ সালে অবশ্য তা ১১ ভাগের সীমা ছাড়িয়ে যায়।[১১০] ১৯৩০ দশকে এসে অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বেকারত্বের ছড়াছড়ি দেখা দেয়। প্রতি বর্ষে তা শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ বা তদূর্ধে হয়ে উঠে। ১৯৪০ সাল নাগাদ এই ধারা অব্যাহত থাকে। তন্মধ্যে চার বৎসর আবার ২০ ভাগের সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়।

১৯৪৮–১৯৫৫ সময়পর্বে ধনীদেশগুলোতে মোটামুটি পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি বজায় ছিল। কোন দেশেই বেকারত্ব বড় একটা ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের মাত্রা শতকবা ৫ ভাগের কাছাকাছি ছিল। উল্লিখিত ৭ বৎসরের মধ্যে ৫ বৎসর বেকারত্বের মাত্রা শতকরা ৪ ভাগেরও কম ছিল।[১১১] বৃটেনে বেকারত্বের মাত্রা কোন বৎসরই শতকরা ২.১-এর অধিক হয়নি।

---

১০৭. দেখুন, W.H. Beveridge-এর Full Employment in a Free Society, W.W. Norton and Co., New York, 1945, 42.

১০৮. ঐ. পৃ: ৪৭, সারণী ১।

১০৯. Svennilson-এর পূর্বোক্ত পুস্তিকা, সারণী ৩, পৃ: ৩১।

১১০. দেখুন, W.S. Woytinsky ও Associates প্রণীত Employment and wages in the United States, The Twenteth Century Fund, New York, 1953,397.

১১১. দেখুন, Statistical Office of the U.N. Monthly Bulletin of Statistics, X, No. 6, 18-20 (June, 1956)

গত ৫০ বৎসরে শ্রমিকের মানমর্যাদা বেশ উন্নত হয়েছে। শিল্প অগ্রগতির সাথে সমতা রেখে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদমর্যাদা বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি দিয়ে এই মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করা যায়। ২৩·১৩ নম্বর সারণী লক্ষ্য করুন। একদিকে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, আপেক্ষিকভাবে অদক্ষ শ্রমিকের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে, আধাদক্ষ শ্রমিক, কেরানীকুল ও পেশাগত শ্রমিকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪০ সাল নাগাদ শ্রেণী-বিভাগ পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে বটে তবে আধাদক্ষ শ্রমিক, কেরানীকুল ও পেশাগত শ্রমিকের কর্মের মর্যাদা যে ক্রমেই বেড়েছে একথা ১৯৪০ থেকে ১৯৫৩ সালের পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১১২]

---

১১২. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৭৩১।

সারণী ২৩.১৩ :

লাভজনক কর্মেরত কর্মী ও শ্রম-শক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কর্মীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদমর্যাদা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯১০, ও ১৯৪০।*

(শতকরা হিসাবে)

	১৯১০ (লাভজনক কর্মেরত কর্মী)		১৯৪০ (শ্রমশক্তি)	
পেশাধারী ব্যক্তি	৪.৪		৬.৫	
মালিক, কার্যনির্বাহী ও অফিস কর্মচারী	২৩.০		১৭.৪	
কৃষককুল ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ		১৬.৫		১০.১
অন্যান্য		৬.৫		৭.৫
কেরাণীকুল ও সমগোত্রীয় কর্মী	১০.২		১৭.২	
দক্ষকর্মী ও কর্মনায়ক	১১.৭		১১.৭	
আধাদক্ষ কর্মীকুল	১৪.৭		২১.০	
অদক্ষ কর্মীকুল	৩৬.০		২৫.৯	
কৃষি-শ্রমিক		১৪.৫		৭.৯
অন্যান্য শ্রমিক		১৪.৭		১০.৭
ভৃত্য		৬.৮		৮.০
মোট :	১০০.০		১০০.০	

* ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শ্রমিক ও ১৯৪০ সালের জন্য নূতন শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। † 'লাভজনক কর্মেরত কর্মী' কথাটা 'শ্রমশক্তি' কথাটা অপেক্ষা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন **U.S. Bureau of Census, Comparative Occupation Statistics for the U.S. 1870 to 1940, U.S. Govt Printing Office Washington, 1943, 11-16.**

উৎস: **J.F. Dewhurst & Associates, America's Needs & Resources, A new survey The Twentieth Century Fund, New York 1955, 730.**

অধিকাংশ ধনীদেশকে 'শ্রম-ভিত্তিক' অর্থনীতি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তার অর্থ কেবল এই নয় যে, দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনী-দেশে মালিকপক্ষ অল্প পরিমাণে স্বীয়কাজে নিরত। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ কথা এই যে, ধনীদেশের শ্রম-শক্তি বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে পরিগণিত। শ্রম-সঙ্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে আজকের শ্রমিক রীতিমত একটা কেউকেটা ক্ষমতার আঁধার। ব্যবসা যেমন বৃহদাকার তেমনি শ্রমিক ও 'বিরাট সুসম্পন্ন'। Galbraith-এর ভাষায় বলা যায় "শ্রমিক তার শ্রম বিকাতে যেয়ে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সম্মুখীন হয় তথা অসংখ্য বিক্রেতা অথচ গুটিকতক ক্রেতার মধ্যে যে অসম প্রতিযোগিতা তাই তাকে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে, স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে।"[১১৩]

১৯৫৫ সাল নাগাদ আমেরিকায় শ্রম ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১৭.৭ মিলিয়ন। তা মোট বেসামরিক শ্রম-শক্তির ২৭ শতাংশের সমান হয়।[১১৪] ১৯৫২ সালে বৃটেনের মোট শ্রমিকের ৪০ শতাংশ ইউনিয়ন আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। শতকরা হিসাবের এই মাত্রা দেখে হয়ত ধারণা জন্মাতে পারে যে, তা আর এমনকি! আসলে কিন্তু, মোট হিসাবের আড়ালে শিল্পজগৎ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহের শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধতা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শিল্প ও জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যাবলী বেশ বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় কৃষি, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, কলমপেষা ও পেশাগত কাজে শ্রমিক আন্দোলন তেমন শিকড় গেড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের এক হিসাব মতে আমেরিকার শিল্প কারখানায় শতকরা প্রায় ৮৬ জন শ্রমিক শ্রম-সঙ্ঘের সভ্য হয়ে উঠছে। এই সমস্ত শিল্পের মধ্যে রয়েছে কৃষিযন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্প, উড়োজাহাজ শিল্প, মোটরযান শিল্প, বস্ত্রশিল্প, বিদ্যুৎ-যন্ত্রপাতি শিল্প, ইস্পাত শিল্প, রেলপথ, রাজপথ, মাংস প্যাকেট করার শিল্প ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে বৃটেনের প্রধান প্রধান শিল্পগুলোতে ইউনিয়নভুক্ত

---

১১৩. দেখুন J.k. Galbraith-এর **American Capitalism, Houghton Mifflin Co., Boston, 1952, 121—122.**

১১৪. **U.S. Department of Labour, Bureau of Labour statistics, Bulletin No. 1185, "Directory of National and International Labour Unions in the United States, 1955," U.S. Government Printing office, Washington, 1955, 9.**

শ্রমিকসংখ্যা এইরূপ হয়: কয়লাশিল্পে শতকরা ৭৯ ভাগ, পরিবহন ও জাহাজ শিল্পে ৮৪ শতাংশ, বস্ত্রশিল্পে শতকরা ৬১ ভাগ, পশম শিল্পে ৫৯ শতাংশ, ধাতব ও প্রকৌশলিক শিল্পে শতকরা ৫২ ভাগ এবং প্রশাসনিক-ক্ষেত্রে শতকরা ৫৭ ভাগ।[১১৫] অন্যান্য দেশগুলোতেও শ্রম ইউনিয়ন কার্যাবলী ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। ১৯৫০ সালে শিল্প, নির্মাণ ও পরিবহন কাজে নিরত শ্রমিকের প্রায় ৯৫ ভাগ ইউনিয়নভুক্ত হয়ে উঠে, সুইডেন দেশে। ডেনমার্ক ও নরওয়েতে এই পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় ৯০ শতাংশের মত।[১১৬]

শ্রম-সঙ্ঘগুলোতে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতাও প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার ২০০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম ইউনিয়নের মাত্র ১৫টিতে অর্ধেকেরও অধিক শ্রমিক জড়ো হয়। হিসাবটি ১৯৫০ সালের জন্য।[১১৭] ডেনমার্কের ৫৩টি জাতীয় ইউনিয়নের মাত্র তিনটি ১৯৪৯ সালে শতকরা ৫৩ জন শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[১১৮]

১০. প্রযুক্তিবিদ্যা

একদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে ধনীদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার প্রযুক্তিক জ্ঞানের গতিশীলতাকে চিহ্নিত করতে হয়। দরিদ্র দেশের তুলনায় ধনীদেশের আঙ্গিকগত অগ্রগতি যেমনি চমৎকৃত তেমনি চলমান। শিল্প বিপ্লবকালে যে অভাবনীয় প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধিত হয় তা নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অকল্পনীয় উদ্ভাবন-আবিষ্কার শুরু হয় তার রেশ বিংশ শতাব্দীতে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল কয়লা ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যুৎ, আভ্যন্তরীণ দহনইঞ্জিন ও রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আগামী ৫০ বৎসর আণবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশে কাটবে বলে আশা করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আমেরিকার বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা

১১৫. দেখুন, W. Galenson সম্পাদিত Comparative Labour Movements, Prentice Hall, New York, 1952, Table 2, 28.

১১৬. ঐ, পৃঃ ১১৯।

১১৭. Woytinsky ও Associate-এর প্রাগুক্ত-বই, ৫৪ নম্বর সারণী থেকে হিসাবকৃত। পৃঃ ৬৪৩-৬৪৬।

১১৮. Galenson সম্পাদিত প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ১২২।

১ মিলিয়ন কিলোওয়াট থেকে ৬৩ মিলিয়ন কিলোওয়াটে বর্ধিত হয়।[১১৯] বিদ্যুৎ শক্তির এই ব্যাপক উৎকর্ষের ফলে তা শিল্পক্ষেত্রে প্রধানতম জ্বালানি হয়ে উঠে। ১৮৯৯ সালে যেখানে আমেরিকান শিল্পে শতকরা অনূর্ধ্ব ৫ ভাগ অশ্বশক্তি সরবরাহ হত বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিনে সেখানে ১৯৫০ সালে প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে।[১২০] গত ৫০ বৎসরে বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে, ইস্পাত, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি অনেক জটিল শিল্পকাজে তার ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়ে চলেছে। তেমনি আলোর উৎস হিসাবে তার ব্যবহার ঘটছে সর্বত্র। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও হিমায়ন কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিদ্যুৎ শক্তির প্রসারের সাথে সাথে বেতার, দূরবীক্ষণ, কম্পিউটার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই সবই বর্তমান শতাব্দীর দান।

আভ্যন্তরীণ-দহন-ইঞ্জিন আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দীর একটা চমকপ্রদ ঘটনা। এই ইঞ্জিনের কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। গ্যাসোলিন, ডিসেল ও টার্বোজেট ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে পরিবহনক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মোটরগাড়ী ও উড়োজাহাজ আজকের দিনে সাদামাঠা ব্যাপার। এগুলো প্রায় সাধারণ পরিবহনের পর্যায়ে চলে এসেছে। তা সম্ভব হয়েছে উন্নততর ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে। শুধু তাই নয়, এই যে বহুল পরিচিত রেলগাড়ী সেও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মোহ কাটিয়ে ডিজেলচালিত ইঞ্জিনকে আপন করে নিয়েছে। আভ্যন্তরীণ-দহন ইঞ্জিন চালু হওয়ার ফলে কৃষিকল ও অন্যান্য জটিলাকার কৃষি-যন্ত্রপাতি চালানো সহজ হয়েছে। রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর নির্মাণে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বহনযোগ্য হাল্কা যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সুযোগ হয়েছে। এই ইঞ্জিন আবিষ্কৃত না হলে এই সকল অগ্রগতি সম্ভব হত কিনা সঠিক করে বলার জো নেই।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে রসায়ন বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রঞ্জন-সামগ্রী, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। এইসব কিছু রসায়ন শাস্ত্রের অবদান। ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার-পদ্ধতি নবরূপ লাভ করে

১১৯. Dewhurst-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৮৫৭।

১২০. ঐ, পৃঃ ৮৫৭।

চলেছে। নব নব উন্নততর পন্থা আবিষ্কৃত হচ্ছে। তাতে করে প্রযুক্তিক জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়ে চলেছে।

সুতরাং, বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়জয়কার ঘোষিত হচ্ছে। উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ অসংখ্য অগ্রগতির নামমাত্র কয়টি উদাহরণ মাত্র। পরিচালন-পদ্ধতি উন্নততর হয়ে চলেছে। নব নব বন্টনপন্থা আবির্ভূত হচ্ছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। উন্নততর যান্ত্রিক-প্রণালী প্রবর্তিত হচ্ছে। আগামী ৫০ বৎসরে আণবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তা শিল্পকাজে ব্যবহৃত হয়ে অর্থনীতিকে আরও চেতনাসম্পন্ন করে তুলবে আশা করা যায়।

প্রযুক্তি-বিদ্যার দিগন্তে অপর উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে ব্যাপক গবেষণা কাজ। সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা খাতে আমেরিকা ব্যয় করে ৩ বিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে ১.২ বিলিয়ন ডলার শিল্পগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যয় হয়। সরকারী খাতে (প্রধানত: প্রতিরক্ষা বিভাগ ও আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক) ব্যয় করা হয় ১.৬ বিলিয়ন ডলার আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যয় করে .২ বিলিয়ন ডলার।[১২১] ১৯৫৪ সাল নাগাদ গবেষণা খাতের ব্যয় লম্ফ দিয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। অথচ ১৯৩৮ সালে এই খাতে ব্যয় করা হত মাত্র আধা-বিলিয়ন ডলার।[১২২] সুতরাং, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিল্প গবেষণা ও প্রযুক্তিক অগ্রগতি পাশাপাশি উন্মার্গগামী হয়ে ছুটেছে।

---

১২১. The President's Material Policy Comission প্রদত্ত প্রাগুক্ত রিপোর্ট, I, পৃ: ১৪১।

১২২. New York Times, January 22, 1956, Section 3, F-1.

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

উন্নতি-অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শর্তসমূহ

গেল অধ্যায়ে বর্ণিত ধনী দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং অগ্রগতি ধারার বৈশ্লিষিক জ্ঞানের আলোতে অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতি বজায় রাখার সাধারণ সূত্রসমূহ বিবৃত করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় এই শর্তসমূহ চারটি শিরোনামায় আলোচনা করা হবে, যথা (১) প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও মূলধন সংগঠন, (২) প্রাকৃতিক সম্পদ, (৩) লোকসংখ্যা এবং (৪) সম্পদ নমনীয়তা।

১. প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও মূলধন সংগঠন

ধনী দেশে লোকসংখ্যা অপেক্ষা মূলধনী সামগ্রী বেড়ে চলেছে অধিকতর দ্রুত হারে। ক্রমবর্ধমান এই মাথাপিছু পুঁজিসামগ্রী জনপ্রতি আয় বর্ধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে প্রযুক্তিক অগ্রগতি যথাবিহিত হারে সম্প্রসারিত না হলে মূলধনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্র কার্যকরী হয়ে উঠে।[১] আর ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী হয়ে উঠলে মূলধন সংগঠন প্রথা ব্যাহত হয়।

প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি থেমে গেলে আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মূলধন সংগঠন কি হারে হ্রাস পাবে তা সঠিক করে বলা মুশকিল। লগ্নীকারক অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক ঝুঁকি বহন করে থাকে, এদিকে উন্নত বাজার-ব্যবস্থা বিদ্যমান অর্থনীতিতে দর ঋজুবদ্ধতাও বেশ অনড়। এমতাবস্থায়, নয়া ক্লাশিক্যালবাদী বর্ণিত ক্রমিক ও মসৃণ পথে অর্থনীতি স্থবির পর্যায়ে নেমে আসবে—একথা মনে করা অনুচিত। বরং নির্বন্ধ (Persistent) ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা সত্ত্ব তাড়াতাড়ি নীট বিনিয়োগে বিরামরেখা টেনে দিতে পারে। অর্থাৎ নয়া ক্লাশিক্যাল মতবাদী যে সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে

১. প্রাকৃতিক সম্পদে বৃদ্ধি প্রযুক্তিক অগ্রগতির নামান্তর হিসাবে বিবেচিত হয়।

নীট বিনিয়োগ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। আর লগ্নীক্রিয়া শিথিল হয়ে উঠলে মারাত্মকধর্মী বেকার সমস্যা জন্ম নিতে পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অবশ্য মূলধনের ক্রমহ্রাসমান পড়তি কিছুটা রোধতে পারে। তবে অধিকাংশ ধনীদেশে অবস্থা যেমন তাতে হয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব বেশী করে হলেও ততটুকু লগ্নী প্ররোচিত করতে পারে যাতে করে হয়ত মাথাপিছু আয়ের পড়তি রোধ হতে পারে। এর অধিক নয়। অবশ্য এই সব ব্যাপারে শেষ কথা বলার সুযোগ একেবারেই অনুপস্থিত। যে যাই হউক, যদি মেনে নেয়া হয় যে প্রযুক্তিক অগ্রগতির অনুপস্থিতিতে নীট বিনিয়োগ সরাসরি পড়ে যেতে বাধ্য, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকৌশলিক অগ্রগতি সাধন করে যেতে হবে। অন্যথায়, মাথাপিছু আয়ের উর্ধ্বমুখী গমনাগমন অপেক্ষকৃত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে থেকে যেতে বাধ্য। তেমনি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বেকার সমস্যা জন্ম নেয়া অবধারিত।

সুতরাং, মন্তব্য করা যায় যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্রের ধীরপ্রবাহী নিরবচ্ছিন্ন ধারা রোধতে হলে যথাবিহিত হারে প্রযুক্তিক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সুষ্ঠু উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রযুক্তিক অগ্রগতি এমন দ্রুত ও সুদৃঢ় হারে নিষ্পন্ন হতে হবে যেন তা হ্যারড-ডোমার বর্ণিত অনমনীয় শর্তাবলী পূরণে সক্ষম হয়। হ্যারড-ডোমার বিশ্লেষণে নমনশীলতা বলে কিছু নেই। ফেলনারের মুখে শুনুন, তিনি বলেন, হ্যারড-ডোমার বিশ্লেষণে "[উৎপাদকের] আপেক্ষিক অংশীত্বে অনুক্ত নিত্যতা এবং অগ্রগতির প্রয়োজনীয় সুদ-যোগ-মুনাফা হারের অনুক্ত নিত্যতা এমন এক মডেল নির্মাণের কথা বলে যাতে অগ্রগতি নিশ্চিত হইতে পারে কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি ইউনিটে প্রয়োজনীয় মূলধনের ধ্রুব (বর্ধনশীল নয়) পরিমাণ দিয়ে।......হ্যারড-ডোমার মডেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্র প্রতিরোধকারী শক্তিবর্গকে প্রতি ইউনিট নূতন লগ্নীর উৎপাদন-বৃদ্ধি সমপর্যায়ে ধরে রাখতে হবে, সেই সময়ে যখন সাকুল্য নূতন লগ্নী সমগ্র সঞ্চয় পরিমাণকে আত্মস্থ (absorb) করে নিতে পারবে। তাঁদের চোখে সুষ্ঠু অগ্রগতির ইহাই একমাত্র শর্ত।"[২]

মূলধন সংগঠন সম্পর্কে নয়া-ক্লাশিক্যালবাদীর মত অনেকটা ভিন্নরূপ। নয়া ক্লাশিক্যাল মডেলে প্রচুর নমনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে

---

২. W. J. Fellner-এর Trends and Cycles in Economic Activity, Henry Holt & Co., New York, 1956, 144.

নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিক অগ্রগতির অনুপস্থিতিতে বাধাহীন অগ্রসর ঘটতে পারে।[৩] পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি বিরাজমান অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি পেতে তেমন অন্য শর্তের প্রয়োজন পড়ে না। অনেকাংশে শিথিল অবস্থাতেও অবিরাম বর্ধন সাধিত হতে পারে। সুদের হার ও মজুরী হার এমনভাবে সাড়া দেয় যে তাতে পূর্ণ চাকুরী সংস্থান অগ্রগতি পেতে হ্যারড-ডোমার মডেলে প্রয়োজনীয় মূলধন উৎপাদন অনুপাত ও সঞ্চয় আয় অনুপাত সহজেই পাওয়া যায়।

তবে হাঁ, এই দুই প্রান্ত-সীমার মধ্যবর্তী পরিস্থিতি অধিকতর বাস্তব বলে মনে হয়। অর্থাৎ, হ্যারড-ডোমার ও নয়া ক্লাশিক্যাল মতবাদের কাঠিন্য বর্জন করে এই উভয়ের মধ্যবর্তী কিছু একটা গ্রহণ করতে পারলে তা অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে পারে। স্বল্পায়ত পরিসরে হ্যারড-ডোমার অধিকতর ফলপ্রসূ হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু, সময় দিগন্ত প্রসারিত করে দিলে তাঁদের মতামত সীমা সরহদের প্রান্তে সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে মোটামুটি সুষ্ঠু অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু এই সীমা-চৌহদ্দি নয়া ক্লাশিক্যাল মতাদর্শীদের ন্যায় তেমন বিস্তৃত নয়। কাজেই, নিরবচ্ছিন্ন সুষ্ঠু অগ্রগতি ধারা বজায় রাখায় দ্রুত হারে প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধন আবশ্যকীয় বলে মনে হয়।

ধনীদেশগুলোতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়কি যদ্বারা মন্তব্য করা চলে যে, সাম্প্রতিক কাল অপেক্ষা ভবিষ্যতে প্রযুক্তিক সম্প্রসারণ অধিকতর দ্রুতহারে সম্পাদিত হবে? এই সম্পর্কে সুম্পিটার একটা মত তুলে ধরেছেন।[৪] তাঁর মতে "প্রযুক্তিক অগ্রগতি ক্রমাগত হারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ দলের ক্রিয়া হয়ে উঠছে। তাঁরা প্রয়োজনানুসারে কলাকৌশল আবিষ্কার করছেন এবং আকাঙ্ক্ষিত পথে তা কর্মশীল করে তুলছেন।" তাঁর এই মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করছেন।

গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশে ক্ষুদ্র একক বাণিজ্য ইউনিট বিস্তৃত গবেষণা কার্যে লিপ্ত হতে পারে না। ফলে প্রযুক্তিক অগ্রগতি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একক বাণিজ্য সংস্থা ব্যয়বহুল সুষম ও বিচিত্র-ধর্মী গবেষণা কর্মক্রম চালাতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ

---

৩. অবশ্য সুদের হার নীট সঞ্চয়ে উস্কানি প্রদায়িনী হতে হবে।

৪. দেখুন, Schumpeter-এর Capitalism, Socialism and Democracy, second edition, Harper and Brothers, New York, 1947,132.

নিয়োগ করতে পারে না। তাদের পক্ষে ব্যয়ভার বহন করা দুষ্কর হয়ে উঠে। এদিকে অনেককাল ধরে অধিক মুনাফা অর্জনেরও সুযোগ নেই। কারণ, প্রতিযোগিতা বিদ্যমান বাজারে সংরক্ষণ ব্যতিরেকে একাধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। কাজেই, গবেষণা কাজে যে ঝুঁকি বিদ্যমান তা সহ্য করা একক বাণিজ্য সংস্থার কর্ম নয়।

বৃহৎ বাণিজ্য কিন্তু এই ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে। তেমনি ব্যয়ভার স্কন্ধে ধারণ করতে পারে। বৃহৎ বাণিজ্য তার লাভ-লোকসানের পরিমাপে ধারাবাহিক সুষ্ঠু গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।[৫] গবেষণা ব্যয়কে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে এবং তা সতত প্রবহমান খরচা হিসাবে পরিগণিত করে নিতে পারে। হয়ত একক কোন গবেষণা প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বৃহদাকার ব্যাপক অনুসন্ধান প্রকল্প চালানো সম্ভব হলে পরে মোটামুটি ফলাফল ও তৎ-উৎসারিত লাভালাভের ভাগী হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

অন্যরা অবশ্য বলেন যে, ধনী দেশগুলোতে একাধিকারিক প্রতি-যোগিতা বিদ্যমান হেতু বরং প্রযুক্তিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এনিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। নাত্যধিক বিক্রেতারও ব্যবসায় (oligopolistic industries) অত্যধিক ক্ষমতা বিরাজমান হেতু একদিকে যেমন লগ্নীতে মন্দাভাব দেখা দেয় অন্যদিকে তেমনি বিনিয়োগে গড়্বড়্ ঘটে যায়। কেননা তা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে অপেক্ষাকৃত স্বল্প উৎপাদনী খাতে প্রবাহিত করে।

লোকসংখ্যা বর্ধনে পড়তিকে অনেক প্রযুক্তিক অগ্রগতির বাধা হিসাবে চিত্রায়িত করেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে অনেকের মতে, জনসংখ্যায় বৃদ্ধি বাজার পরিসর সম্প্রসারিত করে। ফলে গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ উৎসাহিত হয়। বিপরীত মতাবলম্বীরা বলেন, এমন হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অথবা এমনটা ঘটবেই তা বলার জোরালো যুক্তি লক্ষ্য করা যায় না। উন্নত দেশগুলোতে কলেজ যাওয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকেও অনেকে প্রযুক্তিক অগ্রগতির কারণ

---

৫. অগ্রগতিতে একাধিপত্য বাণিজ্যের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে P. Hennipman-এর "Monopoly : Impediment or Stimulus to Economic Progress ?" in E. H. Chamberlin (ed.), Monopoly and Competition and their Regulation, Macmillan and Co., Ltd., London, 1954, 421-456.

হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। তেমনি শিক্ষার মান উন্নত হওয়াকে অনেকে প্রকৌশলিক অগ্রগতি সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ার পথে বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

সুশৃঙ্খল শ্রমিক-সঙ্ঘ কার্যাবলী প্রযুক্তিক অগ্রগতি প্রবাহকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই প্রভাব প্রতিকূল যেমন হতে পারে তেমনি অনুকূলও হতে পারে।[৬] শ্রমিক সঙ্ঘের দর কষাকষির ফলে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকারী উপায় খুঁজে পেতে উৎসাহী হবে। কেননা, কেবল তাহলেই লাভের পরিমাণ বজায় রাখা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান শ্রমিক কাট্‌ছাট্‌ নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হলে শ্রমিক ইউনিয়ন বাঁধা প্রদান করবে। ফলে আঙ্গিকগত উন্নতি ব্যাহত হবে।

পরিশেষে, বৃহৎ বাণিজ্যের পরিবেশগত প্রভাব ও ক্রম-বর্ধনশীল সরকারী সক্রিয়তা প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

উন্নয়ন অগ্রগতি সম্পর্কে হ্যারড-ডোমারের যে ঋজুবদ্ধ ধারণা ধনীদেশে পরিস্থিতি তদপেক্ষা কিছুটা নমনীয় হলেও প্রযুক্তিক অগ্রগতিতে গুণগত কিছুটা বিষয় রয়েছে যা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সন্তোষজনক উন্নতির জন্য অগ্রগতি প্রক্রিয়ার এই দিকই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।"[৭] পর্যাপ্ত অগ্রগতি সাধন করতে হবে বলাই যথেষ্ট নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি-অগ্রগতির প্রকৃতি সম্পদ স্বল্পতার অনুসারী হয়ে উঠতে হবে।"[৮]

মনে করুন, নূতন আবিষ্কার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রচুর বাড়িয়ে দেয়। সেই তুলনায়, বিদ্যমান শ্রম-শক্তির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তেমন বৃদ্ধি পায় না। অর্থাৎ নব আবিষ্কার শ্রম নিয়োগ লাঘবকারী হয়। এই পরিস্থিতিতে শ্রম শক্তির তুলনায় পুঁজিসামগ্রী যথারীতি সম্প্রসারিত নাও হতে পারে। তাহলে, মজুরী হারে পড়তি রোধ করা যাবে না। আর যদি মজুরী হার শক্ত (rigid) হয়, তবে বেকারত্ব দেখা দেবে। অর্থাৎ দেয় মজুরী হারে সমগ্র শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করার মত পুঁজি পাওয়া যাবে না। স্মরণে নিন, রিকার্ডো ও মার্ক্স এই জাতীয় বেকারত্বের কথা উল্লেখ

---

৬. G. F. Bloom-এর "Wage Pressure and Technological Discovery "American Economic Review, XLI, No. 4, 603-617' (sept. 1951)

৭. Fellur-এর প্রাগুক্ত বইয়ের উপর ভিত্তি করে Chapter 8, Sections 5-6.

৮. ঐ, পৃ: ২০৯।

করেছেন। আজকের দিনে হ্রাসমান মজুরী নিয়ে কি বর্ধনশীল বেকারত্ব সহ অগ্রগতি কাম্য নয়। কাজেই উদ্ভাবন-আবিষ্কারের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হতে হবে যেন তা অত্যধিক শ্রমলাঘবকারী না হয়।

এবারে ধরুন, প্রযুক্তি-বিদ্যাক্ষেত্রে এমন উন্নতি সাধিত হল যার ফলে বিদ্যমান শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বেশ বেড়ে গেল। কিন্তু, পুঁজি সম্পদের প্রান্তিক ক্ষমতা তেমন সম্প্রসারিত হলনা, অর্থাৎ উদ্ভাবন-আবিষ্কার পুঁজিলাঘবকারী হল। এই কথার নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বেশ বেড়ে গেল অথচ পুঁজি-সামগ্রীর চাহিদা তেমনটা বিস্তৃত হল না। ফলে, যদি পুঁজি গঠন অধিক হারে হতে থাকে এবং অন্যান্য উপকরণের সরবরাহ সেই অনুপাতে না বাড়ে, তাহলে মূলধনের ফলন কমে যেতে পারে এবং তাহলে পুঁজি সংগঠনে শিথিলভাব জন্ম নিতে পারে। তাছাড়া, কেইনস্ বর্ণিত বেকারত্ব মাথা উঁচিয়ে উঠতে পারে। পূর্ণ বিনিয়োগকারী সঞ্চয় পরিমাণ অপেক্ষা লগ্নী অপ্রতুলতাহেতু এমনটা ঘটতে পারে। সুতরাং, বলা যায় যে উদ্ভাবন আবিষ্কারের অন্য একটা শর্ত হতে হবে যেন তা অত্যধিক পুঁজি লাঘবকারীও না হয়।

প্রযুক্তিক অগ্রগতি প্রক্রিয়ার গুণগত এইসব দিক ধনীদেশের জন্য সত্যিই সমস্যা কিনা তা অবশ্য প্রশ্নাতীত নয়। শ্রম সঙ্ঘগুলো মত প্রকাশ করে থাকে যে, বেপরোয়াভাবে ব্যাপক যান্ত্রীকরণ ঘটালে পরে বিশেষ বিশেষ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য তা ক্ষতির কারণ হতে পারে। হয়ত বা যান্ত্রিক কারণোদ্ভূত বেকার সমস্যার জন্ম দিতে পারে অথবা মজুরী হারে হ্রাস ঘটাতে পারে।[৯] স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার অত্যধিক শ্রম লাঘবকারী হবে কিনা তা এই পর্যায়ে সঠিক করে বলা মুশকিল হলেও মন্তব্য করা যায় যে, উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটা স্বাভাবিক নয়। এই পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে তেমন একটা

---

৯. স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আধুনিক প্রচেষ্টাকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) automatic machinery, (খ) integrated materials handling and Processing equipment, (গ) automatic control system এবং (ঘ) electronic Computers and data Processing machines. আলোচনা করুন, E. Weinbering-এর "A Review of Automatic Technology," Monthly Labour Review. 78, No. 6, 638 (June 1955).

ভয়াবহ কিছু লক্ষ্য করা যায়নি। তাছাড়া এই জাতীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার বড় একটা দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হয় না। অবশ্য ভবিষ্যৎ আবিষ্কার-সম্ভাবনা উজ্জ্বল বটে, তবে সারা অর্থনীতিব্যাপী বিপ্লব দেখা দেবে তেমন মনে হয় না।[১০] একথা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে ভয়ের তেমন কারণ দেখা যায় না। বরং তা সব শ্রেণীর জন্য মঙ্গলময়ী হতে পারে। বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভোদ্ভূত রোজগার থেকে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা অধিকহেতু এই সম্ভাবনা অধিক যথার্থ বলে মনে হয়।

ফেল্‌নার দাবী করেন, আমেরিকায় যে যান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে তা তেমন শ্রম লাঘবকারী নয়।[১১] তিনি অনেকটা অর্বাচীনের ন্যায় মন্তব্য করেন, জাতীয় আয়ের যে ভাগটা শ্রমিক পাচ্ছে তা একটু একটু করে হলেও বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, দীর্ঘকালীন পরিসরে লগ্নী-কারকের পাওনাটা বরং কিছুটা সঙ্কুচিত হচ্ছে। অবশ্য এনিয়ে মাথা-ব্যথার কিছু নেই। "মোটামুটিভাবে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া স্থিরায়তনিক পরিসরে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে এগুচ্ছে।"[১২] কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, বাজার পদ্ধতি সক্রিয় থেকে উপযুক্ত উন্নতি সাধনে প্ররোচণা যুগিয়ে চলেছে। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বিরাজমান উপকরণ বাজারে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উন্নতি-অগ্রগতি হিসাব তালিকায় চলতি আপেক্ষিক উপকরণ স্বল্পতা (তাদের দর দিয়ে প্রকাশিত) অঙ্গীভূত করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনি উপকরণ দরের অতীত অভিজ্ঞতা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে আগ্রহী ক্রেতাকে সঠিক পথে চালিত করতে প্রেরণা যোগাবে অবশ্যই।

এতক্ষণকার আলোচনায় অক্ষুণ্ণ অগ্রগতি বজায় রাখার মত সঞ্চয় নিয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি। অথচ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সঞ্চয় যথারীতি সম্পাদিত না হলে উদ্ভাবন আবিষ্কার দিয়ে লাভ পাওয়ার সুবিধা নেহায়েতই নগণ্য। নীট সঞ্চয় অবশ্যই হতে হবে। দ্রুত অগ্রসর পেতে হলে সঞ্চয়-প্রবণতা অবশ্যই অধিক হতে হবে। তবে কতটুকু, তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সন্তোষজনক উন্নয়ন-অগ্রগতি মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে এবং তা করতে হবে প্রযুক্তিক

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৩।
১১. ফেলনারের পূর্বোক্ত বই, পৃঃ ২১৭।
১২. ঐ, পৃঃ ২১৮।

অগ্রগতি প্রবাহের আঙ্গিকে ও শ্রমশক্তির আকার ও নৈপুণ্য বর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এ দিয়েই নির্ণীত হবে সঞ্চয়-স্পৃহার মাত্রা।

পূর্বে এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতকগুলো ধনীদেশে পূর্বের তুলনায় এক্ষণে নিম্ন সঞ্চয় আয় অনুপাত পাওয়া যায়। অবশ্য সঠিক কোন ধারা এখনো জন্ম নেয়নি। কিন্তু, যদি বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে হ্রাস পায় তবে দীর্ঘকালীন পরিসরে সঞ্চয় অনুপাত পড়ে যেতে পারে। ধ্রুব সঞ্চয় আয় অনুপাত মেনে নেওয়ারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। দ্বিরায়তনিক বিশ্লেষণে তা বরং অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রাযুক্তিক অগ্রগতি সম্ভাবনার কথা আলোচনায় না টেনে অনেকে বলে থাকেন যে, জনগণের অধিক বয়সপ্রাপ্তি, নাগরিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা এবং আয়-বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী সক্রিয় প্রচেষ্টা পরিণামে সঞ্চয় আয় অনুপাত নিম্নমুখী করে তুলতে পারে।[১৩] বিপরীত দিকে সঞ্চয় আহরণকারী প্রতিষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা এবং মোট জনশক্তির তুলনায় শ্রম শক্তির ক্রমানুষিক বৃদ্ধি ভবিষ্যতে সঞ্চয় আয় অনুপাত বাড়িয়ে দিতে পারে। অবশ্য নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী এইসব বিপরীত শক্তিদ্বয়ের আপেক্ষিক ক্ষমতা ও গুরুত্ব আজও পরিষ্কার হয়ে উঠেনি।

তবে সঞ্চয় অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেলেও ভয়ের বড় একটা কারণ নেই। এর ফলে অগ্রগতি হার নিম্নমুখী হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে দেখা যায় যে আমেরিকায়, কি শিল্পক্ষেত্রে, কি কৃষিক্ষেত্রে মূলধন-সহগ হ্রাস পেয়ে চলেছে। অন্য কথায়, অতীতে প্রতি ইউনিট নূতন মূলধন যা ফলন দিত আজকে তদপেক্ষা বেশ কিছুটা বেশী পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই সেই অনুপাতে সঞ্চয় পরিমাণ হ্রাস পেলে বিদ্যমান উন্নয়ন হার ব্যাহত হওয়ার কারণ নেই।

২. প্রাকৃতিক সম্পদ

কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর কলরব উঠে: প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে উন্নয়ন-অগ্রগতি বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। অসবর্ণ বলেন, "এটা হচ্ছে

---

১৩. সঞ্চয় ও এইসব উপাদানাবলীর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা পেতে পারেন, R. W. Goldsmith, D.S. Brady ও H. Mendershansen-এর A study of Saving in the United States, iii, Princeton University Press, Princeton, 1956, Chapters 3 and 4.

অন্য, নীরব বিশ্ব 'যুদ্ধ' আর এই যুদ্ধের শাবক হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত সশস্ত্র সংঘর্ষ। এই পরিস্থিতির সমাধান দেয়া না হলে তা পরিণামে মানব জাতির জন্য অকল্পনীয় ব্যথা-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকি হয়ত মানব জাতির অস্তিত্ব আশঙ্কাজনক পর্যায়ে টেনে নিতে পারে।"[১৪] হতাশাব্যঞ্জক এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধবাদীও অবশ্য যথেষ্ট আছেন। শুনুন ম্যাথারের বক্তব্য: "সমগ্র বিশ্বকে বিবেচনায় নিয়ে চিন্তা করলে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, অচিরাৎ সত্যিকারের কোন কাঁচামাল সামগ্রী ফুরিয়ে যাবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বিশ্ব-ধরিত্রীর ভাণ্ডার যথেষ্ট অফুরন্ত। অন্ততঃ অহরহ যে অভাব-অনটনের কথা বলা হয় তারচেয়ে অবশ্যই তা অনেক অধিক।"[১৫] সে যাই হউক, একথা সত্য বটে যে-কোন ধনবিজ্ঞানীই প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টিকে হালকা করে দেখেন না। নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ অবশ্যই দরকার। তবে তা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়। অনেকেই এটাকে এমন অনতিক্রম্য বাধা বলে মনে করেন না।

প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে চতুর্দশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে যে আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোতে সমস্যাটি দ্বিমুখী বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ, বিদ্যমান প্রযুক্তিক জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়তঃ, নিরন্তর নব নব প্রযুক্তিক আঙ্গিক আবিষ্কার করা দরকার। এই দুইটি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে সম্পদের অভাবে উন্নয়নকার্য ব্যাহত হবে বলে মনে হয় না। তবে কথা হল কতটুকু স্বার্থকতার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে জড়িত প্রয়োজনীয় এই কার্যগুলো নিষ্পন্ন করা যাবে। এটা প্রায়শঃ শুনা যায় যে, যেসব ধনী দেশ তাদের খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে অবশ্যই দীর্ঘকালীন পরিসরে ক্রমহ্রাসমান বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হতে হবে।

৩. জনসংখ্যা

দরিদ্রদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে। তাদের উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রচেষ্টা ঠিক তাল সামলে এগুতে পারছে না। ফলে মাথাপিছু আয়ের

---

১৪. F. Osborn-এর Our Plundered Planet, Grosset and Dunlop, New York, 1948, IX.

১৫. K. F. Mather, Enough and to Spare, Harper and Brothers, New York, 1944.

পরিমাণ বস্তুত, হ্রাস পেয়ে চলেছে। এয়োদশ অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। ধনীদেশের জন্য কিন্তু অবস্থা তত অসহ-নীয় নয়। বিদ্যমান উন্নয়নহার বজায় রাখায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব বড় একটা বাধা বলে মনে হয় না। তেমনি উন্নয়ন হার বজায় রাখার কারণে জনসংখ্যাও অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয় না।

বস্তুত হাল্কা বসতিসম্পন্ন অনেকগুলো ধনীদেশে (যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড) হয়ত জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অপর্যাপ্ত হারে বেড়ে চলেছে। এই সকল দেশে শ্রম ও পুঁজির ফলন ক্রমবর্ধমান নীতির অনুসারী হয়ে থাকলে হয়ত অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের উন্নতি-অগ্রগতিতে তেজীভাব এনে দিতে পারে। কারণ, তাহলে তারা বৃহদাকার উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি শ্লথ গতিসম্পন্ন হলে কি সেসব দেশ সঙ্কীর্ণ জনাগম নীতি গ্রহণ করলে হয়ত পরিণামে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ পড়ে যেতে পারে।

অন্যান্য ধনীদেশে হয়ত অবস্থা তেমন না-ও হতে পারে। বরং, পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতিতে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাথাপিছু আয়ে হ্রাস ঘটিয়ে দিতে পারে। সেই সব দেশ হয়ত শ্রম ও পুঁজির ফলনের পড়তি বিন্দুর ধারে-কাছে অবস্থিত। কাজেই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হ্রাস পেলে শ্রমিক পিছু মালামাল ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ অধিক হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহের সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, যেসব দেশ খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল তাদের লোকসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে গেলে পরিণামে তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।[১৬] তাতে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে তাদের বাণিজ্য শর্ত আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়াবলী বাদ দিলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপর একটা দিক রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্ণ চাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি প্রভাবিত করে থাকে। ক্রমসম্প্রসারণশীল জনসংখ্যা বিনিয়োগযোগ্য সম্পদে ভাগ বসায়। তাদের থাকার ঘরবাড়ী চাই। চাই মূলধন ইত্যাদি। শ্রম-

১৬. দেখুন, Royal Commission on Population-এর Report, Cmd-7695, H.M.S.O. London, 1949, 108.

শক্তির একটা বিরাট অংশ এইসব দ্রব্য তৈরী করে। কাজেই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পেলে বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। জড়ত্ববাদীরা ১৯৩০ দশকের প্রসঙ্গে এই দাবী করে থাকেন। অর্থাৎ ১৯৩০ দশকে নাকি তাই ঘটেছিল। কিন্তু, আমরা পূর্বে লক্ষ্য করে করেছি যে, এই মতের বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি দেন যে, সব ডিম এক হাড়িতে তোলা থাকে না। লগ্নির বহু বিকল্প ক্ষেত্র রয়েছে। কাজেই, জনসংখ্যা হ্রাস পেলেই অসুবিধার সৃষ্টি হবে এমন বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি হার সন্তোষজনক উন্নয়ন পর্যায় বজায় রাখার জন্য কাম্য, তা আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য দেশে দেশে বিভেদ প্রচুর। কালে কালে ব্যবধান অনেক। তবু ধনীদেশের জন্য মোটামুটি একটা বর্ধনহার আন্দাজ করা যেতে পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বলা হয় তা অসুবিধা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষিত বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লগ্নী ও প্রযুক্তিক অগ্রগতি জোরদার হতে পারে। বৃহদাকার উৎপাদন উৎসাহিত হতে পারে, অর্থনীতি অধিকতর নমনীয়তা লাভ করতে পারে। অসুবিধার মধ্যে রয়েছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যমান জীবন যাত্রার মান বজায় রাখায় অধিক সম্পদের প্রয়োজন পড়ে। তবে এই অসুবিধা উপরোক্ত সুবিধাগুলোর তুলনায় নগণ্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। সে যাই হউক, এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার উঁচু হবে কি নিম্ন হবে তা তর্কের বিষয় থেকে যায়। এই সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলার জো নেই।

'প্রগতির ইচ্ছা,' 'পুঁজিবাদতন্ত্রের চেতনা তথা জীবনীশক্তি' ইত্যাদি কথাগুলো বড্ড চাতুরীপূর্ণ প্রত্যয়। এরা সহজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অবস্থিত। এগুলোকে সঠিক করে বর্ণনা করা কি তাদের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়া বড্ড জটিল কাজ। তবে অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন যে, এই সব প্রত্যয়ের প্রেরণা ও অভীষ্ট লক্ষ্য প্রগতিশীল অর্থনীতির উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই, মন্তব্য করা যায় যে, গণমনে অগ্রগতি মনোভাবাপন্ন চেতনা বজায় রাখতে পারা অবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নিশ্চিত করায় আবশ্যকীয়।

এই সকল ধ্যান-ধারণার উদ্‌ঘাটনে ধনবিজ্ঞানী মূলত বাণিজ্য-ব্যবস্থা পরিচালনে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। আজকের উন্নত দেশে দ্বিরায়তনিক

অগ্রগতি হার অব্যাহত রাখতে হলে বাণিজ্য কর্তাদেরকে অবশ্যই প্রগতিশীল ও উদ্যমশীল হতে হবে। তাদেরকে উদ্যোগজনিত সম্ভাবনা খুঁজে নিতে হবে এবং এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নে যথাবিহিত ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। এক কথায়, তাদেরকে সুম্পিটারের পরিভাষায় "উদ্যোগী তেজোদৃপ্ত' হতে হবে। তবেই, উচ্চতর উন্নয়ন হার বজায় রাখা সম্ভব হবে।

আজকের অধিকাংশ ধনীদেশ বৃহদাকার বাণিজ্যের দেশ। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেন, এই বৃহৎ বাণিজ্য পরিবেশে উদ্যমশীল বাণিজ্য-নেতৃত্ব পাওয়া কি সম্ভব? বিশেষ করে দীর্ঘকালীন পরিসরে এই নেতৃত্ব পাওয়া যেতে পারে কি?[১৭] বৃহদাকার বাণিজ্য-সংস্থা মানেই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর আমলাতন্ত্র জন্ম দেয় অপটুতা, অদক্ষতা ও বেকুবী পরিচালনা। এমতাবস্থায় 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি প্রাধান্য পায়, উদ্যম, উৎসাহ-উদ্দীপনা তিরোধান লাভ করে। তদস্থলে ভেজা ভেজা ভাব, অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, 'যাক বাবা কার কি আসে-যায়' মনোভাব জন্ম নেয়। এই পরিবেশে উন্নয়ন-অগ্রগতি ব্যাহত হবে এ আর আশ্চর্য্য কি!

আকৃতিগত দুর্বলতা ছাড়াও বহু পর্যবেক্ষক উদ্যোগী ব্যবসায়ীগুণে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পৃথকীকরণের ক্ষতিজনক দিকের কথা উল্লেখ করেন। কোম্পানী বাণিজ্যে মালিকানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ফলে পরিচালকমণ্ডলী অনায়াসে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে পারে। কাজেই, তারা প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধনে তেমন উৎসাহী নাও হতে পারে। তারা এই জাতীয় বাণিজ্যের লাভালাভের পুরোপুরী ভাগীদার নয়। এদিকে, লাভের অংশ পড়ে গেলে কর্তৃত্ব হারাতে পারে। তাই কোন রকম ঝুঁকি নিতে তেমন উৎসাহবোধ করে না। অথবা নিত্য-নূতন ব্যবসায়ে উদ্যোগী হতে মাথা ঘামায় না। "নিরাপদে দিন কেটে গেলেই হল" দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাণিজ্য চালায়। তাছাড়া, পেশাধারী কার্যনির্বাহী সাধারণতঃ ক্ষমতা ও মান-মর্যাদার অভিমানে আত্মম্ভরী। আত্মগর্বী এই দৃষ্টিভঙ্গির বশীভূত হলে তারা হয়ত এমনভাবে ব্যবসা চালায় যে তা পরিণামে সুষম সম্পদ বিতরণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারী সক্রিয়তা বেড়ে চলেছে। সরকার বেসরকারী খাতে তার হস্ত প্রসারিত করে চলেছে। কেউ কেউ বলেন, সরকারী এই অতি-উৎসাহের

---

১৭. উদাহরণতঃ David E. Lilienthal-এর Big Business: A New Era, Harper and Brothers, New York, 1952 এবং Gordon-এর Business Leadership in the large Corporation, The Brookings Institution, Washington, 1945, 326-340 দেখুন।

ফলেও উদ্যোগী ব্যবসায়ী-গুণ প্রতিহত হতে পারে। বহু ধনী দেশে আয়করের মাত্রা সরাসরি বেড়ে গিয়েছে। অনেকে এই পরিস্থিতিকে ভয়ের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে উঁচু আয়কর কর্ম-প্রেরণা নিরুৎসাহিত করে। ঝুঁকিগ্রহণ প্রতিহত করে। কাজেই, আয়-বণ্টন অধিকতর ন্যায়ানুগ করার খাতিরে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে তা হয়ত একদিন অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধারা অব্যাহত রাখায় অত্যাবশ্যকীয় ঝুঁকিগ্রহণ প্রবণতাকে বানচাল করে দিতে পারে। রাইটের ভাষায় আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে এমনিভাবে বর্ণনা করা যায়:

> 'বুদ্ধির মুক্তি' ও বিজ্ঞান আনিল উন্নতি ও রূপান্তর;
> জন্মিল অনিশ্চিতি।
> অনিশ্চিতি হতে জন্মিল নব নব চাহিদা অবান্তর;
> মরিল উন্নতি ও রূপান্তর,
> ঘটিল বিজ্ঞান ও মুক্তির ইতি।[১৮]

অবশ্য ভিন্নমুখী যুক্তিরও অভাব নেই। অনেকের মতে ধনীদেশ-গুলোতে উদ্যোগগত কাজ নিম্নমুখী ত নয়ই বরং উর্ধ্বগতিসম্পন্ন। বৃহৎ ব্যবসায় বিদ্যমান বলে পরিচালনক্ষেত্রে অধিকতর বিশেষায়ন সম্ভব হয়। ছোট-খাট ব্যবসায় বিরাজমান হলে তা সম্ভব হত না। বাণিজ্য বৃহদাকার, সুতরাং, কর্মচারীর সংখ্যাও অসংখ্য। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষত্ববান। স্বীয় কর্মচারীদের এই বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বৃহৎ ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে কর্ষণে সক্ষম হয়। তদনুসারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন কাজে ব্রতী হতে পারে। ক্ষুদ্রাকার বাণিজ্য এই সুযোগ হতে বঞ্চিত। বৃহৎ বাণিজ্য কর্মচারীদেরকে ব্যাপক ট্রেনিং প্রদান করতে পারে। ফলে তার পক্ষে নিত্য-নূতন পরিচালন-প্রথা প্রবর্তন ও পরিচালন-গুণসম্পন্ন প্রতিভা আয়ত্তকরণ সহজ হয়।

তদ্রূপ সরকারী সক্রিয়তাও বাধা না হয়ে বরং সহায়ক হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে বিশেষ করে, চক্রময় হ্রাস-বৃদ্ধি রোধকারী রাজস্ব-নীতি গ্রহণের ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণী বরং অধিকতর প্রেরণা পেতে পারে এবং তদনুপাতে দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হতে পারে। সরকারী

---

১৮. D. M. Wright, Democracy and Progress, The Macmillan & Co., New York, 1948, 81.

সক্রিয়তার অনুপস্থিতিতে বাণিজ্য-চক্র উদ্ভূত অস্থিরতা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। তাতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ অধিকতর ঝুঁকিবহুল হয়ে উঠতে পারে। অথচ আধুনিক কালের সরকার বেকারত্ব নিরসনে উৎসাহী বলে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অধিক আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বিস্তৃত বাণিজ্যকর্মে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, তাদের তৈরী দ্রব্যাদির চাহিদা মারাত্মকভাবে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই, তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের নষ্টামি রোধে সরকারী সক্রিয়তার অনুপস্থিতিতে তেমনটা করা সম্ভব নয়।

বৃহৎ বাণিজ্য মাঝে-মধ্যে স্থিতিশীলতার এই ছত্রচ্ছায়ার আশ্রয় নিতে চায়। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বিরাজমান হলে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তা ব্যবসায়ীকে নব উদ্যোগ গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং "কারো কারো মতে কিছুটা একচেটিয়া নীতি সমতা রক্ষণে ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সুফল ফলায়। তাতে অর্থনীতি অনেকটা সহজতর ও স্থিতিশীল গতিতে এগুতে পারে। অসীম প্রতিযোগিতা পরিবেশে তা সম্ভব হয় না। একটা যান্ত্রিক তুলনা ব্যবহার করে বলা যায় যে, একাধিকারিক প্রতিযোগিতা অভিঘাত আত্মস্থকারী (shock absorber) হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। এর উনুপস্থিতিতে লগ্নিকারক দল জাতীয় উৎপাদন বর্ধনকারী বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথ পবিক্রমণে সাহসী হবে না।"[১৯]

মনে রাখা দরকার যে, অর্থনীতিতে কেবল কার্যনির্বাহী-দলই একমাত্র গ্রুপ নয় যাদের মধ্যে উন্নয়ন নিশ্চিতকারী মনোভাব বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আরো অনেকের মধ্যে তা বিরাজ করতে হবে। বৈচিত্র্যময় ভোগের ইচ্ছা উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। পরিবর্তন কাম্য হতে হবে, এমনকি যদি কেবল পরিবর্তনের খাতিরেও হয়। ঝুঁকি-গ্রহণ প্রবণতা বিরাজ করতে হবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার নিমিত্তে পরিশ্রমী হওয়ার ঝোঁক বিদ্যমান হতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক দক্ষ হওয়ার স্পৃহা বজায় থাকতে হবে। এই জাতীয় আরো হাজারো ধ্যান-ধারণা উন্নয়ন-ক্রিয়ার উৎসাহদায়িনী। কাজেই, সমাজের মুখ্য মুখ্য অর্থনৈতিক গ্রুপগুলোতে এই সকল প্রবণতা বিরাজ করতে হবে। তবেই উন্নয়ন–অগ্রগতি বজায় রাখা সহজ হবে।

---

১৯. Fritz Machlup, "Monopoly and the Problem of Economic in stability", in E.H. Chamberlain (ed), op cit., 395.

শুধু তাই নয়। ধনীদেশকে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন তাদের উঁচু শ্রম-দক্ষতা আরো উঁচু হতে পারে। ধনী-দরিদ্রদেশের শ্রম-দক্ষতার যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তার জন্য বহু কিছু দায়ী। কেবল চিন্তাধারার বৈষম্যের কারণে তা তেমন নয়। সুষম খাদ্য, অধিক চিকিৎসা সুবিধা, উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নত কলা-কৌশল ইত্যাদি সব কিছু একত্রিত হয়ে তবে প্রগতিশীল দেশের শ্রম-দক্ষতার উচ্চতর করে তুলে।

গেল অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রযুক্তিক অগ্রগতি ও চাহিদা নক্সায় বিবর্তন চিত্র পেতে হলে অধিক শিক্ষিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত শ্রমশক্তি প্রয়োজন পড়ে। ধনীদেশগুলো যদি তাদের উন্নয়ন-সম্ভাবনা পুরোপুরি অর্জনে ইচ্ছুক হয় তাহলে তাদেরকে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢালাই করে প্রয়োজনানুসারে সাজিয়ে নিতে হবে। সুখের বিষয়, ধনীদেশগুলো এই সম্পর্কে সজাগ বলে মনে হয়। তারা শিক্ষা-ব্যবস্থা বিন্যাসে যেমন আগ্রহী তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষাখাতেও উৎসাহী। সরকারী বেসরকারী উভয় খাত এই সকল বিষয় দৃষ্টি দিয়ে চলেছে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রম-দক্ষতা বর্ধনে ব্রতী রয়েছে।

একটু ভয় দেখা দিয়েছে বটে। ধনীদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রম-দক্ষতা একটু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। নবীন কর্মী উৎসাহে, উদ্দীপনায়, শক্তিতে, ক্ষীপ্রতায় এবং মিলিয়ে চলায় অদ্বিতীয়। তাদের সংখ্যা কমে গেলে শ্রম-দক্ষতা হ্রাস পেতে পাবে। অবশ্য এই ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে যাবে বয়স্ক কর্মীর নিপুণতা বিদ্যাবত্তা ও নির্ভরশীলতা দিয়ে।

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী শ্রম-সংঘের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শ্রম-আন্দোলন জোরদার হওয়ার ফলে দক্ষতা ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, শ্রম-সংঘ যেভাবে প্রবীণতা ও নিরাপত্তা নিয়ে মারামারি বাধিয়ে চলেছে তাতে শ্রম-দক্ষতা নিম্নমুখী হয়ে উঠতে পারে। বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু বিপরীত মত প্রদান করেছেন। বিরুদ্ধবাদীদের মতে শ্রম-আন্দোলন নাকি লাভজনক হয়ে উঠবে। তাঁরা বলেন, শ্রমিক সংঘবদ্ধতার ফলে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে শ্রমিকের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে শ্রমিক কর্মে নৈকট্যবোধ করে। তাতে তার মনোবল ও দক্ষতা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। সরকারী রাজস্ব নীতি নিয়েও দুই জাতীয় বিপরীত মত শোনা যায়। কেউ বলেন,

অত্যধিক প্রগতিশীল আয়কর প্রবর্তনের ফলে অনুপ্রেরণা ব্যাহত হয়ে চলেছে। তা কর্তাশ্রেণীদের জন্য যেমন ক্ষতিকারক তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর জন্যও ক্ষতিজনক। অন্যরা যুক্তি দেন, এই অসুবিধা সরকারী ব্যয় উৎসারিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা দিয়ে খণ্ডিত হয়ে যায় এবং তার উপরেও সুবিধার কিছুটা থেকে যায়।

৪. সম্পদের নমনশীলতা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কেবল পুঁজি-সামগ্রী বাড়াবার সমস্যা নয় বা জনসংখ্যার বয়সগত ও গুণগত সমস্যা নয়। অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহের সমস্যা বা প্রযুক্তিক জ্ঞানের সমস্যা নয়। তা সমভাবে বিদ্যমান সম্পদের সুষম ব্যবহারের সমস্যাও বটে। উচ্চ মাথাপিছু আয় সৃষ্টিকারী উৎপাদন-আঙ্গিক সৃষ্টি করে তা আনুপাতিক হারে সম্প্রসারিত করা যায় না। উন্নয়ন-অগ্রগতি একটা গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় নিরন্তর সংযোজন ঘটিয়ে যেতে হয়। খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পরিবর্তিত চাহিদাকাঠামো ও প্রযুক্তিক অগ্রগতি পুরানো যন্ত্রপাতি অকেজো করে দেয়। তদস্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির যন্ত্রপাতি বিধৃত করে নিতে হয়। এক জায়গায় মূলধনী সামগ্রী বাড়াতে হয় অন্যত্র সংকোচন ঘটাতে হয়। শ্রম শক্তিকে পুনরায় ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষিত করে নিতে হয়। এক শাখা থেকে শ্রমিক উঠিয়ে অন্য শাখায় নিয়ে যেতে হয়। এই জাতীয় হাজারো সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে তবে অগ্রগতি ধারা এগিয়ে চলে।

ভেনিলশন (Svenilson) এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়কালে ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রগতি-ক্রিয়া মন্দীভূত হয়ে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে যেযে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই মন্দাবস্থার জন্য "রূপান্তরকরণ সমস্যা ও তার সমাধানে ধীরগতি বিশেষভাবে দায়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর উক্ত দেশগুলো এই সমস্যার সম্মুখীন হয়।"[২০] আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপাদনী প্রবাহ নির্ভরশীল-ধর্মী। এক শাখায় বর্ধন অন্য শাখায় যেমন দ্যোতনা সৃষ্টি করে তেমনি এক জায়গায় পশ্চাৎপদতা মানে অন্যক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া। একঅংশ পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম হওয়া মানে অন্য অংশকে পিছু টেনে ধরা। তাতে উন্নতি-অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

২০. Svennilson Growth and Stagnation in the European Economy, United Nations, Geneva, 1954, 44.

বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্পদ পরিমাণ বাড়ানো এবং তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যৌথ সমস্যা। বিদ্যমান সম্পদের অপব্যবহার একদিকে জাতীয় আয়কে নিম্নমানে রেখে দেয়, অন্যদিকে উৎপাদনী সম্পদের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। অন্যপক্ষে ক্রম-সমপ্রসারণশীল সম্পদ সরবরাহ অর্থনীতিতে নমনীয়তা বাড়াতে পারে এবং এতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পথ সুগম করে দিতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরা যাক। জনসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলে পরিবর্তিত চাহিদা-নক্সা ও নব প্রযুক্তিক পরিবেশের ভিত্তিতে সাঙ্গীকরণ প্রথা বেশ কিছুটা সহজ হয়। পড়তি শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মীদল সহজে অন্যত্র জায়গা করে নিতে পারে না। সমস্যাটা চরম আকার ধারণ করে যদি না ধারে-কাছে কাজ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, বর্ধনশীল জনসংখ্যা বড্ড উপকারে আসতে পারে। পড়তি শিল্পের তৈরিকৃত পণ্যের চাহিদা একেবারে পড়ে না যেয়ে সহনশীল পর্যায়ে থাকার সুযোগ পায়। তাতে করে শিল্পটি হয়ত ভেঙ্গে পড়ার দশা থেকে রক্ষা পেয়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব হারিয়ে কায়ক্লেশে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, নবীন কর্মীদল সাধারণতঃ বাইরে যেতে তেমন আপত্তি করে না। তেমনি পেশা বদলাতেও তারা তেমন নিস্পৃহ নয়। কাজেই, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে সমপ্রসারণশীল শিল্প অতি সহজে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিল করতে পারে।

তেমনি মূলধন সংগঠন অর্থনীতিকে নব নব প্রকল্প গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে পারে। মূলধনী সামগ্রী সহজে বাতিল হয়ে পড়ে না। কাজেই, তার খোল্-নল্চে সাত্ তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা যায় না। মূলধন সংগঠন-কারী সমপ্রসারণশীল অর্থনীতি কিন্তু অনায়াসে এবং বেশ দ্রুততার সাথে উচচ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সম্ভাবনা অঙ্গীভূত করে নিতে পারে।

প্রতিষ্ঠানগত কতক ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে নমনীয়তা এনে দিতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া সংগঠন কালে সংস্থাগত এইসব ব্যবস্থা অর্থনীতিতে নমনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ধরুন বাজার-ব্যবস্থা। বাজার ব্যবস্থার গঠন-প্রণালী বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। স্মীথ থেকে শুরু করে মার্শাল অবধি ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যাল প্রায় সব অর্থ-বিজ্ঞানী পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাধর্মী বাজার-ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের চোখে, এই অবস্থায় সবায় মুক্ত অথচ বাজার শক্তিনিচয়ের শক্ত

নিগড়ে আবদ্ধ। বিক্রেতা যা ইচ্ছা দাম হাঁকতে পারে। তেমনি যতটুকু ইচ্ছা উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পরিশেষে, মাত্র একটা দর-উৎপাদন সম্পর্ক বিরাজ করে। এটা সবায়কে মেনে নিতে হয়। না হলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পুরস্কার (মুনাফা) ও শাস্তি (লোকসান) নৈর্ব্যক্তিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বাজার-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আমলাতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক হামলা দিয়ে নয়। ফলে চাহিদা পরিস্থিতি ও পরিবর্তিত প্রযুক্তিক আঙ্গিকের চাপে সম্পদ বিতরণজনিত প্রতিক্রিয়া অতি সহজে এই বাজার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কোন কোন লেখক দাবী করেন যে, ধনীদেশের শিল্প-প্রশাখায় অত্যধিক সমাহরণহেতু সার্থক উন্নয়ন অগ্রগতি নিষ্পন্নে প্রয়োজনীয় নমনশীলতা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়। একাধিকারিক প্রবণতা বিদ্যমান সম্পদের বণ্টনে বিষম অবস্থা সৃষ্টি করে। তেমনি নীট বিনিয়োগ ও উদ্যোগজনিত কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নাত্যধিক বিক্রেতায়ত্ত ক্ষমতার অধিকারী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান (oligopolistic industry) সহজে হাল ছাড়তে চায় না। তার উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা পড়ে গেলেও সহজে সে বিকল্প লগ্নীপথে যেতে রাজী নয়। এদিকে উচ্চ মুনাফা দুর্বল ও অপটু বাণিজ্য-সংস্থা জিইয়ে রাখে। শিল্পক্ষেত্রে বাড়তি ক্ষমতা দেখা দিলে তা সম্পদ সরিয়ে অন্যত্র না নিয়ে বরং শিল্পান্তর্বর্তী চুক্তি (intra-industry agreements) জোরদার করে। অন্য কথায়, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার নির্মম কষাঘাতের অভাবে, অনেক কাল ধরে অর্থনীতিতে বাড়তি ক্ষমতা ভেসে বেড়াতে থাকে। অত্যধিক বিক্রেতায়ত্ত ব্যবসায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পক্ষেত্রে নূতন কেউ সহজে ঢুকতে পারে না। এই কারণেও উক্ত শিল্পে দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। অথচ হয়ত এই শিল্পে প্রচুর সম্প্রসারণ সম্ভাবনা বিরাজমান। আর যারা এই শিল্পে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তারা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ওলট-পালট সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে অনেক ভেবেচিন্তে ধীরে-সুস্থে এগুতে প্রয়াসী হয়।

অন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নমনশীলতা ব্যর্থ করায় ক্রিয়া করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে সংঘবদ্ধ শ্রম-ইউনিয়। একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিক সংঘগুলো-শ্রম-সরবরাহ নির্দেশক রেখার আকৃতি বদলে দিয়ে শিল্পে শিল্পে শ্রমিক চলাচলের অবাধ স্রোত ব্যাহত করতে পারে। অথচ প্রতিযোগিতা বিরাজমান বাজারে এই স্রোত

অনাবিল হতে পারত। উদাহরণ দেখুন: শ্রম-ইউনিয়ন পড়তি শিল্পের মজুরী হারে হ্রাস ঠেকিয়ে দিতে পারে। এতে করে তারা শ্রমের সহজ চলাচল বন্ধ করে দেয়। তার ফলে সম্প্রসারণশীল শিল্পের উৎকর্ষতা ব্যাঘাত-প্রাপ্ত হয়। কেননা, এই শিল্প তখন অনায়াসে প্রচুর শ্রম পেতে পারে না।

বেগবান উন্নয়ন-অগ্রগতি হার বজায় রাখায় নমনীয় মুদ্রাসরবরাহ ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। ধনীদেশে প্রচুর দর ঋজুবদ্ধতা বিরাজমান বলে স্থায়ী মুদ্রাসরবরাহ দিয়ে দ্রুত অগ্রগতি পাওয়া বেশ অসুবিধাজনক। অথচ ক্রমবর্ধনশীল মুদ্রা সরবরাহ দিয়ে তা পাওয়া যেতে পারে। উৎপাদন বেড়ে যাওয়া কালে দরমাত্রায় হ্রাস ঘটানো অসুবিধাজনক ব্যাপার। তাতে বেকারত্ব জন্ম নিতে পারে। আবার উন্নয়ন হারেও পড়তি ঘটতে পারে। কাজে কাজেই, উন্নয়ন-অগ্রগতি হার বেগবান করার নিমিত্তে মুদ্রা-ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যেন মুদ্রা-সরবরাহ সম্প্রসারণে অসুবিধা না হয়।

অবশ্য সতর্ক হতে হবে যেন মুদ্রা সরবরাহ বাড়াতে যেয়ে খাল কেটে কুমীর না আনা হয়, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির খপ্পরে পড়তে না হয়। দরিদ্র দেশ নিয়ে আলোচনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে যে মুদ্রাস্ফীতির অসুবিধা বহুল। কাজেই, ঝটিকাসঙ্কুল এই প্রবণতার দীর্ঘমেয়াদী আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সময়োচিত প্রতি-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনেকে কথাটা বলে থাকেন। কথাটা দরমাত্রা ও উন্নয়ন সম্পর্কজাত, প্রগতি-ক্রিয়ার সাথে তাল রেখে দরমাত্রা যে ঊর্ধ্বগতি নেয় তাতে নাকি শ্রম-সংঘগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং মজুরী ও মূল্যের দুষ্ট-চক্র (wage-price spiral) সৃষ্টি করে।[২১] যুক্তিটা এইরূপ: প্রতিদ্বন্দ্বি নেতা ও সাধারণ সভ্যদের চাপে শ্রমিক নেতারা বৎসরের পর বৎসর মুদ্রা-মজুরী বৃদ্ধির দাবী তুলে। অথচ উৎপাদনশীলতা বড় একটা বাড়ে না, কাজেই, উৎপাদনশীলতার ঊর্ধ্বে যে মজুরী বৃদ্ধি করা হয় তা দ্রুত গতিতে দরমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কেননা, বৃহৎ ব্যবসায় অনায়াসে বাড়তি খরচটুকু

---

২১. এই দর সমস্যার বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, J. M. Clark-এর "Criteria of Sound Wage Adjustment, with Emphasis on the Question of Inflationary Effects" in D.M. Wright (ed.), The Impact of the Union, Harcourt, Brace & Co., 1951, 1-33.

ভোক্তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারে। ফলে দরমাত্রা ঊর্ধ্বগতি নেয়। আর দুর্ভোগ পোহায় স্থায়ী আয়ের মানুষগুলো, উত্তমর্ণ শ্রেণী, ছোট-খাট ব্যবসায়ী এবং কতকাংশে শ্রমিকরা নিজে। পরিণতি হিসাবে সম্পদ বিতরণে বৈকল্য দেখা দেয়।

অন্যরা যুক্তি দেন, শ্রম-ইউনিয়নের কার্য-উদ্ভূত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার এত কিছু নেই। কারণ সরকার ও মুদ্রা কর্তৃপক্ষ পূর্ণ চাকুরী-সংস্থান লক্ষ্য হাসিলে যত্নবান হয় এবং তদনুসারে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি গ্রহণ করে।[২২] সরকার বরং মন্দা পরিস্থিতির ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাহিদা সৃষ্টিকারী বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এই উদ্যোগ অখণ্ডনীয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে সরকারই বরং লম্বা-মেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি জন্ম দিয়ে বসে। বিপরীত যুক্তিবাদী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের খাতিরে দ্বিরায়তনিক কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় বৈকি। এই পরিবেশ উচ্চাশা প্লবনশীল রাখে। নিষ্ক্রিয় সঞ্চয়কারী ও খাজনার মালিকদের আয় চলনশীল করে ঝুঁকি গ্রহণকারীদের হাতে এনে দেয়। সে যাই হউক, অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানী মত প্রদান করেন যে, অক্ষুণ্ণ অগ্রগতি-ধারার জন্য দরমাত্রার মোটামুটী স্থিতিশীলতা অধিক বাঞ্ছনীয়।

উন্নয়ন-পথে দ্রুত অগ্রগমনে বিনিয়োগযোগ্য টাকা-পয়সা গতিশীল করে তোলাও প্রয়োজন। অবশ্য দরিদ্রদেশের মত ধনীদেশে এই সমস্যা তত প্রকট নয়। তবে অবস্থার উন্নতি করার এখনো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বড় বড় ব্যবসার জন্য তা তেমন বড় সমস্যা নয় বটে, তবে ছোট-খাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট অসুবিধা পোহায়। তাদের পক্ষে মূলধনী বাজার থেকে টাকা পাওয়া যথেষ্ট কষ্টকর। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য মুদ্রাপ্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে প্রচুর দ্বিধা করে। নানা রকম ঝক্কি-ঝামেলায় যেতে হয় বলে তারা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে ঋণ দিতেই উৎসাহী হয়, অন্যত্র দিতে চায় না। তার ফলে ছোট-খাট ব্যবসাকে নিজের উপর সম্বল করে এগুতে হয়। তাতে তাদের বিনি-যোগ-সম্ভাবনা সীমিত হয়। তাতে হয়ত বহু উচ্চ ফলনশীল প্রকল্প বাদ পড়ে যায়। ফলে সুষম-সম্পদ বিতরণ ব্যাহত হয়।

২২. M. Friedman, "Some Comments on the Significance of Labour Unions for Economic Policy", 229-231.

স্বীয় টাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বৃহৎ ব্যবসাগুলোরও অভ্যেস। অন্যত্র মুনাফা-সম্ভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ভিন্নমুখী কার্যক্রিয়ায় লিপ্ত হতে সাধারণ অনীহা বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে উচ্চতর ফলদায়িনী প্রকল্পে উৎসাহিত হতে বিমুখী করে তুলে। অর্থাৎ স্বীয় অর্জনের টাকা অন্যত্র খাটাতে নিরুৎসাহিত করে তুলে। অবশ্য তার কিছুটা পুষিয়ে যায় মূলধনী-বাজার থেকে টাকা পেয়ে তা নব নব প্রকল্পে খাটাবার ফলে। তবে আসল কথা এই যে, বহু ফার্ম নিজেদের অর্জিত টাকা হয়ত ক্ষীয়মান বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখে অথচ উচ্চতর ফলদায়িনী অন্য প্রকল্পে খাটাতে উদ্যোগী হয় না।

আভ্যন্তরীণ বাজারে একাধিকারিক প্রবণতাহেতু যেমন সম্পদ বিতরণ বিঘ্নিত হয় তেমনি বৈদেশিক বাণিজ্য-পথে দেশস্থ বাধার প্রাচীর গড়ে তোলার ফলেও সম্পদ-বণ্টন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে নির্দেশ করা হয়েছে যে, বিশ্ব বাণিজ্যের গঠন ও চেহারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়াছে। ভবিষ্যতেও হয়ত এই পরিবর্তন-ধারা অব্যাহত থাকবে।

এই সকল পরিবর্তনহেতু চাহিদা নক্সায় পড়তি দেখা দেওয়ার কারণে বহু দেশ তা রোধের নিমিত্তে সংরক্ষণধর্মী পন্থা গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তার ফলে সাঙ্গীকরণ ঝামেলার কিছুটা অন্যদেশে চালান দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, অন্যরাই বা নিশ্চুপ বসে থাকবে কেন? তারাও যে প্রতিশোধমূলক নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে উঠিতে পারে। আর যদি তাই হয়, তাহলে ভবিষ্যত উন্নয়ন-সম্ভাবনা বিশেষ-ভাবে প্রতিহত হতে পারে। সংরক্ষিত শিল্প-সম্প্রসারণশীল অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্র কর্ষণোপযোগী সম্পদ আয়ত্তাধীনে ধরে রাখতে পারে। যত বেশী কাল এই নীতি অনুসৃত হবে ফলাফলও তত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। প্রতিষ্ঠিত শিল্পোন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক চাহিদা নক্সা পরিবর্তন উৎসারিত সম্পদ সাযুজ্যকরণ পথে বাধা সৃষ্টি করে চললে নূতন শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের অংশে ভাগ বসাতে পারে।

তার ফলে সমগ্র অর্থনীতি সাঙ্গীকরণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ লেন-দেন ভারসাম্যে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা জন্ম নিতে পারে। আর যদি তাই হয় তাহলে সাযুজ্যকরণ প্রথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে

উঠতে পারে। সুতরাং, একচোখা স্বল্পমেয়াদী সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করে পরিণামে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। সম্পদের অসম বিতরণ শুধু যে অগ্রগতি হারে মন্দাবস্থা সৃষ্টি করে তাই নয়। তা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতাকে নিষ্প্রভ করে দেয়।[২৩]

সুতরাং, ধনীদেশগুলোকে সাবধান হতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা অপসারণকারী নীতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পণ্য চলাচল-গতি তেমন বিঘ্নিত না হয়। অবশ্য দরিদ্রদেশে যেমন ধনীদেশও আন্তর্জাতিক চাহিদা মাত্রার পরিবর্তন হেতু আভ্যন্তরীণ ফলাফল নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি কতকাংশে গ্রহণ করতেই হবে। তবে দৃষ্টি দিতে হবে যেন তা সম্পদের দীর্ঘকালীন চলাচলে মারাত্মকধর্মী বাধা সৃষ্টি না করে। তা না হলে আজকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পোন্নত দেশগুলো বেমক্কা অবস্থায় পড়ে যেতে পারে। সম্প্রসারণশীল বিশ্ব-বাণিজ্যের সুবিধা তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিকভাবে শ্রম ও পুঁজির বিচলন উন্নয়ন অগ্রগতি বজায় রাখায় সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধমধ্যবর্তীকালীন সময়ের ইউরোপের দিকে তাকিয়ে ভেনিলসন মন্তব্য করেন, "..........আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাঠামোগত পরিবর্তনহেতু জাতীয় বর্ধনে ফলাফল আন্তর্জাতিক পুঁজি সঞ্চারণ দিয়ে কতকাংশে কাটিয়ে তোলা যেত। তাহলে দীর্ঘমেয়াদী প্রগতি-প্রক্রিয়ার শরীক হয়ে নিজ নিজ অর্থনীতি সম্প্রসারিত করে শ্রমসহ অন্যান্য সব প্রাকৃতিক সম্পদ পরিপূর্ণ ও কার্যকরীভাবে কাজে খাটানো সহজ হত। বিকল্পপন্থা হিসাবে, শ্রম এমন সব দেশে চলে যেতে পারত যেখানে সম্প্রসারণ-সম্ভাবনা অত্যধিক বিরাজমান ছিল। তাতে করে ইউরোপের অগ্রগতি সুষ্ঠুপথে ধাবিত হয়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বনির্ভরশীল দেশের মত হয়ে উঠতে পারত।"[২৪]

ধনীদেশে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি-ধারা অব্যাহত থাকার জন্য দরিদ্রদেশে পুঁজি সামগ্রী প্রবাহিত হওয়া খুবই জরুরী। বিশেষ করে, যেহেতু শিল্পোন্নত দেশগুলো বর্ধিত হারে বিচিত্র প্রকৃতির কাঁচামাল সামগ্রী আমদানী করে

২৩. Kindleberger-এর The Terms of Trade, John Wiley & sons, New York, 1956, 311-312 জোর আরোপ করে যে, শিল্পোন্নত ইউরোপকে নমনশীল হতে হবে। তবেই সে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পটের দীর্ঘকালীন পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

২৪. Svennilson-এর প্রাগুক্ত বই, পঃ ৪২।

চলেছে সেহেতু তাদের উচিত দরিদ্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে অধিকতর দৃষ্টি দেয়া। প্রচুর পরিমাণে টাকা-পয়সা ও উপযুক্ত শ্রমিক যোগানো উচিত যাতে করে দরিদ্র দেশগুলো তাদের কাঁচামাল সামগ্রী পূর্ণভাবে আহরণ করতে পারে। অবশ্য তার চেয়েও বড় কথা, দরিদ্র দেশগুলো স্বার্থকতার সাথে উন্নয়নের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিশ্ব-বাণিজ্যে যে সম্প্রসারণ দেখা দেবে তা ধনীদেশগুলোর উন্নয়নে শক্তিশালী সঞ্চালক-শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করতে পারবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার কর্মপন্থা এবং সম্ভাবনা

ধনীদেশে উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার সাধারণ প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোটামুটি মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। তেমনি এই সকল প্রয়োজনীয়তা মেটাবার সামর্থ সম্পর্কেও প্রচুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবলোকন করা যায়। ফলে উন্নয়ন কার্যসূচী বাস্তবায়নের সঠিক নীতি নিয়ে ভিন্নমুখী অসংখ্য অভিমত পাওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধের প্রথম পর্যায়ে উন্নয়ন-ক্রিয়া জোরদার করার প্রধান প্রধান নীতিগুলো তুলে ধরা হবে এবং তাদের স্বপক্ষের যুক্তিগুলো যাচাই করা হবে। অতঃপর আমেরিকা ও বৃটেনকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নিয়ে আগামী কয়েক দশকের উন্নয়ন সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা হবে। সর্বশেষ পর্যায়ে ধনীদেশের উন্নয়ন-প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানিক হয়ে উঠার পরিস্থিতি বিশ্লেষিত হবে।

১ উন্নয়ন বজায় রাখার উপায় পদ্ধতি

সন্তোষজনক উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও অনর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলী হাসিলের নিমিত্তে বহুবিধ উপায়-পদ্ধতির মধ্যে পাঁচটি নীতি সাম্প্রতিক কালের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। এই পাঁচটি উপায়-পদ্ধতির একপ্রান্তে রয়েছে উৎপাদন-উপকরণ এবং উৎপাদন পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়ার সুপারিশ এবং অপর প্রান্তে রয়েছে অবাধ নীতি কার্যকরী করে তোলার নিমিত্তে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। ধনীদেশে প্রগতিক্রিয়া সবল ও সপুষ্ট রাখার জন্য অন্য যে সব প্রস্তাব দেয়া হয় তা এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিরাজ করতে দেখা যায়। বর্তমান পর্যায়ে প্রথমে এই চরম দুইটি নীতি আলোচিত হবে এবং পরে মধ্যবর্তী বাকী তিনটি নীতি পদ্ধতি নিয়ে গল্প ফাঁদা হবে। এতে অবশ্য পূর্ণ তালিকা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে না। তবে উন্নয়ন-অগ্রগতি নীতিমালার দৃষ্টান্ত স্থানীয় প্রতিরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

অগ্রগতি বজায় রাখা তথা বেগবান করার চরমস্থানীয় একটি সুপারিশ হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা।[১] এতে নাকি আধুনিক কালের অবাধ অর্থনীতির একচেটিয়াবাদ সমস্যা নিরসন হবে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে নির্বিবাদ অর্থনৈতিক পদ্ধতির কুফল অর্থাৎ কিনা একচেটিয়া বাণিজ্যের অপচয় সারিয়ে তোলা যাবে বলে দাবী করা হয়। সমাজবাদীদের মতে আজকের দিনে কারিগরিবিদ্যা এমন উন্নত যে নৈপুণ্যতার সাথে উৎপাদন ঘটাতে হলে বৃহদাকার উৎপাদন ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই, কি শিল্পক্ষেত্রে, কি খণিজ ক্ষেত্রে অথবা কি বণ্টনক্ষেত্রে নামমাত্র কিছু সংখ্যক বৃহৎ বাণিজ্য-সংস্থাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। সুতরাং, সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থায় তাদেরকে চলতে দেয়া হলে তারা তাদের ইচ্ছামাফিক কর্ম করে উদ্ভাবন আবিষ্কার তথা উদ্যোগ-স্রোত প্রতিহত করে দেয়। পরিনামে, উন্নয়ন হারে ভাঁটা দেখা দেয়। সমাজে অস্থিরতা জন্ম নেয়। সমাজতন্ত্র গ্রহণ না করে এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে জোরালো অন্যায় সমাহরণ নীতি গ্রহণ করতে হয়। তাতে কিন্তু, বৃহদাকার উৎপাদনে সুবিধা বিনষ্ট হয়ে যায়। অথচ, ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হলে একদিকে যেমন বৃহৎ বাণিজ্যের সুবিধা লুটা যায় অন্যাদিকে তেমনি প্রযুক্তিক অগ্রগতি ধারা অব্যাহত রাখা যায়।

সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্র লগ্নীহার নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবাদী বলেন, তাতে উন্নয়নহার অধিক বেগবান নির্ঝঞ্ঝাট হতে পারে। তেমনি তা অধিক ভারসাম্যধর্মী হয়ে উঠতে পারে। পুঁজিবাদতন্ত্রে কিন্তু তেমনটা হওয়ার সুযোগ নেই। রাষ্ট্র উচ্চহারে লগ্নী ঘটাতে পারে। বাজার শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত অবাধ অর্থনীতি হয়ত ততটা ঘটাতে সক্ষম নাও হতে পারে। এমনকি পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতিতেও হয়ত ততটা না ঘটতে পারে। সমাজবাদী অর্থনীতিতে উপকরণ সামগ্রী সর্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। সমাজবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি তাই বলেন, উন্নয়নহার চক্রময়

---

১. সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকদের মধ্যে রয়েছেন, M. Dobb, On Economic Theory and Socialism, International Publishers, New York, 1955 ; O. Lange ও F.M. Taylor On the Economic Theory of Socialism, The University of Minnesota Press, Mineapolis, 1938 ; A.P. Lerner, The Economics of Control, The Macmillan Co., New York, 1944 এবং P. sweezy, Socialism, Mcgrow Hill Book Co., New York, 1949.

হ্রাসবৃদ্ধির আয়ত্তামুক্ত হয়ে নির্বিবাদে এগুতে পারে। অথচ ধনিকতন্ত্র বিরাজমান পরিবেশে চক্রাকার মন্দাবস্থার দ্রুত অবনতিকালে তা কণ্টকহীন পথে এগুতে পারে না। তাছাড়া, সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকরা যুক্তি দেন, সরকারী সক্রিয়তা, পৃষ্টপোষকতা ও গবেষণামূলক কাজ দ্রুত হারে প্রযুক্তিক অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

সুতরাং, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজবাদ উচ্চতর লগ্নী নিশ্চিত করতে পারে, উদ্ভাবন-আবিষ্কার ত্বরান্বিত করতে পারে এবং সর্বোপরি পরিকল্পিত অর্থনীতি অগ্রগতিহার দ্রুত করতে পারে এবং তার সবই ঘটতে পারে নির্বিবাদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে। তাঁরা যুক্তি দেন যে, ব্যক্তিমালিকানা সর্বস্ব অবাধ অর্থনীতি তেমনটা সাধন করতে পারে না। কেননা তার অধীনে উপকরণসামগ্রী তেমন নমনীয় নয়। অথচ সমাজতন্ত্রে সম্পদ-সামগ্রীর এই নমনশীলতা অতি সহজে পাওয়া যেতে পারে এবং তা পাওয়া যেতে পারে হয় দরমাত্রার হেরফের ঘটিয়ে না হয় সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে উন্নয়ন হার বেগবান হয় এই কারণে যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বাঁকাতেড়া পরিস্থিতি বাঁচিয়ে চলতে পারে এবং সামঞ্জসহীনতা পরিহার করতে পারে। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে কিন্তু তেমনটা সম্ভব নয়। কেননা, তার বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্টই এই বিকৃতি ও সামঞ্জস্যহীনতা।" সমস্যার মূল প্রতিপাদ্যটি এমনিভাবে প্রকাশ করা যায় : অর্থনৈতিক উপায় হিসাবে পরিকল্পনার সার কথা হচ্ছে যে, এটা উন্নয়ন প্রকল্পের অঙ্গীভূত বিষয়াবলীতে সমন্বয়-সাধনের একটা পূর্বনির্ধারিত পথ...... বিকেন্দ্রীকৃত দর-ব্যবস্থা সংযোজনের উপায় নির্দেশ করে।"[২]

সমাজবাদী দল যুক্তিতর্কের অবতারণা করে মন্তব্য করেন যে, এই পরিকল্পনা-প্রণালী উৎপাদকের জন্য অনিশ্চয়তার বোঝা লাঘব করে। শুধু তাই নয়, সারা অর্থনীতি উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অতীব প্রয়োজনীয় বাহ্যিক-ব্যয়সঙ্কোচের পুরোপুরী সুযোগ ভোগ করতে পারে। পরিকল্পনা "উন্নয়নে এমন সব দ্বার উন্মোচন করে দেয় যেগুলো নাকি অপরিকল্পিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মোটেই সম্ভব নয় (অথবা খুবই অসম্ভব)......এই রকমটা হয় অর্থনীতির ব্যাপক নির্ভরশীলতার কারণে। অর্থনীতির বিভিন্ন উৎপাদনী শাখা-প্রশাখা একে-অন্যের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে। পরস্পর এই নির্ভরশীলতার কারণে এক শাখার উৎপাদন তার নিজের উপরে যেমন

---

২. M. Dobb-এর পাগুক্ত বই, পৃঃ ৭৬।

তেমনি অন্যান্য শাখা ও অন্যান্য শিল্পের উপরেও নির্ভরশীল হয়। তাতে তার ব্যয়-নক্সা ও উৎপাদনশীলতা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।"[৩] অন্য এককথায় এই সকল ধন-বিজ্ঞানীর মতে কেবল সমাজ-তন্ত্রবাদের অধীনে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার সুসম ভারসাম্য অর্জন করা যেতে পারে।

অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন অন্য এক মতবাদী দল যাঁরা বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে এমনসব নীতিমালা গ্রহণ করে যারা প্রতিযোগিতাকে সত্যিকার অর্থে কার্যকরী করে তুলতে পারে।[৪] সমাজবাদীদের ন্যায় তাঁরাও একচেটিয়া বাণিজ্যের কুফল সম্পর্কে সোচ্চার। কিন্তু, নীতি নিয়ে তাঁদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রতিষেধক হিসাবে সমাজবাদীদল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা বলেন আর তাঁরা জোর দাবী জানান যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিযোগিতা তীব্রতর করে তোলার কার্যকরী পন্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। 'শক্তিশালী প্রতিযোগিতায়' বিশ্বাসীদল কেবল বিদ্যমান সংযোগ-বিরোধী আইন (anti-trust laws) ফলপ্রসূ করে তোলার কথা বলেই ক্ষান্ত নন। তাঁরা একচেটিয়া কারবারের পুরো-পুরি বিনাশের পক্ষপাতি। সর্বতোভাবে একচেটিয়া বাণিজ্যের মূল উচ্ছেদে প্রয়াসী। বিরাট বিরাট বাণিজ্যসংস্থা ও শ্রম-ইউনিয়নগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে।[৫] সমাহরণ আইন (Incorporation laws) বদলে দিতে হবে যেন বিভিন্ন করপোরেশনের শেয়ার-মালিকানা কেন্দ্রীভূত হতে না পারে। তেমনি যেন পরিচালনা একই হাতে জড়ো হতে না পারে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি অবরোধ করার প্রচেষ্টা অমার্জনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত

---

৩. M. Dobb, Soviet Economice Development since 1917, Routledge and K. paul Ltd., London, 1948, 9-10.

৪. এই মতাদর্শে বিশ্বাসী অগ্রগণ্য অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন, F.A. Hayek, The Road to serfdom, The University of Chicago Press, Chicago, 1944, L. Robbins, The Economic Problem in peace and War, Macmillan and Co., Ltd., london, 1947 and H. C Simons, Economic policy for a free Society, The University of Chicago press, Chicago, 1948.

৫. Simons তাঁর প্রাগুক্ত বইয়ের ৩১৯ পৃষ্ঠায় সুপারিশ করেন যে, "প্রধান প্রধান শিল্পগুলোতে কোন মালিকানা ইউনিট মোট উৎপন্নের শতকরা ৫ ভাগের অধিক উৎপন্ন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।"

হতে হবে। কৃতিস্বত্ব আইন (patent laws) সহজ করে দিতে হবে যেন সবায় প্রযুক্তিক জ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা পায়। শুল্ক প্রতিরোধ ব্যবস্থা উঠিয়ে দিতে হবে।

এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজবাদীদের সাথে একমত নন যে, প্রযুক্তি সুযোগ-সুবিধা (Technological economics) কারণে শিল্প-সংযুক্তি ঘটে। তাঁরা মত দেন যে, একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রমূলক দুষ্ট-চুক্তি ও সরকারী নীতি দায়ী।[৬] কাজেই তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বড় বড় ব্যবসা ভেঙ্গে দিলে বৃহদাকার উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। সুষ্ঠু রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত অবস্থান অবাধ প্রতিযোগিতা সর্বোত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাতে উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান হতে পারে। কেবল এই ব্যবস্থার পরিসরে সম্পদ নমনশীলতা অত্যধিক হতে পারে আর এই নমনশীলতা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির প্রধান শর্ত। তাঁরা আরো যুক্তি দেন যে, বিস্তৃত সামাজিক সেবা প্রদানের উপায় হিসাবেও অবাধ প্রতিযোগিতার স্বার্থক রূপায়ণ কল্যাণকর।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কোন বক্তার ন্যায় অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী দলও স্বীকার করেন যে, দ্রুত অগ্রগমন নিশ্চিত করার জন্য চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি সন্তোষজনক হতে হবে এবং অতিমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি বর্জন করে চলতে হবে। তা না হলে সম্পদে ঋজুবদ্ধতা ও লগ্নীকারকের হতাশা-বিভ্রান্তি মনোভাব অগ্রগতি ধারাকে প্রতিহত করে দেবে। তাঁদের মতে 'কার্যকরী প্রতিযোগিতা' নিজেই কর্মসংস্থান ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যার বেশ কিছুটা সমাধান করে দেয়। কেননা, প্রতিযোগিতা একচেটিয়া বাণিজ্যের বদভ্যাসগুলো দূরীভূত করে আর এই দুষ্ট স্বভাবগুলোই হচ্ছে উপরোক্ত দুই সমস্যার মূল কারণ। অবশ্য কেবল প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকাই যথেষ্ট নয়। সরকারকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। অর্থনৈতিক হ্রাস-বৃদ্ধির কারণসমূহ নিরসনে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই ব্যাপারে এক লেখকের মত এই যে, মুদ্রানীতিতে কড়াকড়ি শুদ্ধি ঘটিয়ে নিতে হবে। তাতে "কার্যকরী টাকার পরিমাণ ও তার ব্যবহারের

---

৬. এই সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন, W. Adams 3 H.M. Gray-এর Monopoly Power in America, The Macmillan Co., New York, 1955.

উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।"[৭] অন্যরা অবশ্য তত কড়া নীতির কথা বলেন না। তাঁরা বরং বিদ্যমান মুদ্রা ও রাজস্বনীতির মাধ্যমে চাকুরী-বাকুরী পরিস্থিতি ও দর-পর্যায় নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

এই মতের প্রবক্তারা সরকারী ভূমিকায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকারকে কেবল চক্রাকার হ্রাস-বৃদ্ধির নষ্ট প্রভাবগুলো দূরীভূত করায় সচেষ্ট হলেই চলবে না। তাকে সম্পদ-সঞ্চরণ সহজতর করে তুলতে হবে এবং তা করতে হবে শ্রম-চলাচল সহজ করে নিয়ে আর শ্রম-চলাচল সাধন করতে হবে টাকা-পয়সা যুগিয়ে ও চাকুরী-বাকুরীর সুযোগ-সুবিধার বিস্তৃত খবর প্রদান করে। নব নব প্রযুক্তির আঙ্গিকে আবিষ্কারের নিমিত্তে সরকারকে গবেষণাকার্য পরিচালিত করতে হবে। অবশ্য, এই মতবাদীদল প্রযুক্তিক-অগ্রগতি নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে উৎসাহী নন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কার্যকরী প্রতিযোগিতা পরিবেশ নিজেই প্রচুর প্রকৌশলিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবন-আবিষ্কার নিশ্চিত করে এবং তা দিয়েই অবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন সাধিত হতে পারে।

এই মতবাদের সোচ্চার প্রবক্তারা মত প্রদান করেন যে, এমন কিছু ক্রিয়া-কর্ম রয়েছে যেগুলো উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় অথচ বেসরকারী প্রচেষ্টা সেসবের উন্নয়নে তেমন উৎসাহী নয়। কাজেই তাঁরা বলেন, সরকারকে তা সরাসরি সাধন করতে হবে, না হয় অনুদান (subsidy) যোগাতে হবে। তাছাড়া, যে সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা অত্যধিক বিরাজমান [যেমন গণ-উপযোগধর্মী শিল্প (Public utility industry)] সে সকল ক্ষেত্রে হয় সরকার কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে না হয় তা সরাসরি স্বীয় মালিকানায় নিয়ে আসবে। অবশ্য সরকারী এই সক্রিয়তা সমাজবাদীদের বিস্তৃত ও ব্যাপক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নামান্তর নয়। অথবা তেমন হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

অবাধ বাণিজ্যের অনুসারী দল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য সমাজবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। অন্যান্য আরও বহু প্রবক্তার ন্যায় তাঁরা কেন্দ্রীভূত কি বিকেন্দ্রীকৃত যে-কোন সমাজবাদের উপকারিতা নাকচ করে দেন এবং তা নিম্নে বর্ণিত কারণে:

ল্যাঙ্গ-লার্নার বর্ণিত বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা দক্ষ হতে পারে না। এমনকি, তা প্রচুর আত্মতৎপরতার সাথে চালালেও নিপুণ হওয়ার সুযোগ

---

৭. Simons-এর প্রাগুক্ত বই, পৃঃ ৬৫।

বড় একটা নেই।[৮] অথচ তা তেমন করে চালাবার সম্ভাবনা নেহায়েত নগণ্য অন্ততঃ দীর্ঘকালীন পরিসরে।

কাজেই, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে বাধ্য। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পরিচালনায় যে বিরাট আমলাগোষ্ঠীর প্রয়োজন তাদের দিয়ে আর যাই হউক অন্ততঃ সুষ্ঠু পরিকল্পনা চালানো সম্ভব নয়। কাজেই, সমাজতন্ত্রবাদের এই ফেরকাও সার্থক হতে পারে না। সুশিক্ষিত কর্মী খুঁজে পাওয়া মুশকিল; অদক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করা অসুবিধাজনক; কর্তাব্যক্তিদের কারসাজী অনুধাবন দুষ্কর, কাজেই তাদের বেহুদা 'রাজত্ব' গড়ে তোলার প্রবণতা দমন সুকঠিন; প্ররোচণা প্রদান ও মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা যথেষ্ট জটিল; অসাধু নীতি ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দমন অসুবিধাজনক এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়াতে উপযুক্ত নমনশীলতা অর্জন যথেষ্ট ঝটিকাসঙ্কুল।

এইত গেল অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার আরও বহু বেকায়দা বিরাজমান রয়েছে। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্ত চিন্তাধারা খর্ব করে দেয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সীমিত করে তুলে। গণতন্ত্র সিকায় উঠে। অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি এই একক্ষেত্রে একমত যে সমাজবাদী অর্থনীতি গৃহীত হলে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়।

এবারে 'গতিশীল প্রতিযোগিতা'র সমর্থকদের বক্তব্য শুনা যাক।[৯] অন্যদের সাথে তাঁদের গরমিল এক্ষেত্রে যে তাঁরা (১) ব্যক্তিগত

---

৮. এই জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দক্ষতা সম্পর্কে যেসব সমালোচনা প্রদান করা হয় তা জানতে হলে দেখুন, M. Friedman-এর প্রবন্ধ "Lerner on the Economics of Control" in Essays in Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago, 1953, 301-319.

৯. এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন: Committee for Economic Development, Research and Policy Committee, How to Raise Real wages, Cammittee for Economic Development, New York, 1950; Economic Report of the President under Eisenhower Administration; H.G. Moulton, Controlling Factors in Economic Dovelopment, The Brookings Institution, Washington, 1949; S. H. Slichter, The American Economy, A. Kropf, New York, 1948; এবং D.M. Wright, Democracy and Progress, The Macmillan Co., New York, 1948.

ব্যবসায় 'বৃহদাকার' পরিসর গ্রহণে ইচ্ছুক এবং (২) আয় পুনর্বণ্টন ও মোট চাহিদা স্থিতিকরণে সরকারী সক্রিয়তার কুফল সম্পর্কে অধিকতর সোচ্চার। এই কুফল উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে তাঁরা দাবী করেন।

অবশ্য অন্যান্যের মত তাঁরাও একচেটিয়া প্রভাবের ক্ষতিজনক দিকের কথা সমভাবে বলেন। কিন্তু, তাঁরা বেপরোয়াভাবে বৃহৎ বাণিজ্য ও বৃহৎ শ্রম সংস্থা ভেঙ্গে দিতে নারাজ। কেননা, তাঁরা যুক্তি দেন যে যদি তা করা হয় তাহলে বাণিজ্য-দক্ষতা হ্রাস পাবে এবং 'শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কমে যাবে। তাঁদের চোখে 'বৃহৎ' বাণিজ্য ও 'বৃহৎ' শ্রমিক-সংঘ মানেই সঙ্কোচনধর্মী রীতি-নীতি নয়। তদুপরি, বাজার-ব্যবস্থা রীতিসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাধারী হয়ে উঠলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা জন্ম নেয়। তাই তাঁরা বলেন এবং সেই অনুসারে যুক্তি দেন যে, তাতে সামাজিক অপচয় ঘটে ও প্রযুক্তিক অগ্রগতি প্রতিহত হয়। এই যুক্তিজালের ভিত্তিতে উক্ত মতের প্রবক্তারা এমন সংযোগ-বিরোধী আইন প্রবর্তনের কথা বলেন যা বৃহৎ ব্যবসা প্রতিহত করবে না অথচ বৃহৎ ব্যবসাকর্তৃক ছোট ছোট বাণিজ্য-সংস্থা কুক্ষিগত করে নেয়ার সুযোগও দেবে না। তেমনি নিত্য নূতন বাণিজ্য সংস্থা গজিয়ে উঠার প্রবণতাকেও প্রতিরোধ করবে না। এদিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য সংস্থাকে ঋণ প্রদানের সুবিধা দেবে এবং যথারীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরাদি যোগাবে। কি আভ্যন্তরীণ কি আন্তর্জাতিক বাজারে অবরোধ সৃষ্টিকারী আপাতঃ দৃশ্যমান কোন নীতি যেন গৃহীত হতে না পারে তৎপ্রতি সবিশেষ নজর রাখতে হবে। এক কথায়, এই মতে বিশ্বাসী ধনবিজ্ঞানীরা অধিকতর অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন করেন।

পূর্বোক্ত কার্যকরী প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী দল অর্থনীতির সর্ব শাখায় অসংখ্য উৎপাদকের কথা বলেন। বর্তমান দল অর্থাৎ 'গতিশীল'বাদীরা বলেন, 'বৃহৎ' বাণিজ্য ও 'বৃহৎ' শ্রম-সংস্থা এবং উচ্চতর প্রতি-যোগিতা পাশাপাশি চলতে পারে। তাতে ভয়ের কিছু নেই। বিশেষ করে, উদ্ভাবন-আবিষ্কারক্ষেত্রে অধিক প্রতিযোগিতা সুফলদায়ক বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা যুক্তি দেন যে, সমাজবাদী দল ও কার্যকরী প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী দল প্রযুক্তিক অগ্রগতির উপর অত্যধিক বিক্রেতায়ত্ত বাণিজ্যের 'শ্বাসরুদ্ধকর প্রভাবের বিষয়টি অতিরঞ্জিত' করে চিত্রিত করে থাকে।

এক বিষয়ে কিন্তু চলিষ্ণুবাদীরা বড্ড সোচ্চার। তাঁরা উন্নয়ন-অগ্রগতিতে বৃহৎ ব্যবসার ঋণাত্মক প্রভাব কম করে দেখেন বটে; কিন্তু আয়-পুনর্বণ্টন ও সাকুল্য চাহিদা স্থিরীকরণের নামে সরকারী সক্রিয়তা অগ্রগতি ধারায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বলে জোর মত প্রদান করেন। অবশ্য তাঁরা সরকারী প্রচেষ্টার সারবত্তা অস্বীকার করেন না। তবে তার মাত্রা ও উপায় সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, অত্যধিক মাত্রায় প্রগতিশীল আয়কর দ্রুত অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়। যুক্তি হিসাবে বলেন যে, এই কর ঝুঁকি-গ্রহণ প্রবণতা দুর্বল করে দেয় এবং সঞ্চয় পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অথচ ক্রমবর্ধমান করের এই হার হ্রাস করে দিলে একদিকে যেমন উন্নয়ন-ক্রিয়া বেগবান হতে পারে অন্যদিকে তেমনি করারোপের ভিত্তি বিস্তৃত হতে পারে এবং তাতে করে অন্যসব করের হার না বাড়িয়েও প্রয়োজনীয় কর রাজস্ব পাওয়া যেতে পারে। এমনকি দীর্ঘকালীন পরিসরে অধিকতর কর রাজস্ব পেতেও অসুবিধা না হতে পারে। মূলধন-মুনাফা, অবচয়ন (depreciation) এবং লভ্যাংশের উপর করারোপেও আরো অধিক উদার নীতি গ্রহণের জন্য তাঁরা পরামর্শ প্রদান করেন। সংক্ষেপে এক কথায়, এই দল যুক্তি দেন যে, উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কর-পদ্ধতির ঐসব প্রথা নমনীয় করে তোলা যেগুলো ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-স্পৃহা নিরুৎসাহিত করে।

সরকারকে কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সাকুল্য চাহিদা-নক্সা স্থিতিকরণে সরকারকে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে। এই প্রসঙ্গে গতিশীলবাদী দল নমনশীল মুদ্রানীতি ও সরকারী বাজেটে স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক নীতির উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। এতেও যদি ভয়াবহ সঙ্কট অথবা মারাত্মকধর্মী মুদ্রাস্ফীতিজনক চাপ এড়িয়ে চলা না যায় তাহলে কর-হারে পরিবর্তন ঘটিয়ে তা শোধরে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তবু যেন সরকারী ব্যয়ের অ-স্বয়ংক্রিয় উপাদানাবলীতে বেপরোয়া ওলট-পালট ঘটানো না হয়। যতদূর সম্ভব তা এড়িয়ে চলতে চেষ্টিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁরা মনে করেন, উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে চলা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব যেমন বজায় রাখা সম্ভব হবে তেমনি বেসরকারী খাতের উন্নয়ন-সম্ভাবনাও অব্যাহত থাকবে।

চক্রাকার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত সমস্যার প্রতিবিধানে এই সকল উপায়-পদ্ধতি ছাড়াও সরকারী কার্যক্রিয়া শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার দ্বারে যথাযথ খবরাদি পৌঁছে দেয়ার মত হতে হবে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে যেন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হয়। শ্রমিক গতায়াতের সুবিধা যেন করে দেয়া হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেন তার ট্রেনিংয়ের সুব্যবস্থা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে সরকারকে কিছুটা অগ্রণী হতে হবে। চলিষ্ণু মতবাদী দল আরো বলেন, জনকল্যাণ-মুখী কার্যকলাপ যেমন পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার অবশ্যই কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করবে। টাকা-পয়সা যুগিয়ে উন্নতি সাধনে সহায়তা করবে। এই দল মত প্রদান করেন যে দরিদ্রদেশে কিছুটা সরকারী লগ্নীর প্রয়োজন রয়েছে বটে। আমেরিকার মত দেশে জনসেবার নিমিত্তে যে সব সরকারী প্রচেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো সরকারী খাতে বজায় রাখায় তাঁদের আপত্তি নেই, তবে তাঁরা একটা ভয় প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, জনকল্যাণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে যেযে আয়ের এমন সব শাখায় কর-ভার বাড়িয়ে দেওয়া হবে যেগুলো নাকি উন্নয়ন প্রকল্পে টাকা যোগাতে অধিক সমর্থ। ফলে লগ্নী ক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই তাঁরা যুক্তি দেন যে, কল্যাণমুখী কার্য সাধনের নিমিত্তে যেন সঙ্কোচনধর্মী কর-হার আরোপ করা না হয়। তাহলে একদিকে দ্রুত উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত হবে অন্যদিকে তেমনি করের ভিত্তি (tax base) বিস্তৃত হতে পারবে।

'নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রে' বিশ্বাসী লেখকগোষ্ঠী উপরোক্ত দুই দলের কারো মতই উন্নয়ন-অগ্রগতি সাধনে বেসরকারী খাতের পারঙ্গমতা নিয়ে তেমন উচ্চাশাবাদী নয়।[১০] গতিশীল প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী দলের ন্যায় তাঁরা

১০. এই মতের প্রবক্তা—যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হচ্ছেন : Economic Report of the Prsident Under the Truman Administration ; A. Hansen, Economic Policy and Full Employment, McGrow-Hill Book Co., New York, 1947 ; J.M. Keyres, The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt, Brace and Company, New York, 1936 ; United Nations, Report of a Group of Experts (J.M. Clark, A. Smithies, N. Kaldor, P.Vri, E. R. Walker), National and International Measures for Full Employment, United Nations, New York, 1949 ; এবং S. E. Harris (ed.), Saving American Capitalism, Alfred A. Knopf, New York, 1948.

বিশ্বাস করেন না যে বৃহৎ বাণিজ্য ও বৃহৎ শ্রম-সংস্থা সংগঠন বন্ধ করে দিলেই উন্নয়ন-অগ্রগতি দ্রুত হারে এগিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য তাঁরাও শক্ত সংযোগ-বিরোধী আইনের পূজারী। কিন্তু, তাঁরা কার্যকরী প্রতি-যোগিতায় বিশ্বাসী দল অপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্য ও বৃহৎ শ্রম-ইউনিয়নের সত্যিকারের কার্যকলাপ অধিকতর মনোযোগের সাথে খতিয়ে দেখার পক্ষপাতি। ক্রমবর্ধমান করবোঝা কমিয়ে দিয়ে ঝুঁকি গ্রহণ ও সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে যথাবিহিত বিনিয়োগ পাওয়া যাবে বলে গতিশীলবাদীদের যে মত তাতে তাঁরা তেমন সায় দিতে নারাজ। তাঁরা বলেন, এই পথে একই সময়ে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান ও দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না। দীর্ঘকালীন বেসরকারী বিনিয়োগ আবহাওয়া অনুকূল করেই কেবল এই সকল লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে না—তাঁদের মত। তাই তাঁরা সরকারী ব্যয়ের ভূমিকায় অধিক বিশ্বাসী এবং সরকারী ব্যয়-কার্যক্রমের খরচ মেটাবার জন্য কর নক্সা অধিকতর প্রগতিশীল হওয়ায় তাঁদের আপত্তি নেই।

পূর্বোক্ত দুই দল ব্যয় সঙ্কোচের 'বাহ্যিক' কারণ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। বর্তমান দল কিন্তু তা নিয়ে অধিক উৎসাহী। পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে, জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে, আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ বিকাশে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সরকারী সক্রিয়তা তাঁদের চোখে প্রগতি প্রক্রিয়ার অগ্রগমনে বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া, শিক্ষার সম্প্রসারণে, গবেষণা কাজ জোরদার করায় এবং নগরাঞ্চল উন্নয়নে সরকারী ভূমিকা আরো তীব্রতর হউক তাই তাঁরা কামনা করেন।

গতিশীলবাদী দল সামাজিক নিরাপত্তা বিধান নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করে না। নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দল কিন্তু তা জোরালোভাবে দাবী করেন। তাঁরা যুক্তি দেন যে, সরকারী প্রচেষ্টায় সামাজিক নিরাপত্তা বিধান যেমনি মঙ্গলদায়ক তেমনি উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করায় অধিকতর ক্ষমতাবান। নিম্নহারে শুল্ক আরোপ এবং বর্ধিত-হারে বিদেশে বিনিয়োগ ও অগ্রগতি হার চড়া করে দিতে পারে। তাঁরা বলেন, তাতে রপ্তানী বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং পরিণামে অগ্রগতি পথ মসৃণ হতে পারে। মুদ্রাসঙ্কোচন-প্রবণতা বিরাজমান কালে সরকারী ব্যয় তড়িত গতিতে বাড়িয়ে দেয়া হলে চাকুরী-বাকুরী পরিস্থিতি সহজ হয় বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাছাড়া, এমতাবস্থায় ভোগ বাড়িয়ে দেয় এমন করের বোঝা হাল্কা করে দিলে প্রচুর লাভ পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের চোখে তখন সঞ্চয়-স্পৃহা বড় বলে প্রতিপন্ন হয় না। তাঁরা মনে করেন যে, অগ্রগতি বেগবান করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, সাকুল্য চাহিদা-চিত্র উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান রাখা এবং তা রাখা যেতে পারে সরকারী প্রচেষ্টায়, সরকারী ব্যয় কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে বর্ধিত করে দিয়ে। এতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম জোরদার হতে পারে এবং ঐই পরিবেশে বেসরকারী প্রচেষ্টা বেগবান হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে উন্নয়ন-অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে পারে।

এক্ষণে সর্বশেষ নীতি নিয়ে কথা বলা যাক। এই পন্থাটি পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্রিয়াকর্ম তথা সমাজবাদ ও এইমাত্র বর্ণিত দীর্ঘমেয়াদী অংশত পরিকল্পনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। 'পরিকল্পিত পুঁজিবাদ' নামে খ্যাত এই নীতির মূল বক্তব্য হচ্ছে যে সরকারী ভূমিকা বলিষ্ঠতর হতে হবে যাতে অগ্রগতির সামগ্রিক হার ও তার সাধারণ রূপ-কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।[১১] এই বক্তব্যের নির্গলিতার্থ এই যে, সরকার জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তাতে আকাঙ্ক্ষিত ও অর্জনক্ষম ভোগ-বিচিত্রা, বেসরকারী লগ্নী ও সরকারী ব্যয়-নক্সা অন্তরীত করে নেবে। অতঃপর রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন-পদ্ধতি নির্ণিত হবে। এই মতের প্রবক্তারা যুক্তি দেন যে, সমগ্র উৎপাদন-উপকরণ রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়ার প্রয়োজন নেই। তেমনি পরিপূর্ণ সরকারী পরিকল্পনাও কাম্য নয়। কেননা, তাতে দক্ষতা ব্যহত হতে পারে এবং গণতন্ত্র মারা পড়তে পারে। তদস্থলে সরকার বরং গণ-উপযোগধর্মী ও মৌলিক শিল্পসমূহ স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে পারে। বাকীগুলো বেসরকারী মালিকানায় থাকতে পারে। তাহলে

১১. এই মতাদর্শ পেতে পাবেন তাঁদের লেখায় : W. Beveridge, Full Employment in a Free Society, W. W. Norton and Company, New York, 1945 ; Sir Oliver Franks, Central Planning and Control in war and Peace, Harvard University Press, Cambridge, 1947 ; C. Landauer, Theory of National Economic Planning, University of California Press, Berkeley, 1947 ; W. A. Lewis, The Principles of Economic Planning Dennis Dobson Ltd. London ; এবং B. Wootton, Freedom Under Planning, the University of North Carolina Press, Cuapel Hill, 1945.

একাধিকারিক প্রবণতার সমস্যা যেমন এড়ানো যেতে পারে তেমনি বিস্তৃত ভিত্তিতে দক্ষ পরিকল্পনা পরিচালন সম্ভব হতে পারে।

উন্নয়ন-অগ্রগতির খাতিরে বেসরকারী খাতের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে তেমন ঘাটাঘাটি করা উচিত নয়। তাদের বেলায় পরোক্ষ নীতি অধিক ফলদায়িনী হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। এই মতের ধারক ব্যক্তিরা তাই বলেন, ভোগ ও সঞ্চয় পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রা ও রাজস্ব-নীতির ব্যাপক ব্যবহার করা উচিত। এই দুই নীতি দিয়ে বিনিয়োগ প্রবাহও সঠিক খাতে প্রবাহিত করা যেতে পারে। অবশ্য প্রয়োজনের তাগিদে সরাসরি দর-নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদ-বিতরণ পন্থা অনুসরণে আপত্তি নেই। বিশেষ করে নয়া শিল্প স্থানীয়করণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বেলায় প্রত্যক্ষ এই সকল নীতি প্রয়োজন হতে পারে।

সমপ্রসারিত পরিকল্পনা সমর্থনের পেছনে এই মনোভাব ও বিশ্বাস ক্রিয়া করে: অবাধ বেসরকারী প্রচেষ্টা উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সক্ষম নয়। তেমনি অন্যান্য অর্থনৈতিক লক্ষ্য হাসিলেও পুরোপুরি সমর্থ নয়। এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকগোষ্ঠী মনে করেন যে, সরকারকে যেহেতু কিছুটা কার্য সম্পন্ন করতেই হবে, কাজেই তা বিস্তৃত হতে আপত্তি কি? কাজেই, সরকারকে ব্যাপক ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ায় আপত্তি করা বোকামির নামান্তর। তাঁরা যুক্তি দেন যে, একটু-আধটু পরিকল্পনা গ্রহণ করে গড়ধর্মী দীর্ঘমেয়াদী জড়তা ও পাকাপোক্ত বেকারত্ব রোধ করা যায় না।

পরিকল্পিত পুঁজিবাদে বিশ্বাসী ধনবিজ্ঞানীদল অবশ্য স্বীকার করেন যে, পরিকল্পনা গৃহীত হলে অদক্ষতা জন্ম নিতে পারে। তবে ব্যাপক ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা-পদ্ধতি ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হলে এই সমস্যা তেমন প্রকট হয়ে উঠতে পারবে না। তাছাড়া, এই জাতীয় পরিকল্পনা রাজনৈতিক স্বাধীনতাও খর্ব করবে না। এক কথায়, তাঁদের মতে পরিকল্পিত পুঁজিবাদ দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চত করতে পারে অথচ পরিপূর্ণ পরিকল্পনার মারাত্মকধর্মী অসুবিধাগুলো এড়িয়ে চলতে পারে। এক্ষণে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের আলোচনা স্মরণ করুন। ঐ অধ্যায়ে আলোচিত যুদ্ধোত্তরকালীন উন্নয়ন নীতিমালা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ধনীদেশগুলো উপরোক্ত প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মেনে চলেছে। ফ্রান্স ও বৃটেন মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত পুঁজিবাদ-প্রথা অনুসরণ করে চলেছে, আমেরিকা গতিশীল

প্রতিযোগিতা ও নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের ধারেকাছে্ব পরিস্থিতি মেনে এগিয়ে চলেছে। জার্মান উন্নয়ন নীতিমালাও এই দুই পরিস্থিতির কাছাকাছি পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

বিভিন্নমুখী এইসব উপায়-পদ্ধতির তুলনামূলক গুণাগুন বিচার করার সুবিধা আমাদের নেই। আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়। কারণ, সুবিধা-অসুবিধা বিচারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলী অর্জনের উপর তাদের প্রভাব যেমন বিচার্য তেমনি অন-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ এই সকল অভীষ্ট লক্ষ্যের পরিমাপে প্রতিটি পরিস্থিতির মূল্যায়ন প্রভাবিত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রথা-পদ্ধতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যায়। যে কোন নীতির মূল্যায়নে এই সকল প্রভাব অধিক দৃষ্টির দাবী রাখে। উন্নয়ন-অগ্রগতি বহির্ভূত অর্থনৈতিক অন্যান্য উদ্দেশ্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং দ্রুত অগ্রগতি সাধনের প্রথা-পদ্ধতি ও তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় প্রতিটি নীতির মূল্যায়নে অত্যন্ত প্রাসংগিক হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য। বিদ্যমান পরিবেশে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধারা বজায় রাখার সম্ভাবনা ও বিকল্পধর্মী বিভিন্ন নীতির মূল্য নির্ধারণে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

একটা কথা অবশ্য সত্য, যে কয়টি নীতি উদ্ভাষিত হয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে তাদের মধ্যে একটা অবিচলিত স্রোত লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সাধারণ কর্মপন্থা প্রায় সবগুলো উপায়-পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। প্রায় সব মতের প্রবক্তারাই শিক্ষা ও পেশাগত ট্রেনিংয়ে সরকারী সক্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। তেমনি বিশুদ্ধ গবেষণাক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আরও সবল হওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রদান করেন। চাকুরী-বাকুরীর খোঁজ-খবর, শ্রম-চলাচল সুগম করে তোলার উপায়-পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা আরো জোরদার হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ লেখক জোর আরোপ করেন যে, বর্তমানে ধনীদেশগুলোতে সংযোগ-বিরোধী যে আইন বিদ্যমান রয়েছে তা আরও দৃঢ় হওয়া উচিত। বিশেষ করে, বাণিজ্য-প্রতিরোধক সংহতি অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে বলে মত প্রদান করেন। সবাই যেন অবাধে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে, বিদ্যমান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলো যেন নব নব শিল্পোদ্যোগ বানচাল

করে দিতে না পারে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ছোটখাট ব্যবসায়ীকে আরও অধিক ঋণের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যাপারেও প্রায় সবায় একমত।

সব মতের লেখকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পরিসরে ক্রম-প্রসারের কথা বলেন। তা দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে বর্ণনা করেন। অবশ্য মতে পার্থক্য না থাকলেও পথ নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন উপায়ে তা হাসিলের নির্দেশ দেন। বেসরকারী উদ্যোগে উন্নয়ন-কার্যক্রম বাস্তবায়নের পক্ষপাতি ধনবিজ্ঞানী গোষ্ঠী অতি জোরের সাথে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে মত দেন। তাঁরা আরও বলেন, ব্যক্তিগত মূলধন সঞ্চরণে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। বিস্তৃত সরকারী পরিকল্পনায় বিশ্বাসী দল বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিকল্পিত পথ অবলম্বনের কথা বলেন। তাঁরা আরও দাবী করেন যে, বাহ্যিক মিতব্যয়িতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এমনসব ক্ষেত্রে সরকারকে কিছুটা প্রকল্প অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই দাবীর পরিসর নিয়ে মারাত্মক ভেদাভেদ বর্তমান। অধিকাংশ লেখক শ্রম-কল্যাণ সাধনের জন্য কল্যাণ-প্রকল্প গ্রহণের পক্ষে রায় দেন। প্রায় সব ধনবিজ্ঞানী ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি এড়িয়ে পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থান পরিস্থিতি হাসিলের উদ্দেশ্যে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির ব্যাপক ব্যবহারের জন্য মত প্রদান করেন।

সুতরাং, বলা যায় উন্নয়ন-অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী সক্রিয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে বেশ কিছুটা মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণ এই মতৈক্য ভিত্তি উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করার প্রধান সব শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না। অর্থাৎ বিভিন্ন মতের ব্যক্তি প্রগতি-প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করার যেসব শর্ত নির্দেশিত করেন সে সব শর্ত উপরোক্ত মতৈক্য ভিত্তি ধরা পড়ে না। বেশ কিছুটা বাইরে থেকে যায়। কার্যকরী প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠী বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা নিশ্চিত করার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার কথা বলেন। গতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্বাসী দল দাবী করেন যে, উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উচ্চতর আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর করের বোঝা লাঘব করায়। নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের প্রবক্তারা জোর আরোপ করেন অধিকতর সরকারী ব্যয়ে। সরকারী ব্যয়-পরিমাণ অধিক

হয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল করে দেবে এবং সেই অনুকূল স্রোতে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ স্বর্ণ-ফলন ফলাবে—এই তাঁদের অভিমত। পরি-কল্পিত পুঁজিবাদে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ যুক্তি দেন যে, অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি পেতে হলে সরকারকে বেশ কিছু নির্বাচিত শিল্প স্বয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নিতে হবে এবং শক্তহাতে বেসরকারী খাত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমাজবাদী দল সবায়কে ছাড়িয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, অর্থনীতির সর্বত্র সরকারী মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তবেই কেবল বেগবান, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক অগ্রগতি পাওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে নয়।

২. উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার সম্ভাবনা

ধনী দেশে উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে দেখা বেশ লাভজনক প্রতিপাদ্য হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে চর্চাটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। এমনকি উন্নয়ন-ক্রিয়া জোরদার করার নীতিমালার মূল্যায়ন অপেক্ষা তা আরও জটিলতর। কিছুসংখ্যক লেখক অবশ্য হিসাব-নিকাশ কষে অদূরভবিষ্যতের উন্নয়ন-সম্ভাবনা পরিমাপ করতে চেষ্টা করেছেন।[১২] তবে তাঁদের এইসব ভবিষ্যদ্বাণী স্থূল সঙ্কেতের উর্ধ্বে যেতে পারেনি।[১৩]

সাধারণভাবে প্রগতি-প্রক্রিয়ার এই সব হিসাব-নিকাশ অত্যধিক উচ্চ

---

১২. আমেরিকান জাতীয় আয় বর্ধনের পূর্বাভাস যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : C. Clark, the Economics of 1960, Macmillan and Co., Ltd., London, 1942 ; Dewhurst and Associates, America's Needs and Resources, A New Survey, The Twentieth Century Fund, New York, 1955 ; The President's Materials Policy Commission, Resources for Freedom, U.S. Government Printing office, Washington, 1952, II ; S.H. Slichter, "How Big in 1980 ?" Aplantic Monthly Nov. 1949, 39-43. আমেরিকার উন্নয়ন-সম্ভাবনা নিয়ে সংখ্যা-গণিত বহির্ভূত সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় J. S. Davis-এর "Economic Potentials of the United States" নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি R. Lekachman সম্পাদিত National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

১৩. দীর্ঘকালীন পরিসরে উন্নয়ন-পূর্বাভাস দেয়ার সমস্যা ও ঝঞ্ঝাট নিয়ে আলোচনা পাবেন এই পুস্তকে : Long-Rauge Economic Projection, National Burean of Economic Research, Princeton University Press, Princeton, Part I.

আশাবাদীসম্পন্ন হতে দেখা যায়। আমেরিকার বেলায় কথাটা বিশেষভাবে সত্য। যেসব লেখক আমেরিকান অগ্রগতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এ-পর্যন্ত লিখেছেন তাঁদের প্রায় সবার মায়াময় রঙ্গীন চিত্র এঁকেছেন। Presidents Materials Policy Commission প্রদত্ত রিপোর্ট তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই রিপোর্টটি অত্যধিক নির্ভরযোগ্য বলেও খ্যাত। পূর্বাভাস প্রদানের উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কেও এই বিবরণীটির প্রদত্ত পথ প্রায় সবায় মেনে চলেন। এই কমিশন ১৯৭৫ সালের জন্য আমেরিকার মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব দিয়েছে। তথাকথিত এই প্যালি-কমিশন সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঘণ্টার হিসাবে জনপ্রতি (Perman-hour) বার্ষিক উৎপাদন শতকরা ২½ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে। কমিশনের চোখে এই বৃদ্ধি অকল্পনীয় কিছু নয়। কমিশন আরও পূর্বানুমান করে যে, ১৯৫০ ও ১৯৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ঘণ্টার হিসাবে শ্রমিকপিছু কার্যকাল শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ নেমে আসবে। উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিক-সময়কাল সম্পর্কের এই ভিত্তিতে এবং ১৯৭৫ সালের শ্রমিক শক্তির হিসাবে (শ্রমিক শক্তির হিসাব নিয়েছেন ঐতিহাসিক অনুপাতের ভিত্তিতে এবং এই অনুপাতকে আদমশুমারী ব্যুরোর ১৯৭৫ সালের জনসংখ্যার পরিমাণ দিয়ে পূরণ করে) কমিশন মন্তব্য করেছে যে, প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ "১৯৭০-১৯৮০ দশকের যে কোন সময় ১৯৫০ সালের পরিমাণ অপেক্ষা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া প্রায় সুনিশ্চিত।[১৪]"

মাথাপিছু আয়ের পরিমাপে প্রামাণিক তথা চূড়ান্ত হিসাব পাওয়া যেতে পারে ঘন্টাপিছু শ্রমিকের ফলন দিয়ে। আমেরিকার দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক এই গড় শতকরা ২ ভাগ। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লেখকই আগামী ১০।১৫ বৎসরের হিসাবে এই গড় ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা বরং তাঁদের জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ হিসাবে বার্ষিক ২½ শতাংশ বৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ে থাকেন। ১৯৪০-১৯৫০ দশকে গড়ে বার্ষিক বৃদ্ধি এই হারে নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন লেখক আবার এই মাত্রাও ছাড়িয়ে যান। তাঁরা বলেন, বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি ঘটতে পারে।[১৫] কার্যকাল

১৪. Presidents Materials policy Comission, II 112.

১৫. Slichter-এর প্রাগুক্ত বই; W. S. Woytinsky and Associates, Employment and Wages in the United-states, The Twentith Century Fund, New York, 1953.

সময় অপরিবর্তিত অবস্থায় ২½ ভাগ বৃদ্ধি ও ৩ ভাগ বৃদ্ধি হিসাবে আগামী ২৫ বৎসরে শ্রমিকপিছু উৎপাদন যথাক্রমে ৮৫ শতাংশ ও ১০৯ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে।

বৃটেনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নিয়ে হিসাব-নিকাশে বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রদত্ত অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য ১৯৫৪ ও ১৯৭৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জীবনযাত্রার মান তথা মাথাপিছু ভোগ ও সরকারী কল্যাণব্রতী ব্যয় দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব,— অনুসারে এক বিশ্লেষক মন্তব্য করেন যে হ্যাঁ, তা অর্জন করা সম্ভব্য হতে পারে।[১৬] এই হিসাবে মনে করা হয় যে, "প্রতি ছয় বৎসরে মাথাপিছু উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।"[১৭] অন্য এক হিসাবদাতা মন্তব্য করেন যে, শান্তিপূর্ণ সময়ে এবং পূর্ণ কর্ম-সংস্থান পরিস্থিতিতে বার্ষিক উৎপাদনশীলতা শতকরা ২ ভাগ হারে বেড়ে যেতে পারে।[১৮] পূর্বোক্ত প্যালি কমিশন বৃটেনের এবং ইউ-রোপের অন্যান্য অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলোর জন্যও হিসাব দেয় যে, বৃটেনে উৎপাদনশীলতা আমেরিকার হারে অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ২½ ভাগ হারে বেড়ে যেতে পারে।[১৯]

বৃটিশ অগ্রগতির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে এই ক্রমাবনতির ফলে বৃটেনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ব্যহত হতে বাধ্য।[২০] বহু লেখক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বৃটেন

---

১৬. A.A. Adams and W.B. Reddaway, The British Economy—A Longer view (Reprint series, No. 90) University of Cambridge, Department of Applied Economics, Cambridge, 1955, 5.

১৭. ঐ, পৃঃ ৪।

১৮. Beveridge-এর প্রাগুক্ত বই ; পৃঃ ৩৯৭।

১৯. President's Materials Policy Commission প্রদত্ত পূর্বোক্ত রিপোর্ট, II, পৃঃ ১৩১।

২০. এই সমস্যার সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন, P. D. Henderson "Retrospect and Prospect : The Economic Survey 1954," Bulletin, Oxford University Institute of Statistics, XVI, Nos. 5-6, 137-177 (May and June, 1954) এবং পূর্বোক্ত Bulletin-এর XVII, No. 1 (Feb. 1955) সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের উপর H.G. Johnson, P. Streeten, J. R. Sargent, R. L. Morris, D. Seers, R. Nurkse, C. Kennedy, W. A. Lewis, N. H. Leyland ও G. D. N. Worswick প্রদত্ত সমালোচনা।

রপ্তানী-বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান দুর্দশার সম্মুখীন হবে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশ বৃটেনের উপর ক্রমবর্ধমান চাঁপ দিতে থাকবে। তাঁরা আরও বলেন যে, সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য-শর্ত বৃটেনের বিপক্ষে যেতে থাকবে। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে বাণিজ্য-শর্ত বৃটেনের জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠবে। কাজেই, বিদ্যমান উন্নয়ন ধারা ক্রমাগত হারে লেনদেন উদ্বৃত্তের সমস্যার সম্মুখীন হবে। অন্যকথায়, দ্রুত অগ্রগতি আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের সাথে অসামঞ্জস্য হয়ে উঠবে। তার নিগূরার্থ এই যে, আন্তর্জাতিক স্থিতিসাম্যে সাযুজ্য ঘটানোর নিমিত্তে হয়ত এমন সব নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যার ফলে উচ্চ উন্নয়ন হার বাধাপ্রাপ্ত হবে। অন্যদিকে, লেন-দেন উদ্বৃত্তে স্থিতিসাম্য বজায় রাখার নিমিত্তে বিনিময় হারে যথাবিহিত সংশোধন ঘটিয়ে নিলে বৃটেন হয়ত বাণিজ্য-শর্তের প্রতিকূল প্রভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিজনিত সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশ খুইয়ে বসতে পারে।

এই জাতীয় যুক্তিতর্ক থেকে বহুবিধ উপসংহার উৎসারিত হতে দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, বৃটেনের উচিত হয় বেগবান অগ্রগতি সাধনে প্রবৃত্ত না হওয়া, না হয় স্বীয় সম্পদ বিদেশে পাঠিয়ে অথবা বিনিয়োগ ঘটিয়ে নিজ দেশের জনসাধারণের প্রকৃত আয় বাড়বার প্রচেষ্টা করা।[২১] অন্যরা যুক্তি দেন যে, এই সবে যেয়ে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং এমন সব শিল্পোন্নয়নে ব্রতী হওয়া উচিত যার ফলে বৃটেনে আমদানী প্রয়োজনীয়তা কমে যেতে পারে।[২২] আবার আরেক দল রয়েছে যাদের মত হচ্ছে যে রপ্তানী শিল্পে উৎপাদনক্ষমতা বাড়াবার জন্য বিশেষ চেষ্টা নেয়া বাঞ্চনীয়।[২৩]

৩. অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিষ্ঠানিক আকার ধারণ

অদূর ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা নিয়ে বলতে যেয়ে বহু ধনবিজ্ঞানী বস্তুতঃ মনে করেন যে, উন্নয়ন বজায় রাখার প্রধান প্রধান

২১. উপরোক্ত Bulletin-এ প্রকাশিত H. G. Johnson-এর প্রবন্ধ "Economic Expansion and the Balance of payments" দেখুন।

২২. E. A. G. Robinson 'The Changing structure of the British Economy,' Economic Journal, LXIV, No. 255, 443-461 (sept. 1954).

২৩. পূর্বোক্ত Bulletin প্রকাশিত G. D. N. Worswick-এর 'Flexibility and the stimulations of Investment' এবং R. Nukst-এর "Internal Growth and External Solvency নামক প্রবন্ধদ্বয় দেখুন।"

উপকরণসমূহ ধনীদেশের সামাজিক লতাতন্তুতে প্রতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করে রয়েছে। এই কথার অর্থ আবশ্য এই নয় যে, এই সব অর্থবিজ্ঞানীরা প্রগতি প্রক্রিয়া বেগবান করে তোলার জন্য নীতি-পদ্ধতি পরিবর্তনের জোর আরোপ করেন না অথবা উন্নয়ন পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে মাথা ঘামান না। না, তা নয়। তবে তাঁরা মূলতঃ ধরে নেন যে, আগামী ২০।২৫ বৎসরের অগ্রগতির জন্য একটা শক্তিশালী আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রথা বিদ্যমান রয়েছে।

ধনী ও দরিদ্র দেশে উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভাবনার কিছু সাম্প্রতিক বিশ্লেষণের বৈপরীত্ব-ধারা লক্ষ্য করলে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। দরিদ্র দেশের উন্নয়ন সমস্যার পর্যালোচনায় ধনবিজ্ঞানীরা আশু উপায়-পদ্ধতি গ্রহণের উপর জোর দেন। তাঁদের দৃষ্টিতে অবিলম্বে এমন কার্য-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা উচিত যার ফলে বস্তুগত মঙ্গল অর্জনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে পারে। এই মনোভঙ্গি যেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের গুরুত্বপূর্ণ পোষক হয়ে উঠতে পারে। তাই তাঁরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে জোর দেন। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বজায়ের কথা বলেন। ঋণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার পরামর্শ দেন। উদ্যোগজনিত স্পৃহা জন্ম নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা বলেন। সঞ্চয়মাত্রা বাড়াবার সুপারিশ করেন। ধনীদেশের বেলায় কিন্তু তাঁরা তত সোচ্চার নয়। যদিওবা সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে এই সব বিষয়াবলীর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু চলতি সময়ের জন্য এই সব প্রয়োজনীয়তা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলে মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ধনীদেশের অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ধারা বজায় রাখার জন্য এই সব প্রয়োজনীয়তার সহসা পরিবর্তন আবশ্যক বলে মনে করেন না।

বহু ধনবিজ্ঞানী আবার বিশ্বাস করেন যে, অন্ততঃ আগামী ২৫ বৎসর অবধি ধনতান্ত্রিক পরিবেশেই উন্নয়ন-অগ্রগতির এই সব প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখা যাবে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ধারাপর্ব পর্যালোচনা করে এই মতের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে যেমন ধরুন প্রযুক্তিক অগ্রগতির কথা। প্রযুক্তিক-অগ্রগতি-সম্ভাবনা অনুকূল বলে মনে হয়। প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে লক্ষ্য করা যায় যে, বাণিজ্যিক কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা তেমন একটা জোরদার হবে না যে উদ্ভাবন-আবিষ্কার একেবারে রহিত করে দেবে। বরং গবেষণা কাজে সরকারী সক্রিয়তা, বাণিজ্য জগৎ ও অন্যান্য বেসরকারী

প্রচেষ্টা সঙ্কেত দেয় যে, প্রযুক্তিক অগ্রগতি ধীরে ধীরে ধনীদেশের অর্থনৈতিক নক্সায় 'প্রতিষ্ঠানিক' আকারে অঙ্গীভূত হয়ে চলেছে। অন্য কথায়, গবেষণামূলক কাজ যেন আস্তে আস্তে বৃহৎ সুসম্পন্ন সুশৃঙ্খল শিল্পে পরিণত হয়ে উঠেছে। ফলে নিয়মিত হারে উদ্ভাবন-আবিষ্কার সম্পন্ন হওয়ার প্রবণতা জোরদার হয়ে চলেছে। তাছাড়া, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গুণাত্মক প্রয়োজনীয়তা মেটাবার সমস্যা ও বিকটাকার ধারণ করবে বলে মনে হয় না। সঞ্চয়-আয় অনুপাতের দীর্ঘকালীন চলাচল ভয়াবহ হয়ে উঠার সঙ্গত কারণ লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই, অদূর ভবিষ্যতে অগ্রগতি-ধারা বিপন্ন হতে পারে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধনীদেশে সঞ্চয়-আয় অনুপাত মোটামুটি অপরিবর্তনশীল অবস্থায় বিরাজ করছে। তদুপরি পূর্বতন কালের তুলনায় আধুনিক কালে প্রযুক্তি বিদ্যার ন্যায় সঞ্চয় প্রবাহও অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে।

তদ্রূপ, অধিকাংশ লেখক মত পোষণ করেন যে, আগামী ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদ সরবরাহ উন্নয়ন-অগ্রগতি বজায় রাখার পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না। এমন প্রমাণাদিও পাওয়া যায় না যে, অদূর ভবিষ্যতে 'বৃহৎ' বাণিজ্য কি 'বৃহৎ' শ্রম-সংস্থা অথবা 'বৃহৎ' সরকার অর্থনৈতিক পরিবেশ এমন বিষাক্ত করে তুলবে যাতে অগ্রগতি প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়বে। বস্তুতঃ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বহু ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে, বর্তমান সরকারী সক্রিয়তা পরিবেশে মুদ্রাস্ফীতি বিবর্জিত পূর্ণ চাকুরী-বাকুরী সংস্থানজনিত সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়ে গিয়েছে। কাজেই, এই শর্তসাপেক্ষে (এবং বৃহদাকার যুদ্ধের অনুপস্থিতিতে) এমন কোন মারাত্মক কারণ লক্ষ্য করা যায় না যার জন্য বিনিয়োগ-ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এবং সন্তোষ-জনক উন্নয়ন-হার অর্জন ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

একক্ষেত্রে কিন্তু বেশ একটু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নিকট ভবিষ্যতের অগ্রগতি-সম্ভাবনা হয়ত সম্পদ-নমনশীলতার অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। অধিকাংশ লেখক এই ভয় প্রকাশ করে থাকেন। প্রযুক্তিক অগ্রগতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহ ইত্যাদি সাধারণ বিষয় নিয়ে তেমন মাথা না ঘামালেও বহু লেখককে সম্পদ-অনমনীয়তার ভয় প্রকাশ করতে শুনা যায়। সমস্যাটা এইরূপ: স্রোতশীল উন্নয়ন-

অগ্রগতি ধারার শক্তিশালী প্রবাহের সাথে তাল রেখে সম্পদ-বিতরণ-নক্সা যথাবিহিত পথে এগুতে পারবে কি যাতে সন্তোষজনক প্রগতি-প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্ফুটনোন্মুখ এই সব সম্ভাবনা অর্জন সম্ভব হতে পারে? সমস্যাটি বড্ড জটিল। কিন্তু, অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, এই কারণে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা বর্জন করার প্রয়োজন হতে পারে না।

সে যাই হউক, স্বল্পকালীন উন্নয়ন-অগ্রগতি-সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে মত প্রকাশ করলেও বহু ধনবিজ্ঞানী দূর-ভবিষ্যৎ নিয়ে পূর্বাভাস দিতে নারাজ। তবে আজকের দিনের ধনবিজ্ঞানীর জন্য সেকালের রিকার্ডো ও একালের হ্যানসেনের মত লেখকদের হতাশা-বিভ্রান্তি পরিবেশ তত অন্ধকার নয়। রিকার্ডো ও হ্যানসেনের মত ধনবিজ্ঞানীর চোখে প্রগতি-প্রক্রিয়ার বেগবান প্রবাহ সম্পূর্ণ আপত্তিকর ও অসাধারণ ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল। কাজেই, অতীতের যে সব প্রেরণাদায়িনী স্রোত উন্নয়ন-অগ্রগতি বেগবান করে তুলেছিল তাদের অবসানে অগ্রগতি-হার নিম্নগামী হয়ে উঠা আর বিচিত্র কি! তাই তাঁরা তাঁদের যুক্তিতর্কে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। বলেছেন ভবিষ্যতের রঙ্গিন ঝলমলে স্বপ্ন যাঁরা আঁকছেন তাঁদের কাঁধে ভূত চেপে আছে। তাই তাঁরা আশাবাদী মন নিয়ে উন্নয়ন-অগ্রগতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন। কিন্তু, একদিন তাঁদেরকে এর খেসারত যোগাতে হবে।

কিন্তু, সাম্প্রতিক কালের ঘটনাপ্রবাহ তথা ধনীদেশে উন্নয়ন-ধারা বজায় রাখার প্রয়োজনাবলী প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিকে অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই বলা যায় যে, এইসব যুক্তিতর্কের বোঝা এক্ষণে বরং নিরাশাবাদীদের স্কন্ধে বর্তানো উচিত। অন্য কথায়, আমরা বলব যে বিদ্যমান পরিবেশে ধনীদেশে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি-ধারা সুনিশ্চিত বলে ধরে নেয়া যায়। কাজেই, হতাশাবাদীদের উচিত এমন সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা যা দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে প্রচলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন সাধনহেতু উন্নয়ন প্রয়োজনাবলীর বর্তমান প্রতিষ্ঠানিকতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। অতীতের বহু *ধনবিজ্ঞানীর ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে এই পথে বরং দীর্ঘকালীন* পরিসরে উন্নয়ন-সম্ভাবনা যাচাই করা অধিকতর বাস্তবসম্মত।

অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকা

সাময়িক পত্র-পত্রিকার শব্দ-সংক্ষেপ

Amer. Anthro.	American Anthropologist.
Amer. J. Econ. Soc.	American Journal of Economics and Sociology.
Amer. Soc. Rev.	American Sociology Review.
A.E.R.	American Economic Review.
A.E.R.P.P.	American Economic Review. Papers and Proceedings.
Annals	The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
A.P.S.R.	American Political Science Review.
C.J.E.P.S.	Canadian Journal of Economics and Political Science.
Caribbean Econ. R.	Caribbean Economic Review.
Col. J. Int. Aff.	Columbia Journal of International Affairs.
Econ. Bull. A.F.E.	Economic Bulletin for Asia and the Far East.
E. H. R.	Economic History Review.
Econ. Hist.	Economic History.
Econ. Internaz.	Economia Internazionale.
Econ. J.	Economic Journal.
Explorations	Explorations in Entrepreneurial History.
Econ. Record	Economic Record.
Harv. Bus. R.	Harvard Business Review.
I.M.F. Staff Papers	International Monetary Fund Staff Papers.
Indian Econ. J.	Indian Economic Journal.
Indian Econ. R.	Indian Economic Review
Indian J. Econ.	Indian Journal of Economics.

Int. Aff.	International Affairs.
Int. Lab. R.	International Labour Review.
Int. Soc. Sci. Bull.	International Social Science Bulletin.
J. Econ. Hist.	Journal of Economic History.
J.P.E.	Journal of Political Economy.
Lioyds B.R.	Lioyds Bank Review.
Manchester School.	Manchester School of Economic and Social Studies.
Mid. E. J.	Middle East Journal.
O.U.I.S. Bull.	Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics.
O.E.P.	Oxford Economic Papers.
Q.J.E.	Quarterly Journal of Economics.
Rev. of Econ. Stat.	Review of Economics and Statistics.
R. Econ. Stud.	Review of Economic Studies.
Rural Soc.	Rural Sociology.
Soc. Res.	Social Research.

পরিশিষ্ট-ক

উন্নয়ন অগ্রগতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক : নির্বাচিত পাঠ্যসূচী

নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধাবলী উন্নয়ন-সমস্যা সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। এইগুলি পাঠ করলে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক নিয়ামক ও প্রেষণাগত বিষয়ের আলোচনা অনুধাবন সহজ হতে পারে। এই সকল গ্রন্থাদি উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধে কতটুকু সংশোধন প্রয়োজন তা সাধারণভাবে আলোচনা করেছে এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানিক আঙ্গিক ও মূল্য-নক্সায় উন্নয়ন গতি কতটা বেগবান করা যাবে তার দিক-নির্দেশ দিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে সবলতা, উৎপাদন ক্ষমতা ও উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রভাব-জাত ফলাফল তুলে ধরেছে এবং বেগবান অগ্রগতির প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করেছে।

Anderson, C.A., and M.J. Bourman, "A Typology of Societies," Rural Soc., XVI, No. 3,255-271 (Sept. 1951) .

Bauer, C., "The Pattern of Urban and Economic Development : Social Implications," Annals, CCCV, 60-69 (May. 1956).

Barnett, H.G., "Invention & Cultural Change," Amer Anthro, XLIV, 14-30 (Jan-Mar. 1942)

Belshaw, C.S., "The Cultural Milien of the Entrepreneure", Explorations, VII, No. 3 (Feb. 1955)

Boulding K., "Religious Foundations of Economic Progress", Harv. Bus, R., XXX, No. 3, 33-40 (May-June. 1952)

Browne, G. St. J. Orde, The African Labourer, Oxford University Press, London, 1933.

Brozen, Yale, "Social Implications of Technological Change," Social Science Research Council Items, 3, 31-34 (Feb.15, 1951)

Clark S.D., "Religion & Economic Backward Areas,"A.E.R.P.P, XLI, 259-265 (May. 1951)

Comhaire, J.L., "Economic Change and the Extended Family." Annals, CCCV, 45-52 (May. 1956).

Cox, R.W., "Some Human Problems of Industrial Development", Int. Lab. R., LXVI, No. 3, 246-267 (Sept. 1952).

Davis, J.M., Modern Industry and the African, Macmillan Co., London, 1933.

—, "A conceptual Analysis of Stratification," Amer, Soc Rev., 217-229, Dec. 1940.

Davis, K., 'Population & Change in Backward Areas", Col. J. Int. aff., 43-49, Spring, 1950.

—, Population of India and Pakistan, Princeton University Press, Princeton, 1951.

—, "The unpredicted Pattern of Population Change", Annals, CCCV, 53-59 (May 1956).

Dube, S.C., Indian Village, Cornell University Press, Ithaca, 1955.

Entrepreneurship & Economic Growth, Conference, Social Science Research Council & Harvard University Research Centre in Entrepreneurial History, Cambridge, mass, Nov. 1954.

Firth, H.. "Some Features of Primitive Industry," Econ. Hist., I, No. 1, 12-22 (Jan. 1926).

Fisher, S.N. (ed.) Social Forces in the Middle East, Cornell University Press, Ithaca, 1955.

Gerschenkron, A., "Social Attitudes, Entrepreneurship and Economic Development," Explorations, VI, No. 1, 1-19 (1953)

Gerth, H.H., and C.W. Mills, From Max Weber, Routledge and K. Paul, London, 1947.

Greaves, I.C., Modern Production among Backward Peoples, Allen and Unwin, London, 1935.

Helleiner, K.F., moral Conditions For Economic Growth", J. Econ. Hist., XI, No. 2, 97-116 (Spring, 1951).

Herskovits, M.J., Acculturation : The Study of Social Contact, Augustin, New York, 1938.

Hoselitz, B.F., "Entrepreneurship and Economic Growth," Amer. J. Econ. Soc., XII, No. 1, 97-110 (Oct. 1952).

—, "Non-Economic Barriers to Economic Development," Economic Development and Cultural Change, March. 1952.

—, "The Role of Cities in the Economic Growth of underdeveloped Areas," J.P.E., LXI, 195-208 (June. 1953).

Hoyt, E.E., "The Impact of a money Economy on Consumption Patterns", Annals, CCCV, 12-22 (May. 1956).

Hoyt, E.E., "Want Development in Underdeveloped Countries", J.P.E., LIX 194-202 (June. 1951).

Hsu, F.L.K., "Cultural Factors," in Economic Development (Williamson and Buttrick, eds), Prentice. Hall, New York, 1954, 618-664.

—, Incentives to work in Primitive Communities, Amer, Soc. Rev., VIII, No. 6, 638-642 (Dec. 1943).

International Labour Organization, Basic Problems of Plantation Labour, Committee on Work on Plantations, First Session, Bandoeng, 1950, Geneva, 1950.

—, Industrial Labour In India, P.S. Kind & Staples, London, 1938.

Kardiner, A., Psychological Frontiers of Society, Columbia University Press, New York, 1945 Chap. XIV.

Levy, M., "Some Sources of the Vulnerability of the Structures of Relatively Non-Industrialized Societies to those of Highly Industrialized Societies," in The Progress of Underdeveloped Countries (B. Hoselitz, ed.) University of Chigcago Press, Chicago, 1952.

Linton, R. (ed.), Most of the World. The Peoples of Africa, Latin America, and the East today, Columbia University Press, New York, 1949.

Lipset, S.M., and R. Bendix, Class Status and Power : A Reader in Social Stratification, Free Press, Colncoe, 1953.

Lorimer, F., et al. Culture and Human Fertility, .UNESCO, Paris, 1954.

Malinowski, B., The Dynamics of Cultural Change, Yale University Press, New Havess, 1945.

Matthewes, C., "Agricultural Labour and mechnisation, Caribbean Econ. Review, III, Nos. 1 and 2, 48-57 (Oct. 1951).

Mc Clelland, D.C., et al., The Achievement Motive," Appleton-Century-Crofts, New york, 1953.

Maunier, Rene, The Sociology of Colonies, Routledge and K. Paul, London, 1949.

Merap M. (ed.) Cultural Patterns and Technical Change, UNESCO paris, 1953.

Meek, C.K. Land Law and Custom in the Colonies, 2nd ed., Oxford University Press, London, 1949.

Merton, R.K., Social theory and Social Structure, Free Press, Glencoe, 1949.

Moore, W.E., Industrilization and Labour, Cornell University Press, Ithaca, 1951.

—, "Primitives and Peasants in Industry," Soc. Res., 44-81 (March. 1948).

Nash, M., "The Recruitment of Labour and Development of New Skills," Annals, CCCV, 23-31 (May. 1956).

Orchard, J., Social Background of Oriental Industrialization," in Explorations in Economics, McGraw-Hill Book Co., N.Y. 1936.

Parson, K.H., R.J. Penn, and P.M. Raup (eds.), Land Tenure Proceedings of the International Confernece on Land Tenule and Related Problems in World Agriculture, University of Wisconsin' Press, Madison, 1956.

Parsons, T., "The Motivation of Economic Activities, "Eassay in Sociological Theory, Pure and Applied Free Press, Glencoe, 1949, Chapter IX.

—, The Social System, Free Press, Glencoe, 1951.

—, The Structure of Social Action, McGrow-Hill Book Co., New York, 1937.

—, Toward a General Theory of Action, Harvard University Press, Cambridge, 1951.

Red field, R. Peasants Society and Culture, University of Chicago Press, Chicago, 1956.

Ryan, B., Caste in Modern Ceylon, Rutger University Press, New Brunswick, 1953.

—, "Ceylonese Value Systems," Rural Soc., XVII, 9-28 (Mar. 1952).

Satter, Sir Arthur, Modern Mechanization and its Effects on the Structure of Society, Oxford University Press, London, 1953.

Sawyer, J.E., "The Entrepreneur and Social Order," in Men in Business (W. Miller, ed), Harvard University Press, Cambridge, 1952, Chap I.

—, "Social Structure and Economic Progress," A.E.R.P.P., XLI, 321-329 (May. 1951).

Schapera, I., Migrant Labour and Tribal Life, Oxford University Press, London, 1947.

Singer, M., "Cultural Values in India's Economic Develop ment", Annals. CCCv, 81—91 (May, 1956).

"Social Implications of Technical Change" (collected Papers). Int. Soc. Sci, Bull., IV, Summer, 1952.

Sorokin, P.A., "Social "Mobility", in Encyclopedia of the Soc. Sci. Macmillan Co., New York, 1934.

—, Society, Culture, and Personality, Their Structure and Dynamics, Harper and Bros., New York, 1947.

Spengler, J.J., "Sociological Value Theory, Economic Analysis and Economic Policy," A.E.R.P.P., XLIII, 340-359 (May. 1953).

Spicer, E.H. (ed). Human Problems in Technological Change, Russel Sage Foundation, New York, 1952.

Taueber, I.B., "Ceylon as Demographic Laboratory," Population Index, Oct. 1949.

Tawney, R.H., Religion and the Rise of Capitalism, 2nd ed. John Murray, London, 1937.

Tax. S., Selective Culture Change, "A.E.R.P.P. XLI, 315-320 (May. 1951).

Thomson, S.H., "Social Aspects of Rural Industrialization," Milbank Memorial Fund Quarterly, July. 1948.

Thurnwald, R., Economic Activities in Primitive Communities, Oxford University Press London, 1932.

United Kingdom Cololonial Office, Biblirgraphy of Published Sourcy, Relating to African Land Tenure, Colonial No. 258, Lord, 1950.

United Kingdom Cololonial Office, Bibliography of Published Sources Relating to African Land Tenure, Colonial No. 268, London, 1950.

United Nations, The Determinaints and Consequences of Population Trends, New York, 1953.

—, Proceedings of the World Population Conference, 1955, XIII, 8.

—, Social Progress through Community Development, 1955, IV, 18,.

—, Special Study on Social Conditions in Non-self-Governry Territories New York, 1953.

University of Natal, Dept. of Economics, The African Factory Worker, Oxford University Press, London, 1950.

Warriner, D., Land Reform and Econ. Development, National Bank of Egypt Fiftieth anniversary Commenoration Lectures, Cairo, 1955.

Wilson, G., and M. Wilson, The Analysis of Social Change, Cambridge University Press Cambridge, 1945.

Wolf C., "Institutions and Eco Development," A.E.R. XLV, No. 5, 867-883 (Dec. 1955)

পরিশিষ্ট-খ

উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনাঃ নির্বাচিত পাঠ্যসূচী

নিম্নে উদ্ধৃত বই-পুস্তকে বিভিন্ন দরিদ্র দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার আলোচনা পাওয়া যাবে। এই সকল আলোচনায় যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত কার্যক্রম, যথা—ভারতের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ধরা পড়েছে, তেমনি নির্দিষ্ট নীতি-পদ্ধতি, যেমন রাজনীতি কি কৃষি-নীতিও বিশ্লেষিত হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলো বেশ সাধারণ প্রকৃতির আলোচনা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক বিশ্লেষণী পটে নীতিমালা তুলে ধরেছে।

Adler, J.H., "The Fiscal and Monetary Implementation of Development Programs", A.E.R.P.P., XLII, 584-600 (May, 1952).

Akhtar, S.M., "The Colombo Plan with special Reference to Pakistan," Econ. Internaz., 134-147, Feb. 1952.

Aubrey, H.G., "Deliberate Industrialization," Soc. Res., XVI, 158-182 (June, 1949)

—, Small Industry in Economic Development, "Soc. Res. XVIII, 269-312 (Sept. 1951).

—, The Role of the State in Economic Development," A.E.R.P.P. XLI, 266-273 (May. 1951).

Baster, J., "A Second Lookat Point Four." A.E.R.P.P., XLI 399-406 (May. 1951)

Bauer, P.T., The United Nations Report on the Economic Development of Underdeveloped Countries, Econ. J., LXIII, 210-222 (Mar. 1953)

—, and F.N. Paish, "The Reduction of Fluctuations in the Incomes of Primary Producers", Eco. J., LXII, 750-780 (Dec. 1952).

Benham, F., "Deficit Finance in Asia," Loyds B.R., 18-28, Jan. 1955.

Bernstein, E.M., and I.G. Patel, "Inflation in Relation to Eco. Develoment". I.M.F. Staff Papers", 360-398 (Nov. 1952).

Bhattachary va, K.N., "Fiscal and monetary Policies in Planning —A study of Indian Problems", Indian J. Eco., XXII, 395-401 (April. 1952)

Binghaue, J.B. Short-sleeve Diplomacy : Point Four in Action, John Day Co., New York, 1953.

Bohr. K.A., "Investment Criteria for Manufacturing Industries in Underdeveloped Countries," Rev. of Econ. Stat, XXXVI (May. 1954)

Brown, W.A., "Treaty, Guaranty, and Tax Inducements for Foreign Investments," A.E.R.P.P., XL, 486-494 (May. 1950)

Caldwell, L.K., "Technical Assistance and Administrative Reform in Columbia," A.P.S.R., XLVII, 494-510 (June. 1953)

Carnegie Endowment for International Peace, "An Approach to Economic Development in the Middle East," in International Conciliation, No. 457, New York, 3-32 (Jan. 1950)

Carr-Gregg., J.R.E., "The Colombo Plan : A Commonwealth Programme for South East Asia," International Conciliation, No. 467, New York, 1-55 (Jan. 1951)

Ceylon, Six Year Programme. of Investment, Government Publications Bureau, Colombo, 1955.

Cohen, J.B., "The Colombo Plan for "Co-operative Econ. Development" Mid E.J., V. No. 1, 94-100 (Winter. 1951)

Commonwealth Consultative Committee, The Colombo Plan for Co-operative Economic Developmet South-east Asia, H.M. S.O. London, 1950.

Food and Agricultural Organization, Activities of the F.A.O. under the Expanded Assistance Programme, 1950-50, Rome, May. 1952.

Frankel, S.H., "United Nations Primer for Development", Q.J.E., LXVI, 301-326 (Aug. 1952); also included in the Eco Impact. on under developed Societies, see also comments by W.A. Lewis and others, Q.J. E. LXVII, 267-285, (May. 1953).

Hambridge, G., The Story of F.A.O., D. Van Nostrand Co., New York, 1955.

Hicks, J.R., and U.K. Hicks, Report on Finance and Taxation in Jamaica Government Printer, Kingston, 1955.

Hicks, U.K., The Search for Revenue in Underdeveloped Countries," Revue de science et de Legislation Financieres, 6-43, Jan-March. 1952.

India, Government of, Five Year Plan Progress Report for 1953-54. New Delhi Sept. 1954.

—, A Plan for Community Development, New Delhi, Dec. 1951.

International Bank for Reconstruction and Development, The Agricultural Development of Uruguay (With F. A. O.) Washington, 1951, Mimeo.

—, The Agricultural Economy of Chile (with F. A. O.), Washington, 1952, Mimeo.

—, The Basis of a Development Programme. for Columbia, Washington. 1950.

—, The Eco Development of Br. Guiana, John Hopkins Press, Baltimore, 1953.

I B R D, The Economic Development of Ceylon, John Hopkins Press, Baltimore, 1953.

—, the Eco Dev. of Guatemala, John Hopkins Press, Baltimore, 1951.

—, The Eco. Dev. of Iraq, John Hopkins Press, Baltimore, 1952.

—, The Eco Dev. of Jamaica,..................1952.

—, The Eco Dev. of Malaya,.........................1955.

—, The Eco Dev. of Mexico,.....................1953.

—, The Eco Dev. of Nicaragua, John,...............1953.

—, The Eco Dev. of Nigeria,...............1955.

—, The Eco Dev. of Syria,..................1955.

—, The Economy of Turkey—An Analysis and Recommendations for a Development Programme, Washington, 1951.

—, Report on Cufa : Findings and Recommendations of Economic and Technical Mission to Cufa, Washington 1951.

—, Surinam : Recommendations for a Ten Year Dev. Programme, John Hop. Press Baltimore, 1952.

The International Labour Organisation and technical Assistance", Int. Lab. R., LXVI, 391-418 (Nov.-Dec. 1952)

Iversen, Carl, Report on Monetary Policy in Iraq. Ejnar Mun Ksgaarl Publ., Copenhegen, 1954.

Kahn, A.E., "Investment Criteria in Devt. Programs, Q.J.E., LXV, 38-61 (Feb. 1951)

Keenleyside, H.L., "Administrative Problems of Technical Assistance Administration," C.J.E.P.S. XVIII, 345-357 (Aug. 1952)

Kindleberger, C.P., Planning for Foreign Investment." A.E.R.P., XXXIII, 347-354 (March. 1943).

Lewis, W.A., Developing Colonial Agriculture," Three Banks Review, June. 1949.

—, "Issues in Land Settlement Policy," Caribbean Econ. R.," (Oct. 1951)

—, "Planning in Backward Areas," in The Principles of Economic Planning, Public Affairs Press, Washington, D.C., 1951.

Malenbaum, W., Colombo Plan : New Promise for Asia," U.S Department of State Bulletin, XXVII, 441-448 (Sept. 22, 1952).

Naidu, B. U. N., "Planning in Underdeveloped Countries". Indian Econ. R., I. (July. 1953)

Pakistan Ministry of Economic Affairs, Pakistan Looks Ahead, the Six Year Development Plan, Karachi, 1951.

Pazos, F., "Economic Development and Financial Stability", I.M.F. Staff Papers, III, No. 2. 228-253 (Oct. 1953).

Political and Economic Planning, "International Capital for Economic Development", "Planning XIX, 169-184 (Apr. 13, 1953).

—, "Planned Development in the Less Developed Countries", Planning, XIX, 153-168 (Feb. 16, 1953).

—, "The Strategy of World Development," Planning, XVII, 233-268 (April. 23, 1951).

Prasad, P.S. Narayan, "The Colombo Plan," India Quarterly, VIII, 158-169 (April-June. 1952).

Rao, V.K.R.V., "The Colombo Plan for Economic Devt : An Indian View," Hoyds B.R. July. 1951, 12-32.

—, "An International Development Authority," India Quarterly, VII (July-Sept 1952)

Riggs, F.W., "Public Administration : A Neglected Factor in Econ. Development" Annals, CCCV, 70-80 (May. 1956).

Ruopp, P. (ed). Approaches to Community Development, W. Van Hoeve, The Haque, 1953.

Salant, W., "Some Basic Considerations of Public Finance in the Devt. of Underdeveloped Countries," International Institute of Public Finance, London, 1951.

Schlesinger, E. R., Multiple Exchange Rates and Econ. Development, International Finance Section, Princeton, 1952.

Sharp, W.R., "The Institutional Framework for Technical Assistance—A comparative Review of U.N. and U.S. Experience." International Organisation, VII, No. 3. 342-379 (Aug. 1953),

—, International Technical Assistance, Programmes and Organization, Public Administration Service, Chicago, 1952.

Singh, B., Federal Finance & Underdeveloped Economy, Hind Kitabs Ltd., Bombay, 1952.

Staley, E., The Future of Underdeveloped Countries—Political Implications of Economic Development, Harper and Bros ; New York, 1954.

Stone, D.C., National Organisation the Administration of Economic Development Programmes, International Institute of Administrative Science, Brussels, 1954.

Teaf, Jr., H.M. and P.G. Franck, Hands across Frontiers : Case Studies in Technical Co-operation, Cornell University Press, Ithaca, 1956.

Thorp, W.L., Some Basic Policy Issues in Economic Devt." A.E.R.P.P., XLI, 407-417 (May. 1951)

Timfergen, J., "Capital Formation and the Five Year Plan", Indian Econ. J., I. (July. 1953).

Tirana, R., "Government Financing of Economic Development Abroad". J. Econ. Hist. Suplement, 1950, 92-105.

United Kingdom, "Colonial Development Corporation Annual Reports and Accounts," H.M.S.O., London, Annual.

—, Colonial Office, The Colonial Territories, H.M.S.O. annual Reports.

—, "A Review of Colonial marketing Organizations and Related Bodies," H.M.S.O., London 1952.

United Nations, Analysis and Projections of Economic Development, I : An Introduction to the Technique of Programming 1955, II, G. 2.

—, Domestic Financing of Economic Development, New York 1951, II, B. 1.

—, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. New York, 1950, II, G. 2.

—, The Expanded Programme of Technical Assistance for Economic Development of Underdeveloped Countries, N.Y., 1953, TAB/1/Rev. 1.

United Nations, Formulation and Economic Appraisal of Development Projects, Lahore, Pakistan, 1951, II, B. 4.

—, "Inflation and Mobilisation of Domestic Capital in underdeveloped Countries of Asia; "Econ. Bull. A.F.E., II, No. 3, 21-34 (Feb. 1952)

—, "International Cooperation in Latin American Development Policies, New York, 1954, II. G. 2.

—, Land Reform, Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development, New York, 1951, II. B. 3.

—, Measures for the Eco Development of Under-developed countries, New York, 1951, II, B. 2.

—, Measures for International Economic Stability, N.Y. 1951.

—, Methods of Financing Economic Development in Undeveloped Countries, New York, 1949, II. B. 4.

—, Moblization of Domestic Capital : Report and Documents of the second Working Party, Bangkok, 1953, II F. 2.

—, Progress in Land Reform, New York, 1954, II, B. 3.

—, Report of the Commission on Community Organization and Development in South and South-east Asia, New York, 1953.

—, Report on a Special U.N. Fund for Econ. Development, New York, 1953, II, B. 1.

—, Rural Progress through Co-operatives, New York, 1954 II, B. 2.

—, "Some Financial Aspects of Development Programmes in Asian Countires," Econ. Bull. A.F.E., III, Nos. 1-2, 1-12 (Nov. 1952).

—, Standards and Techniques of Public Administration with Special Reference to Technical Assistance for Underdeveloped Countries, New York, 1951, II. B. 7.

—, Taxes and Fiscal Policy in Underdeveloped Countries, New York, 1955, II. H. 1.

—, Technical Assistance for Economic Development, New York, 1949, II, B. 1, U.S. committed of the Senate on Foreign Relations, Subcommittee on Technical Assistance Programes Multilateral Technical Assistance Programmes, Staff Study No.1, March 11, 1955.

—, House of Representatives, Staff Memorandum on Increasing the Flow of Private Investment into Underdeveloped Areas (Committee Print), 82nd Congress, 2nd seccion, March 27, 1952.

—, International Development Advisory Board, Guidelines for Point Four, Washington, D.C., June 5, 1952.

—, State Department, Division of Library and Reference Services, "Point Four, A. Selected Bibliography of Matereals on Technical Co-operation with Foreign Governments", Bibliographical No. 54. Supplements Nos. 55, 56, 57,

Wilson, J.S.G., "Problems of Commonwealth Economic Development". West-minister Bank Review, 5-8, May, 1954.

Wu, Y. L., "A Note on the Post-War Industrialization of Backward' Countries and Centralist Planning", Economia, XII, No. 47, 172-178 (Aug. 1945).

পরিশিষ্ট গ

উন্নয়ন-সমস্যার দেশভিত্তিক বিশ্লেষণঃ নির্বাচিত পাঠ্যক্রম

নিম্নোল্লিখিত পুস্তকাদিতে বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রক্রিয়ার গতিধারা ও সমস্যা উদ্ভাষিত হয়েছে। জাপান ও রাশিয়া বাদে পৃথিবীর বাকী সব দেশই গরীব। কিন্তু, তবু রাশিয়া ও জাপানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কেননা এরা হচ্ছে "জবরদস্তিমূলক অগ্রগতির" উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উল্লেখিত বই-পুস্তকের অল্প কয়টি মাত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ-সম্পন্ন বই-পুস্তকের সংখ্যা এখনো বেশ নগণ্য। তবে উদ্ধৃত প্রতিটি প্রবন্ধ কি বই দেশের অগ্রগতির ঐতিহাসিক ধারার কোন না কোন একটা দিক অবশ্যই প্রস্ফুটিত করে তুলে। এবং সবায় একত্র মিলে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগমনের ঐতিহাসিক কারণ ও সমস্যার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রচুর সুযোগ দেয়। পরিশিষ্ট খ-তে তালিকাকৃত I.B.R.D. মিশনের রিপোর্টগুলো মূলত নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শদানকারী হলেও সংশ্লিষ্ট দেশের পরিস্থিতি অনুধাবনেও বেশ উপকারী বটে। এই সকল রিপোর্ট বিবেচ্য দেশের বিদ্যমান লক্ষণাগত চিত্রের ব্যাপক রূপটি তুলে ধরে এবং প্রচুর তথ্যাদি পরিবেশন করে, অন্যত্র যা পাওয়া সহজ নয়। United Nations Headquarters Library, Bibliography on Industrialization in Under-Developed Countries, Bibliographical Series No. 6, New York, 1956, II.B. 2. 3 এই সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

Abramson, A., "The Economic Development of the Soviet Union under the Second and Third Five-year Plan," Int. Lab. R., XLI, 177-201 (Feb. 1940).

Adler, J.H., E.R. Schlesinger, and E.C. Olson, Public Finance and Economic Development in Guatemala, Stanford University Press, Stanford, 1952.

Agrawal, A.N. (ed.) Industrial Problems of India, Ranjit Printers and Publishers, Delhi, 1952.

Akhtar, S.M., Economics of Pakistan, 2nd ed. Arthur Probsthain, London, 1951.

All-India Rural Credit Survey, Report of the Committee of Directors, Vol. II, The General Report, Reserve Bank of India, Bombay, 1954.

Allen, G.C., Japanese Industry : Its Recent Development and Present Condition, Institute of Pacific Relations, New York, 1940.

—, A Short Econ. History of Modern Japan, 1867-1937, Allen & Unwion, London, 1946.

—, and A.G. Donnithorne, Western Enterprise in Far Eastern Eco Development, Allen & Unwion, London, 1954.

American Academy of Pol. and Social Science, "Puerto Rico : A study in Democratic Development," Annals, CCCLXXV, 1-166 (Jan. 1953).

Anstey, V., The Economic Development of India, 4th ed., Longmans, Green & Co., New York, 1952.

Aubrey. H.G., "Structure and Balance in Rapid Economic Growth : The Example of Mexico," in Papers of the Conference on Strategic Factors in Periods of Raped Economic Growth, Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, New York, April 1954.

Banerjea, P., A Study of Indian Economics, 6th ed ; University of Calcutta, Calcutta, 1951.

Battern, T.R., Problems of African Development, Oxford University Press, London, 1, 1947, II, 1948.

Bay Kov, A., The Development of the Soviet Econ. System, Cambridge University Press, Cambridge, 1945.

Bergson, A. (ed.) Soviet Econ. Growth : Conditions and Perspectives, Row, Peterson & Co., White Plains, 1953.

Boeke, J.H., The Evolution of the Netherlands India Economy, Institute of Pacific Relations, New York, 1946.

Bonni, Alfred, The Econ. Development of the Middle-east, Oxford University Press, New York, 1945.

—, Land and Population in the Middle-east, mid, E.J., V. No. 1, 39-56 (1951).

Boune, Alfred, State and Economic in the Middle-east : A Society in Transition, K. Paul, London, 1943.
Boston, H., Japan's Modern Century, Ronald Press Co., New York, 1955.
Brintell, G.E., "Factors in the Econ. Development of Guatemala," A.E.R.P.P., XLIII, 104-114 (May, 1953).
—, "Some Problems of Economic and Social Change in Guatemala C.J.E.P.S., XVII, 468-481 (Nov. 1951).
Buchanan, D.H., The Development of Capitalistic Enterprise in India, the Macmillan Co., New York, 1934.
—, "Japan Vs. Asia," A.E.R.P.P., XLI, 359-366 (May, 1951).
Carlson, R.E., "Econ. Development in Central America." Inter-American Econ. Affairs, II, 5-29 (Autumn 1948).
Carus, C.D., and C.L. McNichols, Japan : Its Resourses and Industry, Harper and Bros., New York, 1944.
Coheol, J.B., "Eco Development in Pakistan," Land Economics, XXIX, 1-12 (Feb. 1953).
Crouchley, A.B., The Eco Development of Mod Egypt, Longmans, Green & Co., London, 1938.
Dobb. M., Soviet Eco Development since 1917, Routledge & K. Paul, London, 1948.
Dobby, E.H.G., South-east Asia, University of London Press, London, 1950.
Ellsworth, P.T., Chile : An Economy in Transition, The Machmillan Co., New York, 1945.
—, "Factors in the Economic Development of Ceylon," A.E.R.P.P. XLIII,
Fage, J.D., the History of West Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 1955.
Fairbank, J.K. et al., "Influence of Modern Western Science and Technology on Japan and China", Explorations, VII, No. 4, 189-204 (April. 1955).
Frankel, S.H., Capital Investment in Africa : Its Course and Effects, Oxford University Press, London, 1938.
Furnivall, J.S., Colonial Policy and Practice : A comparative Study of Burma and Netherlands India, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.

—, Netherlands India, : A Study of Plural Economy, the Macmillan Co., New York, 1944.

Galbraith, J.K., R.H. Holton, et al., Marketing Efficiency in Puerto Rico, Harvard University Press, Cambridge 1955.

Gayer, A.D., P.T. Homan and E.K. James, The Sugar Economy of Puerto Rico, Columbia University Press, New York, 1948.

Gourou, P., The Tropical World, Longmans, Green and Co., London, 1953.

Grand, A.J., Land and Peasant in Japan, Institute of Pacific Relations, New York, 1952.

Hailey, Lord, An African Survey, Oxford University Press, London, 1938.

Hicks, J.R. and U.K. Hicks, Report on Finance and Taxation in Jamaica, Government Printer, Kingston, Jamaica, 1955.

Joint Brazil United Sates Economic Development Commission, the Development of Brazil, Institute of Inter-American Affairs, Washington, D.C., 1953.

Kuznets, S., W.E. Moore and J.J. Spengler (eds). Economic Growta : Brazil, India, Japan, Duke University Press, Durham, 1955.

Lewis, W.A. "The Industrialization of the British West Indies," Caribbean Eco. R., II, No. I, 1-61 (May, 1950)

—Industrialization and the Gold Coast, Government Printer, Accra, 1953.

Lockwood, W.W., The Economic Development of Japan, Princeton University Press, Princeton, 1954.

Madan, B.K. (ed.), Economic Problems of Underdeveloped Countries in Asia, Geoffrey Cumberlege, London, 1954.

Malenbaum, W. "India and China : Devlopment Eontrasts," J.P.E., LXIV, No. I. 1-24, (Feb. 1956)

May, S., Costa Rica : A Study in Economic Development, Twentieth Century Fund, New York, 1952.

Mcphee, A., Economic Revolution in British West Africa, G. Routledge & Sons, London, 1926.

Morgan, T., "The Economic Development of Ceylon" Annals. CCCV, 92-100 (May, 1956).

Mosk, S.A.' Industrial Revolution in Mexico, University of California Press, Berkeley, 1950.

—, and M. Burgin, Economic Problems of Latin America, University of California Press, Berkelay, 1953.

Nanjundan, S., "Economic Development of Malay" India Quarterly VIII, 289-311 (July, 1952)

Nathan, R. et al., Palestine : Problem and Promise, an economic study, American Council on Public Affairs, Washington, D.C., 1948.

Nelson, L., Rural Cuba, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1950.

Neuman, A.M., Industrial Development in Indonesia, Student's Bookshop, Cambridge, 1955.

Nicholls, W.H., "Domestic Trade in an Underdeveloped Country—Turkey." J.P.E. LIX, 463-480 (Dec. 1951)

Norman, E.H., Japan's Emergence as a Modern State, Allen & Union, London, 1940.

Perham, M., (ed) The Economics of a Tropical Dependency, Faber & Faber, London, 1947.

—, Mining, Commerce, and Finance in Nigeria, Faber & Faber, London, 1948.

Perloff, H.S., Puerto Rico's Economic Future, University of Chicago Press, Chicago, 1950.

Pim, Sir Alan, The Financial and Economic History of the African Tropical Territories, Oxford University Press, London, 1940.

Puerto Rican Planning Board, Economic Development of Puerto Rico, San June, 1951.

Rao, V.K.R.V., The Structure of Asia's Economy, Indian Council of World Affairs, New Delhi, 1953.

Reubens, E.P., "Foreign Capital in Economic Development : A Case Study of Japan" in Modernization Programmes in Relation to Human Resources, Milbank Memorial Fund, New York, 1950.

—, "Small Scale Industry in Japan" Q.J.E., LXI, 577-604 (Aug. 1947)

Robequain, C., The Economic Development of French Indo-China, rev. ed., Oxford University Press, New York, 1944.

Royal Institute of International Affair, The French Colonial Empire, Royal Institute of International Affairs, New York, 1940.

—, The Italian Colonial Empire, Royal Institute of rnternational Affair, New York, 1940.

—, The Middle East, Royal Institute of International Affairs, New York, 1950.

Sarda, J., "Some Aspects of Economic Development in Venezuela", Inter-American Economic Affairs. VI, 29-39 (Summer 1952).

Schumpeter, E.B. (ed) The Industrialization of Japan and Manchukuo : 1930-1940, The Macmillan Co., New York, 1940.

Seers, D., and C.R. Ross, Report on Financial and Physical Problems of Development in the Gold Coast, Government Printing Office, Accra, 1952.

Simey, T.S.' Welfare and Planning in the West Indies, Oxford University Press, New York, 1947.

Singer, H.W., "Capital Requirements for the Economic Development of the Middle East," Middle Eastern Affairs III, 35-40 (Feb. 1952)

Smith, T.C., Political Change and Industrial Development in Japan—Government Enterprise, 1868-1880, Stanford University Press, Stanford, 1955.

—, Population Growth in Malaya, Royal Institute of International Affairs, London, 1952.

South African Institute of International Affairs, Africa South of Sahara, Oxford University Press, Capetown, 1951.

Spiegel, H.W., The Brazilian Economy : Chronic Iuflation and Sporadic Industrialization, Blakiston, Philadelphia, 1949.

Stamp, L.D., Africa : A study in Tropical Development, John Wiley & Sons, New York, 1953.
Thompson, C.H. and H.W. Woodruff, Economic Development in Ruodesia and Nyasaland, Dennis Doboon, London, 1955.
Thorogood, C.B., Ceylon, H.M. S.O., London, 1952.
Thornburg, M.W. et. al., Turkey : An Economic Appraisal, Twentieth Century Fund, New York, 1949.
United Kingdom, Overseas Economic Surveys, Board of Trade, H.M.S.O., London (Various Countries annually)
United Nations, Economic Bulletin for Asia and the Far East, issued three times annually by the Research and Statistics Division, Economic Commission for Asia and the Far East, I No. I, Issued Aug. 1950, Bangkok.
—, Economic Development in Selected Countries : Plans, Programmes and Agencies, 1 (Sales No. 1948, II. B.1) New York, 1947, II (Sales No. 1950. II. B. 1) New York, 1950.
—, Economic and Social Development of Libya (Sales No. II, H. 8), New York, 1953.
—, Economic Survey of Asia and the Far East, Annual, 1949, New York, 1949.
—, Economic Survey of Latin America, Annual, 1948, New York, 1948.
United Nations, Enlargement of the Exchange Economy in Tropical Africa (Sales No. 1954, II, C. 4) New York, 1949.
—, Final Report of the United Nations Economic Survey Mission for the Middle East (Sales No. 1949. II. B.5) New York, 1949.
—, A General Economic Appraisal of Libya (Sales No 1952, II. H. 2) New York, 1952.
—, Report of the United Nations Economic Mission to Chile, 1949-1950 (Sales No. 1951, II. B. 6) New York, 1951.
—, Scope and Structure of Money Economics in Tropical Africa (Sales No. 1955. II. C. 4), New York, 1955.
—, United Nations Mission to Haiti (Sales No. 1949 II. B.2) New York, 1949.

—, World Economic Situation : Aspects of Economic Development in Africa, New York, March, 1953.

Uyeda, T., et al., The Small Industries of Japan : Their Growth and Development, University of Chicago Press, Chicago, 1938.

Wallich, H.C. and J.H. Adler, Public Finance in a Developing Country : El Salvador, Harvard University Press, Cambridge, 1951.

Warriner, D., Land and Poverty in the Middle-east, Royal Institure of International Affairs, London, 1948.

Weinryb, B.D., "International Development in the Near East" Q.J.E., LXI, 477-499 (May, 1947).

Whetten, N.L., Rural Mexico, University of Chicago Press, Chicago, 1951.

Wythe, G., et al, Brazil : An Expanding Economy, Twentieth Century Fund, New York, 1949.

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা

"বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এক চিত্তাকর্ষক, গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত ক্ষেত্র।"[১] সুদীর্ঘ দুই দশক ধরে Wesley Clair Mitchell-এর এই উক্তি কারো নজরে আসেনি। ১৯৩০ সালের সেই সর্বগ্রাসী মন্দাবস্থা ও ১৯৪০-এর যুদ্ধ-অর্থনীতি ধনবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে সাময়িক সমাধানের উপর নিবদ্ধ রেখেছিল। সে যুগ আজ অতীত হয়েছে। ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। উন্নয়ন অগ্রগতির সমস্যা আজ সবার মুখে মুখে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব দেশ আজ সেই চিন্তায় নিমগ্ন।

১৯৩০-এর কালে 'কেয়নশীয় বিশ্লেষণ' শিল্পোন্নত দেশের জন্য দ্বিমুখী এক বার্তা বয়ে এনেছিল: (ক) চক্রাকার বেকারসঞ্জাত সম্পদ অপচয়ের নিন্দে এবং (খ) বদ্ধমূল 'গড়ধর্মী স্থিতাবস্থার' (secular stagnation) ভয়াবহতা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি। পরস্পর সম্পৃক্ত এই দুইটি সমস্যা পরবর্তীকালে এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই সাধারণ নাম নিয়েছে, কেইনসীয়োত্তর আলোচনার একটি মুখ্য বিষয়বস্তু আজ তা। পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থার উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থিত দেশসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে নিয়ে ধনবিজ্ঞানী আজ কি কি অবস্থায় বর্ধন-প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে এর সাথে সাথে দীর্ঘকাল স্থায়ী অতি উৎপাদন অথবা ঊনউৎপাদন জনিত সমস্যার হাত থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়, তা' নির্ধারণের প্রচেষ্টায় তৎপর।

উন্নয়ন গতি অব্যাহত রাখা ধনীদেশের শিরোপীড়া। দরিদ্রদেশের সমস্যা কিন্তু বিপরীত। তার 'শীরোপীড়া' উন্নয়ন অগ্রগতি বেগবান করা। তার সমস্যা অধিক জটিল। তেমনি অত্যাবশ্যকীয়ও বটে। এটা তার জীবন-মরণ সমস্যা। বিষয়টা যেমনি দুরূহ তেমনি ভাবনারও বিষয় বটে। বিশ্বের অধিকাংশ লোক চরম অভাব-অনটনে নিষ্পিষ্ট। মানবিক বিবেচনায় এটা অসহ্য। অর্থনৈতিক বিবেচনায় তা মানবাত্মার পরাজয়ের

---

১. দেখুন, W.C. Mitchell-এর Business Cycles, National Bureau of Economic Research, New York, 1927, পৃ: ৪২৭।

নামান্তর। রাজনৈতিক দিক থেকে অবস্থাটা ভীতিপ্রদ। বিশ্ব তাই দরিদ্র দেশের তড়িঘড়ি উন্নয়নে আগ্রহী।

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি?

বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে দেখা যাক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়। এই সম্পর্কে নানা মুনীর নানা মত। তবে সন্তোষজনক তেমন সংজ্ঞা পাওয়াও মুস্কিল, অনেকে বলে থাকেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development), অর্থনৈতিক বর্ধন (Economic growth) ও দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন (secular change) কথাগুলো সমার্থবাচক। চুলচেরা বাছবিচার না করে সাধারণভাবে কথাটা অবশ্যই মেনে নেয়া যায়। বস্তুতঃই তারা সমার্থবোধক। কিন্তু তবু বক্তব্য থেকে যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে ঠিক কি বোঝায়? কথাটার মধ্যে কি কি তাৎপর্য নিহিত?

একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত জাতীয় আয় একটা দীর্ঘ সময় ধরে বৃদ্ধি পায়। উন্নয়ন হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হয় তবে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। 'প্রক্রিয়া' কথাটা একটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশ—'প্রক্রিয়া' বলতে বুঝায় অনেকগুলো শক্তির সমাহার। শক্তি নিচয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দীর্ঘকালীন একটা ধারা প্রবাহের জন্ম দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট উপাদানে (variables) সচলতা দেখা দেয়। সময় ও স্থানভেদে এই প্রক্রিয়ায় তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। তবে বিশেষ কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রায় সর্বত্র একই রূপ নিয়ে বিদ্যমান থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রক্রিয়ার ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরিণতি হিসাবে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

জাতীয় উৎপাদনে অগ্রগতি সম্পর্কে ভাবা যাক। এই অগ্রগতি মানে উন্নয়ন প্রক্রিয়া উৎসারিত বাস্তব ফলাফলের সমাহার। উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসবে বিভিন্নধর্মী একাধিক পরিবর্তন যেগুলো উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথেই এগিয়ে চলছে। এই পরিবর্তনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা মৌলিক উপাদান সরবরাহে পরিবর্তন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা আঙ্গিকে পরিবর্তন (Changes in the structure of demand for products)[২]

---

২. T. W. Schultz-এর Economic Organization of Agriculture, McGrow-Hill Book Co., New York, ১৯৫৩ সাল, পৃ: ৫।

উপাদান সরবরাহে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে: (১) অতিরিক্ত সম্পদ-আবিষ্কার, (২) মূলধন সংগঠন, (৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (৪) নূতন ও উন্নত উৎপাদন প্রণালী প্রবর্তন, (৫) দক্ষতা অর্জন এবং (৬) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ও সংস্থানিক সংস্কার।

উৎপন্নদ্রব্যের চাহিদা-আঙ্গিকে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে: (১) জনসংখ্যার আকারগত ও বয়সগত গঠন, (২) আয়-স্তর ও আয়-বন্টন, (৩) রুচি এবং (৪) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ও সংস্থানিক ব্যবস্থা।

অতএব উপাদান-সরবরাহ ও দ্রব্য চাহিদামাত্রায় নির্দিষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রিয়াকর্ম ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমান গ্রন্থের বিষয়-বস্তুতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ ও নির্দিষ্ট এই উভয় মতামতই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। একদিকে উন্নয়ন ক্রিযাকর্ম-উৎসারিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে এই ফলাফলের নিয়ামকগুলির পরিবর্তন বিবৃত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রকৃত জাতীয় আয় সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বৃদ্ধি পায়। আমরা এখানে 'প্রক্রিয়া', 'প্রকৃত জাতীয় আয়' ও 'সময়ের ব্যাপ্ত পরিসর' এই তিনটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানের জন্য বেছে নেব।

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যদি আমরা একটা প্রক্রিয়া বলে মনে করি তাহলে বিভিন্নভাবে কতকগুলো উন্নয়নের তালিকা তুলে ধরে তার শ্রেণী-বিন্যাস করে দেখালেই চলবে না, অথবা প্রত্যেকটা উন্নয়নকে শুধু আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলেও চলবে না। এটা হয়ত প্রস্তাবনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে তবে এই প্রস্তাবনার সূত্র ধরে এগিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কারণিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কারণ এই আন্ত-সম্পর্কের ভিত্তি দিয়ে আকাঙক্ষিত পরিবর্তনধারার পরিণতি চিহ্নিত করা যাবে, অন্যভাবে নয়। চিত্র-বিচিত্র পরিবর্তন ধারার মূলপ্রবাহ উন্মোচিত করে তবে প্রকৃত জাতীয় আয় সম্প্রসারণী প্রক্রিয়ার গতিবিধি সম্যক উপলব্ধি করা যাবে।

'প্রকৃত জাতীয় আয়' মানে দেশের চূড়ান্ত উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্মের মোট ফলশ্রুতি এবং তা টাকার হিসাবে নয়, প্রকৃত হিসাবে। টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের যথার্থ পরিমাপ ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী সামগ্রী এই দুইয়ের যথাযথ মূল্যসূচীর ভিত্তিতে ঠিক করে নিতে হবে। 'জাতীয় আয়'

অবশ্য মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross national product)[৩] অথবা নীট উৎপাদন বোঝাতে পারে। 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' কথাটা দিয়ে আমরা যেমন সাকুল্য উৎপাদন বোঝাতে চাই, তেমনি উৎপাদনকালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সাজ-সরঞ্জামের অবধারিত অপচয়ের পরিমাণও এর মধ্যে হিসাব করে নেই। মোট জাতীয় আয় বললে অপচয়সমূহ বাদ পড়ে না। সেই কারণে নীট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করা প্রয়োজন। নীট উৎপাদন মানে অন্তিম ভোগদ্রব্য ও সেবাকর্ম (Final consumer goods & services) এবং মূলধনী সাজ-সরঞ্জামে নীট সংযোজন। সুতরাং সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে নীট জাতীয় আয় বেড়ে গেলে দেশে উন্নয়ন ঘটে চলেছে বলতে হলে বুঝতে হবে যে, 'প্রকৃত জাতীয় আয়' মানে 'নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর গড়পড়তা দামের হিসাবে মূল্যস্তর বিন্যাসিত নীট জাতীয় উৎপাদন' (Net national product correct for price changes).।[৪]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিবেচনায় নীট জাতীয় আয়ে বর্ধন সপুষ্ট বা অক্ষুণ্ন বর্ধন হতে হবে। সাময়িক সম্প্রসারণ, যেমনটা ঘটে বাণিজ্যচক্রে, তেমন ধর্তব্য বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঢেউকে পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ার ভাবলে চলবে না। নীট জাতীয় আয়ে যথার্থ উর্ধ্বমুখী মোড়ই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন—নামেমাত্র বর্ধন উন্নয়ন নয়। উর্ধ্বমুখী মোড় বলতে বোঝাতে হবে—পরবর্তী বাণিজ্যচক্রের শিখর (peak) ও দ্রোণী (trough) স্বভাবতঃ পূর্ববর্তী চক্রের শিখর ও দ্রোণী অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। একটি চক্রে বর্ধন বিচার করে নয়—ক্রমান্বয়িক বাণিজ্যচক্র শেষে সত্যিকারভাবে জাতীয় আয় বেড়ে চলেছে কিনা তা বিচার করে তবে বলতে হবে উন্নয়ন ঘটে চলেছে। কাজেই, হিসাব কষতে হবে দশকের হিসাবে (অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী ধারাপর্ব অনুমাপে) সাংবাৎসরিক হিসাবে নয় (অর্থাৎ বৎসরব্যাপী

৩. বদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (closed economy) জাতীয় আয় ও মোট উৎপাদন সমান। বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত দেশসমূহে জাতীয় আয় উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হতে পারে। দেশ-বিদেশে বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে মুনাফা হতে পারে। তেমনি ঋণ অথবা অর্থমঞ্জুরী পেতে পারে।

৪ এই পরিমাপের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, যথা—S. Kuznets-এর "Measurement of Economic Growth", in National Bureau of Economic Research, Problems in the Study of Economic Growth, National Bureau of Eco-Reasearch, New York, ১৯৪৯ সাল, ১৩৭-১৭২।

চক্রের হিসাবে নয়), মুখ্য বাণিজ্যচক্র সাধারণত: ৬ থেকে ১৩ বৎসর মেয়াদী হয়। সুতরাং অক্ষুণ্ণ উন্নয়ন গতিধারা ২৫ বৎসর মেয়াদে হিসাব করা যেতে পারে।

অনেকে আবার এতেও পরিতুষ্ট নন। তাঁদের মতে কেবল মোট উৎপাদনের হিসাব নিলেই হল না। তার সাথে জীবনযাত্রার মানও যোগ করতে হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটায় জীবনযাত্রার মান বেড়ে চলেছে—এই বিষয়টিও অন্তরীত করে নিতে হবে। এই মত অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। অভাব-অনটন ঘুচিয়ে, সর্বসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিলিয়ে, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলা যাবে। তার মানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিদ্যমান অভাব-অনটন মুখোমুখী স্থাপন করা হউক; অভাব-অনটন ঘুচে যেয়ে মাথাপিছু যথার্থ আয় বেড়ে চলেছে দেখলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে বলা যাবে—বর্তমান মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য।[৫] কেননা, এই চিন্তাপথের অনুসারীদের মতে, প্রকৃত জাতীয় আয় বেড়ে যেতে পারে অথচ জীবনযাত্রার মান নাও বাড়তে পারে—এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা অসুবিধাজনক নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার জাতীয় আয় বর্ধন অপেক্ষা অধিক, অথবা মনে করুন সমান সমান। প্রথম পরিস্থিতিতে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাবে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে হয়ত তা ধ্রুব (constant) থাকতে পারে।

সে যাই হউক, এই বাদ-বিসম্বাদ নিয়ে বেশী ঝাকাঝাকি করার কিছু নেই। কেননা জাতীয় আয় থেকে অতি সহজে মাথাপিছু আয় বের করে নেওয়া যেতে পারে। মোট আয়কে মোট লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নিলেই হল। কাজেই, অর্থনৈতিক উন্নয়ন জাতীয় আয় কি মাথাপিছু

---

৫. Viner-এর মত অনেকে হয়ত বলবেন জাতীয় আয়ের একটা নিম্নতম পর্যায়ের নিম্নে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া উচিত। অন্যদিকে জাতীয় আয় বাড়তে দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে লোকসংখ্যা বেড়ে যেয়ে অসহনীয় অবস্থার যেমন জন্ম দিতে পারে তেমনি "যারা আজ খেয়ে-না-খেয়ে আছে.......... তাদের সংখ্যা গড় আয় বাড়ার অনুপাতে বেড়ে যেতে পারে।" দেখুন J. Viner-এর International Trade and Economic Development, the Ciarendon Press, oxford, ১৯৫৩ সাল, ১০০ পৃ:।

এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা মূল্যবোধের কথা। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

আয়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা—তেমন তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা নয়। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃত জাতীয় আয়ে জোর প্রদান করা। প্রথমতঃ মাথাপিছু আয় বাড়াবার প্রথম শর্ত জাতীয় আয় বাড়ানো।[৬] দরিদ্রদেশে যে অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় অভাব-অনটন বিরাজমান তা অবশ্যই বিবেচ্য। তবে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে ভীষণ হারে। জাতীয় আয়ে যথাপরিমাণ সম্প্রসারণ ছাড়া মাথাপিছু আয়ে সম্প্রসারণের কথাই উঠে না। কাজেই, প্রথম কর্তব্য যথেষ্ট আকারে জাতীয় আয় বাড়ানো। তাছাড়া, চতুর্থ পর্বের আলোচনায় দেখা যাবে যে, আজকের যেসব দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র কি বৃটেন) মাথাপিছু আয় অধিক তাদের সমস্যা এই নিয়ে নয়। বরং তাদের মাথা ব্যথা কি করে অক্ষুণ্ণ ও সপুষ্ট জাতীয় আয়ধারা বজায় রাখা যায় এবং কেবল তাহলেই মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রাসঙ্কোচনজনিত সমস্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং কোন তর্ক-বিতর্কে না নেমে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, ধনী কি দরিদ্র উভয় দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র সুষ্ঠু মাপকাঠি হচ্ছে জাতীয় আয়ে যথার্থ বর্ধন এবং ইহাই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ, মাথাপিছু আয়কে উন্নয়ন-অগ্রগতির মানদণ্ড হিসাবে নিতে গেলে বেমক্কা অবস্থায় পড়তে হতে পারে। হয়ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াতে পারে যে, জাতীয় আয় বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে লোকসংখ্যাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ফলে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে না। কাজেই, এই দৃষ্টিতে উন্নয়ন ঘটছে, এমন কথা বলার জো নেই। দেশ 'ক'তে আয় বেড়েছে চার গুণ, 'খ'তে দুই গুণ। অথচ লোকসংখ্যা বাড়ার দরুন মাথাপিছু আয় বাড়তে পারেনি। কাজেই মাথাপিছু আয় যদি মাপকাঠি হয় তাহলে বলতে হয় কোথায়ও কিছু ঘটেনি। কিন্তু আসলে যে অনেক কিছু ঘটেছে। বাস্তবে যে দেশ 'ক'তে আয় বেড়েছে 'খ' অপেক্ষা অনেক বেশী।

তৃতীয়তঃ, মাথাপিছু আয় ধরে হিসাব কষতে গেলে জনসংখ্যা সমস্যা *হারিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এই সমস্যা হিসাব বহির্ভূত হয়ে পড়তে পারে।* তার কারণ প্রথমেই যে তা ধরে নিয়ে এগুতে হবে। এতে সার্বিক সমস্যার অনুধাবনক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। **kuznets**-এর হুঁশিয়ারি

---

৬. এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটতে পারে যদি জনসংখ্যা দ্রুত হারে কমে অথচ জাতীয় আয় ধ্রুব থাকে অথবা জাতীয় আয়ে হ্রাস লোকসংখ্যা অপেক্ষা কম হয়। দীর্ঘকালীন বিবেচনায় লোকসংখ্যা বিশেষভাবে কমে যাবে এমন ভাবার সঙ্গত কারণ নেই।

শুনুন "মাথাপিছু প্রতি ইউনিট কি এই জাতীয় অন্য কোন একমাত্র মাপ-কাঠি দিয়ে অর্থনৈতিক বর্ধন যাচাই করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।......এতে (গণিতিক) অনুপাতের হার অবহেলিত হতে পারে। হতে পারে বলি কেন? বরং হবে বলাই যুক্তিযুক্ত। এই পন্থা অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তা ঘটবে। কেননা, মোট উৎপাদন মোট লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। তাতে নাকি লোকসংখ্যায় পরিবর্তনহেতু উৎপাদনে পরি-বর্তনের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।........কথাটা সরাসরি বলা যাক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইউনিটভিত্তিক হিসাব-নিকাশ কষতে যেয়ে ধনবিজ্ঞানীরা জন-সংখ্যা বিষয়টি হয় অত্যন্ত সাদামাঠা বলে ধরে নেন, না হয় আওতা-বহির্ভূত বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের ধারণা যেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয় নিয়ে কায়-কারবার করা ধনবিজ্ঞানীর কাছে জনসংখ্যা বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।..........মাথাপিছু হিসাবে না যেয়ে জাতীয় উৎ-পাদনের সাকুল্য পরিমাণ দিয়ে হিসাব কষার পক্ষে মত প্রকাশ করে আমি এমন একটা পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছি যা প্রয়োজনীয় দিকের সঠিক নির্দেশ দেবে এবং সমস্যা উন্মোচনে সত্যিকার সহায়ক হবে।"[৭] সুতরাং, মাথাপিছু আয় (ভাগফল) নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে জাতীয় আয় (লব) ও জনসংখ্যায় (হর) অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত হবে। এই লব ও হর সূক্ষ্ম-ভাবে হাতরিয়ে দেখে বরং উন্নয়ন সমস্যাবলী যথাযথভাবে নিরূপণ করা যাবে।

কাজেই, উন্নয়নের মৌলিক নির্ণায়ক হিসাবে প্রকৃত জাতীয় আয়কে ধরা যাক। প্রয়োজন হলে অন্যান্য হিসাবে মিলিয়ে নেয়া যাবে। মাথা-পিছু আয় বাড়ছে কিনা তাও দেখা যাবে। এটা এমন কোন সমস্যা নয়। উন্নয়ন পরিমাণ মোট লোকসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নিলেই তা পাওয়া যেতে পারে এবং তা করা হলে অতি সহজে অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলের জগতে ঢুকা যাবে। কারণ তখন 'অর্থনৈতিক উন্নতি' জনকল্যাণ বৃদ্ধির সামিল হয়ে উঠবে। অতঃপর প্রকৃত জাতীয় আয় বর্ধন ও লোকসংখ্যা বর্ধন মিলিয়ে দেখা যাবে। যদি দেখা যায় মাথাপিছু আয় বেড়ে গিয়েছে

---

৭. **S. Kuznets, W. E. Moore, j.j. Spengler সম্পাদিত Economic Growth: Brazil, India, Japan, Duke University Press, Durham ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত S. Kuznets-এর "Problems in Comparison of Economic Trends" দেখুন, পৃঃ ১২-১৩।**

তাহলে নির্বিঘ্নে বলা যাবে যে, অভাব-অনটন তিরোহিত হয়ে চলেছে এবং জীবনযাত্রার মান বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় এসে অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংখ্যাগত মাত্রা ছাড়িয়ে গুণগত পর্যায়েও নেমে আসে। অর্থাৎ তখন তা আর কেবল বর্ণনামূলক বিষয় থাকে না, ব্যবস্থাপত্রধর্মী হয়ে উঠে বটে। জনকল্যাণ চিন্তাধারা অঙ্গীভূত করে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যয় কিছুটা ভিন্নধর্মী হয়ে উঠে। তার সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায় 'আভিপ্রায়িক বর্ণনা' (**Pursuasive definition**) অর্থাৎ উন্নয়ন একটা কাম্যবস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই যে অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনকল্যাণের জন্য অবশ্যই চাই অধিক জাতীয় আয়। শুধু তা হলেই হল না, মাথাপিছু আয় বাড়া চাই। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাও যথেষ্ট নয়। মাথাপিছু আয় বাড়া সত্ত্বেও হয়ত ধনীরা অধিক ধনী এবং দরিদ্ররা অধিক দরিদ্র হতে পারে। মুষ্টিমেয় লোক লাভবান হতে পারে। ক্ষুণ্ণ হতে পারে বৃহত্তর স্বার্থ। তেমনি আরও বহু রকম আয়-বন্টন ধারা অব্যাহত থেকেও জন-প্রতি আয় বেড়ে যেতে পারে। কাজেই, যেনতেন আয়-বন্টন প্রথা মাধ্যমে জনস্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তার জন্য নির্বাচিত আয়-বন্টন নীতি ঠিক করে নিতে হবে। সেই সঠিক নীতি পাওয়া যাবে সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের মূল্য বিচার থেকে। অর্থাৎ জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নির্ধারিত বন্টন-প্রথা অনুসরণ করে তবেই কাম্য জনস্বার্থ অর্জন সম্ভব হবে। মূল্যবোধ কথাটা প্রত্যায়িক বিষয়। বাধাধরা নিয়ম-নীতি দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। ব্যক্তিভেদে তা ভিন্নতর হয়। সে যাই হউক, নির্বিবাদে বলা যায়, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়া মানেই বৃহত্তম মঙ্গল ও জনস্বার্থ অর্জন নয়। তার সাথে বিচার করতে হবে বন্টন নীতি আর এই বন্টন নীতি ন্যায়-নীতিভিত্তিক হলে তবেই কেবল বলা যাবে যে অর্থনৈতিক বিবেচনায় জনকল্যাণ সাধিত হল।

জাতীয় উৎপাদন কি মাথাপিছু উৎপাদন আয় বেড়ে গেলেই উল্লাসে ফেটে পড়ার কিছু নেই। কেননা, মোট উৎপাদনের গঠন-প্রণালী খতিয়ে দেখতে হবে। ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক অপচয় ঘটিয়ে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি সাধিত হতে পারে। সামরিক সাজ-সরঞ্জাম অধিক উৎপন্ন করে তা হতে পারে। তেমনি মূলধনী সম্পদ

অধিক উৎপাদিত হয়ে তা ঘটতে পারে। ভোগ-পরিসর হয়ত তেমন সম্প্রসারিত নাও হতে পারে। কাজেই, অধিক উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে কেবল 'জনসমষ্টির তৃপ্তি' বিধান হয় না। কি জাতীয় সম্পদ উৎপাদিত হল এবং তাদের গুণাবলী কেমন—সেই ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্য দেশবাসীর চাহিদা মিটিয়ে মঙ্গল অধিক করতে পারে। কথাটা শুনতে তেমন মন্দ শুনাল না। কিন্তু যাচাই করা বড় জটিল কাজ। এইক্ষেত্রে সাধারণতঃ ভোক্তার তৃপ্তি দিয়ে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যায়ন করে নেওয়া হয় অথবা পরিকল্পনার লক্ষ্য দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়। দৃষ্টি দেওয়া হয় যেন গুণগত অবনতি না ঘটে। তাছাড়া, দীর্ঘ পরিসরে তুলনার নিমিত্তে ভোক্তার রুচি পরিবর্তন অবহেলা করা হয়, অথবা জটিল ও পরোক্ষ পথে হিসাব করে নেওয়া হয়।[৮]

কল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি কিভাবে তা উৎপাদিত হল তাও গুরুত্বপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে অধিক মজুরী পাওয়া তেমন লাভজনক বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। জাতীয় আয় হয়ত বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। তাঁর কর্মক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে; জ্বালা-যাতনা, রোগ-শোক বেড়ে যেতে পারে। বেশী সময় কাজ করে তাঁর জীবনকাল সীমিত হয়ে উঠতে পারে। কাজেই অধিক উৎপাদন কন্টকবিহীন পুষ্প নাও হতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আয়-বন্টন প্রথা, তার গঠন প্রণালী, রুচিভেদ, কর্মস্থলের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়হেতু উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মঙ্গলে সমঝোতা সাধন এক দুরূহ কাজ। এবারে ভেবে দেখুন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সার্বিক কল্যাণের কথা। এই দুয়ে সামঞ্জস্য সাধন কতটুকু কঠিন কাজ? সর্বাঙ্গীন, সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু উন্নয়ন যেমন কাম্য, তেমনি বর্তমান রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর বিলাসব্যসনের পুত্তলি নয়, তা জনসাধারণের, এর উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন। অর্থনৈতিক মঙ্গল হয়ত সাধন হল; কিন্তু সামাজিক মঙ্গল সাধন নাও হতে পারে। কেননা,

---

৮. দেখুন, যথা—P.A. Sammelson-এর "Evaluation of Real National Income". Oxford Economic Papers, 2 No. 1 পৃঃ ১-২৯ (জানু. ১৯৫০); A. C. Pigou রচিত "Real Income and Economic welfare" ঐ ৩, সংখ্যা ১, পৃঃ ১৬-২০ (ফেব্রু. ১৯৫১)।

অর্থনৈতিক মঙ্গল সামাজিক মঙ্গলের একটা অংশমাত্র। এদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে যেয়ে সরকারী সক্রিয়তা বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় জীবন, চিন্তাধারা ও আচার-প্রথা ব্যাহত করে, ফলে অসন্তুষ্টির মাত্রা বেড়ে যায়। হতাশা-নিরাশা দেখা দেয়। সামাজিক সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরে ও নূতন আঙ্গিক উঁকি মারতে থাকে। এদ্দিনকার স্থিতিশীল সমাজ কাঠামোতে নড়চড় শুরু হয়।[৯]

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা যাক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা মূলত: প্রকৃত জাতীয় আশ্রয় বর্ধনের আলোচনার নামান্তর। তার সাথে যোগ করে নিতে হবে ক্ষেত্র বিশেষের পরিবর্তন। সার্বিক চেহারার পরিবর্তনের অবিসম্ভাবিত ফল হিসাবে অর্থনীতির বিভিন্ন কোটরে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই উভয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাপঝোক্ দিয়ে অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের পরিমাপ করে নিতে হবে। এই কার্য সম্পন্ন করে তবে তা জনসংখ্যার মুখোমুখী করে মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে হবে। মাথাপিছু আয়-বর্ধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে। কিন্তু কেবল তা দিয়ে অর্থনৈতিক মঙ্গল নির্ধারণ সম্ভব নয়। সামাজিক মঙ্গল ত নয়ই। তার সাথে আরও বহুবিষয় সংযোগ করে আদর্শ উন্নয়ন হার (optimum rate of development) চিহ্নিত করার কতকগুলো বিষয়ে মূল্যমান যাচাই করে নিতে হবে। তন্মধ্যে রয়েছে আয়-বন্টন নীতি, উৎপন্নদ্রব্যের গঠনপ্রণালী, রুচিভেদ, আরাম-আয়েশ বর্জন ইত্যাদি বিষয়াবলী। আয় বর্ধনেব সাথে সাথে এই সবেও পরিবর্তন দেখা দেয়।[১০]

---

৯. এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাঠকবর্গকে E.H. Phelps Brown-এর Economic Growth and Human Welfare, Raujit Printers & Publishers, Delhi 1953, Chapter II, J.M. Clark-এর "Common and Disparate Elements in National Growth and Decline" in National Bureau of Economic Research (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৪-২৮ এবং S. H. Frankel এবং Some conceptual Aspects International Economic Development of Under developed Territories, International Finance Section, Princeton University, Princeton, May 1952, ১৬-২৫ পড়তে পরামর্শ দিচ্ছি।

১০. অন্যান্য মূল্যবোধ নিয়েও কথা উঠতে পারে। যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি সরকারী সক্রিয়তার আকার-প্রকার ও মাত্রাভের্দ।

'ধনী' দেশ, 'দরিদ্র' দেশ কি? কিভাবে চিহ্নিত করা যায়? উন্নয়ন পর্যায় তুলনায় নিন। তা লোকসংখ্যার মুখোমুখী করে তুলুন। বের করে নিন মাথাপিছু প্রকৃত আয়। এই প্রকৃত আয়ের মাত্রা দিয়ে 'ধনী' 'দরিদ্র' দেশ চিহ্নিত করা যায়। দরিদ্র দেশগুলো তালিকার শেষের দিকে অবস্থিত হবে। উন্নয়ন-অগ্রগতি ঘটেনি। লোকসংখ্যা যথেষ্ট। কাজেই মাথাপিছু আয় নামমাত্র হতে বাধ্য। ফলে তাদের স্থান নীচের দিকে। ধনী দেশের বেলায় অবস্থা বিপরীত। উন্নয়ন-অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে। লোকসংখ্যা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়েছে। কাজেই, মাথাপিছু আয় অধিক। ফলে, ধনীদেশের স্থান শীর্ষে।

দরিদ্র দেশগুলোকে বলা হয় 'অনুন্নত' দেশ। কথাটা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং নানারকম কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তা ছাড়া কথাটা থেকে মনে হয় যেন দেশটাকে টেনে-হিচড়ে উন্নত করে তোলা যাবে অথবা দেশটা উন্নত হওয়ার ক্ষমতা ধারণ করে। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ আছে। তাই আমরা 'অনুন্নত' কথাটা বাদ দিতে চাই। কোনরূপ বাগ-বিতণ্ডায় যেতে চাই না। তা ছাড়া, আমরা মাথাপিছু আয় কথাটা ধরে নিয়ে এগুবো। সুতরাং, তার স্থলে 'দরিদ্র দেশ' কথাটা ব্যবহার করতে চাই। অবশ্য তার সাথে এটুকু পরিষ্কার করে নিতে চাই যে, কোন দেশ শিশু (Young Country) বলেই দরিদ্র নয় যেমন (ক্যানাডা) অথবা তার শিল্পজাত উৎপাদন কম বলে যেমন (নিউজিল্যাণ্ড) সে দরিদ্র নয়। 'ধনী' 'দরিদ্র' কথাগুলোর সাথে দেশের অন্যকোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়। কেবল অর্থনৈতিক দিক ছাড়া। কাজেই, কেউ যেন ভুল না বোঝেন।[১১]

ধনী-দরিদ্র দেশের মাথাপিছু আয়ের যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য তা সারণী (Table) 'ক'তে লক্ষ্য করা যায়। ৭০টি দেশের জাতীয় আয়ের অঙ্ক থেকে তা হিসাব করা হয়েছে। সারণী 'খ'তে একই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তবে তা অঞ্চল ভিত্তিতে এবং লোকসংখ্যা ও আয়ের হিসাবে।

---

১১. R. Lekachman সম্পাদিত National policy for Economic Welfare at Home and Abroad, Double day & Co., New York, 1955-এ প্রকাশিত S. Kuznets-এর "Toward a Theory of Economic Growth" দেখুন, পৃ: ১৯।

সারণী ক. ১৯৪৯ সালে বিশ্ব-আয় পরিস্থিতি

(আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের হিসাবে: ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী)

	শতকরা বিশ্ব-আয়	শতকরা বিশ্ব-লোকসংখ্যা	মাথাপিছু আয় (ডলার)
উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশসমূহ	৬৭	১৮	৯১৫
মাঝারি আয়সম্পন্ন দেশসমূহ	১৮	১৫	৩১০
নিম্ন আয়সম্পন্ন দেশসমূহ	১৫	৬৭	৫৪

নোট: বিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি লোক এই হিসাবের বহির্ভূত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে একথা সত্য যে, তারা সবায় দরিদ্র দেশের মানুষ।

সূত্র: R. Nurkse-এর Problems of Capital Formation in Under-developed countries, Basil Blackwell, oxford, 1953, 63. Com: piled from Statistical office of the United Nations, "National and per Capital Incomes of 70 Countries, 1949", Statistical Papers, Series E, No. 1, New York, Oct, 1950.

উচ্চ আযসম্পন্ন দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড, মধ্যবর্তী দলে পড়েছে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরায়েল এবং কতকগুলো পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ। বিশেষ করে রাশিয়া। নিম্ন পর্যায়ের দেশগুলো হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা, নিকট ও দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশসমূহ। ১৯৪৯ সালে প্রায় দুই বিলিয়ন লোক অধ্যুষিত এলাকার জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়। তার থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোকের মাথাপিছু আয় ৫৫ ডলারেরও নিম্নে।[১২] কি নিদারুণ কাহিনী ভেবে দেখুন। অথচ করুণ এই চিত্রটিই অকাট্য সত্য। পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দা বাস্তবে অতীব দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত।

---

১২. এই সব হিসাব-নিকাশ তেমন নির্ভরশীল নয় অবশ্য। ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে সব কিছু কাট-ছাট করেও যেটুকু বাকী থাকবে তা পার্থক্য-প্রদর্শনের জন্য কম নয়। এই বিষয়ে বিশদ জানতে হলে International Association

সারণী-খ. বিশ্ব জনসংখ্যা ও আয়বণ্টন, ১৯৪৯ সাল

	শতকরা বিশ্ব-লোকসংখ্যা	শতকরা বিশ্ব-আয়	তুলনামূলক মাথাপিছু আয়
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬.৫	৪০.৯	৬২৬
পশ্চিম ইউরোপ*	১০.০	২১.৫	২১৪
রাশিয়া	৮.৪	১১.২	১১৩
ইউরোপের বাকী অংশ	৬.৪	৬.০	৯৪
লাতিন আমেরিকা	৬.৬	৪.৪	৬৬
আফ্রিকা	৮.৬	২.০	২৪
এশিয়া	৫২.৪	১০.৫	২০

* পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ইউরোপ

উৎস: S. Kuznets-এর "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations," Economic Development and Cultural Change, V, No. 1 (Oct. 1956), 17.

ধনী-দরিদ্র দেশে বিদ্যমান এই যে বৈষম্য তা আজকালকার ঘটনা নয়। বহুদিন থেকেই তা তদ্রূপ। গত শতাব্দীতে তা আরও তীব্রতর হয়েছে। ধনীদেশে অগ্রগতি অনেক দ্রুতহারে বেড়েছে। দরিদ্র দেশে তেমন নয়। ফল দাঁড়িয়েছে ধনীদেশ দরিদ্র দেশকে অনেক, অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে, কি এককভাবে, কি তুলনামূলকভাবে।[১৩]

মাথাপিছু আয়ের কথা বাদ দেয়া যাক। অন্যান্য বিষয় দিয়ে তুলনা করা যাক। এক্ষেত্রেও দরিদ্র দেশের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। ধনী দেশের পাল্লাই অধিক ভারী। সারণী-'গ' লক্ষ্য করুন। কি করুণ চিত্র ফুটে উঠে!

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনায় ইতি টানতে চাই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে আজ জাতীয় আয় প্রতি দশ বৎসরে প্রায় ২৫

---

for Reasearch in Income and Wealth, Income and Wealth Series III, Bowes and Bowes, London, 1953 তে প্রকাশিত S. H. Frankel, F. Beuhum, V.K.R.V. Rao ও D. Creamer-এর প্রবন্ধগুলো আলোচনা করতে পারেন।

১৩. S. Kuznets-এর "Toward a Theory of Economic Growth"-এর ২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। অথচ দরিদ্র দেশগুলোতে তা কোনমতেই ১৫ শতাংশের অধিক নয়। বরং অধিকাংশ দেশে তারও নীচে। কোন কোন দেশে হয়ত তা লোকসংখ্যা বর্ধন অপেক্ষা অধিক নয়। ফলে যেটুকু সম্প্রসারণ ঘটছে তা বর্ধিত লোকসংখ্যা গ্রাস করে নিচ্ছে। জমার খাতায় কিছুই আসছে না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ধনী-দরিদ্র দেশে বিদ্যমান ফাঁক (gap) আরও বেড়ে চলেছে।

সারণী-গ. মাথাপিছু আয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিভেদ: ৫৩টি দেশ: ১৯৩৯ সাল

	মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের শ্রেণী-বিভাগ		
	I	II	III
১। মাথাপিছু আয় (ডলারের হিসাবে)	৪৬১	১৫৪	৪১
২। মোট লোকসংখ্যার শতকরা হার	২০	১৬	৬৪
৩। মোট আয়ের শতকরা হার	৬৪	১৮	১৮
৪। মাথাপিছু আয় (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৩১	৯
৫। গড় লোকসংখ্যা প্রতীক	১.১	১.৫	২.৯
৬। জন্মকালে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৮২	৬৩
৭। হাজার প্রতি লোকসংখ্যার ডাক্তারের সংখ্যা (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৭১	১৬
৮। শিক্ষাহার (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৭৭	২০
৯। অ-কৃষিজাত শিল্পখাত থেকে পাওয়া মোট আয়ের শতকরা হার	৮৪	৭১	৫৯

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের শ্রেণী বিভাগ

	I	II	III
১০। কৃষি নির্ভরশীল লোকের গড় আয় (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৩৯	৮
১১। শিল্পক্ষেত্রে শ্রম-প্রতি বিনিয়োগ (অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৩৯	১১
১২। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ভক্ষণ (মাথাপিছু অশ্বশক্তি ঘণ্টা অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	২৪	৫
১৩। রেলপথ মাইল (প্রতি ১০০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে, অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৭২	৩২
১৪। বার্ষিক মাল বহন (মাথা-পিছু টন মাইল অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৬০	৪
১৫। মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য পরিমাণ (অনুক্রমণী সংখ্যাতে)			
খাদ্য-দ্রব্য (কেলোরী হিসাবে)	১০০	৯২	৭২
জীবপ্রোটিন (আউন্স হিসাবে)	১০০	৫৬	১৮
চর্বি (ঐ)	১০০	৫৭	৩২
১৬। নীট বার্ষিক বস্ত্র ব্যবহার (মাথাপিছু পাউণ্ড হিসাবে, অনুক্রমণী সংখ্যা)	১০০	৪০	২৬

নোট :

ক্রমিক সংখ্যা ৯ বাদ দিয়ে বাকী সব **Point Four (U.S. Development of State, Publication 3719, Jan. 1950, Appendix C, 103-124).** থেকে গৃহীত।

মাথাপিছু আয় হিসাবে দেশগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের অধঃক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত দেশগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে:

I (মাথাপিছু আয় ২০০ ডলারের উর্ধ্বে): আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, ফরাসী, নরওয়ে, বেলজিয়াম, আয়ার ও আর্জেন্টিনা।

II (মাথাপিছু আয় ১০১-২০০ ডলার): দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিনল্যাণ্ড, চিলি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালী, গ্রীস, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া।

III (মাথাপিছু আয় ২২-৫০ ডলার): হাইতি, নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, বলিভিয়া, হণ্ডুরাস, এল-সালভাদর, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, ভারত, ফিলিপাইনস, চীন, ইন্দোনেশিয়া, (মাথাপিছু আয় ৫১-১০০ ডলার): কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, জাপান, ভেনেজুয়েলা, মিশর, প্যালেস্টাইন, কস্টারিকা, কলাম্বিয়া, পেরু, পানামা, সিংহল, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, ডমিনিকান রিপাবলিক।

সারণীতে দেওয়া গড়গুলো ওজনকৃত গণিতিক হারে (weighted Arithmetic means) কষা। অবশ্য নির্দেশিত ব্যতিক্রমগুলো বাদে। কতকগুলো বিষয়ে সব দেশের উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

লোকসংখ্যার প্রতীকগুলো (tyles) নিম্নরূপ:

প্রতীক ১—নিম্নবর্ধন সম্ভাবনা। প্রতি হাজারে জন্মহার ২৫ জনের নীচে। মৃত্যুহার কম। জন্মহার তেমন বেশী নয়। ভবিষ্যৎ লোকসংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা।

প্রতীক ২—পরিবর্তনশীল বর্ধন। হাজার প্রতি জন্মহার ২৫-৩৫। জন্ম ও মৃত্যুহার নিম্নগামী জনসংখ্যা বর্ধন হার উচ্চ।

প্রতীক ৩—বর্ধন সম্ভাবনা অধিক। জন্মহার হাজারপ্রতি ৩৫-এর উর্ধ্বে। মৃত্যুহার নিম্নমুখী। কিন্তু জন্মহার নয়। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রবল। মারাত্মক কিছু না ঘটলে।

পঞ্চম পংক্তিতে দেওয়া সংখ্যাগুলো ওজনকৃত নয়।

S. Kuznets-এর International Differences in Income levels. Some Reflections on their Causes- Economic Development and Cultural Change, II No. I, 5-6 (এপ্রিল, ১৯৫১)।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা কি জন্য

অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় আদি গুরু আদম স্মিথ। তাঁর অবিস্মরণীয় পুস্তক **'An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations'** পরবর্তীকালের চিন্তাস্রোতে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। ধনবিজ্ঞানী অতঃপর, তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা ঐ অনুসন্ধিৎসায় প্রবাহিত করে চলেছেন যার দ্বারা কারণসমূহ বিবৃত করা যায়, কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন হারে ও গতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগমন পথে এগিয়ে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেন, জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর উন্নতি লাভে সক্ষম হয়। এতে নানারকম তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তিতর্কের অবতারণা ঘটে; পুঁজিবাদী শিল্প-বিপ্লব নিয়ে। অন্যদিকে পৃথিবীর বাকী অংশ মোটামুটিভাবে অর্থ-নৈতিক বন্ধ্যাত্ববস্থায় বিরাজ করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে অবস্থা একটু মোড় নেয়। উন্নয়ন হারে কিছুটা অধঃগতি ও শ্লথতা দেখা দেয়। এদিকে আবার রাশিয়া ভিন্নতর অর্থনৈতিক প্রথা চালু করে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপান ডিঙ্গিয়ে যেতে থাকে। পুঁজিবাদতন্ত্রের জন্য তা হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু ধনীদেশের কথা বলে ক্ষান্ত হলেই চলবে না। বরং অভাব-অনটন জর্জরিত বৃহত্তর বিশ্বের আলোচনা অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্য-ময়। রোগ-শোক, দুঃখ-দুর্দশা তাদের অপরিমেয়। লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে অকল্পনীয় হারে। দু'মুঠো ভাত যোগাবার বন্দোবস্ত নেই। যেটুকু বর্ধন ঘটে চলেছে তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা গ্রাস করে নিচ্ছে। ফলে, অভাব-অনটন 'পরিস্থিতি যথা পূর্বং তথা পরং' পর্যায়ে বিরাজ করছে। কোথায়ওবা নিম্নমুখী হয়ে উঠছে। ধনী-দরিদ্র দেশে বিদ্যমান এই যে ফাঁক তা আজ এক মারাত্মক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র দেশ সজাগ হয়ে উঠেছে। সে তার লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছে। চারিদিকে দাবী উঠছে দ্রুত উন্নতির। তা রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। দরিদ্র-বিশ্বে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে মাত্র এক-ষষ্ঠাংশেরও কম আয় নিয়ে তৃপ্ত থাকতে আর রাজী নয়। "অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতি দরিদ্র-বিশ্বের জন্য আজ এক বৃহত্তর লক্ষ্য। তা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সম অর্থবহ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়ে উঠেছে।........এতদিনকার পুঞ্জীভূত অবহেলা ও হীনমন্যতা দাবানলের ন্যায় দাউ দাউ করে জ্বলে

উঠেছে। তাদের মনে জেগেছে উচ্চতর চেতনাবোধ। হৃত গৌরব ও ক্ষমতা আদায়ে আজ তারা বদ্ধপরিকর। তারা বুঝতে পেয়েছে অভাব-অনটন দুর্জয় নয়। রোগ-শোক, জরা-ব্যধি, দুর্দশা ও লাঞ্ছনার কবল থেকে অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।"[১৪]

অর্থনৈতিক মঙ্গল, 'মানবিক কল্যাণ' ইত্যাদি বড় বড় কথা থাক বা না থাক দরিদ্র দেশের মানুষ আজ পাগল হয়ে উঠেছে উন্নতি তাদের চাই। জাতীয় আয় যে করেই হউক, বাড়াতে হবে। নেতৃবৃন্দ অস্থির হয়ে উঠেছেন। সহজ কথায় ভুলবার দিন গত হয়েছে। মিষ্টি কথায় আজ আর চিড়া ভিজানো যায় না। দরিদ্রদেশের সরকার সরাসরি উন্নয়নক্ষেত্রে নেমে এসেছে। জাতীপুঞ্জ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। ধন-বিজ্ঞানীর ধ্যান-ধারণা, উপদেশ-নির্দেশ, বাধা-নিষেধ, ভেঙ্গে-চুড়ে গুড়িয়ে দিয়ে হলেও তারা আজ জয় করবেই। জীবনযাত্রার মান এগিয়ে নিয়ে যাবেই। কোন বাধা তারা মানতে রাজী নয়। লুটোপুটো লেগে গিয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা নিয়ে। অধীর আগ্রহে বিবেচনা করে চলেছে বিদ্যমান নীতি-পদ্ধতি। মিলিয়ে চলেছে স্বদেশের পরিবেশের সাথে। কার্যকরী পন্থা খুঁজে পেতে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। বাধা-অন্তরায় নিরসনে হন্যে হয়ে ছুটেছে।

দরিদ্র দেশের এই উন্মাদনা সীমান্তের পারেও আঘাত হেনে চলেছে। ভাবিয়ে তুলেছে বৃহত্তর বিশ্বকে। দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে উন্নত দেশ-গুলোতেও। ধনীদেশ ক্রমে ক্রমে বুঝতে শুরু করেছে দরিদ্র দেশের যাতনা। তার মধ্যেও চেতনাবোধ জাগতে শুরু করেছে যে দরিদ্র দেশের উন্নয়নে তারও বৃহত্তর মঙ্গল নিহিত। এইসব দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সবচেয়ে অগ্রণী। তারা তাদের বৈদেশিক নীতিমালায় বিধিবদ্ধ করে নিয়েছে দরিদ্র দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে। প্রবল চেষ্টা চালিয়ে চলেছে সাম্যবাদ সম্প্রসারণ রোধ করতে, বিশ্ববাণিজ্য পরিসর ও আয়তন বাড়াতে এবং জাতীয়তাবাদের নব্য উন্মেষণী চেতনাকে স্বীয় গণতান্ত্রিক ধারায় প্রবাহিত করতে।

অবশ্য নিজের স্বার্থকে বাদ দিয়ে নয়। ধনীদেশ দরিদ্র দেশের অভাব-অনটন নিরসনে যেমন সাহায্য যুগিয়ে চলেছে তেমনি পাশাপাশি স্বীয়

---

১৪. Economic Development and Cultural Change, I, No. 2 (জুন, ১৯৫২)-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, পৃঃ ৮৩।

স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলেছে। ধনীদেশের ধন-বিজ্ঞানী, শিল্পপতি ও সরকার সতত নিয়োজিত রয়েছে নিজ দেশের উন্নয়ন হার যথাযথ উপরি-পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে, তারা এটুকু খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে যে, গাঢ় মন্দাবস্থা (deep depression) ও গড়ধর্মী বন্ধ্যাত্ব (Secular Stagation) এড়াতে হলে উন্নয়ন হার উচচ পর্যায়ে বজায় রাখতে হবে। এছাড়া গত্যন্তর নেই। তা না হলে অতি-উৎপাদন সমস্যা যেমন দেখা দিতে পারে, তেমনি দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্ব জটিলতা উঁকি ঝুঁকি মারাও অস্বাভাবিক নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও চিহ্নিত করা যায়। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে আবর্তিত পরিবর্তন ধারা লক্ষ্য করে স্বল্পমেয়াদী হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত সমস্যা হাল্কা করে দেখা যায়। আমাদের চিন্তাধারা এমন যে আমরা অধিকাংশ সময় স্বল্পকালীন জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলি। তার ফলে বৃহত্তর পরিধিতে বিচরণ ব্যাহত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত হয়ে উঠে ও সঙ্কীর্ণ বৃত্তের বাইরে তা পরিচালিত হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ এই দুর্বলতার হাত থেকে রেহাই দিতে পারে। দীর্ঘকালীন মঞ্চ-পরিবেশ সামনে রেখে তবে স্বল্পকালীন অবস্থানরত অভিনেতা-রূপে সমস্যাবলীর পূর্ণ রূপ পেতে পারি—একথা নিয়ে দ্বিমত থাকার আজ আর অবকাশ নেই।

যেমন ধরুন কেয়নশীয় আলোচনা।[১৫] তাঁর স্থবির ধ্যান-ধারণা (static assumptions) ও স্বল্পমেয়াদী পাত্র-পাত্রীর (অর্থনৈতিক) কঠোরতা ঢিলে করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তেমনি বাণিজ্যচক্রের কথা চিন্তা করুন। বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণ সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্তরীত করে নেয়ার চেষ্টা স্বীকৃতি পেয়েছে।[১৬] অথবা ধরুন একচেটিয়া ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক প্রভাবাবলীর কথা। সম্পদ বিতরণের আদর্শ

---

১৫. অন্যান্য আলোচনার মধ্যে Joan Robinson-এর লেখা "Generalization of the General Theory" দেখুন। নিবন্ধটি The Rate of Interest and other Essays, Macmilan & Co. Ltd, London, 1952 তে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭-১৪২।

১৬. আলোচনা করুন J.R. Hicks-এর A Contribution to the theory of the Trade cycle, oxford Universits Press, Oxford, 1950 ; R.F. Horrad এর "Supplement on Dynamic Theory", in Economic Essays, Macmillan & Co. Ltd., London,

পরিস্থিতিতে ভাঙ্গনধর্মী ক্ষমতা হিসাবে মনোপলি ব্যবসায়কে আজ আর তেমন কেউ বিবেচনা করে না।[১৭] বরং তার বিবেচনা করা হয় অর্থ-নৈতিক সার্বিক আঙ্গিক তার কু-ফলাফলের ভিত্তিতে। তাছাড়া, এমনিতেও 'স্বল্পমেয়াদী', 'দীর্ঘমেয়াদী' কথা দুটো তেমন স্বচ্ছ নয়। সময়কে কড়ায়-গণ্ডার হিসাবে বাধা যায় না। তার সচলতা হঠাৎ করে থেমে যায় না। 'স্বল্পকাল' 'দীর্ঘকাল'রূপ শিকলে (Chain) একটা কড়া (ring) মাত্র। তা অনায়াসে দীর্ঘকালীন আবর্তে মিশে যায়। তেমনি স্বল্পকালীন সমস্যা দীর্ঘকালীন আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অবশ্যই কিছুটা তরঙ্গ-লহরী রেখে যায় বটে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আমাদের যে বিশ্লেষণ তা অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপৃত। বৃহত্তর পরিবৃত্তের ঘাত-সংঘাত উন্মোচনে নিয়োজিত, সার্বিক কাঠামোর আঙ্গিকে বিশ্লেষিত।[১৮]

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে উপলব্ধি করা যায়?

জাতীয় আয়ে অক্ষুণ্ণ বর্ধন নিয়ে সাধারণ আলোচনা হয়েছে। কিভাবে তা সাধন করা যায় এবং কেনইবা তা প্রয়োজন এ সম্পর্কে সাধারণ বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সাদামাঠা কথায় বলা হয়ে থাকে যে, জাতীয় উৎপাদন

1952; W. Fellner-এর Trands and cycles in Economic Activity, Henry Holt & Co., New York, 1956, এবং D. Hamberg-এর Economic Growth and Instability, W. W. Norton & Co., New York, 1956.

১৭. দেখুন—যথা, J.K. Galbraith-এর American Capitalism, Hongh-ton Mifflin, Boston, 1952, সপ্তম অধ্যায়, A. D. H. Kaplan -এর Big Enterpriss in a Competitive Society, the Brookings Institution, Washington D.C. 1954; E. S. Mason-এর "The New Competition" yale Review, 'XLIII 37-48 (Sept. 1953) এবং P. Wiles-এর "Growth versus Choice" Economic Journal LXVI, no 262, 244-4-245 (জুন, 1956).

১৮. দেখুন—যথা, Alfred Mashall-এর "Mechanical and Biological Analogies in Economics' in Memorials of Alfred Marshall (A.C. Pigon ed.) Macmillan & Co., Ltd., London, 1925, 312-318.

সম্পদ সরবরাহ, উৎপাদন আঙ্গিক (Production techneque).), বাজার,-পদ্ধতি, অর্থনৈতিক জীবনধারার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দেশবাসীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। সত্য বটে, কিন্তু তা যে সবে সূত্রপাত। তা যে প্রারম্ভিক বিন্দুমাত্র। যাত্রাপথের সূচনা কেবল। ঐ সমস্ত 'ফাঁকা বাক্স' যে ভরাট করতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত উপাদান জাতীয় আয় নির্ধারণে প্রত্যক্ষ নিয়ামক বটে। কিন্তু তাছাড়াও যে আরও বহু বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এইসব উপকরণের অন্তরালেও যে লুকিয়ে আছে আরও বহু নিয়ামক। এগুলোও যে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং কেবল তক্ষুণি উপলব্ধি করা যাবে জাতীয় আওতার নিয়ামকসমূহের মধ্যকার কারণিক সম্পর্ক (causal connections)। এই অনুধাবন বা উপলব্ধি কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য নয়। তা বুঝতে হবে। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে।

একটা মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। কেবল অর্থনৈতিক ঘটনাবলী দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম কতটুকু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? অর্থনীতি (economy) যে একটা যান্ত্রিক প্রথা নয়। অর্থ-নৈতিক প্রভাবাবলী 'স্বাভাবিক গতিতে' প্রবাহিত হয় না। তাদের ক্রিয়া-কর্ম চলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধাত্রে বা আঁধারে (Socio-Cultural matrix)। সুতরাং, এগুলোর গুণাগুণ যাচাই করতে হবে দেয় পরি-প্রেক্ষিতে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক হাজারো ঘটনা উন্নয়নের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ও প্ররোচিত করে। কেমনতর সরকার, আইন-পদ্ধতি কেমন, শিক্ষা-দীক্ষার মানই বা কতটুকু, পরিবারের ভূমিকা, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি বিষয় দেশের উন্নয়ন স্রোত প্রভাবিত করে। কাজেই বলা যায়, উন্নয়ন কার্যক্রিয়া বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী মুখ্য হলেও অন্যান্য বিষয়াবলী উপেক্ষণীয় নয়। বরং পরিপূর্ণ আচরণ উন্মোচনে এই উভয়বিধ উপকরণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উপকরণসমূহ অধিক দৃষ্টির দাবীদার বটে। তবে ঘাত-সংঘাত সৃষ্টিকারী ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্মদায়িনী সমাজের অন্যান্য কোটরেও উপযুক্ত দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই উন্নয়ন সম্পর্কীয় আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। তার আগে নয়।

সে যাই হউক প্রশ্ন করা যাক উন্নয়ন সমস্যার অর্থনৈতিক দিকগুলো কি? কেমনতর তাদের আচার-প্রকৃতি ও রীতি-নীতি? কেউ কেউ বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তত্ত্বাবলী। যদি তাই হয়, তাহলে পরিধি সীমাহীন নয় কি? এইসব কি একই সুতায় গ্রথিত

করা সম্ভব? তার মধ্যে যে হাজার প্রকৃতির মালমশলা বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ধরন-ধারণ ও আকৃতি-প্রকৃতি যে বিচিত্র রকমের? এই সবের মধ্য থেকে ঐক্যসূত্র খুঁজে বের করা যাবে কি করে?

প্রশ্ন জটিল বটে। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। একটা সাধারণ পথ পাওয়া যাবে বৈকি। উন্নয়ন মানে একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ধরে এগুতে শুরু করলে চিত্র-বিচিত্র বহু ঘটনা আকার ধারণ করে একটা সাধারণ সূত্র চিহ্নিত করে। ধরা পড়ে অনেকগুলো সমধর্মী উপকরণ। উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে গেলে প্রগতিশীল ক্রিয়াকর্ম বোঝায়। গতিশীল ক্রিয়াকর্ম মানে প্রধান কতকগুলো শক্তি যোগসাজসে একটা প্রথার জন্ম দেয় যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে একটা ফললাভ ঘটে। কাজেই, একটা যুক্তির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় একটা কাঠামো বা ছক্। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অগ্রগতির এই সাধারণ ছক্ বিশ্লেষণ করে বিশেষ বিশেষ দেশের উন্নয়ন কর্মাবলী ও তৎসংলগ্ন সমস্যাবলী পর্যালোচনা করা যায় এবং সাধারণ নক্সায় মিলিয়ে বিশেষ ঘটনার তারতম্য উপলব্ধি করা যায়।

আমাদের মৌলিক লক্ষ্য ব্যক্ত করা যাক। বহিরাবরণ ভেদ করে ঘটনাবলীর অভ্যন্তরে ঢুকে তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিবৃত করা হবে। তাতে উন্নয়ন-প্রথা অনুধাবন করা সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্লেষণ এমনভাবে বিস্তৃত করা হবে যেন অর্থনৈতিক অগ্রগতির নিয়ামকগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সাদামাঠা কথায় বিশ্লেষণ ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অথবা অর্থনীতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করায়ও আমরা তেমন আগ্রহী নই। উন্নয়নের 'গল্প' শুনিয়েই আমরা নিবৃত্ত হতে চাই না। সমাবেশ ঘটাতে চাই উন্নয়নরূপ নাটকের সমগ্র ঘটনাবলী। গ্রথিত করে নিতে চাই সংঘাতভিত্তিক প্রগতি-প্রক্রিয়ার 'কাহিনী' (Plot)।

কথাটা উপন্যাসিক E. M. Forster-এর বক্তব্য দিয়ে পরিষ্কার করা যাক। E. M. Forster উপন্যাসের আলোচনা করতে যেয়ে 'গল্প' ও 'কাহিনী'র পার্থক্য দেখিয়েছেন। 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে করবেন না যেন। ধন বিজ্ঞানের বই লিখতে যেয়ে উপন্যাসের কাহিনী টেনে আনা হয়ত স্বাভাবিক নয়। তবে বর্তমানক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে যোগ্য বলেই এই তুলনার অবতারণা। Forster বলেন, গল্প মানে 'সময়-অনুক্রমে সাজানো ঘটনাবলীর বিন্যাস। কাহিনী ও

তাই বটে। তবে তা কার্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত। 'রাজা মারা গেলেন, অতঃপর রাণী মারা গেলেন'—কথাটা সাদামাঠা এক গল্প। 'রাজা মারা গেলেন, সেই শোকে রাণী মারা গেলেন'—এটা কাহিনী। সময় অনুক্রম বজায় রইল। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক প্রাধান্য হয়ে উঠল। অথবা দেখুন 'রাণী মারা গেলেন, কেউ তেমনটা জানল না। কিন্তু, পরে আবিষ্কৃত হল যে রাজার শোকে রাণী মারা গেলেন।' এটা একটা কাহিনী যার মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা রহস্য। এই রহস্য ঘন হয়ে রসঘন হয়ে উঠার সম্ভাবনায় সম্ভাবনাময়। সময়-মাত্রা ছাড়িয়ে গল্পের বাধা ছক্‌ কাটিয়ে তা পরিমিত সীমান্ত অবধি পদচারণা করে বেড়ায়। আমরা বলি রাণী মারা গেলেন। এটা নিছক গল্প হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—'অতঃপর'? আর যদি কাহিনী হয় তাহলে মনে দ্বিধা জাগে 'কেন'? উপন্যাসের এই দিক্‌কার মৌলিক পার্থক্য এখানে পরিলক্ষ্যণীয়।[১৯]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই মৌলিক পার্থক্য অনুধাবনীয়। উন্নয়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণের দুই দিক খতিয়ে দেখলে এই মৌলিক বিভেদ সহজেই ধরা পড়ে। কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস যেমন অধিকতর রসঘন, তেমনি কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণও অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। সাদামাঠা বর্ণনায় তেমনটা নয়। দেশের উন্নয়ন ক্রিয়াবলী ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করতে যেয়ে এটুকু বলা যে 'এটা ঘটল', অতঃপর 'সেটা ঘটল' তেমন শিক্ষাপ্রদ বা মূল্যবান কিছু নয়। যুক্তিজাল বিস্তৃত করে বিশ্লেষণ করতে হবে—কেন তা ঘটল, উন্নয়নধারায় একটা কাহিনী নিমজ্জিত রয়েছে; আলোচনায় তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। তবেই অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুতরাং, বিস্তারিত বিশ্লেষণ শুরু করার পূর্বে কতকগুলো তাত্ত্বিক নক্সা আলোচনা করে নেয়া দরকার। মৌলিক তাত্ত্বিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করে নিয়ে এগুলো অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা, তত্ত্বহীন আলোচনা ভিত্তিহীন হতে বাধ্য। আর ভিত্তিহীন আলোচনায় খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা অত্যধিক। চিত্র-বিচিত্র ঘটনাবলীর আবর্তে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আলোচনা সুসংবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত। সুসংহত সিদ্ধান্তে পৌছা কষ্টকর। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য আলোচনার একটা সুষ্ঠু

১৯. দেখুন, E. M. Forster-এর, Aspects of the Novel, Edward Arnold & Co., London, 1949, পৃঃ ৮২-৮৩।

আঙ্গিক প্রদান করা। তা করতে হলে চাই বিশ্লেষণের একটা সংঘবদ্ধ কাঠামো। প্রয়োজন একটা বিজ্ঞানভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিত। এমন কতকগুলো ধ্যান-ধারণা যা দিয়ে ঘোরপ্যাচালো জটিলাবর্ত থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

অতীতের বহু প্রখ্যাত ধন বিজ্ঞানী এই সকল ধ্যান-ধারণা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে গিয়েছেন। তন্মধ্যে আদম-স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০), ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩), কার্লমার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩), আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪), জোসেফ সুম্পিটারের (১৮৮৩-১৯৫০) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। সাম্প্রতিককালেও বহু ধন বিজ্ঞানী আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। প্রথম পর্বে তাত্ত্বিক অবদানগুলো সন্নিবেশিত করা হবে। অতঃপর অধিক অর্থবহ বিষয়াবলী একত্রিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৃহত্তর ছাঁচ সাজিয়ে নেয়া হবে। উন্নয়ন সম্পর্কে একটিমাত্র তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলায় আমরা আগ্রহী নই। হয়ত তা সম্ভবও নয়। তবে 'স্তম্ভ থেকে খুঁটি নাগাদ' দৌড়াদৌড়ি করাও আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যাবলী। এই সমস্যা পরিস্ফুটনে সহায়ক এমন সব সাধারণ তত্ত্বাবলী আমরা খতিয়ে দেখতে চাই। আমাদের বিশ্বাস এতে সমস্যা অনুধাবন সহজ হবে।

দ্বিতীয় পর্বে যে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে তার লক্ষ্য উন্নয়নের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহে অনুসন্ধিৎসা চালিয়ে পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে নেয়া। তত্ত্বগত শিক্ষা প্রত্যয়াবলী (**Concepts**) প্রদান করবে এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সম্পর্ক-বন্ধন উন্মোচিত করবে। তার ফলে, চিত্র-বিচিত্র উপাত্ত (**data**) সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে এবং ঐতিহাসিক বিষয়াবলী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, অতীতের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তত্ত্বসমূহের সত্যতা (**Validity**) ও যথার্থতা যাচাই করে নেয়া যাবে।

তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার আঙ্গিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির সাম্প্রতিক সমস্যাবলী রীতিবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে। দরিদ্র দেশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ (তৃতীয় পর্ব) যেমন তেমনি ধনী দেশের অন্তরায়গুলো (চতুর্থ পর্ব) ও বিন্যাসিত করে সাজানো যাবে। অতঃপর সমস্যাবলীর প্রতিকার-প্রণালী মূল্যায়ন করে নেয়া হবে।